GIFT

ইসলাম ও সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০) : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০১২

Dhaka University Library
466242

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466242

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক

অনুপমা আফরোজ

পিএইচ. ডি গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

B
RB
297.082
AFI

Nayim

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, অনুপমা আফরোজ, পিএইচ. ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রেজিঃ নং ১৫০ (পুনঃ), শিক্ষাবর্ষ, ২০০৮-২০০৯, পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ইসলাম ও সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০) : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। এটি গবেষকের একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষায় উক্ত শিরোনামে কোন পিএইচ. ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ. ডি ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

466242

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ইসলাম ও সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০) : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উক্ত শিরোনামে পিএইচ. ডি ডিগ্রী বা প্রকাশের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ উপস্থাপন করিনি।

Anupama Afroz
20.12.12

অনুপমা আফরোজ
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

466242

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ রহমতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক **ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন** এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি **"ইসলাম ও সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০) : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভের কাজ সম্পন্ন করেছি। বিধি মোতাবেক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং রাসূল (স.) এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক **ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন**, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যিনি প্রচন্ড কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার গবেষণা কর্মের নির্দেশকের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়ে মূল্যবান সময়, শ্রম ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সহযোগীতা করেছেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁদের উৎসাহ, পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও সহযোগীতা আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। উত্তরা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাঁরা আমাকে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে সহযোগীতা করেছেন।

আমার অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশী সহযোগীতা করেছেন তিনি আমার স্বামী **আলমাস আহমেদ জায়েদ**, তাঁর সহযোগীতা ছাড়া আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল। তাই আমি তাঁর কাছে চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়াও অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যস্ত থাকার কারণে আমার শিশু কন্যা **রাইহা জুবাইদা রুহী** ও দুই বছরের শিশু পুত্র **আহমেদ জারিফ রাদিনকে** তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি। এজন্য আমি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমার পিতা **মোঃ আমিনুল ইসলাম** (সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন), মা **মোছাঃ নাদিরা বেগম**, বোন **নিরুপমা নাজনীন লিসা**, ভাই **মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম পান্জেল, তাহমিদ রাফি পল্লব**, শ্বশুর **আলতাফউদ্দীন আহমেদ**, শাশুড়ী **মেহেরুন্নেছা**, দেবর **আখলাক আহমেদ রিয়াদ** সর্বদা আমার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করেছেন। মহান আল্লাহর কাছে সকলের দীর্ঘায়ু ও উন্নয়ন এবং আমার মরহুম পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

466242

আভিসন্দর্ভ রচনার সহযোগীতার নিমিত্তে আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সহযোগীতা গ্রহণ করেছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে তাদের নাম ও গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবু এখানে আরেকবার তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থ, জার্ণাল, পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের সূত্রে যে সব গ্রন্থাগার সমূহ বিশেষ করে ঢাকায় অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, উত্তরা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, প্রভৃতি থেকে সহযোগীতা গ্রহণ করেছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্টাফদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও আমি ধন্যবাদ জানাই **ড. আবুল বাসার, ড. পারভীন সুলতানা** ও **আজিজুন নাহার** প্রমুখকে। যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগীতা দান করে আমার কৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ হয়েছেন।

অনুপমা আফরোজ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

- আরবী ও ইংরেজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অবলম্বন। যেমন

أ = আ a	ج = জ dj, j	ڑ = ড় r	ظ = জ z	م = ম m
إ = ই i	چ = চ c	ز = য z	ع = ‘	ن = ন n
اُ = উ u	ح = হ h	ژ = ঝ zh	غ = গ gh	و = ও w
ب = ব b	خ = খ kh	س = স s	ف = ফ f	ء = ’
پ = প p	د = দ d	ش = শ sh	ق = ক k, q	ى = য় y
ت = ত t	ڈ = ড d́	ص = স s	ك = ক k	= এ ێ ay
ث = ছ th	ذ = য dh	ض = দ/য d	گ = গ g	
যের+ ي =ঈ,ী	ر = র r	ط = ত t	ل = ল L	
	পেশ+ و = ঊ,ূ			

- অভিসন্দর্ভে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে অনুসৃত প্রতিবর্ণায়নের পদ্ধতিকেই অনুসরণ
- ফুটনোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমবার গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম, অনুবাদকের নাম, খন্ড, প্রকাশক, প্রকাশনার সময়কাল, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে শুধু গ্রন্তকারের নাম অথবা গ্রন্থের নাম কিংবা শুধু প্রাগুক্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।
- ফুটনোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা ক্রমিক নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।
- পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে লেখকের পরিবর্তে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে লেখকের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ / আ. / আঃ = আলাইহিস সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)

স. / স / সা / সাঃ = সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)

রা / রা. / রাঃ = রাদিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)

র. / রহ. = রহমতুল্লাহি আলাইহি (তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক)

বা / বাং = বাংলা

ইং = ইংরেজী

হিঃ = হিজরী

খ্রীঃ = খ্রীষ্টাব্দ

বি. দ্র. = বিস্তারিত / বিশেষ দ্রষ্টব্য

ড. / ডঃ = ডক্টর

খ. / খঃ = খন্ড

পৃ. / পৃঃ = পৃষ্ঠা

সং = সংস্করণ

মাওঃ = মাওলানা

অনুঃ = অনুবাদ

অনূ. = অনূদিত

ইফাবা = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

জ = জন্ম

মৃ. = মৃত্যু

তা. বি. = তারিখ বিহীন

Vol = Volume

p: / P: = page

Ed. = Edition

Op. cit = Opere citato (in the work cited)

Ibid = Ibidem (in the same place from the some source)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

- প্রত্যয়ন পত্র
- অঙ্গীকার নামা
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার
- প্রতিবর্ণায়ন
- ভূমিকা

পৃষ্ঠা নম্বর

প্রথম অধ্যায় :

ইসলাম ও নারী.. (১৬-৬৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম পরিচিতি.. ১৬
নারী পরিচিতি ২১
নারীর স্বভাবজাত গুণাবলী.. ২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের ব্যবধান.. ২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারী-পুরুষের ব্যবধান.. ৩২
- কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে.. ৩২
- উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে.. ৩৩
- সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে.. ৩৩
- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ব্যবধান............................ ৩৪
- ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যকার ব্যবধানের কারণ........................ ৩৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারী-পুরুষের সমতা.. ৩৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারীর ব্যক্তিত্ব.. ৪৫
- আল কুর'আনের আলোকে.. ৪৫
- আল হাদীসের আলোকে.. ৪৭
- রাসূল (স.) এর সময়ে নারী ব্যক্তিত্বের প্রশংসনীয় ভূমিকা.................. ৪৮
- রাসূল (স.) এর সময়ে নারীর ব্যক্তিত্ব ও অধিকার রক্ষার দাবী............ ৫১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আল কুর'আনে বর্ণিত কয়েকজন মহীয়সী নারী.................................. ৫৫
- হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা:).. ৫৫
- হযরত আয়েশা (রা:).. ৫৮
- হযরত হাজেরা (আ:).. ৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায় :

বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান.............................. (৬৪-১৬০)

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুমেরীয় সভ্যতায় নারী.. ৬৫
আক্কাদীয় সভ্যতায় নারী.. ৬৭
অ্যাসিরীয় সভ্যতায় নারী ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবিলনীয় সভ্যতায় নারী........ ৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মিশরীয় সভ্যতায় নারী........ ৭৭

গ্রীক সভ্যতায় নারী........ ৭৮

রোম সভ্যতায় নারী........ ৮২

পারসিক ধর্ম বা পারস্য সভ্যতায় নারী........ ৮৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চীন সভ্যতায় নারী ৮৯

ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মে নারী........ ৯২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্মে নারী........ ১১২

ইহুদী ধর্মে নারী........ ১১৫

খৃষ্ট ধর্মে নারী........ ১২১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আরব সভ্যতায় নারীর অবস্থান........ ১৩১

- রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে ১৩১
- রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পর........ ১৪৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আধুনিক বিশ্বে নারী........ ১৫৪

তৃতীয় অধ্যায় :

ইসলামে নারী প্রগতি........ (১৬১-২৬৮)

প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিগত জীবনে নারী প্রগতি........ ১৬২

- ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৬২
- উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৬৫
- মান-সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতি ১৬৬
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৬৭
- ঈমান রক্ষা ও আমল করার ক্ষেত্রে প্রগতি ১৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৬৯

- মা হিসেবে নারীর মর্যাদা........ ১৬৯
- স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা........ ১৭১
- কন্যা সন্তান হিসেবে নারীর মর্যাদা........ ১৭৮
- বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা........ ১৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পারিবারিক জীবনে নারী প্রগতি........ ১৮২

- দাম্পত্য অধিকারের ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৮২
- পারস্পরিক পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৮৩
- বিবাহের ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৮৪
- পাত্র নির্বাচনের অধিকার........ ১৮৫
- বিবাহে নারীর মতামত প্রদানের অধিকার ১৮৬
- বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৮৭
- নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার........ ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সামাজিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ১৯৪
- জন্মগত সমতাভিত্তিক প্রগতি........ ১৯৪
- বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৯৫
- মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৯৭
- আইনের ক্ষেত্রে সুবিচার লাভের ক্ষেত্রে প্রগতি........ ১৯৮
- সভ্যতার অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ২০০
- রাসূল (স.) এর সময়ে মুসলিম নারীর সামাজিক কর্মে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত........ ২০১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শিক্ষাক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ২০৪
- হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা........ ২০৮
- রাসূল (স.) এর যুগে জ্ঞানী মহিলা........ ২১০
- সাহাবীদের যুগে নারীর জ্ঞানচর্চার পরিচয়........ ২১২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ২১৫
- মসজিদ ভিত্তিক কর্মকান্ডে নারী প্রগতি........ ২১৫
- হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ২২৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ২২৯
- অর্থ উপার্জন ২২৯
- ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার........ ২২৯
- ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার........ ২৩২
- মোহরের অধিকার........ ২৩৯
- স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করার অধিকার........ ২৪১

অষ্টম অধ্যায় : কর্মক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ২৪৩
- ঘরে-বাইরে কর্মতৎপরতা........ ২৪৩
- পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করানো........ ২৪৪
- কৃষিকাজ........ ২৪৪
- পশুচারণ........ ২৪৫
- ব্যবসা-বাণিজ্যে........ ২৪৫
- শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে........ ২৪৬
- শিক্ষকতা........ ২৪৭
- সেবামূলক কাজ........ ২৪৭
- ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা........ ২৪৮

নবম অধ্যায় : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি........ ২৫০
- নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার........ ২৫১
- ইসলামে নারী নেতৃত্ব........ ২৫১
  - রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নেতৃত্ব দান........ ২৫১
  - রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্যান্য পদে নের্তৃত্ব দান........ ২৫৫
- পরামর্শ ও মতামত প্রকাশ........ ২৫৭
- ধর্ম রক্ষার সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ........ ২৬০
- অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ........ ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

- রাসূল (স.) এর সময়ে নারীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত ২৬২

চতুর্থ অধ্যায় :

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯০০-২০০০)....................................... (২৬৯-৪০৬)

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯০০-১৯৭১)......................... ২৭০

- বৃটিশ শাসনামলে নারীর অবস্থান (১৯০০-১৯৪৬ সাল)................ ২৭৪
- পাকিস্তান শাসনামলে নারীর অবস্থান (১৯৪৭-১৯৭০ সাল)............ ৩১২
- মুক্তিযুদ্ধে নারী (১৯৭১ সাল)... ৩১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯৭২-২০০০)............................... ৩২০

- পরিবার ও সমাজে নারী.. ৩২০
- শিশু নারীর অবস্থান.. ৩২০
- শিশু নারীর প্রতি বৈষম্যের ধরণ.. ৩২১
- শিশু নারীর প্রতি বৈষম্যের প্রভাব... ৩২৬
- পরিবার ও সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর অবস্থান............................ ৩৩০
- বয়স্ক নারী নির্যাতনের ধরণ.. ৩৩৩
- শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান.. ৩৪১
- শিক্ষা প্রসারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ................................ ৩৪৫
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান... ৩৪৮
- কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান.. ৩৫০
- নারীর রাজনৈতিক অবস্থান.. ৩৫৬
  - ভোটার হিসেবে নারীর অবস্থান....................................... ৩৫৬
  - রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে নারী...................... ৩৫৭
  - স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে নারী... ৩৬০
  - জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে নারী... ৩৬২
- নারী ও সংরক্ষিত আসন.. ৩৬৫
- প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নারী.. ৩৬৭
  - বেগম খালেদা জিয়া... ৩৬৮
  - শেখ হাসিনা... ৩৭২
- বাংলাদেশের আইনে নারীর অবস্থান....................................... ৩৭৪
- স্বাধীন বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা.......... ৩৮২
- বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অবস্থান.................................. ৩৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ.............. ৩৮৮

- নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্যোগ........................... ৩৮৮
- নারী উন্নয়নের বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ........................... ৩৯৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়:

বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০)............................ (৪০৭-৪৬৬)

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১)................ ৪০৮

বিভিন্ন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারী প্রগতি আন্দোলন.............................. ৪০৮

- সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তির জন্য আন্দোলন.................................. ৪০৯
- বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন.................................. ৪১১
- বাল্যবিবাহ রোধের জন্য আন্দোলন...................................... ৪১৩
- বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্দোলন...................................... ৪১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষাক্ষেত্রে নারী প্রগতি আন্দোলন.. ৪১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১)...................... ৪২৫

- অন্যান্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১)................ ৪৩২
- নারী প্রগতি আন্দোলনে সম্পৃক্ত কতিপয় নারী.......................... ৪৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : স্বাধীন বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯৭২-২০০০)........................ ৪৪৪

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ পুনর্বহালের আন্দোলন............... ৪৫৪
- নারী উন্নয়ন ও প্রগতি আন্দোলনে সম্পৃক্ত সংগঠনসমূহ................ ৪৫৯
  - মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর.. ৪৬১
  - বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ.. ৪৬২
  - আইন ও শালিস কেন্দ্র... ৪৬২
  - নারীপক্ষ.. ৪৬৩
- এনজিও ও নারী উন্নয়ন কর্মসূচি.. ৪৬৩
  - ব্র্যাক ৪৬৩
  - প্রশিকা ৪৬৪
  - কারিতাস.. ৪৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায় :

বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা... (৪৬৭-৪৭৭)

১ম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যা.. ৪৬৮

২য় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা.. ৪৭৩

উপসংহার :.. ৪৭৮

গ্রন্থপঞ্জি :.. (৪৮৩-৫০০)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অপার মহিমায় নর ও নারী এই দুইটি রূপে মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। এবং দান করেছেন মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা। শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই মানব জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পুরণে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান অধিকারী। মানব অস্তিত্ব রক্ষা, সহজাত প্রবৃত্তির সৃজনশীল বিকাশ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকারের নামই হচ্ছে মানবাধিকার। প্রতিটি মানব সন্তানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কতিপয় অধিকার তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আর তা হচ্ছে, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার। এগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর এই অধিকারগুলো জন্ম থেকে মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই এটা তার জন্মগত ও মৌলিক অধিকার।

মহান সৃষ্টিকর্তা লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সমান অধিকার প্রদান করেছেন। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুগ যুগ ধরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা অমানবিক নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অথচ বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। শহরের নারীরা সমাজে অবস্থানগত কারণে কিছুটা সুবিধাজনক পর্যায়ে অবস্থান করলেও গ্রামের নারীকে বেঁচে থাকার জন্য করতে হচ্ছে নিরন্তর সংগ্রাম। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার ও পুরুষপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার কারণে তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা লিঙ্গগত কারণে অনেক বেশী অবহেলিত ও নিরাপত্তাহীন। নারী নির্যাতন বন্ধ এবং নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আইন প্রণীত হয়েছে কিন্তু তাতেও নারী নির্যাতন বন্ধ হয়নি। কারণ সে আইন নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য যথোপযোগী নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই দিয়েছে মানবজাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা। ইসলামে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নারীকে যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কেননা নারী-পুরুষ একই উৎস হতে একই রকম আবেগ অনুভুতি নিয়ে সৃষ্ট। নারীরা সমাজের কোন বিচ্ছিন্ন অংশ নয় বা পুরুষের প্রতিদ্বন্দী নয় বরং সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই একে অপরের সহযোগী। তাই নারী জাতিকে বাদ দিয়ে, নির্যাতন অবহেলার মাধ্যমে দমিয়ে রেখে মানব সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মানুষ জন্মসূত্রে চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করে। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম ক্ষমতা তাকে এসব অধিকার প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। তাই যদি রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোন শক্তি মানুষের এসব অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে সে তার মনুষত্বই কেড়ে নিল বা হরণ করল তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। তাই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত অধিকারগুলো মানুষের অবিচ্ছেদ্য এবং অন্তর্নিহিত অধিকার। এসব অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করার কোন উপায় নেই। এসব অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষ পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, পরিপূর্ণরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। আর এই অধিকার লাভ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রয়োজন।

মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে পরিবার। পরিবারে মানুষ নানরকম সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যেমন, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন প্রভৃতি। আর পরিবারের মধ্যেই মানুষের প্রাথমিক জীবনের সূচনা হয়। প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আর এই পরিবারই নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্থায়িত্ব রূপ দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভুমিকা অপরিসীম। পরিবার ও সমাজে নারী ও পুরুষ এক অপরের পরিপূরক।

কিন্তু বিভিন্ন সত্যতা, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় নারীর অবদান অস্বীকৃত। কোন কোন সমাজ ও সভ্যতায় নারী মানুষ একথাই স্বীকৃত নয়। আবার কোন কোন সমাজে নারী যদিও মানুষ হিসেবে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার এমন এক স্তরে নিমজ্জিত যেখানে অধিকারের প্রশ্নে নারী ও পশু সমপর্যায়ভুক্ত। পশুর জীবনকে যেমন মানুষ মূল্যহীন মনে করে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে তেমনি বিভিন্ন সমাজে নারী যথেচ্ছভাবে পুরুষের ভোগ ও বিলাসিতার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নারীরা ছিল পুরুষের সেবাদাসী। সেবার নামে নারীদের সাথে যথেচ্ছভাবে ব্যভিচার করা হতো। এক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। চীন সভ্যতায় নারীকে দু:খের প্রস্রবণ বলা হতো, নারী ছিল স্বামীর পরিবারের সম্পত্তি। স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত। খৃষ্টধর্মে বলা হতো, নারীর কোন আত্মা নেই, তাই আত্মাহীন নারীরূপী আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলা যায়। প্রাচীন খৃষ্টধর্মে দোষী নারীকে অগ্নিদগ্ধ করা আইনসঙ্গত ছিল। ভারতীয় সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল আরও করুণ। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো।

প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে গ্রীক সভ্যতা সর্বাধিক গৌরবময় ছিল কিন্তু সেই গৌরবময় গ্রীক সভ্যতায়ও নারীর অবস্থা ছিল অধ:পতিত। সেখানেও নারী গণিকা, রক্ষিতা ও পুত্র সন্তান লাভের মাধ্যম ছিল। রোম সভ্যতার অবস্থাও গ্রীক সভ্যতার মতোই ছিল, প্রথমদিকে নারীরা ছিল মর্যাদাহীন। পরবর্তী পর্যায়ে আইন দ্বারা নারীদের কিছুটা মর্যাদা দেয়া হলেও পুরুষের সমান মর্যাদা তারা পেত না। রোমান আইনে পতিতাবৃত্তি ঘৃণ্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে লাম্পট্য, বিবস্ত্রতা, নির্বিচার ব্যভিচার মহামারীরূপ ধারণ করে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ে, তাদের উচ্ছৃংখলতা এতটাই খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে রোমান সম্রাট টাইবেরিয়াসকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। ঐতিহাসিকরা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ব্যভিচার ও বেহায়াপনাকে দায়ী করেছেন। আরব সমাজে জাহেলিয়াতের যুগে নারীর অবস্থা সর্বাধিক নির্যাতিত ও নিপিড়ীত ছিল। জন্মের পর শিশুকন্যাকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলা হতো। নারীরা ভোগ্যপণ্যের মত ব্যবহৃত হতো। সমাজে একাধিক ঘৃণ্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্যভিচার ও বহুগামিতা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করত। জোরপূর্বক নারীকে স্ত্রী বা দাসীতে পরিণত করত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা পিতার স্ত্রী ও কন্যাদের উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ করে নিয়ে অবাধে ভোগ করত। জুয়া খেলায় স্ত্রীকে বাজী ধরত, হেরে গেলে অবলীলায় স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিত। একজন মালিকের অধীনে অসংখ্য ক্রীতদাসী থাকত। বিভিন্ন স্থান থেকে নারীদের লুণ্ঠন করে এনে দাসী করা হত এবং ভেড়া-ছাগলের মত হাটে বাজারে বিক্রি করা হতো। এতিম মেয়েদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য বিয়ে থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। নারীদের তালাক প্রদানের কোন অধিকার ছিল না। নারীরা সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো না। মোটকথা রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে সকল সমাজ, সভ্যতা ও ধর্মে নারী ছিল চরমভাবে অবহেলিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত।

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পর ইসলাম নারীকে মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন হিসেবে কেবল পরিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তাই দান করেনি বরং তারও উর্ধ্বে সত্যিকার মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একজন পুরুষের মতই দায়িত্বশীল। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে উভয়ের গুরুত্ব সমান। পুরস্কার ও প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে সমাজে সম্মানজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাসূল (স.) এর মাধ্যমে নারী পেয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার, বিবাহ করার অধিকার, তালাক প্রদানের অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, উপার্জন করার অধিকার ও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার, পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ঈমান আমল রক্ষার অধিকার, সৎ কাজ করার অধিকার, অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার অধিকার, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার ইত্যাদি।

ইসলাম প্রদত্ত অধিকার পেয়েও আধুনিক বিশ্বে নারীসমাজ এখনও বঞ্চিত ও নির্যাতিত। এর অন্যতম কারণ ইসলাম প্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া। এছাড়াও স্বাধীনতার নামে নারীরা বর্তমান বিশ্বে প্রাচীন সভ্যতার চেয়েও অধিক নির্যাতিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও একইরূপ চিত্র পরিস্ফুটিত হচ্ছে। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার, মর্যাদা ও প্রগতিকে পাশ কাটিয়ে তথাকথিত প্রগতি ও স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশের নারীরা সমাজে নিজেকে পণ্যরূপে উপস্থাপিত করছে। এরফলে সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্ষণ, হত্যা, ব্যভিচার, নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপের মত সহিংস ঘটনা। এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীরা আরও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে। এই নির্যাতনের কবল থেকে অবুঝ শিশুও মুক্তি পাচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানেও নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে মৌলিক অধিকারসহ সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সমাজে নারীসহ অন্যান্য দুর্বল অংশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা দেয়ার উল্লেখও সংবিধানে রয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের মধ্যে রয়েছে ভোটাধিকার, চাকুরীর অধিকার, সভা-সমিতির আয়োজন করার অধিকার, পেশা গ্রহণের অধিকার, বিবাহ সম্পর্কিত অধিকার, ধর্মীয় ও বাক স্বাধীনতার অধিকার, আইনে সমান ব্যবহার পাওয়ার অধিকার, নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির অধিকার ইত্যাদি। এসব অধিকার কাজে লাগিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের নারীরা পরিবার, সমাজ, শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি লাভ করেছে। ১৯৯১ সাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর আসনে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন তারা উভয়েই নারী। তারপরও বাংলাদেশের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্নরূপে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, ভূ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দাবীতে বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও এনজিও গুলিও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহযোগীতার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

পৃথিবীতে মানব বংশধারার সুষ্ঠু বিকাশ ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম। এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানে আল্লাহর সৃষ্টি নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার, মর্যাদা, সম্মান ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। আর এই বিধি বিধান কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আবির্ভূত সকল নর-নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু মানবজাতির অর্ধাংশ নারীজাতি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। বর্তমানে নারী জাতির এই বিপর্যয়ের জন্য মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি এবং ইসলামী বিধান পালনের অনীহা অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়াও ইসলামের কতিপয় বিধান যেমন, পুরুষের একত্রে চার বিবাহের অনুমতি, তালাকের অধিকার ও পিতার সম্পত্তিতে ছেলের তুলনায় মেয়ের অধিকার অর্ধেক হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে যুক্তিহীন, বাস্তবতা বিবর্জিত চিন্তাভাবনা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব নারী নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাই আমার গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য মানব সমাজের অজ্ঞতাপ্রসূত প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে ইসলামই যে নারীর সর্বাধিক প্রগতি দান করেছে তা তুলে ধরা। আর ইসলামী বিধানের কার্যকারীতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়িত হবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নারী-পুরুষের কাছে গবেষণা কর্মটি উপাত্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

হবে- এই প্রত্যাশা আমাকে **ইসলাম ও সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০): প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ** শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী সৃষ্টি করে যে সম্মান, মর্যাদা, অধিকার ও সমতা দিয়ে সর্বাধিক প্রগতি দান করেছেন তা উপস্থাপন করা, রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বেকার বিভিন্ন সমাজ, সভ্যতা ও ধর্মে নারীর অবস্থান, রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পর ইসলাম প্রদত্ত নারী প্রগতি, বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারী প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে সুক্ষাতিসুক্ষ্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করাও এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। **ইসলাম ও সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০): প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ** শিরোনামে নির্ধারিত অভিসন্দর্ভের বিষয়গুলিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়কে ছয়টি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ইসলাম পরিচিতি, নারী পরিচিতি ও নারী সৃষ্টি, নারীর গুণাবলী, নারী-পুরুষের মধ্যকার সৃষ্টিগত ব্যবধান, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নারী-পুরুষের ব্যবধান, ইসলামে নারী-পুরুষের ব্যবধান, ইসলামে নারী-পুরুষের সমতা, নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ, পবিত্র কুর'আনের ও হাদীসের আলোকে নারীর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা, নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক উপকরণসমুহ, হাদীসের আলোকে নারী ব্যক্তিত্বের কতিপয় প্রশংনীয় ভুমিকার দৃষ্টান্ত, মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা এবং অধিকার ও দায়িত্বানুভূতির কিছু দৃষ্টান্ত, আল কুর'আনে বর্ণিত কয়েকজন মহীয়সী নারী, যেমনঃ হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), হযরত হাজেরা (আঃ), ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়কে ছয়টি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করে বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা যেমনঃ সুমেরীয় সভ্যতা, আক্কাদীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, রোম সভ্যতা, পারসিক ধর্ম বা পারস্য সভ্যতা, চীন সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, আরবসভ্যতায় নারী - রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে, রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পর নারীর অবস্থান ও আধুনিক বিশ্বের কতিপয় দেশে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়কে নয়টি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে নারীর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, মর্যাদার ক্ষেত্রে, পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা, ইবাদত, অর্থনীতি, কর্ম ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের যে সর্বোচ্চ প্রগতি দান করেছে তা কুর'আন ও হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯০০-১৯৭১), স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯৭১-২০০০) পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান, নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, আইনে নারী এবং বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অবস্থান, নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে বিবরণ দান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করে স্বাধীনতা পূর্ব সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, শিক্ষালাভের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আন্দোলন, এবং স্বাধীন বাংলাদেশে নারী প্রগতি

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন (১৯৭১-২০০০), নারী প্রগতি আন্দোলনে সম্পৃক্ত কতিপয় সংগঠন ও এনজিও সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নারী উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সম্পর্কিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়কে দুইটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ এবং ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

উপসংহারে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনামূলক মতামত পেশ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বিভিন্ন বিবরণের অধিকাংশ কুর'আন, হাদীস ও বিভিন্ন মনীষিদের রচিত তথ্যভিত্তিক গ্রহণযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থরাজি, প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সহযোগীতা গ্রহণ করে প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রমাণসহ পেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জিতে গবেষণার সহায়ক গ্রন্থাবলীর নামের তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও নারী

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম পরিচিতি
নারী পরিচিতি
নারীর স্বভাবজাত গুণাবলী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের ব্যবধান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারী-পুরুষের ব্যবধান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারী-পুরুষের সমতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলামে নারীর ব্যক্তিত্ব
আল কুর'আনের আলোকে
আল হাদীসের আলোকে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আল কুর'আনে বর্ণিত কয়েকজন মহীয়সী নারী
হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)
হযরত আয়েশা (রাঃ)
হযরত হাজেরা (আঃ)

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

ইসলাম পরিচিতি

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত মানবজীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে পথভ্রষ্ট মানব সভ্যতা পেয়েছে সত্যপথের সন্ধান। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠ ও সুশৃংখল পরিবার এবং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থব্যবস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সাফল্যের রশ্মিতে উদ্ভাসিত করেছে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনকে সাফল্যের মহিমায় উজ্জ্বল করতে ইসলাম সদা তৎপর, তাই শুধু পারলৌকিক বিষয়ে ধর্মানুশীলন না করে বরং তার সাথে সফলতাপূর্ণ ও কল্যাণময় ইহলৌকিক জীবনকে সুসমন্বিত করলেই 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান' এই কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়।

ইসলামের আভিধানিক অর্থ

ইসলাম (إسلام) শব্দটি আরবী শব্দ। এই শব্দটি (سلم) সালমুন ও (سلم) সিলমুন শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি, সন্ধি ও নিরাপত্তা, বিরোধিতা পরিত্যাগ, আনুগত্য ও যুদ্ধ-সংঘাত ত্যাগের জন্য শান্তি প্রস্তাব, বিধি বিধান ও আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব।[১] অন্যভাবে বলা যায়, ইসলাম শব্দের অর্থ-প্রাকৃতিক শান্তির ধর্ম, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, হযরত মুহাম্মদ (স.) একে পূর্ণতা দান করে প্রচার করেন।[২]

ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইসলাম (إسلام) একটি আরবী শব্দ। এটি (س-ل-م) শব্দমূল হতে গঠিত باب إفعال এর মাস্‌দার (ক্রিয়ামূল)[৩]। এছাড়াও সাল্‌ম (سلم) শব্দটির উল্লেখযোগ্য অর্থগুলো নিম্নরূপ :

- সিল্‌ম (سلم) শান্তি
- বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা (বিপদ-আপদ) ও দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র থাকা।
- সন্ধি ও নিরাপত্তা
- আনুগত্য ও হুকুম পালন।[৪]
- الإسلام: الدخول في السلم অর্থাৎ আনুগত্যে প্রবেশ করা।[৫]
- ইসলাম (إسلام) এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ও মুসলমান হওয়া।[৬]

---

[১]. হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী, **ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন,** (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), ১ খন্ড, পৃঃ ১০৩; আল-ইমাম আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্‌ন আহমাদ বদরুদ্দীন আল-আইনী, **'উমদাতুল কারী ফী শারহিল বুখারী,** (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হিজরী), ১খন্ড, পৃঃ ১২৮; আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইব্‌ন উমার আল-জামাখশারী, **আল-কাশ্‌শাফু 'আন হাকায়িকিল গাওয়ামিজিত তানযীল ওয়া 'উয়ূনুল আকাবীল ফী উজুহিত তা'বীল,** (মিশরঃ মুস্তফা আল-বাবী আর-হালবী, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৮।

[২]. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, **ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,** (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ও জুন ১৯৮৪), পৃঃ ১৪৪।

[৩]. **ইসলামী বিশ্বকোষ,** সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮৮), পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ২৯৫। উল্লেখ্য যে, আল কুর'আনের আট জায়গায় ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল কুর'আনের বিভিন্ন সূরা- ৩ : ১৯, ৮৫ ; ৫ : ৩ ; ৬ : ১২৫ ; ৯ : ৭৪ ; ৩৯ : ২২ ; ৪৯ : ১৭ ; ৬১ : ৭।

[৪]. আফীফ আবুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, **রূহুদ্দীন আল্-ইসলামী,** (লেবানন, বৈরুতঃ দারুল ই'ল্‌ম লিলমালাইন, ১৯৮৫ খ্রীঃ), পৃঃ ১৩; **ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত,** পৃঃ ২৯৫।

[৫]. আসফাহানী, আর্‌রাগিব, **মুফরাদাত ফী গরীবুল কুর্‌আন,** পৃঃ ২৪০।

[৬]. **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,** সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০০), পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

'ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন' এর প্রণেতা বলেন, 'ইসলাম' শব্দটি (سلم) সালমুন ও সিলমুন শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ নিরাপত্তা, শান্তি, সন্ধি, বিরোধিতা পরিত্যাগ, আনুগত্য ও যুদ্ধ সংঘাত ত্যাগের জন্য প্রস্তাব, ইসলামী বিধান, যুদ্ধ পরিহার করা ও আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব ইত্যাদি।[৭]

আল্-কুর'আনুল কারীমে বিভিন্ন অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে ইসলাম শব্দটি যুদ্ধ পরিহার অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا.

"যদি তারা যুদ্ধ পরিহারে সম্মত হয়, তাহলে আপনিও তাতে সম্মত হোন।"[৮]

আর শরীয়তের বিধানের অর্থেও ইসলাম শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধানের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৯]

শান্তি কামনার অর্থেও পবিত্র কুর'আনে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

"হে ঈমানদারগণ! পরস্পর সম্পর্ক ও পরিবারের লোকজনকে সালাম ব্যতিরেকে তোমাদের অন্যদের ঘরে তোমরা প্রবেশ করোনা।"[১০] তাই বলা যায় যে, আল্লাহর বিধানাবলীর আনুগত্য করে এবং আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব।

ইসলামের পারিভাষিক অর্থ : কুর'আন এর অলোকে - আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেছেন নিম্নোক্তভাবে :

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

[إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ...]

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।"[১১]

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মাবনজীবনের সকল প্রকার বিধিবিধান যে জীবনব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ রয়েছে তা হলো ইসলাম। এটিই হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

[... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...]

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"[১২]

---

[৭]. আল-গাজ্জালী ,হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু হামেদ. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩ আল-আইনী, আল-ইমাম আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বদরুদ্দিন, **উমদাতুল কারী ফি শরহিল বুখারী,** (বৈরুতঃ দারুল ফিকর লাইব্রেরী, তারিখ বিহীন, ১৩৯৯ হিজরী), ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৮।

[৮]. আল-কুর'আন, **সূরা আল-আনফাল,** আয়াত : ৬১।

[৯]. আল-কুর'আন, **সূরা আল-বাকারাহ,** আয়াত : ২০৮।

[১০]. আল-কুর'আন, **সূরা আন-নূর,** আয়াত : ২৭।

[১১]. আল কুর'আন, **সূরা আল-ইমরান,** আয়াত : ১৯।

[১২]. আল-কুর'আন, **সূরা আল-মায়িদাহ,** আয়াত : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের আলোকে: ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন : الإسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلواة وإيتاء الزكواة وصوم رمضان وحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا

"ইসলাম হচ্ছে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে সাওম পালন এবং সঙ্গতি থাকলে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ পালন করবে।"[১৩]

বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে

ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (রহ:) বলেন, "আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের নিমিত্তে ইসলামে প্রবেশ করাই ইসলাম।"[১৪] এ প্রসঙ্গে আফীফ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, "একনিষ্ঠভাবে ও একাগ্রচিত্তে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর তাওহীদের উপর আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের উসূল তথা মৌলিক বিষয় সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ইসলাম।"[১৫]

ড. ইউছুফ হামেদ আল-আলেম বলেন, "ইসলাম হলো এক আল্লাহর জন্য অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী আনুগত্য করা, যে সকল বিধান পালনের দ্বারা ইবাদত করা হয় এবং অনুসরন ও পরিচালনার দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।"[১৬]

ড: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ বলেন, "ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মনে প্রাণে মেনে নেয়া, যা মুখের স্বীকৃতি দ্বারা হোক, কিংবা অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ দ্বারা পালনে হোক। আর এর মূল বস্তু হলো অন্ত:করণ দ্বারা সত্য বলে মেনে নেয়া।"[১৭]

ইমাম আবূ জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্‌ন শরফুদ্দীন আন-নববী রহ. বলেন, "ইসলাম হলো আল্লাহর বিধান ও দ্বীনের সামনে আত্মসমর্পণ। এছাড়াও ইসলাম হলো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা, যদ্দারা আল্লাহ্ সকল বিধানগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। ইসলাম দ্বারা যেমন মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে, সৃষ্টিসমূহ ও জগতসমূহের সাথে, দুনিয়া ও আখিরাতের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। তেমনি সমাজ, স্ত্রী, সন্তান, শাসক ও শাসিতের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, প্রয়োজনীয় সকল সম্পর্ক মানুষের সাথে এভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যদ্দারা এক আল্লাহর আনুগত্য, তার স্বীকৃতি প্রকাশ পাবে, যা দাসত্বের পর্যায়ভূক্ত হয় এবং রাসূল (স.) যা নিয়ে এসেছেন তা পালনের অভিধায় হয়।"[১৮]

আল-মুসলিহাতুল আম্মা লিশ শরইয়াতিল ইসলামিয়্যাহ এর গ্রন্থাকার বলেন, ইসলাম হলো এক আল্লাহর জন্য অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী আনুগত্য করা, যে সকল বিধান পালনের দ্বারা ইবাদত হয় এবং অনুসরণ ও পরিচালনার দ্বারা হিদায়াত করা হয়।[১৯]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.) বলেন, "ইসলাম হলো, আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, তার নিকট আত্মসমর্পণ করা; বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধানানুসারে জীবন

---

১৩. আল-হাদীস, ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, **কিতাবুল ঈমান**, হাদীস নং : ৯।
১৪. আল-রাযী, ফখরুদ্দীন, **তাফসীর-ই- কাবীর**, ২য় খন্ড, পৃ: ২৬৮।
১৫. আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, **রূহুদ্দীন আল্-ইসলামী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।
১৬. ড. ইউছুফ হামেদ আল-আলেম, **আল-মুসলিহাতুল' আম্মা লিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া**, প্রাগুক্ত পৃ: ২০৮।
১৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ, **আদদ্বীন**, (মিশরঃ আসসায়াদা, ১৩৮৯ হিজরী) পৃ: ৪৪; **আশ-শাইখ মুস্তফা আব্দুর রাজ্জাক এর গবেষণা প্রবন্ধ**, ১ম খন্ড, (রিয়াদঃ দায়িরাতুল মায়ারিফ আল-ইসলামিয়াহ, তারীখ বিহীন) পৃ: ৭৯।
১৮. ইমাম আবূ জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্‌ন শরফুদ্দীন আন-নববী, **শরহে নববী ফী মুসলিম**, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০১ হিজরী), ১ম খন্ড, পৃ: ১৪৭; 'আব্দুর রহমান আন-নাহলভী, **'উলূমুত তারবীয়াহ আল-ইসলামিয়া ওয়া আছালিবুহা**, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৮ হি.), পৃ: ১১-১৭।
১৯. ড. ইউসুফ হামিদ আল-আলিম, **আল-মাকাছিদুল 'আম্মা লিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ**, (রিয়াদঃ আল-মাহাদুল আলমী আল-ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হি.), পৃ: ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধানানুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।"[২০]

সারকথা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধানসমূহকে পালন করার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করতঃ নবী করীম (স.)-এর জীবনাদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গড়ে তোলার নামই ইসলাম।

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহ: ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন বিধান বলা হয়। আর এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের মূল বিধান বা প্রধান স্তম্ভ বা উপাদান ৫টি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلواة وإيتاء الزكواة والحج وصوم رمضان.

"পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। তা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল - এ কথার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা বা ঈমান[২১] আনয়ন করা, সালাত[২২] কায়েম করা, যাকাত[২৩] প্রদান করা, হজ্জ[২৪] পালন করা, রমযান মাসে রোযা[২৫] পালন করা।[২৬] এ গুলোকে একত্রে "আরকানুল ইসলাম" বা ইসলামের ভিত্তি বা মূল স্তম্ভ বলা হয়।

---

[২০]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

[২১]. ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান (الإيمان) শব্দটি আরবী। এটি (أ-م-ن) মূলধাতু হতে গঠিত। যা বাবে إفعال এর মাস্‌দার বা ক্রিয়ামূল। ঈমান অর্থ- বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাসী, আস্তিক ও ধার্মিক ইত্যাদি। এছাড়াও ঈমান (ايمان) অর্থ- আল্লাহর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী-রসূলগণ, শেষ বিচারের দিন ভাগ্যের ভাল-মন্দ ও মৃত্যুর পুনরুত্থান-এসবের উপর বিশ্বাস। (ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, **প্রাগুক্ত,** পৃ. ১৪১; এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া ও অন্যান্য, **ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ইং), পৃঃ ৪।)

[২২]. 'সালাত' আরবী শব্দ। ইহা (ص-ل-و) সল্উন শব্দমূল হইতে গঠিত। কারো কারো মতে, এর শব্দমূল ص-ل-ي সল্ইউন, একবচন বহুবচনে صلوات। (**ইসলামী বিশ্বকোষ,** প্রাগুক্ত, ২৪শ খন্ড (২য় ভাগ), পৃঃ ১১১)। এর অর্থ- ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইবাদত বা উপসনা, দুরূদ, দু'আ, রহমত, ইসতিগফার ইত্যাদি। (ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, **প্রাগুক্ত,** পৃঃ ৬৭৬, ১১৪৯; **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।) আর 'নামায' একটি অতি সুপরিচিত ফার্সী শব্দ। 'নামায' শব্দের অর্থ ইসলাম ধর্ম মতে, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা দৈনিক পাঁচবার অবশ্য করণীয় (ফরজ) ইবাদত। নিম্নে 'সালাত' এর আভিধানিক অর্থ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ "সালাত" এর আভিধানিক অর্থ– কারো দিকে মুখ করা, নিকটবর্তী হওয়া, অগ্রসর হওয়া এবং দোয়া করা। (মাওলানা আব্দুল খালেক, **নামায,** ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭ পৃঃ ১।) লিসানুল 'আরব এর প্রণেতা বলেন : الصلاة : الركوع والسجود " রুকু" এবং সিজ্‌দাহ্ করা।" (ইবন মানযুর, **লিসানুল আরাব,** পৃঃ ৩৯৮।) আল্-আয্হারী বলেন : الصلاة عندي الرحمة "আমার নিকট সালাত অর্থ রহমত বা দয়া।"(**প্রাগুক্ত,** পৃঃ ৩৯৮)। سلك البيان في مناقب القرآن এর প্রণেতা বলেন : صلاة এর অর্থ প্রার্থণা করা। "সালাত" এর আভিধানিক অর্থ–দু'আ, তাস্‌বীহ, ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), রহমত, ছানা (প্রশংসা), দয়া ও করুণা কামনা। (**ইসলামী বিশ্বকোষ,** প্রাগুক্ত, ২৪শ খন্ড (২য় ভাগ), পৃঃ ১১১)।

[২৩]. যাকাত শব্দটি আরবী (ز-ك-و) শব্দমূল হতে গঠিত। যা বাবে ضرب এর মাস্‌দার। নিম্নে এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করা হলোঃ যাকাত অর্থ -বৃদ্ধি পাওয়া, পরিশুদ্ধি, কোন জিনিসের উত্তম অংশ। (**ইসলামী বিশ্বকোষ,** ২১শ খন্ড, পৃঃ ৪৭৫।) লিসানুল আরব প্রণেতা বলেনঃ زكاة المال معروفة وهو تطهير অর্থাৎঃ মাল বা সম্পদকে পবিত্র করা। (**লিসানুল আরব,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬)। আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ বলেন : الزكاة: صدقة والصدقة زكاة অর্থাৎ যাকাত হচ্ছে সাদ্‌কাহ আর সাদ্‌কাহ হচ্ছে যাকাত। (**রূহুদ্দীন আল-ইসলামী,** পৃঃ ৩৪৩)। যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পরিবৃদ্ধি, কোন জিনিসের উত্তম অংশ। ইসলামের বিভিন্ন গ্রন্থে 'যাকাত' শব্দটি উল্লেখিত তিন অর্থেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যাকাত দাতাকে পাপ ও কৃপণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে এবং সম্পদের কিয়দংশ ব্যয় দ্বারা অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয় বিধায় এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক বলেনঃ

[خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها]

"ওদের সম্পদ থেকে 'সাদকা' (যাকাত) গ্রহণ করবেন। এর দ্বারা আপনি ওদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।"(আল কুর'আন, **সূরা আত-তাওবা,** আয়াত : ১০৩)।

যাকাত প্রদানের ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা এজন্যও এর এরূপ নামকরণ করে থাকবেন। আল্ কুর'আনের ভাষায় :

[وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون]

"আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়; ওরাই সমৃদ্ধিশালী।"(আল-কুর'আন, **সূরা আর-রুম,** আয়াত : ৩৯)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম এমন এক জীবনাদর্শ যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং মানুষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এবং যা অনুসরণের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। একারণেই মানুষকে পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[২৭] ইসলাম শুধুমাত্র আত্মত্যাগের ধর্ম নয় বরং আল্লাহর নির্দেশিত সীমা অনুযায়ী আত্মরক্ষার ধর্ম। মানবজাতির মধ্যে সুখ-শান্তি ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি সৃষ্টির করাই ইসলামের মুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নারী পরিচিতি

মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে, পিতা ও মাতার শুক্রানু ও ডিম্বানুর মিলনের ফলে সন্তান উৎপাদিত হয়। এতে পুত্র বা কন্যা জন্মদানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কোন কর্তৃত্ব নেই। সকল কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'য়ালার। আল্লাহ তা'য়ালা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেন।[২৮] মেডিকেল সাইন্স প্রমাণ করেছে যে, মানবদেহে ২৩ জোড়া ক্রোমেজোম আছে। তন্মধ্যে ১ জোড়া ক্রোমোজোমকে লিংগ ক্রোমোজোম বলা হয়। অবশিষ্ট ২২ জোড়া ক্রেমোজোমকে বলে অটোমাস। ২টি লিংগ ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি X এবং অন্যটি Y। পুরুষের শুক্রানুতে X এবং Y থাকে। আর স্ত্রীলোকের কেবল X ক্রোমোজোম বিশিষ্ট ডিম্বানু গঠিত হয়। নিষেকের সময় যদি পুরুষের X ক্রোমোজোমযুক্ত শুক্রানু স্ত্রীর X ক্রোমোজোমযুক্ত ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় তবে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। আর যদি পুরুষের Y ক্রোমোজোমযুক্ত শুক্রানু স্ত্রীর X ক্রোমোজোমযুক্ত ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় তাহলে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। সুতরাং ছেলে বা মেয়ে হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারীর কোন ভুমিকা নেই। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে নিষেকে X বহনকারী শুক্রানু না Y বহনকারী শুক্রানু অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করছে তার উপর। আর পুরুষের X বা Y শুক্রানুর কোনটি স্ত্রীর X ডিম্বানুর সাথে নিষিক্ত হবে তা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশের উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "অত:পর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর-নারী।"[২৯] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়।"[৩০]

সম্পদের-ই বৃদ্ধি পারলৌকিক জগতে তো বটেই এমনকি পার্থিব জগতেও যাকাত প্রদানের ফলে বৃদ্ধি ঘটে। আল্লামা শামী তদীয় 'রদ্দুলমুহ্তার' গ্রন্থে বলেন, যাকাত প্রদানের দ্বারা সম্পদে বরকত হয়ে থাকে। (**রদ্দুল মুহতার**, ২য় খন্ড, পৃ: ১)।

[২৪]. সাওম (صوم) আরবী শব্দ। আরবী সওমের বহুবচনে صيام , যেমন আল-কুর'আনে বলা হয়েছে :

[كتب عليكم الصيام]

সাওম এর আভিধানিক অর্থ হল: বিরত থাকা, সংযম, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি।

লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন :

الصوم : ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام

সওম হচ্ছে, খানা পিনা, অনর্থক কথা ও স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করা। (ইব্‌ন মানজুর, **লিসানুল আরব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৩।)

আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ আত তাব্বারাহ বলেন :

الصوم الإمساك والكف عن الشيئ

অর্থাৎ সওম অর্থ হচ্ছে, কোন কিছু থেকে বিরত থাকা। (**রূহুদ্দীন আল ইসলামী**, পৃ: ২৫৩।) ফারসী ভাষায় একে রোযা বলা হয় এবং বাংলা ও উর্দূ ভাষায় তা বহুল প্রচলিত।

[২৫]. হজ্জ (حج) আরবী শব্দ। (ح-ج-ج) শব্দমূল থেকে বাবে نصر এর মাস্‌দার। এর আভিধানিক অর্থ - ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন : الحج: القصد বা ইচ্ছা করা, حج إلينا فلان أى قدم বা আগমণ করা। (**লিসানুল আরব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬)। আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ আত তাব্বারাহ বলেন : الحج لغة: القصد إلى معظم অর্থাৎ: হজ্জ অর্থ হচ্ছে, মহান কাজের নিয়ত বা ইচ্ছা করা। (**রূহুদ্দীন আল-ইসলামী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৩)।

[২৬]. বুখারী, সহীহ, **কিতাবুল ঈমান**, প্রাগুক্ত, হাদীস নং: ৭; মুসলিম, সহীহ, **কিতাবুল ঈমান**, প্রাগুক্ত, হাদীস নং: ১৯।

[২৭]. আল কুর'আন, **সূরা আল-বাক্বারা**, আয়াত : ২০৮।

[২৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল-বাক্বারা**, আয়াত : ২০৮।

[২৯]. আল কুর'আন, **সূরা আল কিয়ামাহ**, আয়াত: ৩৯।

[৩০]. আল কুর'আন, **সূরা আন্ নাজম**, আয়াত: ৪৫-৪৬।

পবিত্র কুর'আনের অনেক স্থানে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। অথচ বিজ্ঞানীরা মাত্র ২ অথবা ৩ শত বৎসর পূর্বে ভ্রুণতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ১৪৭০ বৎসর পূর্বে আল কুরআনের মাধ্যমে ভ্রুণতত্ত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেছেন। মানব সৃষ্টির প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় আল কুর'আনের আরও কতিপয় আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

- তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। সেই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই।[৩১]
- তিনি মানুষকে ঘনীভুত রক্তযোগে সৃষ্টি করেছেন।[৩২]
- অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কিসের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। সে সবেগে নির্গত সলিল দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। যা পৃষ্ঠ ও পৃষ্ঠরাজি থেকে নির্গত হয়।[৩৩]
- আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর আলাক হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিন্ড হতে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছে করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাকে কাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে, তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা।[৩৪]
- অত:পর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি আলাকে অত:পর আলাককে পরিণত করি পিন্ডে এবং পিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে, অত:পর অস্থিপিঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে, অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।[৩৫]
- পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্ত:করণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৩৬]
- অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।[৩৭]
- সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অত:পর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অত:পর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবু কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুঞ্জীবিত করতে সক্ষম নয়?[৩৮]
- তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জননীগণের গর্ভে পর্যায়ক্রমে তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যেও একের পর এক রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[৩৯]
- তিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি তার জন্য বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।[৪০]
- প্রত্যেক বস্তুকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।[৪১]

---

[৩১]. আল কুর'আন, **সূরা আল ইমরান,** আয়াত: ৬।
[৩২]. আল কুর'আন, **সূরা আল 'আলাক,** আয়াত: ২।
[৩৩]. আল কুর'আন, **সূরা আত তারিক,** আয়াত: ৫-৭।
[৩৪]. আল কুর'আন, **সূরা আল হাজ্জ,** আয়াত: ৫।
[৩৫]. আল কুর'আন, **সূরা আল মু'মিনুন,** আয়াত: ১২৩-১২৪; **সূরা আল হাজ্জ,** আয়াত: ৫; **সূরা আল কিয়ামাহ,** আয়াত : ৩৭; ৩৯; **সূরা আয যারিয়াত,** আয়াত: ২০-২১।
[৩৬]. আল কুর'আন, **সূরা আস্ সাজদাহ,** আয়াত: ৯।
[৩৭]. আল কুর'আন, **সূরা নুহ,** আয়াত: ১৪।
[৩৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল কিয়ামাহ,** আয়াত: ৩৭ - ৪০।
[৩৯]. আল কুর'আন, **সূরা আয যুমার,** আয়াত: ৬।
[৪০]. আল কুরআন, **সূরা আল ফুরকান,** আয়াত: ৫৪।
[৪১]. আল কুর'আন, **সূরা আয যারিয়াত,** আয়াত: ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

- পবিত্র সেই সত্তা যিনি সৃষ্টিলোকের সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন-মাটি হতে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি, মানবজাতি এবং সেই সব জিনিস যেগুলো সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।[৪২]
- তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর চতুষ্পদ জন্তুও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই তিনি তোমাদের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছেন (বংশ বিস্তার করেন)।[৪৩]
- আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।[৪৪]
- আমি বনী আদমকে মহাসম্মান দান করেছি। জলে ও স্থলে চলার জন্য তাদেরকে যানবাহন দিয়েছি, পবিত্র রিযিক দিয়েছি এবং বহুসংখ্যক সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[৪৫]
- হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি।[৪৬]
- হে মানবমন্ডলী! তোমাদের প্রতিপালক প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর এই দু'জন ব্যক্তি হতেই অসংখ্য নর ও নারী সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৪৭]
- আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ:) এর পাজরের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ:) কে সৃষ্টি করেছেন। নবী (স.) বলেন, "নারীকে পাজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৪৮]

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জেনেছে যে, বংশগতির জৈব একক জীন যা বংশ হতে বংশান্তরে বংশগত লক্ষণ ধারণ ও পরিবহন করে। ক্রোমোজোমের যে সকল ক্ষুদ্রতর অংশে সারিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে জীন বলে। লম্বা, খাটো, বোকা, বুদ্ধিমান চেহারা ও অন্যান্য আচরণও শিশুরা পেয়ে থাকে। এই জীনকেও মহান আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন। জীন ক্রোমোসোমের অভ্যন্তরে অবস্থিত ডিএনএ-এর নিউক্লিওটাড গুচ্ছ।

নারীর স্বভাবজাত গুণাবলী

মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানুষেরই একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে। সে নারী হোক আর পুরুষ হোক। এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যেও কতিপয় একান্ত ব্যক্তিগত গুণাবলী রয়েছে। এই ব্যক্তিগত গুণাবলীর মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে ভাল বা মন্দ হিসেবে প্রস্ফুটিত করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন "শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি ইহাকে সুঠাম করেছেন, অত:পর এর অসৎকর্ম ও এর সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।"[৪৯] এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই স্বাধীনতা দান করেছেন। এবং এই স্বাধীনতার দ্বারা সে সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ই করতে পারে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা প্রগতিকে যে সৎপথে পরিচালিত করবে সে ব্যক্তিই সমাজে মাথা উচু করে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবে আর যে অসৎ পথে পরিচালিত করবে সে নিজেকে নিক্ষেপ করবে অসম্মানের আস্তাকুড়ে।

নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে গড়ে তোলার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার মধ্যে কতকগুলো মানবিক গুণাবলী দান করেছেন। যেমন: অহংকারমুক্ত হৃদয়, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, কর্তব্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, ক্ষমা, দয়া ও করুণা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা, শালীনতা ও উত্তম আচরণ ইত্যাদি। এই গুণাবলী সঠিক প্রয়োগের অধিকারও ইসলাম নারীকে দিয়েছে। এবং এর মাধ্যমেই নারী তার জন্য নিশ্চিত করতে পারবে সুন্দর ও অনাবিল আখিরাত জীবন। এবং কুরআন ও হাদীসে

---

[৪২]. আল কুর'আন, **সুরা ইয়াসীন**, আয়াত: ৩৬।
[৪৩]. আল কুর'আন, **সুরা শুরা**, আয়াত: ১১।
[৪৪]. আল কুর'আন, **সুরা আত ত্বীন**, আয়াত: ৪।
[৪৫]. আল কুর'আন, **সুরা বনী ইসরাঈল**, আয়াত: ১৩।
[৪৬]. আল কুর'আন, **সুরা আল হুজরাত**, আয়াত: ১৩।
[৪৭]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ১।
[৪৮]. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, **মিশকাতুল মাসাবিহ**, কিতাবুল নিকাহ, (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ: ২৮০; মুসলিম, **সহীহ মুসলিম**, ২য় খন্ড, (বৈরুত: দারু ইয়াহয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.) পৃ: ১০৯১।
[৪৯]. আল কুর'আন, **সুরা আশ শামস**, আয়াত: ৭-১০।

নারীকে ব্যক্তিগত গুণাবলী সংরক্ষণের তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। অহংকার মানব চরিত্রের একটি নেতিবাচক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অহংকার প্রদর্শনের কারণে পৃথিবীর অনেক জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মূলতঃ মানুষের পতনের মূল কারণ হলো অহংকার। অহংকারের কারণে ইবলিশ তার সম্মান ও মর্যাদা হারিয়েছে।[৫০] তাই ইসলাম নারীদের অহংকার মুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন, "অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[৫১]

ইসলাম প্রতিটি নারী ও পুরুষকে সত্যবাদি গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী প্রতিটি নারী সত্যের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস দূরীভূত করবে। সততা নারীর জন্য অপরিহার্য পালনীয় একটি উপাদান। আর কর্তব্যবোধ নারীর জন্য পালনীয় একটি উত্তম গুণাবলী। আচার-আচরণে সবসময় সততা ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেয়া নারীরও কর্তব্য। তাই যে নারীর কর্তব্যবোধ যত বেশি হবে তিনি তত কর্তব্যনিষ্ঠা হবেন।[৫২]

বিশ্বস্ততা ও সততার পাশাপাশি ইসলাম নারী-পুরুষকে ন্যায়পরায়ণ হতেও নির্দেশ দিয়েছে। কারণ সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি সর্বকালে সকলের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর।"[৫৩] আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে ন্যায় বিচার করো, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।[৫৪] কোন নারী যদি কখনও অন্য কারো দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম তাকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ প্রদান করে ক্ষমা ও সবরের তাগিদ দিয়েছেন। কেননা ক্ষমা মহত্বের গুণ। তবে কেউ যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্য্যশীলদের জন্য এটাই উত্তম।"[৫৫] রাসূলে করীম (স.) কে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করা হলে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতেন। তাই নর-নারীও যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিশোধের পরিবর্তে ধৈর্য্য ধারণ করে তাহলে তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে। শুধু প্রতিশোধের ক্ষেত্রেই নয় সকল ক্ষেত্রে একজন মুমিন নর-নারীর নিরপেক্ষতা সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজন। ক্ষমা মানব চরিত্রের একটি অন্যতম মহৎ গুণ। এটা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। নবী করীম (স.) কে বিধর্মীরা অনেক নির্যাতন করার পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। শুধুই ক্ষমাই করেননি, তাদের হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর।"[৫৬] ক্ষমা দ্বারা নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নির্যাতন মোকাবেলা করা সহজতর। এটি মানুষকে অনেক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। নারীরাও এভাবে নিজেদের মর্যাদাকে আরো উন্নত করতে পারে।

---

৫০. আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "যখন আমি (আল্লাহ) ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হলো। (আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ৩৪।) আরও এরশাদ হয়েছে, "তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন এই স্থান হতে নেমে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভূক্ত।" (আল কুর'আন, **সুরা আল আ'রাফ**, আয়াতঃ ১২-১৩)।

৫১. আল কুর'আন, **সুরা লোকমান**, আয়াতঃ ১৮।

৫২. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, (ঢাকাঃ হৃদ প্রকাশনী, ২০০০ খ্রীঃ), পৃষ্ঠাঃ ৭৯।

৫৩. আল কুর'আন, **সুরা আল মায়েদাহ**, আয়াতঃ ৮।

৫৪. আল কুর'আন, **সুরা আল মায়েদাহ**, আয়াতঃ ৪২।

৫৫. আল কুর'আন, **সুরা আন নাহল**, আয়াতঃ ১২৬।

৫৬. আল কুর'আন, **সুরা আল আ'রাফ**, আয়াতঃ ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই উত্তম আচরণের তাগিদ প্রদান করেছে। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "হে মানবজাতি! মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।"[৫৭] নারীকে দানশীল হওয়ার তাগিদ আল কুর'আনে প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভাল। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল। আর তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবহিত।"[৫৮] ইসলামে নারীদেরকেও তাদের অশ্লীল জীবনকে পরিহার করে শালীনভাবে পৃথিবীতে অবাধে বিচরণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৫৯] আল্লাহ তা'য়ালা নর ও নারীকে আচার-আচরণে সুন্দর শালীন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কোন অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত না হতে পারে, মন যাতে অপবিত্র না হতে পারে। অশ্লীলতা থেকে কুকর্মের উৎপত্তি হয়। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে অশ্লীল আচরণের নিকটে যেও না।"[৬০] নারীদেরকে পর্দার মাধ্যমে শালীনতা বজায় রাখারও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, ভাল গুণাবলী অর্জনে ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই অধিকার প্রদান করেছেন। নারীকে ইসলাম তার ব্যক্তিগত গুণাবলী গঠন ও অর্জনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। এই স্বাধীনতা ও প্রগতিকে কাজে লাগিয়ে একজন নারী নিজেকে উন্নত চরিত্রের ও গুণাবলীর মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

---

[৫৭]. আল কুর'আন, **সুরা আল-ইমরান**, আয়াতঃ ১১০।
[৫৮]. আল কুর'আন, **সুরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ৯২।
[৫৯]. আল কুর'আন, **সুরা আন নাহল**, আয়াতঃ ৯০।
[৬০]. আল কুর'আন, **সুরা আল আন'আম**, আয়াতঃ ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের ব্যবধান

সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নারী-পুরুষের ব্যবধান

আকৃতিগত ব্যবধানঃ সৃষ্টিগতভাবে নারী পুরুষের দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়েছে। শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথে এই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারীর আকৃতি, অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে শুরু করে শারীরিক অনু পরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ হতে নারী সম্পূর্ণ আলাদা। শরীরতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীর তুলনায় পুরুষ শারীরিকভাবে অনেকগুণ বেশী শক্তিশালী।[৬১] মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় নারী বা পুরুষ ভিন্ন আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে শারীরিক গঠন লাভ করে। নারীর শারীরিক গঠন এমনভাবে গঠিত হয় যাতে সে সন্তান উৎপাদন ও লালন পালন করতে পারে। এজন্য নারীর জরায়ু গঠন হতে আরম্ভ করে প্রাপ্ত বয়স্কা পর্যন্ত তার দেহের পূর্ণ বিকাশ জেনেটিক প্রভাবে হয়ে থাকে। সন্তান লালন পালনের জন্য নারীকে যুগল স্তন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পুরুষের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।[৬২]

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবধানঃ Encyclopeadia সংকলয়িতা ‘নারী’ (Woman) শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “যদিও নর ও নারীর ভিতরে লিঙ্গগত পার্থক্যটাই বড় হয়ে দেখা দেয়; তবুও সেটাই তাদের মধ্যকার পার্থক্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়। তারপরও নারীর আপাদমস্তক প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র। এমনকি বাইরে থেকেও তাদের যা কিছু পুরুষের অনুরূপ বলে মনে হয় মূলতঃ তাও সম্পূর্ণ পৃথকভাবে গঠিত।[৬৩] এই মন্তব্য করেই তিনি দেহ বিজ্ঞানের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে নারী দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। নারীর শারীরিক গঠন প্রায় শিশুদের মত, তাদের অনুভূতিও শিশুদের মত উচ্ছাসপ্রবণ। যার ফলে যে কোন বিষয় অতি সহজেই নারীদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুরা যেমন কোন দুঃখের ব্যাপার ঘটলে সাথে সাথে কান্না শুরু করে তেমনি আবার খুশীর খবরে উচ্ছাস প্রকাশ করে, নারীদের অবস্থাও তদ্রুপ। তারা পুরুষের তুলনায় বেশী আবেগপ্রবণ ও দুর্বলমনা। বাইরের যে কোন ঘটনা তাদের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করে যে, তাদের জ্ঞানও সেক্ষেত্রে হার মেনে যায়। এ কারণেই নারীদের ভিতরে স্থিরতার অভাব। যার ফলে যে কোন কঠিন ও ভয়াবহ ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না।[৬৪]

দৈহিক পরিমাপ এর ক্ষেত্রে ব্যবধান

গবেষণা ও জ্ঞানগর্ভ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বাভাবিক পুরুষের দৈর্ঘ্য যে কোন স্বাভাবিক নারীর দৈর্ঘ্য থেকে কয়েক সেন্টিমিটার (গড় বারো সেন্টিমিটার) অধিক। এই পার্থক্য কোন বিশেষ এলাকা বা জাতির ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল এলাকা ও জাতির মধ্যেই এই ধরণের পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যেমন দেখা যায় তেমনি শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়।[৬৫]

---

৬১. সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ জামালউদ্দীন হেজাবুল মারআ, **মকতবাতু আততুরাশ আল ইসলামী**, কায়রো, তা. বি. পৃঃ ৯।

৬২. Wau-Block, **The Sexual Life of our time**, p: 49; August Forel, **The Sexual Question**, p: 505.

৬৩. **Encyclopeadia of Britanica**, 15^{th} ed. 1995, U.S.A, Vol-10, p: 537.

৬৪. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

৬৫. ফরিদ বেজদী আল আফেন্দী, **সমাজ ও সভ্যতায় নারীর ভূমিকা**, অনুবাদঃ আকতার ফারুক, (ঢাকাঃ ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬১), পৃঃ ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

দৈহিক শক্তি ও ওজনের ব্যবধান: দেহ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষের দৈহিক শক্তি নারীর চেয়ে অনেক বেশী। নর-নারীর দৈহিক শক্তির এই তারতম্য শুধু অনুমান ও কল্পনাপ্রসূত নয় বরং বাস্তবভিত্তিক। এর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। দৈহিক পরিমাপ ও দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে ওজনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দৈহিক ওজনের ক্ষেত্রেও একজন স্বাভাবিক নারীর শরীরের ওজন একজন স্বাভাবিক পুরুষের ওজনের চেয়ে ৫ কিলোগ্রাম কম। নারীর সম্পূর্ণ শারীরিক গঠনই ভিন্ন ধরণের। নারী দেহের প্রতিটি কোষ নারীত্বের নিদর্শন বহন করে। নারী পুরুষের এই পার্থক্যের কারণেই উভয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা আদান প্রদান করতে পারে এবং শান্তি লাভ করে। সৃষ্টিগতভাবে নারীর শরীর নরম এবং পুরুষের শরীর শক্ত। নারীকে সন্তান উৎপাদনের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর পুরুষের দৈহিক গঠন ব্যাপক পরিধিতে কাজকর্ম করার উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী পুরুষের মধ্যকার এই পার্থক্য সৃষ্টিগত এবং এটা পরিবর্তন করা অসম্ভব।

শিরা - উপশিরার ব্যবধান: শিরা উপশিরার গতি ও শক্তির দিক থেকে নারী জাতি পুরুষের চেয়ে অনেক দুর্বল। Encyclopeadia তে উল্লেখ রয়েছে, "নারীদের শিরা-উপশিরা পুরুষের শিরা-উপশিরা থেকে একেবারেই আলাদা। আর প্রক্রিয়া ও শক্তির দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, নারীদেহের শিরাগুলো এতই দুর্বল যে, স্বাভাবিক শক্তি ও গতির গড় হিসাব পুরুষের অর্ধেকের সমান। শিরা উপশিরার স্পন্দনের দ্রুততা ও ধীরতার বেলায়ও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। পুরুষদেহের শিরাগুলো নারীদেহের শিরা থেকে যেরূপ দৃঢ়তর তেমনি তার স্পন্দনের গতিও দ্রুততর।"[৬৬]

অন্তকরণ: মানবদেহের কেন্দ্রস্থলই হচ্ছে অন্ত:করণ। তাতেও নারী-পুরুষের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, নারীর অন্ত:করণ পুরুষের অন্ত:করণের চেয়ে ষাট ড্রাম ছোট ও হাল্কা।

শ্বাস-প্রশ্বাস: শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা ও শক্তির দিক থেকেও নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান ও গবেষণাগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিশ্বাসের ভিতর দিয়ে যে কার্বলিক এসিডের রেণুগুলো বেরিয়ে আসে তা দেহের ভিতরকার তাপের প্রভাবে গরম হয়ে নি:শ্বাসের সাথে মিশে বের হয়। পুরুষ প্রতি ঘন্টায় প্রায় ১১ ড্রাম কার্বন জ্বালিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে নারী ঘন্টায় ৬ ড্রাম কার্বন জালাতে সক্ষম হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীদেহের শক্তিজাত তাপ পুরুষের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশী।[৬৭]

মেধাগত ব্যবধান: আকৃতিগত পার্থক্যের মত নারী ও পুরুষের মধ্যে মেধাগত দিকেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মেধা শক্তিতে নারী পুরুষের চেয়ে যথেষ্ট দুর্বল।

রুচিভেদ ও স্বভাব: বিখ্যাত নিহিলিষ্ট দার্শনিক প্রুডেনের[৬৮] মতে, "মেয়েদের জ্ঞানশক্তি পুরুষের জ্ঞানশক্তি থেকে যতখানি দুর্বল ঠিক ততখানি পার্থক্য দেখা যায় তাদের রুচিবোধের ভিতরে। তাদের চারিত্রিক শক্তি পুরুষের সমান নয়। তাদের স্বভাবও পুরুষের চেয়ে আলাদা।" তাই দেখা যায়, নারীর ভাল মন্দের বিচারের সাথে পুরুষের ভাল মন্দের বিচার সাধারণত এক হয় না। সুতরাং নারী-পুরুষের পার্থক্য শুধু বাইরেই নয় বরং সে সব প্রকৃতিগত পার্থক্যেরই বহি:প্রকাশ মাত্র।

ইন্দ্রিয় শক্তি: মানুষের জ্ঞান ও মেধাশক্তি যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে প্রতিপালিত হয়, তাতেও নর-নারীর ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মনীষী নিকোলাস ও মনীষী বেইলী প্রমাণ করেছেন যে, নারীদের ইন্দ্রিয়শক্তি পুরুষের ইন্দ্রিয়শক্তি থেকে অনেক দুর্বল।[৬৯]

---

[৬৬]. **Encyclopeadia of Britanica**, 15th ed. 1995, U.S.A, Vol-10, p: 538.
[৬৭]. ফরিদ বেজদী আল আফেন্দী, **নারীর মর্যাদা**, অনু: আকতার ফারুক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ: ১৯।
[৬৮]. প্রুডেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক।
[৬৯]. V.M Rege, **Wither Woman**? p: 225.

Dhaka University Institutional Repository

ঘ্রাণশক্তি: নারীদের ঘ্রাণশক্তির বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বিশেষ দুরত্বে নারী যে ঘ্রাণ লাভ করতে পারে না, পুরুষ তা সহজেই লাভ করে। অর্থাৎ ঘ্রাণের মাত্রা যতটুকু হলে পুরুষ অনুভব করতে পারে, নারীর প্রয়োজন তার দ্বিগুণ।[৭০] অভিজ্ঞতা থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নারীরা হালকা ব্রাসিক এসিডের ঘ্রাণ বিশ হাজারের একভাগ হলে অনুভব করে আর পুরুষ একলক্ষ ভাগের একভাগ হলেই অনুভব করতে পারে। Encyclopeadia- তে উল্লেখ আছে, "নর ও নারীর দৈহিক ও মানসিক ব্যবধান যেভাবে সভ্যতার কেন্দ্র ভুমি পারস্যের বাসিন্দাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই দেখতে পাওয়া যায় আমেরিকার জাতিগুলির মধ্যে।" আরও উল্লেখ আছে, "সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন: শ্বেতকায় সভ্য নর-নারীর ভিতরের বৈষম্যের চেয়ে অসভ্য কালো নর-নারীর ভিতরের পার্থক্য অনেক কম দেখা যায়।" মূলকথা হল, নারী ও পুরুষ জাতির মধ্যকার পার্থক্য যে সর্বতোভাবেই প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৭১]

স্বাদ ও শ্রবণশক্তি: স্বাদ ও শ্রবণশক্তির ক্ষেত্রেও নর-নারীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। Encyclopeadia- তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "এর ফলেই খাদ্যের গুণাগুণ বিচার, সুরের ভাল-মন্দ পরীক্ষা, পিয়ানোর রাগ-রাগিনী পরীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বদা পুরুষই অগ্রাধিকার পায়। নারীরা এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম সক্ষমতা দেখাতে পারে।

অনুভূতিশক্তি: এ সম্পর্কে মনীষী লোমব্রুয়ার ও সিয়ারজী প্রমূখ পন্ডিতদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, অনুভূতিশক্তির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। তাদের গবেষণা প্রসূত যুক্তি হল: দু:খ-কষ্টের অনুভূতি নরের চেয়ে নারীর অনেক কম বলেই তাদের ধৈর্য্য পুরুষের চেয়ে বেশী বলে মনে হয়। লোমব্রুয়ারের মূল বক্তব্য হলো, "গর্ভ ও প্রসবের কঠিন কষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং ভেবে দেখুন যে, নারীরা পৃথিবীর বুকে কত কঠিন দু:খ কষ্ট সহ্য করেছে। যদি নারীদের অনুভূতিশক্তি পুরুষের মতই তীক্ষ্ণ হত, তাহলে কিছুতেই তারা এতবড় দু:খ নীরবে সহ্য করতে পারত না। মানব জাতির সৌভাগ্য যে, খোদা নারীদের প্রখর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তা না হলে বনী আদমের উৎপত্তির গুরুভার বয়ে চলা কারোর পক্ষেই সম্ভব হত না।"[৭২]

মস্তিস্কের আকৃতি গঠন ও ওজনের উপাদানগত ব্যবধান

মানুষের বোধশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিস্ক এবং এই মস্তিস্কের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মগজ। এর কম-বেশী এবং সবলতা-দুর্বলতার ওপরেই বোধশক্তির প্রখরতা ও নিস্প্রভতা নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে যখন বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করা হয়, তখনই সেখানে সুস্পষ্টভাবে নারীদের দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। অধুনা মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, পুরুষের মগজের ওজন সাধারণত ৪৯.১০ আউন্স এবং নারীর মগজের ওজন মাত্র ৪৪ আউন্স। পুরুষের মগজের ওজন নারীর মগজের ওজনের চেয়ে এক ড্রাম বেশী। যদি কেউ বলে যে, এই পার্থক্য নর-নারীর দৈহিক শক্তির পার্থক্য থেকে উদ্ভূত। তাহলে সেটা সঠিক নয়। কারণ এটা স্থিরীকৃত সত্য যে, পুরুষের মগজ তার দৈহিক অবস্থার সাথে ৪০ ভাগের এক ভাগ সম্পর্ক রাখে। অথচ নারীর মগজ তার দৈহিক শক্তির সাথে ৪৪ ভাগের ১ ভাগ সম্পর্ক রাখে। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, দৈহিক সবলতা বা দুর্বলতা মগজের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি নয়। তাই যদি হত তাহলে নারী ও পুরুষের ভেতরকার মগজ ও দেহের অবস্থার যোগাযোগের ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য দেখা দিত না।[৭৩]

---

[৭০]. ফরিদ বেজদী আল আফেন্দী, **নারীর মর্যাদা**, অনু: আকতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ : ২০।
[৭১]. Weith-Kundsen, Feminism, p: 80.
[৭২]. ফরিদ বেজদী আল আফেন্দী, **নারীর মর্যাদা**, অনু: আকতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ : ২১।
[৭৩]. Wahiduddin Khan, **Woman Between Islam and Western Society**, (New Delhi: Islamic center, 1997), p: 33-36.

মগজের ওজনের মত নারীর মস্তিস্কের আকৃতি ও গঠনের পার্থক্য রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, "মেয়েদের মগজে গিরা ও প্যাচ খুবই কম। তার আবরন ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ।" তাই তারা এই পার্থক্যটাকেই উভয় শ্রেণীর ভিতরকার বৈষম্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে নির্ণয় করেছেন।

মনোবিজ্ঞানের স্বত:সিদ্ধ অভিমত এই যে, "মানুষের জ্ঞানের তারতম্যের মূল হচ্ছে মগজের পার্থক্য। নির্বোধ ও বোকাদের মগজ আর বিখ্যাত মনীষীদের মগজ সম্পূর্ণ ভিন্ন।" অভিজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায়, যারা জীবদ্দশায় নির্বোধ ও বর্বর বলে খ্যাত ছিল, তাদের মগজ ৩০ আউন্স থেকে কোনমতেই বেশী ছিল না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞান মেধা ও চিন্তা শক্তির প্রাচুর্য্য সর্বজন স্বীকৃত ছিল, তাদের মগজ মেপে দেখা গেছে যে, ৬০ আউন্স থেকেও তা কখনো কখনো বেশী। মননশক্তির এটাই হচ্ছে কেন্দ্র, আর তাতে নারী সর্বদা পুরুষের চেয়ে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে।[৭৪] ২৭৮ জন পুরুষের মগজ মেপে দেখা গেছে যে, সবচাইতে বড় মগজের ওজন ৬৫ আউন্স এবং সবচেয়ে ছোট মগজের ওজন মাত্র ৩৪ আউন্স। পক্ষান্তরে, ২৯১ জন নারীর মগজ মেপে দেখা গেছে যে সবচাইতে বড় মগজের ওজন ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে ছোট মগজের ওজন মাত্র ৩১ আউন্স।[৭৫]

পুরুষ নারীর চেয়ে দৈহিক ব্যাপারে শক্তিশালী হলেও লজ্জা ও উত্তেজনায় নারীর চেয়ে দুর্বল। নারীদের মস্তিস্কের অনুভুতি ও উত্তেজনার কেন্দ্রটি পুরুষের চেয়ে বেশী সুবিন্যস্ত ও সজাগ। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। কিন্তু এই শক্তি দ্বারা নারীর কোন কল্যাণ লাভ হয় না। কারণ অনুভুতি ও উত্তেজনার প্রাবল্যের ফলে তারা জ্ঞানের সীমারেখা স্থির রাখতে ব্যর্থ হয়। Encyclopeadia-তে উল্লেখ রয়েছে, এই পার্থক্যটা উভয় শ্রেণীর বাইরের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পুরুষের ভিতর যেমন মেধা, বোধ ও জ্ঞানশক্তির উপকরণ বেশী, নারীর ভিতর তার দুর্বল দিক অর্থাৎ লজ্জা ও উত্তেজনার উপকরণ বেশী।

অন্যান্য ব্যবধান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কতিপয় সুমহান উদ্দেশ্য নিয়েই নারী ও পুরুষকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। জীব বিজ্ঞানমতে, নারী তার আকৃতি, অবয়ব, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে শুরু করে শারীরিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। যে বিষয়গুলিতে নারী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে পৃথক তা নিম্নরূপ:

ঋতুস্রাব: নারীর শরীরে ডিম্বকোষ থাকার ফলে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরই মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং দেহতত্ত্ববিদগণের পর্যবেক্ষণে জানা যায়, মাসিক ঋতুকালে নারীদের নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটে:

- দেহের তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অধিক পরিমাণে দৈহিক তাপ নির্গমনের কারণে শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়।
- শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়ে, রক্তের চাপ কমে ও শ্বাস গ্রহণে পার্থক্য দেখা দেয়।
- হজম শক্তি ব্যাহত হয় এবং প্রোটিন ও চর্বির ভাগ শরীরের ক্ষতিপূরণে অপর্যাপ্ত হয়ে ওঠে।
- শ্বাস গ্রহণশক্তি কমে যায় এবং বাকশক্তির যন্ত্রগুলিতে পরিবর্তন সূচীত হয়।
- স্নায়ুশক্তিগুলি অবসন্ন ও অনুভূতি শক্তি শিথিল হয়ে পড়ে।
- স্মরণশক্তি কমে যায় এবং মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। মাসিক ঋতুকালে নারীর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম ক্ষমতায় পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে। এ কারণে ঋতুকালে সুস্থ নারীও প্রায় রুগ্ন হয়ে পড়ে।[৭৬]

শরীরবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গ্রীব হার্ড ও ডাক্তার এমিল নুডিকের মতে, মাসিক ঋতুস্রাবকালে নারীর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় সুস্থ নারীও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের

---

[৭৪]. Wahiduddin Khan, **Woman Between Islam and Western Society**, Ibid, p: 34-36.
[৭৫]. ফরিদ বেজদী আল আফেন্দী, **নারীর মর্যাদা**, অনু: আকতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ : ২৪।
[৭৬]. আবদুল খালেক, **নারী**, (ঢাকা: দ্বীনি পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ: ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

মেজাজ খিটখিটে থাকে।[৭৭] অধ্যাপক লাপিনস্কি তার The Development of Personality in Women গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "মাসিক ঋতুকালে নারীদের কর্ম স্বাধীনতা ও কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে পড়ে এবং একটা প্রভাবশালী ক্ষমতা তাকে বাধ্যানুগত করে ফেলে। স্বেচ্ছায় কোন কাজ করা বা না করার শক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে পড়ে।" এই সমস্ত পরিবর্তন স্বাস্থ্যবতী নারীর মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং সেটা রোগের আকার ধারণ করে। আরও বর্ণিত আছে, এই অবস্থায় নারী পাগলিনীর ন্যায় হয়ে পড়ে। এই সময়ে সামান্য উত্তেজনায় অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হওয়া, পশু ও নির্বোধের ন্যায় কাজ করে ফেলা, এমনকি আত্মহত্যা করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।[৭৮] ডাক্তার ক্রাফট্ এবিং এর মতে, "আমরা যে সকল নারীকে ভদ্র, বিনয়ী ও প্রফুল্লচিত্ত দেখতে পাই, মাসিক ঋতুকালে অকস্মাৎ তাদের মধ্যেও পরিবর্তন এসে পড়ে। তখন তারা হঠাৎ রুক্ষ, ঝগড়াটে ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। তাদের আচরণে গৃহের দাস-দাসী এমনকি তাদের স্বামীগণও তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে।[৭৯] এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওয়েনবার্গ মন্তব্য করেন, "আত্মহত্যাকারী নারীদের শতকরা ৫০ জন ঋতুকালেই আত্মহত্যা করে।" এর উপর ভিত্তি করেই ডাক্তার ক্রাফট এবিং বলেন, "কোন অপরাধী সাবালিকা নারীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে মোকদ্দমা চলাকালে কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান করে দেখা উচিত, তার এই অপরাধ ঋতুকালে সংঘটিত হয়েছে কি না।"[৮০]

সুতরাং বলা যায়, নারীর মন-মস্তিস্ক এবং স্নায়ুসমূহ ঋতুকালে দুর্বল ও বিশৃংখল হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ এক প্রভাবশালী শক্তি তার বিবেচনা ও ইচ্ছাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে তার দ্বারা অনিচ্ছাকৃত কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। তখন তার কর্ম স্বাধীনতা থাকে না এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলে।

গর্ভধারণকালেঃ গর্ভাবস্থা নারীদের জন্য অধিক কঠিন সময়। এ সম্পর্কে ডাক্তার রিপ্রেভ বলেন, "নারীদের অতিরিক্ত দৈহিক উপাদানসমূহ ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে পরিমানে বের হয়, গর্ভাবস্থায় তার চেয়ে অধিক পরিমানে নির্গত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক ও দৈহিক যে শক্তি নারীর থাকে, গর্ভাবস্থায় তদ্রুপ থাকে না। এ সময় তার যে অবস্থা হয় তা অন্য কোন সময় হলে অথবা একইরূপ অবস্থা কোন পুরুষের হলে তাকে রোগী বলে সাব্যস্ত করতে হবে। গর্ভাবস্থায় কয়েকমাস ধরে নারীর স্নায়ুবিক অবস্থায় কোন শৃংখলা থাকে না। তার মস্তিস্কের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং তার সকল মানসিক উপাদান একটানা বিশৃংখলায় নিপতিত থাকে। সে রোগ ও সুস্থতার মধ্যে প্রতিনিয়ত দুলতে থাকে এবং অতি নগণ্য কারণে সে অসুস্থ

---

[৭৭]. এই সময়ে যাদের কোন কষ্ট বা বেদনা হয় না, শতকরা ত্রিশজন নারী পাওয়া কঠিন। শরীর বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এমিল নুডিক বলেন, ঋতুবতী নারীদের মধ্যে সাধারণত যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাহল মাথা ব্যাথা, অবসাদ, অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের বেদনা, হজমশক্তি কমে যাওয়া, মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য, কোন কোন সময় বমিভাব এবং বমি হওয়া। বেশকিছু নারীর বক্ষে মৃদু বেদনা বোধ হয় এবং সময় সময় ইহা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এসময় কোন কোন নারীর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে পড়ে। আবার কখনও কখনও হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। ডাক্তার ক্রেগার যত নারীকে পরীক্ষা করেছেন, "তাদের মধ্যে অর্ধেক এমন ছিল, মাসিক ঋতুকালে তাদের হজমশক্তির ব্যাঘাত ঘটেছে এবং শেষের দিকে কোষ্ঠকাঠিন্যও দেখা দিয়েছে।" ডাক্তার গ্রীব হার্ড বলেন, "মাসিক ঋতুকালে কোন কষ্ট হয়নি এমন নারী খুবই কম পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশ এমন পাওয়া গিয়েছে যাদের মাথা ব্যাথা, অবসাদ, নাভীর নিম্নভাগে বেদনা এবং কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে। তাদের মেজাজ এই সময়ে খিটখিটে হয়ে থাকে এবং কাঁদতে ইচ্ছা করে।" নারীর মানসিক শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এই সকল দৈহিক পরিবর্তন অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে এবং এটা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, ঋতুকালে প্রতিমাসেই নারী এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর এর স্থায়িত্বকাল তিন হতে দশ দিন। (আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃঃ ৫১)।

[৭৮]. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১-৫২; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭।

[৭৯]. গভীর অনুসন্ধানের পর কোন কোন বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নারীদের অধিকাংশ অপরাধমূলক কার্য ঋতুকালে সংঘটিত হয়ে থাকে। কারণ এই সময়ে তারা নিজেদেরকে সংযত রাখতে পারে না। অতি সৎ নারীও এই সময়ে চুরি করে পরে অনুতপ্ত হয়। গভীর গবেষণা করে Dr. Voice chevsky বলেন, "ঋতুকালে নারীর একাগ্রতা ও মানসিক শক্তি হ্রাস পায়।" অধ্যাপক Krschiskevsky মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ঋতুকালে নারীদের স্নায়ুমন্ডলী উত্তেজিত, অনুভুতি শক্তি শিথিল ও সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে, সুবিন্যস্ত চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা হ্রাস পায় এবং অনেক সময়ে এটা নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি, পুর্ব হতে মনের কোনে প্রতিফলিত স্থির সিদ্ধান্তেও বিচলতার সৃষ্টি হয়। এইজন্য দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কার্যে সে অভ্যস্ত, এই সময় তাও ঠিক থাকে না। (আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২)।

[৮০]. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়ে।" ডাক্তার ফিশার বলেন, "সুস্থ নারীও গর্ভাবস্থায় কঠিন মানসিক চাঞ্চল্যে ভোগে। তার মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা দেখা দেয়। স্মৃতিশক্তি ও অনুভূতি এবং চিন্তা-গবেষণা ও বোধশক্তি হ্রাস পায়।" মোল, হিউলাক এলবার্ট, ইলিয়াস প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের মতে, গর্ভকালীন শেষ মাসটি এমন অবস্থায় কাটে যে, তখন দৈহিক ও মানসিক শ্রম করার কোন যোগ্যতাই নারীর থাকে না। সন্তান প্রসবের পর তার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা, বিশেষত সেপটিক রোগে আক্রান্তের সম্ভাবনা থাকে। পুর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক আলোড়ন-সঞ্চালনের সৃষ্টি হয়। এই কারণে সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থা বিশৃংখল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তার বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। এরূপে গর্ভসঞ্চারের পর হতে পূর্ণ এক বৎসরকাল সে রুগ্ন বা অর্ধরুগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করে। এমতাবস্থায় তার কর্মশক্তি স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক কমে যায়।[৮১]

স্তন্যদানকালেঃ স্তন্যদানের সময় নারীদেহের মূল্যবান বস্তুসমূহ সন্তানের স্তন্যদুগ্ধে পরিণত হয়। খাদ্যদ্রব্যের যে পরিমাণ তার জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক, ততটুকুই তার দেহে সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে এবং বাকী সবই স্তন্য-দুগ্ধে পরিণত হয়। অত:পর দীর্ঘকাল সন্তানের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা দীক্ষায় তার দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ রাখতে হয়।[৮২] এক্ষেত্রে নারীকে যতটা শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয় পুরুষকে ততটা করতে হয় না।

---

[৮১]. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩-৫৪; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭।

[৮২]. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে নারী-পুরুষের ব্যবধান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুমহান উদ্দেশ্যেই নারী-পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে কিছু পার্থক্য করেছেন, পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর প্রকৃতি অনুসরণ কর যে, প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৮৩] আল্লাহ প্রদত্ত বহু গুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবজাত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার কারণে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক খানি কর্মহীন হতে বাধ্য হয়। তখন সে অপরের সাহায্য ও সহযোগীতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সন্তান ধারণকালে, সন্তান প্রসব, স্তন্যদান, শিশু পালন এবং নিয়মিত হায়েয-নেফাসের সময় মহিলারা শারীরিকভাবে দুর্বল থাকে এবং এসময় তারা অধিকাংশ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমাজে শৃংখলা বিধান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারও উপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "মহান আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এব্যাপারে তোমরা অন্য কিছু কামনা করো না।"[৮৪] ইসলামে নিম্নলিখিত বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান রয়েছেঃ

কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে

কুর'আন ও হাদিসে বিভিন্নভাবে নর নারীর ব্যবধানের কথা বর্ণিত হয়েছে। সাধারণভাবে নর-নারীর মধ্যকার ব্যবধানের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, "নর নারীর মত নয়।"[৮৫] পরিবারে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদের উপর পুরুষদের প্রাধান্য দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, "পুরুষগণ মহিলাদের অভিভাবক ও পরিচালক; এই নীতি অনুসারে যে আল্লাহ কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; আরও কারণে যে, পুরুষরা মহিলাদের ভরণ-পোষণের জন্য নিজেদের অর্থ ব্যয় করে থাকে।"[৮৬]

আল কুর'আনে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। কারণ স্বামীকে তার স্ত্রীর উপর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। ইসলামের আলোকে পুরুষ স্ত্রীর আহার, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে বলেই স্ত্রীর উপর পুরুষের এই নেতৃত্ব ও প্রাধান্য হওয়া বাঞ্চনীয়।[৮৭] মহান আল্লাহ আরও বলেন, "মহিলাদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।"[৮৮] আর আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী বলেন যে, নারীদের উপর পুরুষদের প্রাধান্যের কারণ এই যে, তারা স্ত্রীদেরকে মহর দান করে, তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তাদেরকে বিপদ-আপদ হতে

---

[৮৩]. আল কুর'আন, **সূরা আর রূম,** আয়াতঃ ৩০।
[৮৪]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা,** আয়াতঃ ৩২
[৮৫]. আল কুর'আন, **সূরা আল ইমরান,** আয়াতঃ ৩৪
[৮৬]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা,** আয়াতঃ ৩৪
উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'অভিভাবক' শব্দার্থের মর্ম হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত, অটলভাবে দন্ডায়মান, তত্ত্বাবধানকারী, প্রভু, প্রতিপালক, পৃষ্ঠপোষক, সংরক্ষক ইত্যাদি। বিভিন্ন তাফসীরকারক এই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। নর-নারীর সাম্যবাদ বা সমানাধিকারের সমর্থকগণ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন যে, পুরুষ স্বীয় ধন-সম্পদ হতে নারীর ভরণ-পোষণ প্রদান করে বলে পৃষ্ঠপোষক ও সংরক্ষক আখ্যায় অভিহিত হয়েছে মাত্র; এর সাথে প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের কোনই সম্বন্ধ নাই। "আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন।" এর অর্থ এই যে, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যে নারীর উপর পুরুষের যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, সেইরূপ দৈহিক সৌন্দর্য-সুষমা এবং প্রেম-প্রীতি স্নেহ-দয়া-মায়া ও কোমলতা মধুরতায় নরের উপর নারীর শ্রেষ্ঠত্ব। (মোহাম্মদ আলী হাসান, **তাফসীর ও বঙ্গানুবাদ,** ১ম খন্ড, ঢাকা, তা.বি, পৃঃ ২৬৩-২৬৪)।
[৮৭]. শেখ আহমদ শাহওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম আল-মুহাদ্দেসে দেহলভী, **দারুল মা'রেফা,** ২য় খন্ড, বৈরুত, পৃঃ ১৩৬।
[৮৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা,** আয়াতঃ ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা করে, আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্যে আদেশ করে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, নামায ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য তাকিদ প্রদান করে থাকে।[৮৯]

সুতরাং বলা যায়, পারিবারে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ইসলামে পুরুষকে একজন অভিভাবক হিসেবে নারীর উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তবে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রকৃত ঈমানদার এবং নেক আমলের অধিকারী পুরুষকে এই অধিকার দিয়েছেন। কোন চরিত্রহীন, মদখোর, বদমেজাজী, দায়িত্বহীন, নিষ্ঠুর প্রকৃতির পুরুষকে এই অধিকার দেয়া হয়নি।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে

সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কারণ নারীর যাবতীয় ভাল-মন্দ, দেখাশোনা, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মীরাস বন্টনে নর-নারীর অধিকার তারতম্য বর্ণনা করে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে, "একজন পুরুষ পাবে দুইজন মহিলার অংশের সমান।"[৯০] মীরাস বন্টনে নর ও নারীর মধ্যকার তারতম্য সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের ক্ষতি অন্যদিক দিয়ে পূরণ করা হয়েছে।

ইসলামের বিধান অনুসারেই স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে মোহরানা পায়। কিন্তু পুরুষ এই ধরণের কোন আর্থিক সহযোগীতা পায় না। আবার বিয়ের সময় বর কনেকে যে অলংকার ও পোশাকাদি দেয়, তার মালিকও এককভাবে স্ত্রীই হয়ে থাকে। এছাড়া সমস্ত পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব শুধু পুরুষের উপরই ন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে নারী ভরণপোষণ দানের মত গুরু দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামের বিধানমতে, যেহেতু মেয়েরা বিয়ের পূর্বে পিতা বা অভিভাবকের এবং বিয়ের পরে স্বামীর নিকট থেকে নিশ্চিতভাবে ভরণপোষণ পেয়ে থাকে। সেহেতু নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দান করলে পুরুষের প্রতি অবিচার হত। আর ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বপ্রকারের অবিচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৯১]

সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে

সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন, "তোমরা পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখ। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী রাখ।"[৯২] সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেছেন, "মহিলার সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়?"[৯৩]

---

[৮৯]. ইবনুল আরাবী, **আহকামুল কুর'আন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১৬; মুহাম্মদ ইজ্জাহ দারুজা, **আল মারআতু ফিল কুর'আন ওয়াস্ সুন্নাহ**, (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল ফিকরিয়া ১৯৮০), পৃ: ২২৬; মুহাম্মদ খায়রাত, **মারকাযুল মারআতি ফিল ইসলাম**, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫), পৃ: ১০৮; Masumeh Raghibi Byat, **Women Victim or Victor**, (Dhaka : A B. Publications, 1995). p: 58.

[৯০]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত:১১। আর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, পুরুষরা স্ত্রীদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা এমনভাবে করে, ঠিক যেমনভাবে শাসকগণ করে থাকে দেশের ও জনসাধারণের। আল্লাহ তা'য়ালা দুটো কারণে স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। একটি কারণ আল্লাহর বিশেষ দান, আর অপরটি পুরুষদের নিজস্ব অর্থ। আল্লাহর দান এই যে, গুরুতর কার্য সম্পাদনা, বিপুল কর্মশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে পুরুষরা স্বভাবতই প্রাধান্যের অধিকারী। এ জন্যেই নবুয়ত, নেতৃত্ব, শাসন ক্ষমতা, জিহাদ, বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত হয়েছে। আর এই অধিকার ও দায়িত্বের কারণেই মীরাসে পুরুষের অংশ বেশী দেয়া হয়েছে। আর পুরুষের অংশ বেশী হবার কারণ এই যে, মহরানা দান, ভরণপোষণ এবং পারিবারিক যাবতীয় দায়িত্ব পুরুষরাই পালন করে থাকে।

[৯১]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী**, (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ: ৩৩-৩৪।

[৯২]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২৮২।

[৯৩]. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, **সহীহ আল বুখারী**, কিতাবুল হায়েয, ১ম খন্ড, (দেওবন্দঃ শিরকাত মুখতার, ১৯৮৫), পৃ: ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ব্যবধান

ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদটিতে নারী নেতৃত্ব দিবে না পুরুষ নেতৃত্ব দিবে সে সম্পর্কে আল কুর'আনে কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। আল কুর'আনে নারীকে নেতৃত্ব দিতেও বলা হয়নি আবার নেতৃত্ব না দিতেও বলা হয়নি। তবে এ সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেছেন, "যে জাতি নিজেদের শাসনব্যবস্থা কোন নারীর উপর অর্পণ করে সে জাতির উন্নতি নেই।"[৯৪] এই হাদিস দ্বারা যে শাসন ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে, তা কেবলমাত্র সর্বোচ্চ শাসক বা রাষ্ট্র প্রধানের পদটিই বুঝানো হয়েছে। এই হাদীসে কল্যাণ না থাকার অর্থই পরোক্ষভাবে নিষেধ করা বুঝায়।[৯৫]

ইবাদতের ক্ষেত্রে

হায়েয ও নেফাসের সময় নারীরা সালাত কায়েম করা ও রোযা পালন করা থেকে বিরত থাকে। এই বিরত থাকা তাদের জন্য শরীয়তসম্মত। কিন্তু এ কারণে তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি পড়ে থাকে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে না। এই প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স.) বলেছেন, "এরূপ নয় কি যে, ঋতুবর্তী অবস্থায় কোন মহিলা নামায পড়ে না এবং রোযাও রাখেনা।"[৯৬]

ইসলামে কতিপয় ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকেও পুরুষের চেয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং এই ব্যবধান স্বীকার করে নেওয়াই হবে সভ্যতা সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর।

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যকার ব্যবধানের কারণ

ইসলামে নারী-পুরুষের মর্যাদা ও অধিকারের সকল ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সমতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। মানবতা, যোগ্যতা ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম নর-নারীতে যে সাম্যের সৃষ্টি করেছে, তার সাথে এই ব্যবধানের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইসলাম এই ব্যবধানগুলো করেছে শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের তাগিদে। ইসলামে নর-নারীর মধ্যকার ব্যবধানের কারণগুলি নিম্নরূপঃ

প্রথমত : সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবধান থাকার কারণ

ইসলামে কোন বিধান সুস্পষ্ট এবং সঠিকভাবে প্রয়োগের তাগিদে কিছু কিছু বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কিছুটা অসমতা রয়েছে। কোন ব্যক্তির অধিকার নিরূপণের জন্য যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তার ক্ষেত্রে ইসলাম দু'জন সত্যভাষী পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করেছে। এ সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। দু'জন পুরুষ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়। তাহলে এমন একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যাদের ওপর তোমরা সন্তুষ্ট, যাতে একজন স্ত্রীলোক ভূলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"[৯৭]

---

[৯৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কিতাবুন নাবী (স.) ইঁরা কিসরা ওয়া কায়সার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৩৭।

[৯৫]. উল্লেখিত হাদীসটি বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪০৭৭ (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃঃ ২৭৪) থেকে উদ্ধৃত। রাসূল (স.) যখন জানতে পারলেন যে, পারস্যবাসীরা তাদের মৃত শাসনকর্তা কেছরার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে তখন তিনি এ কথা বলেছিলেন।

[৯৬]. বুখারী, **সহীহ আল বুখারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪; **আদদুসতুরুল কুরআন ফী শউনিল হায়াত**, (কায়রোঃ আল বাবুল হালাবী ১৯৮৫), পৃঃ ৭৮।

[৯৭]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২৮২।

মানবতা, মর্যাদা এবং যোগ্যতার সাথে যে এই পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই, তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়। মানুষ হিসেবে নারী পুরুষের মতই সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। উক্ত আয়াতে একজন পুরুষের সাথে সাক্ষী হিসেবে দু'জন নারীর শর্ত আরোপের কারণ তার সম্মান ও মর্যাদাকে খাটো করা নয়। বরং এর কারণটি নারীর সম্মান ও মর্যাদার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। তাই একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, ইসলাম যদি নারীকে সকল বিষয়ে পুরুষের সমান মর্যাদা, অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করেছে তথাপি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে সামাজিক দায়িত্বটি অর্পণ করেছে তা হলো পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারীকে বেশীরভাগ সময় গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে হয়। যার ফলে বাহ্যিক সকল ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তার হয় না। যদিও বা কখনো সুযোগ ঘটে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে সে ওটাকে স্মরণে রাখতে পারে না বা স্মরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। পরবর্তীতে ঐ সকল ঘটনাবলীর জন্য যদি তাকে সাক্ষ্য দিতে বলা হয় তখন সে সঠিকভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে না। কারণ পুরো ঘটনা স্মরণ রাখতে আগ্রহী না হওয়ার কারণে সে ঘটনার আংশিক অংশ ভুলে যেতে পারে। এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ব্যাহত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করার জন্য দুজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ আবশ্যক। কারণ দুইজনের একসাথে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বা একজন ভুলে গেলেও অপরজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর মানব অধিকার এমন একটি বিষয়, যার ব্যাপারে সাক্ষীর স্থিতি ও দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক এবং সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রমাণ করতে বিচারকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা জরুরী। এ কারণেই মহিলা সাক্ষীর ক্ষেত্রে ইসলাম দু'জন সাক্ষীর বিধান দিয়েছে।[৯৮] তাইতো বিষয়টি আল কুর'আনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "যাতে একজন নারী ভুলে গেলে অপরজন নারী তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"[৯৯]

তবে যেসব ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি কম সেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তেমনি যেসব ক্ষেত্রে নারী ব্যতীত কোন পুরুষের প্রকৃত সত্য অবগত হওয়া আদৌ সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণ করাকে অনুমোদন করে। উদাহরণস্বরূপ, সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় প্রমাণ করা, কোন নারীর কুমারীত্ব প্রমাণ করা এবং কোন যৌন ত্রুটিতে আক্রান্ত কিনা তা প্রমাণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১০০]

সুতরাং ইসলাম নারীকে কম মর্যাদা দিয়েছে' এই দোষারোপ ঢালাওভাবে আরোপ করে ইসলামকে তিরস্কার করা একেবারেই অর্থহীন। কেননা ইসলাম অকাট্যভাবে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার ঘোষণা করেছে। আর সাক্ষ্যের ব্যাপারে যে দুই জন নারী সমান একজন পুরুষের কথা বলা হয়েছে তার পিছনে সুস্পষ্ট কারণ ও যুক্তি রয়েছে, এবং এটি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।

---

[৯৮]. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪), পৃ: ২১-২২। নারীর মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুসংখ্যক ফিকাহ শাস্ত্রবিশারদ অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি হলঃ নারীরা অধিকাংশ সময় নিজ গৃহে অবস্থান করে এবং সেখানে সহিংসতা পরিলক্ষিত হয় না। যদিও দৈবক্রমে নারী কোন সহিংস ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয় তবে হত্যার ন্যায় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা এবং সহ্য করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সে (নারী) হয় দৌড়ে পালাবে, না হয় চোখ বন্ধ করবে, নয়ত মুর্ছা যেতে পারে। কারণ নারীর মানসিক শক্তি, সাহস ও স্থিরতা দুর্বল। এমতাবস্থায় তার পক্ষে পরবর্তী সময়ে সাক্ষ্য দেয়া, অপরাধ, অপরাধী, অপরাধ সংগঠনের হাতিয়ার ও কিভাবে তা সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তারিত সঠিক বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। অথচ ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধির যাবতীয় দন্ড বিধানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলেই তা বাতিল হয়ে যায় এবং এটা সর্বসম্মত ব্যাপার। তাই হত্যাকান্ডের ন্যায় লোমহর্ষক অপরাধ সংঘটনের সময় নারীর যে মানসিক অবস্থা হওয়ার কথা, তাতে অপরাধের সঠিক বিবরণ দেয়ার মত দৃঢ়তা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটাই সন্দেহজনক। এই সন্দেহের কারণেই নারীর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দুইজনের কথা বলা হয়েছে যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন স্মরণ রাখতে পারে। (ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত)।

[৯৯]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াত: ২৮২।

[১০০]. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩। অবশ্য বিষয়টি অতীত যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন ধাত্রীবিদ্যা, নারীদের চিকিৎসা ও গোপনীয় বিষয়গুলি নারী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত : উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যবধান থাকার কারণ

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ থেকে নারীজাতি যখন সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিল তখন ইসলামই নারীকে উত্তরাধিকার দিয়ে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী বিধিতে নারীর অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যথাক্রমে:

এক. ইসলামী আইনে কখনো উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কম, যেমন– একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী বৈপিত্রেয় বোনের সাথে যখন অন্য কেউ থাকে না এবং অনুরূপ বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সাথে যখন আর কেউ থাকে না। তখন এক ভাই ও বোন উত্তরাধিকারের এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যখন বৈপিত্রেয় ভাই বোন থাকবে, তখন তারা এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অংশীদার হবে এবং ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ।

দুই. আবার কখনো নারীর অংশ হবে পুরুষের সমান বা তার চেয়ে বেশী। যেমন মৃত ব্যক্তি যদি একাধিক পুত্র কন্যাসহ পিতামাতা রেখে যায়। তবে উক্ত পিতামাতা মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর যদি ব্যক্তি এক কন্যা, এক স্ত্রী ও পিতামাতা রেখে মারা যায়, তবে তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে কন্যা অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তিকে মোট ২৪ ভাগে ভাগ করলে ১২ ভাগ পাবে কন্যা, ৩ ভাগ পাবে স্ত্রী, ৪ ভাগ পাবে মাতা এবং ৫ ভাগ পাবে পিতা।

তিন. তবে সাধারণভাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারী পাবে পুরুষের অর্ধেক।[১০১]

এক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী পরিবারের ব্যয় নির্বাহের সকল প্রকার আর্থিক দায়-দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত বলেই নারীকে পিতার সম্পত্তির অর্ধেক উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, নারীর প্রতি ইসলামের এটা অসমতা নয় বরং এটা নারীর প্রতি ইসলামের সর্বোচ্চ উদারতা ও বদান্যতা।

পিতার নিকট থেকে নারী যে সম্পত্তি পায় তা পরিবারের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নয় বলেই তার সম্পত্তি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়াও বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত দেনমোহর ঐ সম্পত্তির সাথে যুক্ত হয়। আর ঐ সম্পত্তিকে লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করলে সেখান থেকেও মুনাফা যুক্ত হয়। সুতরাং নারীর প্রাপ্ত অংশ ব্যয় করতে বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে তা সম্পূর্ণ রয়ে যায়। পক্ষান্তরে পুরুষ যে সম্পত্তি পায়, বিয়ে করার সাথে সাথে তা থেকে স্ত্রীকে মোহরানা দেয়ার কারণে কমে যায়। তারপর স্ত্রীর খোরপোশও ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি বাবদ তার আরও সম্পত্তি ব্যয় হয়। এমনকি এসব করতে গিয়ে তার মিরাসী সুত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তিই শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপরও তার উপর রয়ে যায় আজীবন স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের গুরুদায়িত্ব।[১০২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নারী তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে অংশ পায় তা সম্পুর্ণই সঞ্চিত থেকে যায়। অপরপক্ষে পুরুষ পিতার সম্পত্তির যে অংশ পায়, তা তার উপর অর্পিত অপরিহার্য আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহনে অনিবার্যভাবে খরচ হয়ে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অতএব, সম্পত্তি বন্টন ও দায়িত্ব

---

[১০১]. এখানে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন উথাপিত হতে পারে যে, এর কারণ কি? এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামে সম্পত্তি বন্টনের সাথে দায়-দায়িত্ব বন্টনের ভারসাম্য রক্ষার সম্পৃক্ততা রয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের মুলনীতি হলো প্রত্যেক মানুষের উপর তার প্রাপ্তি অনুপাতেই দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। ইসলামী বিধি ব্যবস্থায় পুরুষের উপর যে ধরণের ও যতখানি আর্থিক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে নারীর উপর ততখানি অর্পণ করা হয়নি। পুরুষই স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করে, স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণসহ আর্থিক সুবিধা প্রদান করে এবং সন্তানের খোরপোষ বাবদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে। পক্ষান্তরে নারী এই সমস্ত দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। বরং সে মোহরানা গ্রহণ করে। সে ধনী হলেও নিজের জন্য নিজের সন্তানের জন্য নিজ সম্পত্তি থেকে এক কপর্দকও ব্যয় করতে বাধ্য নয়। এই কারণেই সম্পদের উত্তরাধিকার নারীর অংশ পুরুষের চেয়ে কম হওয়া ন্যায় সঙ্গত। (ড. মুস্‌তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪)।

[১০২]. ড. মুস্‌তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বন্টনের হিসাব নিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক অধিকারের দিক দিয়ে নারী পুরুষের চেয়ে বেশীই সুবিধা ভোগ করে।

তৃতীয়ত: অনিচ্ছাকৃত ভাবে নারী হত্যার জরিমানার ক্ষেত্রে ব্যবধান

কোন মহিলাকে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত হত্যা করা হয় এবং মহিলার হত্যাকারী কর্তৃক হত্যার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না হওয়ায় কিসাস বা প্রাণদন্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। তার জন্য শরীয়ত অর্থদন্ড তথা দিয়াতের ব্যবস্থা করেছে। এই দিয়াত বা জরিমানা হচ্ছে একই পন্থায় নিহত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।

ইসলাম যেহেতু মানবিক ব্যাপার, কর্মের যোগ্যতায় ও সামাজিক মর্যাদায় নর নারীর সমতা নিশ্চিত করেছে। তাই দিয়াতের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবধান অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে যে, যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নর-নারীর সাম্য নিশ্চিত করেছে তার সাথে উক্ত ব্যবধানের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নারী পুরুষের নিহত হওয়র কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবারে ক্ষয়ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত।

তবে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে এরূপ কোন ব্যবধান নেই। সেক্ষেত্রে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন হত্যাকারীর জন্য মৃত্যুদন্ডই প্রাপ্য। এর কারণ এই যে, কিসাস বা মৃত্যুদন্ডের ক্ষেত্রে হত্যার পরিবর্তে হত্যার নীতি অনুসরণ করা হয়। আর নারী পুরুষ মানুষ হিসেবে যেমন সমান তেমনি উভয়ের জীবনের মুল্যও সমান।

কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বা অনুরূপ হত্যাকান্ডে আর্থিক ক্ষতিপুরণ, কারাদন্ড বা অনুরূপ কোন শাস্তির বিধান করা ছাড়া অন্য কোন সুযোগ নেই। কেননা এর সাথে হত্যাকারী ও মৃত্য ব্যক্তির পারিবারিক ক্ষতি জড়িত। তবে আর্থিক ক্ষতিপুরণ দেয়া ও ক্ষতিপুরণের পরিমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। অর্থাৎ ক্ষতির পরিমান যাচাই করতে হবে। ক্ষতিপুরণের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ নিহত হলে পরিবার যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী নিহত হলে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কি না তা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরুষ অনিচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের শিকার হয়, তার স্ত্রী ও সন্তান ভরণপোষণকারী থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যদি নারী অনিচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের শিকার হয় তবে স্বামী সন্তান একটা মানসিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। একজন মানুষ হিসাবে নিহত ব্যক্তির মুল্য দিয়াত বা জরিমানা দ্বারা নিরূপণ করা হয় না। বরং ঐ ব্যক্তিকে না থাকার কারণে তার পরিবার কতখানি আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলো সেটির মুল্যায়ন করা হয়। মুলত: এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির মুল উদ্দেশ্যই হল নিহত ব্যক্তির পরিবারের ক্ষতির পরিমান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

তবে যে সকল ক্ষেত্রে নারীকে নিজের ভরণপোষণের জন্য জীবিকা উর্পাজনের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বা নারীকে তার পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে কর্মজীবি নারীকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে ন্যায় বিচারের দাবী অনুযায়ী তার দিয়াত বা জরিমানা নিহত পুরুষের দিয়াত বা জরিমানার সমান হওয়া বাঞ্চনীয়।[১০৩]

চতুর্থত: রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবধান

ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদটি সম্পর্কে আল কুর'আনে কোন সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে এ সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেছেন, "যে জাতি নিজেদের শাসনব্যবস্থা কোন নারীর উপর অর্পণ করে সে জাতির উন্নতি নেই।"[১০৪] এই হাদিস দ্বারা যে শাসন ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে, তা কেবলমাত্র সর্বোচ্চ শাসক বা রাষ্ট্র প্রধানের পদটিই বুঝানো হয়েছে। তবে রাসুল (স.) এর এই হাদীসটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে একটি

---

[১০৩]. ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭-২৮।
[১০৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কিতাবুন নাবী (স.) ইলা কিসরা ওয়া কায়সার, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিধর্মী সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে।[১০৫] তাই এই হাদীস দ্বারা নারী রাষ্ট্রের অন্য কোন পর্যায়ের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে না- এই মর্মে কোন সর্বসম্মত বিধান ইসলামী আইনে নেই।[১০৬] ইমাম আবু হানিফার মতে, ক্ষেত্র বিশেষে নারীকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা বৈধ। কেননা এই বিচারের পদটি একটি প্রশাসনিক পদ। তাছাড়া নারী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলে সে রাষ্ট্রের কল্যাণ নাই- এর দ্বারা জনকল্যাণ, নারীর মনস্তাত্তিক অবস্থা ও তার সামাজিক দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই এই বিধান প্রবর্তিত হয়েছে বলে স্বত:সিদ্ধ মত পাওয়া যায়।[১০৭]

পরিশেষে বলা যায়, নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য, তার যোগ্যতা ও মর্যাদার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেয়ার পর ইসলাম তার স্বভাব ও প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে এবং নারী জীবনের কোন কোন কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত তা নির্ণয় করেছে। অত:পর যে কাজ বা কর্মক্ষেত্র তার উক্ত স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী ও অনুপযোগী কিংবা সমাজে তার স্বভাবমুলক ভুমিকা পালনের পথে অন্তরায়, সেই কাজ ও কর্মক্ষেত্র থেকে নারীকে নিরাপদ দুরত্বে রেখেছে। একারণেই ইসলাম পুরুষের তুলনায় নারীকে কোন কোন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। সুতরাং নারী পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য শুধু ইসলাম নয়, সৃষ্টিগত ভাবেই হয়ে এসেছে। ইসলাম এমন কোন বিধান প্রবর্তন করেনি যা দ্বারা নারীর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। বরং ইসলাম প্রদত্ত সকল বিধান নারীর জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে।

---

[১০৫]. উল্লেখিত হাদীসটি বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪০৭৭ (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ: ২৭৪) থেকে উদ্ধৃত। রাসূল (স.) যখন জানতে পারলেন যে, পারস্যবাসীরা তাদের মৃত শাসনকর্তা কেছরার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে তখন তিনি এ কথা বলেছিলেন।

[১০৬]. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮; শেখ মুহাম্মদ আবদুল হাই, **নারী অধিকার**, (ঢাকা: মাহবুব প্রকাশনী, ২০০০), পৃ: ২৫৮-২৫৯।

[১০৭]. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামে নারী-পুরুষের সমতা

সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষ আলাদা কোন জীবসত্ত্বা নয়। পুরুষ যেমন মানুষ, নারীও তেমনি মানুষ। নারী-পুরুষের একত্ব সম্পর্কে কুর'আন পাকে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।"[১০৮]

পুরুষের মধ্যে যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে নারীর মধ্যেও তাই রয়েছে। মানব চরিত্রের যেসকল বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান তা থেকে তাদের স্বতন্ত্র করার কোন বিধান ইসলামে নেই। শারিরীক গঠনে নারী-পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও ইসলামে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-নারীর মধ্যে সমতা রয়েছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "এবং হে নবী! লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সে সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব্ব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরগণকে বের করল এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমাদের রব্ব নই?' তারা বলল, নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের রব্ব। আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।"[১০৯]

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কেই একত্রে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মূল মানুষ হচ্ছে 'রুহ'। যার অর্থ– আত্মা। রুহ এবং শরীর এক নয়। দেহ আলাদাভাবে সৃষ্টি করে তার মধ্যে রুহ প্রবেশ করানোর ফলেই মানুষ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে মৃত্যুর পর দেহ ধ্বংস হয়। কিন্তু রুহ জীবিত থাকে তাই দেখা যায়, আল্লাহ সকল রুহকে একত্রে সৃষ্টি করেছেন। একই রকম করে সৃষ্টি করেন এবং একটিই প্রশ্ন করেন। অতএব বলা যায়, মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এক। সে মানুষ হিসেবে এক এবং এটিই হলো নারী-পুরুষের সাম্যের প্রথম ভিত্তি।

২. পুরুষের শারীরিক কাঠামো নারীর তুলনায় শক্তিশালী হওয়ায় তারা গর্ব করে বলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। অথচ পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম কাঠামোতে।"[১১০] এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা শুধু পুরুষকে উদ্দেশ্য করেই বলেননি বরং মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'সর্বোত্তম কাঠামো' বলতে নারী-পুরুষ উভয়ের কাঠামোকেই সর্বোত্তম বলা হয়েছে। সুতরাং একজনকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যজনকে নগণ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে একথা একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং আল্লাহর কাছে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান।

৩. আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "হে মানব জাতি! সেই রবকে তুমি মান্য কর যিনি তোমাদেরকে একটি মূল সত্তা (নফ্স) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সত্তা থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুইজন থেকে তিনি অসংখ্য নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন।"[১১১]

মানব জাতি হচ্ছে বনি আদম অর্থাৎ আদমের সন্তান। আল্লাহ পাক কুর'আন শরীফে অন্তত ২০/৩০ বার বলেছেন, 'ইয়া বনি আদামা' (হে আদমের সন্তানেরা)। বাবা-মা ও সন্তানেরা মিলে যেমন পরিবার গঠিত হয় তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি একটি পরিবার। সব পরিবারের উপরে হল মানব জাতির

---

[১০৮]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১।
[১০৯]. আল কুর'আন, **সূরা আরাফ**, আয়াত: ১৭২।
[১১০]. আল কুর'আন, **সূরা আত ত্বীন**, আয়াত: ৪।
[১১১]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার। তার অর্থ সবার মৌলিক সম্মান ও মর্যাদা সমান। ছোটখাটো কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। আইনের চোখে সবাই সমান, তেমনি আল্লাহর কাছেও সবাই সমান। আল্লাহর কাছে সম্মানের একমাত্র ভিত্তি হলো 'তাকওয়া'। আল্লাহ কোথাও বলেন নাই যে, তার কাছে পুরুষ সম্মানিত বা নারী সম্মানিতা। আল্লাহ বলেছেন, "ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহে আতকাকুম" অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সম্মানিত যে তাঁকে মেনে চলে।"[১১২] আল্লাহর কাছে নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা তাঁকে মেনে চলা না চলার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে নারী বা পুরুষ আল্লাহকে মেনে চলে সে সম্মানীত। যে নারী বা পুরুষ আল্লাহকে মেনে চলে না সে নিকৃষ্ট। এখানে নারী-পুরুষের মধ্যকার মর্যাদার মাপকাঠি নির্ণয়ের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের উপর অর্পিত হয়নি। অতএব বলা যায়, নারী-পুরুষ সকলেই একই পরিবারের সদস্য এবং উভয়ের মৌলিক মর্যাদা সমান।[১১৩]

৪. পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।"[১১৪] উক্ত আয়াতে আল্লাহ খলীফার কথা বলেছেন। এই খলীফা দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। খলীফা অর্থ প্রতিনিধি অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি নারী-পুরুষের নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহর প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষ উভয়কেই আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দান করেছেন। তবে যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তারা খলিফার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। কিন্তু মূলত সবাই আল্লাহ পাকের খলিফা। এই খলিফার মধ্যে রয়েছে সকল ক্ষমতায়ন। ক্ষমতা ছাড়া কেউ কোন দায়িত্ব পালন করতে পারে না। খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের কিছু ক্ষমতা থাকতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি এই খিলাফতের মধ্যে রয়েছে। শুধু নারী নয় 'খিলাফত' শব্দের মধ্যে নারী, পুরুষ, গরীব, দুর্বল সকলের ক্ষমতায়নের ভিত্তি রয়েছে। সুতরাং নারী পুরুষ মৌলিক সাম্যের এটি হলো চতুর্থ প্রমাণ।[১১৫]

৫. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী এই বিশ্বাসই ইসলামের মূল কথা। হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন পুরুষ এবং তাঁর উপর কুর'আন নাজিল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাসূল (স.) পুরুষ বলে তাঁর পুরুষত্বকে ইসলামে বড় করে প্রচার করা হয়নি বা নবী (স.) কখনও নিজের পুরুষত্বের অহংকার করেননি এবং নিজের মনগড়া কিছু প্রচার করেননি। বরং তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশ পেয়ে সেই নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমাদের সঙ্গী না পথভ্রষ্ট হয়েছে, না বিভ্রান্ত, সে নিজের মনের ইচ্ছায় কথা বলে না। এতো একটা ওহী, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়।"[১১৬] তাই রাসূল (স.) এর বাণীও কুর'আনের বাণীর মতই গুরুত্বপূর্ণ।[১১৭] কুর'আনের বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা। সুতরাং রাসূল (স.) নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং নারী জাতিকেও মানুষ হিসেবে সমাজে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। রাসূল (স.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা মায়েদের নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চারদিক থেকে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সঞ্চিত করা এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।"[১১৮]

---

[১১২]. আল কুর'আন, **সূরা আল হুজরাত**, আয়াত: ১৩।
[১১৩]. শাহ আবদুল হান্নান, **নারী ও বাস্তবতা**, (চট্টগ্রাম: এ্যাডন পাবলিকেশন্স ঢাকা, ২০০২), পৃ: ১৩।
[১১৪]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াত: ৩০।
[১১৫]. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা, **কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রী:), পৃ: ১১৬-১১৭।
[১১৬]. আল কুর'আন, **সূরা নাজম**, আয়াত: ২-৪।
[১১৭]. আনিস আহমেদ, **Muslim women and higher Education**, (Institute of Policy studies), (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান ১৯৮৪), পৃ: ৭৫।
[১১৮]. বুখারী, **সহীহুল বুখারী**, ২য় খন্ড, কিতাবুল আদব, (দেওবন্দ: শিরকাত মুখতার, ১৯৮৫), পৃ: ৮৮৪; Jamal a. Badwi, Woman in Islam, (London: Islamic Council of Europe, 1976), p: 131-145.

Dhaka University Institutional Repository

৬. হে মানুষ, হে বনী ইসরাঈল, হে ঈমানদারগণ, হে মানবজাতি, হে মুসলমান, হে মুমিনগণ[১১৯] ইত্যাদি শব্দগুলো পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। এই শব্দগুলো দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

- হে মানুষ- দ্বারা সমস্ত মানুষকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত।
- হে বনী ইসরাইল- দ্বারা বনী ইসরাঈল জাতির সমস্ত নারী-পুরুষকে বুঝানো হয়েছে।
- হে মানব জাতি- দ্বারা নারী-পুরুষ উভয় মানুষকে বুঝানো হয়েছে।
- হে ঈমানদারগণ- দ্বারা আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী সমস্ত নারী পুরুষকে বুঝানো হয়েছে।
- হে মুসলমানগণ- দ্বারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী সমস্ত নারী ও পুরুষকে বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এসকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও ইসলামে আরও যেসকল ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে সমতা বিধান করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

সামাজিকভাবে মৌলিক অধিকার বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সংস্কৃতি এই ছয়টি অধিকারের নিশ্চয়তাকে বুঝায়। এই ছয়টি অধিকার নিশ্চিত করা বা প্রয়োজন পূরণ করা একজন পুরুষের জন্য যেমন জরুরী তেমনি একজন নারীর জন্য সমান জরুরী। ইসলামে নারী আর পুরুষের মধ্যে সম্মান, ইজ্জত, সম্পদ, শিক্ষা অর্জনের অধিকারের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য সৃষ্টি করা হয়নি। কুর'আন পাকে বলা হয়েছে, "নারীরা তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তোমরাও নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ।"[১২০] "তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"[১২১] "আল্লাহ তোমাদের হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম উপরকণ দান করেছেন। তবুও কি তার বাতিলকে মানছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করছে।" [১২২]

পাপ ও পূণ্যের বিচারে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কুর'আনে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে।"[১২৩] "আমি তোমাদের মধ্যে কারো আমল বা কাজকে বিনষ্ট করে দেব না। পুরুষ হোক কিংবা নারী, তোমরা সকলেই সমজাতের লোক।"[১২৪] কুর'আনে আরও বলা হয়েছে, "পুরুষ হোক কি নারী, যে-ই পুণ্যময় কাজ করবে ঈমানদার হয়ে তাকেই আমরা উত্তম পবিত্র জীবন যাপনের সুযোগ দিব এবং তাদের উত্তম আমলসমূহের শুভ প্রতিফল তাদের দান করব।"[১২৫]

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রেও নর-নারীর মধ্যে সমতা বিধান করেছেন। যে নর বা যে নারী আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে তারা উভয়ই আল্লাহর কাছে সমান। তাদের পুরস্কারের ক্ষেত্রেও কোন তারতম্য করা হয়নি। তাকওয়ার ক্ষেত্রে সমান মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা আল কুর'আনে বলেন, "নিশ্চয়ই যে সব পুরুষ ও যে সব স্ত্রী লোক মুসলমান,[১২৬] মু'মিন, খোদার অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্য্যশীল, খোদার সম্মুখে অবনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের

---

[১১৯]. এই শব্দগুলো পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

[১২০]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারাহ**, আয়াতঃ ১৮৭।

[১২১]. আল কুর'আন, **সুরা আশ শুরা**, আয়াতঃ ১১।

[১২২]. আল কুর'আন, **সুরা আন নাহল**, আয়াতঃ ৭২।

[১২৩]. আল কুর'আন, **সুরা আল মাদ্দাসৃসির**, আয়াতঃ ৩৮।

[১২৪]. আল কুর'আন, **সুরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ১৯৫।

[১২৫]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১২৪; **সুরা আন নাহল**, আয়াতঃ ৯৭।

[১২৬]. মুসলিম শব্দের অর্থ ইসলামের অনুগামী। মুসলমান শব্দের মূল হল মুসলিম। আরবী সাহিত্যে শব্দটি ইসলামের অনুসারী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। (**সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী এবং অধিক মাত্রায় খোদার স্মরণকারী। আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"[১২৭]

আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "নিঃসন্দেহে মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মুমিন নর-নারী, ইবাদতকারী নর-নারী, সত্যবাদী নর-নারী, ধৈর্যশীল নর-নারী, আল্লাহ ভীরু নর-নারী, যাকাত দানকারী নর-নারী, রোজাদার নর-নারী, সতী সাধবী নর-নারী, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারী নরনারী সকলের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তার সুমহান মাগফিরাত এবং বিরাট প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"[১২৮]

ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ের অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। আপরাধী হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান এবং উভয়েই সমভাবে শাস্তি ভোগ করবে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "যারা অবিশ্বাস করবে ও আল্লাহর আয়াতসমূহে অসত্যারোপ করবে তাদেরকে সর্বদা দোযখে রাখা হবে।"[১২৯] "যারা আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভয় করে না তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[১৩০] কোন পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তাদের জন্য ইসলামে একই ধরণের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "ব্যভিচারী নারী-পুরুষ প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহ তা'য়ালার বিধান কার্যকরণের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভুত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও।"[১৩১] আবার একজন পুরুষ বা নারীর চুরি করলে উভয়ের জন্য একই ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে, "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদ কর। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১৩২] আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "ঈমানদার পুরুষদেরকে আপনি বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর ঈমানদার নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে।"[১৩৩] এই আয়াতে নারী আর পুরুষদেরকে সমভাবে আল্ল-াহপাক নির্দেশ দান করেছেন। সুতারাং একথা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধী নারী বা পুরুষ যেই হোকনা কেন উভয়ের শাস্তির বিধান ইসলামে সমান।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করে পৃথীবিতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং এই প্রতিনিধিত্ব যেন মানুষ সহজভাবে করতে পারে সেজন্য তাদেরকে বিধান দান করেছেন। তাই সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজের নিষেধ করা এই গুরুত্ব দায়িত্ব পালন করা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, "মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ একে অপরের সহযোগী। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ রহম করবেন। আল্লাহ পরক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[১৩৪] আল্লাহ বলেন, "তোমারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদের আর্বিভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।"[১৩৫]

আল কুর'আনের এ নির্দেশ দ্বারা বোঝা যায় যে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথ দেখানো। হযরত আবু হুযায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স.) বলেন, যার হাতে আমার

---

[১২৭]. আল কুর'আন, **সূরা আল আহযাব**, আয়াতঃ ৩৫।
[১২৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল আহযাব**, আয়াতঃ ৩৫।
[১২৯]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ৩৯।
[১৩০]. আল কুর'আন, **সূরা আল ইমরান**, আয়াতঃ ১৭৭।
[১৩১]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াতঃ ২।
[১৩২]. আল কুর'আন, **সূরা আল মায়েদাহ**, আয়াতঃ ৩৮।
[১৩৩]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াতঃ ৩০-৩১।
[১৩৪]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাওবাহ**, আয়াতঃ ৭১।
[১৩৫]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ, তার শপথ তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।[১৩৬]

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই আইনের সুবিচার লাভের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই আইন ভারসাম্যপূর্ণ। তাই এই আইন বাস্তবায়িত হলে নারীর পরিপূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৩৭] আল কুর'আনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "হে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা! আইনভিত্তিক বিচারব্যবস্থা শাণিতভাবে কার্যকর হওয়াতেই তোমাদের জীবন নিহিত।"[১৩৮]

শরী'আতের একটি সামগ্রিক স্থায়ী নীতি হলো অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা। আর সে অপরাধী যদি হত্যাকারী হয় তাহলে ইসলামে তার জন্য সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে হত্যাকারী নারীকে হত্যা করেছে না পুরুষকে হত্যা করেছে তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ একজন পুরুষের প্রাণবধ করা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি একজন নারীর প্রাণবধ করা নিষিদ্ধ। তাই হত্যাকারী নারী হোক বা পুরুষ হোক হত্যাপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার প্রাণ হরণ করা হবে; নিহত ব্যক্তি পুরুষ কিংবা নারী হোক।[১৩৯]

নবী (স.) ইয়ামানবাসীদের জন্য যে সব আইন লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, "কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।"[১৪০]

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইয়াহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে (প্রস্তারাঘাতে) যখম করল এবং বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার এ অবস্থা কে করল? অমুক অথবা অমুক? তার সামনে কতিপয় লোকের নাম বলা হলো এমনকি সেই ইয়াহুদীটির নাম বলা হলো, (তখন সে একমত হলো)। ইয়াহুদীকে নবী (স.) এর কাছে আনা হলো এবং নবী (স.) তাকে ততক্ষণ প্রশ্ন করতে থাকলেন যতক্ষণে সে (অপরাধ) স্বীকার করল। অত:পর দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে তার মাথাও যখম করা হলো।[১৪১]

জীবনের সব রকম তৎপরতা ও উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। উভয়ে মিলে জীবনের কঠিন ভার বহন করেছে এবং উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। মানুষের এ দুটি শ্রেণীর কোনটিকেই কোন জাতির আন্দোলন কোনদিনই গুরুত্বহীন মনে করতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের প্রচার ও প্রসার এবং তার বিজয় লাভ ও প্রভাব বিস্তারে নারী ও পুরুষকে যেমন পাশাপাশি অবদান রাখতে দেখা যায় ঠিক তেমনি বাতিলের উন্নতি ও শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও তারা সমানভাবে অংশীদার হয়ে থাকে।[১৪২] এ প্রসঙ্গে আল কুর'আনের ইরশাদ হয়েছে, "মুনাফিক[১৪৩] পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের

---

১৩৬. **মিশকাত**, পৃঃ ৪৩৬।

১৩৭. মাওলানা আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

১৩৮. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ১৭৯।

১৩৯. মাওলানা আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

১৪০. **আহসানুল কুবরা**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২।

১৪১. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, দিয়াত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হত্যাকারীদের স্বীকৃতি প্রদান পর্যন্ত প্রশ্ন করা (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন, ২০০১), ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২২১।

১৪২. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, অনুবাদঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃঃ ৫৫।

১৪৩. মুনাফিকঃ 'নিফাক' শব্দের অর্থ কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব পোষণ করা, ধোকাবাজী, ভন্ডামী ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় অন্তরে কুফরী রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাওয়ার লোভে মুখে ঈমানদার সুলভ কথা বলা ও লোক দেখানো অনুষ্ঠান পালন করাকে নিফাক বলে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে তাকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকরা ইসলামের ভয়ানক ক্ষতি সাধিত করে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়, মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে, আর তুমি তাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে কাউকেও পাবে না। (আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১৪৫)। রাসূল (স.) মুনাফিকদের পরিচয় বা চেনার উপায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর

Dhaka University Institutional Repository

প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। এই মুনাফিকরাই নিঃসন্দেহে 'ফাসেক'[১৪৪]।"[১৪৫] আবার পবিত্র কুর'আনে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, "মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মেয়ে লোক এরা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।[১৪৬]

পরিশেষে বলা যায় উপরোক্ত বিষয়গুলিতে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে যে সমতা বিধান করেছেন তার মাধ্যমে নারী প্রগতির এক বিশাল দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে তার সঠিক প্রয়োগ করে নারী তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে বাধা প্রদান করার এখতিয়ার কারো নেই। এটাই নারী জীবনের সবচেয়ে বড় প্রগতি। এই প্রগতির সুযোগ ব্যবহার করে নারী, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা জীবনে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভূত কল্যাণ সাধিত করতে পারে। সর্বোপরি তার উপর অর্পিত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে। এর ফলে নারী ও সমাজ উভয়েই সমভাবে উপকৃত হবে।

(রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সেই মুনাফিক। **এক.** তার কাছে আমানত রাখলে খেয়ানত করে, **দুই.** সে কথা বললে মিথ্যা বলে. **তিন.** সে প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে. **চার.** সে ঝগড়ারত অবস্থায় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারী, **সহীহ বুখারী**, ঈমান অধ্যায়, মুনাফিকদের আলামত অনুচ্ছেদ, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, মে ১৯৯১, ৪র্থ সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৬)।

[১৪৪]. ফাসেকঃ ফাসেক আরবী শব্দ, এর অর্থ খোদার নির্দেশ অমান্যকারী, তার আনুগত্যের সীমা লংঘনকারী।

[১৪৫]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাওবা**, আয়াতঃ ৬৭।

[১৪৬]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাওবা**, আয়াতঃ ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামে নারীর ব্যক্তিত্ব

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব-অনারব তথা বিশ্বের সমস্ত জাতির দৃষ্টিতেই নারীরা ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও শোষিত। পরবর্তীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদেরকে এই অধস্তন ও অধপতিত অবস্থা থেকে মুক্তি দান করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে বিভিন্নরকম অধিকার ও মর্যাদা দান করেছেন। মূলতঃ ইসলাম নারীদেরকে যে সকল অধিকার দিয়েছে তা নারীর ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। কুর'আন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

আল কুর'আনের আলোকে

পবিত্র কুর'আনে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পুরুষের পাশাপাশি আল্লাহ তা'য়ালা নারীকেও সম্বোধন করেছেন। নারীর ব্যক্তিত্ব রক্ষার তাগিদ প্রদান করে পবিত্র কুর'আনে যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- রাত্রির শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে এবং দিনের শপথ যখন তা উদ্ভাসিত হয় আর শপথ সেই মহান সত্তার যিনি নারী ও পুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। রাত্রি ও দিনের মতই তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টাও নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্রকৃতির।[১৪৭]
- যখন আমি আদমকে বললাম, দেখ এ শয়তান কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে। এখানে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না। আর এখানে পিসাসার্তও হবে না এবং রোদের উত্তাপে কষ্টও পাবে না। কিন্তু শয়তান আদমকে কুমন্ত্রণা দিল। সে আদমকে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা বলব? শেষ পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করল; সাথে সাথেই জান্নাতী পোশাক ঝরে পড়ায় তারা পরস্পরের সামনে বিবস্ত্র হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বিকল্প হিসেবে জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। ফলে সে বিভ্রান্ত হলো। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। তার তওবা কবুল করলেন ও হেদায়াত দান করলেন। বললেন, তোমরা ও শয়তান একই সংগে জান্নাত থেকে নেমে যাও। শয়তান ও তোমরা পরস্পরের চির দুশমন। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াতের বাণী এলে যে আমার সে হেদায়াতের অনুসরণ করবে, সে বিভ্রান্ত হবে না এবং দুর্ভোগেও পতিত হবে না।'[১৪৮]

বিভিন্ন বর্ণনায় প্রথম নারী হযরত হাওয়ার (আঃ) প্রতি দোষারোপ করা হয়ে থাকে যে, নিষিদ্ধ গাছের ফল হযরত হাওয়া (আঃ) এর প্ররোচণাতেই হযরত আদম (আঃ) ভক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন মজীদের বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে সেগুলি খন্ডন করা হয়েছে। আল কুর'আন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, হযরত হাওয়া (আঃ) কে নয়, বরং আদমকেই শয়তান প্রথমে প্রভাবিত করেছিল।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী ও পুরুষকে স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এবং উভয়ের অধিকারও স্বতন্ত্র। নারীর ব্যক্তিত্ব ও অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ধন-সম্পদ দ্বারা কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।"[১৪৯]

---

[১৪৭]. আল কুর'আন, **সূরা আল লাইল**, আয়াতঃ ১-৪।
[১৪৮]. আল কুর'আন, **সূরা ত্বা-হা**, আয়াতঃ ১১৭-১২৩।
[১৪৯]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

- হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তমও হতে পারে। আর কোন বিদ্রুপকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানদারদের পক্ষে অন্যকে মন্দ নামে সম্বোধন করা ফসেকী কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করবে না তারাই জালেম।[১৫০]
- আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) কোন বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোন মুমিন নর-নারীর পক্ষেই তার বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-এর ফায়সালার বিরুদ্ধাচরণ করে ভিন্নমত পোষণ করলে সে নির্ঘাত পথভ্রষ্ট হবে।[১৫১]
- তারাই তো কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিয়েছে, এমনকি কুরবানীর পশুগুলোকেও কুরবানগাহে নিতে দেয়নি। মক্কা নগরীতে যদি মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকদের বিরাট সংখ্যক না থাকত, যাদের ঈমান আনার ব্যাপারে তোমরা কল্পনাও করতে পার না এবং অজ্ঞতাবশত তাদেরকেও নিঃশেষ করার কারণে সমূহ ক্ষতি ও বদনামের আশংকা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি দিতেন। যুদ্ধের অনুমতি না দিয়ে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আর মক্কার সে পরিবেশে মুমিনরা যদি আলাদা থাকত, তাহলে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে তোমাদের দ্বারা কাফেরদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতেন।[১৫২]
- যারা হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি ক্ষুদ্র দল। এ ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকরই হবে। যারা এ ব্যাপারে যত বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করেছে, তারা ততই গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়ানক আযাব। তোমরা যখন এ অপবাদের কথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে কেন সৎ ধারণা করতে পারলে না? তোমরা কেন তাকে একটি নিছক অপবাদ বললে না?[১৫৩]
- সুতরাং হে নবী, ভাল করে জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। কাজেই নিজের ত্রুটি ও মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর গুনাহ-খাতার জন্য আল্লাহর দারবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা ও গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন।[১৫৪]
- নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারী নারী এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষদের ও সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণকারী নারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।[১৫৫]
- নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম দান করে তাদের সওয়াবকে কয়েকগুণ বেশী করে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।[১৫৬]
- আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ওয়াদা করেছেন জান্নাতের, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটিই মহা সাফল্য।[১৫৭]

---

[১৫০]. আল কুর'আন, **সুরা আল হুজরাত,** আয়াতঃ ১১।
[১৫১]. আল কুর'আন, **সুরা আল আহযাব,** আয়াতঃ ৩৬।
[১৫২]. আল কুর'আন, **সুরা আল ফাতহ,** আয়াতঃ ২৫।
[১৫৩]. আল কুর'আন, **সুরা আন নুর,** আয়াতঃ ১১-১২।
[১৫৪]. আল কুর'আন, **সুরা মুহাম্মদ,** আয়াতঃ ১৯।
[১৫৫]. আল কুর'আন, **সুরা আল আহযাব,** আয়াতঃ ৩৫।
[১৫৬]. আল কুর'আন, **সুরা আল হাদীদ,** আয়াতঃ ১৮।
[১৫৭]. আল কুর'আন, **সুরা আত তওবা,** আয়াতঃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

- এটা এজন্য যে, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে চিরকাল বসবাসের উদ্দেশ্যে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করান হবে যার তলদেশে চির প্রবাহমান নহরসমূহ থাকবে এবং তিনি তাদের সমস্ত দোষ তাদের থেকে দূর করে দেবেন। এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মুমিন পুরুষ ও নারীর মহা সাফল্য।[১৫৮]
- সেদিন যখন তোমরা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে ধাবিত হবে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে এবং যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহা সাফল্য।[১৫৯]
- এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারাই আল্লাহর প্রভুত্বের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। সত্যিকার অর্থে তারাই অমংগল চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। আল্লাহ তাদের উপরে রাগান্বিত হয়েছেন, যা তাদের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট আবাস।[১৬০]
- আল্লাহর নির্দেশিত জীবন বিধান প্রত্যাখ্যানের পরিণাম হলো এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর তওবা কবুল করবেন। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল।[১৬১]
- সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা ঈমানদারদের কাকুতি-মিনতি করে বলবে, আমাদের জন্য একটু থাম যাতে তোমাদের আলো থেকে কিছুটা গ্রহণ করতে পারি। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। তারপর তাদের মাঝখানে একমাত্র দরজা বিশিষ্ট একটা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, তার ভিতরে থাকবে আল্লাহর রহমত এবং বাইরে কঠিন আযাব।[১৬২]

সুতরাং পবিত্র কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতাবলী থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং উভয়কেই তার ব্যক্তিগত কর্মের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

আল হাদীসের আলোকে

আল্লাহ তা'য়ালা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা তাদের একজনকে অপরজন থেকে পৃথক করে রাখে। তাই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের দায়িত্ব সকল নারী ও পুরুষের। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। পুরুষের নারীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা বা নারীর পুরুষের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা দোষনীয়। কোন নারীর পুরুষের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা একদিকে যেমন আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনের প্রচেষ্টা, তেমনি অন্যদিকে তা স্বচ্ছ অনুভূতির অভাবেরই নামান্তর। নারীর বৈশিষ্ট্যের এই পার্থক্যটি বজায় রেখে নারী তার উপর অর্পিত মৌলিক দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন করে। নিম্নে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করা হলোঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব পুরুষ নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যেসব নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স.) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।"[১৬৩]

---

[১৫৮]. আল কুর'আন, **সুরা আল ফাতহ**, আয়াতঃ ৫।
[১৫৯]. আল কুর'আন, **সুরা আল হাদীদ**, আয়াতঃ ১২।
[১৬০]. আল কুর'আন, **সুরা আল ফাতহ**, আয়াতঃ ৬।
[১৬১]. আল কুর'আন, **সুরা আল আহযাব**, আয়াতঃ ৭৩।
[১৬২]. আল কুর'আন, **সুরা আল হাদীদ**, আয়াতঃ ১৩।
[১৬৩]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের পোশাকের সাথে মহিলাদের পোশাকের সামঞ্জস্য, ১২তম খন্ড, পৃঃ ৪৫২।

Dhaka University Institutional Repository

হুযাইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আবনে আস (রা:) কে আমি দেখেছি। তাঁর গৃহ ছিল 'হিল' এর মধ্যে। অর্থাৎ হারাম শরীফের সীমানার বাইরে। আর তাঁর মসজিদ ছিল হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে। তিনি বলেছেন, একদা আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আবু জেহেলের কন্যা উম্মে সা'ঈদকে ধনুক গলায় ঝুলিয়ে পুরুষের মত হাঁটতে দেখলেন। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, এই মেয়েটি কে? আমি বললাম, এ হচ্ছে আবু জেহেলের কন্যা উম্মে সা'ঈদ। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, "যে নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যে পুরুষ নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।"[১৬৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এমন পুরুষ ও নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, যে পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করে এবং যে নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করে।"[১৬৫]

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলি তার দৈনন্দিন কর্মকান্ড এবং অনুশীলনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এই অনুশীলন যদি পূর্ণভাবে না করা হয় তাহলে অপরের বৈশিষ্ট্য অনুসরনের ফলে নিজস্ব স্বকীয়তা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করলে যেমন আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত ও রসূল (স.) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটে, ঠিক তেমনি নারী-পুরুষের মধ্যকার আচরণগত পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। এরফলে নারীর সাধারণ মানবিক গুণাবলী পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা তাকে পুরুষের সাথে মিলেয়ে দেয় এবং সে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্তরের মানুষে পরিণত হয়ে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে। এবং তার ইচ্ছা ও আশা-আকাংখার স্বাধীনতা খর্ব হয়। সে কোন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পরিণত হয় এক অক্ষম নিজীব সৃষ্টিতে। তাই সমাজে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে পরিচিত করে তোলার জন্য ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই তার ব্যক্তিত্বের জন্য সুদৃঢ় ফলক ও অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে।[১৬৬]

রাসূল (স.) এর সময়ে নারী ব্যক্তিত্বের প্রশংসনীয় ভূমিকা

নিম্নে ইসলামের জন্য নারীদের এমন কিছু ভূমিকার অবতারণা করা হলো যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীরা মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হতে এবং বহুবিধ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

পূর্ণতা অর্জনের আকাংখা: হযরত আতা ইবনে রিবাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা:) একদা আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতি মহিলা দেখিয়ে দেব? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটিকে দেখ। একবার সে রসুলুল্লাহর (স.) দরবারে এসে আরজ করলে, আমার মৃগীরোগ আছে। আমি আমার অজ্ঞাতে শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশিত হওয়ার আশংকা করি। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে একটু দোয়া করুন। রসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি চাইলে ধৈর্য ধরতে পার। এতে তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর তুমি চাইলে আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য দোয়াও করতে পার। সে বলল, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে আরো বলল, আমি শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করুন, যাতে আমার সতর খুলে না যায়? তিনি তার জন্য সেই দোয়াই করলেন।[১৬৭]

---

[১৬৪]. আল্লামা হাইসামী, **মাজমাউয যাওয়ায়েদ**, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১০২।
[১৬৫]. **সুনানে আবি দাউদ**, পোশাক অধ্যায়, মহিলাদের পোশাক অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৫।
[১৬৬]. আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা, ১ম খন্ড, (ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ও ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫), পৃ: ৩৭১।
[১৬৭]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, রোগব্যাধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: অতি দ্রুত সেবার জন্য এগিয়ে আসার ফযিলত, ১২ তম খন্ড, পৃ: ২১৮; **সহীহ মুসলিম**, সদাচার, সুসম্পর্ক এবং সদ্ব্যবহার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধারণ করা মুমিনের জন্য সওয়াবের কাজ, ৮ম খন্ড, পৃ: ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদতের প্রতি আগ্রহ: আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স.) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দুই থামের মাঝখানে একটি রশি বাধা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের রশি? সকলে বলল, এটা যয়নাবের রশি। সালাত আদায়ের মাঝে ক্লান্তি এসে গেলে সে তাতে ঝুল খায়। তিনি বললেন, না এটা খুলে ফেল। আমাদের উচিত ক্লান্তিহীন সময়টুকুতে সালাত আদায় করা, আর ক্লান্তি এসে গেলেই বসে পড়া উচিত।[১৬৮]

উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন বাইতুল্লাহ শরীফে হেঁটে যাওয়ার মানত করলেন। এরপর আমাকে বললেন এ ব্যাপারে নবী (স.) এর নিকট থেকে সমাধান চেয়ে নিতে। তাই আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, সে যেন কিছু পথ পায় হাঁটে ও কিছু পথ (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করে।[১৬৯]

উল্লেখিত হাদীসসমূহে মেয়েদের বিভিন্ন ইবাদতে প্রবৃত্ত হওয়ার সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। এটা তো প্রশংসণীয় কাজ। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক রসূলুল্লাহ (স.) এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

সাদকাহ ও অর্থদান: আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বের হয়ে সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতেন। সালাত ও সালাম শেষ করে তিনি নামাযের স্থানে বসে থাকা লোকদের কাছে এগিয়ে আসতেন। প্রয়োজনীয় কোন কথা স্মরণ হলে বলতেন। কোন দরকারী বিষয় থাকলে আদেশ করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা সাদকাহ করো। তোমরা সাদকাহ করো। সাদকাহ করো। আর সাদকাহ করতেন বেশীর ভাগ মহিলারাই।"[১৭০]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ঈদুল ফিতরে উপস্থিত ছিলাম। ...অতপর পুরুষদের সারি ভেদ করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের পর্যন্ত পৌছলেন। তার সাথে ছিলেন বিলাল (রাঃ)। রাবী বলেন, ...তাদের অনেকেই দান করল। এরপর বিলাল (রাঃ) তার চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এসে দেখ, আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক! এই মহিলারা বিলালের চাদরের উপর তাদের আংটি ও বাজুবন্দ নিক্ষেপ করেছে।"[১৭১]

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) সাদকার ক্ষেত্রে বলেছেন, ঐ সকল মহিলার অগ্রগামিতা, সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের অলংকারাদি দান করা ইত্যাদি থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, দীনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল সুউচ্চ এবং রসূল (স.) এর নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রতিও তাদের তীব্র আকাংখা ছিল।[১৭২]

পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর: আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে বসা ছিলাম এমন সময় এক মহিলা এসে তাকে বলল, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম, এখন তিনি মারা গেছেন। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ তোমার দানের প্রতিদান অবধারিত। আর উত্তরাধিকার হিসেবে তুমি তা ফেরত পাবে। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তার এক মাসের রোযা বাকী আছে, আমি কি তা আদায় করব? তিনি বললেন, তা আদায় কর। সে বলল, তিনি কখনও হজ্জ করেননি, তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।[১৭৩]

---

[১৬৮]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, তাহাজ্জুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইবাদত বন্দেগীতে যেসব বাড়াবাড়ি অপছন্দনীয় সংক্রান্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৮; **সহীহ মুসলিম**, মুসাফিরদের কসর নামায সংক্ষিপ্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ তন্দ্রায় নিমগ্ন নামাযী ব্যক্তির নামাযের বিধি-বিধান, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৯।

[১৬৯]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পদব্রজে হজ্জ করার জন্য মানতকারীর মাসয়ালা, ৪র্থ তম খন্ড, পৃঃ ৪৯১; **সহীহ মুসলিম**, মানত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পদব্রজে কাবা শরীফে যাওয়ার মানতকারীর মাসয়ালা সংক্রান্ত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৭৯।

[১৭০]. **সহীহ মুসলিম**, দুই ঈদ অধ্যায়, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২০।

[১৭১]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ঈদের দিনে মহিলাদের উদ্দেশে ইমামের নসিহত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১২০; **সহীহ মুসলিম**, দুই ঈদের নামায, অনুচ্ছেদঃ ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৯।

[১৭২]. **ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১২১।

[১৭৩]. **সহীহ মুসলিম**, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি রোযা কাযা করে মারা যায় তার সংক্রান্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমার মা মানতের রোযা রাখার আগেই ইন্তিকাল করেছেন, এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মা কারো কাছে ঋণী থাকত, তাহলে তুমি তা পরিশোধ করে দিলে তা কি পরিশোধ হতো? সে বলল, হ্যা তাতো হত। তিনি বললেন, তাহলে তার পক্ষ থেকে রোযাও রাখ।[১৭৪]

বিপদে ধৈর্য ধারণঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হারেসা শহীদ হলেন। সে ছিল কিশোর। তার মা রসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হারেসা আমার হৃদয় কতটা দখল করে ছিল তা আপনি জানেন। তার স্থান যদি জান্নাতে হয় তবে আমি ধৈর্য্য ধারণ করব এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাইতে থাকব। আর যদি অন্যরকম হয়, তাহলে বলুন আমি কি করব? অপর এক বর্ণনায় আছে, এ ছাড়া ভিন্ন কিছু হলে, আমি কেঁদে শেষ হয়ে যাব।[১৭৫] তিনি বললেন, দুর! অথবা বললেন, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? জান্নাত কি মাত্র একটি? জান্নাত তো অনেক। আর হারেসা "ফিরদাউস নামক জান্নাতে রয়েছে।[১৭৬]

নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকারঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, একদা এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট এসে বলল, আল্লাহর শপথ, আপনি আল্লাহর বিধান অনুসারে আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন কি? তারপর তার বিবাদী পক্ষের লোকটি উটে দাড়াল। সে ছিল তার (বাদীর) চেয়ে জ্ঞানী। সে বলল, আমি সত্য বলছি আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করুন এবং হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি বল! তখন সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির বাড়িতে মজুদ ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। তারপর আমি তার ফিদিয়া স্বরূপ একশত বকরী দান করেছি এবং একটি গোলাম আজাদ করেছি। এ সম্পর্কে বিজ্ঞদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা জানালেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হল একশত বেত্রাঘাতসহ এক বৎসরের নির্বাসন এবং এই মহিলার শাস্তি হল প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে দেব। তোমার প্রদত্ত ফিদিয়া ও একশত বকরী এবং গোলামটি তুমি ফেরত পাবে। তোমার ছেলের শাস্তি হল একশত বেত্রাঘাতসহ এক বৎসরের নির্বাসন।[১৭৭]

পাথর নিক্ষেপের শাস্তি গ্রহণ করে পবিত্রতা অর্জনের আকাংখাঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা জুহাইনা গোত্রের জনৈকা মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে নবী (স.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি দন্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, তাই আমাকে দন্ডিত করুন। নবী করীম (স.) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং সে সন্তান প্রসব করলে তাকে নিয়ে আমার এখানে এসো। সে তাই করল। মহিলাকে কাপড় দিয়ে ঢেঁকে ফেলা হল। তারপর নবী (স.) এর আদেশক্রমে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল এবং তার জানাযা পড়া হল। তখন উমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আপনি এই যিনাকারী মহিলার জানাযা পড়লেন? তিনি বললেন, সে এমন তওবা করেছে, যা মদীনার সত্তর জন লোকের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের ক্ষমার জন্য তা যথেষ্ট হত। সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। এর চেয়ে উত্তম তওবা কি তুমি করেছ।"[১৭৮]

---

[১৭৪]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি রোযা কাযা করে মারা যায় তার সংক্রান্ত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৯৮; **সহীহ মুসলিম**, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা রোযা আদায় সংক্রান্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৫৬।

[১৭৫]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কোন অজানা দিক থেকে তীর এসে কোন ব্যক্তির গায়ে লাগল এবং তাকে নিহত করলো, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৬৬।

[১৭৬]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, যুদ্ধ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বদরের শহীদদের মর্যাদা, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩০৬।

[১৭৭]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, শাস্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইমামের অনুপস্থিতিতে কি কোন ব্যক্তিকে তার শাস্তি প্রদান করা যায়? ১৫তম খন্ড, পৃঃ ২০৩; **সহীহ মুসলিম**, শাস্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ব্যভিচারী যদি স্বতঃস্ফুর্তভাবে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয়, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১২১।

[১৭৮]. **সহীহ মুসলিম**, শাস্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ব্যভিচারী যদি স্বতঃস্ফুর্তভাবে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয় তার বিচার, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) এর সময়ে নারীর ব্যক্তিত্ব ও অধিকার রক্ষার দাবী

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) মাথা আচড়িয়ে নিচ্ছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন রসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরে দাড়িয়ে বলছেন, "হে মানব মন্ডলী! তখন তিনি যে মেয়েটি তাঁর মাথা আচড়ে দিচ্ছিল তাকে বললেন, তুমি সরে যাও। মেয়েটি বলল, রসূলুল্লাহ (স.) তো পুরুষদেরকে সম্বোধন করেছেন, তিনি মহিলাদের সম্বোধন করেননি। তখন উম্মে সালামা বললেন, আমি মানব মন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত।[১৭৯]

শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রসূলুল্লাহর (স.) কাছে মেয়েদের দাবীঃ আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রসুলুল্লাহর (স.) খিদমতে হাজির হয়ে বলল হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাদীস পুরুষরা নিয়ে গেল। [অন্য বর্ণনায় আছে,[১৮০] মহিলারা রসূলুল্লাহর (স.) খিদমতে হাজির হয়ে বলেছিলেন, আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক।] সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হব। জবাবে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে। তারা সমবেত হলে রসূলুল্লাহ (স.) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম হবে। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি দুটি হয়? বর্ণনাকারী বলেছেন, মহিলা একথাটি দু'বার বললে রসূলুল্লাহ বললেন, দুই ,দুই।"[১৮১] হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন,.......এ হাদীসে মহিলা সাহাবীদের দীনি ইলম অর্জনের অধিক আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮২]

সুতরাং মসজিদে নববীতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা রসূলুল্লাহর (স.) মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করাই যথেষ্ট মনে করতেন না বরং তাদেরকে আলাদাভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (স.) এর কাছে আবেদন পেশ করতেন। রসুলুল্লাহ (স.) নারীদের গভীর আগ্রহ অনুধাবন করে তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে দাবী পুরণ করতেন।

দীনি ইলম অর্জনে আসমা বিনতে শাকাল (রাঃ) লজ্জাশীলতার উপর বিজয়ী হলেনঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে শাকাল (রাঃ) ঋতুবর্তী মহিলার গোসল সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এজন্য তোমরা প্রয়োজনীয় পানি ও এক টুকরা কাপড় কিংবা তুলা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে ডলবে, যাতে পানি মাথার সব জায়গায় প্রতিটি চুলের গোড়ায় পৌছে যায়। এরপরে আবার পানি ঢালবে। এরপর মিশক (সুগন্ধি) যুক্ত কাপড় বা তুলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা (রাঃ) বললেন, এ কাপড় বা তুলা দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মনে হচ্ছিল যেন আসমা ব্যাপারটা গোপন করছে। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি এ কাপড় দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। তুমি রক্তের দাগগুলি মুছে নেবে।

আসমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (স.) কে সহবাস পরবর্তী গোসলের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পানি নিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে উত্তমরূপে ডলবে যাতে মাথার সর্বত্র প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌছায়। তারপরে আবার পানি ঢালবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

---

[১৭৯]. **সহীহ মুসলিম,** ফাযায়েল অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ রাসূল (স.) এর জন্য হাউযে কাওছার নির্দিষ্ট হওয়া ও তার পরিচিতি, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৬৭।

[১৮০]. বুখারী, **সহীহ বুখারী,** ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের জন্য কি একদিন নির্দিষ্ট করেছেন? ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৬।

[১৮১]. বুখারী, **সহীহ বুখারী,** কুর'আন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী (স.) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ তাঁকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই কোন কাটছাঁট না করে বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়ই শিক্ষা দিয়েছেন, ১৭তম খন্ড, পৃঃ ৫৫; **সহীহ মুসলিম,** শিষ্টাচার ও আত্মীয়দের সাথে সদাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

[১৮২]. **ফাতহুল বারী,** ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

আনসারী মহিলাগণ কতইনা ভাল, লজ্জাশীলতা তাদের দীনি ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।"[১৮৩]

খাসআম গোত্রীয় যুবতী মহিলা[১৮৪] তার পিতার হজ্জ আদায়ের মাস'আলা জানান জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন: "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) কুরবানীর দিন তার বাহনের পশ্চাতভাগে ফযল ইবনে আব্বাসকে বসিয়েছিলেন। ......এমন সময় খাসআম গোত্রীয় জনৈকা সুন্দরী মহিলা রসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতার উপরে এমন বার্ধক্যে হজ্জ ফরয হয়েছে যে, বাহনের পিঠে বসার মত ক্ষমতা তার নেই। আমি যদি তার তরফ থেকে হজ্জ করি তাহলে তা কি আদায় হবে? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ।"[১৮৫]

মহিলাটি স্বামী নির্বাচনে তার অধিকার সংরক্ষণ করলেন: খানসা বিনতে খিদাম (রা:) বিবাহে সম্মত না থাকায় অভিযোগ করলেন। "কাসেম থেকে বর্ণিত। জাফর তনয়ের এক কন্যা আশংকা করলেন, তার অসম্মতি সত্ত্বেও অভিভাবক তাকে বিবাহ দেবেন। তখন তিনি এ ব্যাপারে ফায়সালার জন্যে জারিয়াহ তনয় আবদুর রহমান ও মুজাম্মা নাম্নী দুই বয়োবৃদ্ধ আনসারীর (রা:) খেদমতে লোক পাঠালেন। তারা বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। খানসা বিনতে খিদামের ব্যাপারে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। তার পিতা তাকে তার অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (স.) সে বিবাহ বাতিল করে দিয়েছিলেন।"[১৮৬]

রসূলুল্লাহ (স.) এর সুপারিশ সত্ত্বেও বারীরা (রা:) তার অধিকার আকড়ে ধরে থাকলেন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। মুগীছ নামে একজন ক্রীতদাস বারীরার স্বামী ছিল। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, সে বারীরার পিছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছিল। তার অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (স.) আব্বাস (রা:) কে ডেকে বললেন, আপনি বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা আর মুগীছের প্রতি বারীরার অনীহা দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন না? তিনি বারীরাকে বললেন, তুমি যদি পুনরায় তাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে। বারীরা বললেন, এটা কি আপনারা নির্দেশ হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, না। বরং এটা আমার সুপারিশ। বারীরা বললেন, তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।[১৮৭]

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, বারীরার বক্তব্য (আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন?) এ কথার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, বারীরা জানতেন রসূলুল্লাহ (স.) এর আদেশ শিরোধার্য ও অবশ্য পালনীয়। তিনি যখন প্রস্তাব পেশ করলেন, বারীরা তখন ব্যাখা চাইলেন, এটা কি আদেশ যা অবশ্য পালনীয়, না পরামর্শ যা গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা রয়েছে? হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) আরও বলেন, এ হাদীসের মধ্যে আরও শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, যেমন, অবশ্য পালনীয় ব্যাপার ছাড়া পরামর্শদাতার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা বৈধ। যে ব্যাপারে কোন ক্ষতি কিংবা সমস্যা নেই সে ব্যাপারে বিচারকের বাদী-বিবাদীর কাছে দয়া প্রদর্শনের সুপারিশ করা মুস্তাহাব! সুপারিশকারী যত মর্যাদা সম্পন্ন হোন না কেন পরামর্শ গ্রহণ না করলে তাকে তিরষ্কার করতে কিংবা তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে যাবেনা। ....এ হাদীস থেকে বারীরা (রা:) এর উন্নত শিষ্টাচার বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা তিনি সুস্পষ্টভাবে সরাসরি সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং বললেন, তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।[১৮৮]

---

[১৮৩]. **সহীহ মুসলিম**, মাসিক ঋতু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নির্গমন স্থান ধৌত করার প্রাক্কালে মিশ্‌কে আম্বর মিশ্রিত কাপড় বা তুলার টুকরা ব্যবহার উত্তম হওয়া সংক্রান্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ১৭৯।

[১৮৪]. ইমাম আহমদ এর বর্ণনায় এ পরিচিতি এসেছে, **ফাতহুল বারী**, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪৩৮।

[১৮৫]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ পালন, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪৪০; **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করা তার অপারগ থাকাকালে অথবা জীবিত অবস্থায় সংক্রান্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১০১।

[১৮৬]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, প্রতারণা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বিবাহে প্রতারণা, ১৫তম খন্ড, পৃ: ৩৭৩।

[১৮৭]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বারীরাহর স্বামীর পক্ষে নবী (স.) এর সুপারিশ, ১১তম খন্ড, পৃ: ৩২৮।

[১৮৮]. **ফাতহুল বারী**, ১১তম খন্ড, পৃ: ৩৩৪, ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

নারী সর্বোত্তম পুরুষ বাছাই করে তার কাছে নিজেকে পেশ করেছে: সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রসূলূল্লাহ (স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার খেদমতে সমর্পণ করার জন্য এসেছি। (অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার জন্য এসেছি।) ভদ্র মহিলা যখন দেখলেন এ ব্যাপারে রসূলূল্লাহ (স.) কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন তিনি বসে পড়লেন।[১৮৯]

ছাবেত আল বান্নানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস (রাঃ) এর কাছে ছিলাম। তার কাছে তার এক কন্যাও ছিলেন। আনাস (রাঃ) বললেন, একদিন একজন মহিলা রসূলূল্লাহ (স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিল। এ কথা শুনে আনাসের কন্যা বলে উঠলেন, মহিলার লজ্জা কতই না কম! তার কাজটি খুবই জঘন্য, তার কাজটি খুবই নিন্দনীয়। আনাস বললেন, তোমার চেয়ে সে মহিলা অনেক উত্তম। সে রসূলূল্লাহ (স.) এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর খেদমত করার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে।[১৯০]

আতেকা বিনতে যায়েদ (রাঃ) নামাযের জামায়াতে হাজির হওয়ার অধিকার অক্ষুন্ন রাখলেন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাবের সহধর্মিণী ফজর এবং এশার নামাযের জামায়াতে মসজিদে হাজির হতেন। তাকে বলা হলো আপনি নামাযের জন্য বের হচ্ছেন, অথচ আপনি জানেন, উমর (রাঃ) এটা অপছন্দ করেন এবং তার আত্মমর্যাদায় বাঁধে। তিনি জবাব দিলেন, কে তাকে আমাকে নিষেধ করতে মানা করেছে? জবাব দিলেন, রসূলূল্লাহ (স.) এর এই হাদীস তাকে নিষেধ করতে বাঁধা দিয়েছে 'আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাঁধা দিয়োনা'।[১৯১]

অর্থোপার্জনের জন্য নারী কোন কোন পেশার অনুশীলন করেছেন: যয়নাব বিনতে জাহশ স্বহস্তে কাজ করে আল্লাহর পথে তা দান করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলূল্লাহ (স.) নিজের সহধর্মিণী যয়নাবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন।[১৯২] হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার এ বর্ণনা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ যে, হযরত যয়নাব (রাঃ) হস্তশিল্পে খুব পারদর্শী ছিলেন, তিনি চামড়া পাকা করতেন এবং তা সিলাই করে আল্লাহর পথে দান করতেন।[১৯৩]

উম্মে কুলসুম বিনতে আবু মুঈত অল্প বয়স্কা তরুণী হয়েও ইসলাম গ্রহণ করে পরিবার পরিজনের সবাইকে ছেড়ে মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন: রসুলুল্লাহ (স.) এর সাহাবী মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ থেকে বর্ণিত। মুমিন নারীগণ হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন। এদের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ আবু মুঈতও ছিলেন। তিনি তখন তরুণী, সবেমাত্র বিবাহযোগ্য হয়েছিলেন। তার পরিবারের লোকেরা তাকে ফেরত নেয়ার জন্য রসুলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে আবেদন করলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেননি।[১৯৪]

উম্মে হানী (রাঃ) শত্রু সৈন্যকে আশ্রয় দিলেন এবং বাধাদানকারী নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন: উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলূল্লাহ (স.) খেদমতে হাজির হয়ে সালাম দিলাম ....তিনি বললেন, উম্মে হানীকে স্বাগতম। ....আমি

---

[১৮৯]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বিবাহের পূর্বে কনে দেখা, ১১তম খন্ড, পৃঃ ৮৬; **সহীহ মুসলিম**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কুর'আন শিক্ষার মাধ্যমে মোহর পরিশোধ, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৪৩।

[১৯০]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: সৎ ব্যক্তির কাছে বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন মহিলার প্রস্তাব দেয়া, ১১তম খন্ড, পৃঃ ৭৯।

[১৯১]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, জুম'আ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নারী ও ছেলেদেরও কি জুম'আর নামাযে অংশ নিতে হলে গোসল করতে হবে, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪।

[১৯২]. **সহীহ মুসলিম**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কোন মহিলাকে দেখার পর মনে এ ভাবের উদয় হওয়া যে তার স্ত্রী বা ক্রীতদাসী এলে তার সাথে মিলিত হতো-এমনটি দোষনীয় নয়, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২৯।

[১৯৩]. **ফাতহুল বারী**, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৯ ও ৩০।

[১৯৪]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ইসলামের যেসব শর্ত জায়েয, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হুবাইরার ছেলেকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালিব তাকে হত্যা করার কথা বলছেন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।[১৯৫]

হাফসা বিনতে উমর (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) এর ভুল সংশোধন করে দিলেনঃ নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা তৈয়েবার একটি পথে ইবনে সায়েগের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর সাক্ষাত হল। ইবনে উমর তাঁকে এমন কথা বললেন যাতে সে খুব রাগান্বিত হল। এমনভাবে চীৎকার করতে লাগল যে, রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ইবনে উমর (রাঃ) হাফসার (রাঃ) এর কাছে গেলেন। এ খবর তাঁর কাছে আগেই পৌছে গিয়েছিল। তিনি ইবনে উমর (রাঃ) কে বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। ইবনে সায়েদের কাছে তোমার কি দরকার ছিল? তুমি কি জাননা রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ক্রোধ থেকে তো ঐ বস্তুই বেরিয়ে আসে যা তোমাকে ক্রোধান্বিত করবে?[১৯৬]

---

[১৯৫]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, ফারদুল খুমুস অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোক কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৮৩; **সহীহ মুসলিম**, মুসাফিরের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ চাশতের নামায......., ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৮।

[১৯৬]. **সহীহ মুসলিম**, ফিতনা ও কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইবনে সাইয়াদের কথা, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনে বর্ণিত কতিপয় মহীয়সী নারী

ইসলাম নারীকে পূর্ণ অধিকার দিয়ে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এর ফলশ্রুতিতে অনেক মহীয়সী নারী পূর্ণতার শীর্ষে পৌছুতে সক্ষম হয়েছেন। এবং পবিত্র কুর'আনেও সে সকল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর আলোচনা স্থান পেয়েছে। নিম্নে আল কুর'আনে উল্লেখিত কতিপয় মহীয়সী নারীর বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলোঃ

হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)

হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ) হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রথম স্ত্রী এবং নারী কুলের শিরোমণি। এ সম্পর্কে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (স.) বলেছেন, (সেকালের) সমগ্র নারীকুলের মধ্যে ইমরান কন্যা মারয়াম হলেন সর্বোত্তম। আর (একালে) নারীকুলের সেরা হলেন হযরত খাদীজা (রাঃ)।"[১৯৭]

হযরত খাদীজা (রাঃ) এর সাথে যখন রাসূল (স.) এর বিবাহ হয় তখন রাসুল (স.) এর বয়স ছিল ২৫ বছর আর খাদীজা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদীজা (রাঃ) জীবিত থাকাকালে রাসুল (স.) অন্য কোন বিবাহ করেননি। রাসুল (স.) এর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন হযরত খাদীজা (রাঃ) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১৯৮] ইতোপূর্বে হযরত খাদীজা (রাঃ) এর আরো দুইবার বিবাহ হয়েছিল।[১৯৯] হযরত খাদীজা (রাঃ) এর গর্ভে রাসুল (স.) এর দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় শৈশবেই পরলোক গমন করেন। কন্যাদের নাম হযরত ফাতিমা যাহরা (রাঃ), হযরত যয়নব (রাঃ), হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ) ও হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)।[২০০]

প্রথম মুসলমান

হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মুসলমান। কাফিরদের জুলুম অত্যাচারের যখন রাসূল (স.) অতিষ্ট ছিলেন তখন তিনিই ছিলেন রাসুল (স.) এর পরামর্শদাতা ও সান্তনা দানকারী।[২০১] উম্মুল মু'মিনীন

---

[১৯৭]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, ৭ খন্ড, পৃঃ ২৮১, ২৮২; **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রাঃ) বর্ণনা, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩২।

[১৯৮]. ইবন কায়্যিম আল জাওযিয়া, **যাদুল মা'আদ** (মিসরঃ মাতবা 'আ মুসতফাল বাবিল হলবী, ১৯০৫ হিঃ), ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬।

[১৯৯]. আবু হালা ইবন হারার সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। আবু হারার ঔরসে হিন্দ নামক এক পুত্র ও যয়নব নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আবু হালার মৃত্যুও পর 'উতায়্যিক ইবন 'আবিদ এর সাথে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। উতায়্যিক্যের ঔরসে হিন্দ নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উতায়্যিকের মৃত্যুর পর রাসুল (স.) এর সাথে তার তৃতীয় বিবাহ হয়। (শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এইচ এম মুজতবা হোছাইন, **হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন**, ঢাকা : ১৯৯৮ খ্রিঃ/ ১৪১৯ হিঃ, ঢাকা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, পৃঃ ৯৬১)।

[২০০]. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী** (আযমগড়ঃ মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ), ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৪ - ১৮৫।

[২০১]. রাসুল (স.) হযরত খাদীজা (রাঃ) কে কতটা ভালবাসতেন সে প্রসঙ্গে একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য - হযরত খাদীজার মৃত্যুর পর একদিন তার ভগ্নি 'হালা' রাসুল (স.) এর গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) সাথে তার কণ্ঠস্বরের কিছু মিল ছিল। তাই রাসুল (স.) হযরত খাদীজা (রাঃ) এর কথা স্মরণ করতঃ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে উঠলেন- সম্ভবত 'হালা' এসেছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর এটা ভাল লাগল না। তাই তিনি বললেন- আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে বহু ভাল স্ত্রী দান করেছেন এখনও আপনি সেই মৃত বৃদ্ধার কথা ভুলতে পারেন না। রাসুল (স.) বললেন, ভুলতে পারিনি এবং কখনও পারব না। যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতো তখন খাদীজা (রাঃ) আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।। যখন সমস্ত লোক কাফির ছিল তখন খাদীজা ছিল মুসলমান। যখন আমি নিঃসহায় ছিলাম তখন একমাত্র খাদীজাই ছিল আমার সহায়। তার গর্ভ থেকেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন। আল্লাহর শপথ আমি খাদীজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী পাইনি। (ইবন 'আবদুল রব, **আল্ ইস্তীআব**, বৈরুতঃ দারুল জেল, ১৯৫৩ খ্রিঃ ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৪০-৭৪১); বুখারী, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী (স.) এর হযরত খাদিজাকে

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসুল (স.) এর প্রতি সর্বপ্রথম যে অহী অবতীর্ণ হয়। তা ছিল ঘুমের মধ্যে সু স্বপ্নরূপে। অতএব যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ঊষার আলোকের ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তার কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং 'হেরা' গুহায় তিনি নির্জনে সময় অতিবাহিত করেন। তিনি সেখানে একাধারে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন এবং হযরত খাদীজা (রাঃ) দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে তাঁর জন্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে হেরা গুহায় অবস্থানরত অবস্থায়ই হঠাৎ একদিন রাসুল (স.) এর কাছে অহী এলো।"[২০২] ওহী অবতীর্ণের পর রাসূল (স.) ভীত অবস্থায়ই কাঁপতে কাঁপতে গৃহে প্রবেশ করে খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ) কে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর। তিনি তখনই তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে রাসূল (স.) এর অস্থিরতা দুর হলো। তখন খাদীজার কাছে তিনি সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল (স.) বললেন, আমি আমার নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদিজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, কখনো না। আল্লাহ আপনাকে কখনও অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় অনাথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।[২০৩]

হযরত খাদীজা (রাঃ) সর্বাবস্থায় রাসুল (স.) কে সহযোগীতা করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) বলেছেন, "…..যখন সকল মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল, তখন খাদিজা আমার প্রতি ঈমান এনেছিল। সকলে যখন আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তখন খাদিজা আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। সবাই যখন আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন খাদীজাই তাঁর সম্পদ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছিল।"[২০৪]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, …..কখনও আমি রাসূল (স.) কে বলতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই। তখন তিনি বলতেন, হ্যাঁ সে এরূপই ছিল। আর তার গর্ভেই আমার সন্তান সন্ততি হয়েছিল।"[২০৫] ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসুল (স.) বলেছেন, "…..অন্য কোন স্ত্রী থেকে আমি সন্তান লাভ করতে পারিনি, আল্লাহ তাঁর গর্ভেই আমাকে সন্তান দান করেছেন।"[২০৬]

হযরত খাদীজা (রাঃ) এর প্রতি রাসুল (স.) এর ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, তাঁর (খাদীজার) প্রতি ভালোবাসা আমাকে বিশেষ ভাবে দান করা হয়েছে।"[২০৭] আয়েশা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রাঃ) এর জীবদ্দশায় রাসুল (স.) অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করেননি।[২০৮] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজার প্রতি আমার ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা রাসুল (স.) এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি

বিবাহ করা এবং এর ফযীলত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৪০; **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রা. এর ফযীলত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩৪।

২০২. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, অহীর প্রারম্ভ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন বুকাইর (রাঃ), ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪; **সহীহ মুসলিম**, ঈমান অধ্যায়, রাসুল (স.) এর নিকট অহীর প্রারম্ভ অনুচ্ছেদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯৭।

২০৩. প্রাগুক্ত।

২০৪. **ফতহুল বারী**, ৮ খন্ড, পৃঃ ১৩৭।

২০৫. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী করিম (স.) এর হযরত খাদিজাকে বিবাহ করা এবং ফযিলত, ৮ম খন্ড, পৃ : ১৩৭।

২০৬. **ফতহুল বারী**, ৮ম খন্ড, পৃ : ১৩৭।

২০৭. মুসলিম, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩৪।

২০৮. মুসলিম, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করতাম না, অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু (ঈর্ষার কারণ ছিল) রাসুল (স.) প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং প্রায়ই বকরী জবাই করে তা খাদীজার বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।[২০৯]

খাদীজা (রাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম আহমদ (রহ.) এর এক বর্ণনায় আছে, রাসুল (স.) বলেছেন, "খাদীজার চেয়ে উত্তম কোন স্ত্রী আল্লাহ আমাকে দান করেননি।"[২১০] হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স.) বলেছেন, "মারয়াম ছিলেন (পূর্ববর্তী) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর খাদীজা (বর্তমান উম্মতের মধ্যে) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[২১১]

খাদীজা (রাঃ) এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান প্রদর্শন

আবু হুরায়রা (রাঃ) আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরাইল (আঃ) রাসুল (স.) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন তাতে তরকারী কিংবা খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাকে তার রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তা খচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন যেখানে না কোন শোরগোল হবে এবং না কোন কষ্ট ক্লান্তি থাকবে।"[২১২]

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, হযরত খাদীজা (রাঃ) এর সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, চারিত্রিক গুণাবলী সর্বোপরি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নারী জাতিকে গর্বিত ও মর্যাদাশীল করেছে। হযরত খাদীজা (রাঃ) শুধু রাসুল (স.) এর যোগ্য সহধর্মিণীই ছিলেন না বরং তিনি তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম কর্মীও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসুল (স.) তাঁকে যতটুকু স্ত্রী হিসেবে স্মরণ করতেন তার চেয়েও বেশী স্মরণ করতেন প্রথম মুসলমান ও শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে।[২১৩] হযরত খাদীজা (রাঃ) রাসুল (স.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজে রাসুল (স.) এর সহযোগীনী ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন, "খাদীজা (রাঃ) ছিলেন ইসলামের বিশ্বস্ত মন্ত্রী; আর রাসুল (স.) তাঁর নৈকট্যে প্রশান্তি অনুভব করতেন।"[২১৪] এছাড়াও উল্লেখ্য যে, আবু তালিবের গিরি উপত্যকায় মুসলিম জাতি তিন বছর অন্তরীণ[২১৫] থাকার সময় খাদীজা (রাঃ) বণিকদের মাধ্যমে উটের সারি ভরে খাদ্যদ্রব্য এনে মুসলিম সমাজকে সহযোগীতা করেন; যাতে কেউ ক্ষুধার কারণে মৃত্যুবরণ না করে। মুসলিম জাতির খিদমতে তিনি নিজেকে পুরোপুরি আত্ম নিয়োগ করেছিলেন।

---

[২০৯]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী (স.) এর হযরত খাদীজাকে বিবাহ করা এবং এর ফযীলত, ৮ম খন্ড, পৃ : ১৩৬; মুসলিম, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩৪।

[২১০]. **ফতহুল বারী**, ৮ম খন্ড, পৃ : ১৪১।

[২১১]. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, **সহীহ আল বুখারী**, কিতাবুল মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ খাদীজা (রাঃ) এর সাথে রাসুল (স.) এর বিবাহ এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বও ২০০০ খ্রিঃ/ রমযান ১৪২১ হিঃ), ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৮৮।

[২১২]. বুখারী, **সহীহ আল বুখারী**, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৯০।

[২১৩]. হযরত খাদীজা (রাঃ) রাসুল (স.) এর বিপদে সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন। সংকটকালে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। অঢেল সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন। কাফেরদের দেয়া সকল আঘাত তিনি ভুলে যেতেন খাদীজার সান্নিধ্যে এলে। সুতরাং বিবি খাদীজা (রাঃ) রাসুল (স.) কে মায়া মমতা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে, অর্থ সম্পদ দিয়ে, দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে, অভিভাবকের মত ছায়া দিয়ে রেখেছেন। এই আপনজন হিজরতের তিন সাল পূর্বে ইন্তেআল করেন। প্রিয় সাথীর ইন্তিকালে ঐ বছরকে "শোকের বছর" হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে মুসলমানগণ এক বিরাট শক্তিশালী আশ্রয়স্থল এবং আপনজনকে হারান। ইসলামের ইতিহাসে এই মহীয়সী নারীর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। (মুহাম্মদ নুরুযযামান, **সংগ্রামী নারী**, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৭ খ্রিঃ, শাবান ১৪১৭, পৃ : ২৪-২৫)।

[২১৪]. ইমাম বায়হাকী, **দালাইলুন নুবুওয়াহ**, ২য় খন্ড, পৃ : ২২৩।

[২১৫]. ইবন সাইয়্যিদুন নাস, **উয়ূনুল আসার**, ১ম খন্ড, পৃ : ২২২-২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)

রাসুল (স.) এর তৃতীয় এবং বয়সের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ একমাত্র কুমারী স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)।[২১৬] তিনি রাসূল (স.) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের প্রায় আট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) [২১৭] এবং মাতা উম্মে রুম্মান।[২১৮]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বিবাহ

হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) তাকে বলেন, বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার[২১৯] অথবা তিনবার[২২০] তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তুমি একখন্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত। আমাকে বলা হল, ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।"[২২১]

---

[২১৬]. হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রকৃত নাম, ডাক নাম, কুনিয়াত মিলে বেশ কয়েকটি নাম ছিল। বিভিন্ন নামকরনের পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ
১.আয়েশা ২. ছিদ্দিকা ৩. হোমায়রা ৪. উম্মুল মু'মিনীন। এ কয়টি নামে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন।
আয়েশা : এ নামটি পিতা মাতার দেয়া নাম ছিল। তার প্রকৃত নাম ও ডাক নাম এটাই ছিল।
সিদ্দিকা : এ নামকরণের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। যথাঃ একটি অবাঞ্চিত মিথ্যা রটনার কারণে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পবিত্র জীবনে একটি দুর্যোগ ঘটে গিয়েছিল। মুনাফিকরা তার নির্মল চরিত্রে একটি দাগ বসানোর চেষ্টা করেছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাতে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে অভিমানে লজ্জায় এতদুর বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, দেহ, মন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় রাসুল (স.) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আয়েশা! আল্লাহকে স্মরন করে তুমি সত্য কথা বল। সত্য বললে যদি তুমি অন্যায় করেও থাক, তবে তওবা কর আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করবেন। জবাবে আয়েশা (রাঃ) বললেন, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকল কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী আল্লাহ আমার সাক্ষী। নিশ্চয় আমি সত্য কথা বলব। কিন্তু নিন্দুকগণ কি আমার কথাকে সত্য বলে জানবে? তেমন তো মনে হয় না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর মতই আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকব। আল্লাহর পক্ষ থেকেই আমার ব্যাপারে সত্য প্রকাশ হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর এরূপ উক্তির সাথে সাথে ফেরেশতা জীবরাঈল (আঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পবিত্রতার ঘোষণা সহকারে অহী নিয়ে হাজির হলেন। রাসুল (স.) এতে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, "আয়েশা তোমার মহান পিতা আবু বকর (রাঃ) সিদ্দীক। আজ দেখলাম তার কন্যা আয়েশাও সিদ্দিকা।" রাসুল (স.) এর এরূপ মন্তব্য করার পর থেকেই আয়েশা (রাঃ) এর এই সিদ্দিকা নামটি প্রচারিত হয়ে যায়।

হোমায়রা : হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হোমায়রা নামকরণের কারণটি ছিল তাঁর দেহের বর্ণ ছিল লাল গৌরবর্ণ। এ কারণে রাসুল (স.) তাকে অনেক সময়ই আয়েশা না ডেকে হোমায়রা নামে সম্বোধন করতেন। হোমায়রা একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ লাল বর্ণ রমণী।

উম্মুল মু'মিনীন : এ নামটি প্রচারিত হওয়ার ঘটনাটি ছিল ইসলামের একান্ত প্রাথমিক অবস্থায় যখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি; তখনকার কোন একদিন রাসুল (স.) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে কথা বার্তা বলছিলেন। এমন সময় সাহাবী দাহিয়া কালবী এসে রাসুল (স.) এর কাছে বসে পড়লেন এবং নবী দম্পতির আলাপ আলোচনা শুনতে লাগলেন। এবং বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.) আপনার পরলোক গমনের পর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে হযরত আয়েশাকে আমি বিয়ে করব। কেননা আপনার অবর্তমানে তার বৈধব্য দশা আমি সহ্য করতে পারবনা। বরং আমি তাকে বিয়ে করে বিধবা বেশ ধারণ করা থেকে বিরত রাখব। দাহিয়া কালবীর এই কথা শুনে রাসুল (স.) মৃদু হেসে কি কথা যেন বলতে চেষ্টা করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা জীবরাঈল (আঃ) এসে শুনিয়ে দিলেন, "আল্লাহর নবী মুমীনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নবীর সহধর্মিনীগণ তাদের কাছে উম্মাহাতুল মুমিনীন" (অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়) অতএব তোমাদের জন্য সিদ্ধ নয় যে, নবীর অবর্তমানে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে। সেদিন থেকে নবী সহধর্মিনীগণকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন নামে সম্বোধন করা হয়।

[২১৭]. ইসলামের প্রথম খলিফা।

[২১৮]. **ফতহুল বারী**, ৮ম খন্ড, পৃ : ১০৬, ১০৭।

[২১৯]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে নবী (স.) এর বিবাহ, ৮ম খন্ড, পৃ: ২২৫।

[২২০]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ফযীলত, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৩৪।

[২২১]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বিবাহের পূর্বে মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ, ১১ খন্ড, পৃ : ৮৫; মুসলিম, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

যখন নবুওয়াতের দশম বর্ষ তখন হযরত আয়িশার (রাঃ) এর বয়স মাত্র ছয় বছর। এই বছরেই খাদীজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। খাদীজার (রাঃ) মৃত্যুর পর হযরত খাওলা বিনতে হাকীম[২২২] রাসুল (স.) এর সম্মতিক্রমে হযরত আয়েশার মাতা উম্মে রুম্মানের[২২৩] নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। স্ত্রীর নিকট থেকে এই সংবাদ শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খাওলার মধ্যস্থতায় রাসুল (স.) এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বিয়ে দিলেন।[২২৪] এ প্রসংগে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী (স.) আমাকে বিয়ে করেন। আমরা মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে খাজরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল এবং সামান্যই মাত্র রয়ে গেল। অতঃপর আমার চুল নতুনভাবে গজিয়ে যখন তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছল তখন একদিন আমি আমার সঙ্গীনীদের নিয়ে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুম্মান আমাকে ডাকলেন। আমি তার কাছে আসলাম কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। তারপর তিনি আমার হাত ধরে একটা ঘরের দরজায় এনে দাড় করালেন। আমি তখন হাপাচ্ছিলাম। অতঃপর আমার শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছেন। তারা বললেন, আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যৎ শুভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করলেন। তারপর পূর্বাহ্নে রাসুল (স.) এর আগমনই আমাকে চকিত করে তুলল। যখন তারা (আনসার মহিলারা) আমাকে তুলে দিলেন তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।"[২২৫]

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুধু আমার ঘরে আমার লেহাফের নীচে থাকাকালে রাসুল (স.) এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে, অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে এরূপ হয়নি। একপাত্র পানি নিয়ে রাসুল (স.) আমার সাথে গোসল করেছেন, অন্য কোন স্ত্রীর সাথে এরূপ করেননি। আমার ঘরে আমার বুকের উপর মাথা রেখে

---

২২২. মাওলানা শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী**, (আযমগড়ঃ মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ), ২য় খন্ড, পৃ : ৪০৬।

২২৩. ইতোঃপূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) আয়েশাকে যুবায়র ইবনে মুতআমের পুত্রের নিকট বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্ত্রীর নিকট রাসুল (স.) এর প্রস্তাবের কথা শুনে তিনি বললেন আমি যুবায়রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখন কি করা যায়? আমিতো জীবনে কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ কখনও লংঘিত হয় না। হঠাৎ একদিন যুবায়ের বলে উঠল আমার পুত্রের জন্য আয়েশা (রা;) কে আনলে আমার ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। সুতরাং এই বিবাহের প্রয়োজন নেই।

২২৪. হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহের সন ও সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা আয়নী সহীহ বুখারীর ভাষ্যে লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ হিজরতের দেড় বছর, দু'বছর কিংবা তিন বছর পূর্বে হয়েছিল। (**উমদাতুল কারী**, তদেব, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৫)। আবার কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুর বছরেই হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ হয়। (ইবন কাসীর, **আস-সীরাতুন নবুবিয়্যা**, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলসিয়্যা, তাবি., ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৬)। সুলায়মান নদভী বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুর তারিখ দ্বারা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহের তারিখ বের করা সহজতর হয়। কিন্তু খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যু তারিখেও মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও বুখারী ও মুসনাদে বিপরীত ধর্মী দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ননায় বলা হয়েছে খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুর তিন বছর পর তাঁর বিয়ে হয়। (মুসলিম, **সহীহ মুসলিম**, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৪; **মুসনাদ**, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১১৮; ইবন কাসীর, **আস সীরাহ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৭; যাহাবী, আত-তারীখ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৫)। অপর বর্ণনায় মতে, হযরত খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুর বছরেই হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ হয়। (**মুসনাদ আহমাদ**, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১১৮; ইবন কাসীর, **আস-সীরাহ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৭)। তবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত খাদীজা (রাঃ) নবুওয়াতের দশম বছরে রমযান মাসে ইন্তেকাল করেন এবং একই বছরের শাওয়াল মাসে রাসূল (স.) এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ হয়। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৬ বছর। (**আল ইস্তি'য়াব**, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৮৮১; মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান ইবন যাবালা, **মুনতাখাব মিন কিতাবি আযওয়াজিন নাবী**, তাহকীহঃ ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, ১৯৮১, পৃঃ ৩৯; **যাদুল মা'আদ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০২-১০৩)।

২২৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, **সহীহ আল বুখারী**, কিতাবুল মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আয়েশা (রাঃ) এর সাথে নবী (স.) এর বিয়ে, আয়েশার মদীনায় আগমন এবং স্বামীগৃহে গমন। (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী), ২০০০ খ্রিঃ ১৪২১ হিঃ ৩য় খন্ড, পৃ : ৬৩০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (স.) ইনতিকাল করেছেন।[২২৬] হযরত আয়েশা (রাঃ) অগাধ জ্ঞানী ছিলেন। কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ফতওয়া ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষার সকল বিভাগেই তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক সংশোধিত বিষয়সমূহ সংগ্রহ করে আল্লামা সুয়ূতী একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।[২২৭] শরীয়াত সংক্রান্ত কোন সুক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে তদানিন্তন বড় বড় আলিমগণ মীমাংসার জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ) এর খিদমতে উপস্থিত হতেন। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, কোন জটিল সমস্যা নিয়ে আলিমগণ হযরত আয়িশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলে সমাধানের যথোপযুক্ত জ্ঞান তাঁর নিকট পেতেন।[২২৮]

হাদীস গ্রন্থ সমূহে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক ২২১০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলিমের মতে শরঈ বিধানাবলীর এক চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যারা শরঈ বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। যদি একা হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক এক চতুর্থাংশ বর্ণিত হয়ে থাকে তবে এর দ্বারা তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও প্রাচুর্য উপলব্ধি করা যায়।[২২৯]

সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস এবং বংশ তালিকার সূত্র পরস্পরা সম্পর্কেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অন্ধযুগের কবিদের সুদীর্ঘ কবিতাসমূহ তিনি কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। মোটকথা নারীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদূষী।[২৩০] রাসুল (স.) এর ইন্তিকালের পর তিনি ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি দ্বীন প্রচার এবং বিদ্যা চর্চায় অতিবাহিত করেন। রাসূল (স.) নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই নবী ছিলেন। সকলের নিকটেই আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। হায়েয, নিফাস, প্রসব ও স্বামী সহবাস সংক্রান্ত শরীয়াতের বহু মাসয়ালা এরূপ আছে যা একমাত্র নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো নিকট বলা যায় না। তাই উক্ত বিষয়ে রাসূল (স.) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর অগাধ জ্ঞান ছিল। মোটকথা নারী বিষয়ক মাসআলাসমূহ প্রচারের জন্য হযরত আয়িশার ন্যায় ধীশক্তিমান, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী নারীরই প্রয়োজন ছিল।[২৩১]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কৃতিত্ব

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আরবে ব্যাপকভাবে কাব্য সাহিত্য রচনা, বংশসূত্র বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির অধিক প্রচলন ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পিতা আবু বকর (রাঃ) এদিক দিয়ে আরবের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি পিতার কাছ থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এবং বিবাহের পর বিশ্ব মানবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সহধর্মিণী হিসেবে তাঁর নিকট থেকে মানবতার প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মুকসিরীন[২৩২] তথা অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাতজন সাহাবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।[২৩৩] তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০ টি।[২৩৪] তন্মধ্যে

---

[২২৬]. ইবন সায়্যিদুন্নাস, **উয়ুনুল আসর,**(বৈরুত : দারুল জেল, ১৯৭৪), ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০২; জালালুদ্দীন সুয়ূতী, **আল কানযুল মদফুন,** (মিশরঃ মুসতাফাল বাবিল হালবী, ১৯৩৯ খ্রি), ৫ম খন্ড, পৃ : ৭।

[২২৭]. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী,** (আযমগড় : মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ), ২য় খন্ড, পৃ : ৪০৭। হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), ও হযরত ওসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালেও তিনি ফতওয়া দিতেন। নামকরা সাহাবীগণ যাঁরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাসুল (স.) এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তারা কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি করলে হযরত আয়িশা (রাঃ) তা সংশোধন করে দিতেন।

[২২৮]. মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী, **আসাহহুস সিয়ার,** (ঢাকাঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রিঃ), পৃ : ৫৭১।

[২২৯]. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী,** প্রাগুক্ত, পৃ : ৪০৭।

[২৩০]. প্রাগুক্ত।

[২৩১]. ড. মুজতবা হুসাইন, **হযরত মুহাম্মদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,** প্রাগুক্ত, পৃ : ৯৬৫।

[২৩২]. যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সহস্রাধিক তাঁদেরকে মুকসিরীন বলা হয়।

[২৩৩]. **ফতহুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস,** পৃঃ ৩৭১; **সীরাতে আয়েশা,** পৃঃ ১৮৮।

[২৩৪]. **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,** ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৯; **আত-তালকীহ,** পৃঃ ৩৬৩; আসমাউস সাহাবা আর-রুয়াত, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৪টি হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে, ৫৪টি ইমাম বুখারী এককভাবে এবং ৬৯টি হাদীস ইমাম মুসলিম এককভাবে নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৩৫]

আবু মুলাইকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (স.) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে ভালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বারবার জিজ্ঞেস করতেন। একবার রাসুল (স.) বলেন, (কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি বলেননি যে, অতি শীঘ্রই তাঁর নিকাশ সহজেই নেয়া হবে? তখন তিনি বললেন, তা তো কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে।[২৩৬]

অনেক সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী (স.) কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে শিক্ষা লাভ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটা একটা ছিনতাই ঘটনা। এর দ্বারা শয়তান বান্দার নামায থেকে কিছু ছিনতাই করে নেয়।[২৩৭]

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর জ্ঞান সম্পর্কে বিশিষ্ট আলেম সাইদ আল আফগানী "আল ইজাবাহ" কিতাবের ব্যাখ্যাতে বলেছেন, "আমি কয়েক বছর যাবৎ হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাঃ) এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেন, চাই তা ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরব গাথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোক না কেন, আপনি তার মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন, এ ব্যাপারটা আপনাকে হতবাক করে দিতে পারে। আপনি আরও অবাক হবেন যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তার পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠার বছর অতিক্রম করেনি।"[২৩৮]

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মর্যাদা

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বনারী জাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদুষী। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন তিনি। সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা, ইতিহাস এবং বংশ তালিকার সূত্র পরম্পরা সম্পর্কেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। রাসুল (স.) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "নারী জাতির উপর আয়েশা (রাঃ) এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্য সামগ্রীর উপর 'সরীদ'[২৩৯] এর মর্যাদা।"[২৪০]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তার এক বোন আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নেন। তারপর সেটি (যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে) পড়ে যায়। রাসুল (স.) তার সাহাবীদের কয়েকজনকে ঐ হারের তালাশে পাঠান। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে সাহাবীরা (পানি না পেয়ে) বিনা অযুতেই নামাজ পড়েন। তারপর তারা যখন নবী (স.) এর নিকট ফিরে আসেন তখন ব্যাপারটা তার নিকট পেশ করেন। ঐ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে

---

২৩৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৯।

২৩৬. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে কোন কিছু শ্রবণ করার পর প্রত্যাবর্তন করল এবং এমনকি তার পরিচয় লাভ করল, ১ম খন্ড, পৃ : ২০৭।

২৩৭. বুখারী, **সহীহ আল-বুখারী**, ১ম খন্ড, পৃ : ১০৪; **জামি' আত-তিরমিযী**, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩০; **সুনান আবু দাউদ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩১।

২৩৮. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, **রসুলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা**, প্রাগুক্ত, পৃ : ২৬৩-২৬৪।

২৩৯. আরবে রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের সাথে একত্রে পাক করা হয়। এ রুটি গোশতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্যকে 'সারীদ' বলা হয়। সারীদ সুস্বাদু রুচিকর বলে আরবদের নিকট এটি সর্বাধিক সমাদৃত খাদ্য।

২৪০. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬৯; **সুনান ইবন মাজাহ**, পৃঃ ২৩৬; **ফাতহুল বারী**, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১০৬; **তাহযীবুত তাহযীব**, ১২শ খন্ড, পৃঃ ৪৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম! যখনই আপনি সংকটে পড়েছেন তখনই আল্লাহ আপনার জন্য তার সমাধানের একটা পথ খুলে দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য তার মধ্যে বরকত দান করেছেন।[২৪১]

আবু হিশাম (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাদের যাবতীয় হাদিয়া উপঢৌকন রাসুল (স.) যেদিন আয়েশার ঘরে অবস্থান করতেন সেদিন প্রেরণ করতেন। আয়েশা (রা:) বলেন, একদিন আমার সঙ্গীনীরা উম্মে সালামার নিকট একত্রিত হয়ে বলল, হে উম্মে সালামা! আল্লাহর কসম! লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হাদীয়া আয়েশার জন্য নির্দিষ্ট দিন পাঠিয়ে থাকে। অথচ আয়েশার মতো আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাংখা আছে। কাজেই রাসুল (স.) কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন যে, তিনি যখন থাকবেন কিংবা যে ঘরে থাকবেন তারা যেন সেখানেই হাদীয়া পাঠিয়ে দেয়। আয়েশা (রা:) বলেন, উম্মে সালামা এ বিষয়টি রাসূল (স.) এর নিকট বললেন। উম্মে সালামা বলেন, নবী (স.) আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। তারপর পুনরায় যখন আমার নিকট এলেন তখন আমি ব্যাপারটা পুনরুল্লেখ করলাম। এবারও তিনি আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। অত:পর তৃতীয়বার যখন আমি তাকে বললাম, তখন তিনি বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, আল্লাহর কসম! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্য কোন স্ত্রীর বিছানায় আমার নিকট ওহী আসেনি।[২৪২] হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, হে আয়েশা! জিব্রাইল তোমাকে সালাম জানিয়েছে, জবাবে তিনি বললেন, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।[২৪৩]

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা হযরত আয়েশা (রা:) এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, হযরত আয়েশা (রা:) জ্ঞান, প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীস বর্ণনায় যে যুগপৎ অবদান রেখেছেন তা তাঁর মর্যাদাকে যুগ যুগ ধরে অবিস্মরণীয় করে রাখবে।

মৃত্যুঃ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) ৫৮ হিজরীর ১৭ রমযান মঙ্গলবার রাতে (১৩ই জুন ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) ৬৬ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।[২৪৪]

পরিশেষে বলা যায়, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা:) তাঁর কর্মকান্ড, জ্ঞান-বিদ্যা, যোগ্যতা, প্রতিভা এবং অসাধারণ অবদানের জন্য গোটা নারী জগতে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ইসলামী হুকুম-আহকাম বর্ণনায় ছিলেন অদ্বিতীয়া। তাই হাদীস ও বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থাবলীতে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

[২৪১]. বুখারী, **সহীহ বুখারী,** মানাকির অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আয়েশা (রা:) এর মর্যাদা, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৭০। এই ঘটনার সময় পানি না পাওয়া গেলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাক নামাযের কাছেও যেয়ো না। নামায তখন পড়বে যখন তোমরা কি বলছ, তা সঠিকরূপে জানতে পারবে। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাজের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করে নিবে; কিন্তু যদি পথ অতিক্রমকারী অবস্থায় থাক তবে অবশ্য অন্যরকম হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পায়খানা করে আসে, কিংবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাক, আর তারপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ কর এবং উহা দ্বারা নিজের মুখমন্ডল ও হাত 'মসেহ' কর। আল্লাহ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল।" (আল কুরআন, **সুরা আন্ নিসা,** আয়াতঃ ৪৩)। এভাবে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র জাতির জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছেন শরীয়াতের বিধান নাযিল করে। হযরত আয়েশা (রা:) এর সম্মান ও মর্যাদা এ কারণেই অন্যদের তুলনায় বেশী।

[২৪২]. বুখারী, **সহীহ বুখারী,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭০। এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে,স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসুল (স.) এর অন্য স্ত্রীদের চেয়ে হযরত আয়েশা (রা:) এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন।

[২৪৩]. বুখারী, **সহীহ বুখারী,** সৃষ্টির প্রারম্ভ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফেরেশতাদের আলোচনা, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৮; সহীহ মুসলিম, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হযরত আয়েশার (রা:) ফযীলত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩৯।

[২৪৪]. **আল-ইস্তি'য়াব,** ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৮৮৫; **আল-কাশিফ,** ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৩০; **আসমাউস সাহাবা আররুয়াত,** পৃঃ ৪০; **তাযকিরাতুল হুফফায,** ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯; **আল-ইসাবা,** ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৪১; অবশ্য ইবনুল মাদানী, আয়েশা (রা.) এর মৃত্যু ৫৭ হিজরীতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। (প্রাগুক্ত); আব্দুল ফাত্তাহ মাহমুদও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুগনী ফী মা'রিফাতি রিজালিস সাহীহায়ন, (বৈরূতঃ দারুল জায়ল, ১ম সং, ১৪০৮/১৯৮৭) পৃঃ ৩৬২ তেও অনুরূপ বলেছেন; Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P: 308; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭। অবশ্য আবদুল্লাহ খাযযী তাঁর খুলাসাতু তাহযীবি তাহযীবিল কামাল ফী আসমাইর রিজাল গ্রন্থে (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল আসরীয়া, তা.বি. ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৭) আয়েশা (রা.) এর মৃত্যু সন ৫৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হাজেরা (আঃ)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)[২৪৫] এর মাতা হযরত হাজেরা (আঃ) [২৪৬] ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ধৈর্য্যশীল মহীয়সী নারী। মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা ছিল। তাই সম্পূর্ণ জনমানবহীন মরু প্রান্তরে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মাত্র কয়েকটি খেজুর ও কিছু পানি দিয়ে ইবরাহীম (আঃ) যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন শিশু সন্তানসহ নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি দেখে তিনি ইবরাহীম (আঃ) এর পিছু গমন করত জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদেরকে এই জনমানবহীন মরু প্রান্তরে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" কয়েকবার এরূপ বলার পরও ইবরাহীম (আঃ) এর পক্ষ হতে কোন উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ আপনাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন কি?" ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, "তা হলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না"[২৪৭] অন্য এক বর্ণনায় আছে[২৪৮] হাজেরা (আঃ) বলেছিলেন, হে ইবরাহীম! তুমি আমাদের কার কাছে রেখে যাচ্ছ? তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে। হাজেরা বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।[২৪৯]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা (আঃ) ও শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে নির্জন স্থানে রেখে প্রস্থান করলেন। তৎকালীন সময়ে বায়তুল্লাহর জমিন টিলার ন্যায় উঁচু ছিল এবং সেখানে কোন বসতি ছিল না। হাজেরা (আঃ) শিশুপুত্র ইসমাঈলকে নিয়েই দিনযাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত "জুরহুম" গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা মক্কার নিম্নভূমিতে অবতরণ করে দেখতে পেল কতগুলো পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা ময়দানে বহুদিন কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তারপর তারা একজন বা দু'জন লোক (সেখানে) পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল এবং সবাইকে পানির সংবাদ দিল। (সংবাদ পেয়ে) সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসে ছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদের অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন কর্তত্ব থাকবে না। তারা "হ্যাঁ" বলে সম্মতি জানাল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। এরপর আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠাল। তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে বসতি গড়ে উঠল। ইসমাঈল (আঃ) তাদের কাছ থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল।[২৫০]

---

[২৪৫]. হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পুত্র ও নবী। তিনি কাবাঘর পুনঃনির্মাণে ইবরাহীম (আঃ) এর সহযোগী ছিলেন।

[২৪৬]. হযরত হাজেরা (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) এর দ্বিতীয় স্ত্রী। বাইবেলে হযরত হাজার (আঃ) কে ইবরাহীম (আঃ) এর স্ত্রী সারার মিসরীয় দাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (Genesis,-1 6, p.1). হযরত সারা (আঃ) নিঃসন্তান ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিঃসন্তান ও নির্বংশ থাকবেন এটা হযরত সারার নিকট খুবই দুঃখের বিষয় ছিল। একটি সন্তানের আশায় তিনি আপন দাসী হাগারকে স্বামী অব্রাহামের সাথে বিবাহ দেন। (Genesis,-16, p.3) এই সূত্র ধরে পাশ্চাত্যের সকল লেখক এবং কোন কোন মুসলিম লেখকও তাদের অনুসরণ করত হাজারকে সাধারণ একজন দাসী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে হাজার ছিলেন মিশরের রাজকন্যা। (আল কিসাঈ, **কাসাসুল আম্বিয়া**, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪২; **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ২০খন্ড, পৃঃ ৫৬০-৫৬১)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাঈল (আঃ) এর মাতা হাজেরা থেকেই কোমরবন্ধ তৈরী করা শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্ধ লাগাতেন।

[২৪৭]. ইবন কাছীর, **আল - বিদায়া ওয়ান - নিহায়া**, ১ খন্ড, পৃঃ ১৫৪।

[২৪৮]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, ৭ খন্ড, পৃঃ ২১৬।

[২৪৯]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, ৭ খন্ড, পৃঃ ২০৮, ২১২।

[২৫০]. বুখারী, **সহীহ বুখারী**, নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, ৭ খন্ড, পৃঃ ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুমেরীয় সভ্যতায় নারী
আক্কাদীয় সভ্যতায় নারী
অ্যাসিরীয় সভ্যতায় নারী
ব্যবিলনীয় সভ্যতায় নারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মিশরীয় সভ্যতায় নারী
গ্রীক সভ্যতায় নারী
রোম সভ্যতায় নারী
পারসিক ধর্ম বা পারস্য সভ্যতায় নারী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চীন সভ্যতায় নারী
ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মে নারী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্মে নারী
ইহুদী ধর্মে নারী
খৃষ্ট ধর্মে নারী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আরবসভ্যতায় নারীর অবস্থান
রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে
রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পর

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আধুনিক বিশ্বে নারী

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

সুমেরীয় সভ্যতায় নারী

পশ্চিম এশিয়ার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নবোপলীয় পর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ ঘটায় সুমেরীয়রা।[১] প্রাচীন সুমেরীয়[২] সমাজ শ্রেণী বিভক্ত ছিল। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীতে অবস্থান করত পুরোহিত, অভিজাত, বণিক, শিল্পপতি, এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ। মধ্য শ্রেণীভুক্তরা হল-চিকিৎসক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ। আর নিম্ন শ্রেণীতে অবস্থান ছিল-দাস, ভূমিদাস ও সাধারণ শ্রমিকদের। সুমেরীয় সমাজে যুদ্ধবন্দীরায় মূলত দাস হিসেবে বিবেচিত হত। পুরুষদের সাথে সাথে মেয়ে ক্রীতদাসীর অস্তিত্বের কথাও জানা যায়। সুমেরীয় সমাজে দাসরা মুক্ত নারী বিয়ে করতে পারত। সে ক্ষেত্রে তাদের সন্ত

---

[১]. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, জুন ১৯৯৬, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ৭৯।

[২]. মেসোপটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিল অ-সেমিটিক সুমেরীয় জাতি। এদের জাতিগত উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ হতে ৪০০০ অব্দে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যভাগে সুমেরীয়রা বসবাস করত। তাদের আদিভূমি সম্পর্কেও সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। সম্ভবত মধ্য এশিয়ার কোন অঞ্চল হতে সুমেরীয়রা মেসোপটেমিয়ায় আগমন করে। গ্রীক 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত ভূমি। এই দুটি নদীর নাম টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস, যা বর্তমানে ইরাকের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠে সেটিই ইতিহাসে মেসোপটেমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। এশিয়া মহাদেশে এটিই প্রাচীনতম সভ্যতা। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে চারটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে যে চারটি সভ্যতার জন্ম হয় তার নাম সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতা। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ বৎসর পূর্বের প্রথম জন বসতির নিদর্শন পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত 'এলাম' নামক স্থানে। এই সকল অঞ্চলে প্রত্নতাত্তিক খনন কার্যের মাধ্যমে তৎকালীন সুমেরীয় সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আবিস্কৃত হয়। এছাড়াও অন্যান্য প্রত্নতাত্তিক খনন কার্যের মাধ্যমে বহু প্রাচীন শহরের সন্ধান পাওয়া যায়। যার মধ্যে 'উর' অন্যমত। স্যার চার্লস ও লি কর্তৃক উরের খনন কার্যের মাধ্যমে পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত নবী ইব্রাহীমের (আ:) জন্মস্থান, বাইবেলের 'কালদিসের উর' (There of the Chaldees) প্রভৃতি আবিস্কৃত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বের দৃষ্টি এই সভ্যতার উপর নিবদ্ধ হয়। এই সুমেরীয় সভ্যতার সুচনা সম্পর্কে DR. FARAJ BASMACHI তার **TREASURES OF THE IRAQ MUSEAM** নামক গ্রন্থে বলেন, The Early Dynastic period (sumerian) lasted from the end of the jamdat Nasr period (c. 2900 B.C) till the sargonid Akkadian Empire (c. 2350 B.C). This period saw the saw important social and cultural developments and its ruins are found in strength at such famous cities as sippur (modern Abu Habba), Shuruppak (Fara), Kish (Tell Al-Uhaimir), Uruk (Warka), Ur (Muqayyar), nippur (Nuffar), Girsu (Telloh), Lagash (Al-Hiba), Khafaje, Tell Ajrab and Mari (Tell Hariri). These cities, whose ruins and monuments continue to exist to the present day, bearing witness to the grandeur of their achievement, were prosperous urban centres with great palaces, temples and fortification walls, surrounded by orchards and fields irrigated by cannals and streams ...Archaeological excavtions have produced magnificent artifacts which bear witness to their social, cultural and raligious life...." (Dr. Faraj Basmachi, **Treasures of Iraq Museum**, Baghdad: Published by Ministry of Information, Iraq, 1975-1976, p: 21).

এই সুমেরীয় সভ্যতার প্রত্নতাত্তিক খনন কার্যের ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে যে সকল নিদর্শন সমূহ আবিস্কৃত হয়েছে তা বর্তমানে ইরাকের বাগদাদ মিউজিয়াম এবং পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। বাগদাদ মিউজিয়ামের ৩ নং হলটি সুমেরিয়ান হল বলে অভিহিত। এই হলে রক্ষিত প্রত্নতাত্তিক নিদর্শনসমূহ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের নিদর্শন থেকে তৎকালীন সুমেরীয় সভ্যতার সামাজিক ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে জানতে পারা যায়। প্রখ্যাত ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ ডঃ অতুল সুর এই সুমেরীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার সাথে ভারতীয় সভ্যতার গভীর মিল খুঁজে পেয়েছেন। ১৯৬৫ সনে তিনি তার "Pre-history and beginnings of civiliztion" নামক গ্রন্থে বলেন, মিশর, ক্রীট, সুমের, এশিয়া মাইনর, সিন্ধু উপত্যকা ও অন্যান্য যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিলো খুব সম্ভবত: সে সভ্যতার আদি জন্মস্থান পূর্বভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকা দেবীর উপাসনা পৃথিবীর দুরদেশ সমূহে নিয়ে গিয়েছিলো। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)**, ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ: ৪৮-৪৯; ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লি:, ১৯৮৫, পৃ: ১২)।

Dhaka University Institutional Repository

ানরা মুক্ত হিসেবে বিবেচিত হত। পিতার মৃত্যুর পর এরা অর্ধেক সম্পত্তি লাভ করত। অর্থের বিনিময়ে দাসরা মনিবের কাছ থেকে মুক্তি কিনে নিতে পারত।[৩]

সুমেরীয় সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান। এই সমাজে বহুবিবাহ আইনগত দিক থেকে নিরুৎসাহিত করা হলেও সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণীর পুরুষদের অবৈধভাবে উপভোগ করার জন্য অজস্র নারী থাকত। রাষ্ট্রের রাজা, তার পরিষদবর্গ, অভিজাত শ্রেণী, বণিক শিল্পপতি ও মন্দিরের পুরোহিতরা প্রতিদিনই নিত্যনতুন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত এবং একসাথে বহু উপপত্নিও রাখত। বহু কুমারী মেয়ে দেবীর প্রসন্নতা লাভের জন্য মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে সতীত্ব বিসর্জন দিত। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের সাথে অবৈধ, অশ্লীল, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। নারীকে নিলামে বিক্রি করা হত। পরবর্তীতে সে দাসী রূপে তার মনিবের কাছে সারাজীবন আবদ্ধ থাকত ও অবৈধ ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত।[৪]

সুমেরীয় সমাজে স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত এবং পরে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে তারা আবার বিয়ে করতে পারত। বিয়েতে যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিল। তবে উচ্চতর শ্রেণীর পুরুষরা অধিক বিবাহের বদলে অধিক সংখ্যক নারীর সাথে নির্বিচার ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হতেই বেশী পছন্দ করত। পুরোহিতরা অগণিত নারীকে ধর্মের নামে ভোগ করত। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মত সুমেরীয় সমাজে স্ত্রী বা অন্যান্য নারী দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হত। অতিথিরা গৃহস্বামীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন ধরণের উপহার প্রদান করত। পুরুষরা যেভাবে অধিকসংখ্যক নারীর সাথে অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হত নারীরাও তেমনভাবে অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত এবং পছন্দমত পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত।[৫] প্রাচীন সুমেরে নারীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখতে পারত। তারা শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনা করতে পারত। মেয়েরা উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত।[৬] সুতরাং বলা যায়, সুমেরীয় সমাজে নারীর কোন মর্যাদায় ছিল না, নারী ছিল শুধু ভোগ্যপণ্যস্বরূপ।

---

[৩]. এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২-৮৩।

[৪]. সুমেরীয় সমাজের নারীর সাথে ভারতীয় নারীর তুলনা করে ডঃ অতুল সুর বলেন, "সুমের ও ভারতের মাতৃদেবীর মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়......মেসোপটেমিয়ার মাতৃদেবী পর্বতের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সেজন্য তাকে 'পর্বতের দেবী' বলা হতো। ভারতে মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিন্ধ্যাবাসিনী প্রভৃতি নাম সুচিত করে। সুমেরে মাতৃদেবীর নাম ছিল 'এ-নান্না'। সে নাম হিংলাজে 'নানাদেবীর নামে এখনও বর্তমান.......দু দেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি (বা সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন দেওয়া) প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় এর উদ্ভব হয়েছিলো ঐন্দ্রজালিক (mimetic or homoepathic) পদ্ধতি থেকে। সধবা ও অনূঢ়া উভয় শ্রেণীর মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা লাভের জন্য সাময়িকভাবে তাদের সতীত্বের বিসর্জন দিত। বলা বাহুল্য, ভারতে এটা বামাচারী তন্ত্রধর্মের বৈশিষ্ট্য। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ** (সাঃ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০)।

[৫]. সুমেরীয়দের একটি অন্যতম মহা খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মকেন্দ্রের নাম নিপ্পুর (Nippur)। আমেরিকান প্রত্নতাত্তিকগণ নিপ্পুরে প্রত্নতাত্তিক খনন কার্যের মাধ্যমে একটি বিরাট লাইব্রেরী খুঁজে বের করেছেন এবং সেখানে পাওয়া গেছে বহু সহস্র মাটির ফলক যা ১৮ ইঞ্চি চওড়া। সে সব বর্তমানে কনস্টান্টিনোপোল এবং ফিলাডেলফিয়ার যাদু ঘরে রক্ষিত আছে। এ সকল প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলক থেকে তৎকালীন সমাজের বহু অজানা অনাবিস্কৃত দিক উন্মোচিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তৎকালীন সময়ে মন্দিরে সেবাদাসী রাখার কথা জানা যায়। উক্ত সেবাদাসীরা মন্দিরের পুরোহিতদের সাথে নির্বিচারে যৌনলিলায় লিপ্ত থাকতো। নারী পুরুষের এই নির্লজ্জ ব্যভিচারের ফলে বহু নারীই সন্তান গর্ভে ধারণ করতো। এই সকল সন্তানদের অধিকাংশকে জন্মের পর মেরে ফেলা হত। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ** (সাঃ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১)।

[৬]. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

আক্কাদীয় সভ্যতায় নারী

সুমেরীয়দের পর খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ২৩০০ অব্দের দিকে সুমেরের উত্তরে আক্বাদ নামক অঞ্চলে সেমেটিক ভাষী এক যাযাবর গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। সভ্যতায় এরা আক্কাদীয় নামে পরিচিত। এই আক্কাদীয় সভ্যতা ১৪২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ীত্ব লাভ করে যার মধ্যে ৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন 'প্রথম সার্গন' (SARGON -1)।[৭] এই সার্গনের জন্ম সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে তৎকালীন সমাজে বহু বিবাহ ও নৈতিক মুল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। Dr. FARAJ BASMACHI এর মতে, "His (Sargons) mother was a temple woman who conceived him and bore him in secret, she put him in a basket and cast him into the Euphrates river which carried him until he was rescued by a gardener. The gardener reared him and when he became grown up the Goddess Ishtar granted him her love. He gained a position in the serice of UR-Zababa, king of kish, and then managed to overthrow his master."[৮]

রাজা প্রথম সার্গনের অবৈধ জন্মের মাধ্যমে তৎকালীন আক্কাদীয় সমাজের বিভিন্ন ধর্মমন্দির গুলোতে সেবাদাসীদের অবস্থানের কথা জানা যায়। এই সকল সেবাদাসীরা মন্দিরের পুরোহিতদের সাথে নির্লজ্জ ব্যভিচারে লিপ্ত হত। ধর্মমন্দিরগুলো সে সময় ব্যভিচার ও যৌনলীলার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি মন্দিরে অসংখ্য নারী থাকত কখনো সেবিকারূপে এবং কখনো দেবদাসীরূপে। নারীদের এইভাবে মন্দিরের কাজে নিয়োজিত থাকাকে কখনো নিন্দার চোখে দেখা হত না। বরং তৎকালীন আক্কাদীয় সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের পিতা মাতারা তাদের মেয়েদের মন্দিরের কাজে অংশগ্রহণ করাতে বেশ গর্ববোধ করতেন এবং জাকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েকে মন্দিরে দেবদাসীর কাজে নিযুক্ত করতেন। দেবদাসীরূপে মন্দিরের কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর সেখানকার পুরোহিতদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকাই মেয়েদের প্রধান ও মূল কাজ ছিল। নির্বিচার যৌনাচারের ফলে অনেক মেয়েই গর্ভবতী হয়ে পড়ত যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজা প্রথম সার্গনের মন্দিরের ভিতর অবৈধ জন্মের ইতিহাস। মন্দিরের ভিতর অবৈধভাবে জন্ম গ্রহণকারীদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হত।[৯]

আক্কাদীয় সমাজ ব্যবস্থায়ও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পুরুষরা একের অধিক স্ত্রী রাখত। তবে অধিক সংখ্যক স্ত্রী রাখার চেয়ে পুরুষরা তাদের যৌন চাহিদা পুরণের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সেবাদাসী ও উপপত্নী রাখত। এছাড়াও তারা পর নারীর কাছে গমন করত এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে নিজ ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ রমণীকে ভোগ করত। যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে সমাজের প্রতিপত্তিশালী লোকদের মধ্যে ও বিভিন্ন মন্দিরে বন্টন করা হত। এই সকল যুদ্ধবন্দী নারীরা আজীবন পুরুষদের ও মন্দিরের পুরোহিতদের যৌনচাহিদা পুরণের কাজে নিয়োজিত থাকত।

---

৭. প্রথম সারগম (SARGON) খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে সুমেরীয়দের পরাজিত করে আক্কাদ অঞ্চলে একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইলামাইটদের (Elamites) এবং ভুমধ্যসাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর সিরিয়া দখল করে সারগন পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম সেমিটিক রাজ্য স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে আগমনকারী সেমেটিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আক্কাদীয়রাই সর্বপ্রাচীন। এই জাতিগোষ্ঠী চার হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে আরব থেকে মেসোপটেমীয় অঞ্চলে এসেছিল। ইউরুকাজিনার পরে আক্কাদীয়রা প্রথম সার্গনের (SARGON-1 or Sharru-kin-2370-2315 B.C) নেতৃত্বে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সুমেরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আক্কাদীয়রা সুমেরীয় লিখন পদ্ধতি, ক্যালেন্ডার, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, বাণিজ্য পদ্ধতি, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা এবং নগর বিন্যাসের ধারণা গ্রহণ করেছিল। সুমেরীয় সভ্যতার উপর ভিত্তি করেই আক্কাদীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। আক্কাদীয় তাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ অব্দের একটি প্রস্তর খন্ড (Stele)। এই প্রস্তর খন্ডে অসাধারণ দক্ষতা ও শিল্প চাতুর্যে রাজা নারমসিন এর দূর্গ অবরোধের দৃশ্যকে খোদাই করা হয়েছে। প্রথম সারগনের মৃত্যুর পর সুমেরীয়গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু দুর্ধর্ষ গুতি তাদের এই বিদ্রোহ দমন করে। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে সুমেরীয়গণ উর নগরীর নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহ করে এবং সুমার ও আক্কাদ অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম ছিল দুঙ্গী। (ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩; এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮১)।

৮. Faraj Basmachi, **Treasures of the Iraq Museum**, p: 26.

৯. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

আক্কাদীয় আইন দ্বারা নারী ও পুরুষের বিবাহ সম্পর্ক নির্ধারণ করা হত। নারী ও পুরুষরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। তবে নারীর চেয়ে পুরুষদের ক্ষমতাই বেশী ছিল। পুরুষদের ক্ষমতা এত বেশী ছিল যে তারা কখনো কখনো তাদের স্ত্রীদের বিক্রি করে দিত। স্বামীর কোথাও ঋণ থাকলে সেই ঋণ পরিশোধের জন্য স্বামীরা স্ত্রীদেরকে ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখত। প্রতিটি স্ত্রীরই দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল স্বামী ও রাষ্ট্রের জন্য অধিক পরিমাণ শিশুর জন্ম দেয়া। স্ত্রী বন্ধা বা সন্তান ধারণে অক্ষম হলে স্বামী কোন যুক্তি না দেখিয়েই তাকে তালাক দিতে পারত। ব্যভিচারের জন্য স্বামীকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হত না। কিন্তু স্ত্রীর জন্য ব্যভিচারের শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। এমনিভাবে আক্কাদীয় সমাজের অধিকাংশ নারীরই সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না। পণ্যের মত তাদেরকে যখন তখন নিলামে বিক্রি করা হত।[১০] সমাজের মুষ্টিমেয় নারীরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করত। এমনিভাবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্না নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'শুব আদ' (SHUB-D), 'এনখিদুয়ানা' (Enkheduana) প্রমূখ। এনখিদুয়ানা সম্পর্কে Encyclopaedia Britanica তে বলা হয়েছে: "Enkheduana must have been a very gifted woman, two Sumerian hymns by her have been preserved ... ."[১১]

তৎকালীন সময়ের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্না নারীরা যে বর্তমান আধুনিক নারীদের চেয়ে সাজ সজ্জায় পিছিয়ে ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরাতত্ত্ববিদ কর্তৃক আবিষ্কৃত রাণী শূব-আদ এর সমাধীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন অলংকারাদী থেকে।

অ্যাসিরীয় সভ্যতায় নারী

মেসোপটেমিয় অঞ্চলে যে সমস্ত জাতি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল অ্যাসিরীয়গণ তাদের মধ্যে অন্যতম।[১২] মেসোপটেমিয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অ্যাসিরীয়রা ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[১৩] অ্যাসিরীয়দের সাম্রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থার[১৪] কথা পর্যালোচনা করলে অ্যাসিরীয় সমাজে তিনটি শ্রেণীর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। যথা:

---

১০. আহমদ মনসুর, **বহু বিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২-৫৩।

১১. Encyclopeadia Britanica, Vol-11, p: 973.

১২. ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬।

১৩. এ.কে মে শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

১৪. ব্যবিলনের প্রায় দুশো মাইল উত্তরে টাইগ্রীস নদীর তীরে প্রাচীন শহর আশুর ছিল সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অ্যাসিরীয়দের অদিবাস স্থান। অ্যাসিরীয়দের এই প্রাচীন শহরটি বর্তমান মসুল (MOSUL) শহরের ১১০ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত। জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বারো বছর বিভিন্ন পর্যায়ে খনন কার্যের পর এই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। DR. FARAJ BASHMACHI এ সম্পর্কে বলেন, "Assur, capital city of the old Assyrian period is situated on a bluff on the west bank of hte Tigris, about 110 kilometers south ofMosul. This, the oldest and most sacred of Assyrian cities, was thoroughly excavated lay a German expedition (Deutche Orient-Gesellschaft) for twelve conscutive years from the beginning of the present century. The excavators exposed its town plan with its temples, palaces and gates, and graves of the Assyrian kings, and found an incomparable wealth of objects from the Sumerian, Akkadian and Assyrian periods." (**Treasures of Iraq Museum**, p: 52). প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত জিনিষপত্র ও ফলক থেকে জানা যায় যে, অ্যাসিরীয়দের প্রাচীন রাজা KIKIA দেবতা অ্যাসুরের নামে মন্দির, নগর, নগর প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই অ্যাসিরীয়রা সেমেটিক বা সুমেরীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিল না। ধারণা করা হয়, জন্মগতভাবে তারা সুবারীয়ান (SUBARIAN) ছিল। পূর্বাতন অ্যাসিরীয়দের রাজত্বকালে রাজা শামাস আদাদ (Shamashadad) ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্রাট। তিনি বিভিন্ন পত্নী ও উপপত্নীর সাথে অতিশয় মাত্রায় যৌনসম্ভোগে লিপ্ত থাকতেন। এ সম্পর্কে DR. FARAJ BASHMACHI বলেন, "In the time of Shamashaded (Samsi-Addu! 1815-1782 B.C) the old Assyrian kingdom reached an unprecedented supremcy. He led its armies to domination over most of the cities in central Iraq and the Euphrates area, in particular Mari (modern Tell Hariri)" (**Treasure of the Iraq Museum**, p: 40).

Dhaka University Institutional Repository

ক) অভিজাত শ্রেণী, খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গ) নিম্ন শ্রেণী।

সাধারণত উচ্চ পদস্থ সামরিক ব্যক্তিত্ব ও পুরোহিতরাই অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিল। ব্যবসায়ী কারিগর প্রভৃতি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। আর নিম্ন শ্রেণীর সদস্যরা ছিল দাস ও সামরিক নেতা কর্তৃক পদানত স্থানীয়

পুরাতন অ্যাসিরীয়দের রাজত্বকালের পর শুরু হয় মধ্য অ্যাসিরীয় রাজত্ব যার সময়কাল ছিল ১৩৬৫-৯১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালে অ্যাসিরীয়রা মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলে তাদের এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে সম্রাট আশুর উবালিটের (Assur-Ubalit) মাধ্যমে, যা বর্তমান ইরাকের কিরকুক (KIRKUK) অঞ্চলে অবস্থিত। মধ্য অ্যাসিরীয়দের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য সম্রাটগণ হলেন আশুর উবালিট (Assur-Ubalit-1365-1330 B.C) সম্রাট প্রথম শালমানিসার-১ (Shalamaneser 1-1274-1245 B.C) সম্রাট টুকুলটি নিনুরতা-১ (Tukulti-Ninurta 1-1115-1208 B.C) ও সম্রাট টিগলাথপিলিসার-১ (Triglathpileser-1-1157-1077 B.C)। এই সকল রাজারা সকলেই বহুবিবাহ ও অসংখ্য উপপত্নী রাখতেন। রাজাদের অবৈধ ব্যভিচার ছিল নিত্য ঘটনা। সম্রাট টিগলাথপিলিসার-১ ছিলেন মধ্য অ্যাসিরীয়দের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। প্যালেসের ভিতর রাজার মনোরঞ্জনের জন্য অসংখ্য নারী নিয়োজিত ছিল। DR. FARAJ BASHMACHI এ সম্পর্কে বলেন, "…..among his (Assur-Nasir-pal-ii) accomplishments is the rebuilding of the city of kalhu (biblical calah, modern Nimrud). He constructed along the western side of the city a massive stone quay-wall on the Tigris, and for his own residence he built a magnificent palace, which is one of the most sumptuous monuments ever excavated in Iraq ..."(**Treasure of the Iraq Museum**, p: 43).

বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই সকল অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এক ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালনা করেন। খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শন সমুহ বর্তমান বাগদাদ শহরে অবস্থিত ইরাক মিউজিয়ামের ১৩ নং হলে রক্ষিত আছে। এছাড়াও এই সম্রাটের রাজত্বকালের প্রথম পাঁচ বছরে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানের উপর নির্মিত প্রাসাদের নিদর্শন বর্তমান ইরাকের মৌশুল মিউজিয়ামে (MOUSUL MUSEUM) রক্ষিত আছে। আশুর নাসিরপাল-২ এর রাজত্বকালের পরবর্তী সম্রাটগণ হলেন শালমানিসার-৩ (Shalmanseer–III-858-824 B.C), সম্রাট আদাদ নিরারী-৩ (Adad–Nirari–III–811–781 B.C). এদের রাজত্বকাল পর্যালোচনা করলে এই সকল নৃপতিদেরকে অতিশয় মাত্রায় নারী সম্ভোগে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর দ্বিতীয় নব্য-অ্যাসিরীয় রাজাদের রাজত্বকাল স্থায়ী হয় ৭৪৫ থেকে ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্রাটগণ হলেন সম্রাট টিগলাথিপিলিসার (Tiglathpileser–745-727 B.C), সারগন-২ (Sargon–II-22-705 B.C)। রাজা দ্বিতীয় সারগন ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নৃপতি ছিলেন। তার অন্যতম নির্মাণ কীর্তি হচ্ছে নিজের জন্য নতুন রাজধানী নির্মাণ করা, প্রাচীন 'ডুর শারুকিন' (DUR-SHARRUKIN) নামক স্থানে যার ধ্বংসাবশেষে আবিস্কৃত হয়েছে বর্তমান উত্তর ইরাকের মোসুল (MOSUL) শহর (প্রাচীন নাম নিনেভ) থেকে ১৮ কি.মি. উত্তর পূর্বে অবস্থিত (KHORSABAD) (সম্ভবত নাম হবে CHOSROEABAD) নামক স্থানে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে এই স্থানে পাওয়া গেছে শহরের প্রধান দরজাসমূহ, রাজকীয় প্রাসাদসমুহ, বিভিন্ন অলংকারাদি, মানুষের মস্তক, কঙ্কাল ও বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শনসমুহ যা বর্তমানে ইরাক মিউজিয়ামের ১০ নং হলে রক্ষিত আছে। তার পরবর্তী সম্রাট হলেন সম্রাট সেন্নাচারিব (Sennacherib-705-681 B.C)। যিনি ছিলেন সারগন-২ এর পুত্র। তিনি প্রচীন নিনেভ (বর্তমান মোসুল) শহরকে রাজধানীর মর্যাদা প্রদান করেন এবং নুতনরূপে ঢেলে সাজান। সেন্নাচারিব ব্যবিলন, এশিয়া-মাইনর সিসিলি, সিডন, আশকিলনসহ বিভিন্ন দেশ জয় করে জেরুজালেমের প্রান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন। বাগদাদের ইরাক মিউজিয়ামের ১২ নং হলের ১০ নং নিদর্শনটি রাজা সেন্নাচারিবের পাথরের উপর প্রচারাভিযানের দৃশ্যের একটি নমুনা আজো রক্ষিত আছে। এরপর ইসারহাডোন (Esarhaddon-681-669 B. C) ছিলেন অ্যাসিরীয়দের পরবর্তী নৃপতি। সম্রাট ইসারহাডোন ব্যাবিলন, সিরিয়া, ফিনিনশিয়ান কোষ্ট, সাইপ্রাস, সিলি, মিশর, মেমফিস প্রভৃতি রাজ্য জয় করে তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। ইসারহাডোনের পর তার পুত্র ইতিহাস বিখ্যাত আসুর বানি পাল (Assur-Bani-669-629 B.C) উত্তরাধিকারী হিসাবে রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার রাজত্বের যে ইতিহাস পাওয়া গেছে তা দীর্ঘযুদ্ধ, অবরোধ, ক্ষুধা ও মৃত্যুযন্ত্রণার বিবরণ। আসুর বানি পাল এলাম বিজয়ের বর্ণনা করে বলেন, "একমাস পঁচিশ দিনের পথ অতিক্রম করে আমি এলামের অঞ্চলগুলো ধ্বংস করলাম। সেখানে আমি লবণ ছিটিয়ে কাটা ঝোপে পুতে দিলাম। রাজার পুত্রদের ভগ্নীদের, এলাম রাজ পরিবারের যুবা, বৃদ্ধ সদস্যবৃন্দ, গভর্ণর, নাইটবৃন্দ ও কারিগরদের সকলকে, অসংখ্য নরনারী, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, মেষপাল, গরুর দল পতঙ্গপালের মত আমি তাদের লুষ্ঠিত দ্রব্যের ন্যায় অ্যাসিরীয়াতে নিয়ে এলাম। এলাম দেশীয় রাজার বিচ্ছিন্ন মস্তক যখন নিয়ে আসা হলো তখন তিনি রাণীকে নিয়ে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত ছিলেন। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ** (সাঃ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩)।

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাসী। দাসদের আবার দুটি শ্রেণী ছিল। ১) রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত দাস। এরা রাস্তাঘাট ও নগর নির্মাণ করত। (২) কৃষিক্ষেত্রে বা গৃহকর্মে নিয়োজিত দাস। এদের অনেকের নিজস্ব ভুসম্পত্তি ছিল।[১৫]

অ্যাসিরীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সুবিন্যস্ত ছিল না। অ্যাসিরীয় রাজারা বহুবিবাহের সাথে সাথে অজস্র উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখত। এই সকল রক্ষিতাদের বিভিন্ন হেরেমে রাখা হত। রাজারা বিভিন্ন সময়ে এই সকল উপপত্নী বা রক্ষিতাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। যুদ্ধে বিজয়ের ফলে যে সকল নারীদেরকে পাওয়া যেত অ্যাসিরীয় রাজারা তাদের মধ্য থেকে পছন্দমত নারীদেরকে নিজেদের জন্য রাখত। বাকী যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত, কারণ সামরিক বাহিনী ছাড়া অ্যাসিরীয় রাজাদের মূল ভরসাস্থল ছিল ধর্মমন্দির। রাজা পুরোহিতদের শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দী নারী ছাড়াও ব্যাপকভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। পুরোহিতরা নির্লজ্জভাবে ধর্মের নামে নারীদেরকে মন্দিরের সেবাদাসী করে রাখত ও তাদের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হত। যুদ্ধবন্দী নারী ছাড়াও তাদের কন্যাদেরকে মন্দিরের সেবাদাসী হিসেবে দান করত। এরই ফলশ্রুতিতে অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিটি ধর্মমন্দির এক নির্লজ্জ যৌনলীলা ও ব্যভিচারের আখড়ায় পরিণত হয়। পুরোহিতদের যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্টপোষকতা ও আর্থ দিয়ে সাহায্য করা হত সে কারণে তারা নির্ভয়ে, নির্বিচারে ব্যভিচারে মত্ত থাকত।

অ্যাসিরীয়দের বিবাহ সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে বাগদান সম্পন্ন হত। পাত্র কন্যাকে বাগদান করে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করত। পাত্রীকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পাত্রীমুল্য পরিশোধ করা হত। কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে বা স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলে এই অর্থ স্ত্রী পেত। অ্যাসিরীয় নিয়ম অনুযায়ী বিবাহের পর স্ত্রীরা স্বামীর ঘরেও থাকতে পারত অথবা পিতৃঘরেও স্বামীসহ থাকতে পারত। স্বামীর ঘরে থাকলে স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হত। একজন বিধবা মহিলা পুনঃবিবাহ করার পরেও তার পূর্বের স্বামীর দেয়া সম্পত্তির অধিকারী হত যদি সে তার নিজের বাড়িতে থাকত। যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে যদি স্বামী বিদেশ যেত তাহলে বিদেশ যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর জন্য ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে যেতে হত। স্বামীর দেশে ফিরতে বিলম্ব হলে স্ত্রীকে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করতে হত। এই সময়ের মধ্যে স্বামী ফিরে না এলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারত।[১৬]

অ্যাসিরীয় সমাজব্যবস্থায় মেয়েদেরকে সাধারণত পর্দার অন্তরালেই থাকতে হত। অ্যাসিরীয়রাই প্রথম মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথার প্রবর্তন করেন।[১৭] ওমসস্টেডের মতে, "এটাই ছিল প্রাচ্যে মহিলাদের প্রাথমিক পর্দা-প্রথা।"[১৮] ঘরের বাইরে বা জনসমক্ষে মেয়েরা বোরখা পরে বের হত। অ্যাসিরীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যভিচার করার অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান ছিল। যদিও মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীদের ব্যভিচারের জন্য শাস্তি প্রদান করা হত কিন্তু অভিজাত বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যভিচারের জন্য বিশেষ কোন শাস্তি প্রদান করা হত না। কারণ রাষ্ট্র ও সমাজের মূল ক্ষমতা তাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। অ্যাসিরীয় সমাজে রাজা তার পরিবারবর্গ, অভিজাত শ্রেণী ও পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যেই বহুবিবাহ ও যৌন ব্যভিচার অধিক মাত্রায় প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা এই শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভুত ছিল বলে তাদের ব্যভিচার ও যৌনলীলা সম্পর্কে কেউই কথা বলতে করার সাহস করত না। এছাড়াও আসিরীয় শাসকরা ছিল অতিমাত্রায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অ্যাসিরীয় আইনে নারীদের সমঅধিকার ছিল না। পুরুষরা ইচ্ছে করলেই স্ত্রী তথা নারীদের ত্যাগ করতে পারত। সাধারণ পুরুষদের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রতিটি অ্যাসিরীয় রাজাই ছিল অধিক মাত্রায় সুরা পানে অভ্যস্থ ও ব্যভিচারে নিমজ্জিত। বহুবিবাহের সাথে সাথে প্রতিটি অ্যাসিরীয় নৃপতিই বহুসংখ্যক উপপত্নী বা রক্ষিতা প্রতিপালন করত। এককথায় বলা যায়, অ্যাসিরীয় সমাজে নারীদের বিশেষ কোন

---

[১৫]. এ.কে.এম. শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩; আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৪।

[১৬]. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

[১৮]. ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা ছিল ভোগ্য পণ্যস্বরূপ।[১৯] স্ত্রীদেরকে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে ভাবা হত।[২০] তবে অভিজাত শ্রেণীর নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করত এবং তাদের অনেকেই তৎকালীন সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ অলংকৃত করেছিল।[২১]

ব্যবিলনীয় সভ্যতায় নারী

সুমেরীয় শাসক দুঙ্গীর[২২] মৃত্যুর পর সুমেরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে সভ্যতার ইতিহাস থেকে সুমেরের উজ্জ্বল্য বিবর্ণ হয়ে পড়ে এবং দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই সুমের 'ইলা মাইট'দের অধিকারে চলে যায়। অতঃপর ১৮০০[২৩] খৃষ্টপূর্বাব্দে আরব মরুভূমি থেকে আমোরাইট (Amorite) নামের এক সেমিটিক গোষ্ঠী এই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং সুমের ও আক্কাদের মাঝামাঝি এক অখ্যাত শহর ব্যবিলনে সভ্যতার পত্তন ঘটায়। এ সময় থেকে তারা ব্যবিলনীয় নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে এই সভ্যতাই ব্যবিলনীয় বা পুরাতন ব্যবিলনীয় সভ্যতা নামে পরিচিতি লাভ করে। আমোরাইট নামে পরিচিত এই জাতির শাসক ছিলেন হাম্মুরাবি[২৪] আমোরাইটদের বিখ্যাত রাজা হাম্মুরাবির নেতৃত্বে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। রাজা হাম্মুরাবির বিখ্যাত আইন গ্রন্থ থেকে ব্যবিলন সমাজ[২৫] ব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র দেখতে

---

[১৯]. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।
[২০]. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।
[২১]. ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
[২২]. ডুঙ্গী তৎকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুমেরীয় নৃপতি ছিল। তিনি পৃথিবীর চারটি (King of the four Regions of the earth) অঞ্চলের নৃপতি উপাধি ধারণ করে সমগ্র সুমেরীয় জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন।
[২৩]. ব্যবিলনীয় সভ্যতার সুত্রপাতের সাল সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা: **প্রথমত:** ড. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ তার **বিশ্বসভ্যতা** গ্রন্থে বলেন-ব্যবিলন সভ্যতার সুত্রপাত বা পত্তন হয় ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। (ড. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫)। **দ্বিতীয়ত:** আহমদ মনসুর তার **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)** গ্রন্থে বলেন - ব্যবিলন সভ্যতা ২৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সভ্যতার সুত্রপাত ঘটায়। (ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেশন্স, পৃঃ ৫৪); শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রাহিম ও মোঃ আমির হোসেন সরকার, **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলামী সংস্কৃতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ** গ্রন্থে বলেন, খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৫০ সালে ব্যবিলন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। **তৃতীয়ত:** ড: মাহমুদুল হাসান তার **ইসলামের ইতিহাস** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- আমোরাইটগণ ব্যবিলনে এসে বসবাস শুরু করে খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ সালে (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ১৩)। এই তিনটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।
[২৪]. Hammurabi এর জীবনকাল আনুমানিক ১৭৯২-১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব অথবা খ্রিষ্টপূর্ব ২১২৩-২০৮১। (এ.কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫-৮৬; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩; আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪)।
[২৫]. বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদের ৯০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বিশাল ধ্বংসস্তুপ বিরাজমান রয়েছে তা প্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতা বলে সমধিক পরিচিত। ব্যবিলন শব্দটি "BAB - ILI" থেকে এসেছে যার অর্থ "the gate of the gods" বা দেবতাদের প্রবেশদ্বার। খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৫০ অব্দের দিকে সুমের ও আক্কাদের মাঝামাঝি একটি অখ্যাত শহর ব্যবিলন বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সিরিয়ার মরুভূমি থেকে আগত দক্ষ সেমেটিক গোষ্ঠী অ্যামরু (Amorite) সম্রাটদের দ্বারা ব্যবিলনীয় সভ্যতার পত্তন ঘটে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৯৪-১৮৮১ অব্দে অ্যামুরু (Amorite) রাজা সুমু আবুম (Sumu-Abum) ব্যবিলনে অ্যামুরু রাজত্বের সূচনা করেন। Dr. FARAJ MASMACHI এ সম্পর্কে বলেন, "Sumu-abum (1894-1881 B.C) Founded the first Dymasty of Babylon at the time when the long struggle of power between Isin and Larsa was going on, and large numbers of Aromite tribes were continuing to pour into Iraq invanding towns and countryside. Sumu-abum chose for his capital the city of Babylon whose ruins now are situated about 90 K.M. to the southwest of Bagdad ... ." (**Treasures of the Iraq Museum,** p: 34).

অ্যামরুদের (Amorite) বিখ্যাত ৬ষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবির (Hammurabi) নেতৃত্বে দজলা ফোরাতের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় ব্যবিলন সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। হাম্মুরাবির রাজত্বকাল ব্যবিলনের স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। ১৭৯২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি ব্যবিলনের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ১৯০১-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ জ্যাকস দ্যা মর্গানের (Jaques de Morgan) নেতৃত্বে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল পারস্যের সুসার দুর্গ আবিষ্কার করেন যা ছিল প্রাচীন কালের অন্যতম চিত্তাকর্ষক স্মৃতিস্তম্ভ। এটি একখন্ড কালো সবুজ প্রস্তর নিয়মিতভাবে গঠিত এবং মসৃন ২.৪৫ মিটার উচু যার মধ্যে সংকলিত হয়েছে আক্কাদীয় ভাষায় রাজা হাম্মুরাবির আইন গ্রন্থ। আইন লিখিত হয়েছে ২৪৫ সেন্টিমিটার উচু একটি পাথরের দুইটিকে যা বর্তমানে ফ্রান্সের লুভ্যর (Louvre) যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই প্রস্তরের সামনের অংশের উপরে একটি অল্প খোদিত ছবিতে দেখা যায় ন্যায়বিচারের দেবতা সূর্যদেব শামাস হাম্মুরাবিকে

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। হাম্মুরাবির এই আইন পর্যালোচনা করলে রাজা হাম্মুরাবি কর্তৃক তৎকালীন ব্যবিলনীয় সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে জানা যায়। আইন গ্রন্থের শুরুতেই হাম্মুরাবি বলেন, "The great gods have called me, and I am indeed a shephered who brings peace whose sceptre is just, my pleasant shade in spread over my city, in my bosom I have carried the people of the land of Sumer and Akkad, thy have be come abundantly rich under my guardian spirit, I bear their charge in peace and my profound wisdom I protect them. That the strong may not oppress the weak and so to give Justice to the orphan and the widow, I have inscribed my precious words on my monument and established them before my statue called king of justice in Babylon."[২৬]

হাম্মুরাবীর আইনে সমগ্র ব্যবিলনীয় সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) উচ্চ শ্রেণীঃ রাজা, পন্ডিত, পুরোহিত এবং উচ্চপদস্থ সৈন্যরা এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা এই শ্রেণী ভোগ করতো এবং শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার তাদের ছিল। (২) মধ্যম শ্রেণীঃ এই শ্রেণীতে যারা অন্তর্ভূক্ত ছিল তাদের কে বলা হতো MUSKINU - যার বুৎপত্তিগত অর্থ হলো ভিক্ষুক। হাম্মুরাবির আইনে এই শব্দটি দ্বারা জনসাধারণ বোঝানো হয়েছে। এই জনসাধারণের মধ্যে অন্ত র্ভুক্ত ছিল মধ্যম শ্রেণীর শিল্পী, স্বাধীন ব্যবসায়ীগণ, সরকারী চাকুরীজীবিগণ প্রভৃতি। (৩) নিম্ন শ্রেণীঃ কৃষক, সাধারণ শ্রমিক এবং দাসগণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। ক্রীতদাসের প্রভূগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের অধীনস্থ ক্রীতদাসদের ক্রীতদাস রমণীর সাথে বিবাহ দিতেন। তাদের সন্তান সন্ততিরা জন্মগতভাবে ক্রীতদাস হিসেবে বিবেচিত হত। অনেক ক্রীতদাস প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীন রমণী বিয়ে করতে পারত। এক্ষেত্রে তাদের সন্তান সন্ততিরা মুক্ত বলে বিবেচিত হত।[২৭]

হাম্মুরাবীর আইন[২৮] অনুযায়ী সমাজের প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত পুরুষগণ একাধিক বিবাহ করতে পারতেন। এই বহুবিবাহ সীমিত পর্যায়ে প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুবিবাহের বদলে সমাজের প্রথম বা

তার আইন লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিচ্ছেন অথবা হাম্মুরাবি তার আইনগ্রন্থ দেবতাকে প্রদান করছেন এমন একটি ভাব প্রকাশিত হয়েছে ভাস্কর্যটিতে। আইন সংকলনটি মূলতঃ ব্যবিলনের সিপারে খোদিত হয়েছিলো এবং পরবর্তীতে এলেমাইট বিজয়ী সম্ভবতঃ শুটরুক ন্যাখুনটে (Shutruk–Nakhunte, ১২০০-১১০০ খ্রীষ্টপূর্ব) যুদ্ধের লুণ্ঠিত সামগ্রী হিসাবে ঐটি নিয়ে গিয়েছিলেন পারস্যে এবং পুনঃস্থাপন করেন নিজ রাজধানীতে, হাম্মুরাবির এই আইনগ্রন্থটি পৃথিবীর প্রাচীনতম সুসংবদ্ধ আইনবিধি যা ২১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রাজা উর নাম্মু (URNAMMU) কর্তৃক প্রবর্তিত আইন বিধির উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪-৫৫)।

২৬. Rosamond E. Mack, **THE CODE OF HAMMURABI**, Ministry of Culture & Information state Organization of Antiquitics & Heritage, Baghdad , 1979. p: 7.

২৭. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬; এ. কে. এম, শাহনাওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৮৬।

২৮. হাম্মুরাবীর আইনের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নব প্রতিষ্ঠিত সংঘবদ্ধ ব্যবিলন সাম্রাজ্যে শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধান করা হয়। হাম্মুরাবীর আইন সংকলনের জন্য জ্যাকস দ্যা মর্গানের (Jaques de Morgan) নেতৃত্বে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক মিশন ১৯০১-১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে খননকার্য পরিচালনা করে। এই মিশনের মাধ্যমে সিপার দুর্গে আবিস্কৃত হয় কালো-সবুজ প্রস্তরের একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এখানেই সংকলিত হয়েছে হাম্মুরাবির আইন। ৮ ফুট উচু এই প্রস্তরের উর্ধ্বাংশে রয়েছে একটি ভাস্কর্য। ন্যায়বিচারের দেবতা সূর্যদেব হাম্মুরাবিকে তার আইন লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিচ্ছেন অথবা হাম্মুরাবি তার আইনগ্রন্থ দেবতাকে প্রদান করছেন এমন একটি ভাব প্রকাশিত হয়েছে ভাস্কর্যটিতে। আইন সংকলনটি মূলত ব্যবিলনের সিপারে খোদিত হয়েছিল, পরে ইলামাইট বিজেতাদেব মাধ্যমে তা পারস্যে এসেছিল। হাম্মুরাবির আইন সংকলনের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির একটি দিক ফুটে উঠেছে। ২৮২ টি আইনের ধারাবিশিষ্ট এই সংকলনের শুরুতেই একটি ভুমিকা ছিল। এখানে রাজা তাঁর আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'দেশে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে, দুষ্ট এবং অসৎ লোকদের ধ্বংস করার জন্যে, দুর্বলকে রক্ষা করার প্রয়োজনে তিনি যেন সূর্যের মতো আবির্ভূত হতে পারেন। নিজের বিভিন্ন গুণ, গৌরব ও সাফল্যের বর্ণনা শেষ করে হাম্মুরাবি সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন এভাবে 'দেবতা মারডক যখন জনসাধারণকে ন্যায়পথে পরিচালনা করার এবং দেশকে শাসন করার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করলেন তখনই তিনি দেশীয় ভাষায় প্রণয়ন করলেন আইনের কাঠামো। এভাবেই তিনি জনগণের কল্যাণ সাধন করলেন।' আইন সংকলন সমাপ্ত করে পুনারায় তিনি উল্লেখ করেন, 'আমি হাম্মুরাবি, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, জনসাধারণ সম্পর্কে কখনো আমি

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত পুরুষরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী অসংখ্য দাসী ও উপপত্নী রাখতো। নিঃসন্তান স্ত্রীর স্বামীরা রক্ষিতা রাখতে পারতো এবং এই সকল রক্ষিতাদের স্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হতো। শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর পুরুষরাই নয় অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষরাও ক্রীতদাস রমণীদের সাথে ব্যভিচার করতে পারত। এক্ষেত্রে তাদের সন্তান সন্ততিরা মুক্ত নাগরিক বলে বিবেচিত হত। রাজারা তাদের হেরেমে অসংখ্য উপপত্নী ও রক্ষিতা রাখতেন, এই সকল রক্ষিতাদের ভরণপোষণ রাজকোষ থেকে দেয়া হত।[২৯]

সাধারণভাবে যে কোন বিয়ে বর ও কনের পিতা-মাতা স্থির করতেন। তবে বর ও কনে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ করতে পারতেন। বিবাহের সময় প্রদত্ত বরপণ ও যৌতুক উভয়ই প্রচলিত ছিল। বরের পিতা বরপণ ও কনের পিতা যৌতুক প্রদান করত। বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুক স্ত্রী আজীবন ভোগ করতে পারত। প্রতিটি বিবাহ আইনসংগত রূপে চুক্তি দ্বারা সম্পাদিত হত। আইনসম্মত চুক্তি ছাড়া কেউ কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেও রাষ্ট্র সেই নারীকে স্ত্রী বলে গণ্য করত না। এ সম্পর্কে হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১২ নং অনুচ্ছেদে বলেনঃ "If a man has taken a woman to wife and has not drawn up a contract for her, that women is not a wife."[৩০]

যদি কোন বিবাহিতা নারী তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হত তাহলে রাষ্ট্রীয় আইন মোতাবেক উক্ত নারী ও পুরুষকে বেধে পানিতে ফেলে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত। যদি স্ত্রীর স্বামী তার স্ত্রীর জন্য প্রাণভিক্ষা করতেন সে ক্ষেত্রে রাজা স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রীকে মুক্তি দিতেন। হাম্মুরাবির মতে, "If a married lady is caught lying with another man, they shall bind them and

---

উদাসীন ছিলাম না।' একই সাথে তিনি তার আইন অমান্যকারী বা তাচ্ছিল্যকারীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন। হাম্মুরাবি কর্তৃক আইন সংকলনটি বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে এক অভিনব কৃতিত্বের বিষয়। আইন সংকলক হিসেবে হাম্মুরাবি সর্বাধিক খ্যাতিমান। অবশ্য তিনি আইনের প্রকৃত উদ্ভাবক নন বরঞ্চ বলা যায় তিনি সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির আইনকে গ্রহণ ও সংস্কারের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট কাঠামো প্রণয়ন করেন। আইনগুলো মোটামুটি ৬ টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমনঃ অস্থাবর সম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি), ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, জখম, শ্রম ইত্যাদি। হাম্মুরাবি আইনের কাঠামো বেশ যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির উপর রচিত হয়েছিল। চুরি সম্বন্ধে আইনের যে বিধান রয়েছে তাতে শাস্তির রকমফের হতো ঘটনার স্থান বিবেচনায়, যেমনঃ মন্দির, প্রাসাদ এবং ব্যক্তিগত গৃহ। এ ছাড়াও রয়েছে নাবালক কিংবা দাস অপহরণের, সশস্ত্র ডাকাতি, অগ্নিকান্ডের; পত্তনি সম্পত্তির, মালিকহীন সম্পত্তির, ক্ষেত এবং বাগানের ক্ষতির, মানহানি ও ব্যবসায়িক বিরোধের, দেনা এবং আমানতি টাকা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিধান। এ ছাড়াও রয়েছে শুঁড়িখানা, বিবাহ, ব্যভিচার, তালাক, বিধবাদের অধিকার, উপপত্নী এবং ক্রীতদাসী সম্পর্কে শিশুদের অধিকার, পোষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আইনের বিধান। পেশাগত কর্তব্য এবং অপরাধ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু আইনের ধারা সংকলিত হয়েছে সংকলনের শেষ ধাপে। সুমেরীয় আইনের ভিত্তি থাকলেও হাম্মুরাবির সময় আইনের ক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদলের সাক্ষ্য পাওয়া যায় আলোচ্য সংকলনে। রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য কঠোরতম শাস্তির বিধান ছিল। রাজা কর্তৃক নিযুক্ত জুরিদের দ্বারা বিচার নিস্পন্ন করা হত। দোষ প্রমাণিত হলে দোষী বা তার পরিবারের কারো আবেদন বিবেচনা করা হতো না। সামান্য কিছু ব্যাপারে যেমন, ইতস্তত ঘোরাফেরা করা অথবা অনুমতি ছাড়া সরাইখানা পরিচালনা করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। কারণ হাম্মুরাবি মনে করতেন যে, এ সমস্ত কার্যকলাপ রাজদ্রোহিতার জন্ম দেয়। হাম্মুরাবির আইনে কঠোরতা ছিল। সুমেরীয় আইনের মতো এখানেও শাস্তি ছিল প্রতিশোধমুলক। যেমনঃ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত ইত্যাদি। আবার একজন প্রাসাদ নির্মাতার ভুলের জন্য যদি প্রাসাদ ভেঙে পড়ে এবং তার ফলে যদি প্রাসাদ মালিকের পুত্র মারা যায় তবে শাস্তিস্বরূপ নির্মাতার ছেলেকে মৃত্যুদন্ড পেতে হবে। হাম্মুরাবির ধারণা ছিল শাস্তি ভয় লোকজনকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। বাণিজ্যের ব্যাপারে সুস্পষ্ট আইনের বিধান ছিল। চুক্তি, বিক্রয় এবং ঋণ ইত্যাদি আইনের সূত্র অনুযায়ী নিস্পন্ন হত। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, সে সময় ব্যবিলনীয় আইন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করেছিল এবং মেয়েরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিতে পারত। পুরাতন ব্যবিলনে মেয়েরা ছিল সম্মানিতা। বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণীঃ যেমন, কাঠমিস্ত্রি, ইট নির্মাতা প্রমূখ পেশাজীবীরা আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাওনা লাভ করত। প্রাচীন আমলে বিচারক ছিলেন পুরোহিত বা ধর্মযাজক শ্রেণী। তারা অলিখিত 'বিধাতা প্রদত্ত আইন' জারি করতেন। এতে সাধারণের জন্য বক্তব্য থাকত না। হাম্মুরাবি এই পদ্ধতির উচ্ছেদ করেন এবং আইনগ্রন্থ রচনা করেন-যা জনসাধারণ সহজেই পড়তে পারত। তিনি বিচারালয় তৈরি করেন এবং ধর্মযাজকদের বদলে রাজ কর্মচারীদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেন। হাম্মুরাবির আইনের প্রভাব হিব্রু আইন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। আরব, ফিনিশিয়া এবং এশিয়া মাইনরের অনেক রাষ্ট্রের আইনে ব্যবিলনীয় আইনের প্রভাব রয়েছে। দূরবর্তী প্রভাব হিসেবে বলা চলে রোমান আইনেও হাম্মুরাবির আইনের ছাপ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। (এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭-৮৮; ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত. পৃঃ ১৪)।

২৯. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

৩০. Rosamond E. Mack, **The Code of Hammurabi,** Baghdad. Iraq, p: 26.

Dhaka University Institutional Repository

cast them into the water, if her husband wishes to let his wife live, then the king shall let his servant live."[৩১]

যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোন স্ত্রীর স্বামীকে দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে থাকতে হয় সে ক্ষেত্রে স্বামী তার ভরণ পোষণের জন্য যাবতীয় সকল কিছুর ব্যবস্থা করে যাবে এবং স্বামীর প্রত্যাবর্তন করা না পর্যন্ত স্ত্রী নিজের দায়িত্ব রক্ষা করে চলবে। কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেই স্ত্রী যদি পর পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় বা পর পুরুষের গৃহে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে সেই নারীর জন্যেও পানিতে ফেলে মৃত্যুদন্ড প্রদান করার শাস্তি ছিল। হাম্মুরাবির মতে, "If that woman has not kept herself chaste but enters another man's house, they shall convict that woman and cast her into the water."[৩২] কিন্তু কোন পুরুষ যদি ঘরের বাইরে দীর্ঘদিন ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে যায় সে ক্ষেত্রে সেই স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের গৃহে প্রবেশ করলে বা পর পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তাকে কোন শাস্তি প্রদান করা হতো না। একইভাবে কোন পুরুষ বা স্বামী দীর্ঘদিন বিদেশে বা ঘরের বাইরে কোন স্থানে ভ্রমনে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে গেলে সেই স্ত্রী অন্য পুরুষের গৃহে প্রবেশ করে তার সাথে সহবাস করার ফলশ্রুতিতে তাদের সন্তান হলে এবং সেই স্ত্রীর স্বামী ঘরে প্রত্যাবর্তন করলে তার পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারত। সেক্ষেত্রে তার সন্তানরা নিজ নিজ পিতার কাছে সন্তানের মর্যাদা লাভ করতো।[৩৩]

হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলেন যে, যদি কোন পুরুষ তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, যে বন্ধ্যা অর্থাৎ তার স্ত্রীর গর্ভে যখন কোন সন্তান হয়না সে ক্ষেত্রে স্বামী কণে পক্ষের যৌতুকের সমপরিমাণ অর্থ প্রথম স্ত্রীকে প্রদান করবে এবং স্ত্রীর পিতা কর্তৃক প্রদেয় যৌতুকসমূহ স্ত্রীকে প্রদান করে তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। হাম্মুরাবির মতে, "If a man wishes to divorce his first wife who has not borne him sons, he shall give her money to the value of her bridal gift and shall make good to her the dowry which she has brought from her fathers house and so divorce her."[৩৪]

যদি স্ত্রীর পিতার পক্ষ থেকে কোন যৌতুক বা বিয়ের উপহার প্রদান না করা হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে স্বামী 'এক মানেহ' (maneh-1) সমপরিমাণ রৌপ্য বিবাহ বিচ্ছেদের অর্থস্বরূপ ঐ স্ত্রীকে প্রদান করবে। স্বামী যদি ভুমিদাস হয় সেক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীকে তিন ভাগের এক ভাগ মানেহ (maneh) রৌপ্য বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রদান করবে।[৩৫] হাম্মুরাবি তার আইনবিধির ১৪১ নং অনুচ্ছেদে বলেন, যদি কোন বিবাহিতা নারী স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মানুষের গৃহে বসবাস করে, সকল সময় নিজ বাড়ীর বাইরে থাকার জন্য উন্মুখ থাকে এবং তার এইরূপ আচরণের জন্য সেই নারী তার নিজ গৃহের ক্ষতি করে ও স্বামীর মর্যাদাহানি ঘটায় সে ক্ষেত্রে সেই নারীর স্বামী তাকে কোন প্রকার অর্থ প্রদান করা ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। যদি সেই নারীর স্বামী তাকে তালাক প্রদান না করে সে ক্ষেত্রে তালাক প্রদান করা ছাড়াই গৃহস্বামী অন্য নারীকে বিবাহ করতে পারবে এবং বিবাহিত নারী স্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবে। প্রথম স্ত্রী দাসীরূপে পূর্ব স্বামীর সাথে একই গৃহে অবস্থান করবে।[৩৬]

হাম্মুরবির মতে, "If a married lady who is dwelling in a man's house sets her face to go out of doors and persists in behaving herself foolishly wasting her house and belittling her husband, they shall convict her and, if her husband then states that he will divorce her, her may divorce her, nothing shall be

---

৩১. **The Code of Hammurabi**, ibid, p: 26.
৩২. **The Code of Hammurabi**, ibid, p: 27.
৩৩. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।
৩৪. **The Code of Hammurabi**, ibid, p: 27.
৩৫. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
৩৬. রাজা হাম্মুরাবীর আইনগ্রন্থের আইন বিধির ১৪১ নং অনুচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

given to her as her divorce-money on her journey. If her husband states that he will not divorce her, her husband may marry another woman; that woman shall dwell a slave-girl in the house of her husband."[৩৭]

হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৪৪ ও ১৪৫ নং অনুচ্ছেদে বলেন, যদি কোন পুরুষ কোন নারী পুরোহিতকে বিবাহ করে এবং সেই পুরোহিত নারী তার স্বামীকে কোন দাসী রমণী প্রদান করে এবং সেই দাসীর ঘরে সন্তান হলে তাকে গ্রহণ করতে হত। এরূপ ক্ষেত্রে সেই পুরোহিত নারীর স্বামী অন্য কোন সন্ন্যাসিনীকে (lay-sister) বিবাহ করতে চাইলেও তা করতে পারতো না। কিন্তু যদি কোন পুরুষ কোন পুরোহিত রমণীকে বিবাহ করে এবং সেই পুরোহিত নারীর ঘরে যদি কোন সন্তান সন্ততি না হয় সেক্ষেত্রে সেই পুরুষ অন্য কোন সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু সেই সন্ন্যাসিনী নারী গৃহ স্বামীর প্রথম বিবাহিত পুরোহিত নারীর সমান মর্যাদা লাভ করবে না।[৩৮]

হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৪৮ ও ১৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলেন, যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করে এবং বিয়ের পর সেই রমণী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে সেই পুরুষ অন্য রমণীকে বিবাহ করতে পারবে। তবে সেই পুরুষ ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত স্ত্রীকে তালাক প্রদান করবে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত নারী যতদিন তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে চায় ততদিন সে তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে পারবে এবং স্বামী তার ভরণপোষণ দেবে। যদি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত নারী তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে না চায় সে ক্ষেত্রে সে নারী বিবাহের সময় তার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত যৌতুক ও উপহার সামগ্রী নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে পারবে। হাম্মুরাবির মতে, "If a man has married a wife and ague attacks her, and he sets his face to marry another woman, he may marry her. He shall not divorce the wife whom ague has attaced; she shall dwell in the house which he has built, and he shall continue to maintain her so long as she lives. If that woman does not consent to dwell in the house of her husband, he shall make good to her dowry which she brought from the house of her father and so she shall go away."[৩৯]

রাজা হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৭০ নং অনুচ্ছেদে বলেন, যদি কোন পুরুষের প্রথম স্ত্রীর ঘরে সন্তান সন্ততি হয় এবং সেই পুরুষের অধীনস্থ দাসী রমণীর ঘরেও সন্তান সন্ততি হয় সেক্ষেত্রে স্বামী যদি তার জীবিত অবস্থায় দাসী নারীর ঘরের সন্তান সন্ততিদেরকে সন্তানরূপে স্বীকৃতি প্রদান করে তবে স্বামীর মৃত্যুর পর দাসী রমণীর সন্তানগণ তাদের পিতার সম্পত্তির একটি বিশেষ অংশ সমানুপাতিক হারে লাভ করবে। হাম্মুরাবির মতে, "If the first wife of a man has borne him sons and his slave-girl has borne his sons, and the father in his life-time states to the sons whom the slave-girl has borne him; You are my sons, he shall Count them with the sons of the first wife. After the father goes to his fate, the sons of the first wife and the sons of the slave-girl shall take proportionate shares in the property of the paternal estate; an heir, l being a son of the first wife, shall choose and take the first share at the divison."[৪০]

হাম্মুরাবির সময়ে ব্যাবিলনে মন্দিরের পুরোহিতরা এক বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার লাভ করতো। হাম্মুরাবির পূর্বের ও পরের রাজাগণ রাষ্ট্রীয় খরচে মন্দির নির্মাণ করে দিতেন। রাজা যখনই কোন যুদ্ধ জয়লাভ করতেন তখনই সম্পদের সর্বোচ্চভাগ মন্দিরের কোষাগারে জমা করতেন। যুদ্ধে জয় লাভের ফলে প্রাপ্ত এক বিশেষ সংখ্যক রমণীদেরকে মন্দিরের দেবদাসীরূপে প্রদান করা হতো। এইসকল দেবদাসীরা

---

[৩৭]. Rosamond E. Mack, **The Code of Hammurabi**, Baghdad, Iraq. p: 28.
[৩৮]. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
[৩৯]. **The Code of Hammurabi**, Ibid. p: 29.
[৪০]. **The Code of Hammurabi**, Ibid. p: 31-32.

Dhaka University Institutional Repository

মন্দিরের পুরোহিতদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। যদিও হাম্মুরাবি তার আইন গ্রন্থের কোথাও এমনি ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করেননি। হাম্মুরাবির আইন গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তৎকালীন ব্যাবীলনীয় সমাজে পুরুষরা একই সময়ে প্রথম স্ত্রী থাকাকালিন অবস্থায় অসংখ্য দাসী রাখতে পারতো এবং তাদের সাথে ব্যভিচারও করতে পারতো। প্রথম স্ত্রীর ম্যালেরিয়া জ্বরের অজুহাতে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারতো। মন্দিরে পুরোহিতরা অসংখ্য সেবাদাসীদের সাথে নির্বচার ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতো। পুরোহিতদের সকলে ভয় পেতো এবং সবাই সমীহ করে চলতো। এরই ফলশ্রুতিতে পুরোহিতদের যৌন কেলেঙ্কারীর কথা কেউ সহজে প্রকাশ করতো না। এই পুরোহিতদের আবার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল রাজা ও তার পরিষদবর্গ। যার কারণে পুরোহিতরা ছিল সাধারণ মানুষের ধরা ছোয়ার বাইরে।[৪১]

হাম্মুরাবীর আইনে নারীকে গৃহপালিত জীবজন্তুর পর্যায়ে ফেলা হত। এ কারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হতো। সে ঐ মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে রেখে দিক, সেটা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার ছিল।[৪২]

প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের সমাজে বিশেষ কোন মর্যাদা ছিলনা। নারীরা পণ্যের মত ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হতো। রাজা হাম্মুরাবি নারীদেরকে বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতদের অবাধ ব্যভিচারে লিপ্ত থাকাকে রাজা হাম্মুরাবিও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন।[৪৩]

---

৪১. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯-৬০।

৪২. ডঃ মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর - ২০০৪), পৃঃ ১৩।

৪৩. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশরীয় সভ্যতায় নারী

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী নীল-এর অববাহিকায় খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার মতান্তরে পাঁচ হাজার বৎসর[৪৪] পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরে দুটি সভ্যতার উদ্ভব ঘটে[৪৫] যা ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতা[৪৬] নামে পরিচিতি লাভ করে। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতা এক অনন্য সৃষ্টি।[৪৭]

প্রাচীন মিশরীয় সমাজ[৪৮] কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমনঃ (ক) রাজপরিবার (খ) পুরোহিত (গ) অভিজাত (ঘ) লিপিকর (ঙ) ব্যবসায়ী (চ) শিল্পী (ছ) কৃষক ও ভুমিদাস।[৪৯]

প্রাচীন মিশরীয় সমাজে বর্ণপ্রথার তেমন কোন প্রমাণ পওয়া যায় না। তবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক বেশী। ধনীরা সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করত, তাদের খাদ্য ছিল বিলাসী এবং তারা বহুমূল্যবান অলংকার ও পোশাকাদি ব্যবহার করত। অপরদিকে দরিদ্রদের অবস্থা ছিল জরাজীর্ণ। শ্রমিকরা

---

৪৪. অধ্যাপক ফ্লিন্ডার্স পেট্রি মিশরীয় সভ্যতাকে খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০০ বৎসরের প্রাচীন বলে চিহ্নিত করেন। (ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮)।

৪৫. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

৪৬. সম্ভবত অপর কোন একক সভ্যতা মানবজাতির ক্রমবিবর্তন, উন্নতি ও উৎকর্ষতায় এত অধিক অবদান রাখতে পারেনি।

৪৭. রফিকুল আলম, **বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা**, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, মে-২০০১), পৃঃ ২৪।

৪৮. THE BOOK OF DEAD গ্রন্থ থেকে প্রাচীন মিশরের ধর্মীয় ও সামাজিক দিক সম্পর্কে জানা যায় যে, পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম ৩৪৭৩ মাইল বিশিষ্ট নীল নদের অববাহিকায় খ্রিষ্টপূর্ব চারহাজার বছর পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরে দুটি সভ্যতার উদ্ভব হয়। GEORGE SARTON-এর মতে, এর স্থিতিকাল ৩৪০০ থেকে ২৪৭৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এবং সেটা ছিল পিরামিড যুগ। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজ বংশের কাল ২৯৮০ থেকে ২৪৭৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, অর্ধ সহস্র বছর। (**A History of Science**, Vol-1, George sarton-এর বাংলা অনুবাদ, **প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭০, পৃঃ ২৯)।

LEONARD COTTREL তাঁর LAND OF THE PHAROAHS নামক গ্রন্থে এই প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজত্বকাল ২৭৮০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২১০০ বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রাচীন উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের দুটি রাজ্য ৩৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে MENES নামক একজন শাসক একটি রাজ্যে পরিণত করেন। মেমফিস (Memphis) নামক শহরে (বর্তমান কায়রো নগরীর অনতিদূরে) এই সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে থিবেস (Thebes) শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

প্রাচীন মিশরীয়রা জাতিতে শংকর ছিল। তারা ছিল কালো রংয়ের বেঁটে আকৃতির, কালো চুল এবং নাক ছিল সামান্য বক্র। বিজ্ঞানীরা ধারণা করে তাদের মধ্যে নিগ্রো ও সেমেটিক রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়াও তাদের মাঝে পশ্চিম এশীয় জনগোষ্ঠীরও মিশ্রণ ঘটেছে। পরবর্তীতে এরা সেমেটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। মিশরের প্রখ্যাত সম্রাটদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রথম থাটমোস (১৫৪৫-১৫১৪ খ্রীষ্টপূর্ব) ও তৃতীয় রামেসিসের (১১৯৮-১১৬৭ খ্রীষ্টপূর্ব) নাম। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুর'আনে মিশরের রাজাকে ফেরাউন বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ে বনী ইসরাঈলদের মিশর ত্যাগের সময় যে ফেরাউনকে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করার কথা বলা হয়েছে FATHER DE VOX তার The Ancient History of Israil (প্যারিস ১৯৭১) নামক পুস্তকে এই ফেরাউনকে দ্বিতীয় রামেসিস বলে উল্লেখ করেছেন। এই যুক্তি খন্ডন করে ড. মরিস বুকাইলী তাঁর The Bible, The Quran and Science নামক গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করে বলেন যে সেই ফেরাউন ছিল দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্র মারনেপতাহ্। মুসা (আঃ) যখন মাদিয়ানে ছিলেন তখন দ্বিতীয় রামেসিসের মৃত্যু হয় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্র মারনেপতাহ্। প্রাচীনকালের মিশরের রাজারা নিজেদের মনে করতেন সূর্য দেবতা 'রে' (RAY) এর পুত্র। সে কারণেই সার্বভৌম প্রাচীন রাজারা পরিচিত হতেন 'ফারাও' (PHARAOH) নামে যা তাদের উপাধিমাত্র। এই ফারাওদেরকেই কুর'আনে ফেরাউন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬)।

৪৯. সাম্রাজ্যের যুগে আরেকটি শ্রেণী হিসেবে সৈন্যদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। অভিজাতদের পরেই তাদের অবস্থান ছিল। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ঘনবসতিপূর্ণ কাদামাটির জীর্ণ ঘরে বাস করত। কৃষকরা কিছুটা ভালো অবস্থায় থাকলেও তাদের প্রাচুর্য ছিল না।[৫০]

মিশরীয় সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। যার ফলে উচ্চ বংশের নারীরা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত। বংশানুক্রমে সম্পত্তির উপর মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত ছিল। ফলস্বরূপ ফারাও প্রথম থাটমোসের (Thutmose-1) মেয়ে হ্যাটশিপুট (Hatsheput) অথবা হাটাসু (Hatasu) মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন (১৫২০-১৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনিই ছিলেন বিশ্বের প্রথম মহিলা শাসক।[৫১]

তৎকালীন মিশরীয় পরিবার প্রথায় যদিও এক বিবাহের প্রচলন ছিল তা সত্ত্বেও রাজা, পুরোহিত এবং ধনী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ বিলাসী জীবন যাপন করতেন। যুদ্ধবন্দী হিসেবে যেসমস্ত নারীদের মিশরে আনা হত তাদের মধ্য থেকে উৎকৃষ্ট নারী রাজা, সমাজের পুরোহিত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ভাগে পড়ত। এ সকল যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে শাসকবৃন্দ ও সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ অবাধ ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতেন। এছাড়াও তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকত অসংখ্য সেবাদাসী। এইসকল সেবাদাসীরাও সমাজের উচ্চশ্রেণীর সাথে নির্বিচার ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হত। এরফলে রাজা, পুরোহিত ও সমাজের ধনী শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ঘটে এবং নারীদের সামাজিক মর্যাদা বিলুপ্ত হয়। তৎকালীন সমাজে নারীদেরকে পণ্য হিসেবে নিলামে বিক্রি করা হত। সমাজের ধনী শ্রেণী অধিক দামে তাদেরকে ক্রয় করে নিজেদের সেবাদাসী করে রাখত এবং তাদের সাথে অবাধ ব্যভিচারে লিপ্ত হত।[৫২]

প্রাচীন মিশরীয় সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ছিল - রাজা, পুরোহিত ও উচ্চবিত্ত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা, অসংখ্য উপপত্নী গ্রহণ, অসংখ্য সেবাদাসী ও অবাধ ব্যভিচারের এক অশ্লীল চিত্র। এছাড়াও অর্থের বিনিময়ে নিলামে বিক্রি হওয়া নারীদের করুণ পরিণতি স্পষ্টভাবে ফুঠে ওঠে। তবে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন ধনী পুরুষের যেমন অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নী ছিল ঠিক তেমনিভাবে ধনী রমণীদেরও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক স্বামী ছিল।[৫৩]

গ্রীক সভ্যতায় নারী

প্রস্তর শিলাময় বিস্তৃত গ্রীক উপদ্বীপ এমন একটি প্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি যা মৌলিকত্বের দিক দিয়ে সকল ইউরোপীয় ও প্রাচ্য সভ্যতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, পৃথিবীর পাশ্চাত্য সভ্যতাসমূহের মধ্যে যে সভ্যতা পাশ্চাত্য জগতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটি হলো গ্রীক সভ্যতা।[৫৪] গ্রীকরা ছিল অনেকাংশে ধর্মনিরপেক্ষ এবং যুক্তিবাদী জাতি। জ্ঞানকে তারা সবচেয়ে বেশী

---

৫০. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

৫১. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

৫২. মিশরের জুলিয়াস সিজারের পরবর্তী শাসক অক্টোভিয়ান সীজারের সময়কালীন দ্বাদশ টলেমী অলিটিস এর কন্যা সপ্তম ক্লিওপেট্রার জীবন নিয়ে তৎকালীন সময়ে CLEOPATRA নামে একটি ছায়াছবি নির্মিত হয়। সেই ছায়াছবির মধ্যেও তৎকালীন মিশরীয় সমাজ ব্যবস্থার চিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও হযরত মূসা (আঃ) এর সমকালীন মিশরের সমাজব্যবস্থা ও তার উপর Ten Commandments নামে একটি ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে। এই ছায়াছবিতে তৎকালীন মিশরীয় সমাজ ব্যবস্থার চিত্র সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। (Pauly Wissowa-২১ খন্ড, ১৯২১, পৃঃ ৭৩২-৭৮৯)। সর্বমোট তেত্রিশজন ক্লিওপেট্রা বিখ্যাত ছিল যাদের কথা বিস্তারিতভাবে Pauly Wissowa গ্রন্থে[৫২] উল্লেখ রয়েছে। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬)।

৫৩. রাশিয়ার মস্কোতে রক্ষিত GOLENISHCHEV প্যাপাইরাস ও লন্ডনে রক্ষিত RHIND প্যাপাইরাস থেকে তৎকালীন মিশরীয় রাজাদের তালিকা এবং তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ছবির খন্ড চিত্র লিখিত রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও তৎকালীন মিশরীয় সমাজে বহুবিবাহ প্রথার এবং একাধিক উপপত্নী রাখার স্বপক্ষে রায় প্রদান করে। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬)।

৫৪. গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-হেলেনিক (Helenic) ও হেলেনিস্টিক (Helenistic)। গ্রীক সভ্যতার গঠন পর্ব অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে গ্রীকদের এই ভূ-খন্ডে আগমনের সময় থেকেই হেলেনিক যুগের সুত্রপাত। এসময় সভ্যতার মূলকেন্দ্র ছিল গ্রীক উপদ্বীপ এবং প্রধান শহর ছিল এথেন্স। হেলেনিক যুগের পরিধি ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৭/৩৩৮ অব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মেসিডোনের রাজা ফিলিপ কর্তৃক গ্রীকদেশ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। অপরদিকে দ্বিতীয় পর্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রাধান্য দিয়ে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল। গ্রীক জাতির সভ্যতার এত উচ্চতর স্থানে পৌছানোর অন্যতম কারণ ছিল পূর্ববর্তী সভ্যতার অনুসরন। তারা পূর্ববর্তী সভ্যতার ভালো ও গ্রহণযোগ্য দিকগুলি খুব সহজেই গ্রহণ করেছিল, যা তাদেরকে খুব সহজেই ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছিল এবং বিশ্বের দরবারে উন্নত ও গৌরবময় জাতি হিসেবে পরিচিত করে তুলেছিল।[৫৫]

গ্রীক সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় এত বেশী উন্নতি সাধন করেছিল যে এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল অনেক সভ্যতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটেছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের। তবে উন্নত সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতা থাকলেও প্রাথমিক পর্যায়ে এই জাতির নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইন সম্পর্কিত অধিকার, সামাজিক আচার আচরণ প্রভৃতি দিকে নারীর মর্যাদা ছিল নিতান্ত অধ:পতিত। গ্রীকদের দৃষ্টিতে 'নারী ছিল নিকৃষ্ট জীব'।[৫৬] নারীকে সকল অনর্থ ও সর্বনাশের মুল কারণ বলা হত। গ্রীকদের ধারণা ছিল পৃথিবীতে যত অনাচারের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে তা সবই নারীর কারণে। প্রাচীন গ্রীকে নারীসমাজ ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত, অবহেলিত ও অসামাজিক বস্তু। নারীদেরকে তারা বিষাক্ত বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করত। গ্রীক সভ্যতায় নারীর মর্যাদা কিরূপ ছিল তা সক্রেটিসের ভাষায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, "Woman is the greatest source of chose and disruption in the world. She is the 'Dafali Tree' which out wordly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail."[৫৭]

গ্রীক সভ্যতায় নারীর অবস্থান সম্পর্কে দার্শনিক এন্ডারসকি (Anderosky) বলেনঃ "Cure is possible for fire–burns and snake–bite; but it is impossible to arrest woman's charms." "অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্প দংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব, কিন্তু নারীর যাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।"[৫৮] অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে নারী আগুন ও সাপ থেকেও বেশী ভয়ংকর ছিল তাই তৎকালীন সময়ে তারা আগুন ও সাপের চেয়েও নারী থেকে বেশী সতর্কতা অবলম্বন করত।[৫৯] অতীতের সভ্যতা গর্বিত সমাজে নারীরা ছিল পুরুষের দাসী মাত্র। গ্রীক সমাজে নারীদেরকে সমাজের কলংক মনে করে তাদেরকে জীবন্ত প্রথিত করা হত। নারীরাও যে মানুষ তাদেরও যে সামাজিক অধিকার আছে একথা তারা কল্পনাও করত না। তাই নারীরা ছিল সমাজের সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত অবহেলিত ও ঘৃণার পাত্রী।[৬০] সমাজে তারা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুন্ডা মনে করা হত।[৬১]

ফিলিপের পুত্র মহাবীর আলেকজান্ডারের সময় খ্রীষ্টপূর্ব (৩৩৬-৩২৩ অব্দ) থেকে শুরু হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬/১৪৮ অব্দে রোমানদের পূর্ব হেলেনীয় অঞ্চল দখল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই দ্বিতীয় পর্যায়কে ঐতিহাসিকেরা হেলেনিষ্টিক (Helenistic) বা উত্তর হেলেনীয় সময়কাল হিসেবে অভিহিত করেন। (ড. এ. এফ. এম শামসুর রহমান, **প্রাচীন পৃথিবীঃ ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতা**, রাজশাহীঃ রোজেন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মে-২০০০), পৃঃ ২৬; এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১)।

৫৫. ইতিহাস থেকে জানা যায়, গ্রীকদের পূর্বে প্রাচ্যদেশে অনেক সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পথনির্দেশ করেছিল। গ্রীকদের বিজ্ঞান ও দর্শন মিশরকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। গ্রীক বর্ণমালা ফোনেশীয় বর্ণমালা থেকে উদ্ভুত। আর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে হেলেনিকদের ধারণা মূল এজিয়ান প্রভাবে প্রভাবান্বিত। (রফিকুল আলম, **বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬)।

৫৬. গ্রীক পূরাণে কল্পিত নারী পান্ডোরাকে মানবের দু:খ দুর্দশার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত হাওয়া (আ:) কে ইহুদী পূরাণে একই বিষয়ের জন্য দায়ী করা হয়েছে। হযরত হাওয়া (আ:) সম্পর্কিত কল্পিত মিথ্যা কাহিনী ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, আইন কানুন, সামাজিক ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র প্রভৃতিকে যে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তা কারো অজানা নয়। পান্ডোরা সম্পর্কে তারা যে ধারণা পোষণ করত তাও তাদের মানসিকতাকে সমভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃঃ ১২)।

৫৭. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪), পৃঃ ১-২।

৫৮. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, **The position of Woman in islam**, (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1982), p: 9-10.

৫৯. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, (ঢাকাঃ হৃদ প্রকাশন, মার্চ ২০০০), পৃঃ ২৩।

৬০. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, মার্চ ২০০১), পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক সভ্যতায় সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোন সম্মান বা মর্যাদা ছিল না। সকল সম্মান ও মর্যাদা পুরুষের জন্য সংরক্ষিত ছিল।[৬২] পুরুষরা নারীদেরকে নিজেদের মনোরঞ্জন ও সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করত। প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ ভেবোস্তিন বলেন, "আমরা জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য পতিতালয়ে যায় এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করি।"[৬৩] জনৈক গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, "দুইটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ, বিয়ের দিন এবং তার মৃত্যুর দিন।"[৬৪] আয়োনিয়ার গ্রীকদের মধ্যে নারীদেরকে নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রায়ই আটকে রাখা হত, কখনও জনসাধারণ্যে বের হতে দেয়া হত না। গ্রীকরা প্রেমের দেবতার পূজা করত, তাদের নৈতিক আচরণের মহামারি এবং নিকৃষ্টতম দুষ্কৃতি বা পাপ সমগ্র গ্রীসে সার্বজনীন রূপ লাভ করেছিল।[৬৫]

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেকী তার 'ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "সামগ্রিকভাবে সতী-সাধ্বী গ্রীক নারীদের মর্যাদা ছিল চরম অধঃপতিত। তাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হত দাসত্বের শৃংখলে। অর্থাৎ শৈশবে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বিধবা হলে ছেলের তত্ত্বাবধানে। নারীর তুলনায় পুরুষের অধিকার সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য ছিল। আইনগতভাবে নারীর তালাকের অধিকার ছিল কিন্তু সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারত না। কারণ আদালতে এ ধরণের কথা প্রকাশ করা গ্রীকদের লজ্জা শরম বোধের পরিপন্থী ছিল।"[৬৬]

প্রাচীন গ্রীসে আইনগতভাবে নারী সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত ছিল। পণ্যের মত তারা বাজারে বিক্রি হত। যেসব বিষয়ে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো সেখানে তাদের কোনই স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। গ্রীকরা নারীদের উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। নারীদের বিবাহের বিষয়টা সম্পূর্ণ পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী পছন্দ করার অধিকার নারীর ছিল না। পুরুষরা তাদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করত নারীদেরকে তাকেই গ্রহণ করতে হতো। নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার বা মতামত প্রকাশের কোন অধিকার ছিল না। সর্বদা তাদেরকে পিতা, স্বামী, ভাই ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের মেনে চলতে হতো। গ্রীক সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার পুরুষের জন্য নির্ধারিত ছিল। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া নারীকে স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকার দেয়া হত না। বরং এই অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হতো।[৬৭] পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারত না। পুরুষরা নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করত।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য গ্রীকনগরীর স্পার্টাবাসীরা কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে নারীকে কিছু কিছু নাগরিক অধিকার দিয়েছিল। স্পার্টার নারীদের উত্তরাধিকার, তালাক ও আর্থিক লেনদেনের অধিকার ছিল। এটা পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি বা তার প্রতি উদারতা ছিল না। বরং এর কারণ ছিল স্পার্টার দীর্ঘ যুদ্ধাবস্থা। পুরুষরা সর্বক্ষণ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতো, তাই তাদের অনুপস্থিতিকালে গৃহস্থালির সমস্ত কাজকর্ম নারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। একারণে স্পার্টার নারীরা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক নগরীর নারীদের চেয়ে বেশী রাস্তায় বের হতো এবং অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতা ভোগ করত।[৬৮]

---

[৬১]. ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর ২০০৪), পৃঃ ৯।

[৬২]. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৩), পৃঃ ১২।

[৬৩]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

[৬৪]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, মে ১৯৯৭), পৃঃ ২৩।

[৬৫]. ডলিঞ্জার, **দি জেন স্টাইল এন্ড দি জু**, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৩৯।

[৬৬]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪।

[৬৭]. কোন নারী যখন তালাক চাওয়ার জন্য আদালতে যেত তখন স্বামী পথিমধ্যে ওঁত পেতে বসে থাকত এবং তাকে পাকড়াও করে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। (ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯)।

[৬৮]. ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক সভ্যতার গৌরবজ্জল যুগে সতী-সাধ্বী নারী মহামুল্যবান সম্পদরূপে পরিগণিত ছিল। সামাজিকভাবে সতী নারীদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা হতো। সম্ভ্রান্ত গ্রীক পরিবারে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। নারীরা পর্দা মেনে চলত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে নারী ও পুরুষের জন্য কক্ষ আলাদা থাকত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা নারী-পুরুষের মিলিত বৈঠকে যোগদান করত না। এবং বিবাহের মাধ্যমে পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকেই তারা সম্মানজনক মনে করত। সেই সমাজে বীরাংগনার জীবন যাপন অত্যন্ত ঘৃণিত ও অভিশপ্ত ছিল।[৬৯]

অত:পর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করল তখন নারীরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলো এবং তারা পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে অবাধে মেলামেশা শুরু করলো। পরবর্তীতে তাদের ধর্মও নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিল। ফলে নির্লজ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, পতিতালয় রূপান্তরিত হলো উপাসনালয়, রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থলে। সেখানে শিল্প ও সাহিত্যের নামে নগ্ন মূর্তি স্থাপন করা হলো। গ্রীকদের মতে, "পতিতা ছিল প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী এফ্রোডাইটের প্রতিনিধি। সে তার স্বামীদেরকে পরিত্যাগ করে অপর তিন দেবতার সাথে অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছিল।"[৭০] সেকালে পতিতা সম্প্রদায় এতখানি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিল যে ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। পতিতালয় গ্রীক সমাজের আপামর জনসাধারণের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা এই আড্ডাখানায় গমন করত এবং তাদের পরিবেষ্টিত করে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাত। সেকালে পতিতাগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করত এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় তাদের মতামতকে চুড়ান্ত বলে গণ্য করা হত।

সৌন্দর্য্যপূজা গ্রীকদের কামাগ্নিকে প্রবলভাবে প্রজ্জলিত করে দিয়েছিল। সাংস্কৃতিক উন্নতি যখন সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান ও রসবিজ্ঞানের (Aesthetics) নামে নগ্নতা ও অবাধ ব্যভিচার পূজার প্রবর্তন করল তখন কামাগ্নির লেলিহান শিখা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, গ্রীকজাতিকে স্বাভাবিক পথ হতে বিচ্যুত করে এক প্রকৃতি বিরুদ্ধ পথে পরিচালিত করল।[৭১] অবশেষে ধর্মও তাদের পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করল।[৭২] কামাতুর ধর্মীয় পুরোহিতগণ কামাসক্ত মন নিয়ে ধর্মীয় শাস্ত্র রচনা করতে শুরু করল। অবশেষে ধর্মীয় গ্রন্থ গ্রীক পুরাণে কল্পিত কামদেবী এফ্রোডাইট (Afrodite)[৭৩] স্থান লাভ করল। স্ত্রী এবং মাতার পরিবর্তে নারী কামদেবীর আসন গ্রহণ করল।[৭৪] নির্লজ্জ নারী দেবযানী বা দেবীতে পরিণত হলো। ব্যভিচার কার্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মর্যাদায় উন্নীত হলো এবং গণিকালয়গুলি উপাসনা মন্দিরে পরিণত হলো। এরূপ কামপূজার দ্বিতীয় সুস্পষ্ট পরিণাম এই হয়েছিল যে, গ্রীকজাতির মধ্যে 'লূত' সম্প্রদায়ের[৭৫] দুষ্কার্যাবলী মহামারীর ন্যায় সংক্রমিত হয়েছিল এবং তা সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিকভাবে সমর্থন লাভ

---

[৬৯]. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ২।

[৭০]. Said Abdullah Seif Al–Hamity, **Women in Islam**, (Lahore: Islamic Publication Ltd. October 1979), p: 2-3.

[৭১]. অবশেষে তাদের মধ্যে পুরুষে পুরুষে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং এর নিদর্শন স্বরূপ 'হারমোডিস ও আরাসতোজেন' নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করেছিল। (ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)।

[৭২]. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

[৭৩]. কামদেবী এফ্রোডাইট (Afrodite) এর পূজা সমগ্র গ্রীসে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। গ্রীক পূরাণে কামদেবী সম্পর্কে এরকম বর্ণিত আছে যে, সে জনৈক দেবতার পত্নী হয়ে অপরাপর তিনজন দেবতা ও একজন মানুষের সাথে প্রেমপূর্ণ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং তার ফলে যে সন্তান জন্মলাভ করেছিল সেই হচ্ছে গ্রীক পূরাণের প্রেম দেবতা 'কিউপিড'। এই কামদেব বা কিউপিড গ্রীকদের উপাস্য ছিল। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, যে জাতি এরকম জঘন্য চরিত্রকে শুধু তাদের আদর্শ নয় উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল তাদের নৈতিক মানদণ্ড কোন স্তরে নেমেছিল। (সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪; ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩)।

[৭৪]. মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী, **বিশ্ব সভ্যতায় নারীর মর্যাদা**, (ঢাকাঃ ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, এপ্রিল ১৯৭৯), পৃঃ ৭।

[৭৫]. আল কুর'আনে উল্লেখ আছে যে, লূত (আঃ) এর জাতি নৈতিক বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হলে আল্লাহ পাক সমগ্র জাতির প্রতি আসমানী গযব নাযিল করেন, এর একমাত্র কারণ ছিল এই জাতির বিপথগামী ব্যক্তিদের নৈতিক দুষ্কার্য।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, এই যুগের পর গ্রীকদের জাতীয় জীবনে আর কোন নবযুগের সূত্রপাত হয়নি।[৭৬]

রোম সভ্যতায় নারী

গ্রীক সভ্যতার গৌরব বিবর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই ইটালীর টাইবার নদীর তীরে আরেকটি সভ্যতা ব্যপকতর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল।[৭৭] রোমক সভ্যতা[৭৮] নামে পরিচিত এই সভ্যতা গ্রীসের স্বর্ণযুগের সমকালে যাত্রা শুরু করে ৫৩ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সভ্য পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল জয় করে এক শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে পরবর্তী ছয় শতক পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে।[৭৯] প্রাচীনকালে ইটালীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাষা ও প্রথাগত ব্যবধানের ফলে অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এসকল রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হয়ে ঐতিহাসিকভাবে রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে।[৮০]

রোমানদের কৃতিত্ব শুধু সামরিক বিজয়ের মধ্যেই সীমিত ছিল না বরং সাংস্কৃতিক দিক থেকে কলা, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা গ্রীকদের নিকট থেকে অনেক কিছুই শিক্ষালাভ করেছিল।[৮১] এ সম্পর্কে ম্যাক কে. হিল ও বাকলার বলেন, "Rome's achievement lay in the ability of the Romans not only to conquer people but to incorporate them into Roman system."[৮২]

---

[৭৬]. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

[৭৭]. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২।

[৭৮]. পূর্ববর্তী অন্যান্য সভ্যতার মতো রোমক সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনেও তার ভৌগলিক অবস্থার প্রভাব বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপীয় ভূখন্ডে অবস্থিত ইটালীর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তরে আল্পস পর্বত থেকে এ্যাপেনীয় পর্বতমালা পর্যন্ত ৭০ মাইল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ৩২০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বাঞ্চলে ৬৫০ মাইল দীর্ঘ এড্রিয়াটিক সাগর ভূমধ্যসাগর থেকে একটি বাহুর মতো বেরিয়ে ইটালী ও পশ্চিম যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে একটি সংযোগ তৈরী করেছে। এই সাগরের তীরে উত্তর-পূর্ব ইটালী অংশে প্রাচীন সমুদ্রবন্দর এড্রিয়া গড়ে উঠেছিল। ইটালীর পশ্চিমাংশে ছিল ভূমধ্যসাগরের জলভাগ। প্রাচীনকালে এই সাগরীয় অংশের নাম ছিল ইট্রুস্কান সাগর। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২; ড. এ.এফ.এম শামসুর রহমান, **প্রাচীন পৃথিবীঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতা**, ঢাকাঃ রোজেল প্রকাশনী, মে-২০০০, পৃঃ ১৫৭)।

[৭৯]. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২।

[৮০]. প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী উচ্চ পুরোপোলীয় যুগের মানুষ ইটালী অঞ্চলে বসবাস করত। সম্ভবত প্রাচীনতমকালে ক্রোমেনিয়া মানুষের বংশধররা বসতি গড়ে তুলেছিল। নবোপলীয় যুগে এ অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী জাতিগোষ্ঠী হচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জনগণ, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও গলের জাতিসমূহ। ব্রোঞ্জযুগে নতুনধারায় অনুপ্রবেশকারীদের আগমন ঘটতে থাকে। এ যুগে আল্পসের উত্তরে পার্বত্যাঞ্চল থেকে সর্বপ্রথম ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর জনগণের আগমণ ঘটে। পশুপালন ও কৃষিজীবি এই জনগোষ্ঠী ইটালীতে ঘোড়া ও দু'চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে আসে। এরা ব্রোঞ্জ সংস্কৃতির ধারক ছিল। পরে ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের দিকে ইটালিতে লোহার ব্যবহার শুরু হতে থাকে। ধারণা করা হয়, ইটালী ও রোমের জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ ছিল এই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি। ইট্রুস্কান নামে পরিচিত জাতিই প্রথম ইটালীকে গড়ে তুলেছিল। এই ইট্রুস্কানদের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ মনে করতেন যে, ইট্রুস্কানরা এশিয়া মাইনর থেকে এসেছিল। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস বলেছিলেন যে ,তারা লিডিয়া থেকে এসেছিল। আধুনিক যুগের অনেক পন্ডিতব্যক্তি মনে করেন যে, ইট্রুস্কানরা প্রাক ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর বংশধর এবং তারা উত্তরাঞ্চল থেকে ইটালীর ভূ-খন্ডে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এই মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না এই কারণে যে, তাদের কবর দেবার পদ্ধতি এবং অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে মনে করা হচ্ছে যে, গ্রীক উপনিবেশের কারণে ইট্রুস্কান শিল্পকলার জন্ম হয়। দক্ষিণ ইটালীতে খৃস্টপূর্ব ৭ম-৮ম শতাব্দীতে তারা গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নাগরিক জীবন শুরু করে এবং পাহাড়ের চূড়ায় নগরীর গোড়াপত্তন করে। ছোট ছোট নগরীতে বিভক্ত ইট্রুস্কানরা বৃহৎ কোন জাতি গড়ে তুলতে পারেনি। সাংস্কৃতিক ভাষাগত ঐক্য থাকলেও রাজনৈতিক একতার অভাবে সহজেই তারা রোমান আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইটালী ভূখন্ডে প্রবেশ করে ইট্রুস্কানরা ধীরে ধীরে একটি সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। (রফিকুল আলম, **বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭; এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩)।

[৮১]. ড. এ. এফ. এম শামসুর রহমান, **প্রাচীন পৃথিবীঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩।

[৮২]. John p. Mckay Bennet D. Hill & John Buckler, **A History of world societies**, (Boston: Hughton Mifflin, 1992), p: 172.

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায়, গ্রীক জাতির পরেই পৃথিবীতে রোমকদের উন্নতির সুযোগ এসেছিল। তারা জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় এতদুর উন্নতি লাভ করেছিল যে, তার উপর ভিত্তি করে অনেক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে।[৮৩] কিন্তু এতসব উন্নতি সত্ত্বেও রোমের সামাজিক অবস্থা গ্রীসের মতই ছিল। যে নিকৃষ্টতম দুষ্কৃতি বা পাপ সমগ্র গ্রীসে সার্বজনীন রূপ লাভ করেছিল পরবর্তীকালে তা রোমে বিস্তার লাভ করেছিল।[৮৪] রোমান সমাজে নারীর কোন মর্যাদাই ছিল না। তারা নারীকে মানবতার জন্য একটা দুর্বহ বোঝা মনে করত।[৮৫]

রোমান সভ্যতায়ও সামাজিক ক্ষেত্রে উত্থান ও পতনের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে রোমানরা বর্বর[৮৬] জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রাচীন রোমান সমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করতে পিতা বাধ্য থাকতো না। শিশু ভুমিষ্ঠ হবার পর তাকে পিতার পায়ের কাছে রাখা হতো। পিতা যখন তাকে ধরে উপরে তুলতো তখন প্রমাণিত হতো যে সে তাকে গ্রহণ করেছে, আর পিতা তাকে তুলে না নিলে ধরে নেয়া হত তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরূপ অবস্থায় শিশুকে কোন খোলা ময়দানে অথবা উপাসনালয়ের বেদীতে রাখা হত। ছেলে হলে পরবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতো নচেৎ শিশু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধুকে ধুকে মারা যেত।[৮৭] রোমক সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে নারীদের তেমন মর্যাদা ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে আইন দ্বারা নারীদের কিছুটা মর্যাদা দেয়া হলেও পুরুষের সমান মর্যাদা তারা পেত না।

সনাতন রোমান সমাজ জীবনে পরিবারের অভ্যান্তরীণ বন্ধন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এদিক দিয়ে রোমান সমাজে মার্কাস কাতো[৮৮] ও তার পরিবার ছিল একটি আদর্শ নমুনা। কাতো ছিলেন Paterfamilies,[৮৯] জীবিতকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম রাখতেন। ব্যভিচারের অপরাধে যেকোন সময় স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতেন। ছেলে বা মেয়েকে হত্যা বা দাস ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করার ক্ষমতাও তার ছিল। ছেলে মেয়েকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিতে ও বিবাহ করতে বাধ্য করতেন। Paterfamilies এর মৃত্যুর পূর্বে ছেলেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না।[৯০] পুরুষ প্রধান পরিবার হওয়ার কারণে পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের মত প্রকাশের কোন অধিকার ছিল না। মহিলারা শুধু গৃহস্থালী কাজ কর্ম পরিচালনা কাজে নিয়োজিত থাকত।[৯১]

বর্বরতার অন্ধকার হতে বের হয়ে রোমানরা যখন ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃশ্যপটে উদিত হয় তখন তাদের সামাজিক শৃংখলার চিত্র এরূপ দেখা যায় যে, পুরুষ তার পরিবারের প্রধান কর্মকর্তা ছিল, স্ত্রী ও সন্তানাদির উপর তার পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। পরিবারের উপর পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব ছিল মালিকানামুলক। তৎকালীন সমাজের রোমান নারীকুলের দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেকী তার "ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, "রোমান আইন অনুসারে দীর্ঘদিন যাবৎ নারীর মর্যাদা ছিল যারপরনাই অধঃপতিত। পিতা বা স্বামী যিনিই পরিবারের প্রধান হতেন স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি থাকতো তার সীমাহীন কর্তৃত্ব। তিনি ইচ্ছা

---

[৮৩]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, মে-১৯৯৭), পৃঃ ২৩।
[৮৪]. ভলিঞ্জার, **দি জেন স্টাইল এন্ড দি জু** , দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৩৯।
[৮৫]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।
[৮৬]. গ্রীক শব্দ Barbaros থেকে বর্বর শব্দের উৎপত্তি। গ্রীকরা নিজেদের ভাষার সাথে মিল নেই এমন ভিন্নভাষী জাতি গোষ্ঠীকে Barbaros বা বর্বর বলত। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা মধ্যযুগ**, ঢাকাঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ডিসেম্বর- ১৯৯৭), পৃঃ ৫।
[৮৭]. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
[৮৮]. মার্কাস কাতো খৃষ্টপূর্ব ২৩৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃষ্টপূর্ব ১৪৯ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মার্কাস কাতো একটি ফে-বীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় মেধা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে রোমের একাধিক সর্বোচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি পুরাতন ঐতিহ্য ও জীবন ধারা অনুসরনের পক্ষপাতি ছিলেন। (ড. এ.এফ.এম শামসুর রহমান, **প্রাচীন পৃথিবীঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১)।
[৮৯]. Paterfamilies বলতে পরিবারের বয়জেষ্ঠ্য পুরুষ সদস্যকে বোঝায়।
[৯০]. ড. এ. এফ. এম শামসুর রহমান, **প্রাচীন পৃথিবীঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১।
[৯১]. তবে সনাতন রোমান সমাজে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরা আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো।

Dhaka University Institutional Repository

করলেই নারীকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারতেন। অধিকন্তু পিতার এতটা কর্তৃত্ব ছিল যে কন্যাকে যেখানে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারতেন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতেও পারতেন।"[৯২]

রোমান সভ্যতায় নারীকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলে গণ্য করা হতো, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনকিছুই লেনদেন করার অধিকার তাদের ছিল না। পিতা যতদিন জীবিত থাকত ততদিন পিতাই অভিভাবক থাকত এমনকি বিবাহের পরও কন্যার অভিভাবক পিতাই হত এবং পিতার ইচ্ছাতেই অন্যকে অভিভাবকের স্থলাভিষিক্ত করা হতো।[৯৩] আর যুবতী কন্যা বিয়ে করলে স্বামীকে স্ত্রীর উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব দেওয়া হতো এবং উভয়ের মধ্যে 'সার্বভৌম চুক্তি' নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতো। এভাবে মেয়েদের অভিভাবকত্ব পিতার নিকট থেকে স্বামীর নিকট হস্তান্তরিত হতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার উপর পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের আইনানুগ অধিকার জন্মাত। পরবর্তীকালে রোমান সমাজের জ্ঞানগত অগ্রগতি সাধিত হলে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব কিছুটা শিথিল হয়ে প্রভুত্ব থেকে তত্ত্বাবধায়ক সুলভ কর্তৃত্বের রূপ লাভ করে। এপর্যায়ে নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হতো। বিবাহিতা নারী ও তার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা স্বামীর অধিকারে চলে যেত। স্বামীর কল্যাণের জন্য স্ত্রীকে দাসীর মতো থাকতে হতো। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান, কোন জিনিস আমানত হিসেবে রাখা, কাউকে কোন কিছু উপহার দেওয়া, কোন কিছুর জামিন, স্বাক্ষী ও শিক্ষক হওয়ার কোন অধিকার নারীর ছিল না। গৃহসজ্জিত অন্যান্য আসবাব পত্রের মতই নারী গৃহের শোভা বর্ধন করত।[৯৪] রোমান সমাজে স্ত্রী কোন অপরাধ করলে বিচার করার সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল, এমনকি স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতে পারতো।[৯৫] পরবর্তী সময়ে রোমানরা নারীদের কিছু অধিকার দিয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বাস্তব সত্য যে, নারীরা পুরুষের সমমর্যাদা কখনও পায়নি।[৯৬]

রোমান সমাজে নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিল। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার ছিল না। নারীর অর্জিত অর্থের উপর পরিবার প্রধানের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এমনকি বয়োঃপ্রাপ্তি বা বিবাহের পরও কন্যার সম্পত্তিতে পিতার মালিকানা বহাল থাকতো।[৯৭] পরবর্তীতে রোমের অভিজাত ব্যক্তিদের ধন সম্পদ বৃদ্ধির ফলে সেখানকার নারীদের অসহায় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। নারীরা আইনের অধিকারের ক্ষেত্রে না হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করে।[৯৮]

---

৯২. লেকী – ইউরোপের ইতিহাস নামক প্রবন্ধ।

৯৩. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, (কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, এপ্রিল-১৯৯০), পৃঃ ২৫। পরবর্তীতে এই বিধি সংশোধিত হয়ে আইনগত অভিভাবকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এরূপ কৌশল প্রবর্তন করা হয় যে, নারী নিজের মনোঃপুত কোন অভিভাবকের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং উভয়ের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হবে যে, এই আত্মবিক্রির উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী মনিবের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ। এই চুক্তির কারণে নারী তার পছন্দমত যে কোন কাজ করতে পারত। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫)।

৯৪. Said Abdullah Seifi Al-Hatimy, **Women in Islam**, (Lahore: Islamic Publication Ltd., October 1979), p: 3-4.

৯৫. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ১৫।

৯৬. সাইয়্যেদ জালালউদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।

৯৭. পরবর্তীতে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়ে সম্রাট কনষ্টানটাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসাবে পাবে তা তার পিতার সম্পত্তি না হয়ে মেয়ের সম্পত্তি হবে। তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে তখন পিতা মেয়ের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে বাকী দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে। সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের আমলে স্থির করা হয় যে, মেয়ে যে সম্পদ নিজের শ্রম দ্বারা উপার্জন করবে অথবা তার পরিবারের প্রধান ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে অর্জন করবে তা তার নিজের মালিকানাধীন বলে বিবেচিত হবে। তবে মেয়ে যে সম্পদ পরিবার প্রধানের নিকট থেকে লাভ করবে সে সম্পদের মালিকানা পরিবার প্রধানেরই থাকবে এবং মেয়ে পরিবার প্রধানের অনুমতি ব্যতীত তা ভোগ ও ব্যবহার করতে পারবে না। (ডঃ মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১)।

৯৮. বয়জ্যেষ্ঠ কেটো (CATO) ছিলেন নারী স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "যদি পরিবারের প্রত্যেকটি পিতা তার পূর্বপুরুষদের উদাহরণ মেনে চলত এবং তাদের স্ত্রীদের দাসী করে রেখে দিতে পারত, তবে আর নারীরা সাধারণ লোকের মধ্যে এত উৎপাত করে বেড়াতে পারত না।" (আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫)।

Dhaka University Institutional Repository

রোমক সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সম্পর্কে রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়। রোমান নারীগণ সামাজিক ক্ষেত্রে এতই স্বাধীনতা লাভ করে যে, নারীর নিকট স্বামীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেতে থাকে। তালাক এত সহজ হয়ে পড়ে যে কথায় কথায় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হতে থাকে। রোমান সমাজে লোক দেখানো বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলেও নারী ইচ্ছামত স্বামী পরিবর্তন করতে এবং অধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারত।[৯৯] বিখ্যাত রোমান দার্শনিক ও পন্ডিত স্নীকা (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬-৪) তালাকের আধিক্যের জন্য অনুতাপ করে বলেন, "আজকাল রোমে তালাক কোন লজ্জার ব্যাপার নয়, নারী তার স্বামীর সংখ্যা দ্বারাই নিজের বয়স গণনা করে।" মার্শাল (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩ - ১০৪) উল্লেখ করেন যে, "একজন নারী দশজন স্বামী গ্রহণ করেছিল।" জুদনিয়েল (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০ - ১৪০) একজন নারী সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "সে পাঁচ বছরে আটজন স্বামী গ্রহণ করেছে।" সেন্ট জুরুম (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০ - ৪২০) এমন একজন নারীর বর্ণনা করেন যে, "সে তার জীবনে বত্রিশজন স্বামী গ্রহণ করেছে এবং সে তার শেষ স্বামীর একবিংশ পত্নী ছিল।"[১০০]

উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১০১] এর ফলে সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে রোম হয়ে পড়ল লাম্পট্য ও ভোগবিলাসের কেন্দ্রস্থল। সাধারণ পতিতালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।[১০২] বিবাহ ব্যতীত যৌন সম্পর্ক যে দুষণীয় নয় এমন ধারণাও রোমান সমাজে প্রচলিত হয়ে গেল। বড় বড় নীতিবিদগণ ব্যভিচারকে একটি সাধারণ কাজ মনে করল। নৈতিক চরিত্র সামাজিকতার বন্ধন এত শিথিল হয়ে পড়ল যে, কামপ্রবণতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্লাবনে রোমানরা ডুবে গেল। নগ্ন ও অশ্লীল চিত্র দিয়ে ঘরের শোভা বাড়ানোকে প্রয়োজন মনে করা হতো। রোমীয় সাহিত্যে অশ্লীল চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধাদি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করা হতো।[১০৩] শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ না করা এবং সন্তান না হতে দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। রোমের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা পতিতালয়গুলির তত্ত্বাবধায়কের দলে নাম লেখাতো, যাতে তাদের ব্যভিচারের অভিযোগে কঠোর শাস্তি পেতে না হয়।[১০৪] রোমান নারীগণ সামাজিক ক্ষেত্রে এতই স্বাধীনতা লাভ করল যে, তারা স্বামীদেরকে উচ্চহারে সুদে টাকা কর্জ দিতে লাগল, ফলে স্বামী ধনাঢ্য স্ত্রীর দাসে পরিণত হল।[১০৫] রোমান সমাজে ব্যভিচারের আধিক্যের কারণে বিবাহের সংখ্যা এবং সন্তানের জন্মহার ক্রমশই কমতে থাকে।[১০৬]

রোমের সামাজিক অবনতির জন্য নারীকেই দায়ী করা হয়েছিল। ক্যাটো ও তার অনুসারীদের মতে, বিয়ের পূর্বে যথাসম্ভব নারীর সংস্পর্শ থেকে দুরে থাকবে। কিন্তু কেউ যদি এ বিষয়ে অসংযম হয় তাকে অযথা নিন্দা ও ভর্ৎসনা করবে না। এই নীতির ব্যপক প্রচলনের ফলে বিবাহ ছাড়াই নারী পুরুষেরা অবাধ ব্যভিচারের ছাড়পত্র পেয়ে যায়। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, "রোমান সভ্যতা ধ্বংসের মূল কারণ

---

৯৯. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর-২০০৩), পৃঃ ১২।

১০০. পতিতাবৃত্তি এত প্রসার লাভ করেছিল যে, রোম সম্রাট টাইবেরিসের (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪-৩৭) শাসনকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের পতিতাবৃত্তি ও নর্তকীয় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আইন প্রনয়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬-১৭)।

১০১. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা - প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৭।

১০২. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫। সম্রাট ট্রজানের রাজত্বকালে রোমে ৩২,০০০ বারবণিতা ছিল। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা - প্রাচীন যুগ**, পৃঃ ২১৭)।

১০৩. রোমীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ সর্বক্ষেত্রে নগ্নতা, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছিল, ফ্লোরা (Flora) নামে একটি খেলা সেই সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ সেখানে উলংগ নারীদের দৌড় প্রতিযোগিতা হতো। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একত্রে স্নানাবগাহন প্রথা প্রচলিত ছিল। (আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭)।

১০৪. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

১০৫. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

১০৬. খ্রীষ্টপূর্ব ১৬ সালে আগষ্টাস (Augustus) তথাকথিত 'জুলিয়ান আইন' (Julian Law) জারি করে ঘোষণা করলেন যে, সন্তান হলে লোকে পুরস্কার পাবে আর অবিবাহিত হলে সাজা পাবে। পরবর্তীকালে টাইবেরিয়াস (Tiberious) ডিক্রি জারি করলেন যে, "এমন কোন নারীই পতিতাবৃত্তি করতে পারবে না, যার পিতামহ, পিতা অথবা স্বামী হলেন রোমান নাইট। যে সমস্ত বিবাহিতা নারী পতিতাবৃত্তিতে নাম লিখিয়েছে তাদের ব্যভিচারী বলে গন্য করা হবে এবং ইটালী থেকে নির্বাসিত করা হবে।" এহেন অবস্থা পর্যালোচনা করে প্লুটার্চ (Plutarch) মন্তব্য করেছেন যে, "রোমানরা বিবাহ করে বংশধরের জন্য নয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য।" (আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

হলো নারী পুরুষের অবাধ ব্যভিচার।"[১০৭] পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত হবার পর রোম সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অট্টালিকা এমনভাবে ধুলিসাৎ হয়ে পড়ল যে, শেষ ইষ্টকটিরও অস্তিত্ব রইল না।[১০৮] Decline and Fall of the Roman Empire গ্রন্থে ঐতিহাসিক গীবন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ব্যভিচার ও বেহায়াপনাকে দায়ী করেছেন।[১০৯]

পারসিক ধর্ম বা পারস্য সভ্যতায় নারী

প্রাচীন পারস্য[১১০] সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করতে ইতিহাসের পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ৫৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পার্সীয়গণ[১১১] মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে এবং সমগ্র ক্যালডীয় সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, যার ফলে একটি নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির ধ্যান ধারণা আত্মস্থ করে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।[১১২]

পারস্য রাজ্য ইরাক হতে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এককালে পারস্য সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাবের প্রায় দেড়শত বছর পূর্ব হতেই এই সভ্যতা দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রাচীনতম কাল থেকেই পার্সীয়রা সূর্য, বৃষ্টি, বাতাস, আকাশ, মাটি ও আগুনের পুজা করত। পুজায় তারা এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করত এবং শস্য ফূল, দুধ ইত্যাদি উৎসর্গ করত। তাদের ধর্মীয় চেতনার নির্দেশিত আচরণ ছিল নৈতিকতা, সাধুতা ও উন্নত চরিত্র। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের দিকে পার্সীয়রা একটি ঐশ্বর্যশালী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার পর প্রাচীন পার্সীয় ধর্মের সরলতা পরিবর্তিত হয়ে কিছুটা জটিল রূপ ধারণ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্য ধর্মে দেবতার আরাধনা পুরোহিতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এরা মজি (Mgi) নামে পরিচিত ছিল। মজিগণ পুজারীদের কাছ থেকে উচ্চহারে অর্থ আদায় করে অত্যন্ত ধনবান ও বিলাসী হয়ে পড়েছিল। অবশেষে পারস্যের ধর্মক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দেই তাদের নবী জরাষ্টার রা জরথুষ্ট (Zoroaster /Zarathursta)[১১৩] এর আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে তিনি পার্সীয়দের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

---

[১০৭]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।
[১০৮]. আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩।
[১০৯]. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামসুল হুদা, **নারীর অধিকার ও মর্যাদা**, (ঢাকা: আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫, পৃ: ১৫-১৬; এ. কে. এম শাহনেওয়াজের মতে, রোমের চুড়ান্ত পতন ঘটে ৪৭৬ খ্রী:, এই সময় রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসকে (Romulus Augustulas) সিংহাসনচ্যুত করার ফলে রোমে বর্বর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা মধ্যযুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫)।
[১১০]. পারস্য (Persia) শব্দটির উৎস Pars শব্দ থেকে। Pars প্রাচীনকালের পার্সীয়দের ব্যবহৃত ভাষা। পারস্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ইতিহাসে পার্সীয়ান (Persians) নামে পরিচিত। আধুনিক পার্সীয়দের বলা হয় ফার্স (Fars) অথবা ফার্সিস্তানের (Farsistan) অধিবাসী। এ জন্য এদের পরিচিতি ফারসী (Farsi) অথবা পার্সী (Parsi) নামে।
[১১১]. পার্সীয়গণ প্রথমে আধুনিক ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বসবাস শুরু করে। এখানে পাসারগাদিয়া (Pasargadae) ও পার্সেপলিস (Persepolis) নামে দুটি বিখ্যাত শহর গড়ে উঠেছিল। গ্রিকদের কাছে শহর দুটো পরিচিত ছিল পার্সা (Parsa) ও পারসিস (Persis) নামে। সম্রাট দারিয়ুসের সময় পারস্যের এই অংশটি একটি প্রদেশ ছিল। প্রাচীন পার্সীয়দের বিশ্বাস মতে এদের পূর্বপুরুষ ছিল 'একেমেনিস' (Achaemenes)। সেই কারণে এরা একিমেনিড নামেও পরিচিত ছিল। প্রাথমিককালে আলোচ্য প্রদেশটি ছিল একিমেনিডদের শাসনকেন্দ্র।
[১১২]. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্ব সভ্যতা প্রাচীনযুগ**, প্রাগুক্ত. পৃ: ১২৫।
[১১৩]. জরথুষ্ট পারস্যের ধর্মীয় নেতা ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি পারস্যের জাতীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি ছিলেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তার জন্মকাল, জন্মস্থান ও সময়কাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা যায় না। তবে তার জন্মকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:
প্রথমত: এ. কে.এম শাহনেওয়াজ তার **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ** গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জরথুষ্ট খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে মিডিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। **দ্বিতীয়ত:** রফিকুল আলম তার **বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা** গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যোরাষ্টার আনুমানিক ৬৬০ খ্রিষ্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। **তৃতীয়ত:** মার্টল ল্যাংলী তার **ধর্মের বিশ্বকোষ** গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জোরাষ্টারের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়। **চতুর্থত:** ড. মাহমুদুল হাসান তার **ইসলামের ইতিহাস** গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জরথুষ্টের আবির্ভাব সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম অব্দে হয়েছিল। **পঞ্চমত:** পাহলবী বুন্দাহিসন হলো

Dhaka University Institutional Repository

যরথুষ্ট ছিলেন একাধারে ধর্ম সংস্কারক এবং একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার ধর্মেও নারী জাতি সম্পর্কে লজ্জাকর বিধান দেখতে পাওয়া যায়। যরথুষ্ট বলতেন, "সন্তানবিহীন নারী পুলসিরাত পার হতে বা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই বেহেশতের অভিলাষিণী নারী যেনো অন্তত:পক্ষে অপর কারো সন্তান পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে।" এই ধর্মে ঋতুমতী নারীর প্রতি যুলুমের শেষ ছিল না। যরোয়াষ্টির হুকুম ছিল, "কোন পুষ্পবতী নারী যেন সূর্য না দেখে কোন পুরুষের সঙ্গে কথা না বলে। আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরণ না করে, অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করে। খাদ্য স্পর্শ না করে, কোন পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুমতী নারী এর বিপরীত করলে তার জন্য বেহেশত হারাম।" প্রসুতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিল। সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতি পেত না। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরের বারান্দায় পা দিতে পারত না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হত। এমনকি ঐ সময়ের পর থেকে তওবা করার জন্য বছরে একটি মাস নির্ধারিত ছিল। নারী ছিল স্বামীর দাসীস্বরূপ। আল্লাহর ইবাদত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্বামীর দাসত্বে নিয়োজিত করা হত।[১১৪]

যরোয়াষ্টির ধর্ম বা পারসিক ধর্ম প্রাচীন ধর্ম।[১১৫] এই ধর্মে বিভিন্ন রকমের যৌন উন্মাদনা থাকায় কায়খসরু, গষ্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী রাজারা এই ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন। পারসিক ধর্মে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। প্রাচীন পারসিক ধর্মের সম্রাট পারভেজ একই সময় বার হাজার স্ত্রীর স্বামী ছিল। এই বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে একশত জনেরও অধিক ছিল তার মা, খালা, ফুফু, বোনসহ নিকট আত্মীয়স্বজন। সম্রাট পারভেজ এই বার হাজার স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিল না। যখন তার ইচ্ছা হত বিশ পঞ্চাশ জনকে তালাক দিত অথবা হত্যা করত। আবার পছন্দ মত স্ত্রী সংগ্রহ করে নিত। এমনকি সে তার স্ত্রীদের বিক্রি করতে বা অন্য কারো অঙ্কশায়িতা করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করত না। সে সময় নারী জাতি

জরথুস্ত্রীয় পান্ডুলিপি, যা আরবদের পারস্য জয় করার সময় লিখিত হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, জরথুস্ত্র ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখিত হয়েছে, আলেকজান্ডারের পারস্য অভিযানের ২৫৮ বছর পূর্বে জরথুস্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। (**বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা**, ত্রয়োদশ খন্ড, ২০০৪, পৃ: ৬৯)। জন্মকালের মত জরথুস্ত্রের জন্মস্থান নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কারো কারো মতে, তিনি প্রাচীন পারস্য তথা বর্তমান ইরানের আজারবাইজান প্রদেশের অন্তর্গত মিডিয়া নামক স্থানে বা পশ্চিম ইরানে খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৮ অব্দের কাছাকাছি ৬ষ্ঠ থেকে দশম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি মধ্যপূর্ব ইরানের খোরাসান অথবা পশ্চিম আফগানিস্তান কিংবা রাশিয়ার তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রে (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০, ৫৮৯, ৫৫৩, ৫৩৮ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। জরথুস্ত্র যাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন ম্যাগি ছিলেন। তার পিতার নাম পুরোসাসপা (Pourushaspa) অর্থাৎ অত্যন্ত সাদা এবং মাতার নাম দুগ্ধোবা (Dughdova) অর্থ দুধে তৈরী। জরথুস্ত্র ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। (David Hellholm ed. **Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East**, Tubingen, 1983, p: 72.

জ্ঞান ও সত্যের প্রেমিক জরাষ্টার আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ সাতবছর নির্জন গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। রোমানদের মতে, তিনি সুদীর্ঘ বিশ বছর তাত্ত্বিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জরাষ্টার বলতেন দুটি মহাজাগতিক শক্তির আকর্ষন ও বিকর্ষণের মাঝে মানুষের অবস্থান। যথা (১) আহুরা মাজদা বা সঠিক পথ (২) আহরিমান বা খারাপ পথ। তিনি ন্যাপরায়ণতা ও আহুরা মাজদা বা Wise Lord এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আহবান জানান। তবে তিনি শুভ ও অশুভ কিছু Spirit বা প্রেতাত্মায়ও বিশ্বাস করতেন। বিশেষ করে Angra Mainyu নামক একজন Evil Spirit কে তিনি তার Wise Lord এর সমকক্ষ ভাবতেন। জারোয়াষ্টার এই উভয় সত্তাকেই চিরন্তন মনে করতেন। এর কারনেই পার্সী ধর্মকে একটি দ্বৈত মতবাদ বলে বিবেচনা করা হয়। তবে জরোয়াষ্টার এটা বিশ্বাস করতেন যে, জড় অস্তিত্ব আবশ্যিকভাবেই খারাপ। আর সেজন্যই তার শিক্ষা ছিল এই যে, 'পরিশেষে মন্দের উপর ভালোর জয় অবশ্যম্ভাবী'। এই বিশ্বাসই পার্সী ধর্মকে একেশ্বরবাদী করে তোলে। পরবর্তীকালে তার বাণীসমূহ 'জেন্দ আবেস্তা' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। (এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪; রফিকুল আলম, **বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫; মার্টন ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯৪, পৃ: ৪১)।

[১১৪]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, (ঢাকা: বাংলাদেশ,কো-অপারেটিভ বুক সোসাইট লি:, ২০০১), পৃ: ৩২; ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, (ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ: ২৪; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, (নারায়নগঞ্জ: হৃদ প্রকাশন, ২০০০), পৃ: ২৮।

[১১৫]. হযরত ঈসা (আ:) এর জন্মের পঁচিশ বছর আগের যুগটি যরোয়াষ্টির যুগ। পারসিক ধর্মের অপর নাম ছিল মজুসিয়াত। সম্রাট পারভেজ মজুসী ছিল। এই ধর্মে প্রতাপশালী রাজাদের দীক্ষা নেওয়ার ফলে এর প্রভাব ও প্রচারণা দুর দুরান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্যদ্রব্য হিসেবে সাধারণভাবেই বিক্রি হত। ধর্মের নামে দোহাই দিয়ে নারী নিজেকে পবিত্রসত্তা বলে আখ্যা দিত আবার সতীন পুত্রের সাথে ব্যভিচার করত। এতে তাদের কোন লজ্জা ছিল না।[১১৬] মানুষের নৈতিক চরিত্র তখন এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে তা কল্পনা করা যায় না। পিতা কন্যাকে বিয়ে করা এবং সহোদরা বোন ভাইয়ের স্ত্রী হওয়া তখনকার সমাজে কোন অন্যায় বা পাপ কাজ ছিল না। সম্রাট দ্বিতীয় য়্যাযদেগরদ স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করে পরে তাকে হত্যা করেছিল।[১১৭] এভাবে মা বোন ও মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহু দুর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিল।

তথাকথিত দার্শনিক মর্যুক সংস্কারক হিসেবে এসে এই ধর্মেই আরো বহু বিধি-বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করে, যার অনুসারী হয়েছিল শাহ কাবাদ এর মত প্রতাপশালী রাজাও।[১১৮] মজুকের মতে, "ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল।" তাই সে ধন ও নারীকে স্বাধীন করে দিল অর্থাৎ ধন ও নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হল। মজুকের এই নীতি শাহ কাবাদের প্রচারণায় রাজ্যের সর্বত্র প্রতিপালিত হতে শুরু করে। ফলে এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং একব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর স্ত্রীতে পরিণত হয়।[১১৯]

---

[১১৬]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৩২-৩৩; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, প্রাগুক্ত. পৃঃ ২৮; ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।

[১১৭]. ফারাস সা' আলিবী আল, **তারীখে গুরার প্যারিস**, ১৯২২, পৃঃ ২২।

[১১৮]. তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় চরম বিশৃংখলা বিরাজিত ছিল। সেই যুগে নিজের ধন বা নিজের স্ত্রীকে অপরের উপভোগ থেকে নিষেধ করার মত সাহস কারো ছিল না। প্রত্যেক মানুষের যে কোন নারী বা যে কারো স্ত্রীর সাথেই মেলামেশা করার অধিকার ছিল। এমনকি শাহ কাবাদ এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তার শাহী মহলের পাহারা ও বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিয়েছিল। শহরের জনসাধারণ নির্ভয়ে এবং নির্বিঘ্নে বেগম মহলে প্রবেশ করে শাহজাদী ও বেগমদেরকে ভোগ করে মযুকী মতবাদকে কার্যত রূপ প্রদান করত। সকল মানুষই একে অপরের ঘরে প্রবেশ করে 'সমবায় কার্যক্রম'- এর রূপদান করত। নওশেরোয়াঁর পিতা শাহ কাবাদের স্ত্রী কথ্য কথায় পাটরাণী বা মহারাণী বলে আখ্যায়িত হত বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার পুরুষ তাকে ভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ছেলে নওশেরোয়াঁ বড় হয়ে পিতার এই লজ্জাকর ঘৃণিত কাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন, তিনি তার মাকে নিয়ে বলখের দিকে পলায়ন করলেন এবং সেখান থেকে এক সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করে পিতা শাহ কাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন এবং এই যুদ্ধে পিতা শাহ কাবাদ পরাজিত হল এবং পুত্র নওশেরোয়াঁরের জয় হল। (ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪)।

[১১৯]. আবুল হাসান আলী নববী, **আসসীরাতুন নববীয়্যা**, (বৈরুতঃ ১৯৮৩ খ্রিঃ), পৃঃ ২৬-২৭; ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চীন সভ্যতায় নারী

প্রাচীন সভ্যতা সমূহের বিচারে চীনের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধু সভ্যতার পরেই সূচিত হয়েছিল।[১২০] চীন সভ্যতা নামে পরিচিত এই সভ্যতা দীর্ঘ ৪০০০ বছর ধরে এক মহান সভ্যতার নিদর্শনরূপে জীবনের প্রয়োজন, সৌন্দর্য্য চেতনা এবং পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতীক হয়ে আজ অবধি বিশ্বের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে টিকে রয়েছে।[১২১] এই সভ্যতা দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সাথে টিকে থাকার কারণ অংশত ভৌগলিক[১২২] এবং অংশত ঐতিহাসিক।[১২৩] চীনের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, এরা কখনো সীমান্ত অতিক্রম করে তেমন একটা আগ্রাসী ভুমিকা পালন করেনি। মূলত চীনের শান্তিবাদি ও নৈতিক দার্শনিকদের প্রভাবে তারা সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে। আত্মকেন্দ্রিক চীনারা বরাবরই অন্য জাতিসমূহকে নিজেদের চেয়ে নিচুস্তরের বলে মনে করত।[১২৪] সকল সংস্কৃতির সমন্বয়ে চীনা সভ্যতা বিশ্বের ইতিহাসে একক পরিচয়ে উপস্থাপিত হলেও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। চীনদেশে তিনধারার ধর্ম প্রচলিত রয়েছে। যথা: কানফিউশাসবাদ,[১২৫] তাওবাদ[১২৬] এবং বৌদ্ধ মতবাদ।[১২৭] উৎসের দিক থেকে তিনটি মতবাদ সম্পূর্ণ আলাদা।

---

১২০. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৯।

১২১. রফিকুল আলম, **বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮।

১২২. চীন পূর্ব এশিয়ার বিশাল এক ভূখন্ড নিয়ে গঠিত এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র। বিশাল এই ভূখন্ডে রয়েছে নদ-নদী, সুউচ্চ পর্বতমালা এবং উজ্জ্বল কৃষিভূমি। মূল চীনের সাথে যুক্ত হয়েছে পার্শ্ববর্তী তিব্বত, সিংকিয়াং, মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক বাধার কারণে মূল ভূখন্ড চারপাশের অঞ্চলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রাকৃতিক বাধাগুলো হলো, উত্তরে গোবী মরুভূমি, পশ্চিমে তিব্বতের পার্বত্য মালভূমি (এই মালভূমিকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়) এবং পূর্ব-দক্ষিণ সীমানা জুড়ে ছিল প্রশান্ত মহাসাগর। এই প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে সামান্য কিছু বাইরের প্রভাব (ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম) ছাড়া চীন স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪১)।

১২৩. চীনা বিশ্বাস মতে, পৃথিবী যখন তৈরী হয়নি সেসময় চারদিক ছিল ভীষণ গোলমেলে। ভয়ংকর একটি প্রলয়ের মুখোমুখি যেন সবকিছু। ধীরে ধীরে দুটি শক্তির আত্মপ্রকাশ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। শক্তি দুটোর একটি 'ইয়াং', আর অন্যটি 'ইন'। এই শক্তি দুটোকে বৃত্ত করে ঘিরে ছিল সমস্ত সৃষ্টি। বৃত্তের এক অংশ ছিল কালো এবং অন্যটি সাদা। চীনা বিশ্বাস মতে, ঔজ্জ্বল্য, উষ্ণতা, কর্মক্ষমতার উৎস 'ইয়াং' পুরুষসত্তা, আর অন্ধকার, নীরবতা, শীতলতা ও কোমলতার প্রতীক 'ইন' হচ্ছে নারীসত্তা। 'ইয়াং' ও ইন জন্ম দেয় 'পানকু' নামের এক পৌরাণিক মানব। পানকুই রূপ নেয় পৃথিবীতে। পানকু অর্থাৎ পৃথিবীর আনন্দের জন্য তৈরী হয় চাঁদ, সূর্য এবং অসংখ্য নক্ষত্র। পানকুর মাথা থেকে হয় পর্বত, নিঃশ্বাস থেকে মেঘ, কণ্ঠস্বর থেকে হয় বজ্র, গায়ের শিরা উপশিরা থেকে হয় নদ-নদী। চুল আর গায়ের পশম থেকে হয় গাছপালা। আর মাটির নীচের বিভিন্ন খনি হচ্ছে পানকুর দাঁত আর হাড়। তার গায়ের উপর কিলবিলে যেসব পোকা মাকড় ঘুরে বেড়ায় সেগুলো হচ্ছে মানুষ আর পশুপাখি। পানকু নামের পৃথিবীর তিনজন সহকারী ছিল– ড্রাগন, ফিনিক্স নামের এক অদ্ভুত পাখি আর প্রকান্ড কচ্ছপ। ধীরে ধীরে ফিনিক্স আর কচ্ছপের কথা হারিয়ে যায় কিন্তু প্রচন্ড শক্তির আধার হিসেবে বেঁচে থাকে ড্রাগন। চীনারা বিশ্বাস করে তাদের সমৃদ্ধির পেছনে ড্রাগনের রয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। তাই ক্রমে ড্রাগন চীনের জাতীয় প্রতিক হয়ে পড়ে। চীনা জাতীয় পতাকায় ড্রাগনের ছবি আঁকা হয়। ১৯১১ খ্রী: ডাঃ সানইয়াৎসেনের নেতৃত্বে চীনে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। এসময় থেকে ড্রাগন চিহ্নিত পতাকার বদলে পাঁচরঙা ডোরায় জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়। চীনারা মনে করত মাঞ্চুরীয়, মোঙ্গল, তুর্কী, তিব্বতীয় আর নিজেরা মিলেই চীনা জাতি গড়ে উঠেছে, পাঁচরঙা পতাকা সেজন্যেই তৈরী। ডোরার লাল রং চীনাদের, হলদে রং মাঞ্চুরীয়দের, নীলরং মঙ্গোলদের, সাদা রং তুর্কীদের এবং কালো রংয়ের ডোরাটি তিব্বতীয়দের প্রতীক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪১-১৪২)।

১২৪. চীনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ব্যাপক, বলা যায় বর্তমান আয়তনের দ্বিগুণ। প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে চীনা জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত মিশ্রণ খুব কম হয়েছে। চীনা জনগোষ্ঠী মূলত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তাদের দেহ খর্বকায় এবং মাথা ও মুখ গোলাকৃতি, চোখজোড়া ছোট মাথার চুল সোজা ও কালো। দাড়ি গোফ নেই বললেই চলে। দেহের সাথে সঙ্গতি রেখে হাত ও পা খাটো আকৃতির। দেহে কিছুটা মুটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। অঞ্চলভেদে চীনাদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। তাই বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। সকল সংস্কৃতির সমন্বয়ে চীনা সভ্যতা একক পরিচয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। (এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪১)।

১২৫. 'কানফ্যিউশাসবাদ' পূর্ব-পুরুষদের উপাসনার প্রাচীন রীতিতে নতুন গতি এনে দেয়। এই মতবাদের জনক কানফ্যিউশাস খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে উত্তর চীনের লু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কানফ্যিউশাসের সময় চীন ছিল বিশৃংখলা ও

Dhaka University Institutional Repository

চীনে পরিবার ছিল প্রধান সামাজিক সংগঠন। বিভিন্ন বংশধর নিয়ে গঠিত পরিবারগুলোর আয়তন ছিল সুবৃহৎ। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হিসেবে চীনা সমাজে মেয়েদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। সামাজিক দিক থেকে মেয়েদের সর্বদা অবদমিত করে রাখা হতো।[১২৮] বলা যায় পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতাগুলোর মধ্যে চীন সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এ সম্পর্কে একটি চীনা প্রবাদে উল্লেখ করা হয়, "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করো না।"[১২৯] চীন সভ্যতায় নারীর অবস্থান যে নিতান্ত অসহায় ও শোচনীয় ছিল তা উক্ত প্রবাদের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

সভ্যতা ও শিক্ষার দিক থেকে চীনারা বেশ উন্নত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী নারী জাতির সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক তথা মৌলিক কোন অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। সুন্দর ও বাস্তবধর্মী অনুশাসনের অভাবে সেখানকার নারীরা ছিল মূল্যহীন ও অবহেলিত। নারীদেরকে পুরুষরা নিতান্ত ভোগ্যপণ্য হিসেবেই ব্যবহার করত। পুরুষের কাছে নারীরা ভাগ্য উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ও অলক্ষী হিসাবে পরিচিত ছিল। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণণা করা হয়েছে, যা তাদের সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চীনদেশের নারীদের দুর্দশার করুণ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক চীনদেশীয় রমণী বলেন, "মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী হতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।"[১৩০]

চীন সভ্যতায় নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। নারীরা কখনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। এমনকি সন্তানের উপরও তাদের কোন অধিকার ছিল না। নারীদের প্রতি পুরুষরা ছিল স্বেচ্ছাচারী মনোভাবাপন্ন। স্বামী যখন তখন স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত আবার অপরের উপপত্নি হিসেবে বিক্রিও করতে পারত। চীন সভ্যতায় নারীদের পুন:বিবাহের কোন রীতি ছিল না বরং স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তি হিসেবে জীবন যাপন করতে হতো।

চীন সভ্যতায় পুরুষের ক্ষমতা ও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। সে দেশের বালকেরাও নিজেদেরকে দেবতার সমান মর্যাদাশীল মনে করত। স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করেছে এরূপ সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হতো না বরং দুঃখ প্রকাশ করত। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার দৃষ্টি যেন কোন পুরুষের উপর পতিত না হয় সেজন্য তাকে অন্দরমহলে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখা হতো। সে মৃত্যুবরণ করলে কেউ তার জন্য শোক পালন বা দুঃখ প্রকাশ করত না। বরং খুশীই হত, কেননা তারা মনে করত নারীরা সকল সৌভাগ্যকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। নারীদের কারণে উন্নতির ভাগ্য আগমন করে না এটাই পুরুষের বদ্ধমুল ধারণা ছিল।[১৩১]

অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। কানফিউশাস শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। একদল ছাত্র যোগাড় করে তিনি তাদের সঙ্গে সমসাময়িক নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন। পদ্ধতিগত বক্তৃতার পরিবর্তে তিনি বিতর্কের ভঙ্গিতেই বেশী শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'লী', যার অর্থ আচরণ ও নীতি নিয়মের শুদ্ধতা। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩-২৪)।

[১২৬]. 'তাওবাদ' পৃথিবী সম্পর্কে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। 'তাও' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে পথ। এটির অর্থ হতে পারে কাজের প্রক্রিয়া বা শিক্ষাদানের নীতি। তাওবাদের গুরুত্ব হচ্ছে শেষোক্তটির উপর। 'তাও' হচ্ছে সব অস্তিত্বের অপ্রকাশযোগ্য উৎস, 'The First Cause' আদিকারণ এবং 'Ultimate Reality' বা চরম সত্য। এটি হচ্ছে সেই Principle বা নীতি যা বিশ্বব্রম্মান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যার বলে মানুষ ও বিশ্ব-ব্রম্মান্ডের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, ২৫-২৬)।

[১২৭]. মহায়ানা বুদ্ধবাদ বিশ্বাস ও ভক্তির মাধ্যমে সকলের জন্য মুক্তির সম্ভাবনা বয়ে আনে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দিকে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের মহায়ানা ধারাটির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই মতবাদের পুনর্জন্ম ও সন্ন্যাস ব্রতের বিষয়টির সঙ্গে চীনাদের পরিবার সম্পর্কিত ধারণা ও পুর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার নীতিতে বিরোধ দেখা দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে মহায়ানা মতবাদটি তার উদার নীতির কারণে যথেষ্ট সমর্থন পায়। এই মতবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাণী হচ্ছে, "বিশ্বাসের মাধ্যমে মুক্তি"। সব মানুষই আশির্বাদ পাবে এবং সবাই একদিন বুদ্ধ হয়ে যাবে। বিকাশের ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় ধারাগুলো একে অন্যের সঙ্গে এবং লোকধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭)।

[১২৮]. এ.কে.এম. শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৯।

[১২৯]. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩।

[১৩০]. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪), পৃ: ৫।

[১৩১]. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

চীন সভ্যতায় নারীকে মানুষ বলে গণ্য করা হত না। চীনা পুরুষেরা একই সঙ্গে বহু নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করত। চীনের লীকি ধর্ম একজন পুরুষকে একসঙ্গে ১৩০ জন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিল। আর চীনের বাবু বা সম্ভ্রান্ত লোকদের একসঙ্গে ৩০০০ পর্যন্ত স্ত্রী ছিল বলে জানা যায়।[১৩২]

চীন সভ্যতায় নারীদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে বিনা বাক্যব্যয়ে তালাক দিতে পারত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হতো। এরূপ পরিস্থিতিতে সে একদম নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ত।[১৩৩]

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকত। বিবাহের পর সে স্বামীর পরিবারে গমন করত এবং স্বামীর পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়ঃবৃদ্ধদের কর্তৃত্বাধীনে থাকত। অলংকারাদি ও নিজস্ব ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ব্যতীত বধু যে সম্পত্তিই আনত তা সবই স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগণিত হত। সংসারে বধুর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিল। কেবল পিতার বংশ মর্যাদার শক্তিতেই সে স্বামীর পরিবারে টিকে থাকতে পারত। পুত্র সন্তান প্রসব করলে এবং স্বামী পক্ষের মুরুব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনের পর পরিবারে স্ত্রীর অবস্থান কিছুটা সবল হয়ে উঠত।[১৩৪]

বিবাহের ক্ষেত্রে বর ও কনের পরিবার প্রধানদের আনুষ্ঠানিক সম্মতিতেই বিবাহকার্য সম্পাদিত হত। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিবাহের উকিলের মাধ্যমেই এই কার্য সম্পন্ন হত।[১৩৫] বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। বুজুর্গদের সিদ্ধান্তকেই নিরবে মেনে নিতে হত। এই ধর্মে নারীরা ছিল নিতান্ত ঘৃণিত ও অপমানিত। এ কারণে মর্যাদা ও অধিকার কোনকিছুই তারা ভোগ করতে পারত না।

---

[১৩২]. ড. এম আব্দুল কাদের, **নানা ধর্মে নারী**, (চট্টগ্রাম: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১৯৮০, পৃ: ২৫; Encyclopeadia Britanica –Vol–4, p: 400.

[১৩৩]. Said Abdullah Seif Al–Hamity, **Women in Islam**, (Lahore: Islamic Publications Ltd., October 1979), p: 7.

[১৩৪]. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।

[১৩৫]. **Encyclopeadia Britanica**, Vol 4, p: 409.

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মে নারী

ইতিহাসের প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে একটি অন্যতম সভ্যতা হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সভ্যতা। মিসর, গ্রিস ও রোমের মত প্রাচীন সভ্যতাসমূহের যেমন উত্থান ঘটেছে তেমনিভাবে কালের পরিক্রমণে সেসব সভ্যতার ধ্বংসও হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রাচীনতম ধারা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে অবলীলায় জড়িয়ে আছে। ১৮ লক্ষ বর্গমাইলের বিশাল ভারতকে প্রাচীন ভারতবাসীরা বলত 'ভারতবর্ষ'।[১৩৬]

সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু[১৩৭] অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে একটি 'হিন্দু ধর্ম'[১৩৮] ভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ এর অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সব সময় বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। এটি জীবনের ও

---

১৩৬. এশিয়া মহাদেশের মধ্য দক্ষিণে ভারতের অবস্থান। পার্সীয় ও গ্রিক লেখকদের প্রভাবে ভারত আন্তর্জাতিকভাবে 'ইন্ডিয়া' (India) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পারস্য সম্রাট দারিয়ুস (Darius-1) ৫১৭-৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাব অধিকারের মধ্য দিয়ে পারস্যের সাথে সংযোগ গড়ে তোলেন। সে কারণে ভারতবর্ষের মৌলিক কিছু নামকরণের কৃতিত্ব ছিল পার্সীয়দের। তারা পাঞ্জাবের সিন্ধু নদকে উচ্চারণ করত, হিন্দু (Hindu) অথবা ইন্দু (Indu), এ কারণে পার্সীয়রা ভারতবর্ষের জনগনকে হিন্দু (Hindu) বলে ডাকত। এই সূত্র ধরেই ভারতের ধর্ম 'হিন্দু ধর্ম' বলে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন গ্রীকরা পার্সীয়দের কাছ থেকে 'হিন্দু' নদীর নাম শুনে তাদের নিজস্ব উচ্চারণে এর নামকরণ করে 'ইন্ডাস' (Indus)। ইন্ডাস নদীর সূত্র ধরেই গ্রিকরা ভারতবর্ষকে এক সময় ইন্ডিয়া (India) বলে অভিহিত করে। পঞ্চনদ বিধৌত অঞ্চল অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং প্রাচীনকালে ইন্ডাস নামে পরিচিত সিন্ধু নদ বিধৌত সিন্ধু অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা। (এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯-১১০)।

শুধুমাত্র পারস্যই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করেছিলো। এই বিদেশীদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। **প্রথমতঃ** যে সকল বিদেশী পশ্চিম এশিয়া থেকে এসেছিলো। এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলো পারসীকগণ, পারদগণ, গান্ধারগণ, সাসানীয়গণ, জার্মান, গ্রীক, রোমকগণ এবং সর্বশেষে মুসলমানগণ। **দ্বিতীয়তঃ** এই শ্রেণীর বিদেশীরা মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলো। যাদের মধ্যে শকগণ, খাসগণ, আভীরগণ, কুষানগণ, হুনগণ, গুর্জরগণ এবং শুলিকগণকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। **তৃতীয়তঃ** এই শ্রেণীর বিদেশীরা পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছিলো যাদের মধ্যে চৈনিকগণ, কিরাতগণ এবং পূর্ব দ্বীপবাসীগণকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তার "An Advance History of India" নামক গ্রন্থে ভারতীয় জাতিসমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। এই বিভক্তিসমূহ হলোঃ ১. আদিম উপজাতি সমুহ ২. মোঙ্গোলিয় ৩. দ্রাবিঢ় এবং ৪. আর্য। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪)।

১৩৭. হিন্দু শব্দটি 'হিন্দ' শব্দ থেকে উৎকলিত। হিন্দ প্রাচীন পাহলবী ভাষার শব্দ। আরবী ভাষায়ও এ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমীর আরবী-বাংলা অভিধানে আরবী 'হিন্দু' শব্দের অর্থ একশত বা তদুর্ধ উটের দল, মেয়ে লোকের নাম, ভারতবর্ষ ইত্যাদি বলে উল্লেখ আছে। হিন্দু শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস থেকে জানা যায়, আর্যজাতি ভারতে এসে প্রথমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বাস করত এবং তারা 'স' এর স্থলে 'হ' উচ্চারণ করত। তারা 'সিন্দু' শব্দকে 'হিন্দু' উচ্চারণ করত। পরবর্তীতে তারা হিন্দু নামেই পরিচিতি লাভ করে। যে সব ভারতবাসী পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না, যাদের পূজা অর্চনায় একত্ববাদ ও মূর্তিপূজা উভয়েরই অবকাশ রয়েছে এবং যাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত তারাই হিন্দু। (**Census Report**, Borora, 1901, p: 120).

১৩৮. হিন্দুধর্ম ভারতীয় লোকদেরই ধর্ম। এটি অনেক পুরাতন ধর্ম। এই ধর্মের অনেকগুলো ধর্মগ্রন্থ আছে। যার কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ঋগবেদঃ ভারতীয়দের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম হচ্ছে 'ঋগবেদ'। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় অর্থাৎ সাধারণ হিসেবে হযরত মুসা (আঃ) যখন ইসরাইলবাসীকে মিশর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় সারথি চালনাকারী আর্য জাতির লোকেরা উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারত আক্রমণ করে এবং বর্তমানের পাঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ এক শ্রেণীর পুরোহিত ছিলেন যাদের কাজ ছিল বিসর্জন অনুষ্ঠানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করা। যুগ যুগ ধরে এই সব স্তোত্র মুখস্থ রাখা হত এবং এগুলোকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ১০২৮টি স্তোত্রকে ঋগবেদে স্থান দেয়া হয়। এই বেদই হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মীয় সাহিত্য এবং হিন্দুদের পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থেই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সার্বিক ধারণা পাওয়া যায়। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)।

রামায়ণঃ রামায়ণ রচিত হয়েছিল একটি বীরত্বপূর্ণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে। বিষ্ণুদেবের আবির্ভাব ঘটে সাহসী যুবরাজ রাম হিসেবে। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বানর-দেব হনুমানের সহযোগিতায় লংকার শয়তান রাজা রাবণের হাত থেকে তাঁর একান্ত অনুরক্ত স্ত্রী সীতাকে রক্ষা করেন। অত:পর, তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে সফলতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই কাহিনী বহুল প্রচলিত। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির এমন একটি পরিপূর্ণ ধারা যা তাদেরকে জীবন, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের বিভিন্ন চক্রের মধ্যে আবর্তিত করে। ভারতীয় সমাজের প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে শ্রেণীভেদ ছাড়াও জন্মগত বর্ণভেদ দ্বারা প্রাচীন কাল থেকেই সমস্ত সমাজ বিভক্ত ও চিহ্নিত।[১৩৯] শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং প্রচলিত লোকাচার অনুযায়ী

মহাভারতঃ মহাভারত রচিত হয় প্রাচীন একটি যুদ্ধের কাহিনীকে ভিত্তি করে। এখানে বিষ্ণু দেবতা আবির্ভূত হন কৃষ্ণ হিসেবে। কৃষ্ণ ছিলেন পঞ্চপান্ডবের প্রিয় বন্ধু ও উপদেষ্টা। পঞ্চপান্ডব বলে কথিত পাঁচ ভাই ছিলেন পান্ডব ও কৌরবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের বীর সৈনিক। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)।

ভগবদ গীতাঃ মহাভারতে উল্লেখিত কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনকে যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন সেটিই 'ভগবদ গীতা' নামে পরিচিত। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)।

[১৩৯]. হিন্দু সমাজে চারটি বড় শ্রেণী রয়েছে। যেমনঃ পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ শ্রেণী, অভিজাত বা ক্ষত্রিয় শ্রেণী, বৈশ্য বলে কথিত বণিক ও কৃষক শ্রেণী এবং শুদ্র বা শ্রমিক শ্রেণী। এছাড়া জাতিচ্যুত ও শ্রেণীহীন অনেক হিন্দু আছে। এরা সবাই বিশেষ শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক শ্রেণীরই একটি নিজস্ব কর্তব্য রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, বড় শ্রেণী চারটিকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতি হিসেবে গণ্য করা হত। এদের এক শ্রেণীর কোন সদস্য অন্য শ্রেণীর কোন সদস্যকে বিয়ে করতে পারত না এমন কি তার সঙ্গে বসে একবার খেতেও পারত না। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫)।

ঋগ্বেদের শেষভাগে রচিত দশম মন্ডলের পুরুষসূক্ত অনুসারে, আদি পুরুষকে খন্ড খন্ড করা হলে তার মুখ থেকে উৎপন্ন হয় ব্রাহ্মণ। দুই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়। দুই উরু থেকে বৈশ্য এবং দুই পা থেকে শুদ্র। আদি পুরুষের শরীরের উপরাংশ থেকে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্ধারিত হয় সমাজের উচ্চ স্থান। আর সমাজের নিম্নাংশ থেকে সৃষ্ট বৈশ্য ও শুদ্রের স্থান নির্দিষ্ট হয় সমাজের নিম্নস্থান। আরও উল্লেখ্য যে, ভারতের ধর্মশাস্ত্রের চতুর্বর্ণের ক্রমধারা সামাজিক বিন্যাসকে প্রথম থেকেই শুচি অশুচি পবিত্র অপবিত্র এবং বিভিন্ন গুণাগুণের পারস্পরিক দ্বন্দের সাথে জড়িয়ে ফেলেছে। শরীরের পবিত্রতম অংশ মুখ থেকে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ হল সমাজের পবিত্রতম অংশ এবং সত্ত্ব (শুচি, সত্য, জ্ঞান, তপস্যা) গুণের অধিকারী। আর কিছুটা কম পবিত্র হল বাহু থেকে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়, যারা রজ (শৌর্য, শক্তি) গুণান্বিত। এরপর ক্রমান্বয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপে আছে উরু থেকে উৎপন্ন বৈশ্য যাদের মধ্যে আছে রজ এবং তম (অন্ধকার) গুণের সমন্বয় এবং পদদ্বয় থেকে উৎপন্ন জাত শুদ্র (যারা অশুচি এবং অপবিত্র এবং শুধুই তম বা অন্ধকার গুণের ধারক)। সুতরাং পর্যায়ক্রমে নিম্নতর বর্ণগুলি হল অধিক মাত্রায় অপবিত্রতার প্রতীক, এবং সমাজের অনগ্রসর অংশ।

466242

শাস্ত্রে নিবিদ্ধ অসবর্ণ বিবাহ থেকে জন্ম নিতো বর্ণসংকর, যা ক্রমে ক্রমে চতুর্বর্ণের বাইরে আরও বহু শাখা বা জাতির সৃষ্টি করে। মনুস্মৃতিতে ৬১ টি বর্ণ সংকরের উল্লেখ আছে। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল অম্বষ্ঠ, নিষাদ বা পারশব, কিরাত, উগ্র, সূত, মাগধ, বৈদেহ, অযোগব, ক্ষত্ত, চন্ডাল, পুক্কশ, কুক্কটক প্রভৃতি। এদের মধ্যে আবার নিযাদ, চন্ডাল, পুক্কশ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা চতুর্বর্ণের বাইরে পঞ্চম বা অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হয়। এছাড়াও সমাজের বর্জ্য ও ত্যক্ত পদার্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার মৃতদেহের সৎকার, বধ্য ব্যক্তিকে বধ এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি অশুচি 'অপবিত্র ও ঘৃণ্য' কাজগুলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও একটি বিশেষ গোষ্ঠীর। তাই সমাজের প্রয়োজনে শাস্ত্রীয় সমর্থনের দ্বারা তৈরী করা হয় এক অমানবীয় 'অস্পৃশ্য' গোষ্ঠী। মনুর বিধান অনুযায়ী যারা ছিল যাবতীয় 'ঘৃণার্হ জাতিরও ঘৃণনীয়'। এরাই অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, অতিশূদ্র, পঞ্চম, দলিত ইত্যাদি নামে পরিচিত ও নির্যাতিত সমাজের দরিদ্রতম অংশ। (**মনুস্মৃতিঃ** ১০/৩২/৩৯, পঞ্চানন তর্ক রত্ন অনুদিত ও সম্পাদিত, **সংস্কৃতি পুস্তক ভান্ডার**, কলকাতা, ১৯৯৩; কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, **নারী, শ্রেণী ও বর্ণ**, হাওড়াঃ ম্যানস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, ২০০০, পৃঃ ১০-১২)।

ভারতের বর্ণ ও শ্রেণী কাঠামো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ডল কমিশন উৎপাদনে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উল্লেখ করে নিম্নবর্ণের মানুষরা যে কিভাবে উচ্চবর্ণের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হন তা দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ Under the existing scheme of production relations, Backward classes comprising mainly small landholder, tenants, agricultural labour, village artisans etc. are heavily dependent on the rich peasantry for their sustenance. In view of this, OBCs Continue to remain in mental and material bondage of the dominant castes and classes. (**Report of the Backward class Commission (Mondal Commission)** Government of India, New Delhi, 1980, Part 1, vol 1).

তাছাড়া অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রসঙ্গে মন্ডল কমিশনে আরও বলা হয়েছে, The deprivation of the OBCs is a very special case of the larger national issue; here the basic question is that of social and educational backwardness, and poverty is only a direct consequence of these crippling caste based handicaps." (Ibid. p: 57). ভারতীয় সমাজের নিম্নশ্রেণী সম্পর্কে হপকিন্স (১৮৮১) বলেছেন, "শুদ্রদের অবস্থা ১৮৬০ এর পূর্বে আমেরিকার ক্রীতদাসদের থেকে পৃথক ছিল না।" (E.W. Hopkins, **Mutual Relations of the Four Castes in Manu,** Leipzig, 1881, p: 102). রিজলি (১৯০৮) বলেছেন যে,

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এই জন্মগত বর্ণভেদ নারী সমাজ সহ দেশের সব মানুষকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করেছে। নারীরা শুধু শ্রেণীভেদ নয়, উচ্চ-নীচ বর্ণভেদেও বিভক্ত। নিম্নবিত্ত এবং নিম্নবর্ণ দ্বারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী সমাজকে নিম্ন বর্গের নারী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৪০] নারী সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা এই মত পোষণ করত যে, মানুষ যাবতীয় সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব নয়।"[১৪১]

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নারীর অবস্থান

হিন্দু ধর্ম প্রাচীনত্ব ও খ্যাতিতে প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে এই ধর্মের বিধান ছিল অত্যন্ত নৃশংস ও অমানবিক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, যেমন - ব্রাক্ষ্মণ, গৃহ্যসূত্র তথা ধর্মসূত্র ও পরবর্তী সাহিত্য (স্মৃতি, পুরান) ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে নারীর সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সমাজে শ্রেণী ও বর্ণপ্রথার[১৪২] প্রভাব খুব বেশী ছিল। শ্রেণী ও বর্ণ প্রথার কারণে শুদ্রকে সমাজের সর্ব নিম্নস্তরের বলে গণ্য করা হয়। এই শ্রেণী সমাজের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত ছিল।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে নারীকে নিম্নশ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হত। মনুস্মৃতির নিয়মানুসারে, "শুদ্র ও নারীজাতির স্থান সমাজের অনেক নিচে এবং তাদের দেখা হয়েছে হীন দৃষ্টিতে। ব্রাক্ষ্মণকন্যার সাথে শুদ্রের মিলনে যে সন্তান জন্ম নিত তাকে চন্ডাল বলা হত।"[১৪৩] অগ্নিপূরাণে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে নারী ও শুদ্রের জীবনের মূল্য সমান বলে মনে করা হয়।[১৪৪] অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে, "নারী হত্যা কারীকে শুদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কুকুর, গোসাপ, পেঁচা ও কাক হত্যা করলেও একই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"[১৪৫] এই মতের সমর্থন করে পরাশর স্মৃতিতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি শিল্পি, কারিগর, শুদ্র ও নারীকে হত্যা করে, তাকে দুবার প্রজাপত্য ব্রত পালন করতে হবে ও দক্ষিণা হিসাবে এগারটি বৃষ দান করতে হবে।[১৪৬] মনুর বিধান অনুসারে, নারী, পুত্র, দাস, শিষ্য ও আপন ভাইয়ের প্রতি অপরাধ করলে তাকে রজ্জু অথবা বংশদন্ড দ্বারা আঘাত করা উচিত।[১৪৭] শুদ্ররাই ছিল দাস সেই জন্য নারীও শুদ্রের জন্য একই প্রকার দন্ডের বিধান ছিল।

"বিজিত দ্রাবিড়দের প্রতি বিজেতা আর্যদের আচরণ ছিল আমেরিকার কিছু বাগিচা মালিকের আফ্রিকা থেকে আমদানি করা দাসদের প্রতি আচরণের মত।" (H. H. Risley, **The people of India**, London, 1915, p: 275).

[১৪০]. কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, **নারী শ্রেণী ও বর্ণ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯।

[১৪১]. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪), পৃ: ১৩।

[১৪২]. হিন্দুরা ৪টি শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত ছিল। যথা: **১. ব্রাম্মণঃ** এরা সমাজের প্রথম শ্রেণীর মানুষ বলে বিবেচিত হত। জমিদার ও পুরোহিতরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাম্মণ 'ব্রম্মণ' এর মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মনুসংহিতায় আছে, সুষ্টিকর্তা ব্রাম্মণের জন্য অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ৬টি কর্তব্য কল্পনা করলেন। **২. ক্ষত্রিয়ঃ** এরা সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হত। সরকারী কর্মচারী, সেনাবাহিনীর সদস্য ইত্যাদি অর্থাৎ যারা শাসনকার্যে পারদর্শী তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। **৩. বৈশ্যঃ** এরা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণী সম্পর্কে মহাগ্রন্থ গীতায় বলা হয়েছে, বৈশ্যের স্বভাব কৃষিকর্ম, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। **৪. শুদ্রঃ** এরা চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সমাজের সবচেয়ে নীচু শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হত। শুদ্র সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, শুদ্র ঈশ্বরের পা থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই এদের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাম্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করা।

[১৪৩]. মূলঃ রামশরণ শর্মা, **প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস**, অনুবাদঃ অঞ্জন গোস্বামী, (কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিঃ, ১৯৯৬), পৃ: ২৮।

[১৪৪]. **অগ্নিপুরাণ**, ১৭৩, ১৩১।

[১৪৫]. **অগ্নিপুরাণ**।

[১৪৬]. **পরাশর স্মৃতি**, অধ্যায় - ষষ্ঠ, পৃ: ১৬।

[১৪৭]. **মনুরাজ-মনুস্মৃতি**, অধ্যায়- ৮, পৃ: ২৯৯; **অগ্নিপুরাণ**, ২২৬, ৪৫- ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

গীতার রচনাতেও নারী, শুদ্র ও বৈশ্য তিন জনকে একই শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন, "হে পার্থ, যারা পাপযোনী (অর্থাৎ নারী, বৈশ্য, শুদ্র) তারা আমার শরণাগত হলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।[১৪৮] ধর্মসূত্র ও পুরাণেও তাদের প্রতি একই রকম ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছে। নারী ও শুদ্রকে সমাজের অপবিত্র শ্রেণী বলে মনে করা হত। দ্বিজ এবং নারী ও শুদ্রের পবিত্রতা দু প্রকারের হত। দ্বিজের শারীরিক শুচিতা যেখানে তিনবার আচমণে অর্জিত হত, সেখানে নারী ও শুদ্রের একবার জল স্পর্শই যথেষ্ঠ ছিল।[১৪৯] নারী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও তাদের সঙ্গ খারাপ চোখে দেখা হত। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে সাতদিন ধরে যবের মন্ড পান করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।[১৫০]

ধর্মের প্রসঙ্গে সমাজে নারীর স্থান নিচুতে ছিল। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পিন্ডদানের অধিকার তাদের ছিল না।[১৫১] ব্রাম্মণদের অনুশাসন অনুসারে নারী, শুদ্র তথা নিম্নবর্ণের লোক অগ্নিযজ্ঞের অধিকারী ছিল না।[১৫২] নারী ও শুদ্র কাছে গিয়ে শিবলিঙ্গের পুজা করতে পারত না। হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে যে, নিষ্ঠা সহকারে মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হলে নারী ও শুদ্র তা স্পর্শ করতে পারবে না। এও বলা হয়েছে নারী, উপনয়ন হয়নি এমন ব্যক্তি ও শুদ্রের বিষ্ণু ও শঙ্করমুর্তি স্পর্শ করার অধিকার নেই। যদি তারা কেশব অথবা শিবকে স্পর্শ করে তবে তাদের স্থান হবে নরকে।[১৫৩] নারী ও শুদ্রের 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এইমন্ত্র ওঙ্কারধ্বণিসহ জপ করার অধিকার ছিল না।[১৫৪]

প্রাচীনকাল থেকেই নারী ছিল সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত ও ঘৃণ্য শ্রেণী। প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীর উপর পুরুষের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। মনুস্মৃতি ও শুক্রনীতি সার এর বিধান ছিল, নারী, পুত্র ও দাস তিনজনেই হল 'অধন'; তারা যা উপার্জন করবে তা হবে তাদের প্রভুর সম্পত্তি।[১৫৫] নিজের স্ত্রী, পুত্র ও দাসের উপর কর্তার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নারীকে আজীবনের দাস বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা মনুরাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, নারী কখনই স্বতন্ত্র হয় না। কুমারী অবস্থায় পিতা তাকে রক্ষা করে, যৌবনে স্বামী তার দেখাশুনা করে। বার্ধক্যে সে থাকে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে, নারীর কোন স্বাধীনতা নেই। নারী সর্বদা পুরুষের অধীন থাকবে।[১৫৬] পিতৃতান্ত্রিক প্রভুত্বের কারণে ভারতবর্ষেও নারীর অবস্থা রোমের মত ছিল।[১৫৭]

মহাকাব্য ও পূরাণে নারী ও সম্পত্তি একসাথে উল্লেখ করে বারংবার বলা হয়েছে যে, উভয়ের সুরক্ষা আবশ্যক এবং এটি রাজার প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হত।[১৫৮] মহাভারতে বহুবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ

---

[১৪৮]. **গীতা**, অধ্যায়-৯, পৃঃ ৩২। গীতায় বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে তিনজনই পরমগতি প্রাপ্ত হবার আশ্বাস পায় কিন্তু 'পাপযোনি' আখ্যা দেয়ার অর্থ তৎকালীন সমাজে তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হত।

[১৪৯]. **মনুরাজ-মনুস্মৃতি**, অধ্যায়- ৫, পৃঃ ১২৩৯। পুরাণ অনুসারে শুচিতা হতো চার প্রকার। যেমন, জল (পানি) হৃদয়ে পৌছলে ব্রাক্ষণ, কণ্ঠে পৌছলে ক্ষত্রিয় এবং তা মুখে ছোয়ালে বৈশ্য শুচিতা অর্জন করে, কিন্তু নারী ও শুদ্র কেবলমাত্র জলস্পর্শেই শুচি হতে পারে। এই ভাবে দ্বিজকে যত্নসহকারে শুচি হতে বলা হয়েছে কিন্তু নারী ও উপবীত রহিত মানুষের শুচিতার ওপর ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। (**গরুড়পুরাণ**, ২১৫, ৩৩; **বৃহন্নারদীয়পুরাণ**,অংশী)।

[১৫০]. **মনুরাজ-মনুস্মৃতি**, অধ্যায় - ৯, পৃঃ ১৫৩।

[১৫১]. **অগ্নিপুরাণ**, অধ্যায় - ১৫৭, পৃঃ ৩৩।

[১৫২]. **ব্রম্মপুরাণ**, অংশ- ২২০।

[১৫৩]. বৃহন্নারদীয়পুরাণ, অংশ - ১৪।

[১৫৪]. **স্কন্দপুরাণ**। পুরাণে আরও বলা হয়েছে, অগ্নিহোত্রী দ্বিজাতি শ্রাদ্ধকর্ম এমন অমাবস্যায় করতেন যখন চাঁদের আলো দেখা যেত কিন্তু অগ্নির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত নারী ও শুদ্রকে এই কাজ অমাবস্যার আঁধারেই করতে হত। তিন বর্ণের লোকই বৈদিক বিধি অনুসারে স্নান করতে পারত কিন্তু নারী ও শুদ্রের সে অধিকার ছিল না। (**বৃহন্নারদীয়পুরাণ**, অংশ-২৭; **ব্রম্মপুরাণ**, অধ্যায়-৬৭. পৃঃ ১৯)।

[১৫৫]. **মনুস্মৃতি**, অধ্যায়-৮, পৃঃ ৪১৬; **শুক্রনীতিসার**-৪,৫, ২৯৫।

[১৫৬]. **মনু**, অধ্যায়-৯, পৃঃ ২-৩; **যাজ্ঞবল্ক্য**, আচার অধ্যায়, পৃঃ ৮৫।

[১৫৭]. W. A. Hunter, **Introduction to Roman Law**, (London, 1934), p: 361.

[১৫৮]. মহাকাব্যদ্বয়ের অনেক স্থলে বলা হয়েছে, পরিবার ও সম্পত্তির সুরক্ষা রাজার প্রধান কর্তব্য। রামায়ণে বলা হয়েছে, রাজাহীন রাজ্যে সম্পত্তির ওপর অধিকার বজায় রাখা যায় না এবং পত্নীও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, রাজাবিহীন রাজ্যে সম্পত্তি, পুত্র ও পত্নী নিরাপদে থাকে না। (**অযোধ্যা কান্ড**, ৬৭, ১১; **শান্তিপর্ব**, ৬৮, ১৫-১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে যে, স্ত্রী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখা রাজ পদাধিকারীদের প্রধান দায়িত্বগুলির অন্যতম।[১৫৯]

ভারতীয় সভ্যতায় কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে পশুর সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণ অনুসারে, নারী ও পশুকে বন্ধক হিসেবে রাখা যেত। তার প্রাথমিক মূল্যের এক সপ্ততিতম অংশ মাসিক সুদ হিসেবে নির্ধারিত হত।[১৬০] তৎকালীন সমাজে পত্নী ও সম্পত্তির অধিকারী হওয়া মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা হত। গরুড়পুরাণ অনুসারে বাল্যকালে যে বিদ্যার্জন করেনি, যৌবনে যে সম্পত্তি ও পত্নীহীন। তার জীবন অতীব দু:খের ও মানবরূপী হরিণের মত এ ধরাধামে বিচরণ করে।[১৬১] সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় নারীকে একপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করা হত। সমাজে সে স্বীয় ইচ্ছানুসারে চলতে পারত না। তাকে সম্পত্তির মত ঋণ হিসাবে প্রদান করা হত। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নারীকে স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার দেয়া হয়নি। স্ত্রীধন বলতে যা বোঝাত তা ছিল খুব সীমিত; মনিমুক্তা, অলংকার ও উপঢৌকন ব্যতীত আর কিছুর উপর স্ত্রীর কোন অধিকার জন্মাত না। এইজন্য দেবতার কাছে ভক্ত আরও অধিক সম্পত্তি ও নারী কামনা করত।

বিবাহ পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে ঋগ্বেদ, অর্থবেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, মহাভারতের মাধ্যমে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে একজন পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণের অধিকার ছিল। তৈত্তরীয় সংহিতায় উল্লেখ আছে, একজন পুরুষ দুই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু একজন নারী বহুপতি গ্রহণ করতে পারে না।[১৬২] প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিবাহ সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীন ভারতে বিবাহের উদ্দেশ্যে ছিল প্রধানত তিনটি: ১. ধর্মপালন ২. বংশরক্ষা ৩. সম্ভোগ বা রতি। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক প্রাচীনতম স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণ করে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করেছেন।[১৬৩] যা নিম্নরূপ:

১. ব্রাম্মবিবাহ: ব্রাম্ম বিবাহ ছিল ব্রাম্মণ্য আচার সম্পৃক্ত বিবাহ। এই বিবাহে মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে স্ববস্ত্রা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করা হতো। বিবাহ যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে বর-কণে উভয়েই তিনবার যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করতে করতে বলতো তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি স্বর্গ, আমি পৃথিবী, আমি সাম, তুমি ঋক, এসো আমরা বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করি।"

২. আর্শ বিবাহ: প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত ছিল তার নাম ছিল আর্শ বিবাহ। এই বিবাহে যৌতুকের পরিবর্তে নাম মাত্র কন্যামূল্য হিসাবে একটি গরু এবং একটি ষাঁড় দেওয়া হতো।

৩. দৈব বিবাহ: গৃহস্থ বা কন্যার পিতা এই বিবাহে যজ্ঞ পুরোহিতকে তার প্রাপ্য অর্থের অংশ হিসাবে কন্যা দান করতো।

---

১৫৯. উল্লেখ আছে যে, সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল যে, সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করতে হবে যে অপরের সম্পত্তি হরণ করেছে ও পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করেছে। (**শান্তিপর্ব**, ৬৮, ১৮-১৯)।

এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, মনুকে রাজপদ অর্পণের প্রস্তাব দিলে তিনি এই শর্তে সম্মত হন যে, প্রজারা তাকে একটি নারী ও সম্পত্তি প্রদান করবে। কারণ এই ছিল যে, রাজার যদি নিজের স্ত্রী ও সম্পত্তি থাকে তা হলে তিনি সেই রাজ্য ও সমাজ সংরক্ষণে সজাগ থাকবেন, যেখানে প্রত্যেকের কাছে এ দুটি আছে। পরবর্তীতে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, মনুকে তারা গাভীসমূহের এক পঞ্চমাংশ সঞ্চিত স্বর্ণের এক পঞ্চমাংশ, খাদ্যশস্যের এক পঞ্চমাংশ ও বিবাহের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাটিকে প্রদান করবে। পরিবর্তে তারা মনুকে তাদের শত্রুদের বিনাশ করতে বলে, যাতে তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। (**শান্তিপর্ব**, ৬৮, ১৮-১৯; **শান্তিপর্ব**, ৬৮, ২৩-২৪)।

১৬০. **অগ্নিপুরাণ**, অধ্যায় ২৫৩, পৃ: ৬৩- ৬৪। অপর একটি বিধি অনুসারে, নিজের সন্তান, পত্নী, পশু ও ধান আমানত হিসাবে জমা রাখলে আমানতকারী তার প্রাথমিক মূল্যের দ্বিগুণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী ছিল। (**যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি**, ১১, ৫৭)।

১৬১. **গরুড় পুরাণ**, ১০৯, ৪৮।

১৬২. **তৈত্তরীয় সংহিতা**, অধ্যায়-৫, ৬, পৃ: ৪৩।

১৬৩. আহমেদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা:)**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রজাপত্য বিবাহ: এই বিবাহে কন্যার পিতা যৌতুকও দিতেন না, কন্যামূল্যও নিতেন না। বলা হতো, "তোমরা দুজনে যুক্ত হয়ে ধর্মাচারণ কর"- এই উপদেশ দিয়ে যেভাবে বরের হাতে মেয়েকে দেওয়া হতো তাকে বলা হতো প্রজাপত্য বিবাহ।

৫. গান্ধর্ব বিবাহ: পাত্র পাত্রীর ইচ্ছায় এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো অর্থাৎ পাত্র পাত্রী স্বইচ্ছায় একে অপরকে মাল্য দানের মাধমে যে বিবাহ করতো তাকে বলা হতো গান্ধর্ব বিবাহ। মহাভারতের নায়কদের মধ্যে অনেকেই গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন। যেমন- অর্জুনের সাথে উলুপি ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ, দুস্মন্তের সাথে শকুন্তলার বিবাহ ইত্যাদি।

৬. আসুর বিবাহ: এইরূপ বিবাহে পয়সা দিয়ে কন্যা ক্রয় করা হতো। অর্থাৎ বিবাহে মেয়ের বাবাকে কিংবা তার অভিভাবককে পণ বা মূল্য দিতে হতো। এই বিবাহের দৃষ্টান্ত মাদ্রীর সাথে পান্ডু বিবাহ এবং দশরথের সাথে কৈকেয়ীর বিবাহ।

৭. রাক্ষস বিবাহ: মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যে বিবাহ করা হতো তার নাম ছিল রাক্ষস বিবাহ। মহাভারতে রাক্ষস বিবাহের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা: কৃষ্ণ রুক্মিনীকে বলপূর্বক হরণ করে এনে বিবাহ করেছিলেন। দেবকের রাজসভা থেকে দেবকীকে শিনি বলপূর্বক অধিকার করে এনেছিলেন বসুদেবের সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য। একইভাবে দুর্যোধনের সাথে বিবাহ দেবার জন্য কলিঙ্গ রাজার সভা থেকে চিত্রাঙ্গদাকে কর্ণ বলপূর্বক হরণ করে এনেছিলেন।

৮. পৈশাচ বিবাহ: যেকোন মেয়েকে অজ্ঞান বা অচৈতন্য অবস্থায় হরণ করে এনে প্রবঞ্চনা অথবা ছলনার দ্বারা যে বিবাহ করা হতো তাকে বলা হয় পৈশাচ বিবাহ।

উপরে বর্ণিত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চার প্রকার বিবাহ ছিল ধর্মীয় বা স্বীকৃত বিবাহ। কোনও কোনও স্থানে বলা হয়েছে "ব্রাম্ম, দৈব, প্রজাপত্য ও আর্শবিবাহ হল ধর্ম।"[১৬৪] কারণ এগুলিতে শুধু পিতার অনুমতি আবশ্যক। এবং এই ধর্মীয় বা স্বীকৃত বিবাহের অধিকার ছিল শুধু ব্রাম্মণ ও ক্ষত্রিয়দের। কারণ ব্রাম্মণ ও ক্ষত্রিয়দের উপর যেহেতু ধর্মাধারিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম রাখার দায়িত্ব ছিল। সেইজন্য ধর্ম বিবাহ মেনে চলার দায়বদ্ধতাও তাদের ওপর বর্তাত।[১৬৫] অবশিষ্ট চার প্রকার বিবাহ ছিলো বিবাহের অস্বীকৃত রূপ। এই প্রকার বিবাহ নিম্নবর্ণের জন্য নির্ধারিত ছিলো।[১৬৬] এবং প্রাচীনকালে এই প্রথার ব্যাপক

---

[১৬৪]. **গৌতম,** অধ্যায়-৪, পৃ: ১৪-১৫; **বিষ্ণু,** অধ্যায়-২৪, পৃ: ২৭-২৮; **অর্থশাস্ত্র** (শ্যামাশাস্ত্রী, সংস্করণ, ১৯২৪), অধ্যায়-৩, পৃ: ২; **নারদ,** অধ্যায়-১২, পৃ: ৪৪; **আদিপর্ব,** অধ্যায়-৬৭, পৃ: ১০।

[১৬৫]. বৌধায়ন ধর্মসুত্র থেকে জানা যায়, এর পিছনে বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক কারণ ছিল। উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে নিম্নবর্ণের মানুষ নিযুক্ত থাকায় এতে তাদের স্ত্রীদেরও অংশগ্রহণ আবশ্যক ছিল। এতে স্বামীদের উপর স্ত্রীদের নির্ভরশীল হতে হত না যার ফলে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের নিয়ন্ত্রনের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষ উৎপাদন কার্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। সেইজন্য তাদের স্ত্রীরা এতে অংশ নিত না। যার জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজনে পুরুষের উপর তাদের নির্ভর করতে হত। বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিবাহের যথোপযুক্ততা আলোচনা করে বৌধায়ন দেখিয়েছেন, "কৃষি ও পরিষেবায় নিয়োজিত থাকায় বৈশ্য ও শুদ্রদের পত্নীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।" (রামশরণ শর্মা, **প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০)।

[১৬৬]. আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের এক পরিচ্ছেদের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে নারায়ণ বলেন, অসুর বিবাহ যেহেতু ধনসম্পদের সাথে সম্পর্কিত সেইজন্য এই বিবাহ বৈশ্যদের জন্য নির্ধারিত। (**আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ,** অধ্যায়-১, পৃ: ৬)। বৌধায়ন ধর্মসূত্র মতে, "আসুর ও পৈশাচ বিবাহ বৈশ্য ও শুদ্রের জন্য নির্দিষ্ট।"(**বৌধায়ন-Hultzsch** সম্পাদিত, অধ্যায়-১, ২০, পৃ: ১৩-১৪)।

মনু এক ঋষির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শুদ্রের জন্য স্বীকৃত। (**মনু,** অধ্যায় ৩, পৃ: ২৪); আদিপর্বেও এই উক্তি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (**Critical edition,** অধ্যায়-৬৭, পৃ: ১১)। আসুর বিবাহে কন্যার গুরুত্ব তার মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর পৈশাচ বিবাহকে নির্বিচার ব্যভিচারের শেষ অবস্থা বলে মনে করা হয়। বিবাহের অপর দুই অস্বীকৃত রূপ রাক্ষস ও গান্ধর্ব বিবাহ কেবল নিম্নবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মনু রাক্ষস বিবাহকে শুধু ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট করেন। (**মনু,** অধ্যায়-৩, পৃ: ২৪; **তুলনীয়, বশিষ্ট ধর্মসুত্র**-Fuhrer's edition, অধ্যায়-১, পৃ: ৩৪)। আদি পর্ব অনুযায়ী শুধু ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাম্মণও এই বিবাহ করতে পারত। (**বশিষ্ট ধর্মসুত্র,** অধ্যায়-৬৭, পৃ: ১১)। দুর্যোধন, অর্জুন ও ভীম সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা ক্ষাত্র বিবাহ (যা রাক্ষস বিবাহের অনুরূপ) করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলন ছিল।[১৬৭] প্রথম চারটি বিবাহের প্রশংসায় এবং শেষের চারটির নিন্দায় মনু ও যাজ্ঞবল্ক উভয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু একই প্রসংগে মনু ভিন্নমতও পোষণ করেছেন। তিনি প্রজাপত্য গান্ধর্ব এবং রাক্ষস বিবাহকে আইনসঙ্গত এবং পৈশাচ ও অসুর বিবাহকে বেআইনী আখ্যা দিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে আর এক প্রকার বিবাহের প্রচলন ছিল। তা হল অসবর্ণ বিবাহ, প্রাচীনকালে প্রচলিত অসবর্ণ বিবাহের বিষয়ে যথেষ্ঠ পর্যালোচনা করা হয়।[১৬৮] কিন্তু বেদ ও মহাকাব্যে উল্লিখিত অসবর্ণ

বিবাহকে আর অনুমোদন করেনি। (A.S Altekar, **Position of Women in Hindu Civilization**, Banaras, 1938, p.45). সম্ভবত রাক্ষস বিবাহ ছিল উপজাতীয় প্রথার শেষ চিহ্ন। বর্ণবিভক্ত সমাজ স্থিতিশীল হলে লড়াকু নেতারা পরবর্তীকালে বিলাস প্রিয় শাসকে পরিণত হয়। তখন রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দের কাছে আর সম্মানজনক থাকে না। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের এক পরিচ্ছেদের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে নারায়ণ বলেন, অসুর বিবাহ যেহেতু ধনসম্পদের সাথে সম্পর্কিত সেইজন্য এই বিবাহ বৈশ্যদের জন্য নির্ধারিত। (**আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ**, অধ্যায়-১, পৃঃ ৬)। বৌধায়ন ধর্মসূত্র মতে, "আসুর ও পৈশাচ বিবাহ বৈশ্য ও শুদ্রের জন্য নির্দিষ্ট।"(**বৌধায়ন - Hultzsch** সম্পাদিত, অধ্যায় -১, ২০, পৃঃ ১৩-১৪)।

মনু এক ঋষির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শুদ্রের জন্য স্বীকৃত। (**মনু**, অধ্যায় ৩, পৃঃ ২৪); আদিপর্বেও এই উক্তি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (**Critical edition**, অধ্যায়-৬৭, পৃঃ ১১)। আসুর বিবাহে কন্যার গুরুত্ব তার মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর পৈশাচ বিবাহকে নির্বিচার ব্যভিচারের শেষ অবস্থা বলে মনে করা হয়।

বিবাহের অপর দুই অস্বীকৃত রূপ রাক্ষস ও গান্ধর্ব বিবাহ কেবল নিম্নবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মনু রাক্ষস বিবাহকে শুধু ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট করেন। (**মনু**, অধ্যায়-৩, পৃঃ ২৪; **তুলনীয়, বশিষ্ট ধর্মসূত্র**- Fuhrer's edition. অধ্যায়-১, পৃঃ ৩৪)। আদিপর্ব অনুযায়ী শুধু ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাম্মণও এই বিবাহ করতে পারত। (**বশিষ্ট ধর্মসূত্র**, অধ্যায়-৬৭, পৃঃ ১১)। দুর্যোধন, অর্জুন ও ভীম সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা ক্ষাত্র বিবাহ (যা রাক্ষস বিবাহের অনুরূপ) করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ এই বিবাহকে আর অনুমোদন করেনি। (A.S Altekar, **Position of Women in Hindu Civilization**, Banaras, 1938, p: 45). সম্ভবত রাক্ষস বিবাহ ছিল উপজাতীয় প্রথার শেষ চিহ্ন। বর্ণ বিভক্ত সমাজ স্থিতিশীল হলে লড়াকু নেতারা পরবর্তীকালে বিলাস প্রিয় শাসকে পরিণত হয়। তখন রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দের কাছে আর সম্মানজনক থাকে না। জলির মতে গান্ধর্ব বা প্রেম বিবাহ অভিজাতবর্গের বিশেষ অধিকারে ছিল। (Jolly, **Hindu Law and Custom**, Calcutta, 1928, p: 126). বলা হয় যে এই বিবাহ প্রধানত ক্ষত্রিয় ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ও তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। (Altekar, **Position of Women in Hindu Civilization**, Ibid, p: 81; A. D. Pusalker, **Bhasa, A study**, Lahore, 1940, p: 369.) কিন্তু পুংখানুপুংখ বিচারে জানা যায়, অন্যান্য বর্ণের নারী পুরুষের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল ও তাদের জন্যও এটি নির্ধারিত ছিল। ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য সাহিত্যগত রচনাবলী দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ক্ষত্রিয়ের জন্য গান্ধর্ব বিবাহের অনুমতি ছিল। (**বৌধায়ন**, ১, ২০, ১২; **মনু**, অধ্যায়-৩, পৃঃ ২৬; **বিষ্ণু**, অধ্যায়-২৪, পৃঃ ২৮)। কিন্তু বৌধায়ন কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন গান্ধর্ব বিবাহের ভিত্তি যেহেতু ছিল বর বধূর পারস্পরিক অনুরাগ, সেই জন্য সকলেই এই রূপ বিবাহ করতে পারে। (**বৌধায়ন**, ১.২০.১৬) পরবর্তীকালে নারদ বলেছিলেন, গান্ধর্ব বিবাহের দ্বার সবার জন্য উম্মুক্ত। (**নারদ**, অধ্যায়-১২, পৃঃ ৪৪)।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত 'কামসূত্র' এর রচয়িতা বাৎস্যায়নের মতে, বংশপরিচয়, ধনসম্পত্তি ও অপরাপর চাহিদার পূরণ ছিল অন্য প্রকার বিবাহের নির্ণায়ক, কিন্তু এর বিপরীতে গান্ধর্ব বিবাহ নির্ধারিত হত পারস্পরিক অনুরাগের দ্বারা। (H. C. Chakladar, **Social Life in Ancient India; A Study in Vatsyayana's Kamasutra**, p: 143).

কোনরূপ বাধানিষেধ না থাকায় গান্ধর্ব বিবাহের আভিজাত্য ছিল না। সেজন্য জন্ম সম্পর্কিত ও বস্তুগত ভাবনা থেকে যারা মুক্ত তারা গান্ধর্ব বিবাহ করতে পারত। অর্থাৎ গান্ধর্ব বিবাহ উচ্চ ও নিম্ন উভয় বর্ণের জন্য অনুমোদিত ছিল।

উনিশ শতক পর্যন্ত অনেক প্রাচীন প্রথা প্রচলিত থাকায় বর্তমান ভারতের কিছু অঞ্চলে নিম্নবর্ণের মধ্যে 'গান্ধর্ব্য'এর অর্থ পুনর্বিবাহ। (A. D. Pusalker, **Bhasa, A study**, Lahore, 1940, p: 375). এ থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অতীতে নিম্নবর্ণের মধ্যেও গান্ধর্ব বিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপুত্র ও অভিজাতবর্গ গান্ধর্ব্য বিবাহের অনুমতিকে আপন কামনা বাসনা চরিতার্থের জন্য কাজে লাগায়, যার পরিণতি বহুবিবাহ। এছাড় গান্ধর্ব্য বিবাহ পরবর্তীকালে নিম্নবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, যার কিছু নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে রাক্ষস ও গান্ধর্ব বিবাহের প্রচলন থাকলেও পরবর্তীতে তারা যখন প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অর্জন করে তারা এইরূপ বিবাহ বর্জন করে। আসুর ও পৈশাচ বিবাহ নিম্নতর বর্ণদুটির মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এই কারণে মনুস্মৃতি ও আদিপর্বে এরূপ বিবাহকে জোর গলায় বাতিল করে দেয়া হয়েছে। (**মনু**, অধ্যায় ৩, পৃঃ ২৫; **আদিপর্ব**, অধ্যায় ৬৭, পৃঃ ১২)।

[১৬৭]. **History of Marriage**, (London, 1926), p: 166-171.

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে সমাজ সংস্কারের স্বপক্ষে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায়নি। এর পিছনে কিছু কারণ ছিল। **প্রথমতঃ** সাধারণ এই বিবাহ ছিল অনুলোম শ্রেণীর, যেখানে উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ হত। **দ্বিতীয়তঃ** অধিকাংশ দৃষ্টান্তই ছিল দুটি উচ্চতর বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কিত। যেখানে বর ব্রাম্মণ ও কনে ক্ষত্রিয়। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়, সাধারণভাবে বৈশ্য, শুদ্র ও সমাজ থেকে বহিস্কৃত জাতিচ্যুত লোকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাম্মণ পরিবারে বিবাহ করতে বা সেরকম অভিলাষ পোষণ করতে পারত না।[১৬৯] কালিদাস রচনাবলীতে অসবর্ণ বিবাহ, বিশেষ করে প্রথম দুই বর্ণ অর্থাৎ ব্রাম্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১৭০] গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে দুটি উচ্চবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের কম করেও চারটি লৈখিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১৭১]

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্নবর্ণের রমণীকে বিবাহ করার অনুমতি ছিল।[১৭২] কিন্তু এই পত্নীরা পরিবারে সমান প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা পেত না। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে, শুধু ভোগবিলাসের নিমিত্ত শূদ্ররমণী বিবাহ করা যেতে পারে।[১৭৩] এই ধরণের বিধানে শুদ্র পত্নীর আইনগত মর্যাদা লাভের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের স্ত্রী স্বামীর উচ্চবর্ণ লাভ করতে পারত না। মনুর মতে, কোন ব্রাম্মণ বিভিন্ন বর্ণের রমণী বিবাহ করলে তাদের পুজার্চনা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা বর্ণানুসারে হবে।[১৭৪] এই স্ত্রীদের জন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্ণানুসারে নির্ধারিত ছিল ও তাদের অভিবাদন জানাবার পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন।[১৭৫] নিম্নবর্ণজাত গুরুপত্নীকেও দুর থেকে অভিবাদন জানাতে হত। গুরু ও স্বামীর পদ স্পর্শ করার অধিকার ছিল না। আবার নিম্নবর্ণের পত্নীদের গর্ভজাত সন্তানদের মর্যাদাও বর্ণানুসারে নির্ধারিত হত। কোন ব্রাম্মণের বিভিন্ন বর্ণের চার পত্নী থাকলে ব্রাম্মণ পত্মীর সন্তানের সম্পত্তির চার ভাগ, ক্ষত্রিয় পত্নীর সন্তানের সম্পত্তির তিন, বৈশ্য পত্নীর সন্তানের সম্পত্তির দুই ও শুদ্র পত্নীর সন্তানের সম্পত্তির এক ভাগ প্রাপ্য হত।[১৭৬] স্পষ্টতই এই বিধিগুলি উচ্চবর্ণের পক্ষে প্রণীত হয়। এইজন্য অসবর্ণ বিবাহকে সমমর্যাদা প্রদানের অনুকুল পরিবেশ প্রস্তুত হয়নি। এর ফলে পুরনো জাতিগুলির অবনতি ও নতুন জাতির সৃষ্টি সবর্ণ বিবাহবিধি লঙ্ঘনের ফলে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।[১৭৭]

---

[১৬৮]. ক্ষিতিমোহন সেন, **ভারতবর্ষমে জাতিভেদ**, কলকাতা, ১৯৪০, পৃঃ ৮০-৯৫; Bhupendra Nath Dutt, **Studies in Indian Social Polity** (calcutta), 1944, Chapter-XII; Binoy kumar Sarkar, **Varnasrama Dharma and Race fusion in India**, Modern Review, February, 1917; Ramprasad Chanda, **Intercaste marriage in Buddhist India**, Modern Review, 1919, 595.

[১৬৯]. B.C. Law, **India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism**, (London, 1941), p: 180.

[১৭০]. R.B.Pandey, **Vikramaditya of Ujjayini** (Banaras. 1951).

[১৭১]. Fleet, **Corprus Inscriptionum Indicarum**, III, p: 152 and 245.

সুপরিচিত পরম্পরা থেকে জানা যায়, কন্ব, বৎস ও সত্য কামজাবালের মত ঋষিরা ছিলেন দাসীপুত্র এবং শান্তনু ছিলেন মেছুনীর পুত্র। (ক্ষিতিমোহন সেন, **ভারতবর্ষমে জাতিভেদ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩)।

[১৭২]. মৌর্যত্তর ও গুপ্তযুগে উচ্চবর্ণের লোকের নিম্নবর্ণের সাথে বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল। স্মৃতিকার বিষ্ণু প্রথম তিন বর্ণের সাথে শুদ্র রমণীর বিবাহের নিন্দা করেছেন। মনুর বিধান, অনুযায়ী, ব্রাম্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুদ্র রমণীকে প্রধান পত্মীর মর্যাদা দান নিষিদ্ধ ছিল। তার মতে, প্রাচীনকালে কখনও এই প্রথার বিধান ছিল না। (**বিষ্ণু**, অধ্যায় ২৬, পৃঃ ৪-৭; **মনু**, অধ্যায়-৩, পৃঃ ১৪)। বিশেষ করে শুদ্রের সাথে ব্রাম্মণের বিবাহের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং একে সবচেয়ে অবাঞ্ছনীয় ও অপমানজনক বলে মনে করা হয়েছে। (**মনু**, অধ্যায়-৩, পৃঃ ১৭-১৯, ৬৪)।

[১৭৩]. **বশিষ্ট**, অধ্যায়-৮, পৃঃ ১৮; **তুলণীয় নিরুক্ত**, অধ্যায়-১২, পৃঃ ১৩; **বিষ্ণু**, অধ্যায়-৩৬, পৃঃ ৫।

[১৭৪]. **মনু**, অধ্যায়-৯, পৃঃ ৮৫।

[১৭৫]. **বিষ্ণু**, অধ্যায়-৩২, পৃঃ ৩৫, **তুলণীয় মনু**, অধ্যায়-২, পৃঃ ২১০।

[১৭৬]. **বৌধায়ন**, অধ্যায়-২; পৃঃ ৩-১৯; **বশিষ্ট**, অধ্যায়-১৭, পৃঃ ৪৮-৫০; **বিষ্ণু**, অধ্যায়-১৭, পৃঃ ৩৮-৪০।

[১৭৭]. রামশরণ শর্মা, **প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪। স্বজাতীয় বিবাহের তত্ত্ব শুধু ভারতবর্ষেই নয়। অন্যান্য প্রাচীন সমাজেও এর অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন ফ্রাংক সমাজের (খ্রীষ্টিয় নবম শতক) সাক্সেনদের সম্পর্কে রুডলফ বলেছেন, এই জাতির মানুষের মধ্যে চারটি শ্রেণী ছিল। অভিজাত (নোব্‌ল), মুক্তপুরুষ (ফ্রি), মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ (ফ্রিডমেন) ও কৃষিদাস (সার্ভি)। আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে কোনও শ্রেণী বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সময় নিজ শ্রেণীসীমা লংঘন করবে না। অভিজাত পুরুষ অভিজাত নারীকে, মুক্ত পুরুষ মুক্তনারীকে, মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ মুক্তিপ্রাপ্ত নারীকে ও কৃষিদাস দাসীকে বিবাহ করবে। কোনও পুরুষ ভিন্ন অথবা উচ্চতর শ্রেণীর রমনীকে বিবাহ করলে তাকে প্রাণ

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যবিবাহ

ভারতীয় সভ্যতায় বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে মোহাম্মদী পত্রিকায় উল্লেখ আছে যে, "অনেকের ধারণা প্রাক মুসলিম যুগে ভারতে বাল্যবিবাহ প্রথা অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল; মুসলিম সমাজের প্রভাবের ফলে এটা ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করেছে। হিন্দুশাস্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাল্যবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত অনুজ্ঞা, প্রাচীন আর্য্য সমাজে এটা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে ঋষি কক্ষিবান ও তার স্ত্রীর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাতে বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ প্রথার অস্তিত্বের স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রথম মন্ডলের ১২৬শ শ্লোকে এই কথোপকথন লিখিত আছে। ষষ্ঠমন্ত্রে ঋষি কর্তৃক বলা হয়েছে যে, যদি তার পত্নী আর একটু বয়স্কা হতেন তাহলে তিনি অধিকতর সুখী হতেন।[১৭৮] উপনিষদে দেখতে পাওয়া যায়, চক্রমুনির পুত্র নিতান্ত অপরিণত বয়স্কা কন্যা বিবাহ করেছিলেন।[১৭৯] বাল্মিকী রামায়ণে সীতার বিবৃতি হতে জানা যায়, সীতা অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বিবাহের ত্রয়োদশ বৎসরে রামের বনগমণকালে তার সাথে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন। বিবাহকালে সীতার বয়স ছিল পাঁচ অথবা ছয় বছর।[১৮০]

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ ছিল একটা নিয়মিত বিষয়। যুবক পুরুষের সাথে শিশুকে বিয়ে দেয়াই ছিল তৎকালীন প্রথা। এরফলে যুবতী নারীই শুধু নয় কন্যা শিশুরাও ছিল নির্যাতিত। যুবক স্বামীর যৌন চাহিদা পুরণ না করতে পেরে অনেক শিশু কন্যাকে মৃত্যুবরণ করতে হত। পরবর্তীতে আইন করে ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়।[১৮১] বর্তমান ভারতীয় সমাজের কোন কোন অঞ্চলে এখনও বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে।

বহুবিবাহ

বহুবিবাহ বা বহুপত্নী গ্রহণ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মৈত্রয়িনী সংহিতায় মনুর দশজন স্ত্রী থাকার কথা এবং তৈত্তরীয় সংহিতায় চন্দ্রের বহু স্ত্রী, শতপথ ব্রাহ্মণে একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮২] মহাভারতীয় যুগেও এই প্রথা বেশ প্রচলিত ছিল। মহাভারতের অনেক

বিসর্জন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। (Stuss, **Constitutional History of England**, 3rd Edition, Chapter- 1, p: 43).

স্পষ্টতই আদি মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বিধি প্রাচীন ভারতীয় বিধির চেয়ে কঠোরতর ছিল। প্রাচীন ভারতীয় বিধি অনুযায়ী এই রকম ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিধান ছিল না। শুধু উচ্চবর্ণের মানুষকে জাতিচ্যুত করে নিম্নবর্ণে অবদমন ঘটান হত। (রামশরণ শর্মা, **প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫)।

১৭৮. মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, **প্রাচীন ভারতে বাল্যবিবাহ**, ***মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা***, ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৪১।

১৭৯. **উপনিষদ**, ছান্দোগ্য প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, প্রথম শ্লোক।

১৮০. **বাল্মিকী রামায়ণ**, তৃতীয় খন্ড, অধ্যায় ৪৭শ; মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, **প্রাচীন ভারতে বাল্যবিবাহ**, ***মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা***, ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৪১; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯-৬০।

১৮১. ১৮৯০ সালের দিকে ভারতজুড়ে দুটি বিতর্ক, রক্ষণশীলরা যে শক্তিশালী তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। বিতর্ক দুটির একটি ছিলো সহবাস সম্মতি আইন। সংক্ষেপে এ আইনের মূলকথা ছিলো, বারো বছরের নিচে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত বালিকার সঙ্গে তার অনুমতি অথবা বিনা অনুমতিতে সহবাস করলে তা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ১৮৯১ সালের ৯ জানুয়ারী ভারতীয় পিনাল কোর্ডের ৩৭৫ ধারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্যার এন্ড্রু স্কোবল বিল আকারে উত্থাপন করেছিলেন এই আইন। এর আগে ১৮৬০ সালে সহবাসের সর্বনিম্ন বয়স ধার্য করা হয়েছিল দশ বছর। পরবর্তীতে দু'বছর বৃদ্ধি করে তা উন্নীত করা হয়েছিল বারোতে। পুর্ববঙ্গে, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আইনকে ঘিরে। সতীদাহ প্রথা বিলোপের পর আর কোন বিষয় নিয়ে বোধ হয় এতো তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও আন্দোলন হয়নি।

তখন বিধবা বিবাহের প্রচলন হলেও বাল্যবিবাহ নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক চলছিল। ঐ সময় কলকাতায় জনৈক হরিমোহন মাইতির এগার বছরের স্ত্রী ফুলমণি বাঈ সহবাসজনিত কারণে মারা গেলে ভারত ও ইংল্যান্ডে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে আবার জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং সেই সুযোগে ব্রিটিশ সরকার বিলটি উত্থাপন করেছিল 'লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে'। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০)।

১৮২. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম ও ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলামী সংস্কৃতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ**, (ঢাকাঃ সেন্টার ফর ইস্ট ওয়েস্ট ষ্টাডিজ ২০০৩), পৃঃ ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

নায়কেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। যেমন, যযাতি বিবাহ করেছিলেন শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে, দুস্মন্ত বিবাহ করেছিলেন শকুন্তলা ও লক্ষণাকে, শান্তনু বিবাহ করেছিলেন সত্যবতী ও গঙ্গাকে, বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেছিলেন অম্বিকা ও অম্বালিকাকে, ধৃতরাষ্ট্র বিবাহ করেছিলেন গান্ধারী ও বৈশ্যাকে, পান্ডু বিবাহ করেছিলেন কুন্তী ও মাদ্রীকে এবং যুক্ত-স্ত্রী হিসাবে দ্রৌপদী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভীম বিবাহ করেছিলেন হিরিম্বাকে এবং অর্জুন বিবাহ করেছিলেন উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রাকে। মগধের রাজা বৃহদ্রথও বিবাহ করেছিলেন কাশী রাজের দুই যমজ কন্যাকে। মহাভারতে একস্থানে উল্লেখিত হয়েছে যে, কৃষ্ণের ১০১৬ স্ত্রী ছিলো আবার অপর স্থানে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী ছিলো। মহাভারতে আরো উল্লেখ আছে যে, রাজা সোমকের একশত স্ত্রী ছিলো।[১৮৩]

প্রাচীন ভারতে বহুপত্নি গ্রহণের মত বহুপতি গ্রহণেরও ব্যাপক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত মহাভারতেও অনেকই আছে। পান্ডব ভ্রাতাদের সংগে দ্রৌপদীর বিবাহই একমাত্র বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত নয়, কালান্তরে গৌতম বংশীয়া জটিলা সাতজন ঋষিকে এক সংগে বিবাহ করেছিলেন। আবার বার্ক্ষী নামে অপর এক ঋষি কন্যা এক সংগে দশ ভাইকে বিবাহ করছিলেন। বৈদিক যুগেও জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা কর্তৃক বিবাহিতা বধুর উপর সকল ভ্রাতার এক সংগেই যৌনাধিকার থাকতো। দ্রৌপদীর বিবাহ কালে ব্যাস বলেছিলেন, স্ত্রী লোকের পক্ষে বহুপতি গ্রহণই সনাতন ধর্ম। ধর্মসুত্র গুলোতেও এর উল্লেখ ব্যাপকহারে পাওয়া যায়। আপস্তম্ভ ধর্মসুত্রে বলা হয়েছে, "কন্যাকে কোন বিশেষ ভ্রাতার হাতে দেওয়া হয় না, ভ্রাতৃবর্গের হাতে দেওয়া হয়।" বৃহস্পতি এর প্রতিধ্বনি করেছেন। তবে তার সময়ে এরূপ বিবাহকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমদ্ভগবত অনুযায়ী দক্ষরাজার ১৬টি মেয়ের বিবাহ হয়েছিলো বিভিন্ন প্রথাতে। ১৩টির বিবাহ হয়েছিলো ধর্মের সংগে, একটি অগ্নির সংগে, একটি 'মিলিত পিতৃগণের' সংগে, আর সতী নামের মেয়েটির বিয়ে হয়েছিলো শিবের সংগে। সুতরাং এস্থলে বহুপত্নীক, বহুপতি ও এক পত্নীক বিবাহ - এই তিন রকম বিবাহ প্রথারই দৃষ্টান্ত রয়েছে।[১৮৪]

ব্যভিচার

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে নির্বিচারে ব্যভিচারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নির্বিচার ব্যভিচার প্রসঙ্গে মহাভারতেও উল্লেখ রয়েছে। পান্ডু এমন এক যুগের উল্লেখ করেছেন, যখন নারী ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে, দুশ্চরিত্রা, স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন। বিবাহের পূর্বেই তারা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হত। কিন্তু এতে তাদের কোন পাপ হত না।[১৮৫] উদ্দালক ও তার পুত্র শ্বেতকেতুর আখ্যানেও নির্বিচার যৌন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮৬]

প্রাচীনতর ধর্মসূত্রগুলিতে উদ্ধৃত পুরাতন গাথায় এমন কালের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন নারীর দাম্পত্য নিষ্টার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না।[১৮৭] বৃহস্পতি স্মৃতি অনুসারে, পুর্বাঞ্চলে নারীগণ ব্যভিচারিণী হত।[১৮৮] তবে সব মিলিয়ে বলা যায় যে, সাহিত্যগত সূত্রাবলী স্পষ্টতই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে

---

১৮৩. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, (কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ভাদ্র-১৩৮০), পৃঃ ৩২।

১৮৪. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২-৩৩।

১৮৫. **আদিপর্ব**, পৃঃ ১২৮, ৪-৫।

১৮৬. শ্বেতকেতুর সামনে তার মাকে এক ব্রাম্মণ হাত ধরে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। পিতা উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলেন যে, এতে ক্রুদ্ধ হবার কোন কারণ নেই কেননা সংসারের সব নারীই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী এবং এই প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকে সনাতন ধর্মে চলে আসছে। (**আদিপর্ব**, কুম্বকোনম সংস্করণ, পৃঃ ১২৮, ৯-১৫)। কিন্তু পুত্র পিতার আচরণের এই ব্যাখ্যা মেনে নেয়নি, সে এর প্রতিবাদ করে এই বিধি রচনা করেন, যে স্ত্রী তার স্বামীকে উপেক্ষা করবে এবং যে পুরুষ কুমারী কন্যার সতিত্ব নাশ করবে উভয়েই ভ্রূণ হত্যার পাপে দোষী সাব্যস্ত হবে। শ্বেতকেতুর এই আখানের সাথে অন্যান্য পরম্পরার সাদৃশ্য আছে বলে একে গল্পগাথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। (D.N. Mitter, **Position of women in Hindu Law**, p: 203). এই প্রসঙ্গে পৌরাণিক উক্তি হল, কৃত যুগে সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছা হলেই সন্তান উৎপাদন করা যেত। (**বায়ুপুরান**, Bibliotheca India, VII. p: 57).

১৮৭. **আপস্তম্ব**, ii, ১৩, ৭; **বৌধায়ন**, ii, ৩, ৩৪।

১৮৮. **বৃহস্পতি স্মৃতি**, ii ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-পুরুষের নির্বিচার ব্যভিচারের ইঙ্গিত দেয়।[১৮৯] পরবর্তীতে বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পরও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বিচার ব্যভিচারের পুরনো প্রথার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকায় কঠোর বিধান চালু করা হয়। মনুর বিধান অনুযায়ী, স্বামী ছাড়া অপর কোন পুরুষের সঙ্গে মিলনের ফলে যদি সন্তানের জন্ম হয় এবং সন্তানের পিতৃপরিচয় নির্ধারণ করা না যায় তবে সেই সন্তান গূঢ়োৎপন্ন নামে পরিচিত হবে।[১৯০]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করে তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দান এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে তাকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামীর জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক। হিন্দু আইনে নারীর কোন মূল্য নেই। নারী অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র। নারী কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। উত্তরাধিকারীও হতে পারে না।[১৯১]

প্রাচীন ভারতে বিবাহ বিধান প্রচলিত হওয়ার পরও বিবাহের পূর্বে বিভিন্ন পুরুষের সাথে মেয়েদের ব্যভিচারের অনুমতি ছিল। এ সম্পর্কে ড. অতুল সুর[১৯২] বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, "বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গ মহাভারতীয় যুগে অনুমোদিত হতো। বোধহয় আগেকার যুগেও হোত। কেননা ছান্দগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, মহর্ষি সত্যকামের মাতা জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন।[১৯৩] বিবাহের পূর্বে মেয়েদের ব্যাভিচার সমাজে স্বীকৃত ছিল তা প্রসূত সন্তানের 'আখ্যা' থেকেই প্রতীয়মান হয়। কৃষ্ণ কর্ণকে বলেছেন "কুমারী মেয়ের দুরকম সন্তান হতে পারে।" যথা: কানীন ও সহোঢ়। যে সন্তানকে কুমারী বিবাহের পূর্বেই প্রসব করে তাকে কানীন বলা হয়। আর যে বিবাহের পূর্বে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে বিবাহের পরে প্রসব করে তাকে সহোঢ় বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে মহাভারতীয় যুগে কুমারী কন্যার পক্ষে গর্ভধারণ করা বিশেষ নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না।[১৯৪]

মহাভারতীয় যুগে বিবাহিতা নারীর পক্ষে স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সংগে ব্যভিচার করা নিন্দনীয় ছিল না। সুদর্শন উপাখ্যানে দেখা যায় যে, অতিথির সন্তুষ্টির জন্য তার নিকট গৃহিণীর আত্মদেহ নিবেদন করা প্রচলিত রীতি ছিল। সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সাথে যৌনমিলনের রীতিও ছিলো। স্বামীর মৃত্যুর পর এই ধরনের যৌনমিলন তো ঘটতোই, স্বামী জীবিত থাকাকালিনও যে এরূপ মিলন ঘটতো তারও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১৯৫] যেমন, কুন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য ধর্মকে

---

[১৮৯]. সিংহের মতে মহাভারতে সব শ্রেণীর পুরুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত ব্যভিচারের উল্লেখ একাধিকবার পাওয়া যায়, যাতে দেবতারাও অংশ নিয়েছেন। (S.D. Shingha, **Polyandry in Ancient India**, Chapters II, III, p: 76-82.) টীকাকার নীলকণ্ঠ উৎসব সংকেত গণকে অবাধ ব্যভিচারে লিপ্ত সাতটি উপজাতির প্রজাতন্ত্ররূপে বর্ণনা করেছেন, যাদের কোন বিবাহ বিধি ছিল না। (**মহাভারত**, অধ্যায়-২, পৃ: ২৪, ১৫) ; এস. ডি. সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

[১৯০]. **মনুস্মৃতি**, অধ্যায়-৯, পৃ: ১৭০-১৮১।

[১৯১]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩।

[১৯২]. একজন বিশিষ্ট লেখক, নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে ও ভারতের বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেন।

[১৯৩]. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪। মহাভারতের এরূপ সংসর্গের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সত্যবতী ও পরাশরের কাহিনী এরূপ ছিল যে, উপরিচর বসুর কুমারী কন্যা সত্যবতী যৌবনে যমুনায় খেয়া পারাপারের কাজ করতেন। একদিন পরাশমুনি তার নৌকায় উঠে তার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে তার সংগে যৌনমিলন প্রার্থনা করলেন। সত্যবতী তখন পরাশরকে বললেন, "নৌকার মধ্যে আমি কিভাবে যৌনকর্মে রত হবো। কেননা তীর থেকে লোকেরা আমাদের দেখতে পাবে।" পরাশর তখন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন এবং তারই অন্তরালে তার সংগে যৌনমিলনে রত হন। এর ফলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয়েছিলো। পরাশর সত্যবতীকে বর দেন যে এই সংসর্গ সত্ত্বেও সে কুমারী থাকবে। কুন্তী ও কুমারী অবস্থায় সূর্য্যের সংগে মিলনের ফলে পুত্র কর্ণকে প্রসব করেছিলেন। এক্ষেত্রেও দুর্বাসামুনির বলে কুন্তী তার কুমারীত্ব হারাননি। মাধবী-গালব উপখ্যানেও দেখা যায় যে, প্রতি সন্তান প্রসবের পর মাধবীর কুমারীত্ব অটুট ছিল। (অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪)।

[১৯৪]. আহমেদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)**, প্রাগুক্ত , পৃ: ৩৭-৩৮।

[১৯৫]. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র উৎপাদনের জন্য অপরের সাথে যৌনমিলনের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিচিত্র বীর্যের মৃত্যুর পর মাতা সত্যবতী ভীষ্মকে ভ্রাতৃজায়াদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। ভীষ্ম যখন এর অনুমোদন করলেন না তখন তাদের গর্ভে

Dhaka University Institutional Repository

আহবান করা হয়েছিলো। ধর্মের সাথে কুন্তীর মিলনের ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছিলো। পরে পান্ডুর ইচ্ছানুক্রমে কুন্তী বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে ভীম ও অর্জুনের জন্ম দেন। তার অপর স্ত্রী মাদ্রীও অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে দুটি সন্তান নকুল ও সহদেবের জন্ম দিয়েছেন, নমস্যা ঋষিপত্নীরাও এরূপ যৌনসংসর্গ বা যৌন আকাংখা থেকে মুক্ত ছিলেন না।[১৯৬] প্রাচীন ভারতে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাম্মণরা অজস্র মেয়েকে বিবাহ করতেন। এরূপও জানা যায় যে এক একজন ২০০/৩০০ পর্যন্ত বিবাহ করতেন।[১৯৭]

আল বেরুনী[১৯৮] বলেন, "বিবাহিতা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অনুমতিক্রমে পর পুরুষের সাথে ব্যভিচারে রত হয়ে যে সন্তান উৎপাদন করতো সে পুত্র তার স্বামীর হতো, যেহেতু স্ত্রীরূপ ভূমিতে তার অনুমতিক্রমে উৎপাদন শষ্যে স্বামীরই অধিকার থাকে। এ নিয়মেই পান্ডু শান্তনুর পুত্র বলে বিবেচিত। নি:সন্তান অবস্থায় কোন মহা তপস্বীর অভিশাপে এই রাজা স্ত্রী সহবাসের সামর্থ হারিয়েছিলেন। তিনি তখন পরাশুর পুত্র ব্যাসকে তার স্ত্রীর গর্ভে তার জন্য পুত্র উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। ব্যাসের সংগে সহবাসকালে তার এক স্ত্রী ভয়ে কম্পিত হয়েছিলো, তার ফলে সেই অবস্থায় পান্ডুর বর্ণের এক রুগ্ন পুত্রকে সে গর্ভে ধারণ করেন। রাজা তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তার কাছে পাঠালে এই স্ত্রীও ব্যাসের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে নিজেকে বসনাবৃত করে রাখে। তার গর্ভে অন্ধ ও অসুস্থ ধৃতরাষ্টের জন্ম হয়। তৃতীয় স্ত্রীকে ব্যাসের কাছে পাঠাবার সময়ে রাজা তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা পরিহার করতে বলে। হাস্যমুখে ও উৎফুল্লচিত্তে ব্যাসের সাথে থাকাতে সে স্ত্রীর গর্ভে সুভাষ ও তীক্ষ্ণধী বিদুরের জন্ম হয়। পান্ডুর চার পুত্রের একজন স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্বামীর সংগে সে একমাস করে বাস করতো।"[১৯৯]

প্রাচীন ভারতে শুধুমাত্র বহুবিবাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল না, এর বাইরে ব্যাপকভাবে বিবাহ বহির্ভুত ব্যভিচার বহাল ছিল। তৎকালীন সময়ের ব্যভিচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ড. অতুল সুর বলেন, "প্রাচীন ভারতেও যে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচলন ছিল তার উল্লেখ মহাভারতেও রয়েছে। বিশেষ করে অনুশাসন পর্বে সুদর্শন ও ওঘাবতীর কাহিনী থেকে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[২০০] মহাভারতে আরও উল্লেখ

সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যাসকে আহবান করা হয়। ব্যাস অম্বিকা ও অম্বালিকার দুটি সন্তান ও তাদের দাসীর গর্ভে আর একটি সন্তান উৎপাদন করেন। শতশৃঙ্গ পর্বতের নির্জনে পান্ড কুন্তীকে আদেশ করেছিলেন, "তুমি অপরের সহিত সঙ্গম করে সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা কর, কেননা শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রয়োজন হলে নারী তার দেবরের সাথে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করতে পারে।" (প্রাগুক্ত)।

[১৯৬]. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

[১৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫-৩৬।

[১৯৮]. প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী আল বেরুনী ব্যক্তিগতভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুদিন অবস্থান করে তৎকালীন ভারতের সামাজিক অবস্থাসহ হিন্দুদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম বিবাহ জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর "ভারততত্ত্ব" নামে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। বইটির আরবী নামের ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে, "Book on an accurate description of all categories of Hindu thought, those which are admissible to reason as well as those are not" (বুদ্ধি বিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর যা গ্রহণযোগ্য নয়, হিন্দুদের সব রকম চিন্তা পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা)। EDWARD ZACHAU আল বেরুনীর মূল আরবী গ্রন্থটি ১৮৮৭ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। পরের বৎসর Zachau টীকা সহ "ALBERUNI'S INDIA" নামে তার একটি সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ দুই খন্ডে প্রকাশ করেন। ভারত সরকারের উদ্যোগে আরবীর একটি সংস্করণ ১৯৫৭ সালে হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই আরবী সংস্করণের উপর ভিত্তি করে আবু আহামেদ হবিবুল্লাহ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন যা বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রথম ১৯৭৪ এবং পরে ১৯৮২ সনে প্রকাশিত হয়। (আহমেদ মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮-৩৯)।

[১৯৯]. আবু আহামেদ হাবিবুল্লাহ, **আল বেরুনীর 'ভারত তত্ত্ব'** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রি:) পৃ: ৭৭।

[২০০]. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮০। সুদর্শন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পালন করেই মৃত্যুকে জয় করবেন সংকল্প করেছিলেন। স্ত্রী ওঘাবতীকে অতিথি সৎকারের কাজে নিয়োজিত করে তিনি তাকে আদেশ দেন যে প্রয়োজন হলে ওঘাবতী যেন নির্বিচারে নিজেকেও অতিথির কাছে সমর্পণ করে। কেননা অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই। একদিন তার আদেশের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তার অনুপস্থিতিকালে যমরাজ স্বয়ং ব্রাম্মণ বেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে ওঘাবতীর সংগে সংগম প্রার্থনা করলেন। ওঘাবতী প্রথমে কৌশল করে এটা এড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রাম্মণবেশী ধর্ম নাছোড়বান্দা দেখে অগত্যা তার সংগে যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সুদর্শন ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে সামনে না দেখতে পেয়ে তাকে বার বার ডাকতে থাকেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। কেননা ওঘাবতী তখন ব্রাম্মণের সংগে যৌন মিলনে নিযুক্ত থাকায় নিজেকে অশুচি জ্ঞান করে স্বামীর আহবানে সাড়া দেন না। এমন সময় অতিথি ব্রাম্মণ ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে সুদর্শনকে বলেন যে ওঘাবতী তার কামনা পূর্ন করেছে। ওঘাবতীর

Dhaka University Institutional Repository

আছে, সন্তসুজাত অর্জুনকে বলেছিলেন যে বন্ধুত্বের ষড়গুণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বন্ধুর নিকট নিজ পুত্র ও স্ত্রীকে সমর্পণ করা। কৃষ্ণও বন্ধুর কাছে পুত্র এবং স্ত্রীকে সমর্পণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কর্ণও বলেছিলেন যে, অর্জুন কোথায় আছে তা যদি কেউ তাকে দেখিয়ে দেয় তাহলে তিনি তার স্ত্রী ও পুত্রকে তার নিকট সমর্পণ করবেন।[২০১]

ভারতীয় সভ্যতায় স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের দ্বারা অতিথিদের যৌন কামনা পুরণ করা ছাড়াও তাদেরকে জুয়া, পাশা প্রভৃতি খেলায় বাজি রাখত। ঋগ্বেদে পাশা খেলায় সুন্দরী স্ত্রীকে হারিয়ে এক যুবককে আফসোস করতে দেখা যায়।[২০২] বয়স্কা ও অবিবাহিতা নারীরা রিপুর তাড়নায় ও প্রলোভনে পড়ে প্রায়ই ব্যভিচারে লিপ্ত হত। উপপতি রাখা ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। কোন নারীর বিবাহের পর পুত্র সন্তান না হলে অথবা স্বামী নপুংসক হলে সে ক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীকে দিয়ে এমন সকল অশ্লীল কাজ করানো হতো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হিন্দুধর্মে আছে "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্যা" অর্থাৎ "পুত্রের জন্যই বিবাহ। পুত্র না হলে পুৎ নামক নরক হতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।" এই কারণে অপুত্রকে রাজারা পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। এর অনুষ্ঠান প্রণালী সম্পর্কে যর্জুবেদে অত্যন্ত অশ্লীলভাবে বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপের বর্ণনা আছে। পতিত ও নপুংসক স্বামীরা অপরের দ্বারা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করাতেন।[২০৩] বিধবারাও দেবরের সাথে এভাবে যৌন মিলনের মাধ্যমে পুত্র উৎপাদন করতে পারতো।[২০৪]

প্রাচীন ভারতের মন্দিরগুলোতে ব্রাম্মণ পুরেহিতরা অবাধ ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। যার ফলে মন্দিরগুলো ব্যভিচারের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল।[২০৫] অতুল সুর আরো বলেন, "দক্ষিণ ভারতের অপর এক স্থানেও আবে দুবোয়া যে প্রথা দেখেছিলেন তার বিবরণও তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, কোন কোন জনবিরল অঞ্চলে এমন অনেক মন্দির আছে যেখানে দেবতাদের প্রীতির জন্য অতি জঘন্য ধরণের লাম্পট্যের লীলা চলে। এ সকল স্থানের বন্ধ্যা নারীরা লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে নির্বিচারে সকল শ্রেণীর মানুষের সংগে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে এই সকল স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতার এক উৎসব হয় এবং ঐ উৎসবের সময় সকল শ্রেণীর নরনারী (বিশেষ করে গ্রামের জঘন্য চরিত্রের লোকেরা) ঐ সব স্থানে সম্মিলিত হয়। বন্ধ্যা নারীরা এখানে দেবতার কাছে এসে মানত করে যে তারা যদি সন্তানবতী হতে পারে তাহলে দেবতার প্রীতির জন্য কোন বিশেষ সংখ্যক পুরুষের সংগে সহবাস করে তবে বাড়ি ফিরে যাবে। এমন কি যে সব নারী বন্ধ্যা নয় তারাও দেবতার প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শনের জন্য অতি নির্লজ্জভাবে অপরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো।"[২০৬]

অতিথিপরায়নতা দেখে সুদর্শন অত্যন্ত প্রীত হন। ধর্ম তখন আত্মপ্রকাশ করে বলেন, "সুদর্শন তুমি তোমার সততার জন্য এখন থেকে মৃত্যুকে জয় করলে।" (আহমেদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০)।

[২০১]. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪-১০৫।

[২০২]. ধর্মীয় গ্রন্থ, **ঋগ্বেদ**, অধ্যায় ২, পৃঃ ১০-৩৪।

[২০৩]. **অথর্ববেদ**, ৯-৫-২৭,২৮।

[২০৪]. ধর্মীয় গ্রন্থ **ঋগ্বেদ**, অধ্যায় ২; পৃঃ ১০-৪০। এছাড়াও তৎকালীন ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে কন্যা সন্তান জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। কন্যা সন্তান জন্মকে অশুভ বলে মনে করা হত।

[২০৫]. এই অবাধ যৌন মিলন ও ব্যভিচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ অতুল সুর বলেন, "...ধর্মের রূপ দিয়ে কামাচারী ব্রাম্মণ পুরোহিতরা বিবাহিতা নারীকে সতীত্ব বিসর্জন দিতে প্রলুব্ধ করতো। এভাবে প্রলুব্ধ হয়ে সতীত্ব বিসর্জন দেবার এক কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যটক আবে দুবোয়া তার গ্রন্থে বিবৃত করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতে এমন কতকগুলি মন্দির আছে যেখানকার পুরোহিতগণ প্রচার করে যে আরাধ্য দেবতার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দুর করবার। এরূপ মন্দিরের মধ্যে কর্ণাটক রাজ্যের তিরুপতির মন্দির বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এখানকার দেবতা ভেনকাটেশ্বরের কাছে অসংখ্য স্ত্রী লোক আসে সন্তান কামনায়, পুরোহিতগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারা মন্দিরে রাত্রি যাপন করে। পুরোহিতরা তাদের বলে যে তাদের ভক্তি দ্বারা প্রীত হয়ে ভেনকাটেশ্বর রাত্রিকালে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের গর্ভবতী করে দিয়ে যাবে। পরদিন প্রভাতে এ সকল জঘন্য চরিত্রের ভন্ড তপস্বীরা কিছুই জানেনা এরূপ ভান করে ঐ সকল স্ত্রীলোকদের কাছে এসে দেবতার করুণা লাভ সম্বন্ধে বিশধভাবে অনুসন্ধান করতো এবং তারা দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেছে বলে তাদের পুন্যবতী আখ্যা দিয়ে তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতো। দেবতাদের সাথে তাদের যৌনমিলন ঘটেছে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এ সকল নারীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত।" (অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪-১০৫)।

[২০৬]. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় ধর্মের নামে ভারতের বিভিন্ন মন্দিরগুলোতে দেবদাসী রাখার প্রচলন ছিল এবং এই দেবদাসীদের সাথে মন্দিরের পুরোহিতরা অবাধ ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতো এবং জঘন্য অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ করতো। ডঃ অতুল সুর এ সম্পর্কে বলেন, "ধর্মের নামে আর এক রকমের গণিকাবৃত্তি মন্দিরগুলোতে প্রচলিত ছিলো। আর এটাই হচ্ছে দেবদাসী প্রথা। এখনও অনেক মন্দিরে দেবদাসী প্রথা বর্তমান আছে।"[২০৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যটক আবে দুবোয়া বর্ণিত বিভিন্ন মন্দিরগুলির যৌনলীলা ও ব্যভিচারের যে চিত্র পাওয়া যায় তা শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতকে ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব পর্যটকগণ সিন্ধু দাক্ষিণাত্য এবং উপকুল বিভাগে মন্দিরের পুজারী নারীদের এবং দেবদাসীদের যে চরিত্রহীনতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এর চাইতে আরও অধিক লজ্জার বিষয় এই যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে দেবতার সন্ত ষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা এই সমস্ত অপকর্ম করত।[২০৮]

প্রাচীন ভারতে কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর নারীর (গণিকা ও ব্রাম্মণ ব্যতিত অন্য বর্ণের স্বৈরিণী) সাথে ব্যভিচার করা বৈধ ছিল এবং একে ব্যভিচার বলে গণ্য করা হতো না। নারদ বলেছেন যে, স্বামী পরিত্যাক্তা নিষ্কলঙ্কা স্ত্রীলোকের সংগে যৌন মিলন ব্যভিচার বলে গণ্য হবে না। স্বামী যদি নপুংসক হয়, কী ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রেও অপর পুরুষের সাথে যৌনমিলন ব্যভিচার বলে গণ্য হবে না। প্রাচীন ভারতে গণিকাদেরও বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ছিল। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পাঁচ শ্রেণীর গণিকার নাম পাওয়া যায়। যারা হল রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্ত বেশ্যা, দেববেশ্যা এবং ব্রম্মবেশ্যা বা তীর্থগণ।[২০৯] এই সকল গণিকাদের নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল দত্তক রচিত গ্রন্থ।[২১০] এছাড়াও হিন্দু ধর্মে তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনকে তন্ত্রশাস্ত্রে গুহ্য রূপ দেয়া হয়েছে। কোন স্ত্রীলোককে প্রতীক ধরে নিয়ে তার সাথে ব্যভিচার করাই তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব।

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। মনুর মতে, তাকে দিন রাত্রি অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক।[২১১] কারণ নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

---

২০৭. অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭। সেকালে দেবতার প্রীতির জন্য অনেকে নিজের কুমারী মেয়েকে উৎসর্গ করতো দেবতার কাছে। এরা মন্দিরে থাকতো এবং এদের দেবদাসী বলা হতো। এদেরকে উত্তমরূপে নাচ গান শেখানো হতো এবং তারা দেবতার সামনে নৃত্যগীত পরিবেশন করতো। দেবদাসী যে হিন্দু মন্দিরেই থাকতো তা নয়, বৌদ্ধমন্দিরেও থাকতো। কালক্রমে দেবদাসীরা কদর্য গণিকাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিলো।

২০৮. সুলায়মান নদভী সায়্যিদ আল্লামা (রাঃ), **সীরাতুন্নবী,** (আজমগড়ঃ মাতমআ মাআরিফ), পৃঃ ২৩২; আবু যায়েদ সায়েরাফী, **সফর নামা,** পৃঃ ১১৫, ১১৮।

২০৯. ডঃ অতুল সুর বলেন, "প্রাচীনকালে গণিকাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। রাজবেশ্যা বলতে বুঝাতো রাজার দ্বারা অনুগৃহীতা গণিকা, নাগরী বলতে বুঝাতো নাগর বাসিনী গণিকা, গুপ্তবেশ্যা বলতে বুঝাতো সদ্বংশীয়া নারী যে গোপনে অভিসার করে। দেব বেশ্যা বলতে মন্দিরের দেবদাসীদের বুঝাতো এবং ব্রম্মবেশ্যা বা তীর্থগ বলতে বুঝাতো তীর্থস্থানে যারা গণিকাবৃত্তি করতো।" (অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইহিহাস,** প্রাগুক্ত. পৃঃ ১১১)।

২১০. দত্তক পাটলিপুত্র নগরের বারাঙ্গনাদের সম্পর্কে তার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দত্তক রচিত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সেই গ্রন্থের সারাংশ বাৎসায়ন তার 'কামসূত্র' গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ করেছিলেন। এই গণিকাবৃত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। তাই অর্থশাস্ত্রে বেতনভূক্ত গণিকাধ্যক্ষ নিয়োগের কথা আছে। এছাড়া বিন্দ্য পর্বতের অন্তর্গত রামগড়ের গুহায় প্রাপ্ত প্রকৃত ভাষায় রচিত প্রত্নতাত্ত্বিক একটি লেখনীতে 'সুতনুকা' নামে এক দেবদাসীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে দেবদাসীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই লেখনীটিই প্রথম নিদর্শন। কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে অসংখ্য দেবদাসী ছিল। হিউয়েন সাঙের সময়ে হিন্দু দেশের পূর্বে অবস্থিত একটি শহরের সূর্যমন্দিরে দেবদাসী ছিল। তবে এই সকল দেবদাসী সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী ছিল দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোতে। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ),** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩)।

২১১. Amer Ali, **The Spirit of Islam**, p: 30; Tamesh Chandra Mazumdar, **Ideal and Position of Indian Women in Domestic Life,** Great Women of India (ed.) Swamei and Mazumder, p: 19.

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত বর্ণনায় প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রকার বিবাহ পদ্ধতি এবং অবাধ ব্যভিচারের চিত্র স্পষ্ট পরিস্ফুটিত হয় যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় সম্প্রসারিত হয়েছে।

উচ্চবংশীয় নারী

ভারতীয় সভ্যতায় নারী সম্পর্কে অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ এবং তাদের সাথে মানবতা বিবর্জিত আচরণ করা হলেও সমাজের উচ্চ শ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের কাছ থেকে দূরে রাখা হত। রাজবংশের মহিলাদের আবাসস্থল কড়া পাহারায় রাখা হত। কোনভাবেই তাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চবংশের কোন নারী জীবিকার্জনে বাধ্য হলে এ কাজে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, সেজন্য অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা হত। বস্ত্রশিল্প কারখানায় তাকে যেতে হলে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে যেতে হত। যেন সহজে কোন লোকের চোখে না পড়ে। তার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করত তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হত। সে যদি মহিলার মুখমন্ডলের দিকে তাকাত বা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তার সাথে বলত, তবে তাকে জরিমানা দিতে হত।[২১২]

উপরোক্ত বর্ণনা হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল।

সতীদাহ প্রথা

হিন্দু সমাজে নারী জাতির প্রতি সুবিচার করা হত না। হিন্দু ধর্মে উপপত্নী রাখার বিধান প্রচলিত ছিল। একেকজন ব্যক্তি অসংখ্য উপপত্নী রাখত। সেইসব উপপত্নীরা পুরুষের চিত্তাকর্ষণের জন্য নগ্নবক্ষ্যে নৃত্য করত। হিন্দু ধর্মে পুত্র না হলে 'পুৎ' নামক নরক থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। এইজন্য অপুত্রক রাজারা পুত্র লাভের আশায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। হিন্দু ধর্মে আছে "স্ত্রী প্রমোদে মত্ত, পানাসক্ত বা রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা না করলে স্বামী তাকে বস্ত্রালংকারে বঞ্চিতা করে তিন মাসের জন্য তার সাহচর্য ত্যাগ করবে। স্ত্রী যার অলুক্ষণে সেই অকালে মারা যায়। তাই বিধবাদের শাস্তি স্বরূপ স্ত্রীকে স্বামীর সাথে সহমরণে যেতে হতো এবং পুনর্বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলে বিবেচিত ছিল।"[২১৩]

যে সমস্ত বিধি দিয়ে কয়েক হাজার বছর ধরে হিন্দু নারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার অধিকাংশই প্রথাগত। ঐ সমাজে ঋষির পর ঋষি জন্ম নিয়েছে। ব্রহ্মার সাথে আলাপ করে এসে তারা এই বিধান লিখেছে এবং সবাই মিলে নারীকে করে তুলেছে পুরুষের ব্যবহারিক পণ্য। মনুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। বরং স্বামীর সাথে তাকেও আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। এই প্রথাকে হিন্দু ধর্মে সত্যা বা সতিদাহ প্রথা বলা হয়।[২১৪]

সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। পন্ডিত নামে পরিচিত এক শ্রেণীর গোড়া লোক তখন হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। তারা বিধবার জীবনকে অস্বীকার করে নানারকম বাধা নিষেধের বেড়াজালে নারী জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বামী মৃত্যুবরণ করলে হিন্দু নারীকে স্বামীর সাথে জলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। যীশু খৃষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই একটি দুটি করে হিন্দু বিধবা সহমরণে ও অনুমরণে গেছে। কোন নারী সহমরণে যেতে অস্বীকার করলে সমাজপতিরা তাকে জোর করে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করত এবং এই ভয়াবহ নৃশংস কাজটি ধর্মের নামে সম্পন্ন করা হত। কোন বিধবা সহমরণে না গিয়ে কোনভাবে বেঁচে গেলে তার সাথে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংস আচরণ করা হত যার ফলে উক্ত বিধবা বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করত। আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে সতীদাহ প্রথা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঋষিরা বিধবার জীবনকে অস্বীকার করে তাকে চরম

---

[২১২]. A. L. Bashan, **The Wonder That was India,** Fontana, 1971, p: 181.

[২১৩]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের,** প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০-৫১।

[২১৪]. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

অপমান করেছে। অঙ্গিরা বলেছেন, বিধবার ধর্ম হচ্ছে সহমরণ; হারীত বলেছেন, "সহমরণ বরণ করে স্ত্রী স্বামীকে চরম পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারে।"[২১৫] স্বামী মারাগেলে যে স্ত্রী স্বামীর জলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী। যে বশিষ্টের পত্নী, তার সমান হয়ে স্বর্গে যায় এবং আর সাড়ে তিন কোটি বৎসর সেখানে বাস করে। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর ভদ্রতার সাথে পরলোক গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে। পতি যদি ব্রম্ম হত্যা করে কিংবা কৃতঘ্ন হয় কিংবা মিত্র হত্যা করে তথাপি স্ত্রী ঐ পতিকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করে এটা অঙ্গিরা মুনি বলেছেন।"[২১৬]

ঋষি ও মুনিদের এরূপ বক্তব্যের ফলে নারীরা অবলীলায় স্বামীর সাথে সহমরণে যেত। বিধবাকে সতী নাম দিয়ে দাহ করার ব্যবস্থা করেছে হিন্দু রাজপরিবারের বিধি। রাজা মৃত্যুবরণ করলে রানীরা এমনকি রাজার উপপত্নীরা দলে দলে রাজার চিতায় উঠে সতী হয়ে যেত। উত্তর ভারতের রাজপুতদের মধ্যে সতীদাহের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল মড়করূপে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মাড়ওয়ারের রাজা অজিত সিংহের চিতায় উঠেছিল ৬৪ জন সতী; পানিতে ডুবে বুন্দির রাজা বুধ সিং মারা গেলে তার চিতায় ওঠে ৮৪ জন সতী; ১৬২০ অব্দে এক রাজপুত মারা গেলে তার চিতায় উঠেছিল ৭০০ সতী।[২১৭]

সতীদাহ সম্পর্কে ঐতিহাসিক Strabo বলেছেন, "ভারতে মৃত স্বামীর সাথে জীবন্ত স্ত্রীকে দাহ করা হয়। যেসব নারী তাতে অস্বীকৃত হয় সমাজে সে ঘৃণার পাত্রী।" ঐতিহাসিক Diodorus Siculus বলেছেন, "ভারতে বিধবাগণকে স্বামীর মৃতদেহের সাথে দাহ করা হয়। কিন্তু যার শিশু সন্তান আছে বা যারা গর্ভবতী, তাদেরকে দাহ করা হয় না। এই দুটি কারণ ব্যতিরেকে যারা সহমরণে যেতে অস্বীকার করে, তাদেরকে আজীবন বিধবা থাকতে হয় এবং যাগ যজ্ঞাদির কাজে তারা যোগদান করতে পারে না।" বানভট্ট এর হর্ষচরিতে দেখতে পাওয়া যায়, "রাজা হর্ষের মৃতদেহের সাথে তার জীবন্ত স্ত্রীকেও দাহ করা হয়েছে।" ইতালীয় পরিব্রাজক Nicolo-de-Conte পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখেছেন, বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃতদেহের সাথে তার দুই সহস্র স্ত্রীকেও দাহ করা হয়েছে।"[২১৮]

হিন্দু ধর্মে নারীর যেমন কোন ধর্ম, কর্ম ও শাস্ত্রাধিকার ছিল না তেমনি তার ব্যভিচারী পাপেরও কোন প্রতিকার ছিল না। পুরুষ যত বড় বীভৎস ব্যভিচারেই লিপ্ত হোক না কেন ব্রাম্মণ ভোজনে তার প্রায়শ্চিত্ত

---

[২১৫]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪-৫৫।
[২১৬]. রাজা রামমোহন রায়, **সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ**, ১৮১৮, পৃঃ ৩-৪।
[২১৭]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪। বৃটিশ ঐতিহাসিক জেমস টেলর তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কোম্পানী আমলে ঢাকা" গ্রন্থে লিখেছেন, "১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ঢাকা জেলায় একশত পঁচানব্বইজন বিধবা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীদের চিতায় আরোহণ করে। বয়সভেদে এই সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

বয়স	সংখ্যা
২০ বছরের কম বয়স্ক ছিল	১০ জন
২১ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক ছিল	৪৩ জন
৩১ থেকে ৪০ বছর বয়স্ক ছিল	৪৯ জন
৪১ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক ছিল	৪৬ জন
৫১ থেকে ৬০ বছর বয়স্ক ছিল	৩৪ জন
৬১ থেকে ৭০ বছল বয়স্ক ছিল	১২ জন

এদের মধ্যে ২৮ জনের কোন সন্তানাদি ছিল না, ২৪ জনের সন্তান ছিল কিন্তু তারা কেউ শিশু ছিল না,"[২১৭] তৎকালীন সমাজে সতীদাহ ছিল হিন্দু সমাজের জন্য স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখের বিষয়। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত ১৪ বৎসরে মোট ৮১৩৫ জন বাঙ্গালী নারী স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সতী হয়। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫)। উল্লেখ্য যে, সতীদাহ প্রথার সময় জোর করে ভাং, ধুতরা পাতার রস বা ঐ রকম কোন নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে আগুনে ফেলে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা হত এবং খুব বেশী ধুপের ধোঁয়া তৈরী করা হত যাতে অন্য লোকে দেখতে না পায়। মৃত্যুর ভয়াবহ করুন আর্তনাদ ঢাকবার জন্য রাজ্যের ঢাক ঢোল কাশি ও শাখ সজোরে বাজান হতো, যাতে কেউ যেন তার চিৎকার কান্না বা অনুনয় বিনয় শুনতে না পায়। (শরৎ রচনাবলী, **নারীর মূল্য**, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৭১-৫৭২; কনক মুখোপাধ্যায়, **উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর**, তা. বি. পৃঃ ৯)।
[২১৮]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যায়। অথচ নারী বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে পতিতালয় ভিন্ন তার আর কোন স্থান নেই। হিন্দু ধর্মের সকল স্তরে নারীদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। পিতামাতার সম্পত্তি হতেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ

হিন্দু সমাজের নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন সুযোগ বা অধিকার ছিল না। ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি বা এরূপ কোন অপরাধের কারণে, এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান যেত না। এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের কোন বিধান হিন্দু ধর্মে ছিল না। এমনকি বাল্য বিধবাদের জন্যও পুন:বিবাহের অনুমতি ছিল না। যার ফলে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেত এবং পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধি ও সামাজিক অনাচার সৃষ্টি হত। পূর্বের যুগে অনেক হিন্দু মহিলার স্বামী মারা গেলে সাথে সাথে ঐ মহিলা আত্মহত্যা করে এরূপ অবস্থা হতে মুক্তিলাভ করত।[২১৯]

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিবাহভঙ্গ ও বিবাহ বিচ্ছেদ দুইটি আলাদা বিষয় ছিল। বিবাহ ভঙ্গ সংক্রান্ত বিধির ক্ষেত্রে বর্ণের প্রাধান্য ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে বরবধূর বর্ণ এক হওয়া আবশ্যক ছিল। কোন কারণে স্বামী জাতিচ্যুত হলে শুধু সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর তাকে ত্যাগ করে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার অধিকার ছিল।[২২০] এছাড়া কোন অবস্থাতেই নারীর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন অনুমতি ছিল না। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে একতরফা ভাবে পুরুষই শুধু বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাত। তবে এই অধিকার সকল বর্ণের জন্য স্বীকৃত ছিল না। প্রথম চারটি স্বীকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে কৌটিল্য বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেননি।[২২১]
নিম্নবর্ণের মধ্যে যেহেতু অস্বীকৃত বিবাহ প্রচলিত ছিল সেইজন্য বিবাহ বিচ্ছেদ তাদের ক্ষেত্রে অনুমতি পেত। তবে সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হত। ব্যভিচার, বন্ধ্যাত্ব, অবাধ্যতা, বাচালতা প্রভৃতি অভিযোগে পতি পত্নীকে ত্যাগ করতে পারত। তবে এই অধিকার শুধু স্বামীর জন্যই সংরক্ষিত ছিল এবং এক্ষেত্রে স্ত্রীরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।[২২২]

হিন্দুধর্মে তালাক প্রদানের কোন বিধান নেই।[২২৩] হিন্দু ধর্মে নারীর স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও নিজ ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার ছিল না। বাবা মেয়েকে যার সাথে বিয়ে দেবে সেখানেই আজীবন থাকতে হবে এবং

---

২১৯. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, **মহানবী (স) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা**, (ঢাকা: ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫), পৃ: ৬৪; আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, **ইসলাম আওর আওরাত**, (লাহোর: ইদারায়ে ইসলামিয়া, তা. বি.), পৃ: ২১; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭; আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

২২০. **নারদ**, অধ্যায়-২১, পৃ: ৯৭; **তুলনীয়**, অধ্যায়-১২, পৃ: ৩।

২২১. **অর্থশাস্ত্র**, অধ্যায়-৩, পৃ: ৪। স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কৌটিল্য ও ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতাগণ স্ত্রীর জন্য বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করেছেন। যার মধ্যে পুনর্বিবাহ ও নিয়োগপ্রথা ও অন্তর্ভুক্ত। কৌটিল্যের নির্দেশ অনুসারে, স্বামী দেশান্তরে গিয়ে প্রতিশ্রুতি মত প্রত্যাবর্তন না করলে নি:সন্তান ব্রাম্মণ পত্নী চার বছর, ক্ষত্রিয় তিন বছর, বৈশ্য দুইবছর ও শুদ্র একবছর অপেক্ষা করবে। আর যদি সন্তান থাকে অথবা স্ত্রীর জীবিকা অর্জনের উপায় বা ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে প্রতীক্ষার সময় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে প্রতীক্ষার সময়ের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।" (**অর্থশাস্ত্র**, অধ্যায়-৩, পৃ: ৫৪)।
বশিষ্টের মতে, "সন্তানসহ ব্রাম্মণ ও ক্ষত্রিয় পত্নীর নিরুদ্দিষ্ট পতির জন্য পাঁচ বছর, বৈশ্য পত্নীর চার বছর ও শুদ্র পত্নীর তিন বছর প্রতীক্ষা করা উচিত। নি:সন্তান পত্নীর ক্ষেত্রের এই সময়কাল এক বছর হ্রাস পাবে। প্রতীক্ষাকাল সমাপ্ত হলে, বশিষ্ঠের নির্দেশ অনুসারে, পত্নী তার পতির শরিক অথবা তার সঙ্গে জন্ম, পিন্ড, তর্পণ ও বংশসুত্রে যুক্ত এমন পুরুষের সঙ্গে বাস করবে। এই সব পুরুষকে ওপরে বর্ণিত ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আরও বলা হয়েছে, পতির পরিবারের একজন সদস্যও জীবিত থাকলে পত্নী কখনও কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কাছে যাবে না। (**বশিষ্ঠ**, অধ্যায়-১৭, পৃ: ৭৮-৭৯)।
বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে দুরদেশে গমনকারী ব্রাম্মণের পত্নীর জন্য শাস্ত্রকারগণ অনেক বিশেষ বিধি প্রণয়ন করেছেন। গৌতমের মতে এক্ষেত্রে ব্রাম্মণ পত্নী বারো বছর অপর পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে না। (**গৌতম**, অধ্যায়-১৮, পৃ: ১৮)। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য নি:সন্তান ব্রাম্মণ পত্নীর জন্য দশ বছর ও সন্তানসহ পত্নীর জন্য বারো বছর ধার্য করেন। (**অর্থ শাস্ত্র**, অধ্যায়-৩, পৃ: ৪)। মনুর বিধি এক্ষেত্রে অনেক উদার ছিল। অনুপস্থিত পতির জন্য পত্নীর প্রতিক্ষাকাল তিনি ছয় বছর নির্ধারণ করেন। (**মনু**, অধ্যায়-৯, পৃ: ৭৬)।

২২২. রামশরণ শর্মা, **প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০-৭১।

২২৩. নারীর তো কথাই নেই, পুরুষও তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। অথচ এতে নারীর ক্ষতি ছাড়া উপকার খুব কমই হয়েছে। কারণ কোন মেয়ে পুরুষের ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু এই ভাল না লাগার পরও ঐ পুরুষটিকে ঐ মেয়েলোক

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর মৃত্যুর পরও স্বাধীনভাবে চলাফেরা বা দ্বিতীয় বিবাহ করার কোন অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের মাধ্যমে বিধবা নারীরা দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি পায় কিন্তু সমাজে বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। নারী সম্পর্কে হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে, শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, পাপলীপ্সা, আত্মগর্ব, রাগ, একগুঁয়েমি ও বিরক্তিকরণ নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গর্হিত কাজ করা তাদের অভ্যাস। মিথ্যা বলা তাদের স্বভাবজাত কাজ। নারীর সঙ্গে পরামর্শ করতে নেই, এমনকি পরামর্শের সময় নারীকে কাছেও রাখতে নেই। পুরুষরা বদকারীর ফলস্বরূপ পরজন্মে নারীত্ব লাভ করে।[২২৪]

একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, যদি কোন শতবর্ষী হাজার রসনা বিশিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল নারীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে থাকে তবুও সে তা বলে শেষ করতে পারবে না। মনু বলেন, ধনের ওপর নারী ও চাকরের কোন অধিকার নেই। ঋণে ডুবন্ত ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্য হিসেবে পরজন্মে নারী বা পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে।[২২৫] তুলসী রামায়ণেও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় বলা হয়েছে যে, নারী জাতির অন্তরে সবসময় ৮টি দোষ বিদ্যমান থাকে। যেমন, ঔদ্ধত্য, মিথ্যা, চালাকি, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা, দয়াহীনতা। স্ত্রী ও শুদ্রকে লেখাপড়া শিক্ষা দিও না। বিয়ে ছাড়া অন্য সময় নারী সাজসজ্জাও করতে পারবে না। হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা এসকল ঘৃণা ও জুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দু:খ প্রকাশ করেছে।[২২৬]

তবে আজও কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুয়াণী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু নারীদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে। পুরুষ যত বড়ো দুষ্কৃতিকারী বা খারাপ লোকই হোক না কেন, সে স্ত্রীর মোক্ষদাতা। সে বিরাট পাপ করেও অপবিত্র হয় না, অথচ নারীর সাধারণ ভুল বা অপরাধও ক্ষমার উপযুক্ত নয়। দিবারাত্রি স্বামীর সেবা করাই তার কর্তব্য। পরামর্শ স্থলে নারীর কোন স্থান নেই। নারী স্বামীর আমোদফুর্তির উপকরণ মাত্র। স্বামীর সাথে সমতার দাবি করা, স্বামীর সমস্থানে বসা বা স্বামীর কাজে হাত দেয়ার অধিকার হিন্দু নারীর ছিল না। বর্তমান হিন্দু নারী সমাজে যুগের প্রভাবে জাগরণ ও আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হওয়ায় সংবিধানের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনে কিছু রদবদল করা হয়েছে।[২২৭]

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন

হিন্দু ধর্ম ও সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সবচেয়ে বেশী অধিকার বঞ্চিত হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকারের এক করুন অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। যথা: ১. দায়ভাগ পদ্ধতি[২২৮] ও ২. মিতাক্ষরা পদ্ধতি[২২৯]

নিয়েই ঘর করতে হবে। সম্পর্ক ভালো হোক বা না হোক, স্ত্রী হিসেবে সেখানে থাকতেই হবে। ছাড়াছাড়ির কোন ব্যবস্থাই সেখানে নেই। এতে করে পুরুষটি স্ত্রীলোকটিকে বহুভাবে কষ্ট দেবার সুযোগ পায় এবং নারীকে যুগ যুগ ধরে এই নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর জীবন ভালই কেটে যাবে, কিন্তু স্বামী যদি অসৎ হয়, তাহলে তার জুলুম ও নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেয়ার কোন পথ হিন্দু ধর্মে নেই, এমনকি পুরুষকেও বলে দেয়া হয়নি যে, স্ত্রীর সাথে অসদ্ব্যবহার করা পাপ, বরং বলা হয়েছে, নারী দিন-রাত্রির কোন সময় স্বাধীন থাকতে পারে না। (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯)।

[২২৪]. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০।

[২২৫]. মনুস্মৃতি লেখক, মহারাজ মনু তদীয় গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে নারীকে দাস সম্প্রদায়ভুক্ত করে নারীর সংগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

[২২৬]. সমাজে নারীর স্থান শীর্ষক প্রবন্ধ, আর্য গেজেট-১৯৩০ সাল ২২ নভেম্বর, ভারত।

[২২৭]. সমাজে নারীর স্থান, শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত।

[২২৮]. এ আইন জীমুতবাহন কর্তৃক রচিত। এটি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের একটি আইন। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকার হবার জন্য পিন্ডদান শর্ত। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান মতে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এই শর্তে উত্তরাধিকার লাভ করবে যে, সে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে তার আত্মিক কল্যাণ কামনা করবে এবং মৃত ব্যক্তির শাস্ত্রে যারা শাস্ত্র মতে পিন্ড দানের অধিকারী তারাই কেবল ঐ ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১. দায়ভাগ পদ্ধতি: দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা: সপিন্ড, সাকুল্য, সমানোদক। সপিন্ডগণের তালিকা: ক) পুত্র এবং তার অধ:স্তন তিন পুরুষ। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। কন্যার তরফ থেকে অধ:স্তন তিন পুরুষ। কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র। খ) পিতার তরফ থেকে উর্ধ্বতন তিন পুরুষ। যথা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতার তরফের তিন পুরষ। যথা: মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা, মাতার পিতার পিতার পিতা। গ) ভ্রাতা এবং ভ্রাতার অধ:স্তন পুরুষ এবং খুড়া ও তার অধ:স্তন পুরুষ। ঘ) মহিলা। যথা: বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার পিতার মাতা।[২৩০]

২. **মিতাক্ষরা পদ্ধতি:** মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটমত সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা: (ক) গোত্রজ সপিন্ড, (খ) সমানোদক ও (গ) বন্ধু।

গোত্রজ সপিন্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭। গোত্রজ সপিন্ডের কেউ জীবিত থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে না। গোত্রজ সপিন্ডের তালিকা নিম্নরূপ:

ক) পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধস্তন পুরুষ	- ০৬ জন।
খ) পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধ্বতন পুরুষ	- ০৬ জন।
গ) উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের পত্নীগণ	- ০৬ জন।
ঘ) উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশ ধারায় ৬টি অধ:স্তন পুরুষ	- ৩৬ জন।
ঙ) বিধবা, কন্যা ও কন্যার পুত্র	- ০৩ জন।
মোট:	৫৭ জন।[২৩১]

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হতে পারে না, মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত ৬ জনের কেউ জীবিত না থাকলে কন্যা উত্তরাধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পায় তা কেবল জীবন স্বত্বে লাভ করে। অর্থাৎ কন্যা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কেবল মাত্র ভোগ দখল করবে। উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্য অংশ কন্যা নিজের ইচ্ছামত ভোগ, ব্যবহার, দান, বিক্রয়, উইল কিংবা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং নিকটাত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। কন্যা বা স্ত্রী যদি অসতী হয় তাহলে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির, কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হলে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। হিন্দু আইনে সকল কন্যার সমান অধিকার নেই। বন্ধা কিংবা যে কন্যা কেবল মাত্র কন্যা সন্তানের মা হয়েছে সে মৃত পিতার সম্পত্তিতে কোন অংশ পাবে না। হিন্দু আইনে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। অত:পর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যার দাবি। হিন্দু আইনে কন্যা জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকারী হয় না।[২৩২] এবং বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হতে যে অংশ পায় তা কেবল মাত্র জীবনস্বত্বে লাভ করে থাকে।[২৩৩]

---

[২২৯]. মিতাক্ষরা পদ্ধতি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রধান দুইটি আইনের একটি। মিতাক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকার ঋষি, যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত নিবন্ধ। এ পদ্ধতি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

[২৩০]. মাওলানা ফজলুর রাহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,** (ঢাকা: আর. আই এস, পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৫, খ্রি:) পৃ: ১১৫-১১৬।

[২৩১]. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,** প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

[২৩২]. ১৯৩৭ সালে বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাস হবার পর (১৮ নং আইন) বর্তমানে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র প্র পৌত্রের সাথে বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতে পারে। এর আগে বিধবা স্ত্রীর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এ আইনটি ১৪/০৪/১৯৩৭ ইং থেকে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষিজমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ধর্মেই হোক, যতদিন পর্যন্ত নারী জতিকে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নিমজ্জিত করা হবে এবং তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত না হবে, অন্ধ অনুকরণ কুসংস্কারে নিমজ্জিত করা হবে, নারীর কোন স্বাধীনতা ও স্বাধীকার এবং তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত না হবে ততদিন পর্যন্ত নারীকে পাপের প্রতিমুর্তি ও ক্ষতিকর জীব বলেই বিবেচনা করা হবে এবং নারীর মুক্তি ও শান্তিপথ অজ্ঞাতই থাকবে। যতদিন এই কুসংস্কারমুলক শিক্ষা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন হিন্দু নারীর মর্যাদা উচু হওয়ার কোন আশাই করা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে হিন্দু নারীদের যে স্বাধীন চলাফেরা ও স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাদের ধর্মমতে বৈধ নয়।[২৩৪]

হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম[২৩৫] বহু পুরাতন ধর্ম। বহুকাল থেকেই লক্ষ কোটি মানুষ এই ধর্মের অনুসরণ করছে। মানব রচিত পরিবর্তনশীল হিন্দু ধর্ম প্রাচীনত্বে ও খ্যাতিতে প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে এই ধর্মের রচয়িতাগণ কখনো মনোযোগ দেয়নি। তাইতো সতীদাহের মত নির্মম অমানুষিক বিধান হিন্দু ধর্মেরই দান। পুরুষ একই সময়ে একাধিক বিয়ে অথবা স্ত্রী বিয়োগের পর আবার বিয়ের অনুমতি লাভ করত, কিন্তু নারী স্বামী বিয়োগের পর আরেক বিয়ে তো দুরের কথা, তার বেঁচে থাকাই পাপ ছিল। এবং স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ না হলে, মৃত স্বামীর সঙ্গে ছটফট করে পুড়ে মরতে না পারলে সে স্বর্গ লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত এমন বিধানই প্রচলিত ছিল। যদি কোন নারী কোন প্রকারে এই সতীদাহ থেকে বেঁচে যেত, তবে ঘরে, সমাজে কিংবা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুর কাছে তার কোন সম্মানই থাকত না। তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার কষাঘাতে এমনভাবে বিদ্ধ করা হত যে, তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াটাই তার কাছে শ্রেয় বলে বিবেচিত হত।[২৩৬] সনাতন ধর্মে পুরুষদের জন্য একই সময়ে দশটি সতী রাখার অনুমতি ছিল। হিন্দুদের খ্যাতনামা মনীষী ও ধর্মীয় প্রধানদের মধ্যে এর বহু নযীর পাওয়া যায়।[২৩৭]

পরিশেষে বলা যায়, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে হিন্দু সমাজ ও ধর্মে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার সাধিত হয়েছে। আধুনিক হিন্দু সমাজে নারী প্রাচীন হিন্দু নারীদের চেয়ে সুবিধাজনক পর্যায়ে রয়েছে। তারপরও নারী বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পায়নি। আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা হলেও নারী হত্যা বন্ধ হয়নি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই ছেলে না মেয়ে হবে তা জানা যায়। তাই এ আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যখন নিশ্চিত হয় যে গর্ভে কন্যাশিশুর অস্তিত্ব রয়েছে তখন তারা ভুমিষ্ঠ না হওয়া শিশুটিকে পৃথিবীর আলো দেখতে না দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরই ফলে শিশুটি আর পৃথিবীর আলো দেখতে পায় না। অর্থাৎ কন্যাশিশুটিকে পরিপূর্ণ জীবন লাভের পূর্বেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। আধুনিক ভারতে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে সন্তানের লিঙ্গ নিশ্চিত হয়ে গর্ভপাতের হার এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে সরকার আইন করে গর্ভবতী নারীর আল্ট্রাসনোগ্রাফি নিষিদ্ধ করেছে। তারপরও গোপনে এ কাজ অব্যাহত রয়েছে।

পর স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সে পুর্বের মৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে। এবং ধরে নেয়া হবে যে, সেই হিন্দু মহিলা তার মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে আর বেঁচে নেই বরং তার মৃত্যু হয়েছে।

[২৩৩]. ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

[২৩৪]. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত,পৃ: ২১।

[২৩৫]. হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কে বা কারা এবং হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি কখন হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য ইতিহাস বা হিন্দুশাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত সঠিক কোন তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হননি। হিন্দু শব্দটি হিন্দু শাস্ত্রের উল্লেখ নেই। ইতিহাস থেকে যতদুর জানা যায়, প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া মহাদেশ হতে একদল লোক ভারতবর্ষে এসে পাঞ্জাব ও সিন্দু প্রদেশের সিন্ধু নদের উপকুলে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদেরকে আর্যজাতি বলে পরিচয় দেয়। সিন্ধু নদকে আর্যরা পবিত্র নদ বলে মনে করত। সিন্ধু শব্দ থেকেই সিন্ধু নদের উপকুল বাসীরা হিন্দু নামে পরিচিত।

[২৩৬]. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯।

[২৩৭]. রাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচজন, পান্ডুর দুইজন ও অর্জুনের তিনজন স্ত্রী ছিল। (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

পৃথিবীতে অহিংস ধর্ম বলে পরিচিত বৌদ্ধ ধর্মের অনেকগুলি Form বা রূপ রয়েছে। তবে এদের কিছু কিছু Form এ দেবতার কোন অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধ ধর্মের "Three Jewels" বা ত্রিরত্ন বলে পরিচিত হচ্ছে বুদ্ধ, ধর্ম (তার মতবাদ) এবং সংঘ (ভিক্ষু সমাজ)।[২৩৮] বৌদ্ধদের প্রতিটি তীর্থস্থানে এই ত্রিরত্নকে তিনবার ডাকা হয়, যেমন, "আশ্রয়ের জন্য আমি বুদ্ধের কাছে যাই, আশ্রয়ের জন্য আমি ধর্মের কাছে যাই, আশ্রয়ের জন্য আমি সংঘের কাছে যাই।"[২৩৯]

বৌদ্ধধর্মের দুটি সুস্পষ্ট ধারা আছে। যেমন, 'তোরাভাদা'[২৪০] ও 'মহায়ানা'[২৪১]। এদের উৎস একই সুত্র থেকে। কখনো কখনো তোরাভাদাকে বলা হয় "Little Vehicle" বা ছোট বাহন এবং মহায়ানাকে বলা হয় "Great Vehicle" বা বড় বাহন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মতবাদকে একটি ভেলা বা জাহাজ জাতীয় যানবাহন হিসেবেই গণ্য করা হয়। এই যানবাহনই মানুষকে পৃথিবী নামক কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়ে শান্তি ও মুক্তির জগতে পৌঁছে দিবে। এই শান্তি ও মুক্তির বাণী জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে যিনি রাজসিংহাসনকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন তিনি হলেন দয়া ও সাম্যের মুর্ত প্রতীক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতম।[২৪২]

---

[২৩৮]. মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, (ঢাকাঃ আলীগড় লাইব্রেরী, অক্টোবর ১৯৯৪), পৃঃ ১৭।

[২৩৯]. মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

[২৪০]. তোরাভাদা হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীতম রূপ। এই ধারার শিক্ষা এমন কিছু মতবাদের উপর নির্ভরশীল, যা গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অনুমোদিত হয়েছিল এবং যা কেবল ভিক্ষুদের মুক্তির সন্ধান দেয়। বর্তমানে এই মতের অনুসারী শ্রীলংকা, বার্মা (বর্তমান মায়ানমার), থাইল্যান্ড, লাওস এবং কাম্পুচিয়ার মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বেশী। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮)।

[২৪১]. মহায়ানা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের দ্বিতীয় পর্যায়ের চিন্তাধারা। এটির সূচনা হয় খ্রিষ্টীয় যুগের সূচনার সঙ্গে এবং এর শিক্ষা সকলের মুক্তির পথ খুলে দেয়। অধিকাংশ বৌদ্ধই মহায়ানা ধারার অনুসারী এবং এদের বসবাস হচ্ছে উত্তরাঞ্চলীয় দেশ নেপাল, তিব্বত, ভিয়েতনাম, চীন, কোরিয়া এবং জাপানে। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭)।

[২৪২]. গৌতম (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ থেকে ৪৮৩ অব্দ পর্যন্ত) ছিলেন সাক্য বংশীয় একজন ধনাঢ্য নেতার সন্তান। বর্তমান নেপালে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে ছোট্ট এক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যাবস্থায় তার বাবা সবসময় তাকে পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট থেকে দুরে রাখতে চেষ্টা করেন। তিনি মনোরম প্রাসাদে বাস করেন এবং রাজকীয় বিদ্যাশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। একজন সুন্দরী রাজকন্যার সাথে তার বিয়ে হয় এবং তার গর্ভেই একজন পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রের শিশু অবস্থাতেই গৌতম দুঃখ-কষ্টের সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। বাবার বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করেই তিনি অবশেষে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। বাইরে বেরিয়ে তিনি একের পর এক দেখতে পেলেন, বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে উপনীত একজন বৃদ্ধকে, রোগাক্রান্ত একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে, শ্মশানের দিকে নিয়ে যাওয়া একটা মৃতদেহ এবং পরিশেষে দেখা হল তার এমন একজন মাথা-কামানো ঘুরে বেড়ানো ধর্মীয় ভিক্ষুকের সঙ্গে যার পরণে সাদামাটা একটা হলুদ পোশাক থাকলেও মুখে ছিল শান্তি ও আনন্দের ছায়া।

এরপর গৌতমের জীবনে আসে আত্ম স্বীকৃতির পালা। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করে একজন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবেন। দীর্ঘ ছয় বছর তিনি পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করলেন। শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়ে তিনি অস্থি-চর্মসার হয়ে পড়লেন কিন্তু গন্তব্যে পৌছা তার হলো না। তখন তিনি সঙ্গীদের পরিত্যাগ করে একা একা ধ্যান করার জন্য গয়া নদীর তীরে একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে গিয়ে বসলেন। এখানেই তিনি তার অজ্ঞতামুক্তি লাভ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, দুঃখ-কষ্ট এবং এর পেছনের কামনা-বাসনাই হচ্ছে মানুষের অসুবিধার মূল কারণ। উপরন্তু, চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও কঠোর সংযমশীলতার মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করে কামনা-বাসনা রোধ করা যায়। এরপর গৌতম যান বেনারসের হরিণ পার্কে। সেখানে তিনি তার পূর্বের পাঁচজন সঙ্গীর মধ্যে প্রচার করেন তার প্রথম "sermon" বা ধর্মোপদেশ। এভাবেই ধর্মের চাকাকে তিনি গতিশীল করলেন। ঐ পাঁচজন সঙ্গীই হলেন তার প্রথম শিষ্য এবং কয়েকদিন পরেই তার আরও ৬০ জন শিষ্য জুটে গেল। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিক্ষুসমাজ। বছরের আট মাস তারা ধর্ম প্রচারের কাজে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং বর্ষাকালের বাকী চার মাস তারা অশিক্ষিত ধনবান অনুসারীদের দেয়া বাঁশের তৈরী কুড়েঘরে বাস করতেন। বড় বড় পার্কে অবস্থিত এইসব কুড়ে ঘরেই পরবর্তী সময়ের বিরাট আশ্রমগুলোর মূল ভিত্তি হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা হল 'দুঃখ বা যন্ত্রণা'। এখানে জীবন মানেই হচ্ছে দুঃখ বা যন্ত্রণা, জন্ম, ক্ষয়, মৃত্যু সবই দুঃখের এবং এগুলো সবই যন্ত্রণাময়। পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সবকিছুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে একটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল অহমের ধারণা অলীক কল্পনামাত্র।[২৪৩] বৌদ্ধ ধর্মমতে, হিন্দু ধর্মের মত ব্রাহ্মণ-শুদ্র, ধনী-দরিদ্র বা ছোট-বড়র কোন প্রভেদ ছিল না, বংশ ও জাতির ভেদাভেদ তিনি মানতেন না। গৌতম বুদ্ধ দয়া ও সহৃদয়তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। পশু-পক্ষির প্রতি নির্দয় ব্যবহার করা তাঁর নীতি বিরুদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মে পশু-পাখি মারা ও খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।[২৪৪]

দয়া ও সাম্যের প্রতীক এই গৌতম বুদ্ধও নারী জাতির জন্য কিছু করে যাননি বা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি নারী জাতির প্রতি দয়া প্রদর্শন না করে বরং তাদেরকে অবহেলা করেছেন। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" অন্যত্র তিনি বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা অনুরাগ রেখো না, তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে না, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ংকর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গী দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস হরণ করে নেয়; নারী একটি সশরীরি ছলনা মাত্র। নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা করো।" গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। নারীর সাথে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা জল্লাদের ছুরির নীচে মাথা পেতে দেয়া উত্তম।"[২৪৫]

বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য হলো নির্বাণ[২৪৬] লাভ করা। তাই বিয়ে ও এর সাথে সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্য-কলাপ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। আর নির্বাণ লাভের মূল লক্ষ্যই হলো সকল কামনা-বাসনার বিলোপ সাধন। তাই এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য্য নিতান্ত আবশ্যক।[২৪৭] তাই বৌদ্ধধর্ম অনুসারীদের মতে, "নারী হলো সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ।" তাই নারী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক (Westmark) বলেন, "Women are of all the Sares Which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world." "মানুষের জন্য যতগুলি প্রলোভন ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভুত হয়ে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।"[২৪৮]

গৌতম ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার শিষ্যরাই তার মৃতদেহ পোড়ান এবং আটটি বংশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে তার দেহাভস্ম ভাগ করে দেন। এই দেহাবশেষকে রক্ষণের জন্য প্রত্যেক গোষ্ঠীই একটি করে পবিত্র শিলাস্তুপ নির্মাণ করে। সাধারণ বৌদ্ধদের কাছে এই স্তুপগুলোই হয়ে যায় উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু এবং এগুলোকেই পরবর্তীতে প্যাগোডায় উন্নীত করা হয়। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০)।

[২৪৩]. মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

[২৪৪]. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

[২৪৫]. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২২।

[২৪৬]. বৌদ্ধ ধর্ম এক ধরণের আত্ম-চেষ্টার ধর্ম যাতে দেবতা বলে কিছু নেই তবে এই ধর্মে অহংয়ের ধারণা খুবই সুস্পষ্ট। অহং হলো আত্মা। আত্মা ৫টি উপাদানে গঠিত। যেমনঃ দেহ, অনুভুতি, বোধ শক্তি, আবেগ এবং সচেতনতা। এটি কোন স্থায়ী আত্মা নয়, যা মানুষের নতুন জীবনকে তার পূর্ববর্তী অস্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বরং এটি হচ্ছে কর্ম (কার্য কারণের নিয়ম বিধি) বা কাজ যা এক অস্তিত্বের লক্ষ্য বা গন্তব্য হচ্ছে একটি পরম সুখবস্থা বা 'নির্বাণ'। যা কেবলমাত্র তখনই পাওয়া সম্ভব যখন কামনা ও কর্মের অবসান ঘটে। নির্বাণ অর্থ ধ্বংস কিংবা শুণ্যতা নয় তবে এর কোন আকার নেই। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২)।

[২৪৭]. U. May Oung, **Buddhist Law**, Part 1, p : 2.

[২৪৮]. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, **The Position of Woman in Islam**, (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1982), p: 12-13.

Dhaka University Institutional Repository

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত পন্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বেটনী (Bettany) তাঁর World's Religion গ্রন্থে বলেন : "Unfathombly deep, like a fish's course in the water, is the character of woman, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie." "পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড় যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুস্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম।"[২৪৯]

গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষের মোক্ষলাভের অন্তরায়, তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নয়। এইজন্যেই গৌতমবুদ্ধ বিয়ে প্রথার বিরোধী থেকে লোকদের সংসার ত্যাগ ও সন্নাসব্রতের দিকে আহবান করেছিলেন।[২৫০]

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন ও মৌলিক মতবাদ হচ্ছে, বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ তিন প্রকার। যথা: নৈতিকতা, প্রজ্ঞা এবং ধ্যান। এগুলো অনুসরণ করতে হবে যুগ যুগ ধরে। প্রজ্ঞার মুল কথা হচ্ছে ৪টি মহান সত্যকে অনুধাবন করে সেগুলো পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া। নৈতিকতা ৫টি উপদেশ মেনে চলা, যেমন, যেকোন জীবকে কষ্ট দেওয়া, না দেওয়া কিছু গ্রহণ করা, যৌনাচার, মিথ্যাচার, মদ ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার। কারণ এগুলো মনকে কলুষিত করে তাই সাধারণ বৌদ্ধ ও ভিক্ষুরা সবসময় এগুলো থেকে নিবৃত থাকার অঙ্গীকার করে। আর ধ্যানের সারকথা হচ্ছে, মুক্তি, মন নিয়ন্ত্রণ এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অবসান।[২৫১]

বৌদ্ধধর্মে মনে করা হয় যে, নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীর নির্বাণের কোন পথ নেই। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও নারীর অধিকার অত্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে। বৌদ্ধরা কন্যার পদযুগল ধুলি স্পর্শে মলিন হয়ে যাবে বলে পদগ্রন্থি বেধে রাখতো। পিতা অবলীলায় কন্যা সন্তান বিক্রি করে দিত। বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের কোন সত্ত্বা ছিল না, হিন্দু ধর্মের ন্যায় তারাও নারীদেরকে 'অলুক্ষণে' মনে করতো। চীন বা জাপানী বৌদ্ধ সমাজে মন্দিরে নারীর প্রবেশাধিকার ছিলনা। তারা নারী ও সংসারের সান্নিধ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে। তবে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলেও বৌদ্ধরা ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। বৌদ্ধ সংঘ, মন্দিরের অধ্যক্ষ ও শ্রমণ ভিক্ষুদল দলে দলে দেবদাসী নিয়ে দিবারাত্র ইন্দ্রিয় চর্চায় মগ্ন থাকতেন। ভিক্ষার ছলে শ্রমণ শ্রমিণীরা লোকালয় থেকে অনতিদুরে গিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন।[২৫২]

---

[২৪৯]. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ৬-৭।
[২৫০]. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।
[২৫১]. মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১। এছাড়াও কিছু অশিক্ষিত বৌদ্ধ আরো একধাপ এগিয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে তারা মধ্যাহ্নের পর আহার, নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ, ফুলের মালা, প্রসাধনী ও ব্যক্তিগত সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতো।
[২৫২]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদী ধর্মে নারী

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগুলোর মধ্যে প্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম হলো 'ইহুদী ধর্ম'।[২৫৩] এই ধর্মে শুধুমাত্র কিছু আকিদা এবং তত্ত্ব পেশ করা হয়নি বরং পেশকৃত আকিদা ও তত্ত্বের ভিত্তিতে বাস্তব সমস্যাবলী সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরূপ একটি ধর্মে নারী সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই নীচুস্তরে। তাদের ধারণা ছিল পুরুষ সৎ স্বভাববিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল এবং নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও ভন্ড।[২৫৪] ইহুদী ধর্মমতে, নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। নারী হতেই সকল পাপের সূত্রপাত হয় এবং তার কারণেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য। নারী সকল দূর্নীতির উৎস। ইহুদী সমাজে[২৫৫] নারী পুরুষ হতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। এমনকি মর্যাদায় নারীকে চাকরদের চেয়েও নিম্নস্তরের বলে গণ্য করা হত।[২৫৬]

ইহুদী সমাজে পুরুষ ছিল সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তারা মনে করত, পুরুষ যত পাপই করুক চল্লিশ দিনের বেশী তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। এজন্য তারা নির্ভীকচিত্তে পাপ কাজ করত।[২৫৭]

ইহুদী ধর্মমতে, পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ:) জান্নাতে মহাসুখে জীবনযাপন করছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তার স্ত্রী হাওয়া (আ:) তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেছিল এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়ালো যা খেতে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছিলেন। এই কারণে তিনি আল্লাহর সব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তার ভাগ্যলিপিতে কায়ক্লেশের জীবন লিপিবদ্ধ হলো।[২৫৮]

---

[২৫৩]. মার্টল ল্যাংলী তার ধর্মের বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেন, ইহুদী ধর্ম হচ্ছে, ঈশ্বরের পছন্দনীয় একটি ধর্ম। এতদসত্ত্বেও ইতিহাসের অর্ধেক সময় ধরে তাদের কোন নিজস্ব মাতৃভুমি নেই। ইহুদী জাতির প্রতিষ্টাতা হচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম (আ:), হযরত ইসহাক (আ:) এবং হযরত ইয়াকুব (আ:)। বর্তমান ইসরাইলের সমান আয়তনের 'কেনান' বা 'ক্যানান' নামক 'প্রতিশ্রুত ভুমি'তে (পরবর্তীতে প্যালেষ্টাইন বলে অভিহিত) বসতি স্থাপনের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ:) আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে মেসোপটেমিয়া পার হয়ে আসেন। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ইয়াকুব (আ:) এর ১২ ছেলে মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা সেখানে দাসত্ব বরণ করেছিলেন। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দে হযরত ইয়াকুব (আ:) এর বংশধররা হযরত মুসা (আ:) এর নেতৃত্বে মিশরের বাইরে চলে যায়। একেই বলা হয় 'Exodus' বা বহির্গমন। পথিমধ্যে সিনাই পর্বতের চুড়ায় হযরত মুসা (আ:) এর সাথে ঈশ্বরের (এখন পরিচিত Yahweh বলে) একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে খোদা হযরত মুসা (আ:) কে দশটি বিধান দান করেন এবং তিনি সেগুলোকে পাথর ফলকে খোদাই করে উৎসর্গীকৃত একটি জীবের রক্ত দিয়ে তা সীল করে রাখেন। ইসরাঈলের এই ঈশ্বরই পরবর্তীতে ইতিহাসের ঈশ্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এটি কোন উপজাতীয় দেব নন বরং তার জগতের নিয়ন্ত্রণকারী সৃষ্টিকর্তা। সেইসময় থেকেই ইসরাঈলদের জাতীয় সত্ত্বা ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। হযরত মুসা (আ:) নিজে প্রতিশ্রুত ভুখন্ডে প্রবেশ করেননি। ইহুদী জাতির বসতি গড়ে তোলার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন তার উত্তরাধিকারী জশুয়া ও তাঁর বিচারক মন্ডলী। পর্যায়ক্রমে তার পরে আসে এক রাজার বংশধর। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন সোহেল, দাউদ এবং সোলায়মান পর্যায়ক্রম ইসরাইল শাসন করেন। (মার্টল ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪-৪৫)। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে ইহুদীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হলেও সৃষ্টিকর্তার পছন্দের জাতি হিসেবে তাদের সচেতনতার জন্যই তারা তাদের জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সত্ত্বা সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "স্মরণ করো, আমরা মুসাকে কিতাব 'ফুরকান' দান করেছি ---। (আল কুর'আন, সূরা আল বাকারা, আয়াত: ৫৩)। "এবং আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান আনো। এটা তোমাদের নিকট সত্যতা প্রমাণকারী।" (আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াত: ৪১)।

[২৫৪]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

[২৫৫]. দুই শতাব্দীর প্রতিপত্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য অগাষ্টাস সিজারের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশাল অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল। এ যুগেই ইহুদী রাজ্য 'জুডা' রোমান প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হয়। প্যালেষ্টাইনের উপর ইউরোপীয় আধিপত্য মহান আলেকজান্ডারের সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আলেকজান্ডার কর্তৃক নিকট প্রাচ্যে প্যালেষ্টাইন অধিকৃত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় টলেমি ও অন্যান্য রাজবংশের নিয়ন্ত্রণভুক্ত ছিল। মূলত ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যবিলনীয় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ইহুদীরা প্রকৃত অর্থে একটি সম্প্রদায় হিসেবে প্যালেষ্টাইনে নিজের সংগঠিত করে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। (এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা মধ্যযুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১)।

[২৫৬]. **Encyclopaedia of Britanica**, Vol.-V, p: 732.

[২৫৭]. নাসির উদ্দীন আবু সাঈদ কাযী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল বয়যাবী, **আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আস্‌সরুত তা'বীল**, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, ১৯৯৮), ১ম খন্ড, পৃ: ৭১।

[২৫৮]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

বাইবেল পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ:) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল ভক্ষণ করেছ? তখন আদম (আ:) বললেন তুমি আমার সঙ্গীনি করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়েছিল, তাই আমি খেয়েছি।"[২৫৯] এরপর আল্লাহ হাওয়াকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে ; এবং সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।"[২৬০]

ইহুদীদের মতে, হযরত হাওয়া (আঃ) হযরত আদম (আঃ) কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হল সন্তান প্রসবকালীন কষ্ট এবং তার উপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কেয়ামত পর্যন্ত নারীর উপর কর্তৃত্ব চালাবে। এই দর্শনের ফলশ্রুতিতে ইহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত বেশী। এই কর্তৃত্বের মাত্রা এত প্রবল ছিল যে, কোন নারী যদি যৌবনকালে আপন পিতৃগৃহে বাসকালীন সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে মানত করে অথবা কোন ব্রত বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে এবং তার পিতা যদি তার মানত বা ব্রতের কথা জানতে পারে ও নিষেধ করে যা দ্বারা সে নিজেকে বদ্ধ করেছে, তবে তার সেই মানত বা ব্রতবন্ধন স্থির থাকবে না বরং ভেঙ্গে যাবে। এরফলে তার পিতার নিষেধ কার্যকর হবে এবং সদাপ্রভু সেই স্ত্রীলোককে ক্ষমা করবে না। কারণ তার পিতা তাকে মানত বা ব্রত বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেয়নি। আর যদি সেই নারী কোন পুরুষের স্ত্রী হয় এবং স্বামীর অধীনে থাকা অবস্থায় মানত করে বা মুখ নিঃসৃত কোন বাক্য দ্বারা আপন প্রাণ আবদ্ধ করে, অতঃপর স্বামী যদি তা শুনতে পায় এবং শ্রবণের দিন তাকে কিছু না বলে তাহলে সেই মানত স্থির থাকবে। আর যদি নিষেধ করে তবে সেই মানত বা ব্রত স্থির থাকবে না বরং ভেঙ্গে যাবে। কারণ স্বামী তাকে ব্রত পালনে নিষেধ করেছে আর সদাপ্রভু সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করবেন না।[২৬১]

ইহুদী সমাজে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এতই বেশী ছিল যে, অবিবাহিত কন্যা পিতার অনুমতি ব্যতীত কোন মানত বা ব্রত বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না বা পালনও করতে পারত না। স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও দিব্য তার স্বামী ইচ্ছা করলে রাখতে পারত আবার ব্যর্থ করে দিতে পারত। ইহুদী ধর্মে বলা হয়েছে, "পুরুষ ও স্ত্রীর সকল বিষয়ে এবং যৌবনে পিতার গৃহে অবস্থানকালে কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করলেন কন্যার প্রতি কর্তৃত্বের।"[২৬২]

ইহুদী ধর্মে ও সমাজে নারীরা শুধু ব্রত পালন করার অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিল না, তাদের সামাজিক কোন মর্যাদাই ছিল না। তারা পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হত। ইহুদী আইন অনুসারে, পুরুষ উত্তরাধিকারী বা ভাই বর্তমান থাকলে নারী পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। তবে পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যা সম্পত্তির মালিক হতে পারত। আর জীবদ্দশায় পিতা কর্তৃক কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তা নিয়েই কন্যাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। তাওরাতে আছে, "আইয়ুবের স্ত্রীদের ন্যায় সুন্দর নারী পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তাদের পিতা তাদের ভাইদের সাথে তাদেরকে উত্তরাধিকারের অংশ দিয়েছে।" অর্থাৎ একাধিক ভাই থাকলে শুধু সেক্ষেত্রেই বোন উত্তরাধিকার পেত। আর একজন ভাই থাকলে বোন পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এক্ষেত্রে বিয়ের সময় বোন ঐ ভাইয়ের কাছ থেকে খোরপোশ ও মোহরানার সমপরিমাণ এককালীন সম্পত্তি লাভ করতো। পিতা যদি ভূসম্পত্তি রেখে যেত, তবে ভাই বোনকে কিছু ভূসম্পত্তি দিত। কিন্তু পিতা যদি অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যেত, তাহলে সে যত সম্পত্তি রেখে যাক, বোন ভাইয়ের কাছ থেকে কিছুই পেত না। তবে পুত্র সন্তান একেবারেই না থাকলে কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত, কিন্তু তখন তার উপর এই বিধিনিষেধ আরোপিত হত যে, সে

---

[২৫৯]. বাইবেল, **আদি পুস্তক**, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোকঃ ১১।
[২৬০]. বাইবেল, **আদি পুস্তক**, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোকঃ ১৬।
[২৬১]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১-৩২।
[২৬২]. **গণনা পুস্তক**, অধ্যায়ঃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রে বিয়ে করতে বা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেন।[২৬৩] আর স্ত্রী কোন অবস্থাতেই সম্পদের মালিক হতে পারত না। কারণ বিবাহিতা স্ত্রীর সম্পত্তির মালিক হত তার স্বামী।[২৬৪]

ইহুদীদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই বিবাহ বিষয়টা একটা ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হত। বিবাহের ক্ষেত্রে কনের মতামত প্রদানের কোন অধিকার ছিল না, পিতাই কন্যার পাত্র নির্বাচিত করত।[২৬৫] ইহুদী সমাজে বিবাহটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুমতির কোন প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে এটি ছিল একটা ব্যবসায়ের উত্তম পন্থা, যার কারণে যৌতুকের গুরুত্ব এতে অনেক বেশী ছিল।[২৬৬]

ইহুদী ধর্ম ও সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে 'তালমূদ'[২৬৭] এ উল্লেখ আছে, "কন্যা বয়:প্রাপ্ত হলে তোমার একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দাও এবং তোমার কন্যাকে তার বাগদত্তা করে দাও।"[২৬৮]

ইহুদীরা বিবাহকে নিছক কর্তব্য বলে মনে করত। সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহুদী জাতির জন্য নির্দেশ ছিল, "ফলপ্রসূ হও এবং বংশবৃদ্ধি কর।" ইহুদী জাতি সমস্ত ধর্মীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও এই আদেশ মান্য করেছে এবং বহুসংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করেছে। ইহুদীরা ম্যালথাসবাদের[২৬৯](Malthusianism) একেবারে বিরোধী।[২৭০] তাই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হলেও স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত অথবা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত। বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[২৭১]

ইহুদীদের সম্বন্ধে ট্যাসিটাস বলেছেন, "তারা একগুয়ের মত নিজেদের মধ্যেই মিশে থাকে। পরস্পরের প্রতি উদার থাকে কিন্তু অন্য সবাইকে তারা শত্রু মনে করে এবং ঘৃণা করে। তারা বাইরের কোন লোকের সঙ্গে পানাহার করে না। আর খুবই কামুক হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন জাতির নারীদের সঙ্গে সহবাস করে না কিন্তু তারা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে যায়। তারা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করাকে পাপ মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধে বা ফাঁসিতে যারা প্রাণ দেয় তাদের আত্মা অমর। তাই তাদের মধ্যে দেখা যায় নিজেদের জাতির বংশবিস্তার করার আকাংখা ও মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা।"[২৭২] বিবাহের পূর্বে কৌমার্য অক্ষুন্ন রাখা ও বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে সততা-সাধুতা বজায় রাখা ছিল বিবাহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাগিদ ছিল এবং বিয়ের সময় সতীত্ব প্রমাণ করতে না পারলে স্ত্রীলোকদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা হত।[২৭৩]

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চেয়ে চীৎকার না দিলে সেই ধর্ষিতা নারী জীবনের সকল অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যাই ছিল তার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হলে ধর্ষণকারীর সাথে বিয়ে দেওয়া হত।[২৭৪] ধর্ষণের অপরাধে ধর্ষণকারী ও ধর্ষিতা উভয়ের

---

[২৬৩]. ডঃ মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪; আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।
[২৬৪]. আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।
[২৬৫]. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।
[২৬৬]. Report of Commission, **Marriage, Devorce and the Church**, (London: 1971), p: 80.
[২৬৭]. ইহুদীদের আইন ও নীতিবাক্য সম্পর্কিত গ্রন্থ।
[২৬৮]. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।
[২৬৯]. ম্যালথাস একজন অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতির উপর চাপ কমানোর জন্য তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত দিয়েছেন।
[২৭০]. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।
[২৭১]. **Bible**, Deutero-nomy, 22 : 21.
[২৭২]. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬-২৭।
[২৭৩]. **Bible**, Deutero-nomy, 22 : 23-25, 28-29.
[২৭৪]. **The Jewish Encyclopaedia**, Vol. xii, p: 556.

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। তবে উপাসনা গৃহে ধর্ষণ করলে অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীর বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রথম যামিনীতে স্ত্রী স্বামীর শয্যা সঙ্গিনী হবার পরিবর্তে ইহুদী গোত্রপতিদের সাথে যৌন মিলনের পর পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীর অংকশায়িনী হওয়ার সুযোগ পেত। বিধবাকে বাধ্যতামুলকভাবে নিকটাত্মীয়ের শয্যাসঙ্গী করা হত।[২৭৫]

মাতা-পিতা কন্যাদেরকে বিবাহের জন্য বাধ্য করত না। পিতাই কন্যার বিবাহের পাত্র নির্বাচন করতেন এবং কন্যাপণ গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে কন্যার কোন স্বাধীনতা ছিল না। বিবাহিত কন্যার প্রথম বিবাহ বা স্বামী বলবৎ থাকা সত্ত্বেও পিতা পুনরায় তার বিয়ে দিতে পারতেন। নারীদেরকে বিয়ে দেওয়া বা কারো নিকট বিক্রি করে দেওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার পিতার ছিল।[২৭৬]

বহুবিবাহ ইহুদী সমাজে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল। পুরুষরা ইচ্ছামত বিয়ে করতে এবং উপপত্নী রাখতে পারত। এছাড়াও অবিবাহিতা দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধ বিবাহিতা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তাদের ছিল। এসব জঘন্য কাজ করেও তারা ব্যভিচারী বলে গণ্য হত না।[২৭৭]

ইহুদী ধর্মমতে, পুরুষ সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল আর নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও ভন্ড। তাদের ধারণা ছিল হাওয়ার ছলনার কারণেই আদম পথভ্রষ্ট হয়েছিল। নারী হিসেবে সৃষ্টি না করায় পুরুষরা প্রার্থনা করত, "বিধাতাকে ধন্যবাদ, যেহেতু তিনি আমাকে নারী করেননি।" ইহুদী পাদ্রীদের মতে, "সতী নারীর চেয়ে পাপীষ্ট পুরুষ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।"[২৭৮]

ইহুদী ধর্মে বহুক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সাথে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করত। পিতা তার ছেলে মেয়েদেরকে অবলীলায় বিক্রি করে দিতে পারত।[২৭৯] স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীর ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করলে সে চিরকালের জন্য সেই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী অপর স্বামী গ্রহণ করতে পারত।[২৮০]

ইহুদীরা মনে করত "মেয়েদের গুণের চেয়ে পুরুষদের দোষও ভাল।" নারীদের তারা অভিশাপ মনে করত। তাওরাতে বলা হয়েছে, "স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এক হাজার জনের মধ্যে এ রকম সৎ পুরুষ অনেক পাওয়া যায় কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন সৎ স্ত্রীলোকও পাওয়া যাবে না।"[২৮১]

ইহুদীদের সামাজিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে কমপক্ষে দশজন পুরুষ উপস্থিত থাকার বিধান ছিল। কোন কারণে নয়জন পুরুষ এবং বহুনারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা আরম্ভ হতো না, কারণ তৎকালীন সমাজে নারী মানুষরূপে পরিগণিত হত না।[২৮২] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারী ছিল চরমভাবে বঞ্চিত। দায়ভাগ আইনে নারীর প্রতি জুলুম করা হত। ছেলের বর্তমানে স্ত্রী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতো না। নারীর স্বাক্ষ্য দেয়ার বা দান করার কোন অধিকার ছিল না। ইহুদীদের কিতাব 'আহাদ নামায়ে আতীক' গ্রন্থে নারী জাতি সম্পর্কে

---

[২৭৫]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।
[২৭৬]. Polpishi, **Victor, Devorce and Marriage**, London, p: 38; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, নারী **নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।
[২৭৭]. Shanar, Donald W, **A Christian view of Devorce**, (London , 1996), p: 31.
[২৭৮]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।
[২৭৯]. Lods, **Adolpe, Israel**, (London: 1948), p: 191.
[২৮০]. **Bible**, Deutero-nomy, 24:1, 22 ; Shanar, Donald W, **A Christian view of Devorce** Ibid, P : 31; Moscati, Sabatino, **Ancient Semitic Civilization**, (London, 1957), p: 159.
[২৮১]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১; ডঃ মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
[২৮২]. Shaner, Donald W, **A Christian view of Devorce**, Ibid, p: 31.

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত আছে, "নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আরাম দেয়ার জন্য, নারী পাপের প্রস্রবণ। পূণ্যের কাজ করার কোন যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে সে মান সম্মানের যোগ্য হতে পারে না।"[২৮৩]

ইহুদীরা বিভিন্ন ধরণের মনগড়া কথায় বিশ্বাস করত। যার কোন তত্ত্বগত বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।[২৮৪] মনগড়া তাওরাতের হুকুম ছিল, "দুইজন পুরুষের ঝগড়া বা লড়াই আরম্ভ হলে কোন নারী যদি তার স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এই অপরাধে ঐ নারীর উভয় হাত কেটে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে তার প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করা যাবে না।"[২৮৫]

তালাকের ব্যাপারেও এরূপ হৃদয়হীন ঘটনার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর ছোট ছোট দোষ ত্রুটির কারণে তালাক দেয়া হত। অনেক সময় দোষত্রুটি না পেলেও তালাক দেয়ার অধিকার পুরুষের ছিল। খুবই সাধারণ অপরাধের কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে দ্বিধাবোধ করত না। তৎকালীন সমাজে তালাকপ্রাপ্তা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার ছিল না। কোন পুরুষ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করত না। অপরদিকে নারী কর্তৃক তালাক দেয়ার কোন সুযোগ নারীদের ছিল না।[২৮৬]

আদালতের রায়ে তালাক হলে গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইহুদী সমাজ এরূপ বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দিত না বরং সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে পূর্ব স্বামীর বিবাহিতা বলে গণ্য করা হত। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে 'গেট' বা বিবাহ বিচ্ছেদের সনদ না দেয়া হলে বিবাহ অটুট থাকত। সংশোধিত ইহুদী আইন ও সিভিল আইনে তার পুনঃবিবাহ হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট সেই স্ত্রী ব্যভিচারিনী এবং সে বিবাহের সন্তানগণ বংশানুক্রমে 'মামজের' বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হত। 'গেট' তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই একটা অংশ। ইহুদীদের বিশ্বাস এই আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) কে দিয়েছিলেন।[২৮৭] কিন্তু তাদের এ মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইহুদীরা ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এই অধিকার লাভ করে থাকে যে, যখন তারা ইচ্ছা করবে, ক্ষুদ্রতম অপরাধের কারণেও স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারবে। তারা স্ত্রীদেরকে ঋতুকালীন সময়ে অপবিত্র বলে মনে করে। এসময় তারা স্ত্রীদের সাথে উঠা বসা, কথা বার্তা, আলাপ আলোচনা করা এমনকি তাদের হাতের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করাকেও নিজেদের জন্য জঘন্যতম অপমানজনক কাজ বলে মনে করে থাকে।[২৮৮] ইহুদী ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইয়াসরিবের (বর্তমান মদীনা শহর) 'ফিতুম' নামক এক ইহুদী বাদশাহ আইন জারি করেছিল, "যে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামুলকভাবে তার সাথে রাত্রিযাপন করতে হবে।"[২৮৯]

---

২৮৩. আবুল কালাম আজাদ মাওলানা, **মুসলমান আওরাত**, (ভারত, ইংল্যান্ডের আর্য বিশপদের রিপোর্ট, লন্ডন, ১৯৪৬), থেকে উদ্ধৃত; ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২৮৪. ইহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস এই ছিল যে, একমাত্র হাওয়া (আঃ) এর প্রলোভনে পড়েই হযরত আদম (আঃ) গন্দম ফল ভক্ষণ করেছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এ থেকেই ইহুদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নারী জাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পাপের উস্কানী দাত্রী হয়ে আছে। অতএব সে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য। শুধু এই একটি কারণে ইহুদীরা নারী জাতির অধিকারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে।

২৮৫. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

২৮৬. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

২৮৭. অধ্যক্ষ শামসুল হুদা, **নারীর অধিকার ও মর্যাদা**, (ঢাকাঃ আশরাফিয়া বইঘর,১৯৯৫), পৃঃ ১৯; আল মুসতাশার হাসান হাফনাভী, **মাকামাতুল মারআতি ফিল ইসলাম**, (আল কাহেরাঃ দারুল বাশীর, আল মারআতু লাদাল ইয়াহুদ), পৃঃ ২৫।

২৮৮. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, **মহানবী (সাঃ) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা**, (ঢাকাঃ ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫), পৃঃ ৬৫; আল্লামা আব্দুল কাইউম নদভী, **ইসলাম আওর আওরাত**, (লাহোরঃ ইদারায়ে ইসলামিয়া, তা.বি.) পৃঃ ২৩।

২৮৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃঃ ৬২; ড. আল্লামা জামাল আল বাদাবী, **ইসলামিক টিচিং কোর্স**, ৩য় খন্ড, অনুবাদঃ আবু খালদুন আল মাহমুদ, **ইসলামের সামাজিক বিধান**, (ঢাকা : দি পাইওনিয়ার, ১৯৯৯), পৃঃ ৪৯-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদী সমাজে নারী সর্বাবস্থায় উপেক্ষিত ছিল। সমাজের ধনী পুরুষরা দরিদ্র ও অসহায় মেয়েদের ক্রয় করে উপপত্নী হিসেবে উপভোগ করত। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অসংখ্য বিবাহ করত। তারা স্ত্রীদের দিয়ে সকল প্রকার কায়িক পরিশ্রম করাত। সতীত্বহীনতার অপবাদ দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিত। শ্বশুর জোরপূর্বক পুত্রের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করত এবং এক্ষেত্রে শ্বশুরকে শাস্তি না দিয়ে পুত্রবধূকে শাস্তি দেয়া হত। প্রাচীন হিব্রু শিলালিপির মত ইহুদী ধর্মে নারী চিরন্তন অভিশপ্ত। নারীর কারণে পাপের সৃষ্টি হয়। তাই তাদের মাধ্যমে মানুষ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয় এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই পুরুষের অপকর্মের জন্য নারীকে দায়ী করে তার সাথে পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা হত।[২৯০]

বর্তমানে ইহুদী জাতি খৃষ্টান সমাজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার কারণে এবং যুগের পরিবর্তনের কারণে নারী সমাজের প্রতি সেরকম অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন ও অবহেলা করতে পারে না। তাই তারা তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাতকে পরিবর্তন করে তাদের মনমতো করে গড়ে নিয়েছে।[২৯১]

---

[২৯০]. মুহাম্মদ আবূ তাহের, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।
[২৯১]. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্ট ধর্মে নারী

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সভ্যতার দাবীদার খৃষ্টধর্ম[২৯২] এই ধর্মের প্রবর্তক হযরত ঈসা (আ:)[২৯৩] খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের গোড়ার দিকে এই ধর্মের বিষয়ে নারীদের প্রবল আগ্রহ দেখা গেছে। এবং তারা এই ধর্ম প্রচারের জন্য খুব সফল প্রতিনিধির কাজ করে।[২৯৪] কিন্তু খৃষ্টধর্ম তার বদলে নারীর প্রতি অবিচারই

---

[২৯২]. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ তার **'বিশ্বসভ্যতা মধ্যযুগ'** গ্রন্থে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে বলেন, "খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশু। যীশুর জন্ম এক দরিদ্র ইহুদি পরিবারে। বাবা সামান্য ছুতারের কাজ করতেন। অল্প বয়স থেকেই ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় যীশুর মধ্যে। ক্রমে তার মধ্যে নতুন বিশ্বাস জন্ম নেয়। তিনি প্রচার করেন ঈশ্বর সকলের পিতা। তিনি শুধুমাত্র ইহুদিদের দেবতা নন। ইহুদি বিশ্বাস মতে, যেহোবা অর্থাৎ ঈশ্বর শুধু ইহুদিদেরই বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। এই কুপমন্ডুক চিন্তার বিরোধিতা করেন যীশু। তিনি বললেন, ঈশ্বর বিশ্বের সকল মানুষের। মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে ইহুদি যাজকদের সাথে যীশুর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ইহুদি যাজকগণ ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার জন্য জেরুজালেমের রোমান শাসকদের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে মানবাত্মার মুক্তিদাতা বলে প্রচার করতে থাকেন। সুতরাং যাজকদের পক্ষে রোমান শাসনকর্তাদের এটা বোঝানো সহজ হয় যে, ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে সম্রাটের যে কর্তৃত্ব রয়েছে, তাকে অস্বীকার করছে যীশু। এতে রোমান আধিপত্য বিনষ্ট হবে। ফলে যীশুকে সমাজ, ধর্ম ও সাম্রাজ্যের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে যুগের প্রথা অনুযায়ী ক্রুশ কাঠে বিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা হয় । (এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা - মধ্যযুগ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫)। কিন্তু এই মতটি পুরোপুরি সর্বজন স্বীকৃত নয়। এই মতটি পরিবর্তিত খৃষ্টধর্মের ক্ষেত্রে বা নিউ টেষ্টামেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সর্বসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য মত হল, আল্লাহ তায়ালা ইসরাইল জাতির হেদায়েতেরে জন্য এবং তাদের অবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য হযরত ঈসা (আ:) কে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তার প্রতি আসমানী কিতাব 'ইঞ্জিল' অবতীর্ণ করেন। তিনি পিতা ছাড়াই আল্লাহর অসীম কুদরতে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল। অত:পর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।" (আল কুর'আন, **সূরা আত তাহরীম**, আয়াত: ১২)।

পরবর্তীতে আল্লাহ ঈসা (আ:) কে উর্ধ্বাকাশে উত্তোলন করে নেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আ:) কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তখন তিনি হাওয়ারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে বেহেশতে আমার বন্ধু হবে? তবে শর্ত তাকে দুনিয়ায় আমার আকৃতি ধারণ করে শত্রুদের সামনে উপস্থিত হতে হবে। অত:পর আমার পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হবে। হাওয়ারীদের মধ্য হতে একজন তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তারপর তাকে হত্যা করা হয় এবং ঈসা (আ:) কে আকাশে উত্তোলন করা হয়। (আলূসী, **সূরা আল ইমরান**, আয়াত: ৫, **তাফসীর**, পৃ: ১৭৫)। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, তাদের এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত)। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি। কিন্তু তাদের এইরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল। তারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি, শুলেও চড়ায়নি, বরং আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১৫৭-১৫৮)।

বর্তমান বিশ্বে ঈসা (আ:) এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার খৃষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ হল 'বাইবেল'। এই গ্রন্থের দুইটি অংশ। যথা: ১) ওল্ড টেস্টামেন্ট ও ২) নিউ টেস্টামেন্ট। খৃষ্টানরা নিউ টেস্টামেন্টে তাদের সুবিধা অনুযায়ী বেশীর ভাগ বিধিবিধান পরিবর্তন করে নিয়েছে। (**সীরাত বিশ্বকোষ**, ৩য় খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ: ৩১৩)।

[২৯৩]. কুর'আন ও হাদিসে হযরত ঈসা (আ:) এর জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত পাওয়া না গেলেও তাঁর জীবন প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু তার পুত-পবিত্র জীবনের উপক্রমণিকা হিসেবে তার মা হযরত মরিয়ম (আ:) এর জীবনের ঘটনাবলীও পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও হযরত ঈসা (আ:) সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বে হযরত ঈসা (আ:) এর অনুসারী হওয়ার দাবিদার খৃষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ হল 'বাইবেল'। এই গ্রন্থের দুইটি অংশ রয়েছে। যথা: ১. ওল্ড টেষ্টামেন্ট (Old Testament) ও ২. নিউ টেষ্টামেন্ট (New Testament)। খৃষ্ট ধর্মের অনুসারীরা ঈসা (আ:) এর ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে 'নিউ টেষ্টামেন্ট'কেই আদি উৎস মনে করে। তাদের মতে, ঈসা (আ:) এর জীবনী সম্পর্কে মৌখিক উৎস হইল ৪টি গসপেল: মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। মথি ও লুক গসপেল বা সুসমাচারে ঈসা (আ:) এর বংশলতিকা উল্লেখ করা হয়েছে। চারটি গসপেলেই ঈসা (আ:) এর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা, শয়তানের আহবান প্রত্যাখ্যান করা, হাওয়ারী গ্রহণ করা, শরীয়াতের কিছু কিছু বিধিবিধান সম্পর্কিত। (**সীরাত বিশ্বকোষ**, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৩)।

[২৯৪]. মধ্যযুগের বর্বর জাতিগুলির লোকেদের বিশেষ করে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের তারা এই ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে। অন্যান্যদের মধ্যে ক্লটিলডার (CHLOTILDA) নাম উল্লেখ করা যায়, তিনি ফ্রাঙ্ক এর রাজা ক্লডউইগ (CLODWIG) কে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিল। জানা যায় যে, কেন্ট এর রাণী বার্থা (BERTHA) ও হাঙ্গেরীর রাণী গীসেল (GISEAL) তাদের নিজেদের দেশে খৃষ্টধর্মের প্রবর্তন করেছিল। আর নারীর প্রভাবেই পোল্যান্ডের ডিউক, জারিশ্চার জার

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের মত খৃষ্টধর্মও নারীদের বিষয়ে একই রকম উপদেশ দিল। এই ধর্ম নারীকে পুরুষের দাসীর পর্যায়ে নামিয়ে দিল এবং স্বামীদের বশবর্তী হয়ে থাকতে বাধ্য করল। খৃষ্টধর্মে নারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে খুবই অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে।

বাইবেলের পূর্বভাগে বর্ণিত দশটি বিধান (Ten Commandments) প্রকৃতপক্ষে শুধু পুরুষদের জন্যই বলা হয়েছে। কারণ দশম বিধানটিতে নারীদের উল্লেখ দাসদাসী এবং গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে একসঙ্গে করা হয়েছে। তারা বলে, নারী হল একটা সম্পত্তি বিশেষ যা কিনা পুরুষ অর্থের বিনিময়ে বা কাজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। যীশুর সম্প্রদায় বিশেষ করে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে তাদের দলের লোকদের উপর কঠোর কৃচ্ছ সাধনার আদেশ দিত। যীশু বিবাহকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তিনি প্রচার করেছিলেন, "কোন কোন লোক মাতৃগর্ভ থেকেই নপুংসক হবে। আর কোন কোন লোককে নপুংসক করা হবে। আর কোন কোন লোক স্বর্গ রাজ্যের জন্য নপুংসক থাকবে।" যীশূর মাতা যখন ক্যানাতে (CANA) বিবাহের ভোজের জন্য বিণীতভাবে তার সাহায্য চেয়েছিলেন তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন: "হে নারী তোমাকে দিয়ে আমার কি প্রয়োজন?" ধর্মযাজক পল[২৯৫] প্রচার করেন, "পুরুষের পক্ষে নারীকে স্পর্শ না করা ভালো। যে পুরুষ নারীকে (কুমারীকে) বিবাহ দেয় সে ভালো করে। কিন্তু যে বিবাহ দেয় না সে আরো ভালো করে।" তাদের দেহের প্রতি ঘৃণা থেকেই নারীর প্রতি ঘৃণার জন্ম হয়, কারণ নারীই পুরুষকে প্রলুব্ধ করছে বলে মনে করা হত।

খৃষ্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।[২৯৬] কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের মতে, নারী হলো অপবিত্র। সে পুরুষকে প্রলুব্ধ এবং এ দুনিয়ায় পাপ নিয়ে এসেছে এবং পুরুষের পতন ঘটিয়েছে। ফলত সমস্ত ধর্ম প্রচারকরা, গীর্জার পুরোহিতরা বিবাহ বিষয়টাকে একটা অনিবার্য অমঙ্গল বলে মনে করেছে। প্রখ্যাত ধর্মযাজকরা নারী ও বিবাহ সম্পর্কে যেসকল বিরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন তা থেকে খুব সহজেই খৃষ্টধর্মে নারীর অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নারী সম্পর্কে খৃষ্টান ধর্মযাজকরা যে সকল বিরূপ মন্তব্য করেন তা ছিল নিম্নরূপ:

খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রাথমিক যুগের ধর্মগুরু টারটুলিয়ান (TERTULLIAN) নারী সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "নারী শয়তানের আগমণের দ্বার স্বরূপ। সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে আকর্ষণকারিণী। খোদার আইন ভঙ্গকারিণী এবং পুরুষের ধ্বংসকারিণী।" নারীজাতিকে লক্ষ্য করে টারটুলিয়ান ঘোষণা করেন, "হে নারী, তোমার উচিত সর্বদা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে অনুশোচনায় কাঁদতে কাঁদতে শোক প্রকাশ করে চলা, যাতে মানুষ ভুলতে পারে যে তুমিই সমগ্র মানব জাতির ধ্বংসের কারণ। নারী! তুমি নরকের দ্বার।" তিনি আরও বলেছেন, "চিরকৌমার্যই ভালো, তাতে যদি শেষ পর্যন্ত মনুষ্যজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তো যাক।"

জেরোম (Jerom) বলেছেন, "বিবাহ হল বড় জোর একটা দোষ, আমরা যা করতে পারি তা হলো এর জন্য ক্ষমা করা এবং একে বিশুদ্ধ করা।" তদনুসারে বিবাহকে করা হলো গীর্জার নিছক একটি ধর্মানুষ্ঠান। তিনি আরও বলেন, "নারী শয়তানের সদর দরজা, কুকর্মের পথ এবং বৃশ্চিকের দংশন।" পল নারীদের শিক্ষা ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে বলেছিলেন, "নারীরা পরাধীন থেকে নীরবে শিক্ষালাভ করুক। কিন্তু তারা যা শেখাবে অথবা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করবে আমি তা সহ্য করব না। তারা চুপচাপ থাকুক।"[২৯৭]

এবং আরো অনেক রাজা ও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। (আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮)।

[২৯৫]. বলা হয়ে থাকে, খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনে যিশুর চেয়েও পলের অবদান বেশী। তিনি সর্বপ্রথম এই ধর্মকে ইহুদীদের সংকীর্ণ গন্ডি থেকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আধ্যাত্মিক পথে চল, জৈব কামনা চরিতার্থ করো না, কারণ দেহ ও আত্মা পরস্পর বিরোধী। যারা খৃষ্টের ভক্ত তারা জৈব কামনা বাসনাকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করে ফেলেছে।" তিনি তার নিজের নীতি মেনে চলেছিলেন এবং অবিবাহিত ছিলেন। (**আগস্ট বেবেল**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮)।

[২৯৬]. Pospishil, **Victor: Divorce and Marriage**, London, p: 38.

[২৯৭]. আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮-২৯; সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯; অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, **নারীর অধিকার ও মর্যাদা**, (ঢাকা: আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫), পৃ: ১৬; আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬; ডঃ মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪, ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬;

Dhaka University Institutional Repository

পল এর দৃষ্টিতে বিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন নয় এবং এটা স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের জন্য সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক বিষয়ও নয়।[২৯৮] বরং তিনি 'জরুরী পাপ' (Necessary Evil) হিসেবেই বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন। তার মতে, "It is well for a man not to touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you do not sin and if a girl marries she does not sin. Yet those who marry will have wordly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affair of the Lord, how to please the Lord; but the married man is anxious about wordly affairs, how to please his wife. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord." "কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল। সে যেমন আছে, তদ্রুপ থাকাই তার জন্য উত্তম। বিবাহ করতে চেয়ো না। কিন্তু তুমি বিবাহ করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিবাহ করলে সেও পাপ করে না। তবে যারা বিবাহ করে। তারা পার্থিব দু:খ কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাক। ইহা আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে উদ্বিগ্ন; কিরূপে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা উপর কোন বাধা আরোপের জন্য নয় বরং শৃংখলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি এটা বলছি।"[২৯৯] খৃষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'বাইবেলে' নারী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- "The head of every man is christ, the head of a woman is her husband." "প্রত্যেক পুরুষের আধিকর্তা হলেন যিশু; নারীর অধিকর্তা তার স্বামী।"[৩০০]
- "Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor." "পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নীরবে নারী শিক্ষা লাভ করবে। পুরুষকে শিক্ষা দান অথবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকেই দেয়নি; সে নির্বাক থাকবে। কারণ সর্বপ্রথম আদম সৃষ্টি হয়েছিলেন, তারপর হাওয়া এবং আদম প্রতারিত হননি; বরং হাওয়াই প্রতারিত হয়েছিলেন ও নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলেন।"[৩০১]

নারী, বিবাহ ও যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয় ধর্ম ও যাজকদের ধারণা চরম সীমা অতিক্রম করেছিল। তাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, নারীই পাপের মূল উৎস। পুরুষের জন্য নারী পাপ আন্দোলনের উৎস এবং নরকের দ্বার স্বরূপ। মানুষের যাবতীয় দু:খ দর্দশা নারী হতেই হয়েছে। নারীরূপে জন্ম লাভ করা এক লজ্জাকর ব্যাপার। নারীর রূপ সৌন্দর্যের জন্য তার লজ্জাবোধ করা উচিত। যেহেতু নারী এই জগতবাসীর জন্য অভিশাপ আনয়ন করেছে সেজন্য তাকে চিরদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে হলেও তা মূলত একটি অপবিত্র কাজ এবং তা হতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই রকম বৈরাগ্য সূলভ মনোভাব শুধুমাত্র নৈতিক ও সামাজিক দিক হতে নারীর মর্যাদাকে হেয় করেনি বরং কৃষ্টিগত আইন কানুনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। খ্রিষ্টধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী যত প্রকার আইন পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত হয়েছে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, নারী **নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮-২৯।

[২৯৮]. Joseph Klansner, **From Jesus to paul**, (London 1964), p: 571-572.

[২৯৯]. **Bible-1**, Corinthians, 7: 1, 26, 28, 29, 32, 35.

[৩০০]. **Bible-1**, Corinthious, 11: 3.

[৩০১]. **Bible**, Timothy, 2: 11-14.

Dhaka University Institutional Repository

- জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে নারীকে সম্পূর্ণ অসহায় করে পুরুষের অধীন করে রাখা হয়েছে। বিষয় সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের অধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল। এমনকি স্বোপার্জিত অর্থের উপরও তাদের কর্তৃত্ব ছিল না। সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল স্বামীর।
- তালাক ও খোলার অনুমতি ছিল না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক যতই তিক্ত ও নরক তুল্য হোক না কেন ধর্ম ও আইন উভয়ই স্বামী স্ত্রীকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করত। পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই খারাপ হলে উভয়কে এই শর্তে বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়া হত যে, তারা কেউই দ্বিতীয়বার অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।
- স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর পুনরায় বিবাহ করা নিষিদ্ধ ও পাপজনক ছিল।[৩০২]

নারীজাতিকে হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের প্রবল ভুমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। তাদের মতে, নারী গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারীজাতির উপর দোষারোপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary Evil) বলে অভিহিত করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন, "নারী বলেই তাদের লজ্জায় অভিভুত হয়ে থাকা উচিত।"[৩০৩]

খৃষ্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জীল এর বিশুদ্ধ নির্দেশ এই যে, নারীর একবার বিয়ে হওয়ার পর স্বামী যত বড় অত্যাচারী ও জালিমই হোক না কেন বা যত বড় অপরাধী ও পাষন্ডই হোক না কেন, ঐ স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য স্বামীর বিবাহবন্ধন হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। তবে স্ত্রী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হতো এবং তা প্রমাণিত হতো তাহলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। কিন্তু সেখানে এরূপ শর্ত আরোপ করা হতো ঐ পুরুষ ও নারী পরবর্তীতে আর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।[৩০৪]

খ্রীষ্টান ধর্মে তালাকের অনুমতিই নেই। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, "....that the wife should not separate from her husband and that the husband should not divorce his wife." "....স্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না।"[৩০৫] Mark (মার্ক) এর মতে, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন, "Who ever divorces his wife and marries another, commits adultey against her; and if she devorces her husband and marries ahother, she coummits adultery." "যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহণ করে, সে ব্যভিচার করে।"[৩০৬]

কিন্তু এরূপ মতও পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টান ধর্মে তালাক ও পুনর্বিবাহ অবৈধ নয়।[৩০৭] শুধু পুনর্বিবাহ নয় খ্রীষ্টধর্মে বহুবিবাহ করার ক্ষেত্রেও কোন নিষেধ বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইঞ্জিলে (নিউ টেষ্টামেন্ট) একাধিক বিয়ে নিষেধ করে কোন স্তোত্র নেই। বরং কোন কোন পুস্তিকায় এমন ধরণের কথা রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সংগত। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, "আর্চবিশপকে এক

---

৩০২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৯।

৩০৩. Libra, **Womanhood and the bible**, (New York), p: 18; Cleugh, James, **Love locked out**, (London 1963), p: 264-265.

৩০৪. পরবর্তীকালে নব্য খৃষ্টানগণ বিবাহ বিচ্ছেদের এই বিধান পরিবর্তন করে এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, স্ত্রী যদি অত্যাচারী ও অপদার্থ স্বামী হতে মুক্তি পেতে চায় তবে তাকে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হবে। (মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, **মহানবী (স) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা**, ঢাকাঃ ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫, পৃঃ ৬৫; আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, **ইসলাম আওর আওরাত**, লাহোরঃ ইদারায়ে ইসলামিয়া, তা. বি. পৃঃ ২২-২৩)।

৩০৫. **Bible: Cristhians**: 7: 38.

৩০৬. **Bible: Mark**, 10: 11-12.

৩০৭. Pospishil Victor, Ibid, p: 38; **Bible -1, Corinthious**, 7: 39-40.

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর স্বামী হতে হবে।" তাহলে অন্যদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।[৩০৮]

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালের অনেক খ্রীষ্টানই একই সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত। ইতিহাস থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনেক পাদ্রীর বহু সংখ্যক স্ত্রী ছিল। আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ সংগত বলে খ্রিষ্টযুগের পন্ডিতগণ রায় দিয়েছিলেন। পারিবারিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ওয়েস্টমার্ক (Westmark) বলেন, "গীর্জার অনুমতিক্রমে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। আর অনেক ক্ষেত্রে গীর্জা ও রাষ্ট্রের হিসেবের বাইরে এর সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যেত।[৩০৯] তিনি আরো বলেন, "আয়ারল্যান্ড সম্রাটের দুজন স্ত্রী আর দুজন দাসী ছিল।" সম্রাট শার্লিম্যানের দুজন স্ত্রী ও বহুসংখ্যক দাসী ছিল। মার্টিন লুথারও বহু বিবাহের কথা অস্বীকার করেননি। কেননা তার মতে, "তালাকের পরিবর্তে একাধিক স্ত্রী রাখাই উত্তম।" ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভিষ্টাফিলিয়া' সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর একজন পুরুষের জন্য দুজন স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা দেওয়া হয়। খ্রিষ্টানদের কোন কোন শাখায় লোকেরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে কর্তব্য মনে করত। প্রটেষ্ট্যান্টদের ধারণা, "বহু স্ত্রী গ্রহণ এক পবিত্র স্রষ্টারই ব্যবস্থা।" আফ্রিকায় কালো মানুষদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, গীর্জা তাদের জন্য বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অবাধ অনুমতি দিয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৪৮ সালে জার্মানীর মিউনিখে বিশ্ব যুব সম্মেলনের এক প্রস্তাবে বহু বিবাহের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের চিন্তা করা হয়।[৩১০]

প্রথম যুগের খৃষ্ট ধর্মের যাজকগণ রোমান সামাজের অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এসব কিছুর জন্য নারীকেই দায়ী করেন। কেননা, নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করত। তাই খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত অপেক্ষা বেশী সম্মানার্হ। খৃষ্টানদের এই মনোভাবের কারণেই খৃষ্টধর্মে বৈরাগ্যবাদের[৩১১] আবির্ভাব ঘটে।

---

৩০৮. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম ও ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলামী সংস্কৃতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।

৩০৯. আল আককাদ, **হাকাইক আল ইসলাম**, পৃঃ ১৭৭; Al Hatimy, Said Abdullah Seif, **Woman in Islam**, p: 61.

৩১০. ড. ইউসুফ মুহাম্মদ, **আল আহকাম আহওয়াল আল শাখাসিয়া**, পৃঃ ১২১।
তবে খৃষ্টান ধর্ম অনুসারীদের মধ্যে কোথাও কোথাও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইন অনুপস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় পাদ্রীগণ বলতেন যে, এটা শুধু পাশবিক প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং ভোগ লালসা ব্যতীত আর কিছু নয়। তারা এটাকে মার্জিত ব্যভিচার নামে অভিহিত করত। কিন্তু হিটলার চেয়েছিলেন তার দেশে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইন চালু করতে। কারণ সেখানে একাধিক বিবাহের অনুমতি ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তা তিনি করতে পারেননি। বহু খ্রিষ্টান মনীষীও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কথা বলেছেন। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেন আওয়ার বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী সমান মর্যাদার হওয়ার কারণে ইউরোপে বিয়ে সংক্রান্ত আইন অত্যন্ত খারাপ। আমাদের একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য করেছে। ফলে আমাদের অর্ধেক অধিকারই নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা যখন মূল বিষয় চিন্তা করি, তখন এমন কোন কারণ খুজে পাইনি, যার দরুন পুরুষকে এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয়কে গ্রহণ করতে বাধা দেওয়া যুক্তিসংগত হতে পারে। বিশেষত কারো স্ত্রী যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, বন্ধ্যা হয় বা কয়েক বছরের দাম্পত্য জীবনের পরেই বৃদ্ধা হয়ে যায়, তখন সে পুরুষকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে কি করে বাধা দেয়া যেতে পারে। (আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮, পৃঃ ২৬১-২৬২; সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯)।

৩১১. মানব ইতিহাসের আর কোন জাতির জীবনে বোধ হয় বৈরাগ্যবাদ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। জ্ঞান, দেশপ্রেম ও হৃদয় বৃত্তির প্রতি উদাসীন, হীন, ভয়ানক ও দুর্বল পাগলাটে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে আত্মনিগ্রহ করে চলছে এবং মনগড়া প্রতিমূর্তির সংকুচিত হচ্ছে। অংগ প্রত্যংগের শীর্ণতাকেই চরম উৎকর্ষের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা হয়। লেকি (Leckey) তার বর্ণনায় তৎকালীন বৈরাগ্যবাদের চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরে বলেন "সেন্ট জেরোম সপ্রসংসভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি এক মঠবাসীকে ত্রিশ বছর যাবত প্রতিদিন এক খন্ড যবের রুটি এবং সামান্য পরিমাণ ঘোলা পানি খেয়ে জীবন যাপন করতে দেখেছেন। দ্বিতীয় একজনকে একটা গর্তে বাস করতে এবং প্রতিদিন পাঁচটা ডুমুর খেয়ে জীবন ধারণ করতে দেখেছেন। তৃতীয় একজন কেবল ঈষ্টার সানডেতে তার চুল কাটতো, ময়লা কাপড় চোপড় পারতো, পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তা খুলতো না, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ও গায়ের চামড়া পাথরের মতো না হওয়া পর্যন্ত উপোষ করতো। তার এসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা মহা কবি হোমারের পক্ষেও কষ্টের ব্যাপার হতো।

Dhaka University Institutional Repository

দেহের ভোজাল থেকে আত্মাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তারা মঠকেন্দ্রিক জীবন গড়ার আন্দোলনে বিকশিত হয় এবং খৃষ্টবাদের সমান গতি নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[৩১২] ধর্ম সম্বন্ধে এমন এক দৃষ্টিভংগি গড়ে ওঠে যা ছিল বিষন্নতায় পরিপূর্ণ। সাধুদের কাজ ছিল স্বাভাবিক চাহিদার অবদমন এবং এমন এক অবস্থা অর্জন করা যা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। তাদের নীতি ছিল, কোন নারীর চেহারার দিকে তাকানো যাবে না। যে ব্যক্তি বছরের পর বছর ধরে এই কলুষতা থেকে মুক্ত থাকতে পারত তাকে উৎকর্ষতার অধিকারী বলে গণ্য

কথিত আছে যে, আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট ম্যাকেরিয়াস ছ'মাস যাবত একটা জলাভূমিতে ঘুমিয়েছেন এবং তার শরীর উন্মুক্ত করে বিষধর মাছিগুলোকে কামড়াবার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি তার দেহে আশি পাউন্ড লোহা বহন করতেন। তার শিষ্য সেন্ট ইউসেবিয়াস একশো পঞ্চাশ পাউন্ড লোহা শরীরে বহন করতেন। তিনি তিন বছর একটা শুকিয়ে যাওয়া কুয়ার ভেতর কাটিয়েছেন। সেন্ট স্যাবাইনাস একমাস পর্যন্ত পানিতে পঁচানো শস্যদানা খেতেন। সেন্ট বেসারিয়ন চল্লিশদিন ও চল্লিশ রাত কাঁটা ঝোপের মধ্যে থাকেন এবং চল্লিশ বছর বিছানায় গা না লাগিয়ে ঘুমিয়েছেন। সেন্ট পেখোমিয়াস শেষোক্ত কাজটি করেন পনের বছর ধরে। সেন্ট মারসিয়ানের মতো কিছু সাধু ব্যক্তি দিন একবার সামান্য আহার করতেন এবং সারাদিন ক্ষুধায় ছটফট করতেন। এক ব্যক্তি প্রতিদিন ছ'আউন্স রুটি এবং কয়েক টুকরা ওষধি খেতেন। তাকে কোনদিন বিছানায় শুতে দেখা যায়নি। এমনকি ঘুমোবার কালে হাত পা গুলোকেও আরামে রাখতেন না তিনি। ক্লান্তির কারণে আহারকালে কখনো কখনো তার চোখ বুজে আসতো এবং মুখ থেকে খাবার পড়ে যেতো। কিছু সংখ্যক সাধু একদিন অন্তর খাবার খেতেন। কেউ কেউ এক সপ্তাহ যাবত উপোষ থাকতেন বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট ম্যাকেরিয়াস সম্বন্ধে বলা হয় যে এক সপ্তাহ যাবত তিনি শুতেন না, কিছু খেতেন না এবং রোববারে কিছু কাঁচা লতা বা গাছের মূল খেতেন।

সেন্ট জন সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি একটি পাথরে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে উপাসনা রত ছিলেন। আরো বলা হয় যে, এ সময়ে তিনি একবারও বসেননি বা মাটিতে গা লাগাননি। প্রতি রোববার তাকে প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কিছু অংশ দেয়া হতো এবং শুধু তা খেয়েই জীবন ধারণ করতেন। কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী বুনো জন্তু জানোয়ারের পরিত্যক্ত গুহাতে বাস করতেন। কেউ কেউ বাস করতেন শুকিয়ে যাওয়া কুয়ার ভেতর। সমাধি-সৌধেও অবস্থান নিতেন কেউ কেউ। কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী কাপড় চোপড় ঘৃণা করতেন, হামাগুড়ি দিয়ে অন্যত্র যেতেন এবং তাদের দীর্ঘ চুল দাড়ি গোফই হতো তাদের শরীরের আবরণ। মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ার একাংশে গ্রেজার নামে একটা সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। এই সম্প্রদায়ের সাধুরা খোলা জায়গায় বসবাস করতো। তারা গোশত খেতো না, রুটি খেতো না, পাহাড়েই জীবন কাটাতো এবং পশুর মতো ঘাস খেতো। শরীর পরিষ্কার করা তাদের কাছে অপছন্দনীয় কাজ ছিলো এবং সব প্রশংসিত ব্যক্তি নোংরামীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। সেন্ট এথানেসিয়াস বর্ণনা করেন কিভাবে সেন্ট এন্টোনি বার্ধক্যকাল পর্যন্ত তার পা ধোয়ার পাপ করেননি। সিলভিয়া নামের এক কুমারী ষাট বছরের বৃদ্ধা হয়েও ধর্মীয় কারণে তার আংগুল ছাড়া আর কোন অংশ ধুতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। সেন্ট ইউফ্রেক্সিয়া একশো ত্রিশজন কুমারীর একটা কনভেন্টে যোগদান করেন। ওরা কোনদিন তাদের পা ধোয়নি এবং গোসলের কথা শুনলে তারা আঁতকে উঠতো। কোন মঠবাসী পরিচ্ছন্ন হলে তার জন্যে তাকে গালমন্দ শুনতে হতো। এবোট আলেকজান্ডার বলেন, "আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ভারাক্রান্ত মনে অতীতের দিকে তাকিয়ে তাদের চেহারায় কখনো পানি লাগাননি, অথচ আমরা গোসল খানায় যাচ্ছি প্রায়ই।" এই সেন্ট বীভৎস ভাবে তার কৃচ্ছতার জীবন শুরু করেন। তিনি তার শরীরে একটি রশি এমনভাবে বেঁধে ছিলেন যে এর ফলে শরীর কেটে তাতে পচন ধরে শরীর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হতে থাকে এবং নড়াচড়া করলে তার শরীর থেকে পোকা ঝরে পড়তো।

এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেন্ট সাইমিওন এক বছর যাবৎ একপায়ে ভর করে দাড়িয়ে থাকেন। তার অপর পায়ে ছিলো মারাত্মক ক্ষত। তার জীবনীকারকে তিনি নিকটে দাড়িয়ে থেকে ঝরে পড়া পোকা গুলো আবার শরীরে তুলে দেবার জন্যে বলতেন। সেন্ট পোকা গুলোর উদ্দেশ্যে বলতেন, "খা, গড্ যা তোদের খেতে দিয়েছেন।" এসব বর্ণনা ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের মাঝে পূণ্য এবং উৎকর্ষতার যে মতবাদ প্রচলিত ছিলো তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। কয়েক শতাব্দী ধরে আত্ম-নিগ্রহই ছিলো মানব জীবনের সাধুতার প্রধান পরিমাপক। হাজার হাজার মানুষ নির্জন অঞ্চলে ছুটে যেতো আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে নিজেদেরকে পশুর স্তরে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই যুগের নীতিশাস্ত্রে এই উৎকট কুসংস্কার প্রধান স্থান দখল করে ছিল। সেন্ট জেরোম এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তি বৈরাগ্যবাদে সহজতা আনার চেষ্টা করেন। এই কৃচ্ছ সাধনার ফলে বহু লোক পাগল হয়ে যেতো। বহু লোক করতো আত্মহত্যা। মঠবাসীদের নির্জন প্রকোষ্ঠগুলোতে কান্না, বিলাপ এবং ফোপানীর এক ভয়ংকর পরিবেশ বিরাজ করতো। মঠবাসীরা কাল্পনিক অশরীরী শত্রুর ভীতিতে ছিলো বিহ্বল। (Leckey, op.cit ii PP. 107-112, 114; আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, **পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস**, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯০, পৃ: ৫৯-৬১)।

৩১২. কথিত আছে যে চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেন্ট পেখোমিয়াস তার অধীনে সাত হাজার মঠবাসী জড়ো করেন। সেন্ট জেরোম এর সময়ে ঈষ্টার উৎসবে পঞ্চাশ হাজার মঠবাসী একত্রিত হয়। নিট্রিয়ার একজন এবোটের অধীনেই ছিলো পাঁচ হাজার মঠবাসী। অক্সিরিনকাস নামের এক মিসরীয় শহরের প্রায় সবাই কৃচ্ছ জীবন যাত্রায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেয় এবং এদের মধ্যে বিশ হাজার কুমারী ও দশ হাজার মঠবাসী সন্ন্যাসী ছিলো। সেন্ট পেরাপিয়ানের অধীনে দশ হাজার মঠবাসী ছিলো। ৪র্থ শতকের শেষভাগে সারা মিসরে মঠবাসী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা শহর গুলোর সামগ্রিক জনসংখ্যার কাছাকাছি এসে দাড়ায়। (Leckey, Ibid. p: 105, 106; আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, **পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯)।

Dhaka University Institutional Repository

করা হত। চারপাশের সব স্বার্থ এবং মায়া মমতার বন্ধন ছিন্ন করাই ছিল বৈরাগ্যবাদের মূল কথা। এর প্রভাবে সংসার জীবনের পুণ্যের প্রতি এক নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। অসংখ্য সংসার ত্যাগী মানুষ তাদের পিতা মাতা, স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেরকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় আত্মার মুক্তি। তারা মনে করত যে পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করতে গেলে তাদের মনের একাগ্রতা নষ্ট হবে।[৩১৩]

---

[৩১৩]. গীর্জা ভক্তদেরকে প্রিয়জনদের প্রতি উদাসীন হবার জন্যে কি তালীম দেওয়া হত নীচের দুটো উদাহরণ থেকে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। **এক.** ইভাগ্রিয়াস দীর্ঘকাল যাবত নির্জন সন্ন্যাস জীবন যাপন করা কালে এক দিন তার বাবা-মার কাছ থেকে চিঠি পান। তিনি এটা পছন্দ করতে পারলেন না। কারণ এতে তার নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান নষ্ট হয়। তিনি চিঠি গুলো না পড়েই আগুনে ফেলে দেন। **দুই.** মিউটিয়াস নামক একব্যক্তি সব সম্পদ সম্পত্তি বর্জন করে আট বছরের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে মঠে ভর্তি হন। মঠবাসীরা তার মন ঠিক করার কাজে লেগে যায়। মিউটিয়াস ভুলে গেলেন যে একদিন তিনি খুব ধনী ছিলেন। আগামীতে তাকে ভুলে যেতে হবে যে তিনি সন্তানের পিতা ছিলেন। তার ছোট ছেলেকে তার কাছ থেকে আলাদা করে নেয়া হয়। ছেলেকে নোংরা কাপড় পরতে দেয়া হয়। তার ওপর চালানো হয় নানা ধরনের অত্যাচার। পিতা দেখতে থাকেন যে দিনের পর দিন দু:খ যন্ত্রনায় তার সন্তান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তার সুন্দর চেহারায় অশ্রু ধারা লেগেই থাকে এবং বেদনায় সে ফুপিয়ে কাঁদে। কিন্তু ধর্মের (ঈসা আলাইহিস সালাম) প্রতি পিতার ভালোবাসা এতো বেশী ছিলো যে এসব দেখেও তার মন গলেনি। তিনি তার সন্তানের চোখের পানির কথা ভাবতেন না। তিনি শুধু নিজের পূণ্য এবং উৎকর্ষ লাভের চিন্তাতেই বিভোর ছিলেন। অবশেষে এবোট তার ছেলেকে নদীতে নিক্ষেপ করার হুকুম দেন। পিতা সন্তানকে নদীতে ফেলে দেবার জন্যে নদীর দিকে অগ্রসর হন। তিনি ছেলেকে নদীতে ফেলার জন্যে উদ্যত হলে মঠবাসীরা ধরে ফেলে। (আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, **পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১-৬২)।

এরূপ অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত: প্রভু ভক্তদের মাঝে সংসার ত্যাগী, দয়া মায়াহীন, কষ্টকর জীবন যাপনের মনোভাব সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিলো মঠবাসী সন্নাসীরা। মেয়েদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আরো বেশী গুরুত্ব সহকারে অনুসৃত হয়। এই ক্ষেত্রে কেবল পারিবারিক মায়া মমতা দমন করাই লক্ষ্য ছিলো না, এর অন্যতম লক্ষ্য ছিলো নারীদের উপস্থিতিতে সম্ভাব্য বিপদের প্রতিরোধ।

তারা শুধু সাধারণ নারীকেই নয় বরং জন্মদাত্রী জননী এবং বোনদেরকেও জাহান্নামের শয়তান মনে করে তাদেরকে পরিহার করে চলতো। বর্ণিত আছে যে, ক্যালামা (সেন্ট জনের বোন) ভাইকে খুব ভালোবাসতেন এবং মরণের আগে ভাইকে একবার দেখার আকুতি জানালেন। ভাই আসবেনা জেনে বোন সংবাদ পাঠালেন যে, দুর্গম স্থানে গিয়ে তিনি তাকে দেখে আসবেন। এই সংবাদ পেয়ে সেন্ট বিচলিত হন এবং বোনকে এই মতলব ত্যাগ করতে বলেন। তিনি ছদ্মবেশে বোনের কাছে যান, বোনের হাত থেকে চেয়ে নিয়ে এক গ্লাস পানি খান এবং সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলে যান।

আরো বর্ণনা পাওয়া যায় যে, এক মায়ের সাত সন্তান ছিল। সকলেই মাকে পরিত্যাগ করে নির্জন বাসে চলে যায়। মা একবার সন্তানদেরকে দেখতে যায়। ওরা তখন তাদের প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে গীর্জার দিকে যাচ্ছিলো। মা তাদেরকে দেখে ফেলেন। তাকে দেখেই সন্তানেরা দৌড়ে প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ে। কম্পিত পদে মা তাদের নিকটে পৌছার আগেই এক ছেলে এসে গৃহদ্বার বন্ধ করে দেয়। বাইরে দাড়িয়ে বৃদ্ধা মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সেন্ট পোম্যান দরজার কাছে দাড়িয়ে বলেন, আপনি তো বুড়ো মানুষ। এমনভাবে কান্নাকাটি এবং হা হুতাশ করছেন কেন, মা ছেলের কণ্ঠস্বর চিনে বলেন, ওহে ছেলে, আমি তোমাদেরকে এক নজর দেখতে চাই। আমি দেখলে তোমাদের কি ক্ষতি হবে? আমি কি তোমাদের জন্মদাত্রী নই? আমি কি তোমাদেরকে দুধ পান করাইনি, আমি অতি বুড়ো। তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমার অন্তর তড়পাচ্ছে। মায়ের এত আকুলতা সত্ত্বেও সন্তানেরা গৃহদ্বার খুলতে রাজী হয়নি। বরং তারা মাকে জানালো যে, মৃত্যুর পর তাদের সাথে দেখা হবে।

সাইমন ষ্টাইলাইটস পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। পিতা-মাতা শোকে কাতর হয়ে পড়েন। অল্পকাল পরেই পিতা মারা যান। শোকাতুরা মা বেঁচে রইলেন। সাতাশ বছর পর সন্তানের অবস্থান স্থলের খবর পেয়ে তিনি তার সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু তিনি ভেতরে যাবার অনুমতি পাননি। মা বললেন, ছেলে, তুমি একি করলে? আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি। তুমি আমার অন্তর গুড়ো করে দিলে। আমি তোমাকে বুকের দুধ পান করিয়েছি। তুমি আমার চোখ পানিতে ভরে দিলে। আমি তোমাকে স্নেহ চুম্বন দিয়েছি তার পরিবর্তে তুমি আমাকে এই দু:খ দিলে। আমি তোমার লালন পালনের জন্যে কতোই না কষ্ট করেছি। আজ তুমি আমার সাথে এই নির্দয় আচরণ করলে। সেন্ট সংবাদ পাঠান যে তিনি শিগগির তার ছেলেকে দেখতে পাবেন। তিন দিন তিন রাত ধরে আম্মা অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। কিন্তু সন্তান মায়ের সাথে দেখা করেনি। অবশেষে অসহ্য দু:খ বেদনার ভার সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। (Leckey: op.cit ii, p: 125-126, 128, 129, 130; আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, **পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস**, প্রাগুক্ত. পৃ: ৬১-৬৩)।

Dhaka University Institutional Repository

বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টানজগতের সব উদ্দীপনাকে বিজন ভূমিতে নিয়ে যায় এবং সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে নির্লিপ্ততাকে আদর্শরূপে উপস্থাপন করে। এর ফলে অনেক মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। রাজা, পরিষদ এবং এই জাতীয় অন্যান্য লোকেরা নির্বিবাদে তাদের নৃশংস কাজ চালাতে থাকে।[৩১৪]

খ্রীষ্টান ধর্মে যৌনতাকে ভয়ের চোখে দেখা হত। কারণ তাদের কাছে নারী ছিল দানবীস্বরূপ। এই ধর্মে দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে এবং শরীরকে আত্মার শত্রু করে তোলা হয়েছে। এই বিশ্বাসে শরীরের সাথে সমস্ত সম্পর্কই পাপ ও অশুভ। খ্রীষ্টানদের কাছে দেহ আর মাংশ পাপ, তবে পুরুষের দেহ পাপ নয়, নারীর দেহই পাপ। খ্রীষ্টানদের চোখে নারীর শরীর প্রলোভনের সোনার কলস, তার দেহ শয়তান। নারীই পাপের পথে নিয়ে গেছে আদমকে। তাই খ্রীষ্টান সাহিত্য নারীর প্রতি ঘৃণা ও তিরস্কারে মুখর। তারতুলিয়ানের চোখে নারী পয়:প্রণালীর উপর নির্মিত প্রাসাদ। অগাস্টিন বলেছেন, "আমাদের জন্ম হয়েছে মলমুত্র থেকে।"[৩১৫] খৃষ্টান ধর্মে নারী জাতির উপর নির্মম, নিষ্ঠুর ও অমানবিক নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। তৎকালীন খৃষ্টীয় সমাজে নারী নির্যাতনের চিত্র ছিল নিম্নরূপ:

পোপ শাসিত রোম সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে। দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে বেঁধে হেচড়ানো হয়েছে এবং মজবুত স্তম্ভে বেধে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে।[৩১৬] উইল ডুরান্ট বলেন "খৃষ্টান সমাজে পথিনাস এর পরেই ছিল এটলাস এর স্থান। তাকে উত্তপ্ত লোহার চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দেয়া হয় এবং জলে পুড়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ব্যান্ডিনা নাম্নী এক দাসী মেয়েকে সারাদিন নিপীড়ন করা হয়, তারপর তাকে একটা বস্তার ভেতরে ঢুকিয়ে শিংয়ের গুতো খেয়ে মরবার জন্য ষাড়ের সামনে ফেলে দেয়া হয়।"[৩১৭]

ড. এসপ্রিঙ্গ[৩১৮] (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্য যুগে নারী জাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। সেই পরিষদ নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালাবার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এই আইনের বলে খ্রীষ্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।"[৩১৯]

হাজার হাজার নির্দোষ সুন্দরী নারীকে শুধু নারী হওয়ার অপরাধে এবং কন্যা সন্তান প্রসবের অভিযোগে জীবিত অবস্থায় আগুনে পোড়ানো ও ফাঁসিতে ঝুলানো হত। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মত থাকতে হত, সে কোন আমানত রাখতে পারত না এবং কোন কিছুর স্বাক্ষী ও শিক্ষক হতে পারত না। বিবাহিত স্ত্রী ও তার সকল সম্পত্তি স্বামীর ব্যবহারে চলে যেত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রকারের অধিকার ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করলে বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমন কি, স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতে পারত। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর ভাসুরদের তার উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত। নারীরা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত না।[৩২০]

---

৩১৪. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, **পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩।

৩১৫. দ্যা বোভোয়ার, ১৯৪৯, পৃ: ২১৯-২২০; সরকার শাহাবুদ্দিন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১। খ্রিষ্ট জগতে সেন্ট বার্নার্ডশ, সেন্ট সিপিল, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জেরোম প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মনীষীদের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। তাদের বাণী ঈসায়ীরা বিশেষভাবে পালন করে থাকে। এই মনীষীরা নারী চরিত্রের যে লজ্জাকর ছবি একেছেন তা খুবই দু:খজনক। তারা লিখেছেন, "নারী শয়তানের শক্তি, অজগর সাপের মত রক্তপিপাসু, তার মধ্যে সাপের বিষ নিহিত আছে। সমস্ত নৈতিক ত্রুটির মূল উৎস, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র, দংশোন্মুখ বিচ্ছু এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মনের উপর শয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নারী শয়তানের সাহায্যকারিণী।" (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১)।

৩১৬. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫।

৩১৭. Will Durant, **The story of Civilization**, p: 649.

৩১৮. ড. এসপ্রিঙ্গ জার্মানির অধিবাসী। তিনি আরবী ভাষায় একজন অভিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালও ছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকাকালে 'ইসাবা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৩১৯. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত. পৃ: ১০।

৩২০. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসূতি আইন অত্যন্ত কঠিন ছিল। সন্তান প্রসবের পর নির্দিষ্ট সময় বা কাল পর্যন্ত নারীকে অস্পৃশ্য অপবিত্র বলে ধরা হতো। কন্যা সন্তান প্রসব করলে এই নির্দিষ্ট সময়টি দ্বিগুণে পরিণত হত।[৩২১] নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা এবং তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই ধারা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। এমনকি ১৮০৫ সাল পর্যন্তও বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেনস।[৩২২]

খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অধিবেশনে সর্ব সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, "Woman has no soul" - "নারীর কোন আত্মা নেই।"[৩২৩] এবং দোযখ হল তার বাসস্থান। তবে এর ব্যতিক্রম হল হযরত মরিয়ম (আ:)।[৩২৪]

নারী মানুষ কিনা- এই বিষয় আলোচনার জন্য তাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে, তবে পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩২৫] প্রাচীন ভারতে পুরুষ নারীকে দাসীর ন্যায় রাখত এবং স্বামীকে প্রভু বা ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে হত। খ্রীষ্টধর্মেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বরং উভয় জাতিই নারী সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করে।[৩২৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতার জীবন যাপন থেকে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করা হলো তখনও নারীর মর্যাদা সংরক্ষিত হয়নি। ফরাসী নাগরিক আইনে নারী অবিবাহিতা হলে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হল। এ আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী, শিশু ও পাগল এই তিন শ্রেণীর মানুষ অধিকারহীন ও দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত ছিল।[৩২৭]

ইংরেজী সাধারণ আইনে স্ত্রীকে ফেলা হয় শিশু, নির্বোধ ও বদ্ধ পাগলের দলে। যে অক্ষম নিজের দায়িত্ব নিতে পারে না, যার নেই কোন বিবেচনা শক্তি। এখানে অস্তিত্বলোপের অর্থ খুবই ভীতিকর। এতে স্বামীকে দেয়া হয় স্ত্রীর শরীরের সম্পূর্ণ মালিকানা, স্বামী ঐ সম্পত্তি ভোগ করতে পারে যথেচ্ছভাবে, স্বামী পিটাতে পারে স্ত্রীকে, তবে খুব ভয়ংকর বা নিষ্ঠুরভাবে নয়। দরকার মনে করলে স্বামী স্ত্রীকে আটকে রাখতে পারে। তবে সে স্ত্রীকে কারারুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অস্তিত্বলীনের অর্থ হচ্ছে স্বামী বা কারো বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার কোন অধিকার নারীর নেই। সে কারো সাথে কোন চুক্তি সম্পাদনের অধিকারী নয়। ঋণ আদায়ের জন্য সে মামলা করতে পারে না। কারো বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনতে পারে না। অর্থাৎ বিয়ের সাথে বাতিল হয়ে যায় নারীর নাগরিক অধিকার, আইনের চোখে হয়ে ওঠে অস্তিত্বহীন। বিয়ের সময় নারীর যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তা পরিণত হয় স্বামীর সম্পত্তিতে আর স্ত্রী হয় স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি। বিনিময়ে স্বামী তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। তার ভরণ পোষণ দান করে। স্বামীর এই অধিকার শুধু বিবাহিত কালের নয়, ১৮৫৭ সালের আগে বিবাহ বিচ্ছেদের পরও স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার থাকত। ১৮৩৭ সালের আগে সন্তানের উপর মায়ের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। ইংরেজী

---

[৩২১]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।

[৩২২]. ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে পাঁচশো পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। এ বিষয়ে আদালতে মামলা হলে ঐ ব্যক্তির উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলে, বৃটিশ আইন একশো বছর আগে স্বামীকে নিজের স্ত্রী বিক্রি করার অনুমতি দিত। আদালত জবাবে বলে, এই আইন ১৮০৫ সালে বাতিল হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। অবশেষে আদালত উক্ত স্বামীকে দশ মাসের কারাদন্ড প্রদান করে। (ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫)। ১৯৩০ সালে জনৈক ইটালীয় স্ত্রীকে কিস্তিতে বিক্রি করে। শেষের দিকের কয়েক কিস্তি বাকী থাকতে ক্রেতা দাম পরিশোধ করা বন্ধ করলে বিক্রেতা তাকে হত্যা করে। (**মাজাল্লাতু হাযারাতিল ইসলাম**, ২য় বর্ষ, পৃ: ১০৭৮; ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত. পৃ: ১৫)।

[৩২৩]. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫।

[৩২৪]. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত. পৃ: ১৪-১৫।

[৩২৫]. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।

[৩২৬]. আবদুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, প্রাগুক্ত. পৃ: ১৪-১৫।

[৩২৭]. মূল: ড. আশ শাইখ মুসতাফা আস্ সিবায়ী, **আল মারআতু বাইনাশ শারীয়াতি ওয়াল কানুন**, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, **ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী**, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮), পৃ: ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ আইন একজন নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা পাওয়ার, মায়ের সম্মান পাওয়ার, কন্যার স্নেহ পাওয়ার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। ফলে নারী হয়েছিল স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ও দাসী।[৩২৮]

বর্তমান বিশ্বে সভ্যতার দাবীদার খ্রীষ্ট ধর্মেও নারীকে দেখা হয় পাপের প্রতীক হিসেবে।[৩২৯] তারা নারীদের কোন রকম শ্রদ্ধা, দয়া ও ভালবাসার অধিকারিণী বলে স্বীকার করে না। খ্রীষ্টানরা মূলতঃ দুটি কারণে নারী জাতির প্রতি ক্রোধান্বিত। **প্রথম কারণঃ** হযরত হাওয়া (আ:) নিজে নিষিদ্ধ ফল খেয়েছে আবার হযরত আদম (আ:) কে খাওয়ালো, তারই কারণে পুরুষকেও বেহেশত হতে বের করে দেওয়া হলো। **দ্বিতীয় কারণ:** নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই হযরত ঈসা (আ:) এর মতো একজন শুদ্ধ মানুষের ক্রুশবিদ্ধ হতে হল। তাদের ভাষায় পাপ ও ঈসা (আ:) এর হত্যা উভয়েরই মূল কারণ নারী, কাজেই সেই দোষী। এই মনগড়া কথা ও ধারণার কারণেই তারা আবহমানকাল থেকে নারীকে হীন জীব বলে মনে করে আসছে। এই কারণেই নারীদেরকে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করা তো দুরের কথা নারীর প্রতি অত্যাচার, যুলুম বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।[৩৩০]

অবশেষে মার্টিন লুথার[৩৩১] নামের একজন সমাজ সংস্কারক খ্রীষ্ট সমাজে শান্তির দূত হিসেবে পৃথিবীতে এলেন। তিনি নারীদের প্রতি এই জুলুম অত্যাচার ও অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ঈসায়ী দুনিয়ার এক মহা পরিবর্তন আনয়ন করলেন। মার্টিন লুথারের প্রচারের ফলে জনসাধারণ বুঝতে পারল যে, এতোদিন ধর্মের নামে যা শোনানো হয়েছিল তা কোন ধর্মের বিধান ছিল না বরং তা ছিল পাদ্রীদের মনগড়া বিধান। সর্বজনের বিশ্বাসও তাই যে, এক খোদায়ী ধর্ম কখনো মানবজাতির একাংশ স্ত্রী জাতির বিরুদ্ধে এত বিষ উদগীরণ করতে পারে না। ঈসা (আ:) এর মত দয়ার আধার নবী এ ধরনের শিক্ষা দিতে পারেন না।[৩৩২] তাছাড়া মূল বা আসল ইঞ্জিল কিতাবের অস্তিত্ব এখন নেই বললেই চলে। বর্তমান ইঞ্জিল শরীফ পরিবর্তিত ও সংশোধিত ইঞ্জিলের সংস্করণ।[৩৩৩]

---

৩২৮. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭-২৮।

৩২৯. খ্রীষ্টান সম্প্রদায় মনে করে মা হযরত হাওয়া (আ:) এর ভুলের কারণে নারীর রক্তে পাপ স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে। মানব শরীরে মাতৃ রক্তের অংশ থাকে বলে সন্তানও পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই পাপ সৃষ্টি বহুদিন থেকে চলে আসছিল। তাই পৃথিবীতে এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির আগমনের প্রয়োজন ছিল যিনি নিজ রক্ত দানে মানবের পাপ ধুয়ে মুছে দিতে পারেন। হযরত ঈসা (আ:) ঐ মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি শূল বরণ করে আত্ম কুরবাণী দ্বারা মানুষের এই পাপ ও কলংক মিটিয়ে ছিলেন। মা হাওয়া (আ:) এর কৃত পাপের কলংক ঘুচাবার এছাড়া আর কোন পথ ছিল না। (নাউযুবিল্লাহ) (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫)।

খ্রীষ্টানদের চোখে নারীর শরীর এতই পাপীয়সী যে, তারা যিশুকে জন্ম দিয়েছে কুমারীর গর্ভ থেকে। ঐ ধর্মের অনেকের মতে, মেরী নারীদের মত স্বাভাবিক রীতিতে যীশুকে জন্ম দেয়নি। অ্যামব্রোস ও অগাস্টিনের মতে, মেরীর রুদ্ধ দেহ থেকেই জন্ম হয়েছিল জেসাসের। খ্রীষ্টানদের কাছে নারীর দেহ কলংকিত। তাই তারা মেরীর দেহ থেকে নি:শেষে বের করে দিয়েছে কামকে, তাকে পরিণত করেছে এক কামশুণ্য বিদেহী নারীতে। খ্রীস্টানরা তাই দানবীকে রূপান্তরিত করেছে দেবীতে; তারা পাপী প্রলোভনকারিণী হাওয়াকে ধুয়ে মুছে তৈরী করেছে পাপমুক্ত মেরীকে। নারীকে তারা করে তুলেছে গৃহ গির্জার থাম। এ প্রক্রিয়ায় নারীর শরীর থেকে ছেঁকে ফেলে দেয়া হয়েছে কাম। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫)।

৩৩০. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

৩৩১. বর্তমান খ্রিষ্টিয় সভ্যতার উৎপত্তি ৮ম শতাব্দীতে স্পেনীয় মুসলমানদের কল্যাণেই হয়েছে। তখন খ্রিস্টান দুনিয়ার চতুর্দিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ইউরোপ ও ঈসায়ী দুনিয়ায় সংস্কারের প্রেরণা সৃষ্টি বা মার্টিন লুথারের মত সংস্কারকের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নারী জাতির তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। কারণ পুরানো কিংবদন্তিগুলো মানুষের শিরায় শিরায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তাদের চোখের উপর গোড়ামির মজবুত পট্টি বাধা ছিল। (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯)।

৩৩২. ইসহাক ওবায়দী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।

৩৩৩. খ্রিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে আলেকজান্ডার রাসেল বলেছেন “পশ্চিমা খ্রিষ্টীয় সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে মানব মনের উপর কোন দাগ কাটতে পারেনি। কারণ তারা স্বার্থপরতা ও ভোগাসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।” (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত. পৃঃ ২৮)।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরবসভ্যতায় নারীর অবস্থান

রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবভুমির[৩৩৪] সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।[৩৩৫] ঐতিহাসিকগণ এই সময়কে 'আল আয়্যামুল

---

[৩৩৪]. এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম কোনে অবস্থিত বিস্তীর্ণ মরুময় ভুখন্ড নিয়ে যে দেশগুলি গঠিত তাকে জাজিরাতুল আরব বা আরবের দ্বীপ বলা হয়। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। এককভাবে কোন আরবী গ্রন্থেই আরবের সঠিক ও পরিপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আরবি ভাষায় আল-হামদানী (মৃ: ৩৩৪/৯৪৫-৪৬ খ্রীঃ) প্রণীত 'সিফাত জাজিরাতুল আরাব' গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ। (**ইসলামী বিশ্বকোষ**, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, একাদশ খন্ড, ১৯৯২, খ্রিঃ, পৃঃ ৩৭৬)।

আরব উপদ্বীপ বা আরব দেশ এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি বিরাট ভু-ভাগ। মৃত্তিকা, জলবায়ু এবং অধিবাসীর আকৃতি অনুসারে এটা অনেক অংশে বিভক্ত। আরব দেশের আয়তন তের লক্ষ বর্গমাইল। যার মধ্যে পাঁচ লাখ বর্গমাইল কেবল উষর মরু অঞ্চল যেখানে কোন বসতি নেই। সর্বাধিক খ্যাত মরুভুমিটি 'আল রাবউল খালী বা আল দাহনা' নামে পরিচিত। এর আয়তন আড়াই লাখ বর্গ মাইল। মরুভুমির উত্তরে বাহরায়নের 'আল হাসায়া' প্রদেশ। এর উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, অতি প্রাচীনকালে ইডোমীয় ও মিডিয়ানীয় নামক জাতিগুলি এখানে বাস করত। এর দক্ষিণে হিজাজ প্রদেশ। প্রাচীনকালে এই প্রদেশে ইয়াসরিব নামে অভিহিত বিখ্যাত মদীনা নগরী, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্মস্থান মক্কা নগরী এবং জিদ্দা বন্দর অবস্থিত। হিজাজ উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পূর্বে সুয়েজ হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নাম 'ইয়ামন'। হিজাজ এবং ইয়ামনের নিম্ন অংশকে 'তিহামা' বলা হয়, হিজাজের দক্ষিণ অংশ ও কখনো কখনো উক্ত নামে অভিহিত হয়। ইয়ামনের পূর্বদিকে 'হাদরা মৌত'। ইহা ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে উম্মান উপসাগরের তীরে উম্মান অবস্থিত। হিজাজ প্রদেশের পর্বতমালা হতে পূর্বদিকে পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত আল আহ্সা ও আল বাহরায়ন নামক মরুভুমি পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চ ভুখন্ডকে 'নজদ' বলে। এই ভুখন্ড মরুভুমি ও ক্ষুদ্র পর্বতে সমাকীর্ণ; তবে এর বিভিন্ন স্থানে মরুদ্যান থাকায় ভীষণ অগ্নিময় মরুভুমির মধ্যে এটা উত্তম আশ্রয়স্থল। হিজাজ ও নজদ সউদ রাজবংশ কর্তৃক শাসিত। ইয়ামন ও স্বাধীন আরব রাজ্য উম্মান মস্কতের সুলতানের অধীন। (মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, **ইসলামের ইতিহাস**, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃঃ ৪৯-৫০; সৈয়দ আমীর আলী, **আরব জাতির ইতিহাস**, (মুলঃ হিষ্ট্রি অফ সারা সিনস), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪, পৃঃ ১)।

আরবদেশের এই বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে কোন বাণিজ্যপোযোগী বা উল্লেখযোগ্য নদ-নদী নেই। স্থানে স্থানে যে ক্ষুদ্র নদী আছে সেগুলি সেই স্থান সমুহের মাটি উর্বর করে মাত্র। প্রায় গোটা দেশটাই উষর মরুভুমি ও অনুর্বর ভুমি নিয়ে গঠিত। এখানে বৃষ্টি হয় না বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল স্থানে বৃষ্টি হয় সেই সমস্ত স্থান ব্যতীত অধিকাংশ স্থানই শুষ্ক, রৌদ্রদগ্ধ এবং ফল-পুস্প ও বৃক্ষলতা শূণ্য, কিন্তু যে সমস্ত স্থানে জল পাওয়া যায় সে স্থান সমূহ উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে কিছু কিছু তরুলতা ও মানুষের বসবাস পরিলক্ষিত হয়। পানি শূন্যতার জন্য দেশটির মধ্যবর্তী অঞ্চল সমূহ মানুষ বসবাসের অনুপোযোগী। তাই অধিকাংশ জনপদ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে অবস্থিত। দেশটির প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দশজন লোকের বসবাস। রৌদ্রের প্রখরতা খুব বেশী, এত প্রচন্ড লু হাওয়া দেশটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যে, এ হাওয়াকে সাইমুম বা বিষাক্ত বায়ু বলা হয়ে থাকে। মরু হাওয়া যে প্রণীটির একান্তই গা সওয়া সেই উটও এ হাওয়ার সম্মুখে অসহায়। লু হাওয়ার এক ঝটকাতেই উট প্রাণ হারায়। শত শত মাইলের মধ্যে পানির সন্ধান পাওয়া যায় না। উট হচ্ছে চলাচলের একমাত্র বাহন। তাই একে মরুভুমির জাহাজ বলা হয়। এর পিঠে চড়েই মানুষকে দুর দুরান্তে সফর করতে হয়। খেজুর ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ফসল সেখানে জন্মায় না। সে দেশের অধিবাসীরা উটের দুধ ও খেজুর খেয়েই জীবন ধারণ করে। অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ যাযাবর জীবনযাপন করে। এজন্যে দেশটিতে বড় বড় শহরের সংখ্যা কম। (সৈয়দ আমীর আলী, **আরব জাতির ইতিহাস**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪, পৃঃ ১;, মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবদী, **ইসলামের ইতিহাস**, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃঃ ৪৯-৫১)।

[৩৩৫]. **আরবদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ**

সামাজিক অবস্থাঃ বংশ গরিমাঃ আরবদের মধ্যে স্বভাবতঃই দুটি বস্তুর প্রসার ঘটে। **প্রথমতঃ** দীর্ঘ অবসর ও রাতের উন্মুক্ত আকাশের নীচে কর্মহীনতা ও দীর্ঘ অবকাশ তাদের মধ্যে কাব্যচর্চার উন্মেষ ঘটায়। **দ্বিতীয়তঃ** স্বাধিকার রক্ষার অব্যাহত অনুশীলন ও সহিষ্ণুতার অভ্যাস তাদেরকে যুদ্ধবাজ ও কথায় কথায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহকে দীর্ঘায়িত করার জন্যে তারা আত্মপ্রশংসা ও বংশ গৌরব প্রকাশের দিকেও অতিমাত্রায়

Dhaka University Institutional Repository

ঝুঁকে পড়ে। অহমিকা প্রকাশ ও নিজের মাহাত্ম প্রকাশের জন্য বীরত্ব ও বদান্যতা ছিল দুটি আকর্ষণীয় ব্যাপার। নিষ্ক্রিয়তা ও কাব্যিকতা তাদেরকে প্রেম নিবেদনে এবং সচ্ছল লোকদেরকে মদ্যপানে উদ্বুদ্ধ করত। বীরত্ব ও বদান্যতা তাদেরকে প্রথম শ্রেণীর অতিথিপরায়ণ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অভ্যস্ত করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে। জুয়া, তীরন্দাজী, মুশায়েরা (কবিসভা), বংশ মর্যাদার অহমিকা প্রকাশে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি ছিলো তাদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। মোটকথা আরবের নি:সর্গ ও আবহাওয়া মনের অজান্তেই তাদের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চরিত্র গড়ে তুলেছিলো। আরববাসীদের বেশীরভাগ লোকই যাযাবর জীবনযাপন করতো এবং তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। আরববাসীরা তাদের বংশপঞ্জী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতো। পিতৃপুরুষের নামধাম ও কীর্তি তারা গর্ব সহকারে প্রকাশ করতো এবং একেই তারা যুদ্ধ বিগ্রহে বীরত্ব প্রদর্শন উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতো। দেশের আবহাওয়ার প্রভাবেই হোক বা বংশপঞ্জী মুখস্থ রাখার আগ্রহেই হোক আরবদের স্মৃতি শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কয়েকশ পংক্তির কবিতা তারা দু একবার শুনে অনায়াসে মুখস্থ বলে দিতে পারতো। কাব্যচর্চা তাদের ভাষাকে এমনি উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই তারা অনারবদেরকে 'আজমী' বা 'বোবা' বলে অভিহিত করতো।

শান্তির মাসসমূহ: বছরে এক বা একাধিক মাস তারা শান্তিকাল বলে নির্ধারিত করে রাখতো, যখন যুদ্ধবিগ্রহ করাকে তারা অবৈধ জ্ঞান করতো। এ সময়ে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ মুলতবী থাকতো। এ অবকাশে বসতো বড় বড় মেলা। অনুষ্ঠিত হতো মুশায়েরা বা কবিসভা। এ সুযোগে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিতো। এবং এটাই ছিল তৎকালীন আরব সমাজের ভাল দিক।

ধর্মীয় অবস্থা: ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন গোত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলো না। আবার তাদের কেউ কেউ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও পরকালে এবং হিসাব-নিকাশে তারা বিশ্বাস করতো না। মূর্তিপুজক ও নক্ষত্র পুজারীদের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। কোন কোন গোত্রের মধ্যে অগ্নি উপাসনারও প্রচলন ছিলো। খানা কাবাকে তারা মুর্তিপুজার কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছিলো এবং সেখানে তারা তিনশ ষাটটি মুর্তি স্থাপন করেছিলো।

মুর্তিপুজা: আরবের সর্বত্র ব্যাপকভাবে মুর্তিপুজার প্রচলন ছিলো। নবী করিম (স.) এর জন্মের চারশ বছর পূর্বে পারস্য সম্রাট শাপূরের শাসনামলে হিজাযের বাদশাহ আমর ইবন লুহা সর্বপ্রথম খানা কা'বার ছাদে হুবল নামের মুর্তি এবং যমযম কুপের ধারে আসাফ ও নায়িলা নামের দুটি মুর্তি রেখে সেগুলোর পুজার জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করে। এছাড়াও ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর, উদ্দ, সুওয়া প্রভৃতির দেবমুর্তির পুজা করতো এবং প্রত্যেক কাবীলার (গোত্র) নিজস্ব স্বতন্ত্র দেবমূর্তি ছিলো।

কুরবানী : পৌত্তলিকরা যখন হজ্জে আসতো, তখন তারা কুরবানীর জন্য উটও নিয়ে আসতো। সে সব উটের গলায় পরিচিতি স্বরূপ তারা জুতা লটকিয়ে দিতো এবং সেগুলোর কুজ যখম করে দিতো। তা দেখলেই লোকে বুঝতে পারতো যে এগুলো কুরবানীর উট। তখন কেউ আর এগুলোর কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতো না। উটের বাচ্চা, ভেড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু তারা মুর্তির নামে উৎসর্গ করতো। কোন কোন গোত্রের লোকজন এসব মুর্তির জন্যে নরবলি পর্যন্ত দিতো। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আরবের মুর্তি পুজারিরা তাওহীদেও বিশ্বাসী ছিলো এবং এক আল্লাহকে জানতো। তারা উক্ত মুর্তিগুলোকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী বলে পুজো করতো। এদের মধ্যে কোন কোন কাবীলার লোকজনের এরূপ বিশ্বাস ছিলো যে, কোন মৃত ব্যক্তির কবরে উটনী যবাই করে দিলে সেই উটনীর পিঠে সাওয়ার হয়ে ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে উত্থিত হবে। তাদের এ বিশ্বাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা পুনরুত্থানে এবং শেষ বিচারের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিল।

নক্ষত্র পুজা: জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে নক্ষত্র পুজার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। প্রত্যেক গোত্র পৃথকভাবে নক্ষত্র পূজা করত। হামীর গোত্র সূর্যের, কিনানা গোত্র চাঁদের, তামীম গোত্র ওহরানের, লুখাম ও জুযাম গোত্র বৃহস্পতি গ্রহের, তাঈ গোত্র সুহায়ল নামক নক্ষত্রের, কায়স গোত্র লুব্ধক নক্ষত্রের এবং আসাদ গোত্র বুধ গ্রহের পুজা করতো। গ্রহ-নক্ষত্রের নামে অধিকাংশ গোত্রের দেবমুর্তির নামকরণ করা হত। তবে প্রস্তর নির্মিত মুর্তি ও বিখ্যাত গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর পুজা বিভিন্ন গোত্র যৌথভাবেই করতো। নক্ষত্র পুজারীদের মধ্যে চাঁদের পুজারী সংখ্যাই ছিলো সর্বাধিক এবং চাঁদই ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় উপাস্য।

কিহানত (ভবিষ্যত বলা): আরবে কাহিন বা গণৎকারদের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। কাহিন বলা হতো ঐ সব লোককে যারা গুপ্ত রহস্য ও অদৃশ্য জগতের সংবাদ জানার দাবী করতো। যারা অতীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সংবাদ দিতো তাদেরকে কাহিন এবং যারা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ঘটনার সংবাদ দিতো তাদেরকে আরাফ বলা হতো। অদৃশ্য জগতের সংবাদ যারা দিতো তাদের মধ্যে নারীপুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলো। আফআ জায়ীমা, আবরাশ, শিক, সাতীহ প্রমুখ ছিলো সেকালের আরবের নামকরা গণৎকার। গণৎকারদের একটি শ্রেণী ছিলো যাদেরকে নাযির বা দ্রষ্টা বলা হতো। এরা দর্পণে বা পানিভর্তি পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অদৃশ্য জগতের সংবাদ বলে দিতো অথবা পশুপক্ষীর অস্থি, যকৃত প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করতো। এদের মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপকারী এবং বীজ নিক্ষেপকারী গণৎকারও ছিল । কিন্তু এদের মর্যাদা আরাফ এবং কাহিনদের চাইতে কম বলে গণ্য হতো। তাবীয বা ঝাঁড়ফুঁককারীদের মর্যাদা তাদের চেয়েও নীচে ছিলো।

ফাল (ভাগ্যপরীক্ষা): অন্ধকার যুগে আরবদেশে সুলক্ষণ এবং কুলক্ষণ পরীক্ষা করার বহুল প্রচলন ছিলো। কাককে তারা খুবই কুলক্ষণে বলে মনে করতো এবং একে বিরহ বিচ্ছেদের হেতু বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিলো যে, কাকের প্রভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ বিরহ বিচ্ছেদের কবলে পড়ে দুর্ভোগের শিকার হয়। তারা পেঁচাকেও অত্যন্ত অলক্ষুণে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিলো যে, পেঁচা শব্দ করলে মানুষের মৃত্যু এবং ধ্বংস অনিবার্য। তারা হাঁচি দেওয়াকেও কুলক্ষুণে মনে করতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক যাদুকরও ছিল। তারা একে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতো অসাধ্য সাধনের উদ্দেশ্যে, শয়তানকে বশীভুত করার জন্যে তারা অনেক কঠোর সাধনায় লিপ্ত হতো।

যুদ্ধপ্রীতি: অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথায় কথায় তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হতো। আর একবার যুদ্ধের সুত্রপাত হলে তা কয়েক পুরুষ এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। তাদের যুদ্ধ সমূহের মধ্যে এমন কোন যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না যা কোন সঙ্গত কারণে বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছিল।

প্রেম-প্রীতি: আরব জাহেলিয়া সমাজে পর্দার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। তাদের নারীরা স্বল্প বসন পরিধান করে পুরুষদের সম্মুখে যাওয়া আসা করতো। জীবন যাত্রার সর্বক্ষেত্রে প্রেম-প্রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। অবস্থা এরূপ ছিল যে, যে ব্যক্তির কোন রমণীর সাথে কোন দিন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতো না আরব সমাজে ঐ ব্যক্তি চরম নীচ ও অভদ্র বলে বিবেচিত হতো। আরবের কোন কোন কাবীলা প্রেমলীলার জন্য বিখ্যাত ছিলো।

কাব্যচর্চা: আরব জাহিলিয়াতে এমন কোন লোক ছিলো না যার মধ্যে কাব্যিকতা ছিল না। নারী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই কিছু না কিছু কাব্যিকতার অধিকার এবং অভ্যাস ছিল। যেন তারা মাতৃগর্ভ থেকেই কবি হয়ে জন্মাত। সাধারণত: তাদের কবিতা হতো তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতা রচনার জন্যে চিন্তা ভাবনা করা বা কল্পনার আশ্রয় নেয়ার আদৌ প্রয়োজন হতো না। তাদের ভাষাসৌন্দর্য ও কাব্যিকতার এমনি গর্ব ছিল যে, গোটা বিশ্বের সকল অনারব লোককে তারা বোবা মনে করতো। কিন্তু কুর'আন শরীফ অবতীর্ণ হয়ে আরবদের দর্পকে চিরতরে চূর্ণ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই কাব্যিকতা ও ভাষা সৌন্দর্যের জন্য দর্পকারী আরবরা আল্লাহর বাণীর অভূতপূর্ব ভাষা, সৌন্দর্য্য ও লালিত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

শিকার: জহিলিয়া যুগের আরবরা ছিলো অত্যন্ত শিকার প্রিয়। এজন্যে আরবী ভাষায় শিকারের অনেক প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। যে শিকার ডান দিক থেকে এসে বাম দিকে চলে যেতো তাকে বলা হতো 'সালিখ', আবার যে শিকার বাম দিক থেকে এসে ডান দিকে চলে যেতো তাকে 'বারিহ' বলা হতো। যে শিকার সম্মুখ দিক থেকে আসে তাকে 'নাতিহ' আবার যে শিকার পিছন দিক থেকে আসে তাকে 'কাঈদ' বলা হতো। শিকারের জন্য শিকারী যেখানে ওঁৎ পেতে থাকে তাকে 'কুত্রাহ' বলা হতো। আবার বাঘ শিকারের জন্য যে গর্ত খনন করা হতো তাকে বলা হতো 'যাবিয়া'। শিকার জন্তু লক্ষ্য করে পেটের উপর ভর দিয়ে মাটি কামড়ে এগিয়ে যাওয়াকে 'তালবুদ' এবং শিকারীর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসাকে 'আখদাক' বলা হতো। তারা যে জন্তুই শিকার করতো তাই নির্বিচারে খেয়ে ফেলত। হালাল হারামের কোন বাছ বিচার করতো না। পরবর্তীতে ইসলাম হারাম হালালের শর্ত আরোপ করে এবং শিকারের মধ্যে নিয়মকানুন প্রবর্তন করে।

পোশাক পরিচ্ছদ ও খাবার-দাবার: সাধারণভাবে আরববাসীদের পোশাক অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর ছিল। মোটা কাপড়ের জামায় চর্মের তালি লাগিয়ে পরা ছিল সাধারণ ব্যাপার। কেউ কেউ চামড়ার ছোট ছোট টুকরা জোড়া দিয়ে চাদর বানিয়ে নিত। এবং এটাকে নির্দ্বিধায় তারা চাদর ও বিছানারূপে ব্যবহার করতো। উট ও ভেড়ার লোম দিয়েও কাপড় তৈরী করতো। ঢিলেঢালা লম্বা কোর্তা ও লুঙ্গি এবং মাথায় রুমাল ও পাগড়ী ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সুবাসিত কাঠ, আম্বর, লোবান ও কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত ছিল। আরবদের খাবারও ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরবিহীন। নিরস ও বিস্বাদ খাদ্যেই তারা তৃপ্ত থাকতো। গোশত ছিল তাদের সবচাইতে প্রিয়, মূল্যবান ও সুস্বাদু খাদ্য। দুধ, গোশত, চীনা প্রভৃতি ছিল দেশের সাধারণ খাদ্য। পনীর, যবের ছাতু, খেজুর, জয়তুন তৈল হারীর প্রভৃতির ব্যবহার চালু ছিল। টিড্ডি ফড়িংও তারা খেতো যা ঐ দেশে প্রচুর পাওয়া যেতো।

লুণ্ঠন ও রাহাজানি: আরবদেশে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত ও যাযাবর এ দুশ্রেণীর লোক বাস করতো। আর এদের মধ্যে যাযাবরদের সংখ্যাই ছিল অধিক। শহুরে লোকদের মধ্যে যদিও প্রতিবেশীর অধিকার সচেতনতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণ ছিল, তথাপি ব্যবসায় প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। বেদুঈন শ্রেণীর লোকরা ডাকাতি রাহাজানি তস্করবৃত্তিতে ছিলো অত্যন্ত পারদর্শী। পথচারীদেরকে লুটপাট করে তাদের যথা সর্বস্ব অপহরণ করা ছিলো সকলের সাধারণ অভ্যাস। কোন পথচারীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পেলে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে দাসরূপে বিক্রি করে দিত।

বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা: যদি কোন হত্যাকারী বা প্রতিপক্ষের জীবদ্দশায় তাকে কাবুতে পাওয়া না যেতো তা হলে তার পুত্র, পৌত্র বা নিকটাত্মীয়কে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়া হতো এবং প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত অস্থিরতার অন্ত থাকতো না। শত্রুতার হেতু স্মরণ না থাকলেও শত্রুতা যে আছে তা সর্বদা স্মরণ থাকতো। অনেকে শুধু এজন্যেই নিহত হতো যে হত্যাকারী গোত্রের সাথে তাদের গোত্রীয় শত্রুতা আছে, কিন্তু সে শত্রুতার হেতু কি তা তারা বলতে পারতো না।

শোক বিলাপ: যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হতো তখন তার নিকটাত্মীয়রা ললাট ঘর্ষণ করে এবং মাথার চুল ছিড়ে হায় হায় করে বিলাপ করতো। মহিলার চুলের বেণী খুলে মাথায় মাটি মেখে শবদেহের পিছু পিছু চলতো যেমনটি ভারতের হিন্দুরা তাদের মৃত জনকের (পিতা) শোকে চুল ও গোফ দাড়ি মুন্ডন করে শোক পালন করে। জাহিলিয়াতের যুগে আরবে মাতমকারিণী মহিলাদেরকে ভাড়া করে বিলাপের জন্যে নিয়ে আসা হতো। তারা অত্যন্ত জোরেসোরে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলিয়াহ'[৩৩৬] বা অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। জাহিল অর্থ আল্লাহ, নবী এবং শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং জাহিলিয়া কে অজ্ঞানতা ধর্মহীনতার যুগ হিসেবে কুর'আনের তাফসীরকারকগণ আখ্যায়িত করেন। কুর'আন মজিদে 'জাহিলিয়া' শব্দটি চারবার উল্লিখিত হয়েছে।[৩৩৭] এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আরবরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজ খেয়ালখুশী মত চলত। তাদের নৈতিক চরিত্র অবনতির চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল। তারা পরস্ত্রী সম্ভোগ করত আর তা নিয়ে অলংকারিক ভাষায় কবিতা লিখত।[৩৩৮] এই শালীনতা বিবর্জিত কবিতা কাবাগৃহের সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হত। পবিত্র কুর'আনে

দাফন কাফন শেষ করে বিলাপকারিণীদেরকে উত্তমরূপে আপ্যায়ন করা হতো। রাসূল (স.) এর নবুয়তের পর জাহিলিয়াতের এসব প্রথার অবসান ঘটে।

কুসংস্কারঃ জিন্-পরী দৈত্যদানবেও তৎকালীন আরবরা বিশ্বাস করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পরীরা পুরুষ লোকের প্রেমে পড়ে এবং জিনরা নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। জিনদেরকে তারা অদৃশ্য জীব বলে বিশ্বাস করতো আবার সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করতো যে, অশরীরী আত্মার সাথে মানুষের জড়দেহের মিলনেও সন্তান ভুমিষ্ঠ্য হতে পারে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, জুরহাম মানুষ ও ফেরেশতার মিলনের ফসল ছিল। অনুরূপ ধারণা তারা সাবারাণী বিলকীস সম্পর্কেও পোষণ করতো। আমর ইবনু ইয়ারবু সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, মানুষ ও প্রান্তরের ভুতের মিলনে তার জন্ম হয়েছিল।

তাদের কুসংস্কারের মাত্রা এত বেশী ছিল যে, কখনো কাজের জন্য বাইরে যেতে হলে তারা 'রতম' নামক একটি বৃক্ষের ছোট্ট শাখায় একটা গাট দিয়ে যেতো এবং ফিরে এসে দেখতো যে সে গাটটা ঠিক আছে নাকি খুলে গেছে। ঘটনাক্রমে সে গাটটি কোনভাবে খুলে গেলেই তারা ধরে নিত যে, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। গাটটি পূর্ববৎ থাকলেই কেবল স্ত্রীর সতীত্ব বহাল আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার কবরে মৃতব্যক্তির উষ্ট্রীকে চোখ বেঁধে উষ্ট্রীটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখতো। অথবা ঐ উষ্ট্রীর মাথা পিছনের দিকে টেনে তার বুকের সাথে বেঁধে দিত এবং এভাবেই উষ্ট্রীর মৃত্যু হতো। তাদের ধারণা ছিল যে, পরকালে যখন ঐ মৃতব্যক্তি কবর থেকে উত্থিত হবে তখন সে এ উষ্ট্রীটিতে আরোহণ করেই উঠতে পারবে।

কন্যা হত্যাঃ বনী তামীম এবং কুরায়শদের মধ্যে কন্যা হত্যার সমধিক প্রচলন ছিল। তারা এজন্যে রীতিমত গর্ববোধ করতো এবং তাদের জন্যে সম্মানের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। কোন কোন পরিবারে এ পাষন্ডতা এতদুর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মেয়েরা যখন বেশ বড় হয়ে যেতো এবং মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শুরু করতো, তখন পাঁচ ছবছর বয়সে তাকে সুন্দর বেশভুষায় সজ্জিত করে পিতা তাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যেতো। পাষন্ড পিতারা পুর্বেই সেখানে গিয়ে গর্ত খুড়ে আসতো এবং পরে মেয়েকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিত। অবোধ মেয়ে তখন অসহায় অবস্থায় চিৎকার করে পিতার সাহায্য চাইতো। কিন্তু পাষন্ড পিতা তার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে টিল ছুড়ে তাকে হত্যা করতো বা জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে নিজ হাতে কবর সমান করে দিয়ে নির্বিকারে ঘরে ফিরে আসতো এবং এভাবে আপন কলিজার টুকরো সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার জন্যে সে রীতিমত গর্ববোধ করতো। বণী তামীমের জনৈক কায়স ইবন আসিম এভাবে একে একে তার দশটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করে। কন্যা হত্যার এ অমানুষিক বর্বরতা থেকে আরবের কোন কাবীলাই মুক্ত ছিল না। তবে কোন কোন কাবীলায় এটি অনেক বেশী হতো আবার কোন কোন কাবীলায় তা কম হতো।

জুয়াখেলাঃ জাহিলিয়াতের যুগে আরবের অদিবাসীরা জুয়াখেলায় অত্যন্ত আগ্রহী ও অভ্যস্ত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আযলামের সাহায্যে জুয়াখেলা হতো। আযলাম ছিল জুয়াখেলার তীর বিশেষ। তাতে পালক সংযোজিত থাকতো না। সে তীরের সংখ্যা হতো দশটি। প্রত্যেকটি তীরের স্বতন্ত্র নাম থাকতো। নামগুলি ছিল এরূপঃ ১. গুয, ২, তাওয়াম ৩. রকীব, ৪. নাফিস, ৫. হালস, ৬. মুবাল, ৭. মুআলা, ৮. ফসীহ, ৯. ফাইহী, ১০ ওগাদ। প্রত্যেকটি তীরের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা ভাগ নির্ধারিত থাকতো। যেমন গুযের একভাগ তাওয়ামের দু'ভাগ। এভাবে সপ্তম তীর পর্যন্ত একভাগ করে বৃদ্ধি পেয়ে সপ্তম তীরের ভাগ সংখ্যা থাকতো সাতটি। অবশিষ্ট তিনটি তীরের কোন ভাগ ছিল না। খানা কাবার মধ্যে হুবল দেবতার সম্মুখে এ জুয়া খেলা হতো। জুয়ার আরেকটি পদ্ধতি ছিল এই যে, কিছু বালি এনে কোন বস্তু তার মধ্যে গোপন করা হতো। তারপর উক্ত বালির স্তুপকে দুভাগে ভাগ করে প্রশ্ন করা হতো, এবার বল দেখি বস্তুটি কোন স্তুপের মধ্যে রয়েছে। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তা সঠিকভাবে বলে দিতে পারলে সে জুয়ায় জিতে যেতো, নতুবা সে হেরে যেতো।

[৩৩৬]. জাহেলিয়াহ শব্দের অর্থ অন্ধকার, অজ্ঞানতা, বর্বরতা, দয়াহীনতা, কঠোরতা, রূঢ়তা, অশিষ্ঠতা, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, মুর্তিপুজা প্রভৃতি। আর ইসলামের পূর্ববর্তী যুগকে আয়্যামুল জাহেলিয়াহ বা অন্ধকার যুগ বলা হয়।

[৩৩৭]. আল কুর'আন, **সুরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ১৫৪; **সুরা আল মায়েদা**, আয়াতঃ ৫০; **সুরা আল আহযাব**, আয়াতঃ ৩৩; **সুরা আল ফাতহ**, আয়াতঃ ২৬)।

[৩৩৮]. তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি ছিলেন ইমরুল কায়েস। 'মুয়ালাকা' তার রচিত অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। ইমরুল কায়েস আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং কিন্দা রাজ্যের যুবরাজ ছিল। সে তার ফুফাত বোন উনায়যার সাথে এবং অন্যান্য আরও মহিলাদের সাথে যে সমস্ত অপকর্ম করত তা নিজের রচিত 'কাসীদায়ে লামিয়া' নামক কবিতায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আরবের খ্যাতনামা কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় এই কবিতাটি প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। সম্মানার্থে এই

Dhaka University Institutional Repository

এটি তাদের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "তারা কথায় কথায় মিথ্যা শপথ করে, তারা লাঞ্চিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অপরের নিকট লাগায়, কল্যাণকর কাজে বাধা দেয়, সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি জারজ।"[৩৩৯]

আরবদের জাতিগত উৎস খুব স্পষ্ট নয়। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, তারা ছিল সেমিটিক ভাষাগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির লোক আরব দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন আরব জাতিকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ১. আরবে বায়দা ২. আরবে বাকিয়া। বর্তমানে বায়দা গোত্রের অস্তিত্ব নেই। পবিত্র কুর'আনে 'আদ' 'সামুদ' 'তাসম' ও 'জাদিস' নামে যে প্রাচীন গোত্রসমূহের উল্লেখ রয়েছে তারা বায়িদা জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আরবদেশে প্রাচীনকাল থেকেই হযরত নুহ আলায়হিস সালামের পুত্র সামের বংশধরদের বাস ছিল। কাল হিসাবে ঐতিহাসিকগণ আরবের অধিবাসীদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: ১. আরবে বায়িদা ২. আরবে আরিয়া ও ৩. আরবে মুসতারিবা।

১. আরবে বায়িদা: আরবে বায়িদা বলতে সে সব জাতির লোকজনকে বুঝায় যারা প্রাচীনকাল থেকে আরবের আদি অধিবাসী ছিল। তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কোন বংশধর পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই। অনেকে আরবে আরিবা ও আরবে মুসতারিবা- এর উভয় গোষ্ঠীকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করে এদের সম্মিলিত নাম দিয়েছেন আরবে বাকিয়া। আরবের অধিবাসীরা দুই শ্রেণীভুক্ত ছিল। যেমন, আরবে বায়িদা ও আরবে বাকিয়া।

আরবে বাকিয়া হচ্ছে তারা যারা এখনো আরব দেশে বাস করছে। তাদেরই দুটি শ্রেণী, যারা আরিবা ও মুসতারিবা নামে অভিহিত।

২. আরবে আরিয়া: এরা আরবের আদি অধিবাসী।

৩. আরবে মুসতারিবা: এরা আরবের প্রকৃত অধিবাসী নয়। পরবর্তীকালে আরবে এসে বসবাস শুরু করে। এরা বনু ইসমাঈল নামে পরিচিত। এদেরকে বনু আদনানও বলা হয়। এরা হিজায এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে অবস্থান করত।[৩৪০] এরা হযরত ইসমাঈল (আ:)[৩৪১] এর বংশধর।[৩৪২]

কবিতাটি পবিত্র কাবার প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের মুখেই এই কবিতাটি শুনতে পাওয়া যেত।

[৩৩৯]. আল্লাহ পাক পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে ঘোষণা করেন, "তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লগিয়ে ফিরে, ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালঙ্ঘন করে, সে পাপিষ্ঠ্য কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত।" (আল কুর'আন, **সুরা আল কালাম,** আয়াত: ১০-১৩)।

[৩৪০]. খাদরী বিন মুহাম্মদ শায়খ, **মুহাদারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যা,** (মিসর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৩৮২ হি:), ১ম খন্ড, পৃ: ১১-১৩; ফুয়াদ হামযা, **কালবু জাযীরাতিল আরব,** (মিশর: আলমা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৫২ হি:), পৃ: ২৩১-২৩৫; আবুল হাসান আবুল নদভী, **আসসীরাতুন নববিয়্যা,** (বৈরুত: দারুশ শরুক, ১৯৮৩ খ্রী:), পৃ: ৫৩-৭১।

[৩৪১]. ইসমাঈল হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর পুত্র এবং আল্লাহর নবী ছিলেন। কাবা ঘর পূণর্নিমানে তিনি তার পিতাকে সহযোগিতা করেন।

[৩৪২]. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা - মধ্য যুগ,** (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা: ১৯৯৭), পৃ: ৫৩-৫৪।

আরবে প্রাচীন বসতী স্থাপনকারীদের পরিচয়:

ক. আরবে প্রাচীনতম বসতি স্থাপনকারী হিসেবে ক্যালডীয়দের কথা বলা হয়ে থাকে। এই জাতি আরবভূমি ছাড়াও প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও মিশরে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এদের গড়া অনেক প্রাসাদ, মন্দির ও পুকুরের নিদর্শন এডেনে রয়েছে।

খ. আরেকটি জাতি সেমেটিক গোত্র কর্তৃক ইউফ্রেটিসের পূর্ব তীর থেকে বিতাড়িত হয়ে ইয়েমেন ও হাজরামুত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এরা কাহতান নামক এক পুর্বপুরুষের বংশধর। কাহতানকে লোকে জোক্তানও বলত। এই জাতির মূল বাসস্থান ছিল দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন অঞ্চলে। তাদের ইয়েমেনীয় বা হিমারীয় বলা হয়ে থাকে। কাহতান বংশের উদ্ভব থেকেই আরব জাতির প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হয়। কাহতানের এক পুত্রের নাম ছিল ইয়ারেব। এর নাম অনুসারে দেশ এবং জাতির নাম হয় 'আরব'। ইয়ারিবের পৌত্র আবদুশ শমসের উপাধি ছিল সবা। এই সবার নামানুসারে এই বংশের রাজাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ আরবসাসীদেরকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেনঃ ১. আরবে বায়দা বা আরবে আরিবা ২. আরবে মুসতারিবা ৩ আরবে তাবিয়া ৪. আরবে মুসতাজিমা ।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির লোক আরব দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাচীন কালদীয় জাতি যে বংশ হতে উদ্ভুত আরবের পূর্বতন অধিবাসীরাও সেই বংশোদ্ভুত, এবং তারা সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এর ধ্বংসাবশেষ এখনও দক্ষিণ আরবে দেখতে পাওয়া যায়। সেমিটিক জাতি ইয়ামন ও হাদরামৌতের কোন কোন অংশে বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে ইসমাঈল বংশীয়গণ আরবে এসে বসতি স্থাপন করে। তিনি মক্কায় বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং তার বংশধরগণ হিজাজ প্রদেশে বসতি স্থাপন করায় প্রকৃত প্রস্তাবে আরবের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপিত হয়। উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আদ, সামুদ, তসম, জাদীন, আমালিক ইত্যাদি গোত্রসমূহ আল আরাবুল বায়িদার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। যাযাবর ও বর্বর জাতির মানবিক মূল্য বোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। তাদের প্রতিটি কার্যকলাপে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্নীতি, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, হত্যা, পাশবিক নির্যাতন, নারী নির্যাতন, রক্তপাত ও অমানুষিক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হত। তাদের পশু প্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে, মানবিক সত্তা বিকাশের পথ রূদ্ধ হয়ে যায়। জুয়াখেলা আরব সমাজের অবসর বিনোদনের একটি বিশেষ উপায় ছিল। অশ্লীল কাজে তাদের কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না।[৩৪৩]

জাহেলিয়া যুগে নারীরা ছিল ঘৃণিত। মর্যাদা বহির্ভুত এবং মুল্য ও অধিকারহীনা, গর্হিত ও নিন্দিত প্রাণী। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোন মূল্য ছিল না। মানুষ হিসেবে যে মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার থাকার প্রয়োজন তা থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত। খাদ্য, বস্ত্র ও বাস্থানের মত মৌলিক চাহিদা পুরণের অধিকার তাদের ছিল না। পুরুষের নির্যাতনের কারণে স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন গঠনের অধিকার নারীদের ছিল না। পুরুষরা নারী সমাজকে সকল মন্দের প্রতীক ও অনাকাংখিত বোঝা মনে করত। সমাজ গঠনে, পরিবার গঠনে নারীরা ছিল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত।[৩৪৪]

কন্যা হত্যা

জাহেলিয়া যুগে আরবের অদিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর বলে মনে করত। কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল তাদের জন্য গভীর দুঃখ এবং মনোকষ্টের কারণ। পুত্র সন্তান নিয়ে তারা গর্ব ও অহংকার করত। আর কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করত। পবিত্র কুর'আনে তাদের এই অনুভুতি ও মনোবৃত্তির বর্ননা দিয়ে বলা হয়েছে, "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের

'সবীয়' বলা হত। কাহতান বংশধররা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ১. ইয়ামিনিয়া ২. সাবাইয়া। এই জাতি বিখ্যাত যোদ্ধা ও নির্মাতা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাদের রাজ্যকেন্দ্র ছিল ইয়েমেন। আরবের অন্যান্য অংশেও তাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। গ. সর্বশেষ বসতি স্থাপনকারী ছিল ইসমাইলী গোত্র। ইহুদি ধর্মের জনক ও নবী ইব্রাহিমের পুত্র ছিলেন ইসমাইল। তিনি মক্কার নিকট বসতি স্থাপন করেন এবং ক্বাবাগৃহ নির্মাণ করেন। হযরত ঈসা (আ:) এর জন্মের প্রায় ১৯০০ বছর পূর্বে তিনি হিজাজে বসবাস করেছিলেন এবং জুরহুম বংশীয় জনৈক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এ বংশেরই একজন আদনান, যার পূর্বের বংশ তালিকা সঠিকভাবে জানা যায় না। সমগ্র আরববাসী কাহতান এবং আদনানের বংশধরগণের শাখা প্রশাখাভুক্ত। ঐতিহাসিকদের মতে, আরবরা প্রায় সকলেই সামী (সেমেটিক) অর্থাৎ নূহের পুত্র সামের বংশধর। (এ. কে. এম শাহানাওয়াজ, **বিশ্বসভ্যতা - মধ্য যুগ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩; সৈয়দ আমীর আলী, **আরব জাতির ইতিহাস**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ২০০৪, পৃঃ ২)।

[৩৪৩]. মোল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তাফা**, (দিল্লীঃ মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৫৭ খ্রিঃ), পৃঃ ৫৫-৫৬; মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত. পৃঃ ১৫। ঐতিহাসিকগণ তৎকালীন আরব সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয়কে অত্যন্ত ভয়াবহ বলে চিহ্নিত করেছেন। তারা আল্লাহর একত্ববাদকে বিশ্বাস করত না। দেবদেবীর পুজা করত। পাপকর্মে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত এবং পাপকাজ করতেই আনন্দ পেত। হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধ নারী এবং মদ ছিল আরব জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি। (মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫)।

[৩৪৪]. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা হয়ে যায় কাল ও মলিন। মনোকষ্টে তার হৃদয় হয়ে উঠে ভারাক্রান্ত। এই দু:সংবাদের কারণে সে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে (কন্যা সন্তান) জীবিত থাকতে দিবে, না মাটির নীচে পুতে ফেলবে? আহা! কত জঘন্য ও নিষ্ঠুর তাদের বিচার-বিবেচনা।"[৩৪৫]

নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, কারো ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা ঐ ঘরটিকে অলক্ষুণে ঘর মনে করে তা পরিত্যাগ করত। নবজাতক শিশু কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করত। এ ধরণের নিষ্ঠুরতা কোন কোন সময় এমন সব ব্যক্তিদের তরফ থেকেও প্রকাশ পেত যাদের হৃদয়কে স্নেহ ও ভালবাসার উৎস বলে মনে করা হত।[৩৪৬] এমন কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স.) কে তার জাহিলী যুগের কাহিনী শুনিয়ে বলল, "আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। আমি যখনই তাকে ডাক দিতাম, সে বড়ই খুশি মনে আমার কাছে দৌড়ে আসত। এমনি করে একদিন আমি তাকে ডাকলাম। সে দৌড়ে আমার কাছে এল। আমি তাকে সাথে নিয়ে নিকটবর্তী একটি কূপের পাশে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে তাকে ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করছিল।" ঘটনাটি শুনে নবী করীম (স.) এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, হে লোক! কেন তুমি আল্লাহর রাসূল (স.) কে কষ্ট দিলে? নবী (স.) বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না, মেয়ের ব্যাপারে তার যে কঠিন অনুভুতি আছে সে সম্পর্কে তাকে বর্ণনা করতে দাও। লোকটি পুনরায় তার কাহিনী বর্ণনা করল যা শ্রবণ করে রহমতের নবী (স.) এত কাঁদলেন যে, তার দাড়ি মোবারক অশ্রুতে ভিজে গেল। তারপর তিনি বললেন জাহিলিয়াতের যুগে যা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন, তুমি এখন নতুন করে জীবন শুরু কর।[৩৪৭]

- কায়েস ইব্‌নে আসেম নামক এক ব্যক্তি জাহিলী যুগে তার দশটি কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করেছিল।[৩৪৮]

জাহিলী যুগে আরবরা কন্যা সন্তানকে ক্ষতি ও অপমানের কারণ আর পুত্র সন্তানকে লাভ ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করত। তাই কন্যা সন্তানের পরিবর্তে সর্বদা তারা পুত্র সন্তান কামনা করত। পবিত্র কুর'আনে তাদের এ হীন মানসিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, "তারা বলত যে, মেয়েরা আল্লাহর জন্য। অথচ মহান আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করা হতে চির পবিত্র। আর তারা নিজেদের জন্য কামনা করত শুধু পুত্র সন্তান।"[৩৪৯]

---

৩৪৫. আল কুর'আন, **সুরা আন নাহল**, আয়াত: ৫৮-৫৯।

৩৪৬. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬।

৩৪৭. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ দারেমী, **সুনানুদ দারেমী**, (করাচী: কাদীমী কুতুবখানা, তা.বি.), ১ম খন্ড, পৃ: ১৪।

৩৪৮. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর, **তাফসীরুল কুরআনিল** আযীম, (পেশওয়ার: মাকতাবাতু আলামিল ইসলামিয়া), ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪৭৭।

৩৪৯. আল কুর'আন, **সুরা আন নাহল**, আয়াত: ৫৭। আরবদের পুত্র সন্তান কামনা করার পেছনে কতগুলো কারণ ছিল। তা নিম্নরূপ:

প্রথমত: বর্বর যুগে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। এজন্য তাদের শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য পুরুষের প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। ফলে পুরুষদেরকে নারীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হত। নারীরা ঘোড়সওয়ার হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারত না বলে তাদেরকে গনীমতের মালের অংশ দেয়া হত না।

দ্বিতীয়ত: তারা ভাবত যে, মেয়েরা জীবিত থাকলে তাদেরকে অন্যের সাথে বিয়ে দিতে হবে। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল লজ্জা শরমের ব্যাপার। কারণ মেয়েকে বিয়ে দিলে বাপকে শ্বশুর হতে হয়। আর শ্বশুর হওয়াকে তারা অপমানজনক মনে করত। এই সামান্য কারণেও মেয়েদেরকে তারা হত্যা করত।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন আরবদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে কন্যা সন্তান জীবিত রাখাই ক্ষতিকর। এজন্যই তারা মেয়েদের জীবিত না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। নিষ্ঠুর পিতারা কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করার জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করতো। **প্রথমতঃ** সহজ পন্থা হিসেবে তারা সাব্যস্ত করে যে, জন্মের পরই তাকে জীবিত মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে। এবং তারা মেয়ের জন্মের পরেই কালবিলম্ব না করে মাটির নীচে পুতে ফেলত। আবার কোন কোন সময় মেয়েকে লালন পালন করে পাঁচ বছর বয়স হলে কোন একদিন তাকে জীবিতই কবর দিত। তাদের এই আচরণের কথা কুর'আন মজীদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "পিতা চিন্তা করে, সন্তানকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে কিছু দিন জীবিত রাখবে না সঙ্গে সঙ্গেই মাটির নীচে পুতে ফেলবে?"[৩৫০] **দ্বিতীয়তঃ** কন্যা হত্যার জন্য তারা দ্বিতীয় পন্থা এভাবে অবলম্বন করত যে, মেয়েকে নিয়ে তারা উচু কোন পাহাড়ের চুড়ায় উঠত। তারপর সেখান থেকে তাকে খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিত। এভাবেই তার মৃত্যু হত।[৩৫১] তবে সব কন্যা সন্তানকেই তারা হত্যা করত না। কাউকে কাউকে তারা জীবিত রাখত প্রজন্মের গতিধারা অব্যাহত রাখার তাগিদে। আর বাধ্য হয়েই তারা এরূপ করত।

জাহিলিয়াতের যুগের এরূপ ঘৃণ্য, বর্বর ও অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে কুর'আনে সতর্ক বাণী উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "পুনরুত্থান দিবসে জাহিলিয়াতের যুগের প্রতিটি পিতামাতাকে তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করার জন্য প্রশ্ন করা হবে এবং এর যোগ্য প্রতিফল বা শাস্তি প্রদান করা হবে। মোটকথা জাহিলিয়াতের সময়কালীন কোন অপরাধী পিতামাতাই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।"[৩৫২] তাফসীরে উল্লেখ আছে, যখন কোন নারী গর্ভবতী হত তখন তার জন্য একটি পৃথক ঘর নির্মাণ করে তাকে সেখানে রাখা হত এবং পাশে একটি গর্ত তৈরী করা হত। যদি উক্ত নারী কন্যা সন্তান প্রসব করত তাহলে সেই সন্তানকে ঐ গর্তে পুতে ফেলা হত এবং কন্যা সন্তান প্রসবের জন্য ঐ নারীকে ধিক্কার দেওয়া হত। আর যদি পুত্র সন্তান জন্ম নিত তাহলে সেই নারী ও পুত্র সন্তানকে অত্যন্ত আনন্দ ভরা চিত্তে ঘরে আনা হত। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তথাকথিত সম্ভ্রান্ত বংশের সকলেই এই অমানুষিক কাজে মনোযোগী ছিল।[৩৫৩]

তৃতীয়তঃ আরবদের মনে এ ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কন্যা সন্তান জীবিত রাখাটাই ক্ষতিকর। কারণ পুত্র সন্তানদেরকে লালন-পালন করতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয় কন্যা সন্তানদেরকে লালন পালন করতেও ঠিক সমপরিমান অর্থ ব্যয় হয়। অথচ ছেলেরা পিতার জন্য যেরূপ উপকারী হয়ে থাকে মেয়েরা তা হয় না। অতএব, মেয়েদের জন্য খরচ করা একটা বড় রকমের ক্ষতির ব্যাপার।
চতুর্থতঃ সন্তান হত্যার আর একটি কারণ দারিদ্রতা। দারিদ্রের কথা চিন্তা করে যারা সন্তানদেরকে হত্যা করত তারা দুই শ্রেণীর লোক। এদের এক শ্রেণী প্রকৃতই দরিদ্র ছিল। তাদের পক্ষে সন্তান লালন পালন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই তারা কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করার পথ বেছে নিয়েছিল। এদের প্রসঙ্গেই আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা দারিদ্রের কারণে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। (আল কুর'আন, **সুরা আন'আম**, আয়াতঃ ১৫১)।

আর অপর এক শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ছিল না। কিন্তু তারা মনে করত যে, যদি অনর্থক মেয়েদের লালন পালনের জন্য ধনসম্পদ খরচ করে তাহলে এমন একদিন আসবে যখন তারা দরিদ্র হয়ে যাবে। সুতরাং দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকায় তারা মেয়েদেরকে হত্যা করত। এদের প্রসঙ্গে কুর'আন মজীদের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকায় তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। (আল কুর'আন, **সুরা বনী ইসরাঈল**, আয়াতঃ ৩১)।
পঞ্চমতঃ জাহিলী যুগের বিভিন্ন সুত্র এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কন্যা সন্তান হত্যা করার এই নিষ্ঠুর রেওয়াজটি প্রথমে গোত্র সর্দার, ধর্মযাজক এবং গণকদের মধ্যে শুরু হয়। তারা নিজেরাও এই অপকর্মে লিপ্ত হত আর জনসাধারণকে এ কাজের জন্য প্ররোচিত করত। তারা বলত যে, তোমরা মেয়েদের জীবিত রেখ না। কারণ এরা অপমানের কারণ। তাদের দেখাদেখি এবং পরামর্শে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে এমন নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হত। এদের প্রসঙ্গে কুর'আন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, "বহু সংখ্যক মুশরিকদের নিকট তাদের প্রভুরা সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করে তুলে ধরেছিল। যাতে করে তারা তাদেরকে ধ্বংস করার প্রেরণা লাভ করতে পারে।" (আল কুর'আন, **সুরা আন'আম**, আয়াতঃ ১৩৮)।

[৩৫০]. আল কুর'আন, **সুরা আন নাহল**, আয়াতঃ ৫৮।
[৩৫১]. আল্লামা মালিক রাম, **আওরাত আওর ইসলামী তা'লীম**, অনুবাদঃ মাহমুদা বেগম নেকু, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা**, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃঃ ১-৫।
[৩৫২]. আল কুর'আনে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, "যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল?" (আল কুর'আন, **সুরা আত তাকবীর**, আয়াতঃ ৮-৯)।
[৩৫৩]. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের মতামত প্রদানের কোন অধিকার ছিল না। নারীর পছন্দ অপছন্দকে তৎকালীন পুরুষ সমাজ কোন মূল্যই দিত না। পুরুষ বা অভিভাবকের পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী নারীকে বিবাহ করতে হত।[৩৫৪] এতিম কন্যা সন্তানদেরকে বিয়ে করত তাদের ধনসম্পদ ও সৌন্দর্য্যের লোভে এবং এসব এতিম মেয়েদের কোন অভিভাবক না থাকার কারণে তাদের স্বামীরা তাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করত এবং প্রয়োজনে তালাক দিয়ে মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিত। যাদেরকে তালাক দিত না তাদের উপর বর্বরভাবে অমানুষিক জুলুম করত। এতিম মেয়ে যদি সম্পদশালী ও সুন্দরী হত সে ক্ষেত্রেও স্বামীরা তাদের বিয়ে করে তাদের ধন সম্পদ ও সৌন্দর্য্য দুইই ভোগ করত। যদি মেয়েটি দেখতে কুশ্রী হত সে ক্ষেত্রে তারা সেই মেয়েটিকে নিজেরাও বিয়ে করত না আবার মেয়েটির সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে অন্য কেউ বিয়ে করতে চাইলেও তাকে বিয়ে করতে দিত না। বিধবার সম্পদ করায়ত্ব রাখার জন্য তাকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বঞ্চিত করত। অনেক সময় কোন অল্প বয়স্ক শিশুর বয়:প্রাপ্তি পর্যন্ত তার পূন:বিবাহ ঠেকিয়ে রাখা হত। যাতে উক্ত শিশু বয়:প্রাপ্ত হয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে।[৩৫৫]

ব্যভিচার

রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে নর নারীর অবাধ ব্যভিচারে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচার ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যদিও তারা গোপনে ব্যভিচার করত কিন্তু ব্যভিচারের পর প্রকাশ্যে নিজের ব্যভিচারের ঘটনা বর্ণনা করতে গর্ববোধ করত। তদানীন্তন আরবে লজ্জাবলে কোন বস্তু ছিল না। মহিলারা উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করার সময় মন্ত্রস্বরূপ বলত, "কেউ যদি আমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার উপযুক্ত বস্ত্র দান করত। তারপর নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করত: "আজ আমার শরীরের কিয়দংশ অথবা পূর্ণাঙ্গ উলঙ্গ থাকবে কিন্তু কাউকে উলঙ্গ দর্শনোপভোগ করে তৃপ্তি লাভ করার অনুমতি দেই না।"[৩৫৬]

তৎকালীন আরবগণ উন্মুক্ত মাঠে অনাবৃত উলঙ্গ হয়ে স্নান করত[৩৫৭] এবং খোলা স্থানে মলত্যাগ করত। লোকসভায় বসে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কীয় সমস্ত ঘটনা প্রকাশ্যে বর্ণনা করত।[৩৫৮] ব্যভিচার এমনরূপ ধারণ করেছিল যে, নারীরা সন্তান প্রসবের পর সন্তানের পিতার নাম বলতে পারত না। ব্যভিচার তখনকার আরবদের কাছে দুষণীয় ছিল না বরং এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই পরিগণিত ছিল। নারী তথা স্ত্রী লোক ছিল পুরুষদের ভোগের বস্তু। নারীদের কোন প্রকার সামাজিক মর্যাদা ছিল না। একজন পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী অগণিত নারীর পানি গ্রহণ করত অথবা জোরপূর্বক নারীকে স্ত্রী বা দাসীতে পরিণত করত। এইরূপ নারীরাও তাদের ইচ্ছা ও সামর্থানুযায়ী বহু পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। নিজের গর্ভধারিণী মা ব্যতীত পুরুষরা যে কোন নারী এমনকি সহোদরা ভগ্নী ও বিমাতার সাথেও ব্যভিচারে লিপ্ত হত। পুত্ররা

ঐতিহাসিকদের মতে, আরবে যুদ্ধ বিগ্রহে পুরুষের মৃত্যু হলে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাই নারী পুরুষের সমতা বিধানের জন্য কন্যা সন্তান জীবন্ত সমাধির মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারিদ্রতা অথবা কন্যা বড় হলে ব্যভিচারীনী বা অন্যের দ্বারা লুন্ঠিত হবে এরূপ আশংকায় কন্যাদের জীবন্ত সমাধি দেয়া হত। (মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯)।

[৩৫৪]. আব্দুর রহিম তার Muslim Jurisprudence গ্রন্থে বলেন, একজন যুবতী বা অনুঢ়ার কুমারী অথবা বিধবার পিতা-ভ্রাতা চাচাত ভাই অথবা অন্য কোন পুরুষ অভিভাবক তাকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে পারত। এক্ষেত্রে নারীর সম্মতির কোন প্রয়োজন হত না। তাবারী তাঁর "তারিখ-ই-রসুল ওয়াল মূলকে" গ্রন্থে বলেন, জাহেলিয়া যুগে যদি কারও পিতা, ভ্রাতা অথবা পুত্র মৃত্যুবরণ করত তাহলে উক্ত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে তার স্বামীর পরিবারের উপযুক্ত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী বিয়ে করতে পারত। সেই উপযুক্ত ব্যক্তি বিধবার সামনে এসে গায়ের পোশাক খুলে রাখতেন এবং বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন।" (ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১)।

[৩৫৫]. **তাফসীরে ইবনে কাসীর**, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৬৫।

[৩৫৬]. সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, **সীরাতুন্নবী**, ৪র্থ খন্ড, (আজমগড়: মাতমআ মাআরিফ), পৃ: ২৯৪।

[৩৫৭]. আবু আব্দুর রহমান, আহমদ ইবনে শুআয়ব আন নাসায়ী, **সুনানুন্নাসায়ী**, (লাহোর: মাকতাবা সাফিয়া, ১৯৮২ খ্রী:) 'আল ইস্‌তিতারু ই'নদাল গুছলে' অধ্যায়।

[৩৫৮]. সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

পিতার মৃত্যুর পর অন্যান্য তৈজসপত্র ও পশুপালের মত পিতার স্ত্রী ও কন্যাদের উত্তরধিকার সূত্রে ভাগ করে নিত এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবাধে ভোগ করত। জুয়া খেলায় তৎকালীন আরবরা এতই মত্ত ছিল যে, জুয়ায় পরাজিত হয়ে সমস্ত ধন সম্পত্তি বিনষ্ট করার পর নিজের স্ত্রী, কন্যার উপর বাজি রেখে জুয়া খেলত এবং পরাজিত হলে স্ত্রী, কন্যাকে প্রতিপক্ষের হাতে অবলীলায় সমর্পণ করত।[৩৫৯]

অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবদেশের সর্বত্র বর্বরতার চরম বিকাশ ঘটেছিল। সেখানে কোন সামাজিক আইন ছিল না। লুটতরাজ ও অনাচার ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিল। নারী জাতি ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত, ও নির্যাতিত। নারীদের নিয়ে রোমান্টিক গান রচনা ছাড়া নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর চেয়ে উন্নতমানের কোন প্রকার ব্যবহার নারীদের প্রতি করা হত না। তৎকালীন আরবের পুরুষরা বিবাহের বাইরে তাদের অধীনস্থ স্ত্রী, দাসী তথা নারীদেরকে দিয়ে গণিকাবৃত্তি করাত[৩৬০] সে সময় দুই ধরণের গণিকাবৃত্তি প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হল, ঘরোয়া গণিকাবৃত্তি।[৩৬১] অধিকাংশ মুক্তিপ্রাপ্ত দাসীরা যাদের কোন অভিভাবক ছিল না তারা ঘরোয়া গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত। দ্বিতীয়টি হল, প্রকাশ্যে গণিকাবৃত্তি, যা ছিল দুই ধরণের।[৩৬২] সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরা দ্বিতীয় প্রকার গনিকাবাড়ী খুলে রাখত। ইসলামের প্রধান দুশমন মুনাফিকদের প্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাই এরও উক্ত ধরণের গণিকাবাড়ী ছিল।[৩৬৩] আরবের ইহুদী খ্রিষ্টানদের মধ্যেও এই ধরণের গণিকাবৃত্তির প্রচলন ছিল।[৩৬৪] তালাকের ব্যাপারেও তখনকার সমাজে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখন ইচ্ছা করত এবং যতবার ইচ্ছা করত স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরই রুজু বা প্রত্যাহার করত।[৩৬৫]

---

[৩৫৯]. ফখরুদ্দীন রাযী, **আত তাফসীরুল কবীর**, ২য় খন্ড, (করাচী: মাকতাবা ইসহাকিয়া, তা. বি.), ৩য় সংস্করণ, ।

[৩৬০]. মুসায়বা ও উসায়মা নামক আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইর দুইজন দাসী ছিল। সে তাদেরকে বলপূর্বক গণিকাবৃত্তি করে টাকা উপার্জন করতে বাধ্য করত। তাদের এইসব জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করার কেউ কোন প্রয়োজন অনুভব করতো না। এ সম্পর্কে কুর'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন, "আর যারা বিবাহের সুযোগ পাবে না তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্য হতে যারা চুক্তিপত্র করার দরখাস্ত দিবে, তাদের সাথে চুক্তিপত্র করো। তোমরা যদি জানতে পার যে তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে আর তাদেরকে সে ধন-সম্পদ হতে দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। আর তোমাদের দাসীরাই যখন নিজেরাই সতীসাধ্বী চরিত্রবতী থাকতে চায় তখন বৈষয়িক স্বার্থে তাদেরকে গণিকাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না। কিন্তু যদি কেউ তাদের ওপর জবরদস্তি করে তবে এ জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়। (আল কুর'আন, **সুরা আন নুর**, আয়াতঃ ৩৩)।

[৩৬১]. কোন এক গৃহে এই পেশার জন্য তারা অবস্থান করতো। সেখানে কয়েকজন পুরুষের সাথে তারা একইভাবে চুক্তিবদ্ধ হতো যে পুরুষরা তাদের ভরণপোষণ দান করবে এবং বিনিময়ে তারা সেই সব পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে।

[৩৬২]. প্রথমটি হলো যুবতী দাসীদের, মালিকরা দাসীদের উপর একটি নির্দিষ্ট টাকার অংশ নির্ধারণ করে বলতো প্রতিমাসে তারা ঐ পরিমাণ অর্থ মালিকদেরকে প্রদান করবে। হতভাগী যুবতী দাসীরা গণিকাবৃত্তি করে তাদের মালিকের দাবী পুরণ করতো। এই গণিকাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এত অধিক পরিমাণ অর্থ তারা উপার্জন করতে পারতো না। দ্বিতীয়টি ছিল পুরুষ তথা মালিকরা তাদের অধীনস্থ যুবতী দাসীদের একটি গৃহের মধ্যে রাখতো এবং বাড়ির দরজার উপর পতাকা টানিয়ে রাখত। বাড়ির উপর এই প্রকার পতাকা লটকানো দেখে দুর দুরান্ত থেকে আগত অতিথিরা বুঝতে পারত এখানেই তাদের যৌন প্রয়োজন পূরণ করা যাবে। এই সকল স্ত্রী লোকদের বলা হত 'কালিকিয়াত' এবং তাদের বাড়ীগুলিকে 'রাওয়াখীর' নামে অভিহিত করা হত। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১-৭২)।

[৩৬৩]. আবদুল্লাহ বিন উবাই এর পতিতালয়ে ছয়জন সুন্দরী নারী থাকত যাদেরকে দিয়ে সে শুধু অর্থই উপার্জন করত না বরং তাদেরকে দিয়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করাত বা অতিথিদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। তাদের গর্ভে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মলাভ করত তাদেরকে দিয়ে দাস দাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হত। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২)।

[৩৬৪]. আহমদ মনসুর, **বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১-৭২; মোল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তাফা**, (দিল্লীঃ মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃঃ ৬১।

[৩৬৫]. আরবের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নাযেহাল করার উদ্দেশ্যে বলল, "আমি তোমাকে সাথেও রাখব না আবার পরিত্যাগও করব না। তার স্ত্রী জানতে চাইল, তা সে কিভাবে করবে? সে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই আবার রুজু করব। এরপর আবার তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ না হতেই পুনরায় রুজু করব। (আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, **আল মুসতাদরাক**, ২য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল মারিফাত, তা.বি. পৃঃ ২৮০)।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ প্রথা

জহিলিয়াতের যুগে একজন পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী অসংখ্য নারীকে বিবাহ করতে পারত এবং তাদেরকে দাসী বানিয়ে রাখত। তৎকালীন যুগে প্রধানত চার প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। জাহেলী যুগের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারীর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায়, "জাহিলী যুগে চার প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হচ্ছে বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌনমিলন কর। এরপর স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনো একই বিছানায় ঘুমাতো না যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত যার সাথে স্ত্রীর যৌনমিলন হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। এটা ছিল স্বামীর অভ্যাস, এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। (এ ধরণের বিবাহকে নিকাহুল ইসতিবযা বলা হত)।

তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশদিনের কম কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে মহিলার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার কিছু দিন অতিবাহিত হত। সেই মহিলা এসকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, সে তাদেরকে বলত তোমরা সকলেই জান তোমরা কি করেছ। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক এটা তোমারই সন্তান। ঐ মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন ঐ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত।

চতুর্থ প্রকার বিবাহ হচ্ছে, যত পুরুষ আসত নারীরা তাদের কাউকে শয্যা শায়িত করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল বারবণিতা যারা চিহ্ন হিসেবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত।[৩৬৬] যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এ সকল মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া সকল পুরুষরা এবং একজন 'কিয়াফা শেনাস'[৩৬৭] ডেকে আনা হত। যে লোকটির চেহারার সাথে সেই সন্তানটির সাদৃশ্য পাওয়া যেত তাকে বলত এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি উক্ত সন্তানটিকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং সে সেই সন্তানকে অস্বীকার করত না।[৩৬৮] পরবর্তীতে রাসূল (স.) জাহেলী যুগের সমস্ত বিবাহ প্রথাকে বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন।

জাহেলী যুগে এক বক্তি দুই সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করত। কেই কেউ বিবাহের দু একদিন পরেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করত। তৎকালীন আরববাসীদের বিবাহের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। তারা ইচ্ছানুযায়ী অসংখ্য নারীকে বিবাহ করত। ইসলাম কবুল করার সময় ওয়াহাব আসাদিয়া রাযী আলাহু আনহু এর দশজন স্ত্রী ছিল[৩৬৯] গাইলান সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল।[৩৭০]

---

[৩৬৬]. **সহীহুল বুখারী**, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৬৯।

[৩৬৭]. এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা শিশুর মুখ অথবা শরীরের অন্য কোন অংশ দেখে তার প্রকৃত পিতার পরিচয় বা নাম বলতে পারত। আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজে পারদর্শী ছিল তাকে 'কিয়াফা শেনাস' বলা হত।

[৩৬৮]. মোল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তফা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২-৬৩।

[৩৬৯]. **সুনানে আবু দাউদ**, কিতাবুত তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফি মান আসলামা ওয়া ইনদাহু নিসাওন আকছারু মিন আরবা, প্রথম খন্ড, পৃ: ৩০৪।

[৩৭০]. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন আত তিরমিযী, **জামিউত তিরমিযী**, (দিল্লীঃ মাকতাবা রাশীদিয়া, তা. বি.), পৃ: ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশে উল্লেখিত বিবাহের বা অবৈধ সম্পর্কের বাইরে আরো কয়েক প্রকারের বিবাহের প্রচলন ছিল। যা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১. সাদিকা বিবাহঃ জাহেলিয়া যুগে আরব মহিলাগণ তাদের ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণ করতে পারতেন। এজন্য তাদের কোন সাক্ষী বা কোন প্রকার কাবিনের প্রয়োজন হত না। এমন কি তার গোত্র প্রধানের সম্মতিরও প্রয়োজন হত না। যদি কোন মহিলা কোন পুরুষকে বিবাহ করতে চাইতেন তখন হবু স্বামী 'খিতব' বা আমি হাজির এ কথা বলে হবু স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হতেন। 'খিতব' কথাটি দ্বারা তিনি নিজেকে বিবাহযোগ্য পুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করতেন। হবু স্ত্রী তখন হবু স্বামীকে সম্মান করে বলতেন 'নিকা' অর্থাৎ 'আমি বিবাহ করলাম'। যে মহিলা বিবাহ করতেন তিনি 'সাদিকা' বা বান্ধবী এবং তার হবু স্বামী 'সাদিক' বা বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মোহরানা হিসেবে 'সাদিক' সাদিকাকে একটি পুরস্কার বা উপহার দিতেন। এটি 'সাদাকা' নামে অভিহিত ছিল। 'সাদাকা' গ্রহণ করে স্ত্রী স্বামীর সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একত্রে বসবাস করতেন। বিবাহ ছিল সামজিক বন্ধন এবং উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে এ ধরণের বিবাহ সম্পন্ন হত। এ ধরনের বিবাহ সমাজে স্বীকৃত ছিল। এ বিবাহ দ্বারা স্ত্রী স্বামীর ওপর নির্ভরশীল বা অনুগত হতো না। বরং এরূপ বিবাহে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত।[৩৭১]

২. মুত'আ বিবাহ : এইরূপ বিবাহ হলো সাময়িক চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ। এই প্রকার বিবাহ ব্যবস্থায় বিবাহিত দম্পতি নির্ধারিত সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত এবং সাময়িক ভবে একসাথে বসবাস করত। মুত'আ বিবাহ বা চুক্তিভিত্তিক বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল যৌন চাহিদা পূরণ। যে সকল লোক নিজ বাড়ি ছেড়ে বিদেশ গমন করত এবং বিদেশে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করত প্রধানত তারাই সাময়িক ভিত্তিতে এরূপ দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতো যাকে মুত'আ বিবাহ বলা হয়। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় রাসূলে করীম (স.) প্রথম দিকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে মুসলমানদেরকে দীর্ঘ প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে মুত'আ বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এরূপ বিবাহ প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর রাজত্বকালে মুত'আ বিবাহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।

৩. প্রেমিক-প্রেমিকার গোপনে একত্রে বসবাসঃ জাহেলী যুগে বৈবাহিক কোন প্রকার চুক্তি ছাড়া তাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী প্রেমিক প্রেমিকা স্বামী স্ত্রীর মতো গোপনে একত্রে বসবাস করত এবং এর কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। কিন্তু যখন তাদের এরূপ গোপন সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে পড়ত তখন এরূপ সম্পর্ক অসম্মানজনক বলে অভিহিত হতো। ফলে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের ইতি ঘটত।

৪. সিগাহর বা বিনিময় বিবাহঃ জাহেলিয়া যুগে যে ঘৃণ্য ও বিবেক বর্জিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তা 'সিগহার' নামে অভিহিত। এই প্রথায় মোহরানা প্রদানের কোন বিধান ছিল না। এই ঘৃণ্য প্রথায় এক গোত্রের কোন ব্যক্তি তার নিজের স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীর বিনিময়ে অন্য গোত্রের কোন ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা ও

---

[৩৭১]. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, (ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৬), পৃঃ ২০। আরবে নারীদের বিবাহের পর স্বামীর গোত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হত না। পূর্বের মত স্ত্রী তার নিজস্ব গোত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। এর মূল কারণ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী বা মাতা গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহে (গাজওয়া) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের মত অনুপ্রেরণা দিতে পারতেন। এ দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, প্রাক ইসলামী যুগের সামাজিক ও পরিবারিক গন্ডিতে মহিলাদের গোত্রের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন বলে মনে করা হত। 'সাদিকা' বিবাহ পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সন্তানদের তাদের মাতাকে ছেড়ে যেতে হত না (মাতৃতান্ত্রীক সমাজ ব্যবস্থার জন্য) সন্তান সন্ততিরা তাদের মায়ের সাথে বসবাস করত এবং তারা মায়ের গোত্রের সদস্য হত।

সাদিকা বিবাহের নারী স্বাধীনতা প্রমাণিত হলেও স্বামী ও স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধন বা পরিবারিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী হত না; কারণ স্ত্রী ইচ্ছামত স্বামীকে তালাক দিতে পারত এবং একাধিক স্বামী গ্রহণ করত। এর ফলে পরিবারে অনিশ্চয়তা বিরাজ করত। তৎকালীন সামজিক কাঠামোতে স্ত্রীর একাধিক বিবাহ দুষনীয় ছিল না। (ড. মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০-২১)।

Dhaka University Institutional Repository

ভগ্নীকে পাওয়ার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হত। এর জন্য কোন প্রকার মোহরানা প্রদান করতে হত না। পরবর্তীতে নবী করীম (স.) এই ধরণের জঘন্য সামাজিক প্রথা নির্মূল করেন।[৩৭২]

৫. জোরপূর্বক বিবাহ: প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের মত জাহেলিয়া যুগে জোরপূর্বক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এরূপ বিবাহ সম্পর্কে ইসলামী পন্ডিত হাম্মুদাহ আবদ আল আতি তাঁর 'THE FAMILY STRUCTURE IN ISLAM' নামক গ্রন্থে বলেন, "This form is believed y some scholar's e.g. smith to have preceded marriage by purchase and is one of the healthy debated points in the history of marriage."[৩৭৩]

জাহেলিয়া যুগে প্রধানত চারটি কারণে জোরপূর্বক নারীকে অপহরণ করে বিবাহ করা হত। কারণগুলি ছিল নিম্নরূপ:

প্রথমত: যুদ্ধ বন্দী নারীদের পণের মাধ্যমে ক্রয় করা হত। নারীদের জন্য যুদ্ধপণের পরিমাণ ছিল খুবই অধিক এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা এই অধিক পণ প্রদান করে তাদেরকে ক্রয় করে স্বগোত্রে ফিরিয়ে নিতে পারত।

দ্বিতীয়ত: শত্রু পক্ষের অথবা বিবদমান গোত্রগুলো তাদের সেনাদলে অধিক সংখ্যক নারী নিয়ে আসত একথা ভেবে যে তারা কোন এক সময়ে বীর গোত্র সেনাদের পত্নী হিসেবে বীর সন্তানদের জন্ম দান করবে। "কিতাবুল আঘানীতে" উল্লেখ আছে, বলপূর্বক অপহরণ করে নারীদের বিবাহ করলে তাদের যে পুরুষ সন্তান হবে তা হবে বলিষ্ঠ ও তেজস্বী। এ সমস্ত কারণে এক গোত্র অন্য গোত্রে অভিযান চালিয়ে শত্রু শিবির বা গোত্র থেকে নারীদের হরণ করত।

তৃতীয়ত: দরিদ্র অসহায় বেদুইনদের পক্ষে উচ্চ মূল্যে স্ত্রী ক্রয় করতে না পারায় তারা অন্য গোত্রে লুটতরাজ করে নারী হরণ করে বলপূর্বক বিয়ে করত।

চতুর্থত: বলপূর্বক বিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ নবজাতক শিশু কন্যাকে হত্যার ফলে বিবাহযোগ্য নারীর স্বল্পতা।[৩৭৪]

জোরপুর্বক হরণ করে বিবাহের ফলে জাহেলিয়া যুগের নারীর সামাজিক মর্যাদা লাঘব হয় এবং তাকে অস্থাবর সম্পত্তি মনে করা হত। বিশেষ করে যুদ্ধে বন্ধী নারীদের সমাজিক অবস্থা এরূপ পর্যায়ে ছিল। রাসূল (স.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির[৩৭৫] পরেও যুদ্ধবন্দী নারীদের বা দাসীদের বিবাহ করার প্রথা অব্যাহত ছিল।[৩৭৬]

---

৩৭২. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮; আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা:)**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭২-৭৩।

৩৭৩. American Trust Publication, 1977. p: 101.

৩৭৪. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।
রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনগণ লুটতরাজ করত। তারা অবলা নারী ও বালিকাদের হরণ করে ধর্ষণ করত এবং বলপূর্বক উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করত। কখনও কখনও বিবাহ করত। 'কিতাবুল আঘানী'তে উল্লেখ আছে যে, সাখরা নামের এক কুমারী মেয়েকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে আত্মহত্যা করে। শিবলী নোমানী তার 'সিরাতুন নবী' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, "যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহিলাগণ (শত্রুপক্ষের) বিজয়ী সৈন্যদের অধিকারে চলে আসে যুদ্ধ বন্দিনী হিসেবে। তৎকালীন সময়ে অনেক পিতা তার যুবতী কন্যাকে অপহৃত হয়ে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য শিশুবেলায় তাকে হত্যা করত। (ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫)।

৩৭৫. রাসূল (স.) ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন।

৩৭৬. সাধারণত যুদ্ধে বন্দী-নারীদের পন্য হিসেবে গণ্য করে বিজীত সৈন্যদের মধ্যে বিলি করা হত উপভোগের জন্য যা ইসলামী শরিয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য ভিন্ন গোত্রের মহিলা যুদ্ধ বন্দী হয়ে অন্য গোত্রে গিয়ে অপরিচিতদের মধ্যে পড়তেন এবং এর ফলে তার সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হত। প্রায়শ: দেখা যেত যে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা যুদ্ধে বন্দী হয়ে কোন নিম্নমানের গোত্রের কোন অযোগ্য লোকের হাতে পড়তেন, যা সামাজিক ও গোত্রীয় কৌলিণ্যের পরিপন্থি ছিল। নবী করিমের (স.) সময় মুরাইসির যুদ্ধে জুয়াইরিয়া নামে প্রখ্যাত বনু মুস্তালিক গোত্রের এক সদস্যা বন্দী হলে যখন তাকে এক বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

৬. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিবাহ: স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের তাদের উত্তরাধিকারদের কাছে অর্পণ করা হত। এমতাবস্থায় ঐরূপ বিধবাদের উত্তরাধিকারীগণ তাদের পূর্বের স্বামীর প্রদত্ত সমপরিমাণ মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করতে পারত। উত্তরাধিকারীগণ ঐ সকল বিধবাদের যদি বিবাহ না করতে চাইত তখন তারা তাদেরকে বেশী মোহরানার বিনিময়ে অন্য লোকের কাছে বিবাহ দিত এবং মোহরানা প্রাপ্ত সকল অর্থ নিজের জন্য রাখত। উত্তারাধিকারীগণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিধবাদের নিজ ইচ্ছানুযায়ী পুন:বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক সারাজীবন স্থায়ী বিধবা হিসেবে রাখতে পারত।[৩৭৭]

৭. চুক্তিভিত্তিক বিবাহ: জাহেলিয়া যুগে চুক্তিভিত্তিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এরূপ বিবাহে এক গোত্রের মহিলাকে বিবাহের জন্য অন্য গোত্রের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করা হত। এক্ষেত্রে বিবাহের জন্য বা নারী লাভ করার জন্য যে অর্থ প্রদান করত তাকে মোহরানা বলা হত। যাকে বিক্রি করে এই মোহরানা লাভ করত নারী তার অধিকারী হত না। বরং মোহরানা স্ত্রীর পরিবার লাভ করত। তবে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ প্রথা সকল সময় সুখের হত না। কারণ সেক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সমঝোতা নিশ্চিত করা যেত না। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর গোত্র সমাজিক পরিবেশের অমিল লক্ষ্য করা যেত।[৩৭৮]

৮. নিকা উল মেকত বা লজ্জাজনক ঘৃণিত বিবাহ: এরূপ বিবাহ প্রথা অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় পুত্র তার বিমাতাকে বিবাহ করতে পারত। আবু বকর জাস্সাস এ সম্পর্কে বলেছেন, "জাহেলি যুগে পিতার স্ত্রী (সৎমা) কে বিয়ে করার প্রচলন ছিল।"[৩৭৯] অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিবাহ দিতে পারত আবার সে বিবাহ বন্ধও করতে পারত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হত।[৩৮০] পরবর্তীতে রাসূল (স.) কঠোরভাবে এরূপ বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং এ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছেন তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে না, পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। এটি অশ্লীল অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৩৮১] জাহেলী যুগে পিতার মৃত্যুর পর গর্ভধারিণী মাকে ছেলেদের অধীনস্থ হয়ে জীবন কাটাতে হত। ছেলেদের ইচ্ছানুযায়ী তাকে চলতে হত। তার নিজের মতামতের কোন মূল্য ছিল না।

এছাড়াও তৎকালীন সমাজে কুমারী মেয়েদের বিয়ে দেয়ার আরেকটি প্রথা ছিল, মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সংবাদ প্রচার করা হত। এরপর বিভিন্ন পুরুষ এসে ঐ মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। যদি কারো

গোত্রের সদস্য ছাবিত ইবন কায়েসের হাতে দেওয়া হয় তখন তিনি অর্থের বিনিময়ে ছাবিতের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চান। কিন্তু তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তিনি নবী করিমের কাছে ঋণ গ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। নবী করীম নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে জুয়াইরিয়াকে মুক্ত করে বিবাহ করেন। (ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২)।

[৩৭৭]. Said Abdullah Sefi Al Hatimy, Ibid, p: 3-4; আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা:)**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩।

[৩৭৮]. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬-২৭।

[৩৭৯]. আবু বকর জাসসাস, **আহকামুল কুরআন**, ২য় খন্ড, (লাহোর: সুহায়েল একাডেমী, ১৯৯১), পৃ: ১৪৮।

[৩৮০]. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।
তৎকালীন সমাজে স্বামীর মৃত্যু ঘটলে ধারণা করা হত স্ত্রীর পাপে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এজন্য স্ত্রীকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হত। কোন নারী বিধবা হলে মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কক্ষে পূর্ণ এক বছর আবদ্ধ থাকতে হত। এই সময়ের মধ্যে তেল বা সুগন্ধি কোন দ্রব্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলে তার কাছে একটি গর্দভ অথবা একটি ছাগল আনা হত। তারপর ঐ নারী অন্ধকার কক্ষের বাইরে আসত এবং তার হাতে একমুষ্ঠি ছাগ নাদি (ছাগলের বিষ্ঠা) দেয়া হত। সে এই নাদিগুলো নিক্ষেপ করে দিলেই বিধবা হওয়ার কঠিন ইদ্দত হতে নিষ্কৃতি লাভ করতো। এটাই ছিল স্বামী হারানোর পাপের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত। হতভাগিণী বিধবা নারী দীর্ঘ এক বছর পর অন্ধকার প্রকোষ্ঠের কারাগার হতে মুক্তি পেলেও মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীদের উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারত না। কারণ বিধবারা মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে উত্তরাধিকারীর অধিকারে আসত। অন্য স্বামী গ্রহণ করার কিংবা পিত্রালয়ে অথবা অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়ার তার কোন অধিকার থাকত না। (মোল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তাফা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৮)। আবার মেয়ের বিয়ের সময় মোহর হিসেবে যে অর্থ দেওয়া হত তাতে স্ত্রীর কোন অধিকার থাকত না। এই অর্থের অধিকারী হত তার পিতা। (সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, **সীরাতুন্নবী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৬)।

[৩৮১]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ২২।

Dhaka University Institutional Repository

পছন্দ হত তাহলে সে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করত। আর যাদের পছন্দ হত না তারা বিবাহে অস্বীকৃতি জানাতো। নারীদের সতীত্ব ও আত্মমর্যাদার কোন মূল্য ছিল না। তাদের এ ধরণের ঘৃণিত ও অভিশপ্ত জীবন থেকে মৃত্যু ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ ছিল না।[৩৮২] ইয়াতীম মেয়েদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ ছিল। ঘটনাক্রমে কোন সুন্দরী এবং সম্পদশালী ইয়াতিম বালিকা যদি কারো তত্ত্বাবধানে এসে যেত। তাহলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করত। কিন্তু ঠিকমত মোহর দিত না।[৩৮৩] মদীনা শরীফে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ তার বিধবা স্ত্রীরও অধিকারী হত। বিধবা তার নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত থাকত এবং মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত সে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করত।[৩৮৪]

তৎকালীন আরব রমণীর স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না বরং এক্ষেত্রে পিতা বা তার কোন পুরুষ আত্মীয়ের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন বিমাতা এমনকি তার বিধবা পুত্রবধূকেও বিয়ে করতে পারত। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধুকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত।[৩৮৫] বস্তুত নারীর উপর পুরুষের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব নারীর মর্যাদা একবারে হীন করে দিয়েছিল এবং নারী ভূসম্পত্তিরূপেই পরিগণিত ছিল।

অন্যান্য সভ্যতার মত আরবেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। বরং সামর্থ থাকলে যে যত খুশী বিয়ে কাতে পারত।[৩৮৬]
তৎকালীন আরবে প্রতিষ্ঠিত পতিতালয় না থাকলেও নারী পুরুষের মধ্যে শর্তাধীনে ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অবাধেই স্থাপিত হত। এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পেশাদারী নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তারা অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করত এবং সামজিকভাবে ঐসব নর্তকীরা মর্যাদা পুর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলে জনগণ মনে করত।[৩৮৭]

জাহেলিয়া যুগে পুরুষের ন্যায় নারীরাও একাধিক বিবাহ করতে পারত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে এ ধরণের প্রথা দূষণীয় ছিল না। রবার্ট স্মীথ তার ‘Kinship and Marriage in Early Arabia’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন “যে কোন এক গোত্রের কয়েকজন ভাই একত্রে অন্য গোত্রের কোন মহিলাকে হরণ করে নিয়ে আসত বা ক্রয় করে নিয়ে আসত এবং উক্ত মহিলার সাথে সকল ভাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত বা তাকে উপপত্নী করে রাখত। এক্ষেত্রে মোহরানার অর্থের পরিমাণ হত মাত্রাধিক।” এই জঘন্য বিবাহ প্রথার মূলে ছিল নারীর স্বল্পতা। অনেক সময় যুদ্ধবন্দী নারীর সংখ্যা কম হলে একজন নারীকে অনেক পুরুষের অংকশায়িনী হতে হত।[৩৮৮] পরবর্তীতে রাসূল (স.) এই সমস্ত ঘৃণ্য ও নারীর জন্য অবমাননাকর প্রথা বাতিল করে সম্মানজনক বিবাহ প্রথার প্রবর্তন করে নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেন।

---

[৩৮২]. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১২।
[৩৮৩]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, **সহীহুল বুখারী,** ২য় খন্ড, কিতাবুত তাফসীর, (দেওবন্দঃ শিরকাত মুখতার, ১৯৮৫), পৃঃ ৬৫৮।
[৩৮৪]. Nazirah Zein Ed-Din, Edited by Azizah Al Hibri; **Women and Islam,** (England: Perganon Press, Oxofrd), p: 222.
[৩৮৫]. Jones Beven, **Woman in Islam**, (Lucknow, 1951), p: 23, 18-21, 28; Smith W. **Kinship and marriage in Early Arabia**, (London, 1970), p: 91-92; Katrak Jamshid, **Marriage in Ancient Iran**, (Bombay, 1965), p: 36; Thomas Bertram, **The Arabs**, (London, 1937), p: 16.
[৩৮৬]. O'Leary De Lacy, **Arabia Before Muhammad**, (London, 1927), p: 191; Thomas Bertram, **The Arabs**, Ibid, p: 16.
[৩৮৭]. Ameer Ali, **The Spirit of Islam**, p: 24-25.
[৩৮৮]. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।
স্ত্রীলোকের একই সাথে একাধিক স্বামী থাকার প্রথাকে নারীর বহুবিবাহ প্রথা বা Polyandry বলা হয়। জাহেলিয়া যুগে নারীর বহুবিবাহ প্রথায় নবজাতক শিশুর পিতৃত্ব নিয়ে সমস্যা দেখা দিত। সেক্ষেত্রে স্ত্রী তার সকল স্বামীর উপস্থিতিতে একজনকে সন্তানের জন্মদাতা হিসেরে চিহ্নিত করত। এক্ষেত্রে চিহ্নিত ব্যক্তি পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারত না। (ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯-৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ বিচ্ছেদ

জাহেলিয়া যুগে বিভিন্ন প্রকার বিবাহ প্রথার মত বিবাহ বিচ্ছেদও বিভিন্ন প্রকার ছিল। যা নিম্নরূপ:

প্রথমত: 'খুলা' দ্বারা: এই প্রথা দ্বারা যদি কোন স্বামী কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইত তা হলে স্বামী স্ত্রীর পিতার নিকট থেকে মোহরানার সমুদয় অর্থ ফেরত নিয়ে তার স্ত্রীকে পিতার পরিবারে পাঠিয়ে দিত।

দ্বিতীয়ত: 'তালাক' দ্বারা: এই প্রথা অনুযায়ী মোহরানা প্রদান অথবা নির্দিষ্ট মুল্যের বিনিময়ে স্বামী যদি কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইত তাহলে স্বামী কেবলমাত্র "আন্তী তালাক" অর্থাৎ 'তোমাকে তালাক দেওয়া হল' বললেই তালাক হয়ে যেত। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে তার প্রদত্ত মোহরানার কোন অংশ বাকী থাকলে স্বামী তা পরিশোধ করত। কিন্তু স্বামীকে কোন প্রকার কারণ দর্শাতে হত না।[৩৮৯]
তৃতীয়ত: 'ইলা' দ্বারা: তৃতীয় প্রকার বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা হচ্ছে 'ইলা' অর্থাৎ 'না'। এই প্রথায় স্বামী তার স্ত্রীর সাথে একই পরিবারের গন্ডিতে বসবাস করেও তার সাথে সকল সংস্পর্শ ত্যাগ করতেন। এটি বর্তমান যুগের বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে পৃথকভাবে বসবাস করা। মাওলানা আব্দুর রহিম[৩৯০] এই প্রথাকে 'স্থগিত তালাক' বলেছেন।[৩৯১]

চতুর্থত: 'যিহার' দ্বারা: চতুর্থ প্রকার বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা হল 'যিহার' অর্থাৎ 'পৃষ্ঠদেশ'। প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতেন তুমি আমার জন্য মায়ের পৃষ্ঠ সদৃশ্য তাহলে স্বামী স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে 'যিহার'[৩৯২] বলে।

---

৩৮৯. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।
বর্ণিত আছে, একবার অথবা পরপর তিনবার (একবারে নয়, যথেষ্ট সময় নিয়ে) উচ্চারণ করলে তালাক হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দু'বার তালাক উচ্চারণ করলে তালাক হত না এবং স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। তৃতীয়বার তালাক বললে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত অর্থে বিচ্ছেদ হত। কিন্তু আরব ও ইসলামী গবেষকগণ এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, প্রাক ইসলামী যুগে তিনবার কেন, দশবার শতবার, এমনকি সহস্রবার তালাক উচ্চারণ করার পর স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গৃহে নিয়ে গিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে, একাধিকবার তালাক দিয়েও পুনরায় পৌত্তলিক আরবগণ তাদের স্ত্রীকে পরিবারে ফিরিয়ে নিতেন। এ প্রসঙ্গে ইসলামের বিধান হলো স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে সুস্পষ্ট কারণ দর্শাতে হবে এবং প্রকাশ্যে তালাক (তিন তালাক) উচ্চারণ বাধ্যতামূলক। এবং কোন মুসলমান তার স্ত্রীকে তিন তালাক বা তালাকের মামলা করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর পর পুনরায় তার স্ত্রীর সাথে সংসার করতে চাইলে স্ত্রীকে অন্য এক পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হয়। কিছুকাল নতুন স্বামীর সাথে ঘর করার পর স্বামী যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে পূর্বের স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বৈধ বলে স্বীকৃত। (প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩-৩৪)।

শরিয়ত মোতাবেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করার পূর্বে ইদ্দত পালন করতে হয়। এর মূল কারণ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সন্তান সম্ভবা কিনা যাচাই করা। পবিত্র কুর'আনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। ইদ্দতের সময় কাল সঠিকভাবে গণনা কর আর তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। তোমরা তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করনা এবং তারা যেন বের না হয়, যদিনা তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়...। অত:পর তাদের ইদ্দত পুরণের সময় আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ (তালাক) করার এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে স্বাক্ষী রাখবে। তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুমতি হবার আশংকা নেই তাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে জেনে রেখো তাদের ইদ্দতকাল হবে তিনমাস এবং যারা এখনও রজ:স্বলা হয়নি, তাদের ইদ্দতকালে অনুরূপ এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (আল কুর'আন, **সুরা আত তালাক**, ১-৩)। সুতরাং প্রাক ইসলামী যুগের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথার আমূল পরিবর্তন হয় রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পর।
৩৯০. বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক।
৩৯১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত পৃ: ৩৪।
৩৯২. পবিত্র কুরআনে 'যিহার' শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ কোন মানুষের দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তুমি 'যিহার' করেছ তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি।" (আল কুর'আন, **সুরা আল আহযাব**, আয়াত: ৪)। আল্লাহ বলেন, "এটি এজন্য যে তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের নারীরা সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নারীগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার নিকট থেকে কোন সম্পদ পেত না। বৈবাহিক সূত্রে নারীদের যে মোহরানা নির্ধারিত হত তা কন্যার পিতা ভোগ করত। তবে মক্কার কিছু কিছু মহিলা স্বাধীনচেতা ছিল এবং তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করত। যে সমস্ত পণ্য বিক্রি হত তার অল্প পরিমাণ অংশ মুনাফা হিসেবে ব্যবসায়িক মহিলাগণ লাভ করত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পৌত্তলিক যুগের আরবরা উদার ছিল না। পরবর্তীতে ইসলামে উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তিত হয়ে সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত হয়।[৩৯৩]

জাহিলিয়াতের যুগে মদীনাবাসীরা ইহুদীদের দ্বারা প্রচন্ডভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। ইহুদী সমাজের মত তারা স্ত্রীদেরকে মাসিক ঋতুর সময় এতো বেশী অপবিত্র বলে মনে করত যে তাদের হাতের রান্না করা খাদ্য এমনকি পানি পর্যন্ত পান করত না। স্ত্রীদের সাথে এক বিছানায় শয্যা গ্রহণ করত না। তাদের হাতের স্পর্শও তারা অপবিত্র বলে গণ্য করত। এরই ফলশ্রুতিতে নারীরা ঋতুবর্তীকালীন সময়ে সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন যাপন করত।[৩৯৪]

নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায় ছিল, যাকে সে নিজ খেয়াল খুশি মতো ব্যবহার করতো। হযরত মুহাম্মদ (স.) উপর কুর'আনের বাণী অবতীর্ণের পূর্ব পর্যন্ত আরবের নারীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলতো। কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার কোন পুরুষ আত্মীয় তাকে স্বীয় চাদর দ্বারা ঢেকে ফেলত যেন লোকে তাকে দেখতে না পায়। বিধবাটি সুন্দরী হলে সে আত্মীয় তাকে বিয়ে

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (আল কুর'আন, **সুরা মুজদালা**, আয়াত: ২-৪)।

পবিত্র কুরআনে 'যিহার' কে নিন্দা করা হয়েছে এবং স্ত্রী ও মাতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য অনুযায়ী 'তালাক' ও 'যিহার' এক নয়, তিন তালাক হলে স্ত্রী স্বামী গৃহে বসবাস করতে পারেন না, কারণ শরিয়ত মোতাবেক স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা, কিন্তু 'যিহার' তালাকের মত কঠিন ও অলজ্ঘনীয় রীতি নয়, কারণ অনুতপ্ত হয়ে 'যিহার' প্রাপ্ত স্ত্রীকে স্বামী গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ এক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন। জাহেলিয়া যুগে বৈবাহিক প্রথা হিসেবে 'যিহার' স্বামীর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি প্রযোজ্য, তাকে স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত করা হত না বরঞ্চ সহানুভূতির সাথে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হতো, যতদিন না অন্য কোন ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর স্বামীর সাথে চুক্তি মোতাবেক তার স্ত্রী স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত না হতেন। কিন্তু ইসলামী বিধানে যিহারের কোন স্থান নেই। যদি কোন স্বামী তার নিজের অজান্তে বা আকস্মিকভাবে স্ত্রীর প্রতি যিহার করেন তা হলে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারেন। এই প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে রয়েছে একজন দাস বা দাসীকে মুক্তিদান এবং দুমাস রোজা রাখা অথবা ষাট জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে খাবার দান। পবিত্র কুর'আনের সুরা তালাকের এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যিহার দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, তার ভরণপোষণ ও থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সন্তান সম্ভবা হলে অথবা সন্তান প্রসবের পর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা (স্বামীগণ) তোমাদের সামর্থমত যেরূপ বাড়ীতে বাস কর তাদেরকে সেরূপ বাড়িতে বাস করতে দিও। তাদেরকে উত্যক্ত করে সংকটে ফেলবে না। তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। যদি তারা (স্ত্রীগণ) তোমার সন্তানদের স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী স্তন্য দান করবে।"(আল কুর'আন, **সুরা আত তালাক**, আয়াত: ৬)।

[৩৯৩]. এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ আছে, "পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক এক নির্ধারিত অংশ।"(আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ৭)।

Richard Burton বলেন, Women in Arab Countries had legal rights in inheritance and in Law. which were not given to English Women Until 1882. "আরব দেশের মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার এবং আইনের যে অধিকার রয়েছে তা ইংরেজ মহিলাগণ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লাভ করতে পারেন নি।" অপর একজন লেখক বলেন, "Islam gave women a greater freedom than any other religion or in society." "অন্য কোন ধর্মে অথবা সমাজের তুলনায় ইসলাম মহিলাদের অধিকতর স্বাধীনতা দিয়েছে।" (ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮)।

[৩৯৪]. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

করত। আর সুন্দরী না হলে তাকে যাবজ্জীবন কারগারে রাখা হত এবং কারাগারে মৃত্যুর পর সেই পুরুষ উক্ত নারীর সম্পত্তি দাবি করত।[৩৯৫]

সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবর রূপে বসবাস করত। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদেরকে ধরে বিয়ে করত। এ জন্যই আরবগণ কন্যা সন্তানদের জন্মকে অত্যন্ত ভয় ও ঘৃণা করতো এবং পুত্র জন্মকে পছন্দ করত। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হতো। এবং এ কারণেই আরবগণ কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।[৩৯৬] Rustum and Zurayk তাঁর History ofthe Arabs and Arabic Culture, গ্রন্থে বলেন, "This revolting custom prevailed extensively untill it was supressed by Muhammad peace be on him."[৩৯৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, একথা দিবালোকের মত সত্য যে হযরত মুহাম্মদ (স.) দমন না করা পর্যন্ত তৎকালীন আরবের সামগ্রিক অবস্থা চরম অবনতিশীল ছিল। অজ্ঞতা ও মুর্খতা ছিল সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান, অশ্লীলতা, নোংরামী, পাপাচারে ডুবে ছিল সারাদেশ। মানুষ মনুষ্যত্বহীন পশুর মতো জীবন যাপন করত। ভোগের প্রয়োজনে ভাগ্যহীন নারীজাতিকে বেচাকেনার নিয়ম প্রচলিত ছিল। মানুষ হয়েও পুরুষরা নারীদের প্রতি এমন আচরণ করত যেন তারা জড়বস্তু মাটি বা পাথর। পরবর্তীতে রাসুল (স.) এর আবির্ভাবের পরেই নারীরা উক্ত অমর্যাদাকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে এবং সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

---

৩৯৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৬৫।
৩৯৬. Nazira Zei Ed-Din, Edited by Aziah AL Hibri, **Women and Islam**, (England: Pergamon press, Oxford), p: 222.
৩৯৭. Rustum and Zurayk, **History of the Arabs and Arabic Culture**, (Beirut: 1940), p: 36.

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পর নারীর অবস্থান

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্ম নারীকে একেবারে অকল্যাণকর, সভ্যতার পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে নিষ্ক্রিয়তার এমন এক গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল যেখান থেকে উঠে আসা বা উত্থান ও অগ্রগতি লাভ করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। একমাত্র ইসলামই নারী জাতিকে এই অন্ধকার গহ্বর থেকে উত্তোলন করে সমাজে মানুষ হিসাবে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে।[৩৯৮]

আল কুর'আনের আলোকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

মানব জীবন ধারায় সমানভাবে নারী পুরুষ উভয়ের মুখাপেক্ষী। পুরুষের মত নারীকেও সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য অংশ হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নর-নারী মানুষের এই দুটি শ্রেণী দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করেছেন। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা পুত্র কন্যা উভয় প্রকার সন্তান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্বজ্ঞানে জ্ঞানান্বিত ও সর্বশক্তিমান।"[৩৯৯]

সম্মান ও মর্যাদার বিচারে সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষের মাঝে ইসলামে কোনই পার্থক্য ও ভেদাভেদ নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ জাহেলী ধ্যান-ধারণা,[৪০০] এরূপ চিন্তাভাবনা ইসলামে স্বীকৃত নয়।[৪০১]

আল কুর'আনে সুস্পষ্টভাবে নারীর সম্মানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, জলে ও স্থলে তাঁদেরকে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি তাঁদেরকে সৃজন করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[৪০২] সুতরাং এ সম্মান ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালাম[৪০৩] ও তাঁর সন্তান নারী-পুরুষ সবার জন্য। তাই সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড নারী বা পুরুষ নয়। বরং ইসলামে ঈমান ও সৎকর্মকে নারী পুরুষের মর্যাদার মানদন্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নারী জাতির বেঁচে থাকার অধিকার ঘোষণা করে কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "তারাও জীবিত থাকবে এবং যে ব্যক্তিই তার অধিকার হস্তক্ষেপ করবে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ......যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[৪০৪] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি।"[৪০৫]

---

[৩৯৮]. Josheph Chachat, **Pre Islamic Background of Family Development of Jurisprudence**, (Washington: Middle East Institute, 1995), p: 28–57.

[৩৯৯]. আল কুর'আন, **সূরা আশ শূরা**, আয়াতঃ ৪৯-৫০।

[৪০০]. জাহেলী যুগে নারী সম্পর্ক ধ্যান ধারণা ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক। নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তারা নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করতো। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা ছিল একটি অভিশাপ ও অপমানকর বিষয় তাই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিতো। (মোল্লা' মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তফা**, দিল্লীঃ মাকতাবা উসমানিয়ো, ১৯৫৭ খ্রীঃ, পৃঃ ৭৬)।

[৪০১]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী**, (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রিঃ), পৃঃ ২৬।

[৪০২]. আল কুর'আন, **সূরা বনী ইসরাঈল**, আয়াতঃ ৭০।

[৪০৩]. হযরত আদম (আঃ) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। জান্নাতই ছিল তার বসবাস। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে প্রেরীত আল্লাহর প্রথম খলীফা বা প্রতিনিধি। (ইবনে কাসীর, **আস-সিরাতুন নাবাবিয়া**, কায়রোঃ ঈমান বাবিল হলবী, ১৯৬৪ খ্রিঃ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০)।

[৪০৪]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাকভীর**, আয়াতঃ ৮-৯।

[৪০৫]. আল কুর'আন, **সূরা আল আন'আম**, আয়াতঃ ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলী যুগে বিবাহিত বা দাম্পত্য জীবনে স্বামীর উপর স্ত্রীর কোন অধিকার ছিল না। নারীরা সর্বদা পুরুষের সেবা দাসী হিসেবে নিবেদিত ছিল। নারী-পুরুষের দাম্পত্য অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "স্ত্রীদের উপর স্বামীদেকে যে রকম অধিকার আছে, স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের ঠিক অনুরূপ সমান অধিকার রয়েছে।"[৪০৬] আল্লাহ আরও বলেন, "(হে স্বামীরা জেনে রাখ যে), স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরাও তাদের ভূষণ।"[৪০৭]

জাহেলিয়া যুগে নারী নির্যাতনের একটি অপকৌশল এরূপ ছিল যে, স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হলে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাকে ফিরিয়ে আনত। ফিরিয়ে আনার পরই পুনরায় তালাক দিত। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরিয়ে আনত। আবার তালাক দিত এবং আবার ফিরিয়ে আনত। এমনি করে সারা জীবন ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে স্ত্রীকে কষ্ট দিত। নিজেও তাকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। আবার তালাক দিয়ে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। এমনই এক অমানবিক অত্যাচার থেকে ইসলামই নারীকে মুক্তি দান করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পুর্বেই তাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী রেখে দাও অথবা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে ভালভাবে মুক্ত করে দাও। তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং জুলুম করার উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। আর আল্লাহর নির্দেশাবলীকে তোমরা তামাশা ও হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না।"[৪০৮]

জাহেলী যুগের নারী নির্যাতনের আর একটি কুপ্রথা ছিল, অনেক সময়েই স্বামীরা কারণে অকারণে স্ত্রীর কাছে গমন না করার শপথ করে বসত। কখনও এ শপথের সময় উল্লেখ করত আবার কখনও সময় উল্লেখ করত না। এমনি করে কখনও অনির্দিষ্ট কালের জন্য কখনও সারাজীবনের জন্য স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিত। তাকে দাম্পত্য অধিকার হতে বঞ্চিত করত। ইসলাম নারীকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা স্ত্রীদের কাছে গমন না করার জন্য কসম করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। এরপর তারা যদি মিলমিশ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি স্ত্রীকে একবারে পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্পই করে থাকে, তাহলে তালাক দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিবে। মহান আল্লাহ এসব শুনেন ও জানেন।"[৪০৯]

রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পুর্বে আরব সমাজে নারী নির্যাতনের আরও দু'টি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। একটি হল এই যে, পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা বিমাতাকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ বলে মনে করত। তাকে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়ে আটকিয়ে রাখত এবং তার সম্পদ আত্মসাৎ করত। আর ছেলে না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরাও তার স্ত্রীর সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত। আর দ্বিতীয় প্রথাটি এই ছিল যে, স্বামী স্ত্রীকে মহর হিসেবে দেয়া সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সে মহরের সম্পদ নিয়ে চলে যাবে এজন্য তাকে তালাকও দিত না। ইসলাম নারীকে এই উভয় প্রকারের অত্যাচার হতেই মুক্তি দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, জোর করে নারীদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তাদেরকে তোমরা মোহর হিসেবে যা দিয়েছ, তার অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখে কষ্ট দিও না।"[৪১০]

---

[৪০৬]. আল কুর'আন, সুরা আল বাকারা, আয়াতঃ ২২৮।

[৪০৭]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ১৮৭। এই আয়াতে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, সকল ব্যাপার ও বিষয়েই নারী পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। মানবীয় সকল অধিকারেই নারী ও পুরুষ সমান। প্রত্যেকের উপরেই প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে এবং তা সমান সমান। পোশাক নারীদের জন্য যেরূপ প্রয়োজন, পুরুষের জন্যও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। পোশাকের প্রয়োজনীয়তা কারও জন্য এতটুকুও কম বেশী নয়। একবারেই সমান সমান। আর পুরুষের সেই পোশাক হল নারীরা আর নারীদের সেই পোশাক হল পুরুষেরা। পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা প্রদান করেছে।

[৪০৮]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২৩১।

[৪০৯]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২২৬-২২৭।

[৪১০]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে অবহেলা না করে তাদেরকে সঠিক সময়ে বিবাহ দেয়ার জন্যে পিতার প্রতি যথেষ্ট তাকীদ দেয়া হয়েছে।[৪১১] আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন ও নিঃসঙ্গ আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান ও বিবাহযোগ্য তাদেরকে বিয়ে দাও।"[৪১২]

আল কুর'আনে আরও বলা হয়েছে, "এবং বিয়ে দাও তোমাদের এমন সব ছেলেমেয়েদের যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই। বিয়ে দাও তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য হয়েছে।"[৪১৩]

অন্ধকার যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই ছিল না তাদের সাথে পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা হত। স্বামীরা স্ত্রীদের জুয়া খেলায় বাজি ধরত আর বাজিতে হেরে গেলে অনায়াসেই স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিত। ইসলাম নারীদেরকে সেই অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি দান করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবং নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। কোন কারণে যদি তারা তোমাদের কাছে ভাল নাও লাগে, তাহলে এভাবে চিন্তা কর যে, তোমরা হয়ত এমন একটি বস্তুকে খারাপ মনে করছ, যার মধ্যে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য মহা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"[৪১৪]

জাহেলী যুগে নারীরা নিজের উপার্জিত সম্পদ এবং পিতার সম্পদের উত্তরাধিকার হতে পারত না। অথচ নারীকে এই উভয় ক্ষেত্রে অধিকার দিয়ে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "পুরুষের জন্য তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আর নারীদের জন্যও তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর কাছেই তোমরা তার নি'আমতের জন্য প্রার্থনা কর।"[৪১৫] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হউক বা বেশীই হউক এক নির্ধারিত অংশ।[৪১৬]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করে পৃথীবিতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং এই প্রতিনিধিত্ব যেন মানুষ সহজভাবে করতে পারে সেজন্য তাদেরকে বিধান দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত বিধি বিধান পালন করা, সৎকাজ করা, অসৎ কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা, অপরকে অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত! মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।"[৪১৭] আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকবে যারা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে তারাই সফলকাম।"[৪১৮] সৎকাজের আদেশ দেওয়া নিজ পরিবার থেকে শুরু করতে হবে।[৪১৯] কুর'আন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের

---

[৪১১]. মাওলানা আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮। ছেলে বা মেয়েদের সঠিক সময়ে বিবাহ না দিলে যদি তারা কোন পাপ কাজ করে তাহলে তার গুনাহের শাস্তি তার পিতাকে ভোগ করতে হবে। কেননা এই ব্যাপারটি পিতারই ত্রুটি ও অবহেলার দরুন হয়েছে। সুতরাং সন্তান বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সেই সঙ্গে বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরও কর্তব্য হচ্ছে এজন্যে নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা।

[৪১২]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ৩২।

[৪১৩]. আল কুর'আন, **সূরা আন নূর**, আয়াতঃ ৩২।

[৪১৪]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১৯।

[৪১৫]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ৩২।

[৪১৬]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ৭।

[৪১৭]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ১১০।

[৪১৮]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ১০৪।

[৪১৯]. রাসুল (স.) ইসলামের দাওয়াত প্রথমে নিজ পরিবারের মধ্যে দিয়েছিলেন। নিজের স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত যায়িদ ইবনে হারীসা (রাঃ) কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তারা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।"[৪২০] রাসুলুল্লাহ (স.) প্রথম নিজ পরিবারের হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত যায়িদ ইবন হারীস (রাঃ) কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, একমাত্র ইসলামই নারীদের অধিকার নিশ্চিত করে পরিবার ও সমাজে সুখে শান্তিতে বসবাস করার নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

হাদীসের আলোকে নারীর মর্যাদা

সমস্ত বিশ্ব যখন নারীকে পাপের উৎস এবং সাক্ষাত পাপ ও গুনাহ বলে মেনে নিয়েছিল তখন ইসলামই নারীকে অমর্যাদাকর অবস্থা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে মুল্যায়ন করে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল কুর'আনে যেমন নারীর সম্মান ও অধিকার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তেমনি রাসূল (স.) এর বাণীতেও নারীর প্রতি মর্যাদা, সম্মান ও ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, "পৃথিবীতে তিনটি জিনিস আমার প্রিয়, সুগন্ধি, নারী ও নামাজ। নামাজের মধ্যে আমার চোখ জুড়ানো বা আত্মার শান্তি রয়েছে।"[৪২১] হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) কোন একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে একদল শিশু ও নারীকে আসতে দেখে দাড়িয়ে বললেন, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।"[৪২২]

রাসূল (স.) নির্যাতিত নারী জাতিকে সহায়তা ও মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন বর্তমানকাল অবধি নারী অধিকারের কোন দাবিদার তার চেয়ে বাস্তবধর্মী ও ন্যায়ানুগ শিক্ষা পেশ করতে পারেনি। রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা মেয়েদের নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চারদিক থেকে ধন সম্পদ লুণ্ঠন ও সঞ্চিত করা এবং মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।"[৪২৩]

রাসূল (স.) কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের চেয়েও অধিক মর্যাদা দান করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।"[৪২৪]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই কন্যাকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকব। এই বলে তিনি হাতের আংগুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[৪২৫]

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজে নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। একাধিক বিবাহ, ব্যভিচার, গণিকাবৃত্তি, কন্যা সন্তান জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা

সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (সম্পাদনা পরিষদ, **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম**, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫, পৃঃ ৪৪৯)।

[৪২০]. আল কুর'আন, **সুরা আত তাহরীম**, আয়াতঃ ৬।

[৪২১]. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোবাইব ইবনে আলী, **সুনানে নাসায়ী**, কিতাবু ইশরাতিন নিসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হুববুন নিসা, ২য় খন্ড, (দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তা.বি.), পৃঃ ৭৭

[৪২২]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আনসারদের সম্পর্কে নবী (স.) এর উক্তিঃ তোমরাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১১৪; **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আনসারদের মর্যাদা, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৭৪।

[৪২৩]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল আদব অধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৮৪।

[৪২৪]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কে উত্তম সাহচর্যের পাত্র, ১৩ খন্ড, পৃঃ ৪; **সহীহ মুসলিম**, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পিতামাতার প্রতি সদাচার করা কেননা তাঁরাই উত্তম হকদার, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২।

[৪২৫]. **সহীহ মুসলিম**, সদাচরণ ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেয়েদের প্রতি সদাচারের ফযিলত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

করা প্রভৃতি চুড়ান্ত অশ্লীলতা ও ঘৃণ্য বর্বরতায় সমস্ত সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। যৌনলালসা চরিতার্থ করার জন্য আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এক একজন পুরুষ অগণিত নারীকে বিয়ে করতো অথবা নিজস্ব হেরেমে নারীদেরকে উপপত্নী হিসেবে রাখতো।

তৎকালীণ সমাজে নারী পণ্যের চেয়েও মূল্যহীন ছিল। নারীদেরকে মনে করা হত শয়তানের মন্ত্রদাতা এবং কোন নারীকে তারা বিশ্বাস করত না। নারীদের সম্পর্কে যে সকল প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল তা হল: (1) Women are the whips of Saitan (2) Trust neither a king, a horse nor a woman (3) Our mother forbids us to err and (herself) runs into error. (4) Obedience to a woman will have to be repented. (5) Women has no Soul etc.[৪২৬]

সে সময় ইহুদিদের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছাড়াও শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইহুদী ও অযাযাবর আরবদের মধ্যে নারীর অবস্থা অধ:পতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। হিব্রু কুমারীগণ তাদের পিতৃগৃহে ভৃত্যের চেয়ে কম মর্যাদা পেত। নাবালিকা অবস্থায় পিতা তার কন্যাদেরকে বিক্রি করতো। কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো না, তবে কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে সে ক্ষেত্রে কন্যার উপর উত্তরাধিকারী বর্তাতো। নারী শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। সে তার স্বামী কিংবা পিতার সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হত এবং কোন ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকারসূত্রে তার পুত্র সন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত হত। এর ফলশ্রুতিতে বৈমাত্রেয় পুত্রের সংগে বিমাতার প্রায়শই ব্যভিচারের মত জঘন্য ঘটনা ঘটতো যা পরবর্তীকালে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ইয়েমেনের অর্ধ ইহুদী অর্ধ-সেবীয় গোত্রসমূহের মধ্যেও স্ত্রীলোকদের একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।[৪২৭] কন্যা সন্তানদের অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ভয়াবহ প্রথাটি কুরাইশ ও কিন্দাহ গোত্রের লোকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এই জঘন্য নির্মম প্রথা বাতিল করেন এবং দেবতাদের কাছে সন্তান বলিদানের প্রথাটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরিশেষে বলা যায়, পুরুষের মত নারীকেও সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশরূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীদেরও জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট। উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে সাধিত বিপ্লব নারী ও পুরুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা সাধনার ফল। তাই ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ব্যবহার করে নারীর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা জীবনে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভূত কল্যাণ সাধিত করতে পারে। সর্বোপরি তার উপর অর্পিত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে। এর ফলে নারী ও সমাজ উভয়েই সমভাবে উপকৃত হবে।

---

৪২৬. S. M. Madani, **The Family of the Holy Prophet (Sm)**, (Delhi: Adam Publishers, India), p: 3.
৪২৭. Lenor mant, **Ancient History of the East**, Second part, p: 318.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আধুনিক বিশ্বে নারী

পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক অধঃপতনের প্রতিবিধানের জন্য ঈসায়ী ধর্মের প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ সুফল পরিলক্ষিত হয়। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ব্যভিচার, নগ্নতা ও পাপাচারের করাল গ্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাদের অন্তরে পুণ্য চরিত্রের ধারণা তুলে ধরা হয়। কিন্তু নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক শারিরীক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধর্মযাজকদের যে ধারণা ছিল তা চরম সীমা অতিক্রম করে।[৪২৮] খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ফরাসী বিপ্লব জন্মলাভ করে এবং নবযুগের সুচনা হয়। নবযুগের প্রারম্ভে নারী জাতিকে সকল অধিকার প্রদান করা হলো। যেমনঃ বিবাহ ও তালাকের অধিকার, জীবিকার্জনের অধিকার, উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার, পুরুষের দাসত্ব মোচন করে সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীনতা প্রদান করা হলো। এসব অধিকার পাওয়ার ফলে ইসলাম প্রদত্ত পর্দার সীমারেখা ভুলে নারী লাভ করল চরম স্বাধীনতা। এরফলে উনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাতির আচরণের মধ্যে সংগত সীমালংঘনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হলো এবং বিংশ

---

৪২৮. ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের প্রাথমিক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, "নারীই পাপের মূল উৎস, পুরুষের জন্য নারী পাপ আন্দোলনের উৎস এবং নরকের দ্বার স্বরূপ। নারীর কারণেই মানবের যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হয়। নারীরূপে জন্মগ্রহণ করা লজ্জাজনক ব্যাপার। তার রূপ সৌন্দর্য্যের জন্য তাকে লজ্জাবোধ করা উচিত। কারণ ঐ রূপ সৌন্দর্য্যই শয়তানের মারণ যন্ত্র। যেহেতু নারী জগতবাসীর জন্য অভিশাপ বয়ে এনেছে সেজন্য তাকে চিরদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে হলেও তা মূলত অপবিত্র কাজ এবং উক্ত সম্পর্ক হতে বিরত থাকা উচিত।" ধর্ম যাজকদের এরূপ মনোভাবের প্রভাব গোটা সমাজে পরিলক্ষিত হতে লাগল। মানুষ বৈবাহিক সম্পর্ককে নৈতিক জীবনের দিক থেকে অপবিত্র, ঘৃণিত, অধঃপতিত ও পাপজনক মনে করে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকাকে পুণ্যের কাজ ও উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক মনে করতে লাগল। এরফলে পবিত্র জীবন যাপনের পন্থা এরূপ হলো যে, নারী-পুরুষ একেবারেই বিবাহ করবে না অথবা বিবাহ করলেও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। বিভিন্ন ধর্মীয় সভা সমিতিতে এরূপ আইন প্রণীত হলো যে, গীর্জার কর্মচারীগণ নির্জনে তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে পারবে না, এমনকি দেখা সাক্ষাত করতে হলেও দুজন পুরুষের উপস্থিতিতে উন্মুক্ত স্থানে দেখা করতে হবে। এমন আইন জারি করা হলো যে, একত্রে বসবাসকারী স্বামী স্ত্রী গীর্জার কোন অনুষ্ঠান বা কোন পবিত্র স্থানে যোগদান করতে পারবে না। তারা নারীকে অপবিত্র মনে করতো বলেই নারীর সাথে সংঘটিত বৈবাহিক সম্পর্ককে অপবিত্র মনে করত। খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রাথমিক যুগের ধর্মগুরু TERTULIAN নারী সম্পর্কে বলেন, "সে শয়তানের আগমনের দ্বারস্বরূপ, সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে আকর্ষণকারিণী, খোদার আইন ভংগকারিনী ও পুরুষের ধ্বংসকারিণী।" এই উভয় প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক ও সামাজিক দিক হতে নারীর মর্যাদাকে অতিমাত্রায় হেয় করেনি বরং কৃষ্টিগত আইন কানুনকে এতখানি প্রভাবান্বিত করেছে যে, একদিকে বৈবাহিক জীবন নারী পুরুষের জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে এবং অপরদিকে সমাজে নারীর মর্যাদা সকল দিক থেকে হেয় ও অবজ্ঞেয় হয়ে পড়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মীয় বিধিবিধান অনুযায়ী যত প্রকার আইন পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) জীবিকার্জন ক্ষেত্রে নারীকে সম্পূর্ণ অসহায় করে পুরুষের অধীন করে রাখা হয়েছে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে তার অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিষয় সম্পত্তির উপর অধিকার অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি স্বোপার্জিত অর্থের উপর তার কর্তৃত্ব ছিল না। সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল স্বামীর।

(খ) পাশ্চাত্যের কোন কোন সমাজে বৈবাহিক প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অনুমতি ছিল না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যতই মনোমালিন্য হউক না কেন, পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্কেও সংসার নরকতুল্য হলেও ধর্ম ও সমাজ তাদেরকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করত। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছলে উভয়কে এই শর্তে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়া হত যে, তারা কেউই দ্বিতীয়বার অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না। এটা প্রথোমোক্ত নীতির চেয়েও অধিক কঠোর ছিল। কারণ এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন নারী পুরুষের জন্য সারা জীবন বৈরাগ্য পালন অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না।

(গ) স্বামীর বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর উভয়ের জন্য পুনরায় বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও পাপজনক ছিল। পাদরীগণ বলতেন, বিবাহ শুধু পাশবিক প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং ভোগ লালসা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা এটাকে 'মার্জিত ব্যভিচার' নামে অভিহিত করত। গীর্জার কর্মচারীগনের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ অপরাধজনক ছিল। দেশের সাধারণ আইন অনুযায়ী কোন কোন স্থানে এর অনুমতি দেয়া হত না। কোথাও আবার আইনগত বাধা না থাকলেও ধর্মীয় ভাবাপন্ন জনসাধারণ এটাকে বৈধ মনে করত না। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩, পৃঃ ১৭-২০)।

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজে অসংযম ও অমিতাচারের প্রান্ত সীমায় উপনীত হল। পরবর্তীতে নারীর ক্ষেত্রে যেসকল দৃষ্টিভঙ্গির উপর নতুন পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হল তা নিম্নরূপঃ

ক) নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য বিধান
খ) নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

এই তিনটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার ফল হলো নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ নারীর নিকট সাম্য বলতে যা বুঝায় তা হল এই যে, নৈতিক মর্যাদা ও মানবীয় অধিকারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষ সমান, দৈনন্দিন জীবনে বা জীবিকার্জনের জন্য পুরুষ যে সকল কাজ করে নারীও তাই করবে এবং নৈতিক বন্ধন পুরুষের জন্য যেমন শিথিল নারীর জন্য অনুরূপ শিথিল করতে হবে। সাম্যের অধিকারের দাবীতে নারী দৈনন্দিন কার্যাবলীর প্রতি উদাসীন ও বিদ্রোহী হয়ে পড়ল। নারী-পুরুষের সাম্য নারীর মন ও মস্তিকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করল যে, দাম্পত্য জীবনের গুরু দায়িত্ব, সন্তানাদির প্রতিপালন, পারিবারিক সেবা শুশ্রুষা, গৃহের সুব্যবস্থা প্রভৃতি দয়িত্ব পালন নারীর কর্মসুচী বহির্ভুত বা গৌন হয়ে পড়ল, পরিবর্তে পুরুষের মত চলাফেরা, কাজকর্ম করা, অর্থ উপার্জন, সর্বোপরি তাদের মত স্বাধীনতা ভোগ নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল। আর দাম্পত্য ও পাবিারিক জীবনে দেখা দিল বিশৃংখলা। এরফলে বিবাহ বিচ্ছেদ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত এর মত অনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেল। নারী পুরুষের সাম্য নারীকে স্বাধীনতা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করল ঠিকই কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল পারিবারিক বন্ধন, বৃদ্ধি পেল ব্যভিচার ও অশ্লীলতা। এর ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের সর্বত্র বিস্তার লাভ করল।

দ্বিতীয়তঃ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাকে পুরুষের চেয়েও বেপরোয়া করে দিল। পূর্বতন রীতি অনুযায়ী পুরুষ উপার্জন করত এবং নারী গৃহশৃংখলা রক্ষা করত। এটা পরিবর্তিত হয়ে নারী পুরুষ উভয়েই উপার্জন করবে এবং গৃহশৃংখলার ভার অন্যের হাতে অর্পিত হবে বলে স্থির করা হল। এরফলে একমাত্র যৌন সম্পর্ক ব্যতীত নারী পুরুষের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক রইল না যার জন্য একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নারীদের মধ্যে সৌন্দর্য প্রদর্শন, নগ্নতা ও অশ্লীলতা স্পৃহাকে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করেছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জীবন ধারণ ও উন্নতি বিধানের জন্য যেসমস্ত শারিরীক ও মানসিক শক্তি দান করেছেন তা এমনভাবেই বিনষ্ট হয়ে গেছে যে, অনৈতিক ও অশ্লীল কর্মকান্ড করাই তাদের জীবনের স্বাভাবিক ধারায় পরিণত হয়েছে।[৪২৯]

বর্তমান আধুনিক যুগে পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে দিয়ে পাশ্চাত্য সমাজে নারী অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতার নামে কর্মের ফাঁদে ফেলে নারীকে পুরুষদের অধীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে পারিবারিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। এর ফলে স্বাধীনতার নামে নারী ধীরে ধীরে পরাধীন হয়ে পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে এবং নারীর উপর নির্যাতনের মাত্রা পরিবর্তিতরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আধুনিকতা ও স্বাধীনতার নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীরা যেরূপে নির্যাতিত হচ্ছে তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

পৃথিবীর কোন কোন দেশে এখনও নারী চরমভাবে অবহেলিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীকে এখনও বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। নারীকে পণ্যের সমতুল্য করে তার রূপ-সৌন্দর্য্য ও শরীরকে বিক্রি করা হচ্ছে। প্রাচীন সমাজে নারী যেমন নির্যাতিত ছিল তেমনি বর্তমান সমাজেও নারী নির্যাতিত। শুধু নির্যাতনের কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে।

---

[৪২৯]. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-২০।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান চীন দেশে নারী নির্যাতন

চীনদেশে নারীর অধিকার ও মর্যাদা চরমভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে। চীনে নারীর অবস্থা দর্শন করে জনৈকা মহিলা বলেছেন, "নারীর মতো দুর্ভাগা ও মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছুই নেই।" চীনের কোন কোন স্থানে কন্যা সন্তানসহ মহিলা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কন্যা সন্তান রফতানী করে চীন প্রতিবছর প্রায় দেড়শত কোটি মার্কিন ডলার আয় করে।[৪৩০] সেদেশে যৌতুকের ভয়ে এখন অভিনব পন্থায় কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হচ্ছে। নারীর প্রতি চলছে অমানবিক পাশবিক নির্যাতন। বিবাহ বা দাম্পত্য সম্পর্কের অবস্থা খুবই নাজুক। প্রতি চারটি বিয়ের মধ্যে একটি ভেঙ্গে যাচ্ছে। ইচ্ছামত স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। এছাড়াও সেদেশে নারী দাসত্বের শিকার হচ্ছে আশংকাজনকভাবে। এরূপ পরিস্থিতির কারণে সেদেশে মহিলাদের আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪৩১]

দক্ষিণ কোরিয়ায় নারী নির্যাতন

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের দরবারে সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু সেদেশের নারীরা এখনও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সেখানে প্রতিদিন প্রায় দশজন মহিলার মধ্যে একজন স্বামীর হাতে প্রহৃত হচ্ছে। সিউলে প্রকাশিত এক জরিপ রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়। জরিপে ৩৪০ জনের ত্রিশ শতাংশ বলেছেন, "অন্তত মাসে একবার তারা স্বামীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হন।"[৪৩২] 'কোরিয়া উইমেন্স হটলাইন' এই জরিপ কাজটি পরিচালনা করেছেন। সেদেশে এখনও নারীকে পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

রাশিয়ায় নারী নির্যাতন

আধুনিক সভ্যতার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রাশিয়ার অবদান অনেক। জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সেখানে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেদেশেই জনশক্তির বিরাট একটা অংশ নারী জাতি সর্বাধিক অপমানিত ও নির্যাতিত। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্যাতিত নারীদের অবস্থা এতই করুণ যে, তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের কথা প্রকাশ করারও সুযোগ নেই। সেখানকার বিভিন্ন স্থানে পতিতালয় স্থাপন করে নারী জাতির মর্যাদাকে চরমভাবে অপমানিত করা হয়েছে। চোরাচালানীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নত দেশে নারী পাচার করে বিপুল অর্থ উপার্জন করা হচ্ছে। এবং নারীর সতীত্ব নষ্ট করে তাদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে সেটাকেই নারী প্রগতির নাম দিয়ে নির্যাতনের চিত্র আড়াল করার চেষ্টা চলছে।

ফ্রান্সে নারী নির্যাতন

নারী স্বাধীনতার স্বর্গ বলে মনে করা হয় ফ্রান্সকে। বলা হয়, সেখানেই নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে। অথচ ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের ৪৯১ জন ডেপুটির মধ্যে মাত্র ২৫ জন নারী। তবে যৌন চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করে। ফ্রান্সে প্রতিরাতে দশ হাজার নারী চল্লিশ হাজার পুরুষের যৌন চাহিদা পুরণ করে বা করতে বাধ্য হয়।[৪৩৩]

জাপানে নারী নির্যাতন

মানব জাতির মধ্যে পরিশ্রমকে পুজি করে যে কয়টি দেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে জাপান তার মধ্যে অন্যতম। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করলেও সেখানে অগ্রগতির নিরিখে নারী ও পুরুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। ১৯৯৩ সালে মানব উন্নয়নের সুচকে জাপান সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে। কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচক যখন নারী ও পুরুষের বৈষম্য বিচার করেছে তখন

---

[৪৩০]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।
[৪৩১]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।
[৪৩২]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।
[৪৩৩]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

জাপান সপ্তদশ স্থানে নেমে গেছে। এর কারণ ছিল, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ভর্তির অনুপাত দুই তৃতীয়াংশ। অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রেও মেয়েদের অবস্থা খুবই খারাপ। পুরুষের আয়ের মাত্র ৫১ শতাংশ আয় করে নারীরা এবং তারা অনেকাংশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে যেতে পারেনা। রাজনৈতিক অঙ্গনেও নারীর উপস্থিতি অনেক কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই নারীরা ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার লাভ করে।[৪৩৪]

বর্তমান জাপানিজ সমাজে পতিতাবৃত্তি আইনসিদ্ধ। তবে জোর করে কাউকে এ পেশায় নামানো নিষিদ্ধ। বর্তমানে সেখানে শিশু পতিতার সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এদের অধিকাংশই স্কুলগামী বালিকা। আর এসব বালিকাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ক্লাব।[৪৩৫]

শিশু পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য জাপানের কতিপয় পত্র-পত্রিকাকে দায়ী করা হয়। ফটোগ্রাফী সেখানকার পত্রিকা জগতে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আর এসব পত্রিকাগুলো প্রায়ই নারীদের নগ্ন ছবি প্রকাশ করে।[৪৩৬] জাপানী ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই যৌনতার দিকে বেশী ঝুকে পড়েছে। ১৯৮৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ২২ শতাংশ স্কুল বালকের যৌন অভিজ্ঞতা রয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ১২ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে মেয়ে ৩৪ শতাংশ আর ছেলে ২৯ শতাংশ।[৪৩৭] তাই বলা যায়, সভ্যতা আর রক্ষণশীলতার দাবীদার বলে কথিত সূর্যোদয়ের দেশ আজ নিজেদের সংস্কৃতিকে কলুষিত ও বিলুপ্ত করতে যাচ্ছে।

ইটালীতে নারী নির্যাতন

ইটালীর খ্রীষ্টান ধর্মের বিশপরা এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন যে, বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে এবং কর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। তাহলে তাদেরকে রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় প্রার্থনা সভায় যোগদানের অনুমতি দেয়া হবে।[৪৩৮] এরূপ বিধান ছাড়াও ইতালীতে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে নারীর প্রতি যৌন নির্যাতনের পরিমাণ অনেক বেশী। বর্তমানে প্রতি ঘন্টায় একজন নারী সতীত্ব হারাচ্ছে। যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা

---

৪৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৭-১২৯।

৪৩৫. এক সরকারী জরীপ থেকে জানা যায় যে, স্কুলগামী বালিকাদের এক চতুর্থাংশ একবার হলেও টেলিফোন ক্লাবে গিয়েছে। আর তাদের মধ্যে তিন বা চার শতাংশ ডেটিংয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, পতিতালয় ছাড়াও জাপানের অলিতে-গলিতে রয়েছে হরেক রকমের যৌন কারখানা। এগুলো মূলত: বাথ-হাউস, মেসেজ পার্লার এবং সেক্সক্লাব ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই কারখানাগুলো আকর্ষণীয় নামে পরিচিত। যেমন: ডেটক্লাব, টেলিফোন ক্লাব, ইমেজ ক্লাব, জেজে ক্লাব, ফ্যাশন হেলথ ক্লাব ইত্যাদি। ডেটক্লাবগুলো নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের ডেটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। আর টেলিফোন ক্লাবের অস্তিত্ত্ব প্রায় এক দশক ধরে রয়েছে। এদের কাছে ডেটিংয়ে যেতে ইচ্ছুক এমন সব ছেলেমেয়ের টেলিফোন নম্বর থাকে। বিজ্ঞাপন মারফত তারা ক্লাবগুলোর ফোন নম্বর পেয়ে থাকে। অনেক সময় রাস্তায় বিনা পয়সায় বিলি করা টিস্যু প্যাকেটের গায়েও ক্লাবগুলোর নম্বর থাকে। ডেটিং প্রত্যাশীরা ক্লাবে যায়। ১৫-২০ ডলারের বিনিময়ে ক্লাব তাদেরকে একটা ছোট কামরায় বসে আলাপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পারস্পরিক বোঝা পড়ার ভিত্তিতে তারা ডেটিংয়ে বেরিয়ে পড়ে। বর্তমানে শুধুমাত্র টোকিওতেই এ ধরনের ৩৬৪টি ক্লাব রয়েছে। ১৯৯২ সালে এ সংখ্যা ছিলো ১১৩ আর ১৯৮৭ সালে ছিল ৮০টি। তাছাড়াও বাণিজ্য কেন্দ্র গুলোতে 'সোপল্যান্ড' নামের বাথ হাউস রয়েছে এবং সেখানে সেক্সুয়াল সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন ক্লাবে বিভিন্ন প্রকারের সার্ভিস দেয়া হয়। আইন অমান্য করলে পাঁচ হাজার ডলার জরিমানা দিতে হয়। এইসব ক্লাবে একজন জাপানী মেয়ে দৈনিক প্রায় একহাজার ডলার আয় করে। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৯-১৩০)।

৪৩৬. 'জেনডাহ' নামক একটি পত্রিকা নগ্ন নারীদেহের ছবি প্রকাশ করার কারণে তার সার্কুলেশন বা বিক্রি প্রায় নয় লাখে পৌঁছেছে। এরকম আর একটি জনপ্রিয় পত্রিকা 'উইকলী পোষ্ট' এর সার্কুলেশন দশ লক্ষাধিক। এসব পত্রিকায় নগ্ন নারীদেহের ছবি প্রকাশ করে বিভিন্ন ক্যাপশন জুড়ে দেয় গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০)।

৪৩৭. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।

৪৩৮. প্রচলিত রীতি হলো, পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পত্তিকে শুধুমাত্র একে অন্যের সাথে বন্ধুরূপে বসবাস করতে হবে। এ ধরণের দম্পতিকে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেয়া হয় না। তারা শুধু দর্শকরূপে উপস্থিত হতে পারে। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়ার জন্য নারীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। Raview of Reviews (একাদশ খন্ড) -এ উল্লেখ আছে যে, জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইটালীতে প্রতিবছর প্রায় ৫৬১২ জন নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বর্তমানে এই সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪৩৯]

কানাডায় নারী নির্যাতন

কানাডার নারীদের সম্ভ্রমহানির মাত্রা সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সরকার পরিচালিত রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয় যে, সেখানে বসবাসকারী অর্ধেকেরও বেশী মহিলা ধর্ষণ ও ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হচ্ছে।[৪৪০]

যুক্তরাজ্যে নারী নির্যাতন

আর্থিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের সাথে সাথে যুক্তরাজ্যে পারিবারিক নির্যাতনের মাত্রা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃটেনে পারিবারিক সমস্যার উপর জরীপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, দশজন নির্যাতিতা নারীর মধ্যে তিনজনই স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়েছেন। এবং প্রতি পাঁচটি ঘটনার মধ্যে একটি পুলিশের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।[৪৪১]

বৃটেনের 'মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়' কর্তৃক সেখানকার মহিলাদের পারিবারিক নির্যাতনের উপর জরিপ চালিয়ে ভয়াবহ তথ্য পাওয়া যায়। নারীদের উপর পারিবারিক নির্যাতনের উচ্চ হার দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ পরিসংখ্যানের প্রথম পর্যায়ে নয়শত নারী পুরুষের উপর জরীপে সবচেয়ে নিষ্ঠুর যে দিকটি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে যৌন নির্যাতনের উচ্চহার। যে সব মহিলা এ সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে শতকরা ছয় জন জানিয়েছেন যে, তারা বাধ্য হয়ে যৌন সংসর্গে রাজী হয়। অন্যদিকে শতকরা আড়াই ভাগ জানিয়েছে যে, তাদের জীবনে কোন একসময় তারা তাদের প্রেমিক কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছে। এ সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায় যে, প্রতি তিন জনের মধ্যে দুই জন পুরুষ তাদের স্ত্রী বা প্রেমিকাকে প্রহার করে এবং তা ঘটে পারিবারিক কলহের কারণে বা যদি তাদের স্ত্রী বা প্রেমিকা অবিশ্বাসী হয়।[৪৪২]

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেকটি জরীপের তথ্য অনুযায়ী, বৃটেনে নারী পুলিশের উপর যৌন নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। জানা যায় যে, মহিলা পুলিশদের উপর সহকর্মী পুরুষ পুলিশদের যৌন উৎপীড়ন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শতাধিক নারী পুলিশ সহকর্মীদের দ্বারা মারাত্মক যৌন হামলার স্বীকার হয়েছেন।[৪৪৩] এছাড়াও দশটি বাহিনীর এক হাজার ছয়শত মহিলা পুলিশ অফিসারের উপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, এদের ছয় শতাংশ ধর্ষণ এবং ধর্ষণ প্রচেষ্টাসহ গুরুতর ধরণের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। মহিলা পুলিশ পিসি এলেন ওয়াটস 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পুলিশের একজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করে বলেন যে, "মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন সহকর্মী দ্বারা তিনি ধর্ষিতা হন কিন্তু তার অভিযোগের কারণে উল্টো তার বিরুদ্ধে মানহানিমুলক প্রচারণা শুরু হয়।"[৪৪৪]

১৯৯২ সালে পুলিশ রিভিউ ম্যাগাজিনে পুর্ববর্তী জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে যেসব মহিলা পুলিশের উপর জরিপ করা হয় তাদের আট শতাংশ জানায়, তারা সহকর্মী পুলিশ সদস্যদের দ্বারা যৌন

---

[৪৩৯]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।
[৪৪০]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।
[৪৪১]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।
[৪৪২]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।
[৪৪৩]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩১।
[৪৪৪]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।
উক্ত জরিপটি পরিচালনা করেন হ্যামশায়ার কনস্টার লারির গবেষণা ব্যবস্থাপক ডঃ জেনিফার ব্রাউন এবং এলিজাবেথ ক্যাম্পবেল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুধু বিষয় নির্ধারণ করে দেয়। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩১-১৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

নিপীড়নের শিকার হয়। আর ৯২ শতাংশ জানায়, তাদের উদ্দেশ্যে কুৎসিত কথাবার্তা বলা হয়।[৪৪৫] ডঃ ব্রাউন বলেন, "বিভিন্ন গবেষণা থেকে মহিলা পুলিশের ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা প্রমাণিত হয়। তবে অধিকাংশ নারী ধর্ষিতা হওয়ার কথা স্বীকার করতে চাইনা। কারণ তাদের ধারণা অভিযোগ করলে তারা ন্যায়বিচার পাবে না বরং আরো হয়রানির স্বীকার হতে হবে। এবং অনেকে সহকর্মীদের উৎপীড়নের কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।"[৪৪৬]

আরেকটি গবেষণা জরিপে বৃটেনের নারী নির্যাতনের আরো কিছু ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। বৃটেনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস ২৪তম বার্ষিক সংখ্যায় জানায়, ১৯৯২ সালে বৃটেনে প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে একটি বিবাহ বহির্ভুতভাবে জন্মগ্রহণ করে। গত দুই দশকে বিবাহের ১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং একই সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪৪৭]

অপরদিকে বৃটেনের আদমশুমারী ও জরিপ অফিস থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস এর প্রায় অর্ধেক নারী অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হয়। জরিপে আরো বলা হয়েছে, ৪৪ ভাগ তরুণী অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হয়। এই হার ১৯৮১ সালের চেয়ে ২ ভাগ বেশী।[৪৪৮]

যুক্তরাষ্ট্রে নারী নির্যাতন

১৯৯৪ সালে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও পত্রিকার এক পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে, দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ড, তৃতীয় স্থানে কানাডা, চতুর্থ স্থানে জার্মান, পঞ্চম স্থানে ফ্রান্স।

১৯৯৪ সালের ১১ জুলাই রয়টার পরিবেশিত খবর ছিলো এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে গৃহিণীরা যখন তখন পারিবারিক হত্যার শিকার হচ্ছেন। দাম্পত্য কলহের কারণে নিহতের মধ্যে ৬০ শতাংশ স্ত্রী স্বামীর হাতে নিহত হয়। ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে নিউজ উইক এর জরিপ থেকে জানা যায়, প্রতি ঘন্টায় ১৬ জন নারীকে ধর্ষণকারীর মোকাবেলা করতে হয়। প্রতি ৬ মিনিটে একজন ধর্ষিতা হয়। ৪০ লাখ নারী প্রতি বছর নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একজন নারী নির্যাতিত হয়। প্রতি ৪ জন নারীর মধ্যে ৩ জনই জীবনে কমপক্ষে একটি গুরুতর অপরাধ করে থাকে। প্রতি বছর ১০ লক্ষাধিক নারী আঘাতের চিকিৎসা নেয়। আমেরিকার ধর্ষণ ঘটনা বৃটেনের চেয়ে প্রায় ১৩ গুণ বেশী। জার্মানি থেকে ৪ গুণ এবং জাপান থেকে ২০ গুণ বেশী।[৪৪৯]

১৯৭৭ সালে নিউইয়র্ক শহরে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ ছিল না। এই অল্প সময়ে প্রায় ৭০ হাজার মহিলা ধর্ষণের শিকার হন। ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪ লাখ অবৈধ শিশু জন্মগ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের উপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের হার দিনদিন বেড়েই চলেছে এবং অধিকাংশ নারীই স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়।[৪৫০] ১৯৮৩ সালের বর্ষপঞ্জী অনুসারে ১৯৭৯ সালে আমেরিকায় ২৩,৩১,০০০ সংখ্যক বিয়ের পাশাপাশি ১১,৮১,০০০ টি তালাক সংঘটিত হয়েছে। এবং সেদেশে তালাকের আধিক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।[৪৫১]

---

৪৪৫. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

৪৪৬. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

৪৪৭. জরিপে আরো বলা হয়, ১৯৯১ সালে প্রতি দু'টি বিবাহের মধ্যে একটি ভেঙ্গে যেত। বিবাহের প্রথম দু'বছরের মধ্যে দশ শতাংশ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। যার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ একাত্তর হাজার একশত। এই সংখ্যা ১৯৮১ সালের তুলনায় ৬ গুণ বেশী। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২)।

৪৪৮. **সাপ্তাহিক বিক্রম**, বর্ষ-৭, সংখ্যা-৩৫, ১৫-২১ আগষ্ট, ১৯৯৪।

৪৪৯. তথ্যসূত্রঃ **দৈনিক সংগ্রাম**, ৭ মে, ১৯৯৫ ইং।

৪৫০. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

৪৫১. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় নারী অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কোন কোন ধর্ম ও সমাজে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি ছিল না, বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না, সম্পদের অধিকার ছিল না, শুধু ছিল পুরুষের ভোগ্যপণ্য। ইসলামই নারীকে এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে সমাজে মানুষ হিসেবে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। ইসলামেই নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বত্তা স্বীকৃত হয়েছে। ইসলামের ছায়াতলে নারী বেঁচে থাকার, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার, মাতা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসেবে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে। রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে কোন ধর্ম, আইন ও সভ্যতাই নারীকে এই সকল অধিকার প্রদান করেনি। মোটকথা সমস্ত পৃথিবীতে যখন নারী জাতি ছিল অবহেলিত ও লাঞ্ছিত তখন নবীকরীম (স:) নারী জাতিকে সকল অধিকার প্রদান করে সার্বিক নিরাপত্তা দান করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নারীসমাজও ইসলাম প্রদত্ত অধিকার, সম্মান ও মর্যাদাকে পাশ কাটিয়ে তথাকথিত অধিকার ও স্বাধীনতার নামে নিজেদেরকে পুরুষের ভোগ্যপণ্য করে তুলেছে। যারফলে নারী নির্যাতন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারী প্রগতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ব্যক্তিগত জীবনে নারী প্রগতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রগতি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	পারিবারিক জীবনে নারী প্রগতি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	শিক্ষাক্ষেত্রে নারী প্রগতি
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী প্রগতি
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	কর্মক্ষেত্রে নারী প্রগতি
নবম পরিচ্ছেদ	:	রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত জীবনে নারী প্রগতি

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী শুধু জগতের জন্য অনুপযোগী ও অনুপোকারীই নয় বরং সমাজ ও সভ্যতার কলংক ও জঞ্জাল মনে করে সামাজিকভাবে নীচুতার এমন এক স্তরে নির্বাসিত হয়েছিল যেখানে নারী ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নারীকে সভ্যতার পরিপন্থী মনে করে তাকে জীবনের কর্মক্ষেত্র থেকে নিষ্ক্রিয়তার গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেখান থেকে উঠে আসা বা উত্থান-অগ্রগতি লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। এই অবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামই সর্বপ্রথম সোচ্চার ভূমিকা পালন করে নারীকে সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে প্রমাণ করেছে মানব জীবনধারা সমানভাবে নারী পুরুষ উভয়েরই মুখাপেক্ষী এবং পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য অংশরূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষের মত নারীকেও অধিকার ও মর্যাদা দান করেছেন। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ব্যক্তি জীবনে নারীরা যে সকল ক্ষেত্রে প্রগতি লাভ করেছে তা নিম্নরূপ:

ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রগতি

ইসলাম নারীকে ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এবং নারীকে নিজ মালিকানার যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতাও দান করেছে। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধি বৃদ্ধি করেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, অতীতে মুসলিম নারীরা ইসলামের ছায়াতলে থেকে অভিভাবকের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাংখা নিয়ে নিজ নিজ অংগনে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। নিজ অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়েছে। নিজে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং দান করেছে। স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রকার কাজ করেছে। স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তারা এসব কাজ করেছে।[১] নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আর ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন। সে প্রার্থনা করেছিল, হে আল্লাহ! তোমার জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরী করে দাও এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর। সাথে সাথে ফেরাউনের জালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। আল্লাহ এমনিভাবে ইমরান তনয়া মারয়ামেরও একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে রুহ ফুৎকার করে দিলাম। সে তার রব এর বাক্যসমূহ ও তার কিতাবসমুহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে অনুগত ও বিনয়ীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।"[২]

হাদীসেও নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কিত কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. উম্মুল মুমীনীন হযরত মাইমুনাহ (রা:) রাসুলুল্লাহ (স.) এর অজ্ঞাতে নিজ দাসীকে মুক্তি দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা:) এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইমুনাহ বিনতে হারিস তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি একটি দাসী কন্যাকে রাসুলুল্লাহ (স.) এর অনুমতি না নিয়েই মুক্তি দিয়েছেন। এরপর যখন তার পালা এল তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি জানতে পেরেছেন

---

[১]. মূলঃ আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, **রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদঃ মাওলানা আবদুল মুনয়েম, অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী, মাওলানা মুনাওয়ার হোসাইন, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট্স, ১৯৯৫), পৃষ্ঠাঃ ৯৬।

[২]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাহরীম**, আয়াতঃ ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

যে, আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর রাসুল (স.) বললেন, "তুমি যদি তাকে তোমার মামাদেরকে দান করে দিতে তাহলে তুমি অধিক প্রতিদানের অধিকারীণী হতে।"[৩]

২. উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান (রা:) তাঁর বিয়ের দিনে স্বনামে রাসুল (স.) কে উপহার দিয়েছেন, স্বামীর নামে নয়। "উম্মু সুলাইম বলেন, হে আনাস! এগুলো রাসুলুল্লাহ (স.) এর খিদমতে নিয়ে যাও এবং তাকে বল আমার মা এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তুমি আরো বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ হতে আপনার জন্য নগণ্য উপহার।"[৪]

৩. আসমা বিনতে উমাইস উমর (রা:) এর সাথে বিতর্ক আলোচনার পরে রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে কথা বলেছেন। তারপর এই কথাবার্তা বলার ঘটনা তাঁর হিজরত সঙ্গীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আর এ সকলই ছিল তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে। সম্ভবত তার স্বামী আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন। উমর (রা:) আসমা (রা:) কে বললেন, আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা রাসুল (স.) এর নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য। এ কথা শুনে আসমা (রা:) রেগে গিয়ে বললেন, কখনই না। আল্লাহর শপথ তোমরা রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেছিলেন। অজ্ঞদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। আর আমরা? আমরা হতভাগারা ছিলাম সুদুর আবিসিনিয়ায়। আর এটা ছিল আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। আল্লাহর শপথ, আপনার বক্তব্য রাসুল (স.) এর কাছে না বলা পর্যন্ত আমি পানাহার করব না। তারপর রাসুল (স.) তাকে বললেন, ...আমার কাছে তোমাদের চেয়ে বেশী নিকটবর্তী আর কেউ নেয়। উমর ও তার সঙ্গীদের হয়েছে এক হিজরত। আর তোমরা, তোমাদের হয়েছে দুই হিজরত। আসমা বলেন, এরপর আমি আবু মুসা ও অন্যান্য জাহাজ আরোহীদেরকে আমার কাছে দলে দলে আসতে এবং আমার কাছে এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।[৫]

৪. আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) তাঁর স্বামীর অজ্ঞাতসারে নিজের দাসীর বিক্রয়মুল্য দান করে দেন। আসমা (রা:) বলেন, আমি দাসীটি বিক্রয় করে ফেললাম। এমতাবস্থায় বিক্রয়মুল্য আমার কাছে থাকতেই যোবায়ের এসে বললেন, এগুলো আমাকে দান করে দাও। আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে এগুলো দান করে দিলাম।[৬]

৫. আতেকা বিনতে যায়েদ (রা:) তার স্বামীর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) তাকে বললেন, তুমি কেন ফজর ও এশার নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাও? অথচ তুমি জান যে, উমর (রা:) এটা অপছন্দ করেন এবং এটা তার আত্মমর্যাদায় বাধে। তিনি বললেন, উমর (রা:) নিজে আমাকে নিষেধ করছে না কেন? হযরত উমর (রা:) বলেন, রাসুল (স.) এর বাণী "তোমরা আল্লাহর দাসীদের মসজিদে যেতে বাঁধা দিয়ো না"- এর কারণেই তিনি কিছু বলছেন না।[৭]

---

[৩]. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী, **সহীহ বুখারী**, দান, তার ফযিলত এবং দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রীর দান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১৪৬।

[৪]. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যয়নাব বিনতে জাহশের বিবাহ, পর্দা নাযিল হওয়া এবং নতুন অলীমা সম্পর্কিত, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১৫০।

[৫]. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, যুদ্ধ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: খয়বরের যুদ্ধ, ৯ম খন্ড, পৃ: ২৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: জাফর বিন আবি তালিবের ফযীলত এবং আসমা বিনতে উমাইস ও তাদের পরিবার, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৭২।

[৬]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: অপরিচিতা মহিলাদের সালাম দান জায়েয, ৭ম খন্ড, পৃ: ১২।

[৭]. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জুম'য়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মহিলা শিশু ও অন্যদের কারণে জুম'য়ায় গোসল প্রয়োজন কিনা, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৪। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাকের সুত্রে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আতেকা উমর (রা:) কে বলেছিলেন, আপনি নিজে আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি এ থেকে বিরত হবো না। ইমাম যুহরী (রহ:) বলেছেন, হযরত উমর (রা:) যখন আততায়ীর আক্রমণে আহত হয়েছিলেন, সে সময় আতেকা মসজিদেই ছিলেন। (**ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪)।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন পুরুষের পক্ষ থেকে তাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে আসার ব্যাপারে বাধা দেয়ার ঘটনা ঘটেছিল। আর রাসুল (স.) তাদেরকে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন এবং পুরুষদেরকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসুল (স.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মেয়েরা যখন তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তখন তাদের বাঁধা দিয়ো না। একথা শুনে বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে বাঁধা দিব। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাদেরকে বের হতে দেবো না। কারণ, এর দ্বারা তারা তাদের স্বামীদেরকে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ পাবে।) সালেম বলেন, তখন আমার পিতা আবদুল্লাহ বিলালকে এত গালমন্দ করলেন যে, আমি এর আগে কখনও এভাবে তাকে গালমন্দ করতে দেখিনি এবং তিনি বললেন যে, আমি রাসুল (স.) এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ কিনা আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে বাধা দিব।"[৮] সুতরাং এটা স্পষ্ট যে কোন কোন তাবেয়ীর পক্ষ মহিলাদের মসজিদে আসতে বাধার সৃষ্টি করলে বিশিষ্ট সাহাবীর পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

রাসূল (স.) এর সময়ে যখনই অভিভাবকরা তাদের অধীনস্থদের উপর কোন বিষয় জোর করে চাপিয়ে দিত তখনই নারীরা তাদের ব্যক্তিগত অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য রাসূল (স.) এর কাছে ছুটে যেতেন। এবং রাসূল (স.) সমাধান প্রদান করতেন। এরূপ কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। মা'কাল ইবনে ইয়াসারের বোনকে তার বোনের স্বামী তালাক প্রদান করে ইদ্দত পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকে। এরপর পুনরায় তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এতে মা'কাল খুবই রাগান্বিত হয়ে বলেন, এ কেমন লোক! সহাবস্থানে সক্ষম হয়েও তাকে তালাক প্রদান করে, এখন আবার বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে? এরপর উভয়ের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। অন্য বর্ণনায়[৯] বলা হয়, এক ব্যক্তি নিরপরাধ ছিল বলে তার স্ত্রী তার কাছে ফিরে যেতে চাইলো। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন, "আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এরপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিবাহ করতে বাধা দিয়ো না। এই উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।"[১০] তারপর রসুল (স.) তাকে ডেকে এ আয়াত পড়ে শোনান। তখন তিনি ক্রোধ সংবরণ করেন এবং আল্লাহর আদেশ মেনে নেন।"[১১]

হযরত খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। পূর্বের বিবাহ ছিন্ন হওয়ার পরে তার পিতা তাকে অন্যত্র বিবাহ দেন এবং তিনি ছিলেন প্রাপ্তবয়স্কা। কিন্তু তিনি তা অপছন্দ করে রাসুল (স.) এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। ফলে রাসুল (স.) এই বিবাহ বাতিল করে দেন।"[১২] বিবাহের পূর্বে পিতা বা অন্য অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে নারীদের থাকতে হয় কিন্তু বিবাহের পর তারা সম্পূর্ণ স্বামীর তত্ত্বাবধানে চলে আসে। এরফলে স্বামীরা নারীদের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেয় এবং তা পালন করতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রেও নারীরা যখনই কোন সমস্যা অনুভব করত তখনই তারা রাসূল (স.) এর স্মরণাপন্ন হতেন এবং তিনি তাদের ফয়সালা দান করতেন। এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হিন্দা বিনতে উৎবাহ বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার এবং সন্তান সন্ততির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ সে আমাকে দেয়

---

[৮]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২।

[৯]. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ না হওয়া, ১১ খন্ড, পৃঃ ৯২।

[১০]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২৩২।

[১১]. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইদ্দতের ক্ষেত্রে এবং কিভাবে মহিলা তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যখন তাকে এক অথবা দুই তালাক দেয়া হবে, ১১ খন্ড, পৃঃ ৪০৮।

[১২]. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কন্যার অসম্মতিতে কোন পুরুষের সাথে তাকে বিবাহ দিলে তা বাতিল সংক্রান্ত, ১১তম খন্ড, পৃঃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

না বলে আমি তার অগোচরে যা প্রয়োজন ততটুকু নেই। তারপর রাসূল (স.) বলেন, তোমার ও সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পার।"[১৩]

হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কোন একটা ব্যাপারে আমি চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি কাজটি এভাবে করলে ভাল হতো। আমি তাকে বললাম, তুমি এখানে কি চাও? যে বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করছি, তাতে তোমার নাক গলাবার দরকার কি? সে বলল, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। তুমি চাও না তোমার সাথে কেউ বাদানুবাদ করুক। অথচ তোমার মেয়ে স্বয়ং রাসূল (স.) এর সাথে তর্কবিতর্ক করে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,[১৪] তিনি বললেন, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করব, এতে তোমার অপছন্দের কি আছে? আল্লাহর শপথ, রাসূল (স.) এর স্ত্রীরাও তার সাথে তর্ক বিতর্ক করে।"[১৫]

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট যে ইসলাম নারীদেরকে ব্যক্তিগত বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রগতি দান করেছে।

উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রগতি

অন্দকার যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই ছিল না তাদের সাথে পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা হত। স্বামীরা স্ত্রীদের জুয়া খেলায় বাজী ধরত আর বাজীতে হেরে গিয়ে অনায়াসেই স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিত। ইসলাম নারীদেরকে সেই অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি দান করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। কোন কারণে যদি তারা তোমাদের কাছে ভাল নাও লাগে, তাহলে এভাবে চিন্তা কর যে, তোমরা হয়ত এমন একটি বস্তুকে খারাপ মনে করছ, যার মধ্যে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য মহা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"[১৬] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, "কোন মুমিন স্বামী তার মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন অভ্যাস তার পছন্দ নাও হয়, তবে তার মধ্যে এমন আরও অভ্যাস আছে যা তার কাছে অবশ্যই ভাল লাগবে।"[১৭]

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর জেনে রাখ যে, আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি।"[১৮] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, "যাদের চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, তারাই হলো পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম মানুষ যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম বলে স্বীকৃত।"[১৯] হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, "তারাই পূর্ণ ঈমানদার যারা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের সাথে সবচেয়ে বেশী নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করে।"[২০]

---

[১৩]. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ব্যয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যখন কোন পুরুষ স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে না তখন স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতে প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রহণ করতে পারবে এবং তার সন্তানদের প্রতি ভাল আচরণ করবে, ১১ খন্ড, পৃঃ ৪৩৫; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ফয়সালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হিন্দের ফায়সালা, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১২৯।

[১৪]. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পিতার স্বীয় কন্যাকে তার স্বামীর বর্তমানে উপদেশ দান, ১১খন্ড, পৃঃ ১৯১; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীর সাথে ইলা ও বিচ্ছিন্ন থাকা, ৪ খন্ড, পৃঃ ১৯৪।

[১৫]. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ তুমি 'তোমার স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা করবে', ১০ম খন্ড, পৃঃ ২৮৩; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইলা এবং মহিলাদের সাথে আযল এবং তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৯০।

[১৬]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত : ১৯।

[১৭]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯১।

[১৮]. আবু আহমদ আল মুনযিরী, **আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব**, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

[১৯]. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী, **জামিউত তিরমিযী**, ১ম খন্ড, আবওয়াবুর রিদা, (দিল্লীঃ মাকতাবা রাশীদিয়া, তা. বি.), পৃঃ ২১৯।

[২০]. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী, **জামিউত তিরমিযী**, ১ম খন্ড, আবওয়াবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁর পিতা রাসূলে করীম (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! একজন স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? উত্তরে রাসূলে করীম (স.) বললেন, তুমি যখন খাবে, তখন তাকে খাওয়াবে, আর তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে তখন তাকেও কাপড় পরিধান করাবে। আর স্ত্রীর মুখমন্ডলে কখনো আঘাত করবে না, তাকে গালি দিবে না এবং রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে কখনও ঘর থেকে বের করে দিবে না।"[২১] নবী (স.) আরও বলেছেন, "একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ নারীদের সম্মান করে না। আর কেবলমাত্র নীচাশয় হীনমনা লোক ছাড়া আর কেউ তাদের অবমাননা করে না।"[২২] নবী করীম (স.) যখন নিজ গৃহে স্ত্রীগণের কাছে যেতেন, "তখন তাদের সাথে অতি নম্র এবং ভদ্র ব্যবহার করতেন আর তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।"[২৩]

পরিশেষে বলা যায় সমাজের সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা ও ঘৃণিতা নারীদের অধিকার ও মর্যাদার ঘোষণা প্রদান করে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (স.) বলেন, "নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমাদের যেমন নারীদের উপর অধিকার আছে তদ্রুপ নারীদেরও তোমাদের উপর অধিকার আছে।"[২৪] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ইসলামই নারীদের ব্যক্তিগত জীবনে সর্বোচ্চ প্রগতি অধিকার দান করেছে।

মান-সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতি

পৃথিবীর কোন কোন ধর্মে নারীকে 'শয়তানের অঙ্গ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[২৫] কিন্তু ইসলামে নারীকে শয়তানের অঙ্গ না বলে তাকে 'মুহসানাহ' (সংরক্ষিত দুর্গ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ একজন অসৎ চরিত্রের পুরুষের চেয়ে একজন সৎ চরিত্রের নারী অনেক উত্তম। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "হে নবী! আমার যে বান্দারা কথা শোনে এবং ভালো কথা মেনে চলে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।"[২৬] আল্লাহ আরও বলেন, "(মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো) যারা ক্রোধকে হযম করে এবং লোকদের প্রতি মার্জনার নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ এ ধরণের সৎকর্মশীল লোকদের ভালবাসেন।"[২৭]

পবিত্র কুর'আনের উক্ত সমস্ত আয়াতসমূহ শুধুমাত্র পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি বরং নারীদের জন্যেও একই বিধান প্রযোজ্য। এছাড়াও পবিত্র কুর'আনে অন্যের গৃহে প্রবেশ করার পুর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করোনা, যতক্ষণ না সেসব ঘরের লোকদের থেকে অনুমতি গ্রহণ করো এবং তাদেরকে সালাম করো।"[২৮] এই আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে কারো ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অবশ্যই তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। এই আয়াতের মাধ্যমে গৃহে অবস্থানরত নারীদের সম্মান রক্ষা করতে সহযোগীতা প্রদান করা হয়েছে। জাহেলি যুগে নারীদের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ তো দুরের কথা বরং জোরপূর্বক তাদের সম্মান নষ্ট করা হতো। যখন তখন তাদের চরিত্রে মিথ্যা কলংক আরোপ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করত না। এমনি কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "যে সব লোক পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন ও সাদাসিধা মুমিন স্ত্রীলোকের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতের লা'নত করা হয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।"[২৯] এই আয়াতের মাধ্যমে নারীদের উপর কলংক আরোপ করা থেকে বিরত

---

[২১]. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস, **সুনান**, ২য় খন্ড, (দিল্লীঃ মাকতাবা রাশীদিয়া, তা. বি.), পৃঃ ২৪৪।
[২২]. আবদুর রউফ আল মানাভী, **ফায়যুল কাদীর**, ৩য় খন্ড, (মিশরঃ আল মাকতাবাতুত্ তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হিঃ), পৃঃ ৪৯৬।
[২৩]. আলামা সুয়ূতী, **আল জামিউস সাগীর**, ৩য় খন্ড, (জেদ্দাঃ দারু তায়েরুর ইরম, তা.বি.), পৃঃ ১৩১।
[২৪]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৭; ইবন হিশাম, **আসসীরাতুন নববিয়্যা**, (বৈরুতঃ উলুমুল কুর'আন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯), ২য় খন্ড, পৃঃ ৬০৪।
[২৫]. মুহাম্মদ রশিদ রেযা, **হকুক আন-নিসা ফিল ইসলাম**, (বৈরুতঃ মকতবায়ে ইসলাম, ১৯৭৫), পৃঃ ৬২।
[২৬]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ১৬-১৭।
[২৭]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ১৩৪।
[২৮]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াতঃ ২৭।
[২৯]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াতঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে আদেশ করে মূলত নারীদের সম্মান রক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম নারীদেরকে কখনও অবমাননা তো করেইনি বরং যারা তাদেরকে অবমাননা করে, অত্যাচার করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে প্রগতি

সৎকাজ করা না করা মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৎকাজ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করেছেন। এই আদেশ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, "তোমারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত মানবজাতির জন্য তোমাদের আর্বিভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।"[৩০]

আল কুর'আনের এ নির্দেশ দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথ দেখানো। হযরত আবু হুযায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স.) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।[৩১]

অপর এক হাদীসে আছে, রাসুল্লাহ (স.) বলেন, তোমাদের মধ্যে শরী'আত বিরোধী কাজ হতে দেখলে সে তা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করবে। যদি সে এর শক্তি না রাখে তবে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে, আর যদি এর শক্তিও না রাখে তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর।[৩২]

নবী রাসুলগণের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দীন কায়েম করা। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হয়েছে। হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ (স.) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসুল এক কাজই করেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি পথভ্রষ্ট জাতিকে তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাতিতে পরিনত করেন। তার পরে আর কোন নবী পৃথীবীতে আসবে না। এ অবস্থায় কারা এ দায়িত্ব পালন করবেন। সে প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকবে যারা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে তারাই সফলকাম।"[৩৩] এই আয়াত থেকে বোঝা যায় মুসলিম জাতির অন্তত পক্ষে একদলকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন। এই কাজ করতে গিয়ে বিশ্বনবী (স.) ও সাহাবায়ে কেরামদেরকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, বিরোধীদের নির্যাতন ও অত্যাচারে তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে যারাই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন তাদেরকে অপরিসীম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সৎকাজের আদেশ নিজ পরিবার থেকে শুরু করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।[৩৪] এ সম্পর্কে কুর'আন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি থেকে।"[৩৫] সৎকাজের আদেশদাতা শুধু অন্যকে আদেশ দিবে না বরং নিজেও সৎকাজে নিয়োজিত থাকবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তোমরা মানুষকে সৎকাজে নির্দেশ দাও, আর

---

[৩০]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান**, আয়াত: ১১০।
[৩১]. **মিশকাত শরীফ**, পৃ: ৪৩৬।
[৩২]. **মিশকাত শরীফ**, পৃ: ৪৩৬।
[৩৩]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান**, আয়াত: ১০৪।
[৩৪]. রাসুল (স.) ইসলামের দাওয়াত প্রথমে নিজ পরিবারের মধ্যে দিয়েছিলেন। নিজের স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রা:), চাচাত ভাই হযরত আলী (রা:) এবং হযরত যায়িদ ইবনে হারীসা (রা:) কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (সম্পাদনা পরিষদ, **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫, পৃ: ৪৪৯)।
[৩৫]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাহরীম**, আয়াত: ৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদেরকে বিস্মৃত হও।"[৩৬] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, সৎকাজের আহবানকারী সৎকাজের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে নিজেও সৎকর্মশীল হবে।[৩৭] আর মুসলমান হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই বিধান সমভাবে প্রযোজ্য।

ঈমান রক্ষা ও আমল করার ক্ষেত্রে প্রগতি

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের ঈমান ও আমলকে সুসংহত করার গুরুত্ব অপরিহার্য। ঈমানের আরকান হল সাতটি। তাওহীদে বিশ্বাসের পরেই বাকী ৬ টির প্রতি ঈমান আনাও নারীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, "শুধু পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নেই। প্রকৃতপক্ষেই নেকী হল, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, আখেরাতের উপর, ফেরেশতাদের উপর, আসমানী কিতাবের উপর এবং নবীদের উপর।"[৩৮]

সুতরাং ঈমান আনয়নের পরই নারীকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হয়। এছাড়া প্রতিটি নারীকে আত্মীয় স্বজনের সাথে, পাড়া প্রতিবেশীগণের সাথে, চাকর চাকরানীদের সাথে, শিশুদের সাথে, বড়দের সাথে ইসলামের আলোকে আচরণ ও তাদের অধিকার আদায় করতে হয়। এভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধান নরের ন্যায় নারীও পালন করে দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশালী, কল্যাণময়ী জীবন গঠন করার তাগিদ কুরআন-হাদীসে প্রদান করা হয়েছে। নারী নারীর জন্য, আবার পুরুষ পুরুষের জন্য এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কেউ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারবেনা; আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয় ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। ঈমানের পরই ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন তথা আমলের মাধ্যমে নারীও অনেক সময় নরকে পেছনে ফেলে আল্লাহর নৈকট্য সহজেই অর্জন করতে পারে। আল্লাহর কাছে তাকওয়াই বড় বিষয়, নর বা নারী নয়। ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে সমতা বিধান করে আল্লাহ বলেন, "আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে পারবে না।"[৩৯] আল্লাহ আরও বলেন, "ঈমানের সাথে যে নারী বা পুরুষ নেক কাজ করবে আমি তাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করব।"[৪০] সুতরাং ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পুরুষের পাশাপাশি ইসলাম নারীকেও ঈমান রক্ষা করার ও আমল করার অধিকার দিয়েছে।

---

[৩৬]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ৮৪।

[৩৭]. সম্পাদনা পরিষদ, **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৯। সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজে নিষেধকারীর পক্ষে বিপরীত কাজ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ সম্পর্কে আনাস (রাঃ) থেকে অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসুল্লাহ (স.) বলেন, আমি মিরাজের রাতে এমন কিছু ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হচ্ছে। আমি জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম এসব লোক কারা? তিনি বললেন, এরা অপনার উম্মতের উপদেশদাতা (বক্তা) যারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিত আর নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন থাকতো আর্থাৎ বাস্তব জীবনে নিজেরা তা পালন করতো না। (**মিশকাত শরীফ**)। ভাল কাজের উপদেশ দান একটি মহৎ কাজ। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, "যারা সৎকাজের প্রতি আহবান জানাবে এবং মানুষকে অসৎকাজে নিষেধ করবে তারাই সফলকাম।" (আল কুর'আন, **সুরা আলে ইমরান**, আয়াতঃ ১০৪)। কোন পদ্ধতিতে ভাল কাজের উপদেশ দিতে হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল-কুর'আনে ইরশাদ করেন, "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তমভাবে।" (আল কুর'আন, **সুরা আন্ নাহ্ল**, আয়াতঃ ১২৫)। এখানে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করার জন্য তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ হিকমত, সদুপদেশ ও সদ্ভাবে বির্তক করা। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আঃ) কে ফিরআউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "হে মুসা ও হারুন! তোমরা দুজন ফিরআউনের নিকট যাও, সে তার সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে বলবে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (আল কুর'আন, সুরা **ত্বা-হা** ,আয়াতঃ ৪৩-৪৪)। এ ছাড়া পবিত্র কুর'আনে আল্লাহর বাণী প্রচারকারীদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো আর আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না। (আর কুর'আন, **সুরা আল আহযাব**, আয়াতঃ ৩৯)। অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে হবে নির্ভীকচিত্তে এবং দাওয়াত দাতার কথা হবে যুক্তিসঙ্গত ও উপদেশপূর্ণ।

[৩৮]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ১৭৭।

[৩৯]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১২৪।

[৪০]. আল কুর'আন, **সুরা আন্ নাহ্ল**, আয়াতঃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রগতি

বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় নারীর কোন মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার না থাকলেও ইসলাম নারীকে মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন হিসেবে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। যা নিম্নরূপ:

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারীকে মা হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছে। পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানুষ পৃথীবিতে জন্মলাভ করে এবং তাদেরই স্নেহ, মায়া-মমতা ও আদর যত্নে লালিত পালিত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। তাই সন্তানের দায়িত্ব হচ্ছে মাতা-পিতার হক আদায় করা এবং তারা যেভাবে আদর যত্ন সহকারে সন্তানকে লালন পালন করেন তেমনিভাবে তাদের সেবা যত্ন করা। এ সম্পর্কে কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[৪১]

আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে আরো বলেন, "আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য কর না।"[৪২]

আল্লাহ আরও বলেন, "আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার হক বুঝার জন্য নিজ হতেই তাগিদ দান করেছি। তার মা দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এই কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে) আমার শোকর কর এবং নিজের পিতা-মাতার শোকর আদায় কর। আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।"[৪৩]

মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যহারের তাগিদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং আমরা মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস।"[৪৪]

পবিত্র কুর'আনের বাণীর মত রাসুল (স.) এর বাণী ও কর্মে মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। রাসুল (স.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর শুনে তার দুধমাতা হালিমা সাদিয়া ছুটে এলেন তাঁর কাছে। দুধ মাতার প্রতি নজর পড়া মাত্রই রাসুল (স.) দাড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর মাথার স্বীয় পাগড়ি বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিয়ে সম্মান জানালেন।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে।"[৪৫] অপর এক হাদিস বর্ণিত আছে, "একদা জাহেমী নামক এক সাহাবী রাসুল (স.) নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন , হে আল্লাহর রাসুল আমি জিহাদে যোগদান করতে চাই। এই বিষয়ে আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি। তখন নবী (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? সে বলল হ্যাঁ। তখন নবী (স.) বললেন, তুমি মায়ের নিকট

---

[৪১]. আল কুর'আন, **সূরা বনী ইসরাঈল,** আয়াতঃ ২৩-২৪।
[৪২]. আল কুর'আন, **সূরা আনকাবুত,** আয়াতঃ ৮।
[৪৩]. আল কুর'আন, **সূরা আল লুকমান,** আয়াতঃ ১৪।
[৪৪]. আল কুর'আন, **সূরা আল আহকাফ,** আয়াতঃ ১৫।
[৪৫]. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্ তিরমিযী, **জামে তিরমিযী,** ২য় খন্ড, (দেওবন্দঃ রশিদিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

থাক কেননা মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত।"[৪৬] হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম আহকাম এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করল সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করল। যদি মাতা পিতার মধ্যে কোন একজন হয় যে ব্যক্তি মাতা পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়েত অমান্য করল, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হবে। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোন একজন থাকেন। তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল (স.) যদি মাতা পিতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে থাকেন, তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও।"[৪৭]

হাদীসে মাতার প্রাধান্যের দৃষ্টান্ত

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষের সাথে সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে মায়ের সম্পর্ককে বেশী প্রাধান্য দান করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।"[৪৮] এই হাদিসে পিতার চেয়ে মাতাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ পিতার তুলনায় মা সন্তানের জন্য অধিক কষ্ট সহ্য করেন।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। জনৈক সাহাবী যিনি তার স্ত্রীকে নিজ জননীর উপর কিছুটা প্রাধান্য দিয়ে থাকতেন এবং মৃত্যুর সময় কালিমা পাঠ করতে অপারগ হচ্ছিল এ সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে অবস্থান করছিলাম এমন সময় জনৈক আগন্তক এসে বললেন, মৃত্যু পথযাত্রী এক যুবক খুবই কষ্ট করে শ্বাস গ্রহণ করছে, সে মুহূর্তে তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়তে বলা হলে সে কালিমা পড়তে পারেনি। রাসুল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, সে সালাত আদায় করতো কি? লোকটি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, সে সালাত আদায় করতো। এরপর রাসুল (স.) উঠে রওয়ানা করলেন আমরা তার সাথে গেলাম। রাসুল (স.) যুবকের কাছে প্রবেশ করে, তাকে কালিমা পাঠ করতে বললেন। যুবকটি বললেন, আমি উচ্চারণ করতে অপারগ। রাসুল (স.) উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম হবার উল্লেখ্যযোগ্য কারণ রয়েছে কি? জনৈক ব্যক্তি বলল, সে তার মায়ের অবাধ্য ছিল। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তার মা কি জীবিত আছেন? হ্যাঁ তিনি জীবিত আছেন। রাসুলল্লাহ (স.) বললেন তাকে ডেকে আনো। এরপর মহিলা উপস্থিত হলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ যুবকটি আপনার ছেলে? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। রাসুলল্লাহ (স.) মহিলাকে বললেন, যদি এখানে আগুনের কুন্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়, আর আপনাকে বলা হয়, আপনি তার জন্য সুপারিশ করলে আমরা তাকে মুক্তি দেবো নতুবা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো-তাহলে কি আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন? মহিলা বললেন, অবস্থা এমন হলে আমি তার জন্য অবশ্যই সুপারিশ করবো। তখন রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তাহলে আপনি আল্লাহর এবং আমাকে সাক্ষী রেখে বলুন। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। তখন মহিলা বললেন, হে আল্লাহ আমি আপনাকে এবং আপনার রাসুল (স.) কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট তখন রাসুল (স.) বললেন, এই ছেলে বল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহেদ লা-শারীকা লাহ-ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদ আবদুহু ওয়া রাসুলুহু'। তখন সে যুবক তা বলতে সমর্থ হলো। সে সময় রাসুলুল্লাহ (স.) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বললেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমার মাধ্যমে তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন। অতএব উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, মাতার উপর অন্য কোন

---

৪৬. আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব, **সুনানে নাসায়ী**, ২য় খন্ড, (দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, ইউ পি), পৃঃ ৪২১।

৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল আদাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৮; ইমাম মুসলিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কে উত্তম সাহচর্যের পাত্র, ১৩ খন্ড, পৃঃ ৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পিতামাতার প্রতি সদাচার করা কেননা তাঁরাই উত্তম হকদার, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়া সন্তানের জন্য সঠিক হবে না। এবং মায়ের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মুক্তির পথ সন্তানের জন্য সুগম হবে।[৪৯]

মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনীত হলে সন্তানের যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাদের মধ্যে কিছু আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। তারা সে সময় অনেকটা শিশুদের মত আচরণ করে। এবং রোগ ব্যধির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহ পাক বৃদ্ধ মাতা-পিতার আচরণে ও রোগ-ব্যাধির কারণে বিরক্ত হয়ে 'উহ' শব্দ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (স.) বৃদ্ধাবস্থায় মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক), ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ ব্যাক্তি কে? প্রতি উত্তরে নবী করীম (স.) বললেন, যে ব্যক্তি তার মাতা বা পিতা অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করল না অর্থাৎ মাতা-পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করল না সে ধ্বংস হোক।"[৫০]

অতএব, পিতা-মাতার হক আদায় তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন যে সন্তান যত বেশি করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদান সে তত বেশি পাবে। এবং যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়। রাসুল (স.) বলেন, তিন ব্যক্তি পথ চলছিল হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হলে তারা একটি পাড়াড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। একটি বিরাট প্রস্তর খন্ড গুহার মুখে এসে পড়ায় গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একনিষ্ট ভাবে তাদের নেক আমলের উছিলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগল যাতে গুহার মুখ আল্লাহ উন্মুক্ত করে দেয়। .... তারমধ্যে একজন বাবা মায়ের প্রতি ভালবাসা ও ভাল ব্যবহারের উছিলায় আল্লাহর কাছে মুক্তির দোয়া কবুল হল এবং গুহার মুখ কিছুটা খুলে গেল।[৫১] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ইসলামে মা হিসেবে নারীকে পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাড়ী সভ্যতা নারী জাতির উপর পাপ ও অপবিত্রতার কলংক আরোপ করে নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ করেছে। তৎকালীন আরব সমাজে নারীকে স্ত্রী হিসেবে চরম অপমান ও অমর্যাদা ভোগ করতে হত। হীন ও নগণ্য মনে করে স্ত্রীদের সাথে দাসীর মত আচরণ করা হত। ইসলামই সর্বপ্রথম এই আচরণের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ করেছে এবং স্ত্রীর উপর সকল অত্যাচার ও অপমান দুর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে উৎসারিত। তারা নারী বলে মৌল অধিকারের[৫২] ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। আল্লাহ বলেন, "স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে

---

৪৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০), পৃ: ৭৬-৭৭।

৫০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আত-তীবরিযী, **মেশকাতুল মাসাবিহ**, আদাব অধ্যায়, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ: ১৩৭৬।

৫১. তাদের একজন দোয়া করল হে আল্লাহ আমার মা বাপ অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আমি পশু চরাতাম এবং সন্ধ্যা বেলা পশুগুলো দোহন করতাম এবং আমার ছেলেমেয়েদের দুধপান করানোর আগে আমার পিতা-মাতাকে দুধপান করাতাম। একদিন ফিরে আসতে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখলাম তারা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যথা নিয়মে দুধ দোহন করলাম এবং দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদের ঘুম থেকে জাগানো ভাল মনে করলাম না এবং তাদের আগে ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। আমার তিন ছেলেমেয়েদের এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত চলল। হে আল্লাহ যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এটা করেছি তাহলে পাথরটা এতটা সরিয়ে দাও যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তায়ালা পাথরটি একটু সরিয়ে দিল। (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আদব আখলাকের বর্ণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যে বক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯০-৯১)।

৫২. মৌলিক অধিকার বলতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রকৃত প্রয়োজন বা মূল অধিকারকে বুঝায়। যেমন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর হক যথাযথভাবে আদায় করাও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।"[৫৩] অর্থাৎ স্ত্রী এবং স্বামী দুজনেই আল্লাহর নিকট সমান। তাদের অধিকার ও অভিন্ন। মৌল অধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অথচ জাহেলিয়া যুগে আরবে নারীর মৌলিক অধিকার তো দুরের কথা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। নারীদের উপর চালানো হত অকথ্য জুলুম ও অত্যাচার। একবার কোন নারীর বিয়ে হলে তাকে আজীবন এই জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করতে হতো। তারা স্ত্রী হিসেবে কোন অধিকার ও মর্যাদা পেত না। আবার তাদের কাছ থেকে মুক্তিও পেত না। তৎকালীন নারীদের স্বামীর নিকট থেকে তালাক গ্রহণ করে বা তাকে তালাক দিয়ে মুক্তি পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। বরং নারীদেরকে এমনভাবে আটকে রেখে তাদের নিকট থেকে নিজেদের দেয়া ধন সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাতো এবং সে জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করত। কুর'আনে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা (হে স্বামীরা) তাদের স্ত্রীদের বেঁধে আটকে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিকট থেকে তোমাদের দেয়া ধন সম্পদের কিছু অংশ কেড়ে নেবে।"[৫৪]

জাহেলিয়া যুগে আরবদের মধ্যে স্ত্রীদের ঘরের অন্যান্য আসবাব পত্রের মতই অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করা হত এবং স্বামী মরে গেলে তার স্ত্রীকেও বন্টন করে দেয়া হত।[৫৫] এই প্রথা নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মেয়েদের অন্যায় জবরদস্তি করে নিজেদের মীরাসের সম্পদ বানিয়ে নিওনা। তা তোমাদের পক্ষে আদৌ হালাল হবে না।"[৫৬]

ইসলামে কারো মর্যাদা দান বলতে কারো অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ এবং অবদান সমূহের যথাযথ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই স্বামীর সমমর্যাদায় অধিষ্টিত করে স্ত্রীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী ঘোষণা করেছে। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "হে বিশ্বমানবতা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র প্রাণ অর্থাৎ আদম (আ:) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সহধর্মিনী হাওয়া (আ:) সৃষ্টি করেছেন। তা তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন।"[৫৭] আল কুর'আনে আরও বলা হয়েছে, "নারীদের জন্য যথারীতি সেসব অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে।"[৫৮]

জাহেলী যুগে কোন কোন স্বামী বিনা কারণেও স্ত্রীকে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা দিত। তাকে তালাক দিত আবার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ফিরিয়ে আনত। এমনি করে বারবার তালাক দিত এবং প্রতিবারই ফিরিয়ে আনত। এতে অসহায় স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে দাম্পত্য সুখ লাভ করতে পারত না। এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করারও সুযোগ পেত না। নারীদের এ দুর্বিষহ যাতনা দুর করার জন্য আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য আটকে রেখনা, যে এরূপ করবে সে নিজের উপরই জুলুম করবে অর্থাৎ নিজেরই ক্ষতিসাধন করবে। তোমরা আল্লাহর নির্দেশ সমূহকে ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত কর না।"[৫৯] কুর'আনে আরও বলা হয়েছে, "এবং যখনই তোমরা স্ত্রীদেরকে (অস্থায়ী) তালাক দাও ও তারা ইদ্দত নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে বিধিমতে বহাল কর অথবা তাদেরকে ভালভাবে বিদায় দাও। তাদের উপর নির্যাতন বা বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক করে রেখ না। যে ব্যক্তি এমন করে সে নিজেরই ক্ষতি করে।"[৬০]

---

[৫৩]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াত: ২২৮।
[৫৪]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১৯।
[৫৫]. আমিন আহসান এছলাহী, **মদাব্বেরে কুর'আন**, ২য় খন্ড, (দিল্লী: তাজ কোং, ১৯৮৯), পৃ: ২৬৯।
[৫৬]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১৯।
[৫৭]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১।
[৫৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াত: ২২৮।
[৫৯]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াত: ২৩১।
[৬০]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াত: ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন আরব সমাজে স্ত্রী জাতি ছিল খুবই অসহায়। স্বামীর সম্পদেও তাদের কোন অধিকার ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও স্ত্রী কোন অংশ পেত না। বিধবা নারীদের এই অসহায় অবস্থা দুর করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তোমরা যদি কোন সন্তান সন্ততি না রেখে মারা যাও। তাহলে স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশের মালিক হবে। আর তোমাদের সন্তান থাকলে স্ত্রীরা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত ধন সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ।"[৬১]

স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণে রসুল (স.) এর নির্দেশ

নারীর প্রতি রাসূল (স.) এর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা, অফুরন্ত আন্তরিকতা। তাই তিনি নারী জাতির প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এই পৃথিবীতে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম বস্তু হচ্ছে নারী, সুগন্ধি এবং নামাজের মধ্যে রাখা হয়েছে আমার চক্ষু শীতলতা।"[৬২] রাসূল (স.) আরও বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে করে তোমরা তাদের উপভোগ করেছ।"[৬৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, তোমরা স্ত্রীদেরকে সদুপদেশ দাও।[৬৪] রাসূল (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী পরিজনদের কাছে উত্তম।"[৬৫] রাসূল (স.) আরও বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া তার উচিত নয়। আর আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ পুরুষের বুকের পাশের বক্র হাড় দ্বারা নারী সৃষ্টি হয়েছে এবং ইহার উপরের অংশই সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি একে একেবারে সোজা করতে চেষ্টা কর, তবে ইহা ভেঙ্গে যাবে। আর একে সোজা করতে চেষ্টা না করলে ইহা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে উপদেশ দিচ্ছি।"[৬৬] তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে আরও বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের প্রতি সম্মানের সাথে আচরণ করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। কারণ, তারা আমাদের মাতা, কন্যা, ফুফু, খালা, মামী ইত্যাদি। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মুল্য আছে। কিন্তু জগতে সর্বাপেক্ষা মুল্যবান হল ধার্মিক নারী।[৬৭]

গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর বিষয়সমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে। কুর'আন মজীদে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, "স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।"[৬৮]

---

৬১. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১২।

৬২. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোবাইব ইবনে আলী, **সুনানে নাসায়ী**, ২য় খন্ড, (দেওবন্দঃ দারু কিতাব তা.বি.), পৃঃ ৭৭।

৬৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, কিতাবুল হজ্জ এর বরাত দিয়ে মাওঃ আব্দুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭৯।

৬৫. সাইয়্যেদ সাবিক ফিকহুস সুন্নাহ, **দার-উল-ফাতহুল ইলমিল আরবী**, ২য় খন্ড, (কায়রোঃ ২য় সংস্করণ, ১৯৯০), পৃঃ ২৯৩; মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ, **সুনানে ইবনে মাযাহ**, বিবাহ অধ্যায়, (দেওবন্দঃ রশিদিয়া কুতুবখানা), পৃঃ ১৪৩।

৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৭৯।

৬৭. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ১ম খন্ড, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮১।

৬৮ আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২৩৩। আল্লামা আহ্‌মাদুল মুস্তাফা আল-মারাগী এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, কুর'আন মজীদ সন্তান পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতা-মাতার একজনকে অপরজনের উপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি-এ কথা যদি চিন্তা ও লক্ষ্য করা হয়

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলে করীম (স.) এর জীবনে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ সম্পর্কিত অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম অহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অপনোদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা:) এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। তিনি বলেছিলেন, আমি এই ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি।[৬৯] একথা শুনে জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা (স.) তাঁকে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনাকে কখনোই এবং কোনদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপর্দকহীন গরীবদের জন্যে উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এজন্যে আল্লাহ কখনই শয়তানদের আপনার উপরে জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোন অমূলক চিন্তা-ভাবনাও আপনার উপর চাপিয়ে দেবেন না। আর এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়েতের কার্য্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।[৭০] হযরত খাদীজা (রা:) এর সান্ত্বনা বাণী রাসূল করীম (স.) এর মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দেয়।

স্ত্রীর সাথে পরামর্শ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা সম্ভব হল না, তখন রাসূল (স.) এর সঙ্গে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবী নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে রাসূল (স.) তাঁদেরকে ঐখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে তাঁর এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। এ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম (স.) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা:) এর কাছে সবকথা খুলে বললেন। তিনি সবকথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবীগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং সে কাজ করতে লেগে যাবেন। রাসূল (স.) তাই করলেন এবং সাহাবীরাও রাসূল (স.) কে অনুসরণ করল।[৭১] এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে বাস্তবিকই হযরত উম্মে সালামা (রা:) এর পরামর্শ কাজে লেগেছিল। তাই বলা যায় স্ত্রীকে নারী হওয়ার কারণে দুর্বল ভেবে অবহেলা না করে সকল কাজ স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে করলে অনেক কল্যাণ সাধিত হয়।

স্ত্রীগণের সাথে রাসূল (স.) এর আচরণ

স্ত্রীকে সহযোগীতা করার লক্ষ্যে রাসূল (স.) গৃহের অনেক দায়িত্ব পালন করতেন। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা:) কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল (স.) ঘরে কি করতেন? তিনি বললেন, তিনি গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করতেন।[৭২]

সফরে স্ত্রীদের সঙ্গে নিতেন : হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠত তিনি তাকেই সঙ্গে নিতেন।[৭৩]

তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়। (আল্লামা আহ্‌মাদুল মুস্তাফা আল-মারাগী, **তাফসীরে আল-মারাগী**, ২য় খন্ড, দারুল ফিক্‌র, পৃ: ১৮৮)।

[৬৯]. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড (দিল্লী: রশিদিয়া কুতুবখানা, ১৩৭৫ হিজরী), পৃ: ৩।

[৭০]. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩।

[৭১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুত শুরুত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: আশশুরত ফিল জিহাদ ওয়াল মাসালিহাতু মা'আ আহলিল হারব; নুরুল ইয়াক্বীন, **ফি সীরাতে সাইয়্যেদুল মোরসালীন**, পৃ: ১৯১ এর বরাত দিয়ে মাওলানা আবদুর রহিম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৪।

[৭২]. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যে স্বীয় পরিবারের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকবে, তারপর নামায প্রতিষ্ঠা করবে, তারপর বের হবে, ২য় খন্ড, পৃ: ৩০৩।

[৭৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, যুদ্ধ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের আলোচনা, ৮ম খন্ড, পৃ: ৪৩৬; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা এর বিরুদ্ধে অপবাদের আলোচনা, ৮ম খন্ড, পৃ: ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিকাফের সময় ও তিনি স্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী সফিয়াহ (রা:) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রমযানের শেষ দশকের কোন একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইতিকাফ অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠে দাঁড়ালেন।[৭৪] অন্য বর্ণনায় আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর স্ত্রীগণও সাথে ছিলেন। এরপর তাঁরা চলে গেলেন। তারপর তিনি সাফিয়াহ বিনতে হুয়াইকে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমার সাথেই আসছি।[৭৫]

তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান: হযরত আনাস রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক পারসিক প্রতিবেশী, যে ভাল গোশত রান্না করতে পারত, রাসূল (স.) এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত দিতে এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযী আল্লাহু আনাহাকে দেখিয়ে বললেন, এ আমার সাথে যাবে না? সে বলল, জী না। রাসূল (স.) বললেন, তাহলে আমার যাওয়া হবে না। এরপর রোকটি ফিরে গিয়ে পুনরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসুল (স.) বললেন, আয়েশা আমার সাথে যাবে না? সে বলল, জী-না। রাসূল (স.) বললেন, তবে আমি যেতে পারছি না। লোকটি পুনরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসূল (স.) বললেন, আয়েশা কি যাবে? এবার তৃতীয় বারে লোকটি বলল, জী হ্যাঁ। এরপর তাঁরা উভয়েই উঠলেন এবং একে অপরের পেছনে পেছনে সে লোকটির গৃহে গিয়ে পৌছলেন।[৭৬]

তিনি স্ত্রীর আরোহণের জন্য উটের পিঠে কোমল আসন রেখেছেন এবং নিজের হাটু স্থাপন করে তার উপর স্ত্রীকে আরোহণ করিয়েছেন: হযরত আনাস রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ...তারপর আমরা খায়বর থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে রাসুল (স.) কে তার স্ত্রীর সাফিয়া (রা:) এর জন্য বাহনের পিছনে পর্দা টানাতে দেখলাম। এরপর তিনি উটের কাছে বসে নিজ হাটুদ্বয় স্থাপন করলে সাফিয়াহ (রা:) তাঁর হাটুর উপর পা রেখে আরোহণ করলেন।[৭৭]

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও উৎকৃষ্ট ব্যবহারের দৃষ্টান্ত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সহধর্মিণীদের প্রতিও সদাশয় ব্যবহারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। পঁচিশ বয়সে তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা হযরত খাদিজা (রা:) কে বিবাহ করেন এবং দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর পরম তৃপ্তিতে তাঁর সাথে অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অন্য বিবাহ করেননি এবং তাঁর ইনতিকাল রাসূল (স.) এর নিকট অতীব মর্মন্তুদ ছিল। চিরকাল তিনি তাঁর পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করেন। তিনি সর্বদা খাদীজা (রা:) এর আত্মীয় স্বজনের নিকট উপঢৌকন পাঠাতেন। আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজার প্রতি আমার ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা রাসুল (স.) এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না, অথচ আমি তাঁকে দেখিনি।[৭৮]

---

[৭৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ইতিকাফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ইতিকাফ স্ত্রীর সাথে স্বামীর সাক্ষাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৮৬।

[৭৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ইতিকাফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ইতিকাফকারী কি স্বীয় প্রয়োজনে মসজিদের গেটে যেতে পারবে, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৮৬; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি একাকী নিজের স্ত্রী বা মাহরাম মহিলার সাথে চলে তার জন্য অন্য কাউকে ইনি হচ্ছেন অমুক একথা বলে মহিলার পরিচয় দেয়া ভাল, ৭ম খন্ড, পৃ: ৮।

[৭৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, পানীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মেজবান যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়নি সে যখন মেহমানের অনুসরণ করবে তখন মেহমান কি করবে সংক্রান্ত, ৬ খন্ড, পৃ: ১১৬।

[৭৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, যুদ্ধ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: খায়বরের যুদ্ধ, ৯ম খন্ড, পৃ: ২০।

[৭৮]. কিন্তু (ঈর্ষার কারণ ছিল) রাসুল (স.) প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং প্রায়ই বকরী জবাই করে তা খাদীজার বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নবী (স.) এর হযরত খাদীজাকে বিবাহ করা এবং এর ফযীলত, ৮ম খন্ড, পৃ: ১৩৬; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আহমদ (রহ.) এর এক বর্ণনায় আছে, রাসুল (স.) বলেছেন, "খাদীজার চেয়ে উত্তম কোন স্ত্রী আল্লাহ আমাকে দান করেননি।"[৭৯] হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (স.) বলেছেন, (সেকালের) সমগ্র নারীকুলের মধ্যে ইমরান কন্যা মারয়াম হলেন সর্বোত্তম। আর (একালে) নারীকুলের সেরা হলেন হযরত খাদীজা (রা:)।"[৮০]

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ...কখনও আমি রাসূল (স.) কে বলতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই। তখন তিনি বলতেন, হ্যাঁ সে এরূপই ছিল। আর তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান সন্ততি হয়েছিল।"[৮১] ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসুল (স.) বলেছেন, ".....অন্য কোন স্ত্রী থেকে আমি সন্তান লাভ করতে পারিনি, আল্লাহ তাঁর গর্ভেই আমাকে সন্তান দান করেছেন।"[৮২]

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) এর সহধর্মিণীদের কেউই আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি, এমনকি হযরত খাদীজা (রা:)ও নন। অবশ্য আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু রাসূল (স.) তাঁর কথা খুব স্মরণ করতেন। কখনও কখনও তিনি বকরী জবাই করে তা টুকরো টুকরো করে খাদীজার বান্ধবী ও স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[৮৩]

তিনি হাবশীর খেলাধুলা দেখতে নিজ স্ত্রীদেরকে আহবান জানাতেন এবং তার চলে যাওয়া অবস্থান করতেন। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেদিন ছিল ঈদের দিন। কতিপয় হাবশী চামড়ার ঢাল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করেছিল। সে সম্পর্কে হয়তো বা আমি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করেছি বা তিনি নিজেই বলেছেন, তুমি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ, এরপর তিনি আমাকে তার পিছনে দাড় করিয়ে দিলেন। তখন আমার গাল তাঁর গালের সাথে মিলানো ছিল। এ সময় তিনি বলে চলছিলেন, হে বনী 'আরফেদা'[৮৪] খেলা চালিয়ে যাও। এরপর যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন, তোমার দেখা হয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ । তিনি বললেন, তাহলে এখন যাও।"[৮৫]

মুমিনদের স্ত্রীদের সাথে রাসুলুল্লাহ (স.) এর আচরণ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাই। আমি চাই সালাতকে দীর্ঘায়িত করতে। কিন্তু আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে তার মায়ের ভাবনার কথা মনে করে সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি।[৮৬]

হযরত উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) সালাম ফিরিয়ে কিছুক্ষণ বসতেন। তার উঠার পূর্বেই মহিলারা বেরিয়ে যেত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন শিহাব (রা:) বলেন, আল্লাহই ভাল

---

৭৯. **ফতহুল বারী**, ৮ম খন্ড, পৃ: ১৪১।

৮০. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, ৭ খন্ড, পৃ: ২৮১, ২৮২; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা:) বর্ণনা, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৩২।

৮১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নবী করিম (স.) এর হযরত খাদিজাকে বিবাহ করা এবং ফযিলত, ৮ম খন্ড, পৃ: ১৩৭।

৮২. **ফতহুল বারী**, ৮ম খন্ড, পৃ: ১৩৭।

৮৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: রাসুল (স.) এর সাথে খাদিজা (রা:) বিবাহ ও তাঁর গুণাবলী, ৮ম খন্ড, পৃ: ১৩৬; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হযরত খাদিজা (রা:) এর গুণাবলী, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৩৪।

৮৪. হাবশীদের উপাধি।

৮৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ঈদের দিন নেযা ও তরবারি খেলা, ৩য় খন্ড, পৃ: ৯৫; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ঈদের দিন যে খেলায় কোন গুনাহ নেই তাতে রুখসাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২২।

৮৬. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: শিশুর কান্নার সময় যে নামায হালকা করে, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৪৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: সকলকে নামায সংক্ষিপ্ত করতে ইমামের আদেশ, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

জানেন, তবে আমার মনে হয়, পুরুষের বেরিয়ে আসার পূর্বেই যাতে মহিলারা বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্যই তিনি এমনটি করতেন।[৮৭]

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (স.) বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে কতিপয় মহিলা ও শিশুকে আসতে দেখে দাড়িয়ে থাকলেন। তারপর তাদেরকে বললেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, একথাটি তিনি তিনবার বললেন।[৮৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে উসমান রাযী আল্লাহু আনহু এর অনুপস্থিতির কারণ হচ্ছে তাঁর স্ত্রী (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা) রোগগ্রস্ত ছিলেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বদর অংশগ্রহণকারী অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান, তোমরাও সেই প্রতিদান।[৮৯]

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ রা এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। (অন্য এক বর্ণনায় আছে,[৯০] রাবী বলেন, আমার নিশ্চিত ধারণা তিনি মহিলাই হবেন।) তিনি মারা গেলে রাসূল (স.) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে মারা গেছে। আল্লাহর রাসূল (স.) বললেন, তোমরা আমাকে তা জানালে না কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরের কাছে এসে তার জানাযা পড়লেন।[৯১]

হযরত বুরাইদা রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধে গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ যদি আপনাকে যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে আপনার সম্মানে দফ বাজাব এবং গান গাইব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, মানত যদি করে থাক, তাহলে বাজাতে পার, অন্যথায় দরকার নেই। এরপর সে মহিলা দফ বাজাতে শুরু করল।[৯২]

রাসূল (স.) এর যুগের স্ত্রীদের অবস্থান ও মর্যাদা একজন নারীর মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করে দেয়। সুতরাং ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা পৃথিবীর যে কোন ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে বিরল।

পরিশেষে বলা যায়, স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন শুধু রাসুল (রাঃ) এর সময়ই ছিল না খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও এর চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট স্বীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে এলো। কিন্তু খলিফার গৃহে প্রবেশের পুর্বে তিনি শুনতে পেলেন খলীফার স্ত্রী স্বীয় স্বামীর প্রতি চীৎকার করে কর্কশ উক্তি করছেন। কিন্তু মহান খলীফা স্থির ও প্রশান্ত রয়েছেন, স্ত্রীকে কিছুই বললেন না। এতে সে ব্যক্তি হতবুদ্ধি হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাকে ফিরে যেতে দেখে মনে করলেন, লোকটি হয়ত কোন জরুরী কাজে এসেছিলেন। তাই তিনি তাকে ডেকে আনলেন এবং তার প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি উত্তরে বলেন, তিনি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর কর্কশ উক্তি সত্ত্বে খলীফা কিছু না বলে নির্বিকার

---

[৮৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামাযের গুণাগুণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সালাম দান, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬৭।

[৮৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আনসারদের উদ্দেশ্যে মহানবীর (স.) উক্তি, সকল মানুষের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট বেশী প্রিয়, ৮ খন্ড, পৃঃ ১১৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আনসারদের ফযীলত, ৭ খন্ড, পৃঃ ১৭৪।

[৮৯]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উছমান বিন আফফানের (রাঃ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী, ৮ খন্ড, পৃঃ ৬০।

[৯০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মসজিদের খেদমত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০০।

[৯১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে ঝাড়ু দেয়া এবং কাপড়ের টুকরো বাইরে ফেলে দেয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৯; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কবরের পাশে নামায পড়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৬।

[৯২]. ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে 'হাসান' 'সহীহ' ও 'গরীব' সূত্রে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী, **সহীহ সুনানে তিরমিযী**, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ "হে উমর! নিশ্চয়ই শয়তান তোমাকে ভয় করে," হাদীস নং ৩৬৯১/২৯১৩।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছেন দেখে তিনি অভিযোগ না করেই প্রত্যাবর্তন করছিলেন। ..... তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন। আমার স্ত্রী আমার খিদমত করেন। তিনি আমাদের রান্না-বান্না করেন, আমাদের গৃহ পরিচালনা করেন এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির লালন পালন করেন। অতএব মাঝে মাঝে তাঁদের জ্বালাতন সহ্য করে গেলে বেশি কী-ই বা করা হল।[৯৩] হযরত উমর (রা:) বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান (খলীফা) হিসাবে সরকারী তহবিল হইতে অতি সামান্য ভাতা গ্রহণ করতেন। গৃহকার্যে স্ত্রীকে সাহায্যের জন্য কোন চাকর-চাকরাণী রাখবার আর্থিক সঙ্গতি তাঁর ছিল না। তাঁর স্ত্রী সংসারের সমস্ত কাজ করতেন বলে তিনি অনেকসময় স্ত্রীর উত্তেজিত আচরণের প্রতিবাদ করতেন না। পরবর্তীকালেও ইসলামের বাস্তব অনুসারিগণ স্ত্রীদের সাথে এরূপ সদাচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই রেখে গিয়েছেন।

কন্যা সন্তান হিসেবে নারীর মর্যাদা

জাহেলিয়া যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাহিত করা হত, জন্মের পূর্বেই মেরে ফেলার পরিকল্পনা করা হতো। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হলে তার মুখ বিষাদে কালো হয়ে যায়, এবং অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা বোধ করতে থাকে। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার প্রেক্ষিতে লজ্জায় ও গ্লানিতে সে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা ও অপমান সহ্য করে তাকে জীবিত রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তাদের সিদ্ধান্ত অতীব নিকৃষ্ট।"[৯৪]

আল কুর'আনে নারী নির্যাতনের শুধু সমালোচনাই করা হয়নি বরং তাদের অপরাধবোধের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে অপরাধীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অঙ্গীকার করে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[৯৫]

ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেছে। কুর'আনে আল্লাহপাক বলেন, "যারা নিজেদের সন্তানদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[৯৬] আল্লাহ আরও বলেন, তোমরা দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে ও তাদেরকে তো আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। সন্তানদের হত্যা করা অমার্জনীয় অপরাধ।[৯৭]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান রয়েছে যাকে পুতে ফেলা হয়নি, তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করা হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়নি, আল্লাহ তা'য়ালা সেসব ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৯৮]

রাসুলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়নি, তাদের সুখে-দু:খে ধৈর্য্য ধারণ করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কারণে সে ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেসা করলেন, দু'জন কন্যা হলে, উত্তরে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, দুজন হলেও, আবার প্রশ্ন করা হলো, একজন হলে, উত্তরে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, একজন কন্যা সন্তান হলেও।[৯৯]

---

৯৩. সায়িদ আল-শাবালঞ্জি, **নুর আল-আবসর**, (কায়রো: আতিফ প্রেস, ১৯৬৩), পৃ: ৬৪।

৯৪. আল কুর'আন, **সুরা আন্ নাহ্ল**, আয়াত: ৫৮-৫৯।

৯৫. আল কুর'আন, **সুরা আত তাকবীর**,আয়াত: ৮-৯।

৯৬. আল কুর'আন, **সুরা আল আন'আম**, আয়াত: ১৪০।

৯৭. আল কুর'আন, **সুরা বনী ইসরাঈল**, আয়াত: ৩১; সুরা **আল আন'আম**, আয়াত: ১৫১।

৯৮. আবূ দাউদ, **সুনান**, ৪র্থ খন্ড, (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.) পৃ: ৩৩৭; মুহাম্মদ ইবনে আবি শায়বা, **মুসান্নাফ**, ৫ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, (রিয়াদ: মাকদতাবাতুর রুশাদ), পৃ: ২২১; ইমাম হাকিম, **মুসতাদরাক**, ৪/১৭৭, ইবন আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি এ বর্ণনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম যাহাবী এতে একমত পোষণ করেছেন।

৯৯. প্রাগুক্ত, ৪/১৭৬, আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বর্ণনাটি সহীহ। ইমাম যাহাবী (রহ.) এতে একমত পোষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলিয়া যুগে কন্যা সন্তানদের হৃদয় বিদারক চিৎকার উপেক্ষা করে পিতা কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত। এবং এটাকে তারা সৎকর্ম বলে মনে করত। এমনকি প্রাচীন আরবে যে যতবেশী কন্যা সন্তানকে হত্যা করতে পারত সে তত বাহাদুর বলে বিবেচিত হত। নারীর এই অধঃপতিত অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে ইসলামের অবদানে, তাই রাসূল (স.) যথার্থই কন্যা সন্তানদেরকে মহিমান্বিত করেছেন, হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেন, একবার জনৈক মহিলাদের সাথে দুটি মেয়ে নিয়ে আমার কাছে ভিক্ষা করতে আসলো। কিন্তু সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই পেল না। আমি সেটি তাকে দিলে সে তা তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল। এরপরে সে উঠে চলে গেল। ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করলেন এবং আমি তার কাছে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম, সব কিছু শুনে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কন্যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদাচরণ করবে এই কন্যারা তার জাহান্নামে যাওয়ার পথের প্রতিবন্ধক হবে।[১০০]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দুই কন্যাকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকবো, এই বলে তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[১০১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।"[১০২] হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তিন কন্যা সন্তান বা তিন বোনের লালন-পালন করবে, তারা (কন্যা বা বোন) সে ব্যক্তির দোযখে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।[১০৩]

পিতা জীবিত থাকতে ছেলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার লালন-পালন করা যেমন পিতার কর্তব্য, মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার জন্যেও পিতার অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ যদি কন্যা সন্তানদের মাধ্যমে কাউকে কোন রকম পরীক্ষায় ফেলেন আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তাহলে ঐ সব কন্যা সন্তান তার জন্য দোযখের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।[১০৪]

নবী করীম (স.) বলেছেন, "আমি কি তোমাকে সবচেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ সাদকার কথা বলব না? তাহলো তোমার ঐ কন্যা যে বিধবা হওয়ার কারণে অথবা তালাক দেয়ার কারণে তোমার কাছে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার জন্য উপার্জনকারী বা দায়িত্ব গ্রহণকারী আর কেউ নেই।[১০৫]

প্রাক ইসলামী যুগে নারীর অবস্থা যখন খুবই করুণ ছিল তখন নারী মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (স.) কন্যা সন্তানকে সকল প্রকার লজ্জা ও অপমান থেকে মুক্ত করে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং কন্যা সন্তানের লালন পালনকে জান্নাত লাভের উপায় বলে ঘোষণা করেন।

নিজ কন্যা সন্তানের সাথে রাসূল (স.) এর আচরণ

---

[১০০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আদাব অধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৮৬-৮৮৭; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, **জামে তিরমিযী**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

[১০১]. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩; ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (রহ.), **রিয়াদুস সালেহীন**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, একাদশ প্রকাশ, এপ্রিল-২০০১), পৃঃ ২১১; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ২য় খন্ড, কিতাবুল আদব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩০; Arthur Zefri, **The Family in Islam**, (New York: Harfar and Row, 1959), p: 201-238.

[১০২]. মহানবী (স.) চার কন্যার পিতা ছিলেন। (আলা উদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী ইবনে হুসামউদ্দীন, **কানযুল উম্মাল, আল-মকতবা আত-তুরাস আল-ইসলামী, হালব**, ১৬শ খন্ড, পৃঃ ৪৬৮)।

[১০৩]. মুহাম্মদ নাসের উদ্দীন আল-বানী, **সহীহ আল-জামে আসসগীর**, (আল-মকতবা আল-ইসলামী, ১৯৮৮ হি.), হাদীস নং ৫,২৪৮।

[১০৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ২য় খন্ড, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮৭।

[১০৫]. ইবন মাজাহ, **সুনান**, ২য় খন্ড, কিতাবুল আদব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) এর চারজন কন্যা সন্তান ছিল। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ যত্ন সহকারে লালন পালন করেন।[১০৬] তাদের বিবাহিত জীবনে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। কনিষ্ট কন্যা হযরত ফাতেমা (রা:) ব্যতীত তিন কন্যাই রাসূলের (স.) জীবদ্দশাই মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মৃত্যুতে তিনি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। তিনি হযরত ফাতেমা (রা:) কে অধিক ভালবাসতেন। বিবাহের পর হযরত ফাতেমা (রা:) স্বামীর সাথে দুরে চলে গেলে তিনি একটি নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া করে তাদেরকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি কন্যা ফাতিমা (রা:) সম্বন্ধে বলতেন, ফাতিমা তাঁরই অংশবিশেষ। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি অন্যায় করে সে আমারই উপর অন্যায় করল। এবং যে ব্যক্তি তাঁকে সন্তুষ্ট করল সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল।[১০৭] হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা রাযী আল্লাহু আনহা পায়ে হেঁটে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলেন। তাঁর হাটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাঁটার মতো। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কন্যার আগমন শুভ হোক। এরপর তিনি তাঁকে ডান বা বাম পাশে বসালেন।[১০৮]

তাই বলা যায় ইসলাম কন্যা সন্তানের জন্মকে পিতা-মাতার জন্য সম্মান ও মর্যাদার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং বাবা-মা কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মত স্নেহ, ভালাবাসা ও গুরুত্ব দিয়ে যত্ন সহকারে লালন পালন করবেন সেই শিক্ষা দান করেছেন।

বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা

আল্লাহ তা'য়ালা নারীকে বোন হিসেবেও মর্যাদা দান করেছেন। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, যে ব্যক্তি দুই বা তিন বোন প্রতিপালন করলো, আমি এবং সে অত্যন্ত কাছাকাছি থাকবো এবং মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলদ্বয় ইঙ্গিত করে দেখালেন।[১০৯]

ইসলাম বোন হিসেবে নারীকে অধিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা দান করেছে। এ সম্পর্কে উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। হযরত জাবির (রা:) এর পিতা তাকে বললেন, বৎস! হয়ত এই যুদ্ধেই আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এই শেষ মুহুর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার অসিয়ত করছি। এরপর হযরত জাবির (রা:) একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও তার বোনদের দেখাশোর জন্য একজন বয়স্কা বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলেন। নবী কারীম (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি একজন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে বা কেন? জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। অর্থাৎ আমার নয়টি বোন আছে। তাদের দেখাশোনার প্রয়োজন আছে মনে করে আমি তাদের মত একজন অনভিজ্ঞ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা পছন্দ করিনি। তাই এমন একজন নারীকে বিয়ে করেছি, যে তাদের চুল চিরুনী করে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনার করতে পারবে। নবী করীম বললেন, তুমি ঠিকই করেছ।[১১০]

---

১০৬. রাসুল (স.) প্রায়ই ফাতেমা (রা:) এর গৃহে যেতেন এবং তাঁর সার্বিক খোঁজ খবর রাখতেন। সফর হতে ফেরার সময় তিনি নিজের বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বেই ফাতেমা (রা:) এর বাড়িতে যেতেন। তিনি প্রায়ই ফাতেমা (রা:) ও তার পরিবারের অন্য সদস্যদের নিজের বাড়িতে ডেকে আনতেন একত্রে আহার করার জন্য। রাসুল (স.) নিজের কন্যার সন্তানদেরকেও খুব আদর করতেন। তাঁর জেষ্ঠ্য কন্যা যয়নব (রা:) এর কন্যা হযরত উমামা (রা:) কে প্রায়ই তার কোলে দেখা যেত। অনেক সময় রাসুল (স.) নামাযরত থাকা অবস্থায়ও ছোট উমামা (রা:) তাঁর কাঁধে চড়ে বসতেন। সিজদা দেওয়ার সময় রাসুল (স.) তাকে মেঝেতে বসিয়ে দিতেন এবং সিজদা হতে উঠলেই উমামা পুনরায় রাসুল (স.) এর কাঁধে চড়ে বসতেন। এতে রাসুল (স.) কখনও বিরক্তিবোধ করতেন না।

১০৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: রাসূল (সা:) এর নিকটতমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ৮ম খন্ড, পৃ: ৮০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: রাসূল (স.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা:) এর গুণাবলী, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৪১।

১০৮. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ইসলামের নবুয়তের চিহ্ন, ৭ম খন্ড, পৃ: ৪৪০। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নবীর (স.) কন্যা ফাতেমার ফযীলত, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৪৩।

১০৯. **মুসনাদ আহমদ**, ৩/১৪৭-১৪৮।

১১০. আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, **আল-মুসতাদরাক**, ২য় খন্ড, (বৈরুত; দারুল মা'রিফাত, তা. বি.), পৃ: ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একটি ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে হযরত হামযা (রাঃ) এর শাহাদাতের পর তিন ব্যক্তি তার মেয়ের অভিভাবকত্বের দাবীদার হলেন। হযরত আলী (রাঃ) দাবী করলেন যে, সে আমার চাচাতে বোন। সুতরাং তাকে প্রতিপালনের জন্য আমার দাবী অগ্রগণ্য। হযরত জাফর (রাঃ) দাবী করলেন যে, আমি আলী (রাঃ) এর চেয়ে তাকে লালন-পালনের জন্য অধিক হকদার। কেননা সে আমার চাচাতো বোন এবং আমার স্ত্রী তার খালা। অতএব এই দুটি কারণে তার লালন-পালনের দায়িত্বের সুযোগ আমার হওয়া উচিত। হযরত যায়েদ (রাঃ) দাবী করে বসলেন যে, আমি একজন আনসার আর হযরত হামযা (রাঃ) ছিলেন মুহাজির। সুতরাং আমার মুহাজির ভাইয়ের কন্যার প্রতি দায়িত্ব পালনের অধিকার আমার চেয়ে আর কার বেশী থাকতে পারে।[১১১]

পরিশেষে বলা যায়, নারী মা, বোন, স্ত্রী, ও কন্যা যেই হোক না কেন তার সাথে উত্তম আচরণ করা ও তার প্রাপ্য অধিকার সঠিকভাবে প্রদান করা, তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে তার বাস্তবায়ন করাই ইসলামের শিক্ষা।

---

[১১১]. আল্লামা শাওকানী, **নায়লুল আওতার**, ৭ম খন্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৩), পৃঃ ১৩৭; মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, **আল-মারআতু-বায়নাল ফিকহ ওয়াল কানূন**, অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, **ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃঃ ১০৩; সৈয়দ আমীর আলী, **দি স্পিরিট অব ইসলাম**, অনুঃ ড. রশীদুল আলম, (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৪), পৃঃ ৩১৬-৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক জীবনে নারী প্রগতি

নারী-পুরুষ যখন থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এখানে পুরুষ স্বামী হিসেবে আর নারী স্ত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবনকেই বলা হয় দাম্পত্য জীবন। পৃথিবীর প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) কে কেন্দ্র করে। এই প্রথম পরিবারের সদস্যদ্বয় স্বামী-স্ত্রীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছিলেন, "হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে একত্রে বসবাস কর এবং যেখান থেকে মন চায় তোমরা দুজনে অবাধে পানাহার কর।[১১২] বস্তুত মানব ইতিহাসের প্রথম পরিবার যেমন সর্বতোভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার ছিল, তেমনি তাতে ছিল পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এবং তার ফলে সেখানে বিরাজিত ছিল পরিপূর্ণ তৃপ্তি, শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ। সুতরাং সূচনাকালের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পারিবারিক জীবন পদ্ধতি ও ধারা মানব সমাজে অব্যাহত রয়েছে। আর এ ধারার অগ্রগতিতে নারী পুরুষ উভয়েই সমভাবে কৃতিত্বের দাবিদার। কিন্তু কোন কোন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা নারীর অবদানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে পরিবারে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে এবং পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রগতি লাভের অধিকার দান করা হয়েছে।

দাম্পত্য অধিকারের ক্ষেত্রে প্রগতি

দাম্পত্য জীবন বলতে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বুঝায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দাম্পত্য অধিকার সম্পূর্ণ স্বামীর হস্তগত। জাহিলী যুগে নারীর কোন দাম্পত্য জীবন ও অধিকার ছিল না। নারীরা সর্বদা পুরুষের সেবা দাসী হিসেবে নিবেদিত ছিল। পুরুষের উপর তার কোন অধিকারই ছিল না। কিন্তু রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পর নারী-পুরুষের দাম্পত্য অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা ঘোষিত হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "স্ত্রীদের উপর স্বামীদের যে রকম অধিকার আছে, স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের ঠিক অনুরূপ সমান অধিকার রয়েছে।[১১৩] আল্লাহ আরও বলেন, "(হে স্বামীরা জেনে রাখ যে), স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরাও তাদের ভূষণ।"[১১৪] এই আয়াত দুটিতে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, সকল ব্যাপারে ও বিষয়েই নারী পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। প্রত্যেকের উপরেই প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে এবং তা সমান সমান। অন্য কথায় স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান।

পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা প্রদান করেছে। জাহেলিয়া যুগে নারী নির্যাতনের অপকৌশল ছিল, স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর নারাজ হলে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাকে ফিরিয়ে আনত। ফিরিয়ে আনার পরই পুনরায় তালাক দিত। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরিয়ে আনত। আবার তালাক দিত এবং আবার ফিরিয়ে আনত। এমনি করে সারা জীবন ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে স্ত্রীকে কষ্ট দিত। নিজেও তাকে দাম্পত্য অধিকার হতে বঞ্চিত করত। আবার তালাক দিয়ে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। এমনই এক অমানবিক অত্যাচার থেকে ইসলামই নারীকে মুক্তি দান করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী রেখে দাও অথবা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে ভালভাবে মুক্ত করে দাও। তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং জুলুম করার উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। আর আল্লাহর নির্দেশাবলীকে তোমরা তামাশা ও হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না।"[১১৫]

---

[১১২]. আল কুর'আন, **সুরা আল আ'রাফ**, আয়াতঃ ১৯।
[১১৩]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২২৮।
[১১৪]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ১৮৭।
[১১৫]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলী যুগের নারী নির্যাতনের আর একটি কুপ্রথা হল, অনেক সময়েই স্বামীরা কারণে অকারণে স্ত্রীর কাছে গমন না করার শপথ করে বসত। কখনও এ শপথের সময় উল্লেখ করত আবার কখনও সময় উল্লেখ করত না। এমনি করে কখনও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বা কখনও সারাজীবনের জন্য স্ত্রীর কাছে যেত না। ইসলাম নারীকে এই অভিশপ্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা স্ত্রীদের কাছে গমন না করার জন্য কসম করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। এরপর তারা যদি মিলমিশ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি স্ত্রীকে একবারে পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্পই করে থাকে, তাহলে তালাক দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিবে। মহান আল্লাহ এসব শুনেন ও জানেন।"[১১৬]

রাসুলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পুর্বে আরব সমাজে নারী নির্যাতনের আরও দু'টি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। একটি হল এই যে, পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা বিমাতাকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ বলে মনে করত। তাকে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়ে আটকিয়ে রাখত এবং তার সম্পদ আত্মসাৎ করত। আর ছেলে না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরাও তার স্ত্রীর সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত। আর দ্বিতীয় প্রথাটি এই ছিল যে, স্বামী স্ত্রীকে মহর হিসেবে দেয়া সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাকে নানভাবে কষ্ট দিত। সে মহরের সম্পদ নিয়ে চলে যাবে এজন্য তাকে তালাকও দিত না। ইসলাম নারীকে এই উভয় প্রকারের অত্যাচার হতেই মুক্তি দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, জোর করে নারীদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তাদেরকে তোমরা মহর হিসেবে যা দিয়েছ, তার অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখে কষ্ট দিও না।"[১১৭]

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহ তা'য়ালা প্রমাণ করেছেন নারী ব্যতীত পুরুষ অপূর্ণাঙ্গ এবং অসম্পূর্ণ। তাই তিনি পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, একমাত্র ইসলামই নারীদেরকে দাম্পত্য অধিকার নিশ্চিত করে পরিবারে সুখে শান্তিতে বসবাস করা অধিকার প্রদান করেছে।

পারস্পরিক পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রগতি

পরিবারের যে কোন বিষয়ে একক সিদ্ধান্তের কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলাম কখনো পরিবারের বিবাদকে সমর্থন করেনা। তাই নর ও নারী উভয়ে উভয়ের সাথে যে কোন বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া আদর্শ পরিবারের জন্য অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এভাবে যে কোন কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে করা হলে সেখানে দাম্পত্য জীবনে কলহ বা বিবাদের পরিবর্তে সুখ ও শান্তি তথা ভালবাসা বিরাজ করতে থাকে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছে করে, তবে তাতে কোন দোষ হবেনা তাদের।"[১১৮] যে কোন বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলে পরিবারের স্বৈরাচারী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তির কারণে সাহাবীদের পক্ষে তওয়াফ করা সম্ভব হয়নি। এ সময় রাসূল (স.) তাদেরকে ঐ জায়গায় কুরবানী দেয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ দেখা গেলনা। রাসূল (স.) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) এর কাছে পরামর্শ নিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্রথমে কুরবানী দেয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করার পরামর্শ দিলেন। রাসূল (স.) সেই পরামর্শ মোতাবেক কাজ শুরু করলে সাহাবীগণ তাকে অনুসরণ করলেন এবং সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করলে পরিবারের

---

[১১৬]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২২৬-২২৭।
[১১৭]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১৯।
[১১৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণ সাধিত হয়। আবার স্ত্রীরও পরিবারের যে কোন কাজের ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা অপরিহার্য।[১১৯]

বিবাহের ক্ষেত্রে প্রগতি

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই বিবাহ করার অধিকার প্রদান করেছে। এবং সেই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের উপর। সন্তানের সুষ্ঠু লালন পালনের পাশাপাশি তাদের বিবাহ দিয়ে বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করে নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার দায়িত্বও পিতামাতার। তাই বিবাহযোগ্য নারী ও পুরুষের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতা বা তাদের অবর্তমানে অভিভাবকের জন্য খুবই জরুরী। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, "যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তার উচিত তার জন্যে ভাল নাম রাখা এবং তাকে ভাল আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া। আর যখন সে বালেগ বা পূর্ণ বয়স্ক ও বিয়ের যোগ্য হবে, তখন তাকে বিয়ে দেয়া কর্তব্য। কেননা বালেগ হওয়ার পরও যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, আর এ কারণে সে কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।"[১২০] তাই ইসলামে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে অবহেলা না করে তাদেরকে সঠিক সময়ে বিবাহ দেয়ার জন্যে পিতার প্রতি যথেষ্ট তাকীদ দেয়া হয়েছে।[১২১]

অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (স.) পিতামাতাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমাদের নিকট যদি এমন কোন বর বা কনের বিয়ে প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তাহলে তাঁর সাথে বিয়ে সম্পন্ন কর। যদি তা না কর, তাহলে জমিনে বড় বিপদ দেখা দেবে এবং সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।"[১২২]

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহে নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে বলে অভিভাবকের দায়িত্ব নারী পুরুষ উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা।

নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। এক্ষেত্রে বিবাহই একমাত্র বিধিবদ্ধ বৈধ ব্যবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ ব্যতীত নারী-পুরুষের মিলন একেবারেই নিষিদ্ধ। বিয়ে শুধু নারী পুরুষের যৌন চাহিদাই পুরণের উদ্দেশ্যেই নয় বরং পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিবার গঠন ও সন্তান জন্মদানও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এবং এই বিবাহের মাধ্যমেই নারী পুরুষ একে অপরের উপর দায়িত্বশীল হয় এবং একজনের উপর অপরজনের অধিকার আরোপিত হয়। তাই আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "এবং বিয়ে দাও তোমাদের এমন সব ছেলেমেয়েদের যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই। বিয়ে দাও তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য হয়েছে।"[১২৩]

---

[১১৯]. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, **ইসলামে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।
[১২০]. **বায়হাকী**।
[১২১]. মাওলানা আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮। কেননা সঠিক সময়ে বিবাহ না দিলে ছেলে বা মেয়ে যদি কোন পাপ কাজ করে তাহলে তার গুণাহের শাস্তি তার পিতাকে ভোগ করতে হবে। কেননা এই ব্যাপারটি তারই ত্রুটি ও অবহেলার দরুন হয়েছে। সুতরাং সন্তান বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সেই সঙ্গে বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরও কর্তব্য হচ্ছে এজন্যে নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা।
[১২২]. **তিরমিযী শরীফ**। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করে মাওলানা ইদরীস কান্দেলুভী বলেছেন, যারা দ্বীনদারী তোমরা পছন্দ কর, সে ছেলের বা মেয়ের সাথে যদি তোমরা বিয়ে সম্পন্ন না কর এবং তোমাদের দৃষ্টি উদগ্রীব হয়ে থাকে ধন-মাল ও সম্মান সম্ভ্রম সম্পন্ন কোন বর বা কনের সন্ধানে যেমন দুনিয়াদার লোকেরা করে থাকে-তাহলে বহুসংখ্যক মেয়ে স্বামীহীনা এবং বহু সংখ্যক পুরুষ স্ত্রীহীনা অবিবাহিত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। আর এরই ফলে জ্বেনা-ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে দেখা দেবে এবং সমাজে দেখা দেবে নানারূপ ফিত্না-ফ্যাসাদ ও বিপদ-বিপর্যয়। (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯)।
[১২৩]. আল কুর'আন, **সূরা আন নূর**, আয়াতঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) বলেছেন, "চারটি কাজ নবী গণের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য তা হচ্ছে সুগন্ধি ব্যবহার, বিয়ে করা, মিসওয়াক করা এবং খাতনা করানো।"[১২৪]

তিনি আরও বলেছেন, "হে যুবক যুবতীগণ! তোমাদের মধ্যে যারাই বিয়ের সামর্থ্যবান হবে। তাদেরই বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে তাদের চোখ বিনত রাখবে। তাদের যৌন অঙ্গ পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখবে। আর যাদের সে সামর্থ নেই। তাদের রোযা রাখা কর্তব্য। তাহলে এই রোযা তাদের যৌন উত্তেজনা দূর করবে।"[১২৫]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানব জীবনে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাহের উপকারীতা ও উপযোগীতা অনস্বীকার্য। বিবাহের উদ্দেশ্য ও উপকারীতা সম্পর্কে ড. ওয়েষ্টার মার্ক বলেন: "There are three essential elements is every normal marriage-the gratification of the sexual impulse, the relation between husband and wife apart from it and procreation of children." "প্রতিটি নিয়মিত বিবাহে তিনটি অত্যাবশ্যক মূল বস্তু নিহিত রয়েছে। যৌন বাসনার নিবৃত্তি তদুপরি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক এবং সন্তান উৎপাদন।"[১২৬] আর এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েরেই এই সকল উপকার লাভের অধিকার রয়েছে।

পাত্র নির্বাচনের অধিকার

ইসলাম নারীকে যেমন বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে তেমনি পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম, দ্বীনদারী, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।"[১২৭]

ইসলাম নারী-পুরুষের বাহ্যিক চাকচিক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে সচ্চরিত্রবান নারী-পুরুষকে বিবাহ করার তাগিদ প্রদান করেছে। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "অমুসলমান নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয়ই মুসলমান ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। আর একজন ঈমানদার ক্রীতদাসও একজন উচ্চবংশীয় অমুসলমান হতে উৎকৃষ্ট, যদিও তার রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-দৌলত তোমাদেরকে আকৃষ্ট করে।"[১২৮]

ইসলাম পুরুষদেরকে বাহ্যিক চাকচিক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে সচ্চরিত্র নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার তাগিদ প্রদান করেছে। রাসূল (স.) বলেছেন, "দুনিয়ার সবকিছুই উপকারী এবং তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল পূণ্যবতী স্ত্রী।"[১২৯] তিনি আরও বলেছেন, "কেবল সৌন্দর্য্য দেখেই নারীকে বিয়ে করো না। কেননা সৌন্দর্য্য তাদেরকে বিপথগামীও করে দিতে পারে। আর তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্যের জন্যও তাদেরকে বিয়ে করো না। কারণ ধনসম্পদ তাদেরকে অবাধ্য এবং বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। বরং দ্বীনদারী দেখে

---

১২৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, **জামে তিরমিযী**, বিবাহ অধ্যায়, ১ম খন্ড, (দেওবন্দ: রশিদিয়া কুতুবখানা), পৃঃ ২০৬।

১২৫. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, বিবাহ অধ্যায়; ইমাম বুখারী, **বুখারী শরীফ**, বিবাহ অধ্যায়।

১২৬. Dr. Westmark, **The future of Marriage in western civilization**.

১২৭. আল কুর'আন, **সূরা আন নূর**, আয়াত: ২৬।

১২৮. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াত: ২২১। পবিত্র কুরআনে স্বামী এবং স্ত্রী নির্বাচনে মুসলিম ঈমানদার নারী-পুরুষকে প্রধান্য দেয়ার কারণস্বরূপ উল্লেখিত হয়েছে, অমুসলমান পাত্র-পাত্রী নারী অগ্নির দিকে আহবান করে, মুক্তির দিকে পরিচালনা করে না। কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "কারণ তারা (অমুসরমানগণ) তোমাদেরকে অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করে। (আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াত: ২২১)। দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল বংশ মর্যাদা, রূপ-লাবণ্য ও ধন সম্পদের লোভে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন।

১২৯. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদেরকে বিয়ে কর। জেনে রাখ, দ্বীনদার হলে একজন অসুন্দর দাসী ও ধর্মহীনদের তুলনায় উৎকৃষ্ট।"[১৩০] ইসলামে পুরুষকে যেমন ঈমানদার নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে তেমনি নারীকেও স্বামী গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছে এবং স্বামী হিসেবে ঈমানদার পুরুষকে নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছে। যার দ্বীন ও চরিত্র পছন্দ হয়, এমন পাত্রের নিকট বিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (স.) বলেছেন, "যখন এমন পাত্রের জন্য তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমরা পছন্দ কর। তবে তার নিকট বিয়ে দাও। তোমরা যদি তা না কর, তবে দুনিয়াতে বড় ফিতনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে।"[১৩১]

সুতরাং ধন-সম্পদের স্বল্পতা সামাজিক অবস্থার অনুন্নতি, সৌন্দর্যহীনতা, নীচ বংশজাত দাসীর সন্তান– এরূপ ধারণা পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় না এনে বরং প্রস্তাবিত পাত্রের দ্বীন, চাল-চলন, কার্যকলাপ ও স্বভাব চরিত্র যাচাই বাছাই করে উত্তম ব্যক্তিকে পাত্র বা স্বামী হিসাবে নির্বাচন করার পরিপূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা ইসলাম নারীকে দান করেছে।

বিবাহে নারীর মতামত প্রদানের অধিকার

বিবাহ করার ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে তার পছন্দ মত পাত্রের সাথে বিবাহ করার অনুমতি ও অধিকার প্রদান করেছে। পুরুষের যেমন স্ত্রী বাছাই করার অধিকার রয়েছে তেমনি স্বামী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নারীরও পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত মতে, ছেলে বা মেয়ে পূর্ণ বয়স্ক বা বিবাহযোগ্য হলে তার মতামত অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবক কোন জোর জবরদস্তি করতে পারবে না। অভিভাবক শুধু অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ দিতে পারবে। বয়স্ক ছেলে মেয়ের বিবাহ তাদের স্পষ্ট মত ছাড়া সম্পন্ন হবে না। বরং একজন উপযুক্ত জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী রা পুরুষের পছন্দ বা অপছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।[১৩২]

বিয়ের ব্যাপারে বিবাহযোগ্য মেয়ের মতামতের গুরুত্ব যে কতখানি তা এক ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। হযরত খানসা বিনতে হাজাম আনসারী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা তাকে বিয়ে দেয়। তখন তিনি বিধবা। এ বিয়ে তিনি পছন্দ করেননি। তিনি রাসূল (স.) এর কাছে চলে আসেন (এবং এ বিয়ে তার পছন্দ নয় বলে জানান)। মহানবী (স.) সব শুনে তার এ বিয়ে প্রত্যাহার ও বাতিল করে দেন।[১৩৩]

হযরত জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী মেয়েকে বিয়ে দেন তার বিনা অনুমতিতে। পরে সে নবী করীম (স.) এর নিকট হাযির হয়ে অভিযোগ দায়ের করে। নবী করীম (স.) তাদের বিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেন।[১৩৪] হযরত ইবন আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন একটি কুমারী মেয়ে রাসূল (স.) এর কাছে আসল এবং বলল তার পিতা তাকে এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। যাকে সে পছন্দ

---

[১৩০]. ইবনে মাযাহ, **বায়হাকী**।

[১৩১]. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, **জামে তিরমিযী**।

[১৩২]. মুহাম্মদ জাওয়াদ মাগানিয়া, **আল আহওয়াল আল শাখছিয়া আলা আল মাহাতিব আল খোমছা**, (বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৬৪), পৃ: ২২-২৯; Mohammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, **Islamic Fatawa Regarding Women**, (Riyad: Darussalam Publisher's, 1996), p: 167.

[১৩৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, প্রতারণা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বিবাহ প্রতারণা, ১৫ খন্ড, পৃ: ৩৭৩; আবু দাউদ, **সুনান আবু দাউদ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক এই ঘটনাটিকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা হচ্ছে, একজন আনসারী খানসাকে বিয়ে করেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। অত:পর তাঁর বাবা তাঁকে অপর এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দেন। তখন তিনি রাসূলের (স.) দরবারে হাযির হয়ে বললেন, 'আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিয়েছেন অথচ আমার সন্তানের চাচাকেই আমি অধিক ভালবাসি। (এবং তাকে আমি বিয়ে করতে চাই) তখন নবী করীম (স.) তাঁর বিয়ে ভেঙ্গে দেন। (**সুনান নাসাঈ**, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৭)।

[১৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

করে না। এ কথা শুনে রাসূল (স.) সেই মেয়েকে বিয়ে বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন।[১৩৫]

অপর এক ঘটনায় জানা যায়, একটি প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে রাসূল (স.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, "আমার পিতা আমাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। সে নীচ শ্রেণীর লোক। আমাকে বিয়ে করে সে তার নীচতা দূর করতে চায়। এ অবস্থায় রাসূল (স.) তাকে বিয়ে বহাল রাখা না রাখার স্বাধীনতা দান করেন। তখন মেয়েটি বলল, আমার পিতা যে আত্মীয়তা করেছেন, আমি অবশ্যই তা কার্যকর করেছি। কিন্তু তবু এ অভিযোগ নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হল আমি চাই যে, আমি নারীদের জানিয়ে দেই যে, মেয়েদের (বিয়ের) ব্যাপারে পিতার জোর করে কিছু করার এখতিয়ার বা অধিকার নেই।"[১৩৬]

এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহযোগ্য বয়স্কা মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পিতা বা অভিভাবক কেউই জোরপূর্বক কোন মেয়েকে বিয়ে দিতে বা বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। কন্যার মর্জি ছাড়া জোর করে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণরূপে ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। রাসূল (স.) এই পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, "বিধবার বিবাহ তার সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত হতে পারে না এবং কুমারীর বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি কিরূপে জানা যাবে? তিনি বলেন, তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।[১৩৭]

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, "অলী বা অভিভাবক পূর্বে বিবাহিত ও অবিবাহিত ছেলে মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। অতএব পূর্ব বিবাহিত ছেলে মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের জন্য স্পষ্ট আদেশ পেতে হবে এবং অবিবাহিত বালেগ ছেলে মেয়ের কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি নিতে হবে।"[১৩৮]

সুতরাং বলা যায়, প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়ার অধিকার কোন অভিভাবকের নেই। বিয়ের ক্ষেত্রে নারী তার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে তার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারে। আর এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান।

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রগতি

পারিবারিক জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে রক্ষা করার জন্য ইসলামে তালাক[১৩৯] বা বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চরম ভাঙ্গন দেখা দেয়, পরস্পর

---

১৩৫. সুনান আবু দাউদ, **সুনান ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদ।**

১৩৬. **তাফসীরে আয়াতুল আহকাম লিল জাসসাস**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৪; **সুনান নাসাঈ**, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৭।

১৩৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৭১।

১৩৮. মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, **জামে তিরমিযী**, বিবাহ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৮; বদরুদ্দীন মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আল-আইনী, **ওমদাতুল ক্বারী**, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮; Saiyed Abul Ala Maududi, **Parda and The Status of Women in Islam**, Translated by Al- Ash'ari, (Delhi: Maktaba Islamia Publisher's, 2000), p: 197.

১৩৯. তালাক শব্দটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ "পায়ের বন্ধন খুলে দেওয়া। যেমন বলা হয়- আত লাকা'ল বা'ঈরা মিন ইকা'লিহি" অর্থাৎ "সে উটের পায়ের বন্ধন মুক্ত করে দিল।" তালাকা'ল মার 'আ' অর্থাৎ "সে স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধন হতে মুক্ত করে দিল।"(**ইসলামী বিশ্বকোষ**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, ১২শ খন্ড, পৃঃ ৩৫৩)।

শরীয়তের পরিভাষায় তালাক অর্থ- বিয়ের বন্ধন খুলে দেয়া। ইমামুল হারামাইন বলেছেন, এ শব্দটি ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে ব্যবহৃত পরিভাষা। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সুবুলুস সালাম**, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৬৭; আলামা ইজ্জুদ্দীন বালিক (রহঃ) **মিনহাজুস সালেহীন**, অনুবাদঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল, ই. ফা. বা., ১ম খন্ড, ২০০৪, পৃঃ ৪০৯)। ইসলামেও এক্ষেত্রে উক্ত শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। মিশরীয় পন্ডিত আল খাওলী বলেছেন, তালাক হলো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা। অথবা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একত্রিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের রশি ছিন্ন করা। (আল খাওলী, **আল মার'আতু বাইনাল বাইতি ওয়াল মুজতামা**, পৃঃ ৫৭)। ফিকহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে তালাক অর্থ-বিয়ের বাধনকে তুলে ফেলা, আর বাধন তুলে ফেলার

Dhaka University Institutional Repository

মিলে মিশে স্বামী স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্যমন্ডিত জীবন-যাপন একবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে, একজনের মন যখন অপর জন থেকে এমনভাবে বিমুখ হয়ে যায় যে, তাদের শুভ মিলনের আর কোন আশাই থাকে না। ঠিক তখনই এ চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১৪০] ইসলামী শরীআতে তালাক খুবই অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় কাজ। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহর কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হচ্ছে তালাক।"[১৪১]

ইসলামী আইন মানব স্বভাবের প্রবণতা এবং সামাজিক শৃংঙ্খলা ও অখন্ডতা রক্ষার মধ্যে এমন সঠিক ভারসাম্য স্থাপন করেছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন আইনেই পাওয়া যায় না। অন্যান্য ধর্মে স্বামী স্ত্রীর জন্য বৈবাহিক জীবন যত যন্ত্রণাদায়কই হোক না কেন কোন অবস্থাতেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।[১৪২] অপরদিকে ইসলামী আইনে এরূপ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু তা আবার পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশের মত সহজসাধ্য নয়।[১৪৩] ইসলাম তালাক দেয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি পরিহার করে তালাক দেয়ার সঠিক পন্থা বেঁধে দিয়েছে।[১৪৪]

অর্থ বিয়ের বাধ্যবাধকতা খতম করে দেয়া। (আল্লামা আলাউদ্দীন, **দররুল মোখতার**, ২য় খন্ড, দেওবন্দ: মকতবাতে ফয়জুল কুর'আন, তা.বি., পৃ: ৫৭০)।

[১৪০]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জিলহজ্জ-১৪১৯, মার্চ-২০০০ খ্রি:), পৃ: ৩৭১।

[১৪১]. **সুনান আবু দাউদ**, তালাক অধ্যায় ২/২৫৪; **সুনান ইবন মাজাহ**,তালাক অধ্যায়, হাদীস নং ২০১৮; সুনান কুবরা, বাইহাকী' ৭/৩৩২ সবগুলো বর্ণনাই ইবন' উমর (রা:) হতে বর্ণিত।

[১৪২]. **Encyelopeadia Britanica**, Vol-7, Ed, 1950. p: 453.

[১৪৩]. জাহেলী যুগে আরব সমাজে কেবল পুরুষদের জন্য এই অধিকার সংরক্ষিত ছিল যে সে যখন ইচ্ছা করত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। মহানবী (স.) এর আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতে আরবে এই প্রকার তালাকের রেওয়াজ সাধারণভাবে বিদ্যমান ছিল। এর এই অর্থ মনে করা হত যে, বিবাহের কারণে নারীর উপর পুরুষের যে অধিকার রয়েছে তা তৎক্ষনাৎ ও চুড়ান্তভাবে ত্যাগ করতে পারতো, (W. Robertson smith, **kinship & Marriage in Early Arabia**, 2nd En. p: 112; **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ১২তম খন্ড, ইফাবা, ১৯৯২, পৃ: ৩৫৩)।

[১৪৪]. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল দেখা দিলে একবারে তালাক প্রদান না করে ইসলাম তাদেরকে কতিপয় দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কারণ বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সারা জীবন একসাথে সংসার করা। এই দীর্ঘ সময়ে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই এক্ষেত্রে এই সামান্য বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে কৌশলে সমস্যার সমাধান করে নেয়াই সর্বাধিক উত্তম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "কোন স্ত্রী যদি নিজ স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে, তাদের উভয়ের কোন পাপ হবে না; আর মীমাংসা করে নেয়াই শ্রেয়।"(আল কুর'আন, **সূরা আন** নিসা, আয়াত: ১২৮)।

আর স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় তাহলে তা সংশোধনেরও পন্থা আছে। আবার স্ত্রী পূণ্যবতী হলেও তার মধ্যে কদাচিৎ অবাধ্যতা পরিলক্ষিত হতে পারে। তাই তাকে সংশোধন করার পথও আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলে দিয়েছেন, "সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয় এবং আল্লাহ যা সংরক্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন সে লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার সংরক্ষণ করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর, এরপর তাদের প্রহার কর। যদি তাতে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে আর তাদের বিরুদ্ধে কোন পন্থা অনুসন্ধান করো না।"(আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ৩৪)।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামে একদিকে স্বামী স্ত্রীতে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে, তেমনি অপরদিকে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোরও কার্যকর নিয়ম কানুন পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার যুলুম, অবিচার নির্যাতন ও সীমালংঘনের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। কোন কারণ বা কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেয়া কিংবা স্বামীর নিকট থেকে তালাক গ্রহণের কাজকেও ইসলামে সমর্থন করা হয়নি। স্ত্রী বা স্বামী কাউকেই বিনা কারণে কষ্ট দেয়া ইসলামে একেবারে নিষিদ্ধ।

তারপরও সকল প্রকার সীমা লংঘনকারী কাজ থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করা এবং সকল অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলামে তালাক দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধান না থাকলে ব্যক্তির উপর জুলুম করা হতো। অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারতো যে, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ চরিত্রহীন। এবং শত চেষ্টাতেও তা সংশোধিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তালাকের বিধান না থাকলে স্বামী বা স্ত্রী ঐ চরিত্রহীন ব্যক্তির সাথেই সংসার করতে বাধ্য হত। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সর্বদা ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। এরূপ অবস্থায় উভয়ের চূড়ান্ত বিচ্ছেদই তাদের নিকট কাম্য হয়ে থাকে। আইনসম্মতভাবে এ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা না থাকলে উভয়ের জীবন বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। (ড: মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, **ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ**, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০৪. পৃ: ৪৭-৪৮)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে তালাক দানের পদ্ধতি

দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায় তখনই ইসলাম তালাক দানের অনুমতি প্রদান করেছে। ইসলামে পুরুষকে তালাকের এখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে কতগুলো শর্তেরও অধীন করে দেয়া হয়েছে। পুরুষ তার নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করে স্বামীত্বের অধিকার অর্জন করে, এজন্য সে সমস্ত অধিকার থেকে অব্যাহতি নেয়ার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা স্পর্শ করার পূর্বে যদি তালাক দাও আর তার মোহরানা যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় (তালাক দিলে) তাকে অর্ধেক মোহরানা দিতে হবে। আর স্ত্রীলোক নিজেই যদি অনুগ্রহ দেখায় (মোহরানা গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সুত্রটি রয়েছে, সে যদি অনুগ্রহ করে (মোহরানা আদায় করে দেয়) তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। (আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২৩৭)। কুর'আন তালাকের আহকাম বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিটি স্থানে তালাকের ক্রিয়াকে স্বামীর দিকে নির্দেশ করেছে। এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তালাক দেয়ার ক্ষমতা কেবল স্বামীকে দেয়া হয়েছে। ইসলাম বিচ্ছেদ বা তালাক প্রদানের বিষয়টি পুরুষের ক্ষমতায় দিয়েছে, কারণ স্ত্রীর চেয়ে স্বামী পারিবারিক দায়িত্ব অধিক পালন করে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। এই ব্যতিক্রম অতীতে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। (মুহাম্মদ সায়্যিদ সায়্যিদ আস সাফতী, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭)।

তাছাড়া বিচ্ছেদ পরবর্তী অবস্থায় শরীয়াত নির্ধারিত কিছু অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্মকান্ড স্বামীর উপরই বর্তায়। যেমন মহরের বাকী অংশ প্রদান, ইদ্দত পালনরত অবস্থায় ভরণ-পোষণ দান, বস্ত্র জাতীয় বিশেষ উপহার, সন্তানকে স্তন্য দানের পারিশ্রমিক ও লালন-পালনের ব্যয়ভার একমাত্র স্বামীকেই বহন করতে হয়। এ ধরনের আরো অনেক রকম দায়িত্ব রয়েছে। (মূল মুহাম্মদ সায়্যিদ সায়্যিদ আস সাফাতী, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭)। তবে ইসলাম বিচ্ছেদ প্রদানের ব্যাপারে সুন্দর নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এবং তালাককে কতগুলো শর্তেরও অধীন করে দেয়া হয়েছে। সে এ শর্তের আয়ত্তাধীনে কেবল সর্বশেষ হাতিয়ার হিসাবে তার এ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। কুর'আন মজীদের শিক্ষা হচ্ছে স্ত্রী যদি তোমার অপছন্দনীয়ও হয় তবুও যথাসাধ্য তার সাথে সদ্ভাবে মিলেমিশে জীবন যাপন করার চেষ্টা কর। কিন্তু যদি মিলেমিশে নাই থাকতে পার তাহলে তোমার এ অধিকার আছে যে, তাকে তালাক দিতে পারবে। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬)। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের উত্তম পদ্ধতি হলো, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে দু' ঋতুর মধ্যবর্তী সুস্থাবস্থায় এক তালাক দিবে, যে মধ্যবর্তী অবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। আর স্ত্রী সেই স্বামীর বাড়ীতে আলাদাভাবে ইদ্দত পূরণ করবে। স্বামী চাইলে ইদ্দতকালীন অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে এবং সে স্ত্রী হিসাবে বহাল থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, "তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীরা হকদার।" (আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২২৮)।

ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক দানের অন্যতম উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, স্বামী বা স্ত্রীকে তিন 'তুহরে' তালাক দিবে, কোন পুরুষেরই একসাথে তিন তালাক দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অনুচিত। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে এক এক মাসের ব্যবধানে এক এক তালাক দেওয়া উত্তম। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ চিন্তা ভাবনার সুযোগ পাওয়া যাবে হয়ত কলহ বিবাদের সমঝোতার কোন উপায় বেরিয়ে আসবে অথবা স্ত্রীর আচরণের মধ্যে পছন্দনীয় কোন পরিবর্তন এসে যেতে পারে কিংবা স্বয়ং স্বামীর অন্তরও পাল্টে যেতে পারে। এ সময়কাল এবং আল্লাহর দেয়া এই বিধান সমগ্র মানব জাতির দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখারই একটি সুযোগ হিসেবে রাখা হয়েছে। (সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭)। অবশ্য এ সময় সুযোগের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝাপড়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে যদি ত্যাগ করাই স্বামীর সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তৃতীয় মাসে শেষ তালাক দিতে হবে অথবা পুনঃগ্রহণ (রুজু) না করে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দেবে। সর্বোত্তম পন্থা এই যে, তৃতীয়বার তালাক না দিয়ে এমনিতেই ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হতে দেয়া। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছানুযায়ী তাদের মধ্যে পুনর্বার বিয়ে হওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে তা মুগাল্লাযা বা চূড়ান্ত তালাকে পরিণত হয়। এরপর তাহলীল ব্যতীত প্রাক্তন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোক এই মাসয়ালা অনুসরণ না করে যখন তালাক দিতে উদ্যত হয় একত্রে তিন তালাক দেয় এবং পরে অনুতপ্ত হয়। (সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬)।

তালাক প্রদানের উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "তালাক হচ্ছে দুই বার অতঃপর হয় উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে রাখতে হবে অথবা ভালভাবে সকল কল্যাণ সহকারে বিদায় দেয়া হবে।" (আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২২৯)। আল্লাহ আরও বলেন, "যেসব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজদেরকে বিরত রাখবে। তাদেরকে স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হয় তাহলে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে।" (আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২২৮)। এই সময়কালে আল্লাহপাক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিন মাসের এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিও না বরং নিজের কাছেই রাখ। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও। তাদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের সুযোগ রেখেই তালাক দাও। ইদ্দতের সময় গুণতে থাক এবং তারাও বের হয়ে যাবে না। তবে কেবল তখনই তা করতে পার যখন তারা প্রকাশ্যে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হয় এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে নিজের ওপর অত্যাচার করে তুমি জান না। হয়তবা এরপর আল্লাহর সমঝোতার কোন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। অতঃপর যখন তারা ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময়ের সমাপ্তিতে পৌঁছবে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে ফিরিয়ে রাখ অথবা উত্তম পন্থায় তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।"(আল কুর'আন, **সুরা আত তালাক**, আয়াতঃ ১)।

জাহেলিয়া যুগে একমাত্র স্বামীই বিবাহ-বিচ্ছেদের একচ্ছত্র অধিকারী ছিল। এতে স্ত্রীর কোন অধিকারই ছিল না। ইসলাম সর্ব প্রথম স্ত্রীকে এই অধিকার দিয়েছে। দাম্পত্য জীবন সুখময় ও শান্তিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই কিছু বিধি নিষেধ জারী করেছে। আল কুর'আনে তাদেরকে এই বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য নির্দেশও দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনের পরিভাষায় এই বিধি নিষেধ গুলোকে 'আল্লাহর সীমারেখা' বলা হয়েছে, কিন্তু কোন স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তাদের পক্ষে সেই সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করা সম্ভব নয়, তাহলে স্বামী যেরূপ তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, স্ত্রীও তেমনি খুলা'র মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে।

তালাক হচ্ছে স্বামীর পক্ষ হতে সংঘটিত বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর খুল'আ হয়ে থাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। সুতরাং তালাকের সময় স্বামী মহর হিসেবে স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পূর্ণ অর্থ এবং ইদ্দত কালের যাবতীয় খোরাক, পোশাক ও বাসস্থানের খরচ বহন করতে বাধ্য। আর খুল'আর সময় স্ত্রীকে মহরের দাবী প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং স্বামীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা স্ত্রীদেরকে যা কিছু দিয়েছ তা থেকে সামান্য কিছুও ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী স্ত্রী যদি আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে না পারার আশংকা করে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। আর তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু দিয়ে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত হতে চায়, তাতে কোন দোষ নেই।"[১৪৫]

নবী করীম (স.) এর সময়ের খোলা'র দৃষ্টান্তসমূহ

খোলার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা হচ্ছে সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ) এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছ থেকে খোলা আদায় করেছিলেন। এ মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের বিভিন্ন অংশ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে।

এছাড়া মাসিক (ঋতু) বা হায়েয চলাকালীন অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আদেশ করা হয়েছে, যদি তালাক দিতেই হয় তাহলে তুহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দাও। কারণ-**এক.** এ সময় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যে, তাদের থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কথাবার্তা প্রকাশ পায়। যা তারা নিজেরা ও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করা পছন্দ করে না। এ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নিগূঢ় তত্ত্ব। **দুই.** এ সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকে না, যা তাদের পারস্পরিক চিত্তাকর্ষণ ও প্রেম ভালবাসার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সময় উভয়ের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এ সব কারণে নবী (স.) হায়েয অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করেছেন।

এই পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে তালাক প্রদান ইসলামী বিধানের সৌজন্যতার পরিপন্থি। ইসলামী বিধান মেনে তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে যদি তিন তালাক দেয়ার পূর্বে বা ইদ্দত চলাকালীন সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা না হয় তাহলে এই তালাক আপনা আপনি বায়েন তালাক হয়ে যাবে। শী'আ সম্প্রদায়ের তালাকের নিয়ম-কানুন সুন্নীগণের অনুরূপ কেবল আনুষঙ্গিক ও অপ্রধান বিষয়ে মতভেদ আছে, কুর'আন মজীদের সূরা আত তালাক এর দুই নং আয়াতের বিধানের কিছুটা কঠোরতা ব্যাখা প্রদান পূর্বক তাদের মতে দুইজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখার নির্দেশ রয়েছে এবং ইহা আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী মোস্তাহাব, অবশ্য শাফেঈগণের সম্পর্কে রজাআতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার অপরিহার্যতা বর্ণিত আছে। (**ইসলামী বিশ্বকোষ,** ই.ফা.বা. ১৯৯২, ১৬শ খন্ড, পৃঃ ৩৬২)।

তবে একবারে তিন তালাক অথবা নারীর ঋতুকালীন তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে রাসূল (স.) তাঁর জীবদ্দশায় সতর্ক করে দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় তালাক প্রদান করলে হযরত উমর (রাঃ) রাসূল (স.) কে তা জানালেন। রাসূল (স.) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, তোমার ছেলে আবদুল্লাহকে ডেকে বলে দাও যে, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। স্ত্রী বাড়িতে অবস্থান করে আবার সময়মতো ঋতুবতী হয়ে যখন পবিত্র হবে সে সময় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে না তালাক দিবে। তালাকের সিদ্ধান্ত হলে ঋতু হলে পবিত্র হবার পর স্ত্রীর সাথে আর মিলিত হতে পারবে না। আর ঋতুর এই কাল যাপন হল ইদ্দত যা তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে তা পালন করতে হবে। (**সহীহুল বুখারী,** তাফসীর অধ্যায়; তালাক প্রথম পরিচ্ছেদ; ৮/৬৩৫); **সহীহ মুসলিম,** তালাক অধ্যায় ২/হাদীস নং- ১০৯৩-১০৯৪; **সুনান আবু দাউদ,** তালাক অধ্যায়; ২/২৫৫; **সুনান নাসাঈ,** তালাক অধ্যায়; **সুনান বিন মাজাহ,** তালাক অধ্যায়ঃ ১/৬৫১; **মুসনাদ আহমদ,** ২/৬; সবগুলো বর্ণনাই ইবন 'উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত)। কারণ তালাক দেয়ার পর যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে পুনরায় অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে এবং নতুন মোহর ধার্য করতে হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে গ্রহণ করতেও পারে, আর ইচ্ছা না হলে সে অপর কোন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

[১৪৫]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা,** আয়াতঃ ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

অংশগুলোকে একত্র করে দেখা যায়, সাবিত (রাঃ) থেকে তার দুইজন স্ত্রী খোলা অর্জন করেছিলেন। একজন স্ত্রী হচ্ছেন জামীলা বিনতে উবাই ইবনে সলুল (আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বোন)। তার ঘটনা এই যে, সাবিতের চেহারা তার পছন্দনীয় ছিল না।[১৪৬] তিনি খোলার জন্য নবী করীম (স.) এর কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন এবং নিম্নোক্ত ভাষায় নিজের অভিযোগ পেশ করলেন:

হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাথা ও তার মাথাকে কোন বস্তু কখনও একত্র করতে পারবে না। আমি ঘোমটা তুলে তাকাতেই দেখলাম সে কতগুলো লোকের সাথে সামনের দিক থেকে আসছে। কিন্তু আমি তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশী কালো, সবচেয়ে বেঁটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারার দেখতে পেলাম।[১৪৭] আল্লাহর শপথ! আমি তার দ্বীনদারী ও নৈতিকতার কোন ক্রটির কারণে তাকে অপছন্দ করছিনা। বরং তার কুৎসিত চেহারাই আমার কাছে অপছন্দনীয়।[১৪৮] আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় না থাকত তাহলে যখন সে আমার কাছে আসে, আমি তার মুখে থুথু দিতাম।[১৪৯] হে আল্লাহর রসূল ! আমি কিরূপ সুন্দরী ও সুশ্রীতা আপনি দেখেছেন, আর সাবিত হচ্ছে এক কুৎসিত ব্যক্তি।[১৫০]

বুখারীর গ্রন্থকার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, সাবেত (রাঃ) এর স্ত্রী বললেন, হে রসূলুলাহ! (স.) আমি তার দ্বীনদারী ও নৈতিকতার উপর কোন অভিযোগ করছি না, কিন্তু ইসলামে আমার কুফরের ভয় হচ্ছে।[১৫১] নবী করীম (স.) তার অভিযোগ শুনলেন অত:পর বললেন, সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তা ফেরত দেবে? তখন উত্তরে সাবেতের স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা ফেরত দিতে রাজি আছি। তখন তিনি সাবিতকে নির্দেশ দিলেন, তোমার বাগান গ্রহণ কর এবং তাকে তালাক দিয়ে দাও।[১৫২]

হযরত সাবিত (রাঃ) এর আর একজন স্ত্রী ছিলেন হাবীবা বিনতে সাহল আল আনসারিয়াহ (রাঃ)। তার ঘটনা ইমাম মালিক ও ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন, একদিন খুব ভোরে রসূল (স.) ঘর থেকে বের হয়েই হাবীবা (রাঃ) কে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? তিনি বললেন, "আমার ও সাবিত ইবনে কায়েসের মধ্যে মিলমিশ হবে না।" যখন সাবিত (রাঃ) উপস্থিত হলেন নবী (স.) বললেন, দেখ, এ হচ্ছে হাবীবা বিনতে সাহল। এরপর সাবিত (রাঃ) যা কিছু বলার তাই বললেন। হাবীবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সাবিত আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তা সবই আমার কাছে আছে। নবী (স.) সাবিত (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন, "এসব কিছু তুমি নিয়ে নাও এবং তাকে বিদায় করে দাও।"[১৫৩]

আবু দাউদ ও ইবনে জরীর হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত সাবিত (রাঃ) হাবীবাকে এমন মার দিয়েছিলেন যে, তার হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। হাবীবা (রাঃ) নবী করীম (স.) এর কাছে এসে অভিযোগ করলে তিনি সাবিত (রাঃ) কে আদেশ দিলেন, "তার সম্পদের কিছু অংশ নিয়ে নাও এবং তাকে পৃথক করে দাও।"[১৫৪] কিন্তু ইবনে মাজাহ হাবীবা (রাঃ) এর প্রসঙ্গে যে সব শব্দে বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায়, সাবিত (রাঃ) এর বিরুদ্ধে হাবীবা (রাঃ) এর যে অভিযোগ ছিল, তা মারধরের নয়, বরং তার কুৎসিত আকৃতির।[১৫৫]

---

১৪৬. M.Mazheruddin Siddiqi, **Women in Islam**, Ibid, p: 66.

১৪৭. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী, **জামেউল বয়ান ফী তাফসীরুল কুর'আন**, ২য় খন্ড, (দারুল মা'রেফা, ২য় সং ১৯৭৮), পৃ: ২৮০।

১৪৮. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮১।

১৪৯. ইবনে জরীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮২।

১৫০. আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী, **ফতহুল বারী**, ৯ম খন্ড, (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফা, লেবনন, তা. বি), পৃঃ ৩৯৫।

১৫১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৯৪।

১৫২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৯৪।

১৫৩. সুনানে আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খোলা অধ্যায়, পৃ: ৩০৩; M. Mazheruddin Siddiqi, **Women in Islam**, Ibid, p: 66.

১৫৪. **সুনানে আবু দাউদ**, প্রাগুক্ত, খোলা অধ্যায়, পৃ: ৩০৩; আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮০।

১৫৫. **সুনানে ইবনে মাজাহ**, এর বরাত দিয়ে 'হুকুকুঝ ঝাউযাইনি', প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রাঃ) এর সামনে এক মহিলা ও এক পুরুষের মোকদ্দমা পেশ করা হল। তিনি স্ত্রী লোকটিকে উপদেশ দিলেন এবং স্বামীর সাথে বসবাস করার পরামর্শ দিলেন। স্ত্রীলোকটি তার পরামর্শ গ্রহণ করেনি। এতে তিনি একটি ময়লা আবর্জনাপূর্ণ কুঠুরিতে তাকে আবদ্ধ করে দিলেন। তিন দিন বন্দী করে রাখার পর তিনি তাকে বের করে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তোমার কি অবস্থা?" সে বলল, "আল্লাহর শপথ! এ রাত কয়টি আমার কিছুটা শান্তি হয়েছে।" একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন, "তোমার জন্য দুঃখ হয়, কানের বালির মত সামান্য অলংকারের বিনিময়ে হলেও একে 'খোলা' দিয়ে দাও।"[১৫৬]

'রুবাই' বিনতে মুআত্তবিব ইবনে আকরা (রাঃ.) তার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে খোলা করে নিতে চাইলেন। কিন্তু স্বামী তা মানল না। হযরত উসমান (রাঃ) এর দরবারে মোকদ্দমা পেশ করা হল। তিনি স্বামীকে নির্দেশ দিলেন, তার চুল বাঁধার ফিতাটা পর্যন্ত নিয়ে নাও এবং তাকে 'খোলা' দিয়ে দাও।[১৫৭]

হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী খোলার পরিণতি হচ্ছে এক তালাকে বায়েন। অর্থাৎ খোলার হুকুম কার্যকর হওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন তাকে পুনঃগ্রহণের অধিকার স্বামীর থাকবে না।[১৫৮] তবে যদি স্ত্রী লোকটি স্বেচ্ছায় তার কাছে পুনরায় বিবাহ বসতে চায় তবে তা সে করতে পারে।[১৫৯]

খোলার বিনিময় নির্ধারণে আল্লাহ তা'য়ালা কোন শর্ত আরোপ করেননি। যে কোন পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রী সম্মত হবে, তার ওপরেই খোলা কার্যকর হতে পারে।[১৬০] মুজতাহিদ ইমামগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর যুলুম-নির্যাতনের কারণে খোলার দাবি করে তাহলে বিনিময় গ্রহণ করা মূলত স্বামীর জন্য মাকরূহ।[১৬১]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনবোধে স্ত্রী খোলার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার রাখে। এবং এক্ষেত্রে তার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যেমন, **প্রথমতঃ** বিবাহের চুক্তিপত্রে যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। **দ্বিতীয়তঃ** খোলার মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারেন। **তৃতীয়তঃ** স্ত্রী আদালতের সহায়তাও স্বামীকে তালাক দিতে পারে।[১৬২]

নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার

জাহেলী যুগে তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের স্বাধীনভাবে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার কোন অধিকার ছিল না। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মেয়েরা মানবেতর জীবনযাপন করত। ইসলামই তাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করেন। বৈধব্য বা তালাক অথবা খুল'আর কারণে যে মেয়েরা স্বামীহীনা হয়ে পড়ে, তাদেরকে পুনরায় বিয়ে দেয়ার তাগিদ প্রদান করে আল্লাহ বলেন, "তোমরা বিধবা এবং তালাক ও খুল'আ প্রাপ্তা মেয়েদেরকে

---

[১৫৬]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
[১৫৭]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
[১৫৮]. খোলার হুকুম কার্যকর হওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন তাকে পুনঃগ্রহণের অধিকার স্বামীর থাকবে না। কেননা পুনঃগ্রহণের অধিকার অবশিষ্ট থাকলে খোলার উদ্দেশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া স্ত্রী যে অর্থ তাকে দিয়েছে তা বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যই দিয়েছে। স্বামী যদি তা গ্রহণ করে তাকে রেহাই না দেয় তাহলে এটা হবে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। শরী'আত কিছুতেই এটা জায়েয রাখে না। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬০)।
[১৫৯]. ইদ্দতকালীন সময় স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। কারণ এটা মুগাল্লাযা তালাক নয়। এ ধরনের তালাকের পর বিয়ের জন্য তাহলীল শর্ত।
[১৬০]. কিন্তু খোলার বিনিময়ে স্বামীর দেয়া মহরের চেয়ে বেশি অর্থ গ্রহণ করতে নবী (স.) অপছন্দ করেছেন। রাসূল (স.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যে পরিমাণ মোহর দিয়েছে খোলার সময় সে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে না।" (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১)।
[১৬১]. হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে যুলুম নির্যাতন হয়ে থাকলে খোলার সময় স্ত্রীর কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা তার জন্য মাকরূহ। হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে একমত। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬১)।
[১৬২]. **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন**, তৃতীয় ভাগ, ই. ফা. বা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে দিয়ে দাও।"[১৬৩] নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার ঘোষণা করে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার কাজ সম্পন্ন কর এবং তারাও (নারীরা) তাদের নির্দিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়িও না। যখন তারা সঠিকভাবে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয়েছে।"[১৬৪]

তবে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দত পালন করতে হবে।[১৬৫] মহান আল্লাহ আরও বলেন, "বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে শরীয়ত মোতাবেক ও প্রচলিত রীতি অনুসারে যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, সেক্ষেত্রে তোমাদের পুরুষদের কোন দায়িত্ব নেই বা কোন কিছু করণীয় নেই।"[১৬৬] এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তাদের জন্য নির্ধারিত ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ে করতে পারবে। এ ব্যাপারে ইসলামে কোন বাধা নেই। সুতরাং নারীদের যে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার আছে তা আল কুর'আনের আয়াত দ্বারাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

---

[১৬৩]. আল কুর'আন, **সুরা আন নুর**, আয়াতঃ ৩২।

[১৬৪]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২৩২।

[১৬৫]. বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার কতদিন পর তাদের বিবাহ দিতে হবে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, সেই বিধবা মহিলারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত বিবাহ করা হতে বিরত থাকবে।"(আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২৩৪)। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন হায়েয কাল পর্যন্ত বিবাহ করা হতে বিরত থাকবে।"(আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২২৮)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা দরিয়াবাদী (রহ.) বলেন, স্ত্রীর জন্য এ নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা বিধানে অনেক হিকমত, রহস্য ও স্বার্থ- কুশলতা নিহিত রয়েছে। একদিকে স্বামী ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার পূর্ণ অবকাশ পেয়ে যায়। অন্যদিকে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। (মাওলানা আবদুর মাজেদ দরিয়াবাদী, **তাফসীরে মাজেদী**, অনুবাদঃ মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃঃ ৪৪৪)। আর বেশী বয়স্কা, অল্প বয়স্কা এবং গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "বয়স বেশী হওয়ার কারণে যে মহিলাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সন্দেহ নিরসনের জন্য তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর অল্প বয়সের দরুন যে মেয়েদের হায়েয শুরুই হয়নি, তাদেরও ইদ্দত তিন মাস। আর গর্ভবতী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।"(আল কুর'আন, **সুরা আত তালাক**, আয়াতঃ ৪)। এই আয়াতের ব্যাখায় ইমাম তাবারী বলেন, যে মহিলার মাসিক হয় না, তার ইদ্দত তিন মাস; আর গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত তার গর্ভের সন্তান প্রসব করার পর্যন্ত। (ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্ তাবারী, **তাফসীরুত্ তাবারী, জামিউল বয়ান ফী তাবীলিল কুরআন**, ১২শ খন্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা.বি., পৃঃ ১৩৪-১৩৫।)

[১৬৬]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি

রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে সামাজিকভাবে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। শুধু অস্তিত্ব, মর্যাদা, অধিকারই নয় বরং সামাজিক জীব হিসেবে নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা যে অধিকার, সম্মান, মর্যাদা ও প্রগতি লাভ করেছে তা নিম্নরূপঃ

জন্মগত সমতাভিত্তিক প্রগতি

জন্মগত কারণে ইসলামে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদার আধিক্য প্রদান করা হয়নি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে পুত্র ও কন্যা উভয়েই সমান। এবং সন্তান পুত্র হবে না কন্যা হবে তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। এক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নেই। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দিয়ে থাকেন। অথবা দান করেন পুত্র সন্তান উভয়েই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি বন্ধা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[১৬৭]

মহান আল্লাহ রাব্বুলের নিকট নারী ও পুরুষ সমান বলেই তিনি পৃথিবীতে নারী-পুরুষ উভয়কেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অনেক পুরুষকে যেমন অনেক নারীর চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তেমনি অনেক নারীকেও অনেক পুরুষের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "হে মরিয়াম! আল্লাহ তোমাকে উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করেছেন ও পবিত্রতা দান করেছেন।"[১৬৮] সুতরাং সন্তান হিসেবে আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কে জন্মগতভাবে সমতা দান করেছেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[১৬৯]

রাসূল (স.) বলেন, "সকল মানুষই চিরুনীর শলাকার ন্যায় সমান। আরবের অনারবের উপর, সাদার কালোর উপর, পুরুষের নারীর উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্য তাঁর নিকট অধিক মর্যাদা রয়েছে।"[১৭০] সুতরাং সম্মান ও মর্যাদার বিচারে সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষের মাঝে ইসলামে তেমন কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ জাহেলী ধ্যান-ধারণা,[১৭১] এরূপ চিন্তাভাবনা ইসলাম স্বীকার করে না।[১৭২] আল কুর'আনে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, জলে ও স্থলে তাদেরকে

---

[১৬৭]. আল কুর'আন, **সূরা আশ শুরা,** আয়াতঃ ৪৯-৫০।
[১৬৮]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান,** আয়াতঃ ৪২।
[১৬৯]. আল কুর'আন, **সূরা আল হুজরাত,** আয়াতঃ ১৩।
[১৭০]. **মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল,** ষষ্ঠ খন্ড, (কায়রো, ১৯৩০), পৃঃ ৪১১; **মুসনাদে দারিমী।**
[১৭১]. জাহেলী যুগে নারী সম্পর্ক ধ্যান ধারণা ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তারা নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করতো। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা ছিল একটি অভিশাপ ও অপমানকর বিষয় তাই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিতো। (মোল্লা' মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তফা,** দিল্লীঃ মাকতাবা উমসানিয়ো, ১৯৫৭ খ্রীঃ), পৃঃ ৭৬।
[১৭২]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী,** (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃঃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং বহুসংখ্যক সৃষ্টির উপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি।"[১৭৩] সুতরাং এই সম্মান হযরত আদম আলাইহিস সালাম[১৭৪] ও তাঁর সন্তান নারী-পুরুষ সবার জন্য। সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড নারী বা পুরুষ নয়। বরং ইসলাম ঈমান ও সৎকর্মকে নারী পুরুষের মর্যাদার মানদন্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে প্রগতি

জাহেলিয়া যুগে আরবদের সামাজিক জীবন পাপাচার, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার অনুষ্ঠান ও নিন্দনীয় কার্যকলাপে কলুষিত ও অভিশপ্ত ছিল। আরববাসীরা মদ, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকা ছাড়াও মুর্খতা, বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় নিমজ্জিত ছিল। রাসূল (স.) এর আবির্বাবের পূর্বে আরব ভূখন্ডে নারীদের মানবাধিকার ছিল না, ছিল না স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। তৎকালীন সমাজের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য সামাজিক প্রথা ছিল শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবগণ কন্যা সন্তানের জন্মকে অভিশাপ ও লজ্জাজনক মনে করে তাদেরকে হত্যা করত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "তাদের কেউ যখন মেয়ে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার খবর শুনতে পায়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায়। প্রাপ্ত খবরের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় সে জনগণের কাছ থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় আর ভাবে, অপমান সত্ত্বেও ঐ সন্তানকে কি সে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে? জেনে রাখ, তাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"[১৭৫] এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামই এই অবহেলিত, লাঞ্ছিত নারী জাতিকে বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান করেছে। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল?"[১৭৬]

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "যারা নিজেদের সন্তানকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হত্যা করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[১৭৭] আল্লাহ বলেন, "তোমরা দারিদ্র্যের কারণে সন্তানদেরকে হত্যা কর না, তোমাদের এবং তাদের রিযিক তো আমিই দিয়ে থাকি।"[১৭৮]

রাসূল (স.) ঘোষণা করলেন, "যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, সে তাকে জ্যান্ত কবর দেয় না, তার সাথে লাঞ্চনাকর আচরণ করে না এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দেয় না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১৭৯] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন পালন করেছে, তাদেরকে উত্তম আচরণ শিখিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে জান্নাত লাভ করবে।[১৮০]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেন, "আল্লাহ যদি কাউকে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে কোন রকম পরীক্ষায় ফেলে থাকেন আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে তাহলে ঐ সব কন্যা সন্তান তার জন্য দোযখের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।"[১৮১]

---

[১৭৩]. আল কুর'আন, **সূরা বনী ইসরাঈল**, আয়াতঃ ৭০।

[১৭৪]. হযরত আদম (আঃ) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। জান্নাতই ছিল তার বসবাস। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে আগমনকারী আল্লাহর প্রথম খলীফা বা প্রতিনিধি। (ইবনে কাসীর, **আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা**, ১ম খন্ড, কায়রোঃ ঈমান বাবিল হলবী, ১৯৬৪ খ্রিঃ, পৃঃ ১০)।

[১৭৫]. আল কুর'আন, **সূরা আন নাহল**, আয়াতঃ ৫৯।

[১৭৬]. আল কুর'আন, **সূরা আত-তাকবীর**, আয়াতঃ ৯।

[১৭৭]. আল কুর'আন, **সূরা আল আন'আম**, আয়াতঃ ১৪০।

[১৭৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল আন'আম**, আয়াতঃ ১৫১।

[১৭৯]. **আবু দাউদ**, ৪র্থ খন্ড, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.) পৃঃ ৩৩৭; মুহাম্মদ ইবনে আবি শায়বা, **মুসান্নাফ**, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২১।

[১৮০]. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

[১৮১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদঃ রাহমাতুল ওয়ালাদ ওয়া তাকাবিলুস্, ওয়া মুয়ানাকাতুহু; **সহীহ মুসলিম**, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলাতি বাবু ফাদলুল ইহসান ইলাল বানত।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) আরও বলেছেন, আমি কি তোমাকে সবচেয়ে উত্তম সাদকার কথা বলবো না? তোমার সেই কন্যা যে বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে, আর তুমি ছাড়া তার উপার্জনকারী আর কেউ নেই।"[১৮২]

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করে বড় করল সে এবং আমি এ ভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী (স.) তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে একথা বললেন। তিনি আরো বললেন, দুটি পথ এমন আছে যা দিয়ে দুনিয়াতেই অতি দ্রুত আযাব আসে। তাহলো জুলুম ও সীমালংঘন এবং অবাধ্যতা।"[১৮৩]

সমস্ত পৃথিবী যখন নারী জাতিকে অপরাধের উৎস ও সাক্ষাৎ পাপ মনে করে তাদেরকে হত্যা করছিল এবং গোটা সমাজ কলুষতায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তখন সমাজের মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) আবির্ভূত হন এবং সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেছেন, দুনিয়ার বস্তু নিশ্চয়ের মধ্যে আমি ভালবাসি নারী এবং সুগন্ধি আর আমার চক্ষু শীতলকারী হল নামায।"[১৮৪] রাসূল (স.) তার প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (স.) সম্পর্কে বলেছেন, আমার মেয়ে আমারই রক্ত মাংস। যা তার সন্দেহ সংশয় ও অশান্তির কারণ হয় তা আমার ও সন্দেহ সংশয় ও অশান্তির কারণ হয়। আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।"[১৮৫]

পৃথিবীর সাধারণ আইনে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে তার নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আইনে মাতৃ উদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর হতেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[১৮৬] এ কারণে মহানবী (স.) গমেদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ প্রদান করেননি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবর্তী ব্যক্ত করেছিল। অত:পর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর তার মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রাণনাশের আশংকা ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলাম প্রাণ রক্ষার্থে ব্যভিচারের মত গুরুতর অপরাধের শাস্তি প্রয়োগে বিলম্ব করেছে।

ইসলামের এই সমস্ত শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও কর্মে এমন একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল যে, যারা একসময় নিস্পাপ কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করত না এবং এই নিষ্ঠুর আচরণ করতে গিয়ে যাদের ললাটে এক বিন্দু ঘাম পর্যন্ত দেখা দিত না সেই সমস্ত লোকেরাই ঐসব শিশুর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিজেদের জীবনের পুঁজি মনে করেছিল। নিজের শিশু সন্তান যাদের কোলে নিরাপত্তা পেত না তারাই অন্যের সন্তানের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গিয়েছিল।[১৮৭] তাই একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় একমাত্র ইসলামই নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে।[১৮৮]

---

[১৮২]. ইবনে মাযাহ, **সুনান**, ২য় খন্ড, কিতাবুল আদব, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২০৯-১০।
[১৮৩]. **মুসতাদরিক হাকেম**, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১৭৭।
[১৮৪]. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোবাইব ইবনে আলী, **সুনানে নাসায়ী**, কিতাবু ইশরাতিন নিসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হুববুন নিসা, ২য় খন্ড, (দেওবন্দ: দারুল কিতাব, তা. বি.), পৃ: ৭৭।
[১৮৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল মানাকিব, মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু মিন ফাযায়েলে ফাতেমা।
[১৮৬]. তাই ইসলামী আইন বিশারদগণ গর্ভে সন্তান ধারণের ১২০ দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করেছেন। কেননা এই সময়সীমায় গর্ভ সঞ্চার (Fetus) গোশত পিন্ডে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে এবং তার উপর 'মানুষ' পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। ইসলামের এই অভিমত শত-সহস্র বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। (মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, **ইসলামে মানবাধিকার**, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ২০০১, পৃ: ২২৫)। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট "র" বনাম "ওয়েব" এর বিখ্যাত মামলায় আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ক তথ্যের বরাতে রায় দিয়েছে যে, মাতৃগর্ভে মানব অস্তিত্ব কে গর্ভ ধারণের তিনমাস পর আইনগত স্বীকার করে নিতে হবে। (**যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রতিবেদন**, অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রী: নিউইয়র্ক ১৯৭৪ খ্রী:, পৃ: ১৪৭)।
[১৮৭]. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২। ওহুদ যুদ্ধের সময় হযরত জাবের (রা:) এর পিতা তাকে বললেন, বেটা, হয়তো এই যুদ্ধে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এই শেষ মূহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণ কামিতার অছিয়ত করছি। (**মুসতাদরিক হাকেম**, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২০৩)। পিতার অছিয়ত পালন করতে গিয়ে হযরত জাবের (রা:) একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও বোনদের দেখা শোনার জন্য একজন বিধবাকে বিয়ে করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রগতি

সামাজিকভাবে মৌলিক অধিকার বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদিকে বুঝায়।[১৮৯] ইসলাম এই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। কুর'আন পাকে বলা হয়েছে, "নারীরা তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছদস্বরূপ এবং তোমরাও নারীদের পোষাক পরিচ্ছদস্বরূপ।"[১৯০] "তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"[১৯১] "আল্লাহ তোমাদের হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম উপরকণ দান করেছেন। তবুও কি তারা বাতিলকে মানছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করছে?"[১৯২]

ইসলাম নারীদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করেছে। বিবাহের পূর্বে পিতা, বিবাহের পর স্বামী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেরা এই দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, (হে রাসূল) আপনি বলে দিন, তোমরা যা কিছুই খরচ করবে, তা করবে পিতা-মাতার জন্য, নিকট আত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীম, মিসকিন এবং সম্বলহীন পথিকদের জন্য।"[১৯৩] আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন, "সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে আর সীমিত আয়ের লোক আল্লাহর দেয়া সম্পদ অনুসারে স্ত্রীদের জন্য খরচ করবে।"[১৯৪]

বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে হযরত হামযা (রাঃ) এর শাহাদতের পর তিনজন তাঁর মেয়ের অভিভাবকত্বের দাবীদার হলেন। **প্রথমত ঃ** হযরত আলী (রাঃ) দাবী করলেন যে, সে আমার চাচাতো বোন। তাই তাকে প্রতি পালনের জন্য আমার দাবী অগ্রগণ্য। **দ্বিতীয়ত ঃ** হযরত জাফর (রাঃ) দাবী করলেন, আমি আলী (রাঃ) এর চেয়ে তার লালন-পালনের অধিক হকদার, কেননা, সে যে আমার চাচাতো বোন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু আমার স্ত্রী তার খালা। এজন্য দু'টি কারণে তার লালন-পালনের দায়িত্ব ও সুযোগ আমার হওয়া উচিত। **তৃতীয়তঃ** হযরত যায়েদ (রাঃ) দাবী করলেন যে, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে (হযরত যায়েদ ছিলেন আনসার এবং হযরত হামযা (রাঃ) ছিলেন মুহাজির, নবী (স.) তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন)। তাই ভ্রাতৃকন্যার প্রতিপালনের অধিকার চাচার চেয়ে আর কার বেশী থাকতে পারে? (**নাইলুল আওতার**, ৭ম খন্ড, পৃঃ১৩৭)।

[১৮৮]. রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি ছিল চরম অবহেলিত, লাঞ্চিত, নির্যাতিত, তখন এই নারী জাতির বেঁচে থাকার অধিকার ছিলনা। অথচ বেঁচে থাকার অধিকার হল সব গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের মধ্যে একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকারটি নিশ্চিত হলেই কেবল একজন নারী বা পুরুষ তার জন্য বরাদ্ধ অন্যান্য অধিকার উপভোগ করতে সক্ষম হবে। পবিত্র কুর'আনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "যদি কেউ কোন একজন মানুষকে হত্যা করে তবে মনে হবে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল, আর যদি কেউ একজন মানুষের জীবন রক্ষা করে তবে মনে হবে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করল। (আল কুর'আন, **সুরা আল মায়েদাহ**, আয়াতঃ ৩৫।) আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করে কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "এমনকি আল্লাহ আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। (আল কুর'আন, **সুরা আল মায়েদাহ**, আয়াতঃ ২৯।) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাক-ইসলাম যুগে বহু জায়গায় মেয়ে শিশুকে হত্যা করা হত বা কোন কোন জায়গায় মাটিতে পুতে ফেলা হত। ইসলাম কন্যা শিশুর হত্যার এই প্রথাকে প্রচন্ডভাবে নিন্দা করেছেন। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের শিশুদের হত্যা করো না। আমরা তাদের রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতই তাদের হত্যা করা একটি মস্ত বড় অপরাধ।"(আল কুর'আন, **সুরা বনী ইসরাইল**, আয়াতঃ ৩১)।

[১৮৯]. সাইয়্যিদ সাবিক, **ফিকহুস সুন্নাহ আল ফাতহ লিল ইলমিল তারাবী**, ২য় খন্ড, (কায়রো, ১৯৯০), পৃঃ ১৭৮।

[১৯০]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ১৮৭।

[১৯১]. আল কুর'আন, **সুরা আশ শুরা**, আয়াতঃ ১১।

[১৯২]. আল কুর'আন, **সুরা আন নাহল**, আয়াতঃ ৭২।

[১৯৩]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২১৫। এই আয়াতে ধন সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার স্বপক্ষে অনেক হাদিস রয়েছে। হযরত হামযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "আমি রাসুলের (স.) কাছে জিহাদের শরীক হওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য এসেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, আমার মা জীবিত আছেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, তাহলে তুমি তোমার মা এর খেদমতে লেগে থাক। কেননা তার পায়ের কাছেই তোমার বেহেশত রয়েছে।"(আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসায়ী, **সুনানু নাসায়ী**, ৬ষ্ঠ খন্ড, কিতাবুল জিহাদ, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯৫, পৃঃ ৯)।

[১৯৪]. আল কুর'আন, **সুরা আত তালাক**, আয়াতঃ ৭। এই আয়াতে সচ্ছল লোকদের আদেশ করা হয়েছে যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বাচ্ছন্দ অনুসারে খরচ করবে। আর যাদের রিযিক সচ্ছল নয়, নিম্নমানের প্রয়োজন মত অথবা সংকীর্ণ,

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "তোমরা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের উপঢৌকন প্রদান কর। এ ব্যাপারে ধনী ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী উপঢৌকন প্রদানের যথাসম্ভব উত্তম ব্যবস্থা করবে। এটা তার উপর অর্পিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।"[১৯৫]

নারীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাদের স্বামীদের উপর অর্পিত। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, "তোমরা সামর্থানুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস কর মহিলাদের জন্যও তদ্রুপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও।"[১৯৬]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত। তবে এ ব্যাপরে স্বামীর সামর্থ অনুযায়ী সে ব্যয় করবে। তাকে তার সাধ্যাতীত কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। আবার স্বামীও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কৃপণতা করে স্ত্রীকে কোন প্রকারের কষ্ট দিবে না। স্ত্রীর সাথে সর্বদা উত্তম ব্যবহার করবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে নারীর মৌলিক অধিকার পূরণের দায়িত্ব সন্তানের উপর অর্পিত হয়। এ সম্পর্কে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে, "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তবে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করে থাকেন।"[১৯৭] সুতরাং একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, ইসলাম স্বত:স্ফুর্তভাবে নারীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে।

আইনের সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রগতি

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই আইনের সুবিচার লাভের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। বস্তুত ইসলামী আর্দশে গঠিত সমাজই মানুষের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়িত ও কার্যকর করতে পারে।[১৯৮] এ সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "হে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। আইনভিত্তিক বিচারব্যবস্থা শাণিতভাবে কার্যকর হওয়াতেই তোমাদের জীবন নিহিত।"[১৯৯]

শরী'আতের একটি সামগ্রিক স্থায়ী নীতি হলো, হন্তার প্রাণবধ করা। এ ক্ষেত্রে সে নারীকে হত্যা করেছে না পুরুষকে হত্যা করেছে তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ একজন পুরুষের প্রাণবধ যেমন নিষিদ্ধ তেমনি

তারা আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার চেয়ে বেশী খরচ করার কোন দায়িত্ব তাদের নেই। (মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আশ্ শাওকানী, **তাফসীরে ফাতহুল কাদীর**, ৫ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৩, পৃঃ ২৩৯)।

[১৯৫]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২৩৬। এই আয়াতের ব্যাখায় মাওলানা আবদুল আযীয বলেন, "সামান্য পরিমাণ অর্থ বা বস্তু দেওয়াকে মুত'আ বলা হয়, যাকে উপঢৌকনও বলা যায়। মুত'আর কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকলেও তা স্বামীর অবস্থানুপাতে হতে হবে। অবস্থাপন্ন স্বামীর অবস্থানুপাতে মূল্যবান মুত'আ দিবে। আর স্বামী গরীব হলে তার অবস্থানুপাতে মুত'আ হবে। এটা ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। মুত'আ দেওয়া বাধ্যতামূলক। (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয, **তাফসীরুল বয়ান ফী তাফসীরুল কুর**আন, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৭, পৃঃ ২৫০-২৫১)।

[১৯৬]. আল কুর'আন, **সূরা আত তালাক**, আয়াতঃ ৬। এই আয়াতের ব্যাখায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "তোমরা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের বসবাসের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দাও। তোমরা যেরূপ স্থানে বসবাস কর তাদেরকেও তদ্রুপ স্থানে বসবাস করা ব্যবস্থা কর। তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে তাদের খাওয়া-পরা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা কর। খোরাক-পোশাক এবং বাসস্থানের ব্যাপারে তাদের কষ্ট দিবে না। এ ব্যাপারে তাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করবে না।"(হযরত ইবন আব্বাস রাঃ, **তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস**, করাচীঃ খাদীমী কুতুবখানা, তা.বি. পৃঃ ৬০২)।

[১৯৭]. আল কুর'আন, **সূরা লুকমান**, আয়াতঃ ১৪।

[১৯৮]. মাওলানা আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

[১৯৯]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

একজন নারীর প্রাণবধও নিষিদ্ধ সুতরাং হত্যাকারী নারী হোক বা পুরুষ হোক হত্যাপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার প্রাণ হরণ করা হবে; নিহত ব্যক্তি পুরুষ কিংবা নারী হোক।[২০০]

নবী (স.) ইয়ামানবাসীদের জন্য যে সব আইন লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে ছিল, "কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।"[২০১]

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইয়াহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে (প্রস্তারাঘাতে) যখম করল এবং বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার এ অবস্থা কে করল? অমুক অথবা অমুক? তার সামনে কতিপয় লোকের নাম বলা হলো এমনকি সেই ইয়াহুদীটির নাম বলা হলো, (তখন সে একমত হলো)। ইয়াহুদীকে নবী (স.) এর কাছে আনা হলো এবং নবী (স.) তাকে ততক্ষণ প্রশ্ন করতে থাকলেন যতক্ষণে সে (অপরাধ) স্বীকার করল। অত:পর দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে তার মাথাও যখম করা হলো।[২০২]

হযর উমর (রা:) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এক মহিলার কিসাসে[২০৩] তিনি হত্যার অংশীদার কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন।[২০৪]

ইসলামী আইনে নারী পুরুষ যেই অপরাধী হোক উভয়ের জন্যই শাস্তির বিধান রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "যে সব লোক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের উপর নিপীড়ন ও জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে ও পরবর্তীতে এসব অপকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে তওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে দগ্ধের সাজা নির্ধারিত।"[২০৫]

আল্লাহ আরও বলেন, "যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে বিনা অপরাধে নির্যাতন করে ও কষ্ট দেয় তারা নি:সন্দেহে বিরাট মিথ্যার দোষ ও গুণাহর বোঝা নিজের উপর চাপিয়ে নিয়েছে।"[২০৬]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী প্রত্যেককেই একশত করে বেত্রাঘাত কর। এদের উপর আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন তোমরা দয়া পরবশ হয়ে না পড়। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাক, তাহলে তার প্রশ্নই আসে না। আর এ বেত্রাঘাতের অনুষ্ঠান যেন জনসমক্ষে হয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুমিন যেন তাদের উভয়ের এ সাজা প্রত্যক্ষ করে।"[২০৭]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন, "চোর পুরুষ হোক বা নারী উভয়েরই হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সাজা। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।"[২০৮]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যারা প্রতি চরিত্রের অধিকারী নারীদের সম্পর্কে অপবাদ রটায় অথচ তার সমর্থনে প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না এ ধরণের অপবাদকারীদেরকে আশীটি করে বেত্রাঘাত

---

[২০০]. মাওলানা আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২।
[২০১]. **আহসানুল কুবরা**, ৩য় খন্ড, পৃ: ২।
[২০২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, দিয়াত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হত্যাকারীদের স্বীকৃতি প্রদান পর্যন্ত প্রশ্ন করা ৬ষ্ঠ খন্ড, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন, ২০০১), পৃ: ২২১।
[২০৩]. কিসাস আরবী শব্দ। এর অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ কারো উপর যতটুকু যুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা মাজলুমের জন্য জায়েয। তার চেয়ে বেশী করা বৈধ নয়। সূরা আল বাকারার ১৯ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তার উপর ততটুকু বাড়াবাড়ি কর যতটুকু সে তোমাদের উপর করেছে।" তেমনিভাবে সূরা নাহলের ১২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর যদি তোমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ নাও, তারা তোমাদেরকে যতটুকু কষ্ট দিয়েছে।"
[২০৪]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।
[২০৫]. আল কুর'আন, **সূরা আল বুরুজ**, আয়াত: ১০।
[২০৬]. আল কুর'আন, **সূরা আল আহযাব**, আয়াত: ৫৮।
[২০৭]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াত: ২।
[২০৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল মায়েদা**, আয়াত: ৩৭।

কর। এই অপরাধীদের সাক্ষ্যও কখনো গ্রহণ করো না। এসব চরিত্রের লোকেরাই হলো ফাসেক। হ্যা, পরবর্তীতে তারা যদি তওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাকারী ও অতীব দয়ালু।"[২০৯]

আল্লাহ আরও বলেন, "যারা চরিত্রবান, সরলমনা ও মুমিন নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করে, তাদের প্রতি এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে অভিসম্পাত করা হয়েছে। তাদের জন্য ভীষণ কষ্টকর আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে। সেদিন তাদের জিহ্বা ও হাত-পা তাদের এসব অসৎ আচরণ ও ঘৃণিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে এসব কাজের পুরস্কার পুরোপুরি দেবেন, যারা যা পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে তাই দেয়া হবে। তারা সেদিন বুঝতে পারবে যে, বস্তুত আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য দিয়েই প্রতিষ্ঠাকারী।"[২১০]

সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আইনগত সকল বিষয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দিয়ে উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করেছেন। ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই আইন সর্বদিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। এ আইন বাস্তবায়িত হলে নারীর পরিপূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সভ্যতার অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে নারী প্রগতি

জীবনের সব রকম তৎপরতা ও উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। উভয়ে মিলে জীবনের কঠিন ভার বহন করেছে এবং উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। মানুষের এ দুটি শ্রেণীর কোনটিকেই কোন জাতির আন্দোলন কোনদিনই গুরুত্বহীন মনে করতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের প্রচার ও প্রসার এবং তার বিজয় লাভ ও প্রভাব বিস্তারে নারী ও পুরুষের যেমন পাশাপাশি কর্মতৎপরতা দেখা যায় ঠিক তেমনি বাতিলের উন্নতি ও শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও তারা সমানভাবে অংশীদার হয়ে থাকে।[২১১]

আল কুর'আনের ঘোষণা, "মুনাফিক[২১২] পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ ও তাদের ভুলে গেছেন। এই মুনাফিকরাই নিঃসন্দেহে 'ফাসেক'[২১৩]।"[২১৪] আল্লাহ আরও বলেন, "মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ হতে নিজেদেরকে বিরত

---

২০৯. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াত: ৪-৫।

২১০. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াত: ২৩-২৫।

২১১. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, অনুবাদঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃঃ ৫৫।

২১২. মুনাফিক: 'নিফাক' শব্দের অর্থ কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব পোষণ করা, ধোকাবাজী, ভন্ডামী ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় অন্তরে কুফর রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাওয়ার লোভে মুখে ঈমানদার সুলভ কথা বলা ও লোক দেখানো অনুষ্ঠান পালন করাকে নিফাক বলে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে তাকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকরা ইসলামের ভয়ানক ক্ষতি সাধিত করে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়, মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে, আর তুমি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কাউকেও পাবে না। (আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১৪৫)। রাসূল (স.) মুনাফিকদের পরিচয় বা চেনার উপায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সেই মুনাফিক। **এক.** তার কাছে আমানত রাখলে খেয়ানত করে, **দুই.** সে কথা বললে মিথ্যা বলে, **তিন.** সে প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে. **চার.** সে ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মুনাফিকদের আলামত, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, মে ১৯৯১, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৬)।

২১৩. ফাসেকঃ ফাসেক আরবী শব্দ, এর অর্থ খোদার নির্দেশ অমান্যকারী, তার আনুগত্যের সীমা লংঘনকারী।

২১৪. আল কুর'আন, **সূরা আত তাওবা**, আয়াতঃ ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।[২১৫]

রাসূল (স.) নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। মুগীরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, অতিমাত্রায় যাঞ্চা করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেন।[২১৬]

ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালনা করা এবং ইসলামকে সমুন্নত রাখা ও মানব সেবায় নিয়োজিত থাকা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অপরিহার্য করে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সে সব দুর্বল ও অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য আল্লাহর পথে লড়াই করছো না, যারা নিপীড়নের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ জনপদ হতে নাজাত দাও, যার অধিবাসীরা সীমাহীন অত্যাচারী এবং তোমার খাস রহমতে আমাদের জন্য কোন বন্ধু ও কোন দরদী সাহায্যকারী তৈরি করে দাও?"[২১৭] আল্লাহ আরও বলেন, "তোমরা পৃথিবীর সেই সর্বোত্তম দল, যাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২১৮] মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উক্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নারী-পুরুষ একত্রে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং উভয়েরই প্রচেষ্টায় মানব সভ্যতা আজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম নারীদের যে সকল অধিকার প্রদান করেছেন তার মাধ্যমে নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ব্যবহার করে নারী, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা জীবনে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভূত কল্যাণ সাধিত করতে পারে। সর্বোপরি তার উপর অর্পিত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যান লাভ করতে পারে।

রাসূল (স.) এর সময়ে মুসলিম নারীর সামাজিক কর্মে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত

রাসূল (স.) এর সময়ে মুসলিম নারীরা সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতো। নিম্নে রাসূল (স.) এর যুগে নারীদের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলোঃ

ইবাদতমূলক তৎপরতায় অংশগ্রহণ

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো ... আমি আমার প্রয়োজন সেরে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রাসূল (স.) নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন এমনকি আমি বসে পড়তে মনস্থ করলাম। কিন্তু তারপর এক দুর্বল মহিলাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, এতো আমার চেয়ে দুর্বল (সে তো দাঁড়িয়ে আছে)। তাই আমিও দাঁড়িয়ে থাকব। অতঃপর তিনি রুকু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন। এমনকি সেই সময় যদি কেউ এসে দেখতো তাহলে তার ধারণা হতো যে, তিনি রুকু করেননি। রাসূল (স.) যখন নামায শেষ

---

[২১৫]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাওবা,** আয়াতঃ ৭১।

[২১৬]. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনূদিত, **সহীহ আল বুখারী**, কিতাবুল আদাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ, ৫ম খন্ড, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃঃ ২২১।

[২১৭]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা,** আয়াতঃ ৭৫।

[২১৮]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান,** আয়াতঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

করলেন তখন সূর্য গ্রহণমুক্ত হয়েছে। তখন তিনি লোকদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আম্মা বা'দ ...।[২১৯]

সাংস্কৃতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ...অতপর আমি মসজিদে গিয়ে রাসূল (স.) এর সাথে নামাজ পড়লাম। রাসূল (স.) নামায শেষে হাসতে হাসতে মিম্বরে বসলেন। তিনি বললেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকো। তারপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি কেন তোমাদের সমবেত করেছি? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কোন উৎসাহব্যঞ্জক বা ভীতিকর খবরের জন্য সমবেত করিনি। বরং এ উদ্দেশ্যে সমবেত করেছি যে, তামীমে দারী নামক এক ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। সে ছিল একজন খৃষ্টান। সে আমার কাছে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে যা আমি মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের ইতিপূর্বে যে কথা বলেছিলাম তার সাথে হুবহু মিলে যায়...।[২২০]

সাধারণ সভা সমাবেশে মেয়েদের যোগদান

বিবাহ উৎসবঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এক বিবাহ মজলিস থেকে নারী এবং শিশুদেরকে ফিরে আসতে দেখে দাড়িয়ে গেলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।"[২২১]

হযরত সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসাইদ সাঈদী যখন বিবাহ করলেন তখন রাসূল (স.) এবং সাহাবায়ে কেরামকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাদের জন্য কোন খাদ্য তৈরী করলেন না। তাদের সামনে কোন কিছুই হাজির করলেন না। তবে তার স্ত্রী উম্মু উসাইদ একটি পাথরের পাত্রে রাত্রি বেলায় কিছু খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ (স.) খাওয়া শেষ করলেন, তখন তিনি (উম্মুল উসাইদ) খেজুর নরম করে দিলেন রসুলুল্লাহ (স.) এর জন্য এবং তা থেকে তিনি পান করতে দিলেন।"[২২২]

ঈদ উৎসবঃ হযরত উম্মে আতিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য আদেশ করা হতো। এমন কি আমরা কুমারীদেরকেও পর্দার ভিতর থেকে বের করে আনতাম। ঋতুবতী মহিলারা বেরিয়ে পুরুষদের পিছনে বসে থাকত। তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলতো এবং ঐ দিনের বরকত কামনা করতো ও গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতো। অন্য এক বর্ণনায় আছে,[২২৩] কল্যাণ ও মুমিনদের দোয়ায় উপস্থিত থাকার জন্য বেরিয়ে আসতো।"[২২৪]

---

২১৯. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি খুতবায় আল্লাহর প্রশংসার পরে আম্মা বাদ (অতপর) বলে, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, বৃষ্টি প্রার্থনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে নবী (স.) এর কাছে যা পেশ করা হয়েছিল..., ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩২, ৩৩।

২২০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থান, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২০৩।

২২১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি যে, তোমরা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সংক্রান্ত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১১৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আনসারদের গুণাবলী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৮৪।

২২২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে মহিলাদের পুরুষদের খেদমত ও নিজ হাতে খাদ্য পরিবেশন করা, ১১ খন্ড, পৃঃ ১৬০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, পান করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মৃদু নেশাযুক্ত পানীয় (যাকে নাবিয বলা হয়) পানের অনুমতি, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১০৩।

২২৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মাসিক ঋতু অবস্থায় দুই ঈদের নামাযে যোগদান, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৭।

২২৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, দুই ঈদের নামাযের বিবরণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মিনায় তাকবীর পড়া সংক্রান্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১৫; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের দুই ঈদের নামাযে যোগ দেয়ার অনুমতি সংক্রান্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যর্থনা সভা: হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিজরতের দিন আমরা রাতে মদীনায় এলাম। নারী-পুরুষ ঘরের ছাদে উঠেছিল এবং গোলাম ও খাদেমরা রাস্তায় "ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! এর শ্লোগান দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল।"[২২৫]

সেবামূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ

পারস্পরিক সহযোগীতা: হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আইমান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমি একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা:) এর কাছে গেলাম। তিনি সূতি কাপড়ের একটি জামা পরিহিত ছিলেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার এই দাসীর দিকে তুমি তাকিয়ে দেখ, সে ঘরে এই পোশাক পরিধান করতে গর্ববোধ করে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে আমার এই ধরনের একটি জামা ছিল। মদীনায় কোন মহিলা সাজসজ্জা করতে চাইলে লোক পাঠিয়ে আমার জামাটি ধার চাইতো।"[২২৬]

আগন্তুক মেহমানদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা: হযরত ফাতিমা বিনতে কায়িস (রা:) থেকে বর্ণিত, ...উম্মে শুরাইক একজন ধনাঢ্য আনসারী মহিলা ছিলেন। দান সাদকার ব্যাপারে তিনি খুবই উদারহস্ত ছিলেন, তার বাড়িতে মেহমানের ভীড় লেগে থাকতো।"[২২৭]

স্বাস্থ্য পরিচর্যা: উম্মুল আলা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাযউন (রা:) আমাদের এখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত আমি তার সেবা করেছিলাম।"[২২৮]

---

[২২৫]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, আত্মত্যাগ ও সৎ গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হিজরতের ঘটনাবলী, ৮ম খন্ড, পৃ: ২৩৭।

[২২৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, দান, তার ফযিলত ও তাতে উদ্বুদ্ধকরণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নতুন দম্পতিদের ঘর সাজানোর জন্য কোন কিছু ধার নেয়া প্রসংগ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১৬৯।

[২২৭]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ফিত্না ও কিয়ামতের লক্ষণসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: দাজ্জালের আগমন ও তার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা, ৮ম খন্ড, পৃ: ২০৩।

[২২৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মদীনায় রসূলের আগমন ও মদীনার সাহাবীগণ অনুচ্ছেদ, ৮ম খন্ড, পৃ: ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষাক্ষেত্রে নারী প্রগতি

পবিত্র কুর'আনের অবতীর্ণ প্রথম নির্দেশ "পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু জমাট রক্ত হতে। পাঠ কর, আর জেনে রাখ যে, তোমার প্রভূ মহামহিম। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহয্যে। তিনি মানুষকে সে সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"[২২৯] সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, পড়! বা জ্ঞান অন্বেষণ কর! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই নির্দেশ নারী পুরুষ সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। নর-নারী প্রত্যেকের জন্য বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য, কেননা এ ছাড়া মানুষের পূর্ণতা লাভের আর কোন বিকল্প পথ নেই। আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে নারী ছিল চরম অবহেলিত, লাঞ্চিত ও বঞ্চিত। রাসূল (স.) সর্বপ্রথম অন্যান্য কাজের মত বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও তাদের যথাযোগ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।"[২৩০] এই হাদীসে জ্ঞান অর্জনকে ফরয বলা হয়েছে, এতে নারী ও পুরুষ সবাই অন্ত র্ভুক্ত। তবে ইসলামী চিন্তাবিদ ও পন্ডিতগণ মনে করেন (ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে) মুসলিম নারী এমন বিদ্যা অর্জন করবে যা তাদের জীবন ও দায়িত্বের সাথে সুসামঞ্জস্য ও প্রয়োজনীয়। ইসলাম স্বাধীন নারী-পুরুষকে জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ দিয়েছে এমনকি যারা ক্রীতদাসী তারাও যেন জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য রাসূল (স.) পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন, "যার নিকট কোন দাসী আছে এবং সে তাকে ভালভাবে বিদ্যা শিক্ষা দান করে ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয় অত:পর তাকে স্বাধীন করে দেয় এবং তাকে বিবাহ দেয় তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।"[২৩১] এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে দাসীদেরকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর জন্য মুসলিম মুনীবদের তাকীদ প্রদান করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তাদের নিজ কন্যাদের ব্যাপারে এটা যে অধিকতর প্রযোজ্য তা খুবই স্পষ্ট।

---

[২২৯]. আল কুর'আন, **সুরা আল 'আলাক,** আয়াত: ১-৫।

[২৩০]. **ইব্‌ন মাজাহ,** অধ্যায়, ১/৮১, আনাস (রা:) হতে বর্ণিত। ত্বাবরানী, **আল-মু'জামুস সগীর,** ১/১৬;, আনস (রা:) থেকে বর্ণিত। আর ১/২৯ পৃষ্ঠায় হুসাইন ইবন 'আলী (রা:) হতে বর্ণিত; **আল-মু'জামুল আউসাত:** ৩/২১ বর্ণনা হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত, ৩/২১ ও ৩/২২৯ পৃষ্ঠায় আনাস (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে; **আল-মুজামুল কাবীর:** ২৪/২৪০ ইবন মাস'উদ (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী বলেন, উক্ত বর্ণনা্য় 'উসমান বিন 'আব্দুর রহমান আল ওয়ারাক রয়েছেন, যিনি অপরিচিত এবং এ বর্ণনাটি আল-বাহরুয যিখার ওরফে মুসনাদ বাযযার গ্রন্থে রয়েছে: ১/১৭২-১৭৩ কিন্তু গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত সবগুলো বর্ণনা সহীহ নয়। গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, ইমাম বাইহাকী বলেন, উক্ত হাদীসের মূল ভাষাটি প্রসিদ্ধ বা মশহুর, তবে এর বর্ণনা দুর্বল। এ হাদীসে অনেক সনদ রয়েছে, যা সবই দুর্বল। ইমাম আহমদ বলেন, এ ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ বলেন, বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইমাম মুযানী বলেন, উক্ত হাদীসের বর্ণনার অনেক দিক রয়েছে, তাই বর্ণনাটি মর্যাদার দিক দিয়ে হাসান হাদীসের সমপর্যায়ের। শাইখ আলবানী বর্ণনাটি সহীহ ইবন মাজাহ হতে সংকলন করে বলেন, বর্ণনাটি সহীহ। (১/৪৪) (ইমাম সুয়ূতী, **আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ফিল আহদীসিল মুশতাহারাহ্‌,**পৃ: ১৩০-১৩১)। আলোচ্য হাদীসে (মুসলিম) শব্দের সাথে বিশেষভাবে (মুসলিমা) বলে নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনের অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারী পুরুষ উভয়কে একই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন, নামায কায়েম কর। যাকাত দাও! এসব ক্ষেত্রে একই শব্দ দ্বারা নারী পুরুষ উভয়ের প্রতি সমানভাবে হুকুম প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে (মুসলিম) শব্দের সাথে বিশেষভাবে শব্দের উল্লেখ করে নারী শিক্ষার প্রতি অগ্রাধিকার ও বিশেষ তাকীদ দেয়া হয়েছে। কারণ নারী হচ্ছে মায়ের জাতি। মাতৃত্বের দায়িত্ব যেমন তাদের উপর রয়েছে তেমনি জাতি গঠনের দায়িত্বও তাদের উপরই ন্যস্ত। তাই নারীকে শিক্ষিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়াও একজন শিক্ষিত নারীর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় না। শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সে নিজেকে অসচ্ছলতা থেকে দুরে রাখতে পারে। সর্বোপরি সমাজের একজন শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, তাই ইসলাম শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে নারীকেও পুরুষের সমান উৎসাহ প্রদান করেছে ।

[২৩১]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) এর বাণীর কোথাও জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞানীর মর্যাদা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে পুরুষ জাতিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি বরং সমস্ত মানব মন্ডলির জন্যই বলা হয়েছে। রাসূল (স.) যখন আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যস্ত, তখন মহান আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ এলো যে, কোন মহিলা যদি আদর্শ সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য হতে চায়, তাহলে তার নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত নৈতিক নীতিমালা ও আইনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গঠন করতে হবে। কুর'আনের বাণী, "হে নবী! ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে যখন এই মর্মে বাইয়াতের[২৩২] জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুতে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন অপবাদ গড়ে নেবে না এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না। তাহলে তাদের বাইয়াত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"[২৩৩] এই আয়াতে নারীদের থেকে দ্বীন ইসলামে যে নীতিমালা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে পুরুষকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। কারণ পারিবারিক জীবনের সাথে তাদের যতটা সম্পর্ক তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক পরিবারের বাইরের জীবনের সাথে। এ থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীন ইসলামের মূলনীতি ও বিধানকে মর্যাদা দানের দাবি পূরণের জন্য দ্বীনের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া দরকার। যাতে নারীরাও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্যার ক্ষেত্রে কুর'আনের হেদায়াত এবং কুর'আন কিভাবে তার সমাধান করে তা অবহিত হতে পারে।[২৩৪]

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে নারীদের কাছ থেকে যে সব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে একথাও আছে যে, তারা কোন সৎ কাজে রাসূলের (স.) অবাধ্য হবে না। বাহ্যত এটি একটি ক্ষুদ্র বাক্যাংশ। কিন্তু এ দ্বারা সমাজে নারীকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। যেজন্য একজন নারীর প্রয়োজন পরিপুর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। রাসূল (স.) এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়েছিল যে, নারীরা রাতদিন সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকত। ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পরে যে সব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিত তা তাদেরকে বিমুখ করতে পারত না।[২৩৫]

নবী করীম (স.) এর যুগে পুরুষগণ যেমন দ্বীনি এবং নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করত নারীগণও তদ্রুপ শিক্ষা লাভ করত, এ প্রসঙ্গে ইবনে জুরাইয হযরত আতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কোন এক ঈদুল ফিতরের দিন রাসূল (স.) সালাত আদায় শেষে খোতবা দিলেন। খুৎবা শেষে তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তখন তিনি হযরত বেলাল (রাঃ) এর হাতের উপর ভর দিয়েছিলেন আর বেলাল (রাঃ) তার কাপড় মেলে ধরেছিলেন যাতে মহিলারা দান করছিলেন।[২৩৬]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (স.) মনে করলেন তার কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি। তাই তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করতে বললেন। ইবনে জুরাইয হযরত আতা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মনে করেন যে, মেয়েদেরকে উপদেশ দেয়া ইমামের কর্তব্য? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই এটা ইমামের কর্তব্য কিন্তু তারা এটা করছে না কেন? [২৩৭] রাসূল (স.) যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পাননি কারণ সমাবেশ ছিল বড়, উপরন্তু মহিলাদের সারি ছিল পুরুষের সারির পিছনে তখন তিনি সামনে এগিয়ে এসে আলাদাভাবে উপদেশ দিলেন। এটা ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের বৈধ অধিকার। রাসূল (স.) এর যুগের মেয়েরা এ অধিকার আদায়ে যে ভূমিকা পালন করেছেন, জ্ঞান অন্বেষণে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তা সত্যিই

---

২৩২. বাইয়াতঃ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সমর্থন জ্ঞাপন ও ঐ বিষয় অনুসরণের উদ্দেশ্যে কারো কাছে শপথ গ্রহণ করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় বাইয়াত বলা হয়।

২৩৩. আল কুর'আন, **সূরা আল মুমতাহিনাহ,** আয়াতঃ ১২।

২৩৪. জালালুদ্দীন আনসার উমরী সাইয়েদ, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮-৮৯।

২৩৫. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

২৩৬. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী,** এল্‌ম অধ্যায়, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম,** ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯।

২৩৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী,** ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়কর। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, মেয়েরা রাসূল (স.) কে বলল, আপনার কাছে সবসময় পুরুষদের ভীড় লেগে থাকে। তাই আমরা আপনার মূল্যবান উপদেশ হতে বঞ্চিত থেকে যায়। আপনি আমাদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য করেন, এবং তিনি আলাদা দিন ধার্য্য করে সেইদিন তাদের কাছে গেলেন। তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে বললেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান হবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি দুটি হয়? রাসূল (স.) বললেন, দুটি হলেও ।"[২৩৮]

রাসুল (স.) এর সময়ে মহিলা সাহাবীদের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টার বহু নজির পাওয়া যায়। আনসারী মহিলাদের[২৩৯] সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)[২৪০] বলেন, "আনসারী মহিলারা কতই না ভাল দ্বীনের বিধি বিধান সম্পর্কে পরিপক্কতা লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি।"[২৪১] ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে যে যুগের মহিলারা কত গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর উদ্ধৃতি থেকেই বুঝা যায়, "রাসূল (স.) এর যুগে পবিত্র কুর'আনের আয়াত নাযিল হত। আমরা যদিও তার শব্দগুলো হুবহু ধরে রাখতাম না কিন্তু তার হালাল হারাম ও আদেশ নিষেধগুলো স্মৃতিতে গেঁথে নিতাম।"[২৪২] রাসূল (স.) যে নারী শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এর প্রমাণ বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করলে ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।[২৪৩]

হযরত আবু বুরদা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স.) বলেন, "যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী থাকে সে যদি তাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয় এবং বিবাহ করে তবে সেই ব্যক্তি দুটি প্রতিদান পাবে।"[২৪৪]

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিন্তে কায়েস জাহানিয়া (রাঃ) নবী করীম (স.) এর সুউচ্চ কন্ঠের উল্লেখ করে বলেছেন, "জুম'আর দিনে আমি রাসূল (স.) এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[২৪৫] হারিসা ইব্‌নে নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূল (স.) এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্ত করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুম'আর খুতবাতে এটি পড়তেন।[২৪৬]

---

২৩৮. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ইলম অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০।

২৩৯. **আনসার** অর্থ সাহায্যকারী। যেসব মুসলিম ভাই ও বোনেরা মক্কা থেকে মদীনায় আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে হিজরত করেছিলেন। মদীনায় অবস্থানকারী যেসব মুসলমানরা তাদের জান ও মাল দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।

২৪০. হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (স.) এর বয়সের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কন্যা। হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন।

২৪১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ১ম খন্ড, কিতাবুল হায়েজ অধ্যায়, পৃঃ ১৭৯।

২৪২. **আল ইকদুল ফারীদ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৬; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০। কোন কোন সময় নবী করীম মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাদের কাছে পাঠাতেন। তারপর তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সালাম দিতেন। তারাও তাঁর সালামের জবাব দিতেন।

২৪৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা ও আলিঙ্গন, ১৩ খন্ড, পৃঃ ৩৩, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কন্যাদের প্রতি সুন্দর আচরণ, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৮।

২৪৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করা, ১১তম খন্ড, পৃঃ ২৮।

২৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌নে সাদ, **আত্‌ তাবাকাত**, ৮ম খন্ড, (বৈরুতঃ দারুস সদর, ১৩৭৬ হিঃ), পৃঃ ২১৭।

২৪৬. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী করীম (স.) নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোন সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায়নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা:) এর ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছায়নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।"[২৪৭] এরপর তিনি বললেন, "আমি রাসূল (স.) এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। অত:পর তিনি আমাদের যুবতী এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও দু'ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আরও বললেন যে, আমাদের জন্য জুম'আর নামায ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করলেন।"[২৪৮]

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।[২৪৯] এ আয়াতের অর্থ হযরত আলী (রা:) এভাবে করেছেন, তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও ও এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।[২৫০]

মালিক ইব্‌নে হুয়াইরিস (রা:) বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী (স.) এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[২৫১]

সর্বোপরি বলা যায় রাসূল (স.) এর সময়ে জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তারা ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। জ্ঞান আহরণের পথে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ করতে পারত না। বিশিষ্ট ইসলামী আইনবিদগণও নারী শিক্ষার অধিকারের ব্যাপারে তাদের মতামত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেছে। বিদ্যা শিক্ষা ও অজানাকে জানার সেই অদম্য স্পৃহা নিয়েই শুরু হয়েছিল ইসলামের জয়যাত্রা। এবং এই যাত্রা পথে অংশ নিয়েছেন অসংখ্য মহিলা সাহাবী, যারা জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।

লিখন পদ্ধতি শিক্ষার সুযোগ

নবী করীম (স.) নারীর জন্য শুধুমাত্র ইসলামের নীতিমালা ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং তিনি তাদের জন্য পুঁথিগত শিক্ষাও আবশ্যক মনে করেছেন। যাতে শুধু শ্রবণ ইন্দ্রীয় তাদের জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম না হয়ে চক্ষুও আরেকটি মাধ্যম হতে পারে এবং স্মৃতিশক্তির সাথে সাথে গ্রন্থের পৃষ্ঠাও তাদের ধ্যান ধারণার সংরক্ষক হতে পারে। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি হযরত হাফসা (রা:) এর কাছে বসে ছিলেন, এই সময় নবী (স.) বললেন,

---

[২৪৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, **মুসলিম নারীর পোশাক ও কর্ম**, (ঢাকা: এশা রাহনুমা, সাইন্স ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮), পৃ: ৭২-৭৬।

[২৪৮]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৪।

[২৪৯]. আল কুর'আন, **সুরা আত্‌ তাহরীম**, আয়াত: ৬।

[২৫০]. আল্লামা শাওকানী, **ফাতহুল কাদীর**, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৬।

[২৫১]. মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি একে যেমন লিখতে শিখিয়েছো তেমনি কি ক্ষুর ফাটা রোগের দোয়া শিখাবে না?"[২৫২] সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (স.) এর যুগে নারীদেরকে লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হত।

হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা

ইসলামের শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি বরং পুরুষের শিক্ষা দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রুপ জরুরী মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবী (স.) এর নিকট তালীম গ্রহণ করতেন, তেমনি নারীরা বিভিন্ন বিষয়ে নবী (স.) এর কাছ থেকে তালিম গ্রহণ করতেন। তিনি নারীদের শিক্ষা লাভের জন্য আলাদাভাবে সময় দিতেন। সে সময়ে নবী (স.) তাদের বিভিন্ন বিষয়ে তালিম দিতেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ মহিলাদের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা:) এর নিকট শুধু নারী নয় বরং অনেক পুরুষও শিক্ষা লাভ করতে আসতেন। সাহাবীরাও তাঁর কাছে হাদীস, তাফসীর এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন, তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মুসা (রা:) এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "আমাদের মাঝে যখনই কোন হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, তখনই আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা:) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।"[২৫৩]

মুসলিম উম্মাহ জীবনের অনেক দিক ও বিভাগ সম্পর্কে নারীর বর্ণিত হাদীসের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করেছে এবং পুরুষ ও নারীর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করেনি বরং উভয় প্রকার হাদীসকেই সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। কোন কোন হাদীস এমন সব সনদের মাধ্যমে পরবর্তী জাতির নিকট পৌঁছেছে যার বর্ণনাকারী ছিলেন একজন নারী।[২৫৪]

তাছাড়া হাদীস শাস্ত্রবিদগণও বিভিন্ন হাদীসের ব্যাপারে নারীদের পর্যালোচনা, সমালোচনা ও সংশোধনী মেনে নিয়েছেন এবং তাদের মতামতের আলোক কোন রাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ রা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[২৫৫] ইমাম শাওকানী বলেন, উলামায়ে কেরামের কারো পক্ষ থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি কোন মহিলার বর্ণনাকে মহিলা হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন বহু হাদীস রয়েছে যা একজন মহিলা সাহাবী বর্ণনা করেছেন, আর সমস্ত উম্মত তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। ইলমে হাদীস সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে তিনিও একথা অস্বীকার করতে পারেন না।[২৫৬] হাফেয যাহাবী বলেন, "হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মহিলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"[২৫৭]

শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রাসূল (স.) এর কাছে তৎকালীন মহিলা সাহাবীরা আলাদা ব্যবস্থা দাবি করেছিলেন। আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (স.) এর খিদমতে হাজির হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হব। জবাবে রাসূল (স.) বললেন অমুক দিন অমুক স্থানে

---

[২৫২]. সুলাইমান ইবনে আশ্‌আশ, **সুনানে আবু দাউদ**, পৃ: ৫৪২; **মুসনাদে ইমাম আহমদ**, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৩৭২।

[২৫৩]. মাওলানা নো'মান আহমদ, **ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার**, (ঢাকা: শিবলী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ: ৯৪।

[২৫৪]. যেমন: মুসলিম (রহ.) ফিতান সম্পর্কিত একটি হাদীস আবু বকর ইবনে আবী শায়বা (রা:), সাঈদ ইবনে আমর (রা:), যুবায়ের ইবনে হারব (রা:) এবং ইবনে আবী উমর (রা:) থেকে গ্রহণ করেছেন। এই চার জনই পরস্পরগতভাবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রা:), ইমাম যুহরী উরওয়া, জয়নাব বিনতে আবী সালামা, হাবীবা (তিনি তার মা উম্মে হাবীবা থেকে বর্ণনা করেন) এবং জয়নাব বিনতে জাহাশ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (**তবকাতে ইবনে সাদ**, ৮ম খন্ড, পৃ: ৩৬৭)। ইমাম তিরমিযী এই হাদিসটি সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ও অন্য লোকের মাধ্যমে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

[২৫৫]. আল্লামা ইবনে জুযীর, **আল কিফায়াত ফী ইলমির রেওয়ায়াহ**, পৃ: ৯৭।

[২৫৬]. **নাইলুল আওতার**, ৮ম খন্ড, পৃ: ১১২।

[২৫৭]. আবুল ফজল ইবরাহীমের গবেষণামূলক পর্যালোচনা সহকারে যাহাবী প্রণীত মীযানের ভূমিকা। আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ্, **রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা সমবেত হবে, তারা সমবেত হলে রাসূল (স.) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন।[২৫৮]

হাফেয ইবনে হাজার রাযী আল্লাহু আনহু বলেন "এই হাদীসে মহিলা সাহাবীদের দ্বীনি ইলম অর্জনের অধীর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়।"[২৫৯]

মহিলা সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত কতিপয় হাদীস

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, "আমাদের দ্বীনের মধ্যে কেউ যদি নতুন কিছু প্রবর্তন করে যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহেলে তা অগ্রহণযোগ্য।"[২৬০]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "জুতা পরিধান করা চুল আচঁড়ানো এবং ওযূ করা এ জাতীয় প্রতিটি কাজে রাসূল (স.) ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।"[২৬১]

হযরত হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূল (স.) কে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি। অবশ্য ইন্তেকালের এক বছর পূর্ব থেকে তিনি নফল সালাত (নামায) বসে আদায় করেছেন। তখন ধীর ও শান্তভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সূরা তেলাওয়াত করতেন।"[২৬২]

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, আমার কাছে মানুষ ঝগড়া বিবাদ নিয়ে আসে। তাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় আমি তাকে সত্যবাদী বলে মনে করি এবং তার সপক্ষে রায় দিয়ে দেই। আমি যদি কোন মুসলমানের অধিকার ক্ষুন্ন করে রায় প্রদান করে থাকি, তবে তা হবে আগুনের টুকরো, সে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারে বা পরিত্যাগও করতে পারে।"[২৬৩]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে শাকাল ঋতুবতী মহিলার গোসল সম্পর্কে রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এজন্য তোমরা প্রয়োজনীয় পানি ও এক টুকরা কাপড় কিংবা তুলা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে ডলবে। যাতে পানি মাথার সব জায়গায় প্রতিটি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়। এরপরে আবার পানি ঢেলে ঘষবে। এরপর মিশক (সুগন্ধি) যুক্ত কাপড় বা তুলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে।[২৬৪]

---

[২৫৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কুরআন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী (স.) নারী পুরুষ নির্বিশেষে তার সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন, ১৭ খন্ড, পৃঃ ৫৫; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, শিষ্টাচার ও আত্মীয়দের সাথে সদাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন অনুচ্ছেদ, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

[২৫৯]. ইবনে হাজার আসকালীন, **ফতহুল বারী**, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৪।

[২৬০]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নিস্পত্তিকরণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত, ১ম খন্ড, (কায়রোঃ হালবী প্রকাশনী), পৃঃ ২৮০।

[২৬১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ওযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ওযু গোসল ও তায়াম্মুম, ১ম খন্ড, (কায়রোঃ হালবী প্রকাশনী), পৃঃ ২৮০।

[২৬২]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, মুসাফিরদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নফল নামায দাঁড়িয়ে ও বসে পড়া সম্পর্কিত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৩।

[২৬৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, অত্যাচার ও জুলুম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ জেনে শুনে অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন মহাপাপ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩১।

[২৬৪]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, মাসিক ঋতু অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নির্গমন স্থানে ধৌত করার প্রাক্কালে মিশকে আম্বর মিশ্রিত কাপড় বা তুলার টুকরা ব্যবহার উত্তম হওয়া সংক্রান্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম নারীর শিক্ষা লাভে বাধা প্রদান করে না। নারী যত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাতে সর্বাত্মক সহযোগীতা প্রদান করাই ইসলামের শিক্ষা। তবে ইসলাম নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ প্রদান করেছে।[২৬৫]

রাসূল (স.) এর যুগে জ্ঞানী মহিলা

জ্ঞান সম্পর্কে কুর'আনের ঘোষণা এবং রাসূল (স.) এর সুন্নাহর বাস্তব স্বাক্ষর রয়েছে তার সময়ের মহিলাদের পান্ডিত্যে। ইসলামের বিকাশের প্রাথমিক যুগেই জন্ম হয়েছিল অসংখ্য বিদূষী নারীর। রাসূল (স.) এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা:) ছিলেন জ্ঞানী, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না ও স্বচ্ছ সাবলীল বাচনভঙ্গীর অধিকারিণী। বিখ্যাত সাহাবীগণ ছিলেন তার ছাত্র। ইসলামের বিখ্যাত আইনবিদদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা:), জয়নাব বিনতে আম্মি সালাম, শিমা (রা:)[২৬৬] প্রভৃতি নারীদের নাম উল্লেখযোগ্য।[২৬৭]

উরওয়া ইবনে যুবাইর হযরত আয়েশা (রা:) ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারিণী হওয়া সম্পর্কে বলেছেন, আমি কুর'আন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখিনি।[২৬৮] এছাড়াও হাদীস বর্ণনার সংখ্যার দিক দিয়ে হযরত আয়েশা (রা:) তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা:) এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে মানুষ বিস্মিয় প্রকাশ করত। ইবনে আবী মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা:) কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ আপনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা:) এর কন্যা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) এর বাগ্মিতা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কিভাবে শিখলেন? তিনি বললেন, নবী করীম (স.) অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধি দল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[২৬৯] মূসা ইবনে তালহা বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা:) এর চেয়ে অধিক

---

[২৬৫]. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান**, (ঢাকা: মওদুদী রিচার্স একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ: ৩৪৪। যেমন, **এক.** নারীরা যেসব কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পারে, তাদের এমন শিক্ষা দেয়াই সর্বাত্মক উত্তম। **দুই.** নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নারী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা প্রদান করা উত্তম। কারণ বর্তমানে সহশিক্ষার কুফল পাশ্চাত্য সমাজের উপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আমেরিকায় ১৭ বছর পর্যন্ত যে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়ে সহশিক্ষার কারণে প্রতি বছর গড়ে ১০০০ জন গর্ভবতী হয়। এটা ১৯৬২ সালের কথা। ব্রিটেনে ১৯৮০ সালে ১০ হাজার কুমারী মেয়ের মধ্যে এক জরিপে দেখা যায়, একজন মেয়ে ২০ বছর বয়সে ১০ জনেরও বেশি পুরুষের সঙ্গী হয়েছে। ১৯৮০ সালের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ লাখ অবৈধ সন্তান সরকার লালন-পালন করছে। বহু প্রকার গর্ভ নিরোধক আবিষ্কার করেও তারা কুমারী নারীদের গর্ভধারণ রোধ করতে পারছে না। আমেরিকার প্রতি ৬ মিনিটে ১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং ব্যাংককে ১ বছরে ২ লাখ গর্ভপাত হয়। এর অর্ধেকই কুমারী। বর্তমানে এ সংখ্যা বহুগুণ বেশি। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৫; জহুরী, **অপসংস্কৃতির বিভীষিকা**, ঢাকা: উতলু প্রকাশন, ৪র্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ৪১)। **তিন.** উচ্চ শিক্ষিত নারীদের এমন প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগ প্রদান করা উত্তম যেখানকার কাজ ও পরিবেশ নারীদের উপযোগী। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৪-৩৪০)।

[২৬৬]. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পালিত ভগ্নী শিমা (রা:) ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। হযরত হোসেন (রা:) এর কন্যা সাকিনা সে যুগের সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। খলিফা হারুণের সহধর্মিণী জোবায়দার নাম শিক্ষা ও সমাজ সেবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

[২৬৭]. কানিজ মুস্তাফা সাইয়্যেদ, **ইসলামে নারীর অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯২।

[২৬৮]. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, **তাযকিরাতুল হুফফাজ**, ১ম খন্ড, পৃ: ২৭; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।

[২৬৯]. আবু আবদুল্লাহ আহমদ আল-হাকিম নিশাপুরী, **আল-মুসতাদরিক**, ৪র্থ খন্ড, (হায়দারাবাদ: দায়েরাতুল মা'রিফিল উসমানিয়া, ১৩৪৫ হি:), পৃ: ১১।

Dhaka University Institutional Repository

বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি।[২৭০] তিনি অংক শাস্ত্রে এমন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, বড় সাহাবাগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসলা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[২৭১]

তাবেয়ীদের যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ কাসেম ইবন মুহাম্মদ, ইমাম যুহরীকে বললেন, আমার বিনতে আবদুর রহমানের মজলিস ছেড়ে থেক না কারণ তিনি হযরত আয়েশা (রা:) এর লালিত পালিত। (তাই তার জ্ঞানের বড় উত্তরাধিকারিণী)।[২৭২] ইমাম যুহরী বলেন, "তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি আমরাতা বিনতে আবদুর রহমানের খেদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার। ইবনে হাব্বান তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা:) এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।[২৭৩]

হাফেয ইবনে হাজার উম্মে সালামা (রা:) সম্পর্কে লিখেছেন, "উম্মে সালামা পরমা সুন্দরী হওয়ার সাথে সাথে পরিপক্ক জ্ঞান বুদ্ধিও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।"[২৭৪] হযরত উম্মে সালামা (রা:) এর কন্যা হযরত যয়নাব (রা:) সম্পর্কে হযরত ইবনে আবদুল বারী (রা:) বলেন, "তিনি তার যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।"[২৭৫] রাফে সায়েগ বলেন, যখনই আমি ফিকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোন মহিলার কথা স্মরণ করি তখনই যায়নাব বিনতে আবু সালামার কথা মনে পড়ে যায়।[২৭৬]

হযরত আবু দারদার স্ত্রী উম্মে দারদার জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আমল বাস্তব জীবনের কাজকে সহীহ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশা করেছেন। উম্মে দারদা ছিলেন একজন ফকীহ মহিলা তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন (তাই তাঁর দলীল হিসেবে গণ্য)।[২৭৭] তিনি ছিলেন বিবেক বুদ্ধি ও মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও দক্ষতার অধিকারিণী মহিলাদের গোজার এবং মুত্তাকী।[২৭৮]

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা:) এর জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি ফিকহী মাসয়ালার ব্যাপারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা:) ও হযরত উমর (রা:) এর সাথে বিতর্ক করেছেন। ইমাম নববী তার সম্পর্কে লিখেছেন, ফাতেমা বিনতে কায়েস প্রথম যুগে হিজরতকারীদের একজন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী।[২৭৯]

হযরত আনাস (রা:) এর মা উম্মে সুলাইম সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী মহিলা সাহাবী।[২৮০] উম্মে আতিয়া (রা:) সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.) একই মন্তব্য করে.যে, তিনি রাসূল (স.) এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৮১]

---

২৭০. আহমদ ইবন আলী হাজার আল আসকালানী, **আল ইসাবা ফী তামীযিস্ সাহাবা**, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৬০।
২৭১. **ইমাম হাকিম মুসতাদরিক**, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১১; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।
২৭২. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, **তাযকিরাতুল হুফফাজ**, ১ম খন্ড, পৃ: ১০৬; আমরাতা বিন্তে আবদুর রহমান আনসারী ছিলেন বিজ্ঞ ফিক্হবিদ। তিনি হযরত আয়েশা (রা:) এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন এবং তার নিকট থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতি শক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী, তার বর্ণিত হাদিস সমূহ সর্বদা গৃহীত হত। (**শাজারাতুয যাহাব**, ১ম খন্ড, পৃ: ১১৪)।
২৭৩. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, **তাহযীবুত তাহযীব**, ১২শ খন্ড, (ইন্ডিয়া: মজলিশে দায়েরাতুল আল-মা'রেফ, ১৩২৬ হি:), পৃ: ১২৯।
২৭৪. শেহাবুদ্দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, **আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা**, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫৯।
২৭৫. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।
২৭৬. শেহাবুদ্দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, **আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা**, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৭।
২৭৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতুল জুলুস ফীত তাশাহহুদ, ১ম খন্ড, পৃ: ১১৪।
২৭৮. আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব তাযকিরাতু উম্মে দারদা-এর বরাত দিয়ে সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৭।
২৭৯. **তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত**, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৫৩।
২৮০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালেক (রহ.) এর কন্যার জ্ঞান ও মর্যাদার অবস্থা এই ছিল যে, ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যায়নকালে কোথাও ভুল করে ফেললে তিনি ঘর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহ.) এর এতটা আস্থা ছিল যে, করাঘাত শুনে তিনি ছাত্রদের বলতেন, আবার পড়ো তোমরা কোথাও ভুল করছ।[২৮২]

নওফেলের কন্যা উম্মে ওয়ারাকা (রাঃ) ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ভালভাবে কুরআন অধ্যায়ন করেছিলেন। নবী করীম (স.) তার বাড়ীর লোকদের (মহিলাদের) নামাযে তাকে ইমামতি করতে দিয়েছিলেন।[২৮৩]

একবার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একটি মাসয়ালা বর্ণনা করলে উম্মে ইয়াকুব নাম্নী বনী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তার কাছে এসে বললেন, "আমি পুরা কুর'আন মজিদ পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন তা কোথাও পাইনি।"[২৮৪]

সুতরাং ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), এবং হযরত হাসান বসরী (রাঃ), ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম রাযী (রহ.), ইমাম গাযযালী (রহ.) এর মত মহাপুরুষ গণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত শিফা বিন্‌তে আবদুল্লাহ (রাঃ), হযরত কারীমা বিন্‌তে মিকদাদ (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) এবং হযরত রাবে'য়া বসরী (রহ.) এর মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গন্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্ম সংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনী শিক্ষা লাভ করতেন।[২৮৫]

সাহাবীদের যুগে নারীর জ্ঞানচর্চার পরিচয়

রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা সাধনা করেছেন। একইভাবে তারা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা করতেন তাতেও পুরুষদের সাথে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকত। নবী (স.) এর ওফাতের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিত নারীদের নিকট অনেক সাহাবী, তাবেয়ী এবং প্রসিদ্ধ পন্ডিতগণ হাদিস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন।[২৮৬] মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইমাম ইব্‌নে কাইয়ুম (রহ.) বলেন, রাসূল (স.) এর সময়ের যে সব সাহাবার ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশি। এর মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এতো অধিক যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে এক জনের ফতোয়া একত্রিত করলে একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাত জনের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মত ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।[২৮৭]

---

[২৮১]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৪।

[২৮২]. **আল মাদখালু লি ইবনিল হাজ্জ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ২১৫; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।

[২৮৩]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, লেবাস ওয়ায় যিনাহ অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃঃ ২০৪; মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, লেবাস অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৭৯।

[২৮৪]. সুলায়মান ইবনে আশ্‌ আশ, **সুনানে আবু দাউদ**, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইমামাতুন নিসা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৭।

[২৮৫]. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, **নবী (স.) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা**, (ঢাকাঃ ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫), পৃঃ ৭৯-৮১।

[২৮৬]. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, **নারীর অধিকার ও মর্যাদা**, (ঢাকাঃ আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫), পৃঃ ৪৩-৪৬।

[২৮৭]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

ফতোয়া দানকারী সাহাবাদের দ্বিতীয় সারিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উসমানে (রাঃ) এর সাথে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) এর মত মহিলা সাহাবা রয়েছেন।[২৮৮]

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরেক দল সাহাবা ছিলেন। এসব সাহাবাগণের মধ্যে হযরত হুসাইন (রাঃ), আবু যর (রাঃ), আবু উবায়দা (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাগণ। হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), হযরত আফিয়া (রাঃ), লায়লা বিনতে কায়েস (রাঃ), আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ), উম্মে শরীফ (রাঃ), খাওলা বিনতে তাওয়ীত (রাঃ), উম্মে দারদা (রাঃ), আতেকা বিনতে যায়েদ (রাঃ), সাহলা বিনতে সুহাইল (রাঃ), হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ), হযরত ময়মূনা (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ), যয়নব বিনতে উম্মে সালামা (রাঃ), উম্মে আয়মন (রাঃ), উম্মে ইউসুফ (রাঃ) এবং গামেদিয়া (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত।[২৮৯]

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট-বড়, নারী-পুরুষ এবং কাছের ও দুরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ্‌র এসব মহীয়সী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) এর জ্ঞান ভান্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে হযরত সাফিয়া (রাঃ) এর খিদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কূফার কিছু সংখ্যক মহিলা পূর্বেই তার খিদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় এবং হায়েয ও নিফাযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এভাবে কত জায়গার কত মানুষ যে তাঁর নিকট হতে শত শত মাসআলা জেনে নিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।"[২৯০]

আমেরা বিনতে আব্দুর রহমানের বর্ণিত হাদীসমূহ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের দৃষ্টিতে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি তা লিখে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৯১] মারওয়ান একটি বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে বলেন, আমাদের মধ্যে নবী (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ বর্তমান থাকতে কোন বিষয়ে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেন? তাই তিনি লোক মারফত হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সে সমস্যার সমাধান দেন।[২৯২]

সাহাবীগণের ইলমী মত পার্থক্য দূরীকরণে নবী করীম (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইব্‌নে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, "সাহাবীগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী করীম (স.) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।"[২৯৩]

হযরত রাবী মু'আওয়ায (রাঃ) একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ও কখনো তাঁর নিকট হাযির হতেন।[২৯৪] হযরত রুবায় নবী করীম (স.) থেকে ২১ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৯৫]

---

[২৮৮]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

[২৮৯]. ইবনুল কাইয়্যেম আল জাওজিয়া, **ইলামুল মুয়াককিয়ীন**, ১ম খন্ড, (কুর্দীঃ মাতবা'আ ফায়জুল্লাহ আল কুর্দী, ১৩২৫ হিঃ), পৃঃ ৯-১১।

[২৯০]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, **মুসনাদ**, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৩০।

[২৯১]. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তবকাতে ইবনে সাদ**, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৫৩।

[২৯২]. **মুসনাদে আহমদ**, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩২৩; ইব্‌ন জারীর আত্ তাবারী, **তারীখুর রসুল ওয়াল মুলূক**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭, ইবনে হিশাম, **আস্ সীরাতুন নাবাবিয়াহ**, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫।

[২৯৩]. ইবনুল কাইয়্যুম আল জাওজিয়া, **যাদুল মা'আদ**, ৪র্থ খন্ড, (রিয়াদঃ দারুস সালাম, তা.বি.), পৃঃ ২২১।

[২৯৪]. ইব্‌নে আবদুল বার, **আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব**, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩৭।

[২৯৫]. হযরত রুবাই (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইব্‌নে ইয়াসার, আবূ সালামা ইব্‌নে আবদুর রহমান, নাফে, উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইব্‌নে যাকওয়ান, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৯৬] উম্মে আতিয়া (রাঃ) একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। ইল্ম ও ফযিলতের দিক থেকে তিনি অধিক জ্ঞানী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ হাদীস রিওয়ায়াতের দিক দিয়ে তাঁকে পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের মধ্যে চতুর্থ তবকার মানুষ বলে গণ্য করেছেন। মাইয়্যিতের (মৃতব্যক্তি) গোসল দেয়া, মহিলাদের জানাযায় যাওয়া এবং ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[২৯৭]

হযরত সা'আদ ইব্নে আবূ ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা (রাঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ূব সুখতিয়ানী এবং হাকাম ইব্নে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[২৯৮] ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) হযরত হাসান (রাঃ) এর নাতনী সাই'য়ীদা নাফিসা (রাঃ) এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[২৯৯] উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম নারীর শিক্ষা লাভের বাধা দুর করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতির দ্বার উন্মোচন করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলকে সমানভাবে সম্পৃক্ত করেছে, উৎসাহিত করেছে এবং তাগাদা দিয়েছে। সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই সমগ্র মুসলিম নারী জাতিকে জ্ঞানার্জনের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। স্বর্ণযুগের মুসলিম মহিলাদের মত বর্তমান যুগেও মুসলিম মহিলাদের সমাজ ও সভ্যতা নির্মানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে এবং বিজ্ঞানের এই যুগে এ কাজ তখনই সম্ভব হবে যখন মুসলিম নারীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে থাকবে। মুসলিম নারীর শিক্ষায় সূচনা হয়েছিল মসজিদে নববীতে মদীনায়। সেখানে নারীরা শিক্ষা লাভ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে এবং ইসলামকে পৃথিবীতে সুদৃঢ় করতে অবদান রেখেছিলেন।[৩০০]

ইব্নে আকীল, আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইব্নে ইয়াসির (রাঃ) প্রমুখ রয়েছেন। (আল্লামা ইবনুল আসীর, **উসুদুল গাবা ফী মা' রিফাতিস্ সাহাবা**, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি. পৃঃ ৪৫২)।

[২৯৬]. হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইব্নে মুহাম্মদ (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাঃ), উরওয়া ইব্নে যুবায়ের (রাঃ) এবং আবূ সালামা ইব্নে আবদুর রহমান (রাঃ) এর মত সাহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সালমান বিন ইয়াসির এবং শা'বীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবিঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন। (তালিবুল হাশেমী, **মহিলা সাহাবী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫; ইব্ন হাজার আল আসকালানী, **তাহযীবুত তাহযীব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৪)।

[২৯৭]. তালিবুল হাশেমী, **মহিলা সাহাবী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬। উম্মে আতিয়া (রাঃ) সম্পর্কে আল্লামা ইব্নে আবদুল বার (রহ.) লিখেছেন, "তিনি নবী করীম (স.) এর কন্যার জানাযায় গোসলে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূলভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবি'য়ী আলিমগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইব্নে মালেক, মুহাম্মদ ইব্নে সীরিন এবং হাফসা বিন্তে সিরীন (রাঃ) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।" (ইব্ন আবদুল বার, **আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব**, ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪৭)।

[২৯৮]. ইব্নে হাজার আল আসকালানী, **তাহযীবুত্ তাহ্যীব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৬।

[২৯৯]. ইবনে খল্লিকান, **ওয়াফাতুল আ'ইয়ান**, ২য় খন্ড, (মিশরঃ আল মাতবা আতুল আমীরিয়াহ, ১২৮৩ হি), পৃঃ ১২৯।

[৩০০]. একজন মুসলিম নারী ধর্মীয় জ্ঞানার্জনসহ সমসাময়িক জ্ঞান অর্জন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতিবাদ করার জন্য সব রকমের জ্ঞান ভালভাবে রপ্ত করে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও বিষবৃক্ষ সমূলে উপড়ে ফেলার মাধ্যমে নারী তার পরিবারের সুষ্ঠ পরিচালিকা হবে। নিজের অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে তবেই ইসলামী পরিবার সুখী পরিবারে পরিণত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী প্রগতি

ইসলাম ইবাদতের ক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের সমান সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। তাই রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে অংশগ্রহণ করতেন। এবং নারীদের ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে রাসূল (স.) উৎসাহিত করতেন। নিম্নে এ সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ উপস্থাপন করা হলো:

মসজিদ ভিত্তিক কর্মকান্ডে নারী প্রগতি

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সালাত। পবিত্র কুর'আনে ৮২ জায়গায় সালাত কায়েম করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। আর এই সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করা নি:সন্দেহে একটি উত্তম কাজ এবং মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য শরীয়তে বারবার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। পুরুষের জন্য মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের জন্য উত্তম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পুরুষের জন্য মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের তাগিদ থাকলেও নারীদের জন্য ততটা তাগিদ প্রদান করা হয়নি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করাকে মেয়েদের জন্য ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছে। মসজিদে গিয়ে কোন নারী সালাত আদায় করতে চাইলে রাসুল (স.) বাধা দিতে নিষেধ করে বলেছেন, "আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করো না, তোমাদের মধ্যে কারো স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তবে তাকে বাধা দিও না।"[৩০১] রাসূল (স.) আরও বলেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি প্রদান করবে।"[৩০২] হযরত ওমর (রা:) এর স্ত্রী মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতেন কিন্তু হযরত ওমর (রা:) বাধা দিতেন না কারণ রাসূল (স.) নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।[৩০৩]

ফরজ নামায

রাসুল (স.) এর সময়ে মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে বিশেষ করে ফজর, মাগরিব এবং এশার নামাজে মসজিদে হাজির হতেন। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুমিন নারীরা মাথা ও শরীরে চাদর জড়িয়ে রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ফজরের নামাযে শরীক হতো এবং নামায শেষে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতো। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চেনা যেতো না।"[৩০৪] ইবনে উমর (রা:)

---

৩০১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাত অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ: ১৮৩; মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জুম'আ অধ্যায়, ১ম খন্ড, (দিল্লী: রশিদিয়া কুতুবখানা), পৃ: ১২৩।

৩০২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আবওয়াবুস সিফাতিস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: রাতে ও ভোরের অন্ধকারে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৯২; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মেয়েদের মসজিদে যাওয়া..., ২য় খন্ড, পৃ: ৩২।

৩০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হযরত উমরের এক স্ত্রী ফজর ও এশার নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। তাকে বলা হলো, তুমি জান যে, উমর (রা:) তোমার একাজ পছন্দ করেন না এবং এতে তাঁর মর্যাদাবোধ আহত হয়, তা সত্ত্বেও তুমি মসজিদে যাও কেন? জবাবে তাঁর স্ত্রী বললেন, আমাকে নিষেধ করতে তাঁর বাধা কোথায়? 'আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।' রাসূল (স.) এর এই বাণী তাঁকে নিষেধ করতে বাধা দেয়।" (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মেয়ে, শিশু এবং মসজিদে গমনকারী অন্যদের কি গোসল করতে হবে? ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৪)।

৩০৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ফজরের সময়, ২য় খন্ড, পৃ: ১৯৪; সহীহ মুসলিম, মসজিদে ও নামাযের স্থান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: সকালে তাকবির দেয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ১১৮। এই হাদীসে রাসূল (স.) এর উক্তি 'মুমিন নারীরা' কথার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এখানে কথাটি ছিল সম্মানিতা মুমিন নারীরা বা অনুরূপ। বলা হয়েছে যে, এখানে নারীগণ বলতে মর্যাদাসম্পন্ন নারীদের বুঝানো হয়েছে। যেমন, কওমের পুরুষগণ বললে তার অর্থ হয় সম্মানিত পুরুষগণ। (**ফাতহুল বারী**, ২য় খন্ড, পৃ: ১৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমরের এক স্ত্রী মসজিদে জামায়াতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতেন...।"[৩০৫]

জুমআর নামায

জুমআর নামাযের ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, "হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিনের সালাতের জন্য যখন আহবান জানানো হবে, তখন আল্লাহর জিকিরের জন্য ধাবমান হও এবং বিক্রয় পরিত্যাগ কর।"[৩০৬] আল কুর'আনের এই আয়াতটিতে পুরুষ অথবা নারীকে আলাদাভাবে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং ঈমানদারদের সম্বোধন করা হয়েছে। আর ঈমানদার ব্যক্তি পুরুষ হতে পারে আবার নারীও হতে পারে। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, ঈমানদার পুরুষের মত ঈমানদার নারীরও জুম'আর সালাতে শরীক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে উল্লেখিত কথাটি আরো সুস্পষ্টভাবে সমর্থিত হয়। রাসূল (স.) বলেন, "জুমআ তার উপরই, যে আযান শুনেন।" আর এই আযানের ধ্বনি যে পুরুষের মত মেয়েদেরও কানে পৌঁছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।[৩০৭] তবে জুমআর নামাজ মেয়েদের জন্য ইচ্ছাধীন। ইমাম আবু দাউদ সাহাবী তারিক বিন সাহাব (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, "জুম'আ প্রকৃতই জামাত সহ প্রত্যেক মুসলমানের পালন করা কর্তব্য। কিন্তু অধীনস্থ দাস, নারী, ছোট ছেলে মেয়ে এবং রুগ্ন ব্যক্তি এই নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত।"[৩০৮]

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে (জুমআর) নামায পড়ছিলাম এমন সময় খাদ্য সম্ভার নিয়ে একটি কাফেলা এসে পৌঁছল। প্রায় সবাই কাফেলার কাছে চলে গেলো। এমনকি বার জন পুরুষ ছাড়া আর কেউই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে থাকলো না।[৩০৯] তখন নাযিল হলো, "আর যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা হতে দেখলো, তখন তোমাকে একাকী রেখে সেদিকে ছুটে গেল।"[৩১০] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন .....আবু কাতাদা (রা:) থেকে সহীহ সনদে তাফসীরে তাবারী ও ইবনে আবী হাতেমে বর্ণিত হয়েছে। আবু কাতাদা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কয়জন আছো? তারা নিজেদেরকে গণনা করে দেখলেন যে, নারী ও পুরুষ মিলে সর্বমোট বারোজন রয়েছেন।"[৩১১] সুতরাং উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত যে, রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন এবং ইসলামে মসজিদে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নারীদের কোন বাধা নেই।

আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রা:) তাঁর এক বোন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি 'ক্বাফ, ওয়াল কুর'আনিল মাজিদ' সূরাটি জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ (স.) এর মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমআর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সুরাটি পড়তেন।"[৩১২]

---

[৩০৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জুমআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেয়ে, শিশু এবং মসজিদে গমনকারী অন্যদের কি গোসল করতে হবে? ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪।
[৩০৬]. আল কুর'আন, **সুরা আল জুম'আ**, আয়াতঃ ৯।
[৩০৭]. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব আত তিবরিজি, **মেশকাতুল মাসাবিহ**, জুমআ অধ্যায়, পৃঃ ১২১।
[৩০৮]. প্রাগুক্ত।
[৩০৯]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জুমআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ লোকেরা যখন জুমআর নামায এড়িয়ে চলতে চায়, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৭৫; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জুমআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী (ওয়া ইযা রাআও তিজারাতান আও লাহওয়ানিন ফাদ্দ ইলাইহা), ৩য় খন্ড, পৃঃ ১০।
[৩১০]. আল কুর'আন, **সুরা আল জুম'আ**, আয়াতঃ ১১।
[৩১১]. **ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৭৬।
[৩১২]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জুমআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নামায ও খুতবার পরিসর কমিয়ে আনা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩। উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা উবনুন নু'মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দুই বছর অথবা এক বছর অথবা এক বছরের কিছু সময় পর্যন্ত আমাদের ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর চুলা এক ছিল। 'ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরাটি আমি রসূলুল্লাহ (স.) এ মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমআর দিন খুতবা দানের সময় মিম্বরে দাঁড়িয়ে সুরাটি পাঠ করতেন।" (প্রাগুক্ত)। তাবাকাতুল কুবরার অন্য একটি রেওয়ায়েতে খাওলা বিনতে কায়েস আল-জুহানিয়া থেকে বর্ণিত

Dhaka University Institutional Repository

নফল নামায

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন দুটি খুঁটির মাঝে একটি রশি টাঙানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে এ রশি কেন? সবাই বললো, এটা যয়নাবের জন্য বাঁধা রশি। নামায পড়ার সময় যখন সে ক্লান্তি বা আলস্যে আক্রান্ত হয়, তখন এই রশির ওপর ঝুলে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, এ রশি খুলে ফেল। তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়বে যতক্ষণ সে ক্লান্তি ও আলস্যহীন থাকবে। যখনই সে ক্লান্তি ও আলস্যে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, তখনই বসে পড়বে....।"[৩১৩] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীসে....মসজিদে মেয়েদের নফল নামায পড়ার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে।[৩১৪]

ইমাম মালেক ইসমাঈল ইবনে হাকীম (রহ.) থেকে তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্ল-াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলার রাতের বেলা নামায পড়ার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলা কে? তাঁকে বলা হলো, এ হচ্ছে হাওলা বিনতে তুয়াইব। সে রাতে ঘুমায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ কাজ অপছন্দ করলেন। এমনকি পছন্দ না করার অভিব্যক্তি তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠলো। তিনি বিরক্ত ও অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ বিরক্তি বোধ করেন না। যতটা কাজের সামর্থ ততটা কাজ নিজের ওপর চাপিয়ে নাও।[৩১৫]

তারাবীহর নামায

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ...উরওয়ার মাধ্যমে সাঈদ ইবনে মানসূর বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাঃ) রমযানে তারাবীহর সালাত আদায়ের জন্য লোকজনকে উবাই ইবনে কা'বের কাছে একত্র করেন। তিনি পুরুষদের (তারাবীহর) নামাযে ইমামতি করতেন এবং তামীম আদ-দরী মেয়েদের (তারাবীহর) নামাযে ইমামতি করতেন।[৩১৬]

ইমাম নববী তাঁর "মাজমু" গ্রন্থে আরফাজাহ সাকাফী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) রমযান মাসে মানুষকে তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মেয়েদের জন্য একজন ইমাম নিয়োগ করতেন। আমি নিজে ছিলাম মেয়েদের ইমাম।[৩১৭]

আবু দাউদ (রাঃ) কর্তৃক আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, ...তারপর তৃতীয় রাত হলে (অর্থাৎ রমযান মাসের তিন রাত অবশিষ্ট থাকতে) তাঁর পরিবারের লোকজন, স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য লোকেরা সমবেত হলে তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন, (এবং কিরাআত এত দীর্ঘ করলেন যে) আমরা কল্যাণ হারিয়ে ফেলবো বলে আশংকা করলাম।[৩১৮৪০] নাসায়ীর একটি রেওয়ায়েতে আছে, রমযান মাসের তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে তিনি তাঁর কন্যা ও স্ত্রীগণকে ডেকে পাঠালেন এবং লোকজনকে একত্রিত

হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি জুময়ার দিন মেয়েদেরে পেছনের সারিতে বসে রসূলুল্লাহ (স.) এর খুতবা শুনতাম এবং মসজিদের শেষের দিকের সারিতে বসে তাঁর 'সূরা ক্বাফ' ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' পাঠ শুনতাম। তিনি মিম্বরে উঠে সুরাটি পাঠ করতেন। (ইবনে সা'দ, **আত তাবাকাতুল কুবরা**, ৮ খন্ড, পৃঃ ২৯৬)।

[৩১৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, তাহাজ্জুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বনকে অপছন্দ করা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৮; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাতুল মুসাফিরীন অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ তন্দ্রা এলে নামায পূর্ণ করে শয়ন করার অনুমতি, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৯।

[৩১৪]. **ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৯।

[৩১৫]. **আল-মুয়াত্তা**, রাতের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ রাতের নামায প্রসংগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৮।

[৩১৬]. **ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৬।

[৩১৭]. **কিতাবুল মাজমু শারহুল মুহায্‌যিব**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫২৮।

[৩১৮]. **ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন, এমনকি আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করলাম। দাউদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কল্যাণ কি?" তিনি বললেন, সাহরী।[৩১৯]

নযর বা মানতের নামায

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক মহিলা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে বললো, আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থতা দান করেন, তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে সফরে বের হবো এবং বায়তুল মাকদাসে নামায পড়বো। সে সুস্থতা লাভ করলে সফরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তারপর সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী মায়মুনার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাল্লাম দিয়ে এ বিষয়ে অবহিত করলো। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, তুমি এখানেই থেকে যাও। যা কিছু পাথেয় সংগ্রহ করেছো তা খাও এবং রসূলুল্লাহ (স.) এর মসজিদে নামায পড়। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।"[৩২০]

জানাযার নামায

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের ইনতিকাল হলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ তাঁর মরদেহ মসজিদে নিয়ে আসতে এবং মসজিদের নিকটবর্তী মাকায়েদের[৩২১] পার্শ্বের বাবুল জানায়েয দিয়ে বের করে নিতে বললেন, যাতে তাঁরাও জানাযা পড়তে পারেন। কাজেই রসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ কর্তৃক তাঁর জানাযা পড়ার জন্য তাঁদের হুজরার সামনে তাঁর মরদেহ এনে রাখা হলো এবং তাঁরা জানাযা পড়লেন। পরে তাঁরা জানতে পারলেন যে, লোকেরা এটাকে দূষণীয় মনে করেছে এবং বলেছে যে, মরদেহ কখনো মসজিদের ভিতরে নেয়া হতো না। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে বললেন, অজানা বিষয়ের সমালোচনা করতে মানুষ কত তাড়াহুড়া করেছে। অথচ রসূলুল্লাহ (স.) সুহাইল ইবনে বাইদার জানাযা মসজিদের অভ্যন্তরে পড়েছিলেন।[৩২২] সারাখসীর মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে, "জানাযার নামাযে মেয়েরা পুরুষদের পেছনে কাতার করবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মেয়েদের জন্য উত্তম কাতার হচ্ছে শেষের কাতার।"[৩২৩]

সূর্যগ্রহণের নামায

আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার কাছে গেলাম। সে সময় লোকজন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, কি ব্যাপার, লোকজন নামায পড়ছে? তিনি মাথা দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন (অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের প্রতি)। আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দ্বারা ইশারা করে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) নামায খুব দীর্ঘ করলেন। এমনকি আমার সংজ্ঞা লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত মুসলিমের

---

[৩১৯]. **ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৯।

[৩২০]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত, ৪ খন্ড, পৃঃ ১২৬।

[৩২১]. মাকায়েদ হচ্ছে মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী একটি জায়গা, যেখানে মুসল্লিরা অযু করার জন্য বসতেন।

[৩২২]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৩। ইমাম নববী এ হাদীসের সাথে সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ (স.) এর জানাযা সম্পর্কে বলেছেন...। জমহুরের মতটিই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ তারা সবাই একা একা রাসূল (স.) এর জানাযা পড়েছিল। একদল করে লোক প্রবেশ করতো এবং প্রত্যেকে একা জানাযা পড়ে বেরিয়ে আসতো। তারপর আরেক দল প্রবেশ করতো এবং অনুরূপভাবে জানাযা পড়ে বেরিয়ে আসতো। তারপর পুরুষরা প্রবেশ করে জানাযা পড়ে এবং তারপর মেয়েরা এবং সর্বশেষে শিশুরা নামায পড়ে বেরিয়ে আসে।"(বিস্তারিতঃ ইমাম নববী লিখিত মুসলিমের শরাহ গ্রন্থ, ৭ খন্ড, পৃঃ ৩৬।) ইমাম মালেক ইবনে আনাসের মুদওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মালেকের উক্তি অনুসারে কি মেয়েরা নামাযে জানাযা পড়তে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮৮)।

[৩২৩]. বিস্তারিতঃ ইমাম নববী লিখিত মুসলিমের শরাহ গ্রন্থ, ২ খন্ড, পৃঃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে প্রচন্ড গরমের দিনে রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবাদের সাথে নিয়ে এত দীর্ঘ কিয়াম করে নামায পড়লেন যে, তারা বেহুশ হয়ে পড়ে যেতে থাকলেন।[৩২৪] হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমার পাশেই একটি চামড়ার মশকে পানি ছিল। আমি সেটি খুলে আমার মাথায় পানি ঢালতে শুরু করলাম। (মুসলিমের অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, তিনি দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি বসে পড়তে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি দুর্বল মহিলাটির প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে বললাম, এ তো আমার চেয়ে দুর্বল। অতএব আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। এরপর তিনি রুকু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। তারপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই সময় যদি কোন মানুষ আসতো তাহলে সে মনে করতো যে, তিনি রুকু করেননি) তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) নামায শেষ করলেন, তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি সবার সামনে বক্তব্য পেশ করলেন কিছু সংখ্যক আনসার মহিলা শোরগোল করতে থাকলে আমি তাদেরকে থামাতে মনোযোগী হলাম.....।"[৩২৫]

সূর্যগ্রহণের নামাযের ওপর কিয়াসের ভিত্তিতে মেয়েরা চন্দ্রগ্রহণের নামাযেও অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অনুরূপ "সালাতুয যালযালা" (ভূমিকম্পের নামায) "সালাতুর রীহ" (ঝড়ের নামায) এবং "সালাতুল ইসতিসকা" (ইসতিসকার নামায) ইত্যাদি নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারবে।[৩২৬]

---

[৩২৪]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাতুল ইসতিসকা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কাসূফের নামাযে নবীর সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা উপস্থাপন করা হয়, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩০।

[৩২৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ খুতবার সময় আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মা বা'দ' বলা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ইসতিসকা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় নবী (স.) এর সামনে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৩। 'পুরুষদের সাথে মেয়েদের সূর্যগ্রহণের নামায পড়া' শীর্ষক অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ.) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, পুরুষদের সাথে মেয়েদের নামায পড়তে যারা নিষেধ করে এবং বলে যে, মেয়েরা একা একা নামায পড়বে এই অনুচ্ছেদের শিরোনাম রচনা করে ইমাম বুখারী তাদের মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। (**ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৯৭)।

[৩২৬]. ইবনে রুশদ বলেছেন, (...সূর্যগ্রহণ ক্ষেত্রে যেভাবে নামায পড়া হয় চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে হবে বলে ইমাম শাফেয়ী মত প্রকাশ করেছেন। আহমদ, দাউদ, ও একদল মনীষী তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। কেননা, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কারো জীবনে বা মৃত্যু তাদের গ্রহণের কারণ নয়। তাই গ্রহণ হতে দেখলে গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, নামায পড়বে এবং সাদকা করবে।"(**সহীহ বুখারী**, ও **সহীহ মুসলিম**)। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় নামাযের নির্দেশ থেকে একটি অর্থই) বোঝা যায় অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে নামায পড়া। ইমাম শাফেয়ী সূর্যগ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ (স.) এর নামায পড়ার কাজটিকে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায পড়ার যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন, "কিছু সংখ্যক আলেম সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ওপর 'কিয়াস' করে ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা, অন্ধকার প্রভৃতি নিদর্শনের সময় নামায পড়া উত্তম মনে করেন। কেননা, এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স.) এর উক্তি রয়েছে, যাতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঐসব নিদর্শন হওয়াটাই কারণ ('ইল্লাত')। তাদের মতে এটি কিয়াসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণী। কেননা, এটা সেই ইল্লাতকেই কিয়াস করা হয় নসে যার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও একদল মনীষী তা মনে করেন না। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, কেউ যদি ভূমিকম্পের নামায পড়ে তবে তা উত্তম। কিন্তু না পড়লে তাতে দোষ নেই। ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সূর্যগ্রহণের নামাযের নিয়মে ভূমিকম্পের নামায পড়েছেন ....।" ইবনে রুশদ আরো বলেছেন, ইসতিসকার নামাযের জন্য জনপদের বাইরে যাওয়া এবং বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া ও কাকুতি-মিনতি করা রসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক বিধিবদ্ধকৃত সুন্নত। তবে তারা ইসতিসকার নামাযের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন.......অধিকাংশ উলামার মতে ইসতিসকার নামাযের জন্য বের হওয়া সুন্নাত।..... রসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক ইসতিসকার নামায পড়া সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হাদীসটি উবাদা ইবনে তামীম কর্তৃক তার চাচা থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'জমহুর' অর্থাৎ অধিকাংশ উলামা এ হাদীসটিকে এতদসম্পর্কিত দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে, "রসূলুল্লাহ (স.) লোকদের সাথে নিয়ে ইসতিসকার নামায পড়তে বের হলেন। তিনি উচ্চস্বরে কিরাআত করে দুই রাকাত নামায পড়লেন। দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠালেন, চাদর পাল্টালেন, কিবলামুখী হলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন"। (**সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম**।) 'ইসতিসকার নামায পড়া সুন্নাত' এ মতের সমর্থকগণ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইসতিসকার নামাযে খুতবা দানও সুন্নাত। কারণ সাহাবাদের কার্যক্রমে তা উল্লেখিত হয়েছে। ইবনুল মুনযির বলেছেন, এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ (স.) ইসতিসকার নামায পড়েছেন এবং খুতবা দিয়েছেন। (**বিদায়াতুল মুজতাহিদ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫৫, ১৫৬)।

Dhaka University Institutional Repository

ঈদের নামায

ঈদ মুসলমান জাতির এক বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর দুইবার এই ঈদ পালিত হয়। একটি ঈদুল ফিতর ও অপরটি ঈদুল আযহা। ঈদের জামাতে অধিক পরিমাণে লোক জমায়েত হয় বলে অধিকাংশ স্থানে ঈদের নামায খোলা মাঠে আদায় করা হয়। রাসূল (স.) এর সময়ে ঈদের মাঠে পুরুষের সাথে মহিলারাও হাযির হতেন এবং জামায়াতে সালাত আদায় করতেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা:) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) সাহাবীদ্বয় থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, "নবী করীম (স.) ঈদুল ফিতরের দিন সালাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে সালাত আদায় করে পরে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ করে তিনি নামলেন এবং মহিলাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নসীহত করলেন। তখন তিনি বেলাল (রা:) এর হাতের উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। বেলাল (রা:) নিজের কাপড় বিছিয়ে দিলেন, আর মেয়েরা তার মধ্যে সদকার দ্রব্যাদি ফেলছিলেন।"[৩২৭] এই হাদীসটিতে ঈদের মাটে বহুসংখ্যক নারীর উপস্থিতি প্রমাণ করে।

রাসূল (স.) ঈদের মাঠে নারীদের উপস্থিত হতে তাগিদ প্রদান করতেন। হযরত হাফসা বিনতে সিরিন (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুমারী তরুণীদেরকে ঈদের দিন বাইরে বের হতে বাধা দিতাম, এমন সময় বনি খালফের প্রাসাদে একজন মহিলা উপস্থিত হলেন। আমি তার নিকট গেলাম। মহিলাটি বললেন যে, তার ভগ্নিপতি বারোটি জিহাদে রাসূল (স.) এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছয়টি জিহাদে তাঁর বোনও শরীক ছিলেন। তাঁর বোন বলেছেন, আমরা রোগীদের দেখাশুনা করতাম এবং জখমী লোকদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করতাম। এক সময় তাঁর বোন রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসুল, যদি আমাদের কারো গায়ের ওড়না না থাকে, তাহলে কি তার বের না হওয়া অপরাধীর মধ্যে গণ্য হবে? রাসূল (স.) জবাব দিলেন, প্রত্যেকেরই আপন আপন সহচরীগণকে ওড়না দ্বারা আচ্ছাদন করা উচিত যাতে তারা মঙ্গলজনক কাজে এবং মুমিনদের প্রার্থনায় (দোয়ায়) শামিল হতে পারে। হাফসা (রা:) বলেন, এরপর যখন মহিলা সাহাবী উম্মে আতিয়া (রা:) বসরাতে এলেন, আমি তার নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূল (স.) এর নিকট এ ধরণের কথা শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমার আব্বার শপথ। উম্মে আতিয়া (রা:) এর অভ্যাস ছিল যখনই তিনি রাসূল (স.) এর বিষয়ে কিছু বলতে চাইতেন, তখনই আমার আব্বার শপথ-এই কথাটি বলতেন। তিনি বললেন, তিনি বলে দিয়েছিলেন-অন্তপুরবাসিনী কুমারী মেয়েলোক এবং ঋতুবতী সকলেই যেন বের হয়। ঋতুবতী মেয়েরা ঈদগাহর একপাশে থাকবে এবং মঙ্গলজনক কাজ ও মুমিনদের দোয়ায় (প্রার্থনা) শামিল হবে। হাফসা (রা:) বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে উম্মে আতিয়া (রা:) কে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী মেয়েরাও বের হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেন তারা কি আরাফাতের ময়দানে হাজির হয় না এবং অমুক অমুক জায়গায় (মীনা, মুযদালিফা ইত্যাদি স্থান) উপস্থিত থাকে না?[৩২৮]

উপরোক্ত হাদীসটিতে কুমারী মেয়েদের ঈদের ময়দানে হাজির হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, বয়স্কা মেয়েদের বের হওয়ার ব্যাপারে কোনদিনই আপত্তি ওঠেনি। হাফসা (রা:) বলেছেন, আমরা আমাদের তরুণীদের ঈদের দিনে বের হতে বাধা দিতাম। তা থেকে এই বুঝা যাচ্ছে যে, হাফসা ও তার সমবয়সী মেয়েরা সবসময়েই বের হতেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল তরুণীদের বের হওয়ার ব্যাপারটিকেই তারা সমর্থনযোগ্য মনে করেননি, কিন্তু পরে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং কুমারী মেয়েদের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, উল্লিখিত হাফসা (রা:) হচ্ছেন একজন তাবেয়ী। সুতরাং সাহাবাদের সময়ের পরে তাবেয়ীদের সময়েও যে নারীরা ঈদগাহে যেতেন- এ থেকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাদীসের অন্য রেওয়াতকারী আসিম বিন সোলায়মান উক্ত হাফসা বিনতে সিরিন (রা:) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আমাদের উপর নির্দেশ ছিল যেন আমরা ঈদের দিনে বাইরে বের হই এবং কুমারীগণকেও

[৩২৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, দুই ঈদের অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ: ১৩৩।
[৩২৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, দুই ঈদের অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ: ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরাল থেকে বের করি, এমনকি ঋতুবতী নারীদেরকেও যেন বাইরে নিয়ে যাই। তারা পুরুষদের পশ্চাতে থাকবে, তাদের তাকবীর ধ্বনির সঙ্গে তাকবীর বলবে, তাদের দোয়ার সঙ্গে দোয়া করবে। ঐ দিনের বরকত ও পবিত্রতার আকাংখা পোষণ করবে।[৩২৯] এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূল (স.) এভাবে ঈদের দিনে সমস্ত মেয়ে লোককে ঈদগাহে বের হওয়ার নির্দেশ দান করেছিলেন। ঈদের সালাতে নারীর অধিকার বিষয়ে নি:সন্দেহে এটা একটা মজবুত দলিল।[৩৩০]

ই'তিকাফ

রসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ই'তিকাফরত অবস্থায় প্রয়োজনে বাড়িতে প্রবেশ করতাম। বাড়িতে অসুস্থ লোকও থাকতো। আমি চলতে চলতেই তার অসুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। ই'তিকাফরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতেন না।"[৩৩১]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে ওফাত দান করেন। তারপর তাঁর স্ত্রীগণও অনুরূপভাবে ই'তিকাফ করতেন।"[৩৩২] হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে তাঁর একজন ইসতিহাযাগ্রস্তা স্ত্রীও ই'তিকাফ করেন। তাঁর রক্তিম ও হলুদ স্রাব হতো। আমরা অনেক সময় তার দাঁড়ানোর স্থানে পানির পাত্র রেখে দিতাম আর তিনি ঐ অবস্থায়ই নামায পড়তেন।"[৩৩৩]

মসজিদের খেদমত করা

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত (বুখারী একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আমার জানা মতে সে ছিল একজন মহিলা)।[৩৩৪] সে মারা গেল। রসূলুল্লাহ (স.) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বললো, সে মারা গিয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা তার সম্পর্কে আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি ঐ মহিলার কবরের পাশে গেলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন (বা তার জানাযা পড়লেন)"[৩৩৫]

---

৩২৯. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, দুই ঈদের অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ: ১৩২।

৩৩০. আবু বকর, ইবনে ওমর, উরওয়া, কাসেম, ইয়াহহিয়া ইবনে সাঈদ আন-আনসারী এবং আবু ইউসুফের মতে, ঈদের জামাতে সাধারণ মানুষের সাথে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৈধ। (বদরউদ্দীন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আর-আইনী **'উমদাতুল ক্বারী' দারুল ইযাহইয়া আত-তুরাস আল আরবী**, লেবানন, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৭২)।

৩৩১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ঋতুবর্তী মহিলা কর্তৃক স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া ও চিরুনি করা, ১ম খন্ড, পৃ: ১৬৭।

৩৩২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, তারাবীর নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: (রমযানের) শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করা, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৭৭; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ই'তিকাফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৭৫।

৩৩৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, তারাবীর নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ইসতিহাযাগ্রস্তা নারীর ই'তিকাফ, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৮৬।

৩৩৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মসজিদের খাদেম, ২য় খন্ড, পৃ: ১০০।

৩৩৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মসজিদে ঝাড়ু দেয়া এবং খড়কুটা, ময়লা তুলে ফেলে দেয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৯৯; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কবরের ওপর জানাযা পড়া, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫৬। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করে অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত করার জন্য মানত করছি। এভাবে তিনি মহান আল্লাহর বাণী, "(যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছেন, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে তা আমি একান্ত তোমার জন্য মানত করলাম! তুমি আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ কর।)" এর প্রতি ইংগিত করছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, ...ইবনে খুযায়মা 'আলা ইবনে আবদুর রহমান ও তার পিতা আবদুর রহমানের মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মসজিদের খেদমতের জন্য যাকে মানত করা হয়েছিল সে ছিল একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিল না। বায়হাকী হাসান সনদে ইবনে বুরাইদার মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত মহিলার নাম রাখা হয়েছিল উম্মে মিহজান। তিনি আরো বলেছেন, 'একান্তভাবে' শব্দটির অর্থ 'স্বাধীনভাবে'। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, তাদের শরীয়তে সন্তানকে 'সযর' করা বৈধ ছিল। একথাটি উল্লেখের পেছনে

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের মসজিদে নিদ্রা যাওয়া

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরবের একটি গোত্রের একটি কৃষ্ণাঙ্গ বাঁদী ছিল। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। আয়েশা (রা:) বলেন, তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু অথবা পশমের তৈরী অনুচ্চ ছোট কক্ষ ছিল। তিনি বলেন, সে আমার কাছে আসতো এবং আলাপ-আলোচনা করতো"[৩৩৬]

হাফেজ ইবনে হাজার আরো বলেছেন, আয়েশা বর্ণিত হাদীস থেকে একথাও বুঝা যায় যে, নারী বা পুরুষ যে সব মুসলমানদের বাড়ি-ঘর নেই, ফিতনা মুক্ত থাকতে পারলে-তাদের জন্য মসজিদে রাত্রি যাপন ও দুপুরে নিদ্রা যাওয়া বৈধ।[৩৩৭]

মেয়েদের মসজিদে যাতায়াতের নিয়ম-কানুন

নারীদের মসজিদে যাতাতের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসকল নিয়ম-কানুন মেনে চরারনির্দেশ দেয় তা নিম্নরূপ:

১. মসজিদে যাতায়তকারিণী নারী সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের যে মসজিদে জামায়াতে হাজির হবে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।"[৩৩৮] হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, কোন নারী ধূপের সুগন্ধি ব্যবহার করার পর যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে শরীক না হয়।"[৩৩৯]

২. মেয়েদের কাতারসমুহ পুরুষদের কাতার সমূহের পেছনে থাকবে এবং তাদের মাঝে পর্দা থাকবে না। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা:) থেকে বর্ণিত।....ঘোষণা করা হলো, নামাযের জামায়াত তৈরী। তিনি বলেন, লোকদের সাথে আমিও মসজিদে গেলাম। আমি মেয়েদের সর্বপ্রথম কাতারে ছিলাম। অর্থাৎ পুরুষদের সর্বশেষ কাতারের পেছনের কাতারে.....।"[৩৪০]

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকজনকে সাথে নিয়ে চার সিজদাসহ ছয় রাকাত নামায পড়লেন...তারপর তিনি পিছিয়ে আসলেন। তাঁর পিছনের কাতারগুলোও পিছিয়ে এলো। এমনকি আমরা শেষ প্রান্তে পৌছে গেলাম। ইমাম মুসলিম (রহ.)

ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে খেদমতের মাধ্যমে মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার রীতি শরীয়তে বিধিবদ্ধ ছিল। এমনকি তাদের নিজের সন্তানকে মসজিদের খেদমতের জন্য মানত করার ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। হাদীসের অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে এ ঘটনার সম্পর্ক হচ্ছে, ঐ মহিলা যে নিজেকে মসজিদের খেদমতের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন তা ছিল বৈধ। কারণ রসূলুল্লাহ (স.) তার ঐ কাজ অনুমোদন করেছেন। (**ফাতহুল বারী**, ২য় খন্ড, পৃ: ৯৯-১০০)।

[৩৩৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মসজিদে মেয়েদের ঘুমানো, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৯। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি "মসজিদে মেয়েদের নিদ্রা যাওয়া" অনুচ্ছেদের শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন।

[৩৩৭]. **ফাতহুল বারী**, ২য় খন্ড, পৃ: ৮১।

[৩৩৮]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ফিতনার আশংকা না থাকলে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া এবং সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে যাওয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৩।

[৩৩৯]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ফিতনার আশংকা না থাকলে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া এবং সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে যাওয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৩৪। ইমাম ইবনে দাকীক আল-ঈদ বলেছেন, সুগন্ধির মত ফলাফল বয়ে আনে এরূপ জিনিসও একই পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। সুগন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ তাতে পুরুষের আবেগ ও যৌনাকাংখা উদ্দীপ্ত হয় এবং অনেক সময় তা নারীর সুপ্ত যৌন কামনাকেও জাগিয়ে তোলে। সুতরাং যে জেনে বুঝে এ অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে চায়, সেই সুগন্ধি ব্যবহার করে। (এছাড়া আর কেউ এ অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে না।) উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যে সব অলংকারাদি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাও এরই অন্তর্ভূক্ত। (আহকামুল আহকাম গ্রন্থের ব্যাখ্যা উমদাতুল আহকাম, ১ম খন্ড, পৃ: ৫৬।)

[৩৪০]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ফিতনা (ফিতনাসমূহ) ও কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, ৮ম খন্ড, পৃ: ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এর বরাত দিয়ে শায়খ আবু বকর বলেছেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁরা মেয়েদের কাতারের কাছে পৌঁছে গেলেন..... ।"[৩৪১]

কোন পর্দা রা আড়াল ছাড়া মসজিদের জামায়াতে পুরুষদের পেছনে মেয়েদের নামায পড়া রাসূল (স.) এর প্রদর্শিত হিদায়াতের অন্তর্ভূক্ত।[৩৪২] ইমাম সারাখসী তাঁর মাবসূত গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে যদি দেয়াল থাকে এবং তাতে কোন ছিদ্র না থাকে তাহলে এভাবে ইমামের পেছনে ইকতিদা' জায়েয হবেনা।[৩৪৩] মুদাউওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে আছে, ইবনে কাসেম বলেছেন, আমি ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, একদল লোক মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলো মসজিদের আঙিনা মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এ অবস্থায় তারা যদি মেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়ে ইমামের 'ইকতিদা' করে নামায পড়ে তাহলে তাদের নামায হবে কি? জবাবে তিনি বললেন, তাদের নামায পূর্ণরূপে আদায় হবে এবং তাদেরকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না।[৩৪৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, পুরুষদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট হচ্ছে সর্বশেষ কাতার। আর মেয়েদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কাতার হচ্ছে সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথম কাতার।"[৩৪৫]

পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারের স্থান পেতে আগ্রহী হওয়ার অর্থ হচ্ছে অতি প্রত্যুষে মসজিদে উপস্থিত হওয়া, ইমামের কাছে বসা এবং তাকে পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করা। এগুলো খুবই ভাল কাজ। আর মেয়েদের জন্য অতি প্রত্যুষে মসজিদে যাওয়া কোন কোন সময় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সে বাড়ির তত্ত্বাবধানে শিশুদের দেখা শোনা করে। পুরুষদের কাতারের নৈকট্য তাকে যেমন বিব্রত করে, তেমনি পুরুষকেও বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। এ দুটি দিকের কোনটিই ভাল নয়। তাছাড়া মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে শামিল হওয়ার মর্যাদা তাদেরকে আগে ভাগে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। কিন্তু প্রথম কাতারের মর্যাদার কারণে পুরুষ আগে ভাগে মসজিদে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে নারী তার দায়িত্বে অর্পিত বাড়ির কাজসমূহ সুষ্ঠুভাবে অধিক মাত্রা আঞ্জাম দেয়ার সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশের সময় ভিড় এড়াতেও সক্ষম হয়। এর সাথে যখন ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই এবং পুরুষদের মসজিদ ত্যাগের

---

[৩৪১]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় নবী (স.) এর সামনে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩১।

[৩৪২]. রাসূল (স.) এর এ হিদায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, **প্রথমতঃ** নারী ও পুরুষ একটি স্থানে সমবেত হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে পুরুষদের কাতার থেকে নারীদের কাতার আলাদা হওয়াকে যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে চরম সাবধানতা অবলম্বন অসম্ভব। (আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, **রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, নভেম্বর ২০০২, পৃঃ ২০১)। **দ্বিতীয়তঃ** নারীরা রুকু ও সিজদার ক্ষেত্রে ইমামকে ভালভাবে অনুসরণ করতে পারবে। শুধু তাকবীর শুনতে পাওয়াই যথেষ্ট হবে না। অনেক সময় ইমাম তাকবীর বলেন এবং ভূল করে মধ্যবর্তী 'তাশাহহুদ' এর জন্য না বসেই তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এ ক্ষেত্রে যদি 'মুকতাদী' ইমামকে দেখতে না পান, তাহলে তারা একে 'তাশাহহুদের বৈঠক মনে করে বসে পড়বেন। অনেক সময় ইমাম তাকবীর বলে তিলাওয়াতের সিজদা করেন। সেক্ষেত্রে মুকতাদী ইমামকে না দেখতে পেলে একে রুকুর তাকবীর মনে করে রুকুতে চলে যাবেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসূলুল্লাহ (স.) দেখলেন সাহাবাগণ অনেক পেছনে রয়েছেন। তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা সামনে এসো এবং আমাকে অনুসরণ করো। আর তোমাদের পেছনে যারা আছে, তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে। (মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা ..., ২য় খন্ড, পৃঃ ৩১)। প্রত্যেক কাতারে অবস্থানকারীদের তার সামনের কাতারে অবস্থানকারীদের দেখতে পাওয়া প্রয়োজন। তাহলে প্রত্যেক কাতার সামনের কাতারকে দেখে তার কাজ পুরোপুরি সম্পাদন করতে পারবে এবং এভাবে মেয়েদের প্রথম কাতার পুরুষদের শেষের কাতারকে দেখে তাদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। ইমাম আবু ইসহাক বলেন, কাতারগুলো যদি পরস্পর থেকে দুরে হয় এবং প্রথম কাতার ইমাম থেকে দুরে হয় এবং মাঝখানে কোন আড়াল না থাকে, নামায মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় এবং মুক্তাদী ইমামের নামায সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে আমি মনে করি নামায আদায় হবে। কারণ, মসজিদের প্রতিটি স্থানই জামায়াতের স্থান। (**আল মাজমু শরহে মুহাযযিলিন নববী**, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৯৬)।

[৩৪৩]. **আল মাবসূত**, পৃঃ ১৮৪।

[৩৪৪]. **আল মুদাউওনাহ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৬।

[৩৪৫]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা..., ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই নারীকে অবিলম্বে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হচ্ছে, তখন তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং তার ঘরকন্নার দায়িত্ব বিবেচনা করা হচ্ছে। এভাবে সে সবশেষে মসজিদে গমন করছে এবং সর্বপ্রথম বেরিয়ে আসছে।[৩৪৬]

৩. মসজিদে নারী ও পুরুষদের কাতারের মাঝে কোন হিজাব থাকে না, তাই নারীরা বিলম্বে সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে। সাহল ইবনে সা'দ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা রসূল (স.) এর সাথে নামায আদায় করতো। পরিধেয় ইজার ছোট হওয়ার কারণে তারা তা ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতো। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, শিশুদের মত করে ঘাড়ের সাথে ইজারগুলি বেঁধে রাখতো।[৩৪৭] এ কারণে মেয়েদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, পুরুষরা সিজদা থেকে উঠে ঠিকমত বসার পূর্বে মেয়েরা সিজদা থেকে মাথা তুলবে না।[৩৪৮] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, মেয়েরা সিজদা থেকে মাথা তোলার পরে পুরুষদের গোপন অঙ্গসমুহের কোন কিছু তাদের দৃষ্টিগোচর না হয় সেজন্য তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩৪৯]

বর্তমান সময়ে নারীরা যখন কোন আড়াল ছাড়া পুরুষের পেছনে নামায পড়বে যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে পড়তো, তখন তারা সিজদা থেকে বিলম্বে মাথা উঠাবে, যাতে পাজামা ও পরিধেয় বস্ত্র সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে পুরুষদের গোপন অঙ্গ নারীদের দৃষ্টিগোচর না হয়। কারণ পরিধেয় বস্ত্র সংকীর্ণ বা সংক্ষিপ্ত হলে গোপন অঙ্গের আকৃতি ফুটে ওঠে।

৪. মেয়েরা হাত চাপড়ে শব্দ করবেন এবং পুরুষরা তাসবীহ বলবে। সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, কি ব্যাপার। আমি দেখছি তোমরা অধিক মাত্রায় হাত চাপড়ে শব্দ করছো। নামাযের মধ্যে কেউ কোন বিষয় দেখলে সে তাসবীহ বলবে। কারণ 'তাসবীহ' বললে সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। কেবলমাত্র মেয়েরাই হাত দিয়ে শব্দ করবে।"[৩৫০]

৫. ইমাম মেয়েদের প্রতি দয়ার্দ্র হবেন এবং এশার নামায অবিলম্বে পড়বেন। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এশার নামায পড়তে অধিক রাত করলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত উমর (রা:) তাঁকে ডেকে বললেন! নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন বেরিয়ে এসে বললেন, পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে তোমরা ছাড়া এই নামাযের জন্য আর কেউ অপেক্ষা করছে না। সেই সময় মদীনা ছাড়া আর কোথাও নামায পড়া হতো না। আর অধিক রাতে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর দিগন্তের লালিমা তিরোহিত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়তেন।"[৩৫১]

৬. নারীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের জন্য ইমাম কর্তৃক নামায সংক্ষিপ্ত করা। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি নামায শুরু করার পর তা দীর্ঘায়িত করতে

---

[৩৪৬]. আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, **রসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২।

[৩৪৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কাপড় যদি খাটো হয়, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২।

[৩৪৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামাযে করণীয় সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মুসল্লীকে যদি বলা হয় এগিয়ে এসো অথবা অপেক্ষা করো এবং সে অপেক্ষা করে তাতে ক্ষতি নেই, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩২৮; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের পেছনে নামাযরত মেয়ে নামাযীদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া যে, পুরুষরা সিজদা থেকে মাথা উঠানোর আগে তোমরা মাথা উঠাবে না, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২।

[৩৪৯]. **ফাতহুল বারী**, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯।

[৩৫০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আযান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কেউ ইমামতির উদ্যোগ নেয়ার পর নির্ধারিত ইমাম আগমণ করলে, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৯; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং মেয়েদের হাত চাপড়িয়ে শব্দ করা, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭।

[৩৫১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায পড়ার নিয়ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ রাতের বেলা ও ভোরের অন্ধকারে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯২; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ এশার নামাযের সময় এবং তা বিলম্বে পড়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

চাই। কিন্তু শিশুদের কান্না শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কারণ শিশুর কান্নায় মায়ের চরম মনোকষ্টের কথা আমি জানি। (অপর একটি বর্ণনায় আছে,[৩৫২] তার মায়ের কষ্ট হবে এই আশংকায়।)"[৩৫৩]

৭. মেয়েদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে তাদেরকে পুরুষদের পূর্বে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয়া। হিন্দ বিনতে হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে মেয়েরা ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পরে উঠে পড়তো এবং রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাথে নামায আদায়কারী পুরুষরা বসে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) উঠে পড়লে অন্যরাও উঠে পড়তো। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে,[৩৫৪] উম্মে সালামা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সালাম ফিরানো শেষ করে অল্প সময় বসতেন। তখন মেয়েরা তাঁর স্থান ত্যাগের পূর্বে উঠে পড়তো। ইবনে শিহাব যুহরী (রাঃ) বলেন, তালহা (রাঃ) সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তবে আমি মনে করি, মেয়েরা যাতে চলে যেতে পারে এবং পুরুষরা তাদের সাথে মিশে না যায় সেজন্য তিনি অপেক্ষা করতেন।"[৩৫৫]

৮. মসজিদে নারী ও পুরুষদের মধ্যে আদান প্রদানে ক্ষতি নেই।

পুরুষের নারীকে দেখা এবং নারীর পুরুষকে দেখাঃ রাসূল (স.) এর সময়ে মসজিদে নারী ও পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতো। যেমন, হাদীসে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) নামায পড়তে অধিক রাত করলেন। শেষ পর্যন্ত উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে ....। এখানে বক্তব্য হচ্ছে নারী ও পুরুষদের কাতারের মাঝে কখনো হিজাব বা আবরণ থাকত না। কাজেই দৃষ্টি আনত রাখা সত্ত্বেও কোন না কোন সময় অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়তোই।[৩৫৬]

প্রয়োজনে নারী ও পুরুষের পরস্পর কথা বলাঃ রাসূল (স.) এর সময়ে মসজিদে পুরুষ ও নারীদের মাঝে শুধু দেখা সাক্ষাতই হতো না বরং প্রয়োজনে তারা কথাও বলতেন। অনেক হাদীস থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হাদীসে আছে, নারীদের বলা হলো, পুরুষরা সিজদা থেকে উঠে ঠিকমত না বসা পর্যন্ত মেয়েরা সিজদা থেকে উঠবে না।[৩৫৭] তবে অন্য পুরুষের সাথে মেয়েদের দেখা সাক্ষাতের নিয়মাবলী আল কুরআনের আলোকে নিম্নরূপঃ

ক) দৃষ্টি সংযমঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেছেন, "হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তাদের জন্য উন্নত চরিত্র গঠনের এটিই উত্তম পন্থা তারা যাই করুক না কেন, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। অন্যদিকে মুমিন মেয়েদের বলে দাও, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।"[৩৫৮]

---

[৩৫২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায পড়ার নিয়ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইমামের দাড়ানো পর্যন্ত মুসল্লীদের অপেক্ষা করা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৪।

[৩৫৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শিশুদের কান্নার কারণে যে নামায সংক্ষিপ্ত করে, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৪৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নামায সংক্ষিপ্তকরণের জন্য ইমামদের নির্দেশ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৪।

[৩৫৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইমামের দাড়ানো পর্যন্ত মুসল্লীদের অপেক্ষা করা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬৭।

[৩৫৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সালাম ফিরানো, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬৭।

[৩৫৬]. আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, **রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

[৩৫৭]. আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, **রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

[৩৫৮]. আল কুর'আন, **সূরা আন নূর**, আয়াতঃ ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

খ) দুই হাতের কবজি ও মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীরই আবৃত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপঃ আল্লাহ বলেন, "মুমিন মেয়েরা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে, কেবল যেটুকু স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে পড়ে তাছাড়া। তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখে।"[৩৫৯]

গ) মেয়েদের গতিবিধি ও চালচলনে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখাঃ আল্লাহ বলেন, "মেয়েদের বলে দাও তারা যেন জমিনে পা ঠুকে শব্দ করে চলফেরা না করে, তাদের আবৃত ও সংরক্ষিত সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে।"[৩৬০]

ঘ) পর পুরুষদের সাথে প্রয়োজনবোধে অ-আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলাঃ আল্লাহ বলেন, "তোমরা অন্য পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে লম্পট চরিত্রের লোকেরা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে। তাই প্রয়োজনে তাদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ ও অনাকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বল।"[৩৬১]

হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে নারী প্রগতি

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিধানের একটি অন্যতম বিধান। এটি ব্যক্তির আর্থিক ও শারিরীক ইবাদত। প্রত্যেক সামর্থবান (শারিরীক ও আর্থিক সামর্থ) ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরজ। এই বিধান নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। রাসূল (স.) এর হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জাকালে আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে হজ্জের জন্য যাত্রা করলাম। আমরা প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যার সাথে কুরবানীর জন্তু আছে সে যেন হজ্জ ও উমরার জন্য এক সাথে ইহরাম বাঁধে এবং হজ্জ ও উমরা সম্পাদনের পর এক সাথে ইহ্রাম খুলে ফেলে ....।"[৩৬২]

ইবনে আব্বাস রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'রাওহা' নামক স্থানে একটি কাফেলার সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ কওমের লোক? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তারা রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর রসূল। তখন এক মহিলা তাঁর সামনে একটা শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তার পুরষ্কার লাভ করবে তুমি।"[৩৬৩]

রসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যাত্রা করলাম.....আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি আমাকে বললেন, চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরার নিয়ত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম ....।"[৩৬৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি, সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেছে কিন্তু আপনি এখনো উমরার ইহরাম খুলেননি? তিনি বললেন, আমি

---

[৩৫৯]. আল কুর'আন, **সুরা আন নুর,** আয়াতঃ ৩১।
[৩৬০]. আল কুর'আন, **সুরা আন নুর,** আয়াতঃ ৩১।
[৩৬১]. আল কুর'আন, **সুরা আল আহযাব,** আয়াতঃ ৩২।
[৩৬২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী,** হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হায়েয ও নিফাসগ্রস্তা মেয়েরা কিভাবে ইহরাম বাঁধবে? ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫৯; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম,** হজ্জ অধ্যায়, ইহরামের বর্ণনা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৭।
[৩৬৩]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম,** হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শিশুর হজ্জের সিদ্ধতা ও তাকে সাথে নিয়ে যে ব্যক্তি হজ্জ করে তার পুরস্কার প্রসংগে, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১০১।
[৩৬৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী,** হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যেসব মহিলা হায়েয ও নিফাস অবস্থায় আছে তারা কিভাবে ইহরাম বাঁধবে বা তালবিয়া পাঠ করবে? ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫৯; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম,** হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইহরামের দিকসমূহের বর্ণনা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

(আঠালো বস্তু দিয়ে) মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা লটকিয়ে দিয়েছি। তাই কুরবানী না করে আমি ইহরাম খুলবো না।"[৩৬৫]

উম্মুল ফাযল বিনতে হারেস (রা:) থেকে বর্ণিত। আরাফাতে অবস্থানের দিন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সামনে ঐদিন রাসূলুল্লাহ (স.) এর রোযা রাখা সম্পর্কে মতানৈক্য করলো। কেউ বললো, তিনি রোযা রেখেছেন কেউ বললো, তিনি রোযা রাখেননি। আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলে তিনি পান করলেন। সে সময় তিনি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন।"[৩৬৬]

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা সবাই মুযদালিফায় পৌঁছলে সাওদা লোকজনের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি ছিলেন একজন ধীরগামী মহিলা। রসূলুল্লাহ (স.) তাকে অনুমতি দিলেন। লোকজনের ভিড়ের আগেই তিনি যাত্রা করলেন। এবং আমরা ভোর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলাম। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যাত্রা করলাম। আমিও যদি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে সাওদার মতো অনুমতি চাইতাম, তাহলে তা আমার জন্য তাঁর সাথে থাকার চাইতে বেশী আনন্দদায়ক হতো।"[৩৬৭]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফাযল রাসূলুল্লাহ (স.) এর সওয়ারীর পেছনে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে খাছ্'আম গোত্রের একটি মেয়ে আসলো....... এটা ছিল বিদায় হজ্জকালের ঘটনা।"[৩৬৮]

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা:) এর হায়েয শুরু হলে এবং সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলা হলে তিনি বললেন, সে কি আমাদের যাত্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, সবাই বললো, তিনি তাওয়াফে যিয়ারতের কাজ সেরে ফেলেছেন। নবী (স.) বললেন, তাহলে আর কোন বাধা নেই।"[৩৬৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা:) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি মক্কা থেকে যাত্রা করতে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। উম্মে সালামা (রা:) তখনো বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেননি এবং তিনিও মক্কা থেকে রওয়ানা হতে মনস্থির করেছিলেন। (অন্য এক বর্ণায় আছে)[৩৭০] উম্মে সালামা (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আমার অসুস্থতার অভিযোগ করলে) তিনি তাঁকে বললেন, ফজরের নামাযের ইকামত দেয়ার পর লোকজন যখন নামায পড়তে থাকবে,

---

[৩৬৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি ইহরামকালে (আঠালো বস্তু দিয়ে) মাথার চুল জড়িয়ে নেয় এবং মাথা মুন্ডন করে, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩০৩; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হজ্জে ইফরাদকারী ইহরাম না খোলা পর্যন্ত হজ্জে কিরানকারী ইহরাম খুলবে না, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫০।

[৩৬৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আরাফাতের ময়দানে সওয়ারী জন্তুর পিঠে অবস্থান করা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৫৯; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ পালনকারীর আরাফাতে অবস্থানের দিন আরাফাতের ময়দানে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা উত্তম, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪৫।

[৩৬৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যারা নিজ পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে ভাগে রাতের বেলায় পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করে, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৭৭; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ দুর্বলদের আগে ভাগে পাঠিয়ে দেয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৭৬।

[৩৬৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও তার মর্যাদা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২১; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বৃদ্ধাবস্থার কারণে হজ্জ করতে অক্ষম অথবা মৃত্যুর কারণে হজ্জ করতে অক্ষম, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১০১।

[৩৬৯]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ তাওয়াফে ইফাদা বা যিয়ারতের সময় কোন মহিলার ঋতুস্রাব দেখা দিলে, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৩৫; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী মহিলাকে তা থেকে অব্যাহতি দান, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৯৩।

[৩৭০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২২৭; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উট বা অন্য কোন সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফের বৈধতা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তখন তুমি তোমার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করবে। তিনি তাই করলেন এবং মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করার আগে তিনি নামায পড়তে পারেননি।"[৩৭১]

হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধে আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে যাত্রা করলাম....এরপর নবী (স.) আমার কাছে এলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম.....আমার তো উমরা করা চলবে না। নবী (স.) বললেন.....তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে.....আয়েশা (রা:) বলেন, আমি ঐ অবস্থায়ই থাকলাম এবং পরে আমরা মিনা থেকে যাত্রা করে মুহাস্‌সাবে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নবী (স.) আমার ভাই আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, তোমার বোনকে হারাম শরীফ নিয়ে যাও। সে সেখান থেকে উমরার ইহরাম বাধবে। তারপর তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে চলে আসবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করবো। আমরা মধ্যরাতে তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি সাহাবাদের মধ্যে যাত্রা শুরু করার ঘোষণা দিলেন। লোকজন রওয়ানা হয়ে গেল। ফজরের নামাযের পূর্বেই যারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছিল তারাও রওয়ানা হলো এবং নবী (স.) মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।"[৩৭২]

ইবনে জুরায়েজ 'আতার মাধ্যমে ইবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে হিশাম পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করতে নিষেধ করলে আতা তাঁকে বললেন, কিভাবে আপনি তাদেরকে নিষেধ করছেন? অথচ নবী (স.) এর স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। আমি বললাম, এ ঘটনা পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার আগের না পরের। তিনি বললেন আমার জীবনের শপথ! পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমি তাদেরকে এরূপ করতে দেখেছি।[৩৭৩] আমি বললাম, মেয়েরা কি করে পুরুষদের সাথে মিশতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, তারা পুরুষদের সাথে একেবারে মিশে একাকার হয়ে যেত না। যেমন আয়েশা (রা:) পুরুষদের থেকে দূরে অবস্থান করে তাওয়াফ করতেন এবং তাদের সাথে মিশে যেতেন না। এক মহিলা আয়েশাকে বললো, হে উম্মুল মুমিনীন! চলুন আমরা হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেই। আয়েশা (রা:) তাকে বললেন, তুমি যাও। তিনি নিচে যেতে অস্বীকার করলেন। নবী (স.) এর স্ত্রীগণ রাতের বেলা নিজেদেরকে আবৃত করে বেন হতেন এবং পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতেন। কিন্তু তাঁরা বায়তুল্লায় প্রবেশ করতে চাইলে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন এবং পুরুষরা বের হয়ে যাওয়ার পর তারা প্রবেশ করতেন। আয়েশা যখন 'সাবীর' পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত (তাঁবুতে) অবস্থান করছিলেন, তখন আমি এবং উবায়েদ ইবনে উমায়ের তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই সময় তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? তিনি বললেন, সেই সময় তিনি তুর্কী তাঁবু (এক প্রকার ছোট তাঁবু) তে অবস্থান করছিলেন। এর দরজায় একটা পর্দা লটকানো ছিল। এছাড়া আমাদের ও তাঁর মাঝে কোন পর্দা ছিল না। আর তিনি একখানা গোলাপী রংয়ের চাদর পরিহিতা ছিলেন।"[৩৭৪]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে নারীদেরও অধিকার রয়েছে। রাসূল (স.) এর সাথে তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য নারীরা হজ্জ পালন করেছিলেন।

---

[৩৭১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায পড়ে, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২৩২; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: উট বা অন্য কোন সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফের বৈধতা, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৬৮।

[৩৭২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াফ করেই যদি রওয়ানা হয়ে যায় তবে ঐ তাওয়াফ বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা? ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৬১; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ইহরামের বর্ণনা, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩১।

[৩৭৩]. এখানে সাধারণ ঈমানদারদের স্ত্রীদের থেকে নবী (স.) এর স্ত্রীদের হজ্জ পালনের পার্থক্য লক্ষনীয়। তাদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার কারণে তারা পুরুষদের থেকে অধিক দুরত্ব বজায় রেখেছেন।

[৩৭৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি

জাহেলিয়া যুগে নারীদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার, নিজের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করা, অন্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ ও ব্যবহার ইত্যাদির কোনকিছুতেই নারীর অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারী নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু উপার্জন করতে বা ইচ্ছামত কোন কিছু ব্যয় করতে পারত না। সর্বপ্রথম ইসলামই নারীদেরকে পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার ও উপার্জিত সম্পদ ভোগ দখলের অধিকার দান করেছেন। ইসলামে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার ও প্রগতি নিম্নরূপঃ

অর্থ উপার্জন

অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেছে। নারীর অর্থ উপার্জনের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ''আল্লাহ ধন-সম্পদ দ্বারা কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।''[৩৭৫] সুতরাং ইসলামী শরীয়তে নারীদের নিজেস্ব উপার্জিত বা প্রাপ্ত সম্পদে পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকৃত। এতে নারীর বিনা অনুমতিতে অভিভাবক বা অন্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ইসলামসম্মত নয়।

ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার

পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ[৩৭৬] প্রদানের প্রতি ইসলাম অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্তান যতদিন নিজে উপার্জনক্ষম না হবে ততদিন পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ দেয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিবারের।[৩৭৭] শুধু ভরণপোষণ প্রদান নয় বরং সন্তানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পিতা মাতা উভয়ের। ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতার নিকট থাকবে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর সন্তান তার ইচ্ছামত পিতা বা মাতা যে কোন একজনের সাথে বসবাস করবে। তবে সন্তান যেখানেই থাকুক তার ভরনপোষণ সহ যাবতীয় ব্যয়ভার পিতাকেই বহন করতে হবে।[৩৭৮] আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দেয়, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।"[৩৭৯]

---

৩৭৫. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ৩২।

৩৭৬. আরবী 'নাফাকা' শব্দের অর্থ- পরিবারের ব্যক্তিবর্গের জন্য যা ব্যয় করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরের অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করাকে 'নাফাকা' বা ভরণ-পোষণ বলে। (মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন, **হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার**, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি. ১ম খন্ড, পৃঃ ৬২৮; সাইয়্যিদ আবু জাবির, **আল-কামুছ আল-ফিকহি**, করাচিঃ ইরাদাতুল কুর'আন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, তা.বি., পৃঃ ৩৫৯)।

৩৭৭. বস্তুতঃ সন্তানের পিতা-মাতার সঙ্গে জন্মের সম্পর্ককে বংশ পরিচয় বা ইসলামী বিধানে 'নসব' বলা হয়। এর ভিত্তি হল একজন পুরুষ ও একজন নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক। মূলতঃ 'নসব' এর মাধ্যমে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সন্তান বংশ পরিচয় ও সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করে। এই সম্পর্কের কারণেই উভয়ের প্রতি ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্ম লাভ করে। (নূরুল মু'মিন, **মুসলিম আইন**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃঃ ৪০৪)।

৩৭৮. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন**, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), ধারা-৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৬, ৪০৭।

৩৭৯. ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস- সিজিস্তানী, **আস-সুনান**, আল আদাব অধ্যায়, ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতীমা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, (রিয়াদঃ দারুস-সালাম, ২০০০), পৃঃ ১৫৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করাবে কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসাথে থাকব।"[৩৮০] তবে সন্তানের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ইসলাম ছেলে এবং মেয়েকে সমান অধিকার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন অবস্থাতেই ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, "যার কোন কন্যা আছে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"[৩৮১]

নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার কর, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝেই ইনসাফ কায়েম কর।"[৩৮২] অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, নু'মান ইব্ন বশীর (রাঃ) বলেন, একবার আমার পিতা আমাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। তখন রাসুল (স.) বললেন, তুমি কি তোমার সব ক'টি সন্তানকে এভাবে একটি করে ক্রীতদাস দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল (স.) বললেন, তুমি এ দান ফিরিয়ে নাও।[৩৮৩]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সন্তানদের (ছেলে-মেয়ে) মধ্যে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য। আর এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করলে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা অমান্য করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা হচ্ছে এই যে, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য, আর কম-বেশী করা হারাম।"[৩৮৪] সুতরাং সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, নিজস্ব উপার্জন না করা পর্যন্ত তার ভরনপোষণ দান করা পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। [৩৮৫]

ইসলামে স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর অর্পিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। আর যার আয় সীমিত সে আল্লাহর দেয়া সম্পদ অনুসারে খরচ করবে।"[৩৮৬] আল্লাহ আরও বলেন, "সন্তানের পিতার দায়িত্ব হল স্ত্রীর খোরাক ও পোশাকের সুব্যবস্থা করা।"[৩৮৭] এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, "স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর উপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালেমা

---

[৩৮০]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, আল-বিবরু ওয়াস সিলাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফাদলুল ইহসানি ইলাল বানাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০), পৃঃ ১১৩৬।

[৩৮১]. ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস- সিজিস্তানী, **আস-সুনান**, আল- আদাব অধ্যায়, ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতীমা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯৯।

[৩৮২]. ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস- সিজিস্তানী, **আস-সুনান**, আল- বুয়ু্য অধ্যায়, ফীর রজুলি ইউফাদ্দিলু বা'দা ওয়ালাদিহি ফীন নাহলি অনুচ্ছেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮৬।

[৩৮৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আল- হিবা অধ্যায়, হিবা লিল ওয়ালাদি অনুচ্ছেদ, (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০), পৃঃ ২০৪।

[৩৮৪]. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, **নাইলুল আওতার**, (আল-কাহেরাঃ মুসতাফা আলবাবী আল-হালাভী), তা.বি. ৯ম খন্ড, পৃঃ ২২১।

[৩৮৫]. আর এ দায়িত্ব পালন না করা বা অবহেলা করা সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, "যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর বর্তাবে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে।"(ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস- সিজিস্তানী, **আস-সুনান**, আল- যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফী সিলাতির রিহমি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪৯)। অপর এক হাদীসে আছে, "যাদের খাওয়া-পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গুণাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"(মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, আয-যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফাদলুন নাফাকাতি 'আলাল ইয়াল আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০, পৃঃ ৮৩৫)।

[৩৮৬]. আল কুর'আন, **সুরা আত তালাক**, আয়াতঃ ৭।

[৩৮৭]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াতঃ ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ। তোমাদের উপর অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের খোরাক ও পোশাকের সুবন্দোবস্ত করবে।"[৩৮৮]

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (স.) বলেছেন, "স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ এবং খোরাক পোশাকের সুব্যবস্থা করবে।"[৩৮৯]

রাসূল (স.) আরও বলেছেন, "হে লোকসকল! তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। কেননা, তারা তো তোমাদের নিকট বন্দীর মত। মনে রেখ, স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীদের ঠিক তেমন অধিকারই রয়েছে। সাবধান, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের জন্য খোরাক ও পোশাকের উত্তম ব্যবস্থা করবে।"[৩৯০]

আর স্ত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা সামর্থ্যানুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস কর, স্ত্রীদের বসবাসের জন্যও তদ্রূপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে জীবন সংকটাপন্ন কর না।"[৩৯১]

জনৈক সাহাবী রাসূল (স.) কে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কি? রাসূল (স.) বললেন, "তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খেতে দিবে আর তুমি যখন কাপড় পরিধান কর, তখন তাকেও কাপড় পরিধান করতে দিবে।"[৩৯২]

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয় এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাদের মৌলিক অধিকার পুরণ করার দায়িত্ব সন্তানের। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তবে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করে থাকেন।"[৩৯৩]

কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[৩৯৪]

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ রসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস

---

৩৮৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, কিতাবুল হজ্জ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭।

৩৮৯. প্রাগুক্ত।

৩৯০. তিরমিযী, **জামিউত তিরমিযী**, ১ম খন্ড, আবওয়াবুর রিদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।

৩৯১. আল কুর'আন, **সূরা আত তালাক**, আয়াতঃ ৬।

৩৯২. আবূ দাউদ, **সুনান**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা খলীল আহমদ বলেন, স্ত্রীর খোরাক ও পোশাক যোগাড় করে দেয়া তোমার কর্তব্য, যখন তুমি এগুলোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হও।" (আবূ ইবরাহীম খলীল আহমদ, **বযলুল মজহুদ**, ৩য় খন্ড, রিয়াদঃ দারুল লিউয়া লিন নাশর ওয়াত তাওযী, তা.বি. পৃঃ ৪৪)। আর আল্লামা আল খাত্তাবী (রহ.) বলেন, "এই হাদীস স্ত্রীর খোরাক-পোশাকের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। প্রচলিত নিয়মানুসারে তা করতে হবে। আর করতে হবে স্বামীর সামর্থানুযায়ী। রাসুলে করীম (স.) যখন একে অধিকার বলেছেন, তখন স্বামীর তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। সে উপস্থিত থাকুক আর অনুপস্থিত। সময়মত আদায় করতে না পারলে তা স্বামীর উপর অবশ্য আদায় যোগ্য একটা ঋণ হয়ে থাকবে। যেমন অন্যান্য হক বা অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে। (আল্লামা আল খাত্তাবীম, **মা'লিমুস্ সুনান**, ২য় খন্ড, হালাবঃ মাতবাউল ইলমিয়াহ, তা. বি. পৃঃ ২২১)।

৩৯৩. আল কুর'আন, **সূরা লুকমান**, আয়াতঃ ১৪।

৩৯৪. আল কুর'আন, **সূরা বনী ইসরাঈল**, আয়াতঃ ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।"[৩৯৫]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, সন্তানের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পিতা-মাতার আর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রী যদি নিজে উপার্জন করে তারপরও সে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী হয়। আর পিতা-মাতা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলে তাদের ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সন্তানের। অতএব নারী হিসেবে মাতা, কন্যা, স্ত্রী, অবিবাহিত বোন সকলেরই দেখাশোনা করা পুরুষের দায়িত্ব।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী সকল ধর্মেই বঞ্চিত ছিল।[৩৯৬] একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে স্ব-উপার্জিত বা অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদের উত্তরাধীকারী হওয়ার অধিকার দান করেছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "পুরুষরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর নারীরা যা উপার্জন করে তাতেও রয়েছে তাদের পূর্ণ অধিকার।"[৩৯৭] প্রাক ইসলামী যুগে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের উপর মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের মত নারীর অধিকারও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হউক বা বেশীই হউক এক নির্ধারিত অংশ।[৩৯৮] নিম্নে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর অংশ তুলে ধরা হলো:

স্ত্রীর অংশ

স্বামীর মুত্যু হলে তার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে স্ত্রীর দুই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কুর'আন কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তাহলে তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে, তাহলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে।"[৩৯৯]

প্রথম অবস্থা: মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না তাকে তাহলে স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ অংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: মরহুম জামান সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং পিতা রেখে মারা গেছেন। এমতাবস্থায়, স্ত্রী শরীফা বেগম পাবে এক চতুর্থাংশ এবং পিতা পাবে তিন চতুর্থাংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে পুত্র, অথবা কন্যা জীবিত রেখে যান, তাহলে স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ।[৪০০] উদাহরণস্বরূপ: মরহুম জামান সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং এক পুত্র রেখে মারা গেছেন। এমতাবস্থায়, স্ত্রী শরীফা বেগম পাবে এক অষ্টমাংশ এবং পুত্র পাবে সাত অষ্টমাংশ। হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামগণের (ইসলামী আইনবিদ) মতে, মৃত ব্যক্তির যদি অন্য কোন

---

[৩৯৫]. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কে উত্তম সাহচর্যের পাত্র, ১৩ খন্ড, পৃ: ৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: পিতামাতার প্রতি সদাচার করা কেননা তাঁরাই উত্তম হকদার, ৮ম খন্ড, পৃ: ২।

[৩৯৬]. ইসলামের মীরাস আইন প্রবর্তনের পূর্বে আরব-অনারব জাতিসমূহের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে চলতো নানা ধরনের জুলুম ও অত্যাচার। মুশরিকদের নিয়মে পিতার বড় ছেলে সকল সম্পত্তির মালিক হতো। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা হতো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। আবার কোন কোন জাতির নিয়মে এতিম বালক-বালিকা ও নারীগণ মীরাসের বিষয়ে কোন অংশই পেত না। (মুফতী মোহাম্মদ শফি, **তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন**, অনুবাদ: মহিউদ্দিন খান, ২য় খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ: ৩৪৮)।

[৩৯৭]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ৩২।

[৩৯৮]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ৭।

[৩৯৯]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১২।

[৪০০]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭), পৃ: ১০।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকারী না থাকে এবং দেশে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি স্ত্রীর উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।[৪০১]

কন্যার অংশ

পিতার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে কন্যা সন্তানের তিন অবস্থা পরিলক্ষিত। যেমন কুর'আন কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়ার) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান পাবে, আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই এর অধিক হয়, তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পাবে, আর একটি মাত্র কন্যা থাকলে অর্ধেক অংশ পাবে।"[৪০২]

প্রথম অবস্থা: কন্যা যদি একজন হয় এবং পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার সকল সম্পত্তির দুই ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অর্ধেক পাবে। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে, "হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ম'আজ ইবনে জবল ইয়ামানে শিক্ষক অথবা আমীর হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন, অত:পর আমরা তার কাছে এক ব্যক্তির মীরাস সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। যিনি মারা গেছেন এবং একটি মেয়ে ও বোন রেখে গেছেন। তখন তিনি মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক অংশ প্রদান করলেন।"[৪০৩] উদাহরণস্বরূপ: মরহুম হাসান সাহেব মৃত্যুকালে এক কন্যা এবং এক বোন রেখে মারা গেছেন। এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে অর্ধাংশ এবং বোন পাবে অর্ধাংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির কন্যা যদি দুই বা ততোধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যারা পিতার সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। উক্ত অংশ সকল কন্যাদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।[৪০৪] পবিত্র কুর'আনে দুই কন্যার জন্য যে বিধান রয়েছে দুই এর অধিক কন্যার জন্যও একই বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রসূল (স.) এর সাথে বাইরে বের হলাম। ইতিমধ্যে আসওয়াফ নামক স্থানে জনৈকা আনসার মহিলার নিকট দিয়ে গেলাম। মহিলা তার দুই কন্যাকে নিয়ে আসল এবং বলতে লাগল, হে আল্লাহর রসূল এ কন্যাদ্বয় (আমার স্বামী) ছাবেত ইবনে কায়েসের। সে আপনার সঙ্গী হয়ে ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছে। এদের চাচা এদের পিতার যাবতীয় ত্যাজ্য সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? আল্লাহর কসম! যদি কন্যাদের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকে, তবে কেউ তাদেরকে বিয়ে করতেও সম্মত হবে না। রসূল (স.) একথা শুনে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে ফয়সালা দিবেন। হযরত জাবের (রা:) বলেন, অত:পর যখন সূরা নিসার আয়াত 'ইউসিকুমুল্লাহ ফী আওলাদিকুম' অবতীর্ণ হয়, তখন রসূল (স.) বললেন, ঐ মহিলা ও তার দেবরকে (কন্যাদের চাচা, যে সমস্ত সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল) ডেকে আন। তিনি কন্যাদের চাচাকে বললেন, কন্যাদ্বয়কে মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়ে দাও। তাদের মাতাকে দাও আট ভাগের এক ভাগ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তুমি নিজে নাও।[৪০৫]

উদাহরণস্বরূপ: মরহুম হাসান সাহেব মৃত্যুকালে দুই কন্যা এবং পিতা রেখে মারা গেছেন। তার কোন পুত্র সন্তান নেই। এমতাবস্থায়, কন্যাদ্বয় পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাবেন এক তৃতীয়াংশ।

---

[৪০১]. ফজলুর রহমান, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ**, (ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ: ৩২।

[৪০২]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াত: ১১।

[৪০৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ফারায়েয অধ্যায়, ২য় খন্ড, (ইন্ডিয়া: মোকতার এন্ড কোম্পানী, ইউপি, ১৯৮৫), পৃ: ২৭।

[৪০৪]. মুফতী মোহাম্মদ শফি, **তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন**, অনুবাদ: মহিউদ্দিন খান, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২।

[৪০৫]. আবু দাউদ ও তিরমিজীর বরাত দিয়ে মুফতী মোহাম্মদ শফি, **তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন**, অনুবাদ: মহিউদ্দিন খান, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২-৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অবস্থা: কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তাহলে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে।[৪০৬] উদাহরণস্বরূপ: মরহুম হাসান সাহেব অথবা শামীমা বেগম মৃত্যুকালে এক কন্যা এবং এক পুত্র রেখে মারা গেছেন।[৪০৭] এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং পুত্র পাবে দুই তৃতীয়াংশ।

সহোদর বোনের অংশ

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সহোদর বোন ৫ অবস্থায় অংশ পেয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, "হে নবী! লোকে আপনার নিকট (উত্তরাধিকার) বিধান জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নি:সন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন (সহোদর বা বৈমাত্রেয়) থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে এবং এ ব্যক্তি বোনের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হবে। যদি মৃত বোনের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয় তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান।"[৪০৮]

প্রথম অবস্থা: সহোদর বোন একজন হলে পুরো সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: করিম সাহেব মৃত্যুকালে এক বোন এবং এক চাচা রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায়, বোন পাবে অর্ধাংশ এবং চাচা পাবে অর্ধাংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা: সহোদর বোন দুই বা ততোধিক হলে সকলে মিলে পুরো সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে এবং উক্ত অংশ প্রত্যেকে সমানভাবে ভাগ করে নিবে। উদাহরণস্বরূপ: রহিম সাহেব দুই বোন এবং এক চাচা রেখে মারা গেলেন।[৪০৯] এমতাবস্থায়, সহোদর বোনদ্বয় পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং চাচা পাবে এক তৃতীয়াংশ।

তৃতীয় অবস্থা: বোনের সাথে ভাই থাকলে ভাই বোনের দ্বিগুণ অংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: আসিফ সাহেব এক বোন এবং এক ভাই রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায়, বোন পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং ভাই পাবে দুই তৃতীয়াংশ।

চতুর্থ অবস্থা: মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রীগণ বর্তমান থাকলে বোন আছাবা[৪১০] হবে। অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বোন পাবে। রসূল (স.) বলেছেন "বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা করে দাও।"[৪১১] উদাহরণস্বরূপ: রজব সাহেব এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং দুই বোন রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে ৬ ভাগের ৩ ভাগ, পৌত্রী পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ, এবং প্রত্যেক বোন পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ হারে।

পঞ্চম অবস্থা: মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র অথবা পিতা জীবিত থাকলে ইসলামী আইনবিদগনের সর্বসম্মতভাবে সহোদর বোন ওয়ারিশ হবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে, মৃত ব্যক্তির দাদা জীবিত থাকলেও বোন ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে, দাদার বর্তমানে বোনগণ ওয়ারিশ হবে। উদাহরণস্বরূপ: জব্বার সাহেব স্ত্রী, পুত্র ও বোন রেখে মারা

---

[৪০৬]. মুফতী মোহাম্মদ শফি, **তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন**, অনুবাদ: মহিউদ্দিন খান, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬১।
[৪০৭]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০।
[৪০৮]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ১৭৬।
[৪০৯]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০।
[৪১০]. আছাবা আরবী শব্দ। এর অর্থ মাংশপেশী। ফারায়েযের পরিভাষায় যাদের সাথে রক্ত মাংশের সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা যাবিল ফুরুজের নির্ধারিত অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাদেরকে বলা হয় আছাবা। সন্তান পিতার সাথে রক্ত মাংশের শরীক। বলা বাহুল্য, এই কারণেও পুত্র আছাবার মধ্যে গণ্য হবে, যাবিল ফুরুজের মধ্যে নয়। আছাবা তিন প্রকার। যথা: প্রথম প্রকার শুধু পুরুষদের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। (মাওলানা আবদুল আজীজ, **ফারায়েয শিক্ষা**, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ: ১৫)।
[৪১১]. সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ আস-সিরাজী, **মীরাস**, (দেওবন্দ: কুতুবখানা সুলতানিয়াহ, তা. বি.), পৃ: ১৬।

গেছেন। এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে ৮ ভাগের ১ ভাগ এবং পুত্র পাবে ৮ ভাগের ৭ ভাগ। সহোদর বোন বঞ্চিত হবে (ইসলামী আইনবিদগণের সর্বসম্মত মতামত অনুসারে)। মৃত ব্যক্তির সহোদর বোন ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি সহোদর বোনদের প্রতি রদ্দ হবে। অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে সহোদর বোনগণ।[৪১২]

বৈমাত্রেয় বোনের অংশ

মা দুইজন কিন্তু পিতা একজন হলে অর্থাৎ পিতার অন্য স্ত্রীর গর্ভের কন্যা সন্তানকে বৈমাত্রেয়া বোন বলা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবার ব্যাপারে বৈমাত্রেয়া বোনের ৭ অবস্থা বিরাজমান। যথা:

প্রথম অবস্থা: বৈমাত্রেয়া বোন মাত্র একজন হলে পুরো সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: জাফর এক বৈমাত্রেয়া বোন এবং এক চাচা রেখে মারা গেল। তার কোন পুত্র সন্তান নেই। এমতাবস্থায় বৈমাত্রেয়া বোন পাবে অর্ধাংশ এবং চাচা পাবে অর্ধাংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা: বৈমাত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে এবং মৃত ব্যক্তির কোন সহোদর বোন না থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ সবাই মিলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে এবং প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ সমান হবে। উদাহরণস্বরূপ: হাশিম দুইজন বৈমাত্রেয় বোন এবং একজন চাচা রেখে মারা গেল।[৪১৩] এমতাবস্থায় প্রত্যেক বৈমাত্রেয়া বোন পাবে এক তৃতীয়াংশ হারে এবং চাচা পাবে এক তৃতীয়াংশ।

তৃতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির একজন সহোদর বোন থাকলে এবং সেই সাথে বৈমাত্রেয়া বোন এক বা ততোধিক থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ। উদাহরণস্বরূপ: জসিম একজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং একজন চাচা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় সহোদর বোন পাবে ৬ ভাগের ৩ ভাগ অংশ, বৈমাত্রেয়া বোন পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ অংশ এবং চাচা পাবে ৬ ভাগের ২ ভাগ অংশ।

চতুর্থ অবস্থা: মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ সহোদর বোন আত্মীয়তার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী। উদাহরণস্বরূপ: লালু মিয়া দুইজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয় বোন এবং একজন চাচা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় প্রত্যেক সহোদর বোন পাবে ৩ ভাগের ১ ভাগ হারে, চাচা পাবে ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশ, বৈমাত্রেয়া বোন বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থা: দুই বা ততোধিক সহোদর বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোনের সঙ্গে যদি বৈমাত্রেয়া ভাই থাকে, তাহলে সে বোনদেরকে আছাবা করে দিবে।[৪১৪] অর্থাৎ সহোদর বোনগণ তাদের দুই তৃতীয়াংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈমাত্রেয়া ভাইবোনগণ পাবে এবং বোনের দ্বিগুণ হিসেবে ভাই পাবে।

ষষ্ঠ অবস্থা: মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ আছাবা হবে। অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণ তাদের অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ঠ থাকবে তা বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: হাফিজ সাহেব এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং দুইজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে ছয় ভাগের তিন ভাগ অংশ, পৌত্রী পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ, এবং প্রত্যেক বৈমাত্রেয়া বোন পাবে ছয় ভাগের একভাগ অংশ হারে।

সপ্তম অবস্থা: মৃত ব্যক্তির পুত্র বা তাদের অধ:স্তন, পিতা এবং দাদা জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। এ বিধান শুধুমাত্র বৈমাত্রেয়া বোনের ক্ষেত্রেই নয় বরং সহোদর বোনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়া সহোদর বোন যখন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে আছাবা হয়, তখনও বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ তারা আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী। উদাহরণস্বরূপ: শহিদ সাহেব এক কন্যা, স্ত্রী, পিতা এবং একজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেলেন।

---

[৪১২]. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয**, প্রাগুক্ত, ৬৪।
[৪১৩]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১।
[৪১৪]. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, কন্যা পাবে আট ভাগের চার ভাগ অংশ, পিতা পাবে আট ভাগের তিন ভাগ অংশ। বৈমাত্রেয়া বোন এক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে। মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয়া বোনগণ ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি বৈমাত্রেয়া বোনগণের প্রতি রদ্দ হবে। অর্থাৎ বৈমাত্রেয়া বোনগণ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

বৈপিত্রেয় বোনের অংশ

মা একজন কিন্তু পিতা দুইজন অর্থাৎ মায়ের অন্য স্বামীর ঔরসের কন্যা সন্তানকে বৈপিত্রেয়া বোন বলা হয়। বৈপিত্রেয়া ভাইয়ের ন্যায় বোনের তিন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, "যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে ৬ ভাগের এক ভাগ অংশ। তারা যদি তদপেক্ষা বেশী হয় তবে তারা সকলে একত্রে ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশের অংশীদার হবে।"[৪১৫]

প্রথম অবস্থাঃ বৈপিত্রেয় বোন যদি মাত্র একজন হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ৬ ভাগের ১ ভাগ অংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপঃ রাশেদ তার মা, চাচা এবং একজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায়, মা পাবে ছয় ভাগের দুই ভাগ অংশ, বৈমাত্রেয়া বোন পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ এবং চাচা পাবে ছয় ভাগের তিন ভাগ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ বৈপিত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে বৈপিত্রেয়া ভাই থাকলে সবাই মিলে এক তৃতীয়াংশ পাবে এবং উক্ত অংশ ভাই-বোন সকলেই নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিবে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের অংশই সমান।[৪১৬] উদাহরণস্বরূপঃ মালেক মিয়া মা, দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন, একজন বৈপিত্রেয় ভাই এবং একজন চাচা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায়, মা পাবে আঠারো ভাগের তিন ভাগ অংশ, বৈপিত্রেয় ভাই পাবে আঠারো ভাগের দুই ভাগ অংশ, প্রত্যেক বৈপিত্রেয়া বোন পাবে আঠারো ভাগের দুই ভাগ অংশ করে এবং চাচা পাবে আঠারো ভাগের নয় ভাগ অংশ।

তৃতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তি পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে কিংবা পিতা বা দাদা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়া বোন কোন অংশ পাবে না। উদাহরণস্বরূপঃ শাহাদত স্ত্রী, কন্যা, বৈপিত্রেয় বোন এবং পিতা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ অংশ, কন্যা পাবে আট ভাগের চার ভাগ অংশ, পিতা পাবেন আট ভাগের তিন ভাগ অংশ এবং বৈপিত্রেয়া বোন বঞ্চিত হবে। তবে বৈপিত্রেয়া বোন ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বৈপিত্রেয়া বোনগণই পাবে।

মাতার অংশ

মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ব্যাপারে মাতার তিন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ। আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তাহলে মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।"[৪১৭]

প্রথম অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তনিম্নের কেউ জীবিত থাকে অথবা যে কোন প্রকারের (সহোদর, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা এক

---

[৪১৫]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১২।

[৪১৬]. আল্লামা কুরতুবী বলেন, একমাত্র বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ছাড়া ফারায়েযের আর কোথাও নারী-পুরুষের সমান অংশ হয় না। (মুফতী মোহাম্মদ শফি, **তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন**, অনুবাদঃ মহিউদ্দিন খান, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৯)।

[৪১৭]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াতঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠাংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: খালেক মিয়া দুই পুত্র, এক কন্যা এবং মা জীবিত রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায়, মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ, কন্যা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ এবং প্রত্যেক পুত্র পাবে ছয় ভাগের দুই ভাগ অংশ হারে।

দ্বিতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তনিম্নের কেউ না থাকে কিংবা তিন প্রকার ভাই বোনের মধ্যে হতে কমপক্ষে দুইজন না থাকে, তাহলে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে।[৪১৮] উদাহরণস্বরূপ: রউফ পিতা এবং মাতা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায়, পিতা পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং মা এক তৃতীয়াংশ।

তৃতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তনিম্নের কেউ না থাকে কিংবা যে কোন প্রকারের (সহোদর, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোনও না থাকে, কিন্তু পিতা-মাতা জীবিত থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রী অংশ দেয়ার পর বা মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মাতা পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকেন তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে, মাতা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে।[৪১৯] কিন্তু ইমাম ইউসুফ (রহ.) এর মতে, এ অবস্থায়ও মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তনিম্নের কেউ জীবিত থাকে তাহলে মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: খালেক মিয়া দুই পুত্র, এক কন্যা এবং মা জীবিত রেখে মারা গেল। উদাহরণস্বরূপ: আহাদ সাহেব স্ত্রী, মাতা এবং দাদা রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে ১২ ভাগের ৩ ভাগ অংশ, মাতা পাবে ১২ ভাগের ৪ ভাগ অংশ (ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে) এবং দাদা পাবে ১২ ভাগের ৫ ভাগ অংশ। মৃত ব্যক্তির মাতা ব্যতীত যদি আর কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে সমস্ত সম্পত্তি মাতার প্রতি রদ্দ হবে। অর্থাৎ মাতাই সমস্ত সম্পত্তি পাবেন।

দাদীর অংশ

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে দাদীর দুই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যথা:

প্রথম অবস্থা: মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা মাতা যদি বর্তমান না থাকে, তাহলে দাদী এক ষষ্ঠাংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: আশরাফুল এক কন্যা, এক ভাই ও দাদী রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে ৬ ভাগের ৩ ভাগ অংশ, দাদী পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ অংশ এবং ভাই পাবে ৬ ভাগের ২ ভাগ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির পিতা বা মাতা কেউ জীবিত থাকলে দাদী কোন অংশ পাবে না। উদাহরণস্বরূপ: মনিরুল স্ত্রী, পিতা ও দাদী রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে ৪ ভাগের ১ ভাগ অংশ, পিতা পাবে ৪ ভাগের ৩ ভাগ অংশ এবং দাদী বঞ্চিত হবে।[৪২০] মৃত ব্যক্তির দাদী ব্যতীত যদি আর কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে সমস্ত সম্পত্তি দাদীর প্রতি রদ্দ হবে। অর্থাৎ দাদীই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

পৌত্রির অংশ

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পৌত্রীদের (পুত্রের কন্যাদের) উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভের ৬টি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যথা:

প্রথম অবস্থা: কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার ঔরসজাত কোন কন্যা সন্তান যদি না থাকে এবং পৌত্রী যদি মাত্র একজন হয়, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সকল সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপ: মাসুম সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী, পৌত্রী এবং ভাই রেখে গেলেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী

---

[৪১৮]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২; আলিমুজ্জামান চৌধুরী, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন**, (ঢাকা: মহানগর ল' বুক সেন্টার, ১৯৯৮), পৃ: ৯৩।

[৪১৯]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২।

[৪২০]. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮-৭৯।

পাবে ৮ ভাগের ১ ভাগ অংশ, পৌত্রী পাবে ৮ ভাগের ৪ ভাগ অংশ এবং ভাই পাবে ৮ ভাগের ৩ ভাগ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮নং অধ্যাদেশের বলে বর্তমানে স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, পৌত্রী পাবে সাত অষ্টমাংশ এবং ভাই বঞ্চিত হবে।[৪২১]

দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কন্যাদের অবর্তমানে পৌত্রী যদি দুই বা ততোধিক হয়, তাহলে তারা পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং উক্ত অংশ পৌত্রীগণ নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিবে। উদাহরণস্বরূপঃ শামীম সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পৌত্রী এবং চাচা রেখে গেলেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী পাবে ২৪ ভাগের ৩ ভাগ অংশ, প্রত্যেক পৌত্রী পাবে ২৪ ভাগের ৮ ভাগ অংশ এবং চাচা পাবে ২৪ ভাগের ৫ ভাগ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮নং অধ্যাদেশের বলে বর্তমানে স্ত্রী পাবে ১৬ ভাগের ২ ভাগ অংশ, প্রত্যেক পৌত্রী পাবে ১৬ ভাগের ৭ ভাগ অংশ হারে এবং চাচা বঞ্চিত হবে।[৪২২]

তৃতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার ঔরসজাত কন্যা সন্তান যদি একজন থাকে তাহলে পৌত্রীগণ সকল সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে। উদাহরণস্বরূপঃ কালাম সাহেব মৃত্যুকালে এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং চাচা রেখে গেলেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কন্যা পাবে ৬ ভাগের ৩ ভাগ অংশ, পৌত্রী পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ অংশ এবং চাচা পাবে ৬ ভাগের ২ ভাগ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮নং অধ্যাদেশের বলে বর্তমানে কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ, পৌত্রী পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং চাচা বঞ্চিত হবে।

চতুর্থ অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কন্যা যদি দুই বা ততোধিক থাকে তাহলে পৌত্রী কোন অংশ পাবে না। দুই কন্যা বর্তমান থাকায় তারাই দুইজনে সর্বোচ্চ এক+এক = দুই তৃতীয়াংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে কন্যারা অধিক নিকটবর্তী। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপঃ ফিরোজ সাহেব মৃত্যুকালে দুই কন্যা, পৌত্রী এবং ভাই রেখে গেলেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী আইনে দুই কন্যা পাবে এক+এক = দুই তৃতীয়াংশ, ভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং পৌত্রী বঞ্চিত হবে। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮নং সংশোধনীর ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে প্রত্যেক কন্যা পাবে ৪ ভাগের ১ ভাগ অংশ হারে, পৌত্রী পাবে ৪ ভাগের ১ ভাগ অংশ এবং ভাই বঞ্চিত হবে।[৪২৩]

পঞ্চম অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত দুই বা ততোধিক কন্যা বর্তমান থাকাবস্থায় যদি পৌত্রীদের সাথে তাদের সহোদর ভাই, চাচাতো ভাই অথবা নিম্ন শ্রেণীর এক বা একাধিক পুরুষ সন্তান অর্থাৎ পৌত্রীদের ভাইপো, ভাইপো পুত্র ইত্যাদি থাকে তাহলে পৌত্রীরা আছাবা হবে। মৃত ব্যক্তির কন্যাদ্বয়ের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পৌত্রীদের মধ্যে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হারে বন্টন করা হবে। উদাহরণস্বরূপঃ রায়হান সাহেব মৃত্যুকালে দুই কন্যা, পৌত্রী এবং পৌত্র রেখে গেলেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে প্রত্যেক কন্যা পাবে ৯ ভাগের ৩ ভাগ অংশ হারে, পৌত্রী পাবে ৯ ভাগের ১ ভাগ অংশ এবং পৌত্র পাবে ৯ ভাগের ২ ভাগ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮নং অধ্যাদেশের বলে বর্তমানে প্রত্যেক কন্যা পাবে ১২ ভাগের ৩ ভাগ অংশ হারে, পৌত্রী পাবে ১২ ভাগের ২ ভাগ অংশ এবং পৌত্র পাবে ১২ ভাগের ২ ভাগ অংশ।

ষষ্ঠ অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তাহলে পৌত্রী কোন অংশ পাবে না। এ অবস্থায় পৌত্রীর সাথে পৌত্র থাকলেও অংশ পাবে না। উদাহরণস্বরূপঃ এমদাদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র এবং পৌত্রী রেখে গেলেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী পাবে ৮ ভাগের ১ ভাগ অংশ, পুত্র পাবে ৮ ভাগের ৭ ভাগ অংশ, পৌত্র এবং পৌত্রী বঞ্চিত হবে। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮নং সংশোধনীর ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে স্ত্রী পাবে ৪৮ ভাগের ৬ ভাগ অংশ, পুত্র

---

[৪২১]. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৫।
[৪২২]. **মুসলিম পারিবারিক আইন**, ১৯৬১ সালের ৮ নং অর্ডিনেন্স-রাওয়াল পিন্ডি ২রা মার্চ ১৯৬১।
[৪২৩]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

পাবে ৪৮ ভাগের ২১ ভাগ অংশ, পৌত্র পাবে ৪৮ ভাগের ১৪ ভাগ অংশ এবং পৌত্রী পাবে ৪৮ ভাগের ৭ ভাগ অংশ। মৃত ব্যক্তির যদি পৌত্রী ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকে, তাহলে ইসলামী আইনে পৌত্রীর উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে পৌত্রী।[৪২৪]

মোহরের অধিকার

ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যে সম্পদ নগদ প্রদান করে বা পরবর্তীতে প্রদানের অঙ্গীকার করে তাকে 'মোহর'[৪২৫] বলে। 'মোহর' স্ত্রীর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নির্ধারিত একটি বিশেষ অধিকার। বিবাহের সময় নারীকে দেয়ার জন্য যে অর্থ বাধ্যতামুলকভাবে নির্ধারণ করা হয় তাই মোহর। আল কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "মোহর ধার্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণ কম-বেশী করে নাও, তাতে দোষের কিছু নেই।"[৪২৬]

মোহরের পরিমাণ

স্ত্রী হালাল হওয়ার অপরিহার্য বিনিময় মাধ্যম হলো মোহর এবং এটি পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয। কিন্তু শরীয়তে এর কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। তবে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে মোহরের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যা পরিশোধ করা স্বামীর জন্য কষ্টকর না হয় আবার স্ত্রীর অধিকার অক্ষুন্ন থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা সহবাস বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না। কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিবে; সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থানুযায়ী খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে। এটি সত্য পরায়ণ লোকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[৪২৭]

বিবাহের সময় মোহরের যে চুক্তি করা হয় তা পূর্ণ করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। এটা স্বামীর জন্য এমন এক দায়িত্ব যা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই তবে স্ত্রী যদি স্বাচ্ছন্দে নির্ধারিত মোহর মাফ করে দেয় তাহলে স্বামী এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। আর যদি স্ত্রী তা মাফ না করে এবং মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্বামীর মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। তাই মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীদের সতর্ক ভুমিকা পালন করা উচিত। প্রত্যেক স্বামী নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ করবে। তবে বিত্তবান ব্যক্তি স্ত্রীর দাবি অনুসারে বেশী পরিমাণে মোহর দিতে পারে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহরের অংশবিশেষ সে ফেরত নিতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক তবে তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার নিকট থেকে কিছুই ফেরত নিবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফেরত নেবে?"[৪২৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"[৪২৯]

---

[৪২৪]. আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০-১১।

[৪২৫]. যে টাকা বা বস্তু বিবাহিতা নারীকে স্বামীর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় তাই মোহর। (মালিক রাম, নারী **সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা**, অনুবাদ: মাহমূদা বেগম নেকু, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ: ৯৪)। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও।"(আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ৪)।

[৪২৬]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ২৪। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোহরের বিনিময়েই স্ত্রীর উপর স্বামী অধিকার লাভ করে থাকে এবং মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য ফরয।

[৪২৭]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াত: ২৩৬।

[৪২৮]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ২০।

[৪২৯]. আল কুর'আন, **সুরা আল বাক্বারা**, আয়াত: ২২৯। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী (রহ.) বলেন, "স্ত্রীকে স্বামী যা কিছু দিয়েছে তা থেকে কিছু বা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে স্ত্রী যদি খুল'আর মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাই তবে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু অংশ ফেরত নিতে পারবে। (আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী, **আল বাহরুল মুহীত ফিত্‌ তাফসীর**, ২য় খন্ড, বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, তা.বি. পৃ: ৪৬৯)। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "অবশ্য এরূপ অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে না বলে আশংকাবোধ করবে। তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া যে, স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

মোহরের পরিমাণ স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। হাদীসে আছে, এক নিঃসম্বল সাহাবী এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলে রাসুল (স.) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, না। নবী (স.) বললেন, যাও খুজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কিনা, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। এমনকি একটি লোহার আংটিও নয়। নবী (স.) বললেন, তুমি কি কুর'আনের কিছু মুখস্থ জান? সে উত্তল দিল আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। নবী (স.) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুর'আন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।"[৪৩০]

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আটির সমপরিমান স্বর্ণ মোহরানা দিলেন।[৪৩১] সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি বিবাহ কর, মোহরানা হিসেবে একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।"[৪৩২]

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান আবশ্যকীয়। তা যত নিম্ন পরিমাণ হোক না কেন। আবার মোহরের কোন উর্ধ্বসীমাও নির্ধারিত নেই। স্বামীর সামর্থ ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হবে। তবে স্বামীর পক্ষে যে পরিমাণ মোহর প্রদান করা সহজ হয় সেই পরিমাণ নির্ধারণ করাই উত্তম।

মোহর আদায়ঃ স্ত্রীকে স্বামী মোহর প্রদান করবে এটাই ইসলামের বিধান এবং স্বামীর কাছ থেকে মোহর পাওয়া নারীর অধিকার। কেননা স্বামী হিসেবে স্ত্রীর উপর মোহরের বিনিময়েই তার অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিবাহের সময় মোহর প্রদানের যে চুক্তি হয় তা প্রদান করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। স্বামী যদি চুক্তি অনুযায়ী মোহর আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার অধিকার রাখে।[৪৩৩] মোহর আদায় করা প্রসংগে হযরত উকবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) বলেন, "সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তা হল, যে শর্ত দ্বারা তোমরা (নারীদের) বিশেষ অঙ্গ উপভোগ করা হালাল করে থাক।"[৪৩৪] নবী (স.) আরও বলেন, "যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে বিয়ে করে আর মনে মনে নিয়ত করে যে, এটা আদায় করবে না, সে একজন ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে কর্জ নেয় আর মনে মনে নিয়ত করে যে সে তা পরিশোধ করবে না, সে একজন চোর।"[৪৩৫]

মোহর আদায়ের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকারী স্ত্রী। মোহরের মালিকানা যেহেতু স্ত্রীর, সেক্ষেত্রে আদায় করার ব্যাপারেও স্ত্রীর মতামত চূড়ান্ত। স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহর নগদ আদায় করতে পারে, আবার পরবর্তীতে পরিশোধ করার জন্য স্বামীকে সে কিছুদিন সময় দিতে পারে, আবার সম্পূর্ণ রা কিয়দংশ মাফ করে দিতে পারে। মোহর আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর সাথে সহবাস, তার আদেশ পালন ও তার সাথে এক গৃহে অবস্থান করতে অস্বীকার করার অধিকার স্ত্রীর আছে। মোহর পরিশোধের পূর্বে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মোহর

স্বামীকে কিছু বিনিময় দান করে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবে, এটা কিছুমাত্র দূষণীয় নয়।" (আল কুর'আন, সুরা আল বাক্বারা, আয়াতঃ ২২৯)।

[৪৩০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ৫ম খন্ড, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃঃ ৬৪।

[৪৩১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

[৪৩২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

[৪৩৩]. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, জুলাই-১৯৯৬), পৃঃ ৩০-৩১।

[৪৩৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, অনুবাদঃ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য, ৫ম খন্ড, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃঃ ৬৫।

[৪৩৫]. হাফেজ আবদুল আযীয আল মুনযেরী, **আত্তারগীব ওয়াত তারহীব**, ৩য় খন্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৪ হিজরী), পৃঃ ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আদায় না হওয়া পর্যন্ত মৃত স্বামীর সম্পত্তি দখল করে রাখতে পারে।[৪৩৬] তবে মোহর যেহেতু স্ত্রীর অধিকার তাই স্বামীত্বের অধিকার লাভের সময়ই তা পরিশোধ করা উচিত। কিন্তু স্বামী যদি তৎক্ষনাৎ পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তবে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা খুশিমনে এর কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার।"[৪৩৭]

মোহরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসুল (স.) বলেন, "বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনযোগ্য শর্ত হলো এই যে, তোমরা মোহর আদায় করবে। কেননা এর দ্বারাই তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক লাভ করে থাক।[৪৩৮] অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আলকামা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মাসউদ (রা:) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। সেই লোকটি মোহর নির্ধারণ না করেই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার পূর্বেই লোকটি মারা যায়। ঘটনাটি শোনার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) বললেন, এ বিধবা মহিলা মহরের মেছেল পাবে। অর্থাৎ তার পরিবারের অন্য মহিলাদের মহরের সমপরিমাণ মোহর পাবে। কমও নয়, বেশীও নয়। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে তার মৃত স্বামীর সম্পদে মীরাসও পাবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) এর এই সিদ্ধান্ত শুনে মা'কাল ইবনে সিনান আল আশজ'য়ী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাদের গোত্রের বিরউয়া' বিনতে ওয়াশিক নাম্নী এক মহিলার ব্যাপারেও রাসূলে করীম (স.) ঠিক আপনার সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) খুব সন্তুষ্ট হলেন।"[৪৩৯]

সুতরাং স্বামীকে অবশ্যই মোহর দিতে হবে। কারণ এর বিনিময়েই ইসলামী শরীয়ত স্ত্রীকে স্বামীর জন্য হালাল করে দিয়েছে এবং এটি স্ত্রীর একটি অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার।

স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করার অধিকার

স্ত্রীকে ধন-সম্পদ আয় করা, ব্যয় করা, ব্যবহার করা এবং দান-খয়রাত করার অধিকার ইসলাম প্রদান করেছে। প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার সম্পত্তি থেকে অর্থ ব্যয় করতে পারবে। তবে ইসলামে স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণ করে নেওয়া উত্তম পন্থা বলে উল্লেখ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, "স্ত্রী যদি খাদ্যদ্রব্য হতে শরীয়ত বিরোধী এবং অহেতুক নয় এমনভাবে ব্যয় করে, তাহলে খরচ করার জন্য সে সওয়াব পাবে আর উপার্জন করার জন্য তার স্বামী সওয়াব পাবে।"[৪৪০] হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেছেন, "স্ত্রী যদি স্বামীর রোজগার করা সম্পদ থেকে তার আদেশ ছাড়াই কিছু ব্যয় করে, তবে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে।"[৪৪১]

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা:) একদিন নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! স্বামী যুবাইর আমাকে সংসার খরচ করার বাবদ যা কিছু দেন, তাছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এ থেকে দান খয়রাত হিসেবে কিছু খরচ করলে কি আমার গুনাহ হবে? তখন নবী (স.) বললেন, যা পার দান সাদকাহ করতে পার, তবে নিজের তহবিলে জমা করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমার শাস্তি জমা করে রাখবেন।"[৪৪২]

---

৪৩৬. তানযীলুর রহমান, **মাজমুআহ কাওয়ানীনে ইসলাম**, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৮; Asif Fyzee, **Out lines of Muhammadan Law**, 2nd Edition, Oxford, 1995; Sir Ronald K. Wilsow, **Anglo Muhammadan Law**, 4th ed. London, 1912, p:167-168.

৪৩৭. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ৪। তবে মোহর মাফ করিয়ে নেয়া বা কম করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবাহের রাত্রে নববধুর আবেগকে কাজে লাগিয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। অথবা মোহর মাফ করে দেয়া বা কম করে দেয়ার জন্য জোর করা যাবে না। কেননা মোহর নির্ধারণ ও প্রদান করা বিয়ে হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত।

৪৩৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, ১ম খন্ড, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫৫।

৪৩৯. আবদুর রহমান আহমাদ ইব্ন শুয়াইব আন-নাসায়ী, **সুনানু নাসায়ী**, কিতাবুন নিকাহ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৯।

৪৪০. আবু দাউদ, **সুনান**, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩১।

৪৪১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুন নাফাকাত, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮০৭।

৪৪২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২০।

Dhaka University Institutional Repository

এক মহিলা রাসুল (স.) কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা তো আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর বোঝাস্বরূপ। এ অবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ হতে খরচ করার কোন অধিকার আমাদের আছে কি? এর জবাবে রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ, তোমরা যাবতীয় তাজা খাদ্য খাবে এবং অপরকে হাদিয়া দিবে।"[৪৪৩]

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পিতা, পুত্র এবং স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা এবং অপরকে হাদিয়া দেওয়া, দান-খয়রাত করার জন্য অর্থ ব্যয় করার পরিপূর্ণ অধিকার নারীর আছে। তবে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনে ব্যয় করাকে ইসলাম কখনই সমর্থন করে না।

"স্বামীর ধন-সম্পদ হতে স্ত্রীর জন্য দান সাদকা করা জায়েয কিনা"- এ নিয়ে মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে, দানের পরিমাণ সামান্য হলে কোন দোষ নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তবে সে অনুমতি সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট হলেও ক্ষতি নেই। তবে কোন অন্যায় কাজে অথবা স্বামীর ধন বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আবার কোন কোন মনীষির মতে, স্বামীর ধন-সম্পদে যখন স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত, তখন তা থেকে দান-সাদকা করাও স্ত্রীর জন্য জায়েয।[৪৪৪]

স্ত্রীর নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় ব্যবহার সম্পর্কেও মুসলিম মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় মনীষীর মতে, এটা বৈধ নয়।[৪৪৫] তবে অধিকাংশ মনীষীর মতে এটা বৈধ। তাদের মত এই যে, স্ত্রী যদি বুদ্ধিহীনা ও বোকা না হয়, তাহলে স্বামীর কোন প্রকার অনুমতি ছাড়া সে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যয় করতে পারবে। আর যদি সে বুদ্ধিহীন হয় তবে পারবে না।[৪৪৬] তাদের মতের স্বপক্ষের দলীল এই যে, রাসুল (স.) এর আহ্বানক্রমে মহিলা সাহাবীগণ নিজ নিজ অলংকার জিহাদের জন্য দান করেছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, স্ত্রীর নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করতে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) নারীদের কাছে বর্ণনা করলেন, তাদের উপদেশ দিলেন এবং সাদকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় হযরত বিলাল (রাঃ) কাপড় ধরলেন আর মহিলারা তার আংটি, কানের বালা ইত্যাদি ফেলতে লাগলেন।"[৪৪৭] সুতরাং এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীরা তাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দান-সাদকাহ করতে পারবে। আবার প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেও ধন সম্পদ ব্যয় করতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে ব্যয় করাই উত্তম।

---

[৪৪৩]. আবু দাউদ, **সুনান**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

[৪৪৪]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮।

[৪৪৫]. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান-সাদকা করা বা উপহার উপঢৌকন দেয়া জায়েজ নয়। অন্য বর্ণনায় আছে, স্ত্রীর দাম্পত্য সত্তার মালিক যখন স্বামী, তখন তার অনুমতি ছাড়া নিজের ধন সম্পদ ব্যয় বন্টন করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়।"(ইমাম আহমদ, **মুসনাদ**, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২১)। উক্ত হাদীস মোতাবেক স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ধন-সম্পদ তো নয়ই বরং স্ত্রীর নিজের ধন-সম্পদ হতেও দান সাদকাহ, উপহার উপঢৌকন দেয়া বৈধ নয়। কিন্তু ফকীহগণ এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাউস ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তার ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে দান-সাদকাহ করতে পারে তার বেশী নয়।" আর ইমাম লাইস (রহ.) বলেন, "স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কোন ধন-সম্পদই দান-সাদকা করা বৈধ নয়, তা এক তৃতীয়াংশ হোক বা তার কম বা বেশী হোক। তবে খুব সামান্য হলে তা ধর্তব্য নয়।"(মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৯)।

[৪৪৬]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৯।

[৪৪৭]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, কিতাবুন ঈদায়েন, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্মক্ষেত্রে নারী প্রগতি

ইসলাম নারীর চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতাকে শুধু জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেনি। বরং তার কর্মতৎপরতার ব্যাপক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। নারী তার জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে সাহিত্য, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরী এবং অন্যান্য পেশা গ্রহণ করতে পারে।[৪৪৮]

ইসলাম নারীকে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতানুযায়ী সকল ক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি দেয়। তবে ইসলামের মৌল নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে তার সামঞ্জস্য ও সংগতি থাকতে হবে। যেমন মা ও স্ত্রীর জন্য তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, এমন কাজ না করাই উত্তম। তাই বলে ইসলাম নারীকে শুধু পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে বলেছে তা নয়। বরং নারীকে পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত করে দিলেও তার চিন্তা ও কর্মের জগতকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়নি। আবার সামাজিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার সমূহ থেকেও তাকে বঞ্চিত করেনি। বরং ইসলাম নারীকে এতটা যোগ্য করে গড়ে তোলার অধিকার দিয়েছে যাতে সে সমাজে সফল ও সার্থক জীবন যাপন করতে পারে।[৪৪৯] রাসূল (স.) এর সময়ের মহিলা সাহাবীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

ঘরে-বাইরে কর্মতৎপরতা

জীবনের প্রয়োজনে ইসলাম নারীদেরকে ঘরে বাইরে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছে। পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন এবং কল্যাণকর কাজের পূর্ণতা সাধনের জন্য নারী ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারে। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে মুসলিম নারীরা প্রয়োজনের তাগিদে ঘরের বাইরে হাটে বাজারে, ক্ষেত-খামারেও চলে যেতেন এবং এ ব্যাপারে বিশেষ কোন ধরণের নিষেধাজ্ঞা ছিল না। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরেও নারীরা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হতেন। তবে তখন তারা পর্দা সম্পর্কিত ইসলামী বিধান মেনে চলতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, হযরত সাওদা (রাঃ)[৪৫০] কে ঘরের বাইরে যেতে দেখে হযরত উমর (রাঃ) তাঁর সমালোচনা করলে তিনি (কোন কথা না বলে) ঘরে ফিরে আসলেন এবং নবী (স.) এর কাছে বিষয়টি বললেন। এর পরই নবী (স.) এর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন, "প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।"[৪৫১] সুতরাং

---

[৪৪৮]. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯; মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

[৪৪৯]. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫; মাওলানা আব্দুর রহিম, নারী, (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃঃ ৪২।

[৪৫০]. **হযরত সাওদা (রাঃ)ঃ** হযরত খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যুর এক মাস পর হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুওয়াতের দশম বর্ষের রমজান মাসে তায়িফ ভ্রমণে বের হওয়ার পূর্বে সাওদা (রাঃ) এর সাথে রাসূল (স.) এর বিয়ে সম্পন্ন হয়। যেহেতু হযরত সাওদা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিয়ের সময়কাল কাছাকাছি ছিল সে কারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কার বিয়ে আগে হয়েছিল এই নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাকের এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে সাওদা (রাঃ) এর বিয়ে আগে হয়েছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে এটাই সঠিক। এই বিয়ের সময় সাওদা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৫৫ বছর। অপরদিকে মুহাম্মদ (স.) এর বয়স ছিল ৫১ বছর। বিবি খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যুই পর তার দুই নাবালিকা কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা যাহরার লালন-পালন করার জন্য এবং সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন দায়িত্বশীল স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল। হযরত সওদা (রাঃ) রাসূল (স.) এর সংসারে পদার্পণ করে সংসারের যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং মা হারা মেয়েদেরকে ভালবাসা, স্নেহ দিয়ে এমনভাবে মানুষ করেছিলেন যে, কেউ মনে করতে পারতেন না তিনি তাদের আপন মা নন। মহিমাময় সাওদা (রাঃ) এর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে চব্বিশ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন বলে উল্লেখ আছে। ইমাম বুখারীসহ অধিকাংশ আলেম এ মতকে সমর্থন করেন। মদীনায় বাকী নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়েছিল।

[৪৫১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুত তাফসীর, সুরাতুল আহযাব, অনুচ্ছেদঃ "কাওলুহু লা-তাদখুলু বুয়ুতান নাবীয়ে" ২য় খন্ড, পৃঃ ৭০৭; **মুসনাদে আহমদ**, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায়, প্রয়োজনে ঘরের বাইরে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে ইসলামী সমাজ নারীকে অনুমতি প্রদান করেছে।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করানো

নারীকে প্রয়োজনে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতে এবং অন্যের সন্তানকে দুধপান করাতে ও লালন পালন করতে ইসলাম অনুমতি প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী নিজেরা যে স্থানে বাস করো তাদেরকেও সেখানে বাস করতে দাও। অসুবিধায় ফেলার জন্য তাদেরকে কষ্ট দিওনা। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করতে থাক। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে থাকে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করো এবং সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেদের মধ্যে উত্তম পন্থায় পরামর্শ করো। আর তোমরা নিজ নিজ দাবীতে অনড় থাকলে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে।"[৪৫২]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছে। আমার পিতার[৪৫৩] নামানুসারে আমি তার নাম রেখেছি ইবরাহীম। তারপর তাকে আবু ইউসুফ নামের এক কর্মকারের স্ত্রী উম্মে সাইফের কাছে স্তন্যদানের জন্য অর্পণ করলেন।" অপর এক হাদীসে আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতি রাসূল (স.) এর চেয়ে অধিক দয়ালু ও স্নেহশীল লোক আর দেখিনি। তিনি বলেছেন, মদীনার আওয়ালী অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইবরাহীম স্তন্য পানের জন্য ধাত্রী মাতার কাছে ছিলেন। নবী (স.) তাকে দেখতে যেতেন। আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি তার বাড়ীতে প্রবেশ করতেন। তিনি সেখানে আগুন জ্বালাতেন। তার স্বামী ছিল কর্মকার। নবী (স.) তাকে (ইবরাহীম) কোলে নিয়ে চুমু খেতেন এবং তারপর ফিরে আসতেন।[৪৫৪]

কৃষিকাজ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূল (স.) এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ তুমি তোমার খেজুর কাটতে পার। তুমি তো ঐগুলি অবশ্যই দান করবে অথবা ভাল ব্যবহার করবে।[৪৫৫]

আবু হুমাইদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (স.) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছে এক মহিলাকে তার খেজুর বাগানে দেখতে পেলেন। নবী (স.) তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমরা এই বাগানে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করো। রাসূল (স.) নিজে দশ ওয়াসাক পরিমাণ অনুমান করলেন। তিনি বাগানের মালিক মহিলাকে বললেন, বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেখো। আমরা তাবুতে পৌঁছলে তিনি বললেন, আজ রাতে প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন রাতের বেলা উঠে না দাড়ায় এবং যার সাথে উট আছে সে যেন তা বেঁধে রাখে। তাই আমরা উঠগুলো বেঁধে রাখলাম। রাতে প্রচন্ড ঝড় প্রবাহিত হলো। সেই সময় একব্যক্তি উঠে দাড়ালে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করলো। সেই সময় আইলার শাসক নবী (স.) কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিলেন। নবী (স.) ও তার জন্য একখানা চাদর পাঠালেন এবং তাকে ঐ এলাকার শাসক হিসেবে বহাল রেখে ফরমান লিখে দিলেন। ফেরার পথে তিনি ওয়াদিউল

---

[৪৫২]. আল কুর'আন, **সূরা আত-তালাক**, আয়াত: ৬।

[৪৫৩]. মুসলমান জাতীর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:)।

[৪৫৪]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: শিশু ও পরিবার পরিজনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.) এর দয়া ও বিনম্র আচরণ এবং তাঁর মর্যাদা, ৭ খন্ড, পৃ: ৭৬।

[৪৫৫]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বায়েন তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের বের হওয়ার বর্ণনা, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২০০। আবু দাউদ, **সুনান**, কিতাবুত তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ফিল মাবতুতাতি তাখরুজু বিন নাহার; ইবনে মাজা ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কুরায় পৌঁছলে সেই মহিলাকে তার বাগানে উৎপন্ন খেজুরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, দশ ওয়াসাক। যা রসূল (স.) অনুমান করেছিলেন।[৪৫৬] সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমানিত যে, রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা কৃষিকাজ করত।

পশুচারণ

মু'আবিয়া ইবনে হাকাম আস্‌সালামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "আমার একজন দাসী ছিল। সে মদীনার পার্শ্ববর্তী ওহোদ ও জাওয়ানিয়া এলাকায় আমার বকরী চরাতো। একদিন সে আমাকে জানালো যে, হঠাৎ একটি বাঘ এসে তার বকরীর পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমি এমন একজন লোক যে অন্যদের মত শুধু আফসোস করলাম তবে আমি তার গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করেছিলাম। পরে আমি রাসূল (স.) এর কাছে গেলাম। তিনি আমার একাজকে গুরুতর বলে মনে করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বললো, আসমানে। তিনি বললেন, সে মুমিন, তাকে মুক্ত করে দাও।"[৪৫৭]

সাদ ইবনে মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কা'ব ইবনে মালেকের এক দাসী সালা' পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাতো। একটি বকরী হঠাৎ করে আহত হলে সে সেটিকে ধরে পাথর দ্বারা যবেহ করলো। এ বিষয়ে নবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা খেতে পার।"[৪৫৮] সুতরাং নারীদের যে পশুচারণের অধিকার আছে এবং রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা পশুচারণ করতেন তা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ব্যবসা-বাণিজ্যে

ফায়লা (রাঃ) নাম্মী এক মহিলা সাহাবী নবী (স.) কে বললেন, আমি একজন মহিলা। আমি নানা প্রকার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি (অর্থাৎ আমি ব্যবসায়ী) এরপর সে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নবী (স.) এর কাছ থেকে জেনে নিল।[৪৫৯]

হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফত যুগে আসমা বিনতে মাখরা (রাঃ) কে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাতো আর তিনি ঐ আতরের কারবার করতেন।[৪৬০] আমরা বিনতে তারীখ বলেন, একবার দাসীকে সাথে করে বাজারে গিয়ে মাছ খরিদ করে থলিতে রাখলাম। (থলি ছোট থাকায়) মাছের মাথা ও লেজ থলির বাইরে বেরিয়ে ছিল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রাঃ) তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কত দাম দিয়ে কিনেছেন? এতো বেশ বড় এবং সুন্দর। পরিবারের সবাই তৃপ্তির সাথে খেতে পারবে।[৪৬১] বিখ্যাত মালেকী ইমাম আশহাব (রহ.) একবার এক দাসীর নিকট থেকে সবজি ক্রয় করলেন। তৎকালীন রীতি ছিল, সবজির মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করার পরিবর্তে সবজি বিক্রেতাকে রুটি বা খাদ্য দেয়া। আশহাবের (রহ.) কাছে সেই মূহুর্তে রুটি ছিল না। তিনি দাসীকে বললেন, সন্ধ্যা

---

[৪৫৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ খেজুরের পরিমাণ অনুমান করা, ৪ খন্ড, পৃঃ ৮৭; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী (স.) এর মু'জিযা, ৭ খন্ড, পৃঃ ৬১।

[৪৫৭]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নামাযের মধ্যে কথা বলা হারাম ও তার বৈধতা মানসুখ হওয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭১ ।

[৪৫৮]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, যবেহ ও শিকার করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নারী ও দাসীর যবেহকৃত জন্তু, ১২ খন্ড, পৃঃ ৫১।

[৪৫৯]. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইবনে সা'দ**, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২।

[৪৬০]. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইবনে সা'দ**, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২; আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু রাবী বিনতু মু'আওয়েয; কিতাবুত তাবাকাত-এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র.) রাসূল (স.) এর এমন সাহাবীগণের বর্ণনা করেছেন, যারা রাসূল (স.) কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থটি হিজরী ৬২৮ সালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের একটি কপি তুরস্কের আহমদ আস্- সালিস্' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক সংখ্যা ৬২৪/২৬।

[৪৬১]. **তাবকাতে ইবনে সা'দ**, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

বেলায় রুটি বিক্রেতার নিকট থেকে রুটি আসলে তুমি এসে নিয়ে যাবে। দাসী বললো, জনাব এটা তো না জায়েয। খাদ্য দ্রব্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে শরীয়ত তো তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ করতে আদেশ করেছে।[৪৬২]

বারী বিনতে মু'আউয়েম বলেন, আমরা কয়েকজন মহিলা আসমা বিনতে মাখরামার নিকট থেকে আতর খরিদ করলাম। তিনি শিশিতে আতর ভর্তি করে আমাদের বললেন, "তোমাদের কাছে আমার অর্থ পাওনা থাকলো তা লিখে দাও।"[৪৬৩] সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, নারীদের ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার আছে এবং রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা ব্যবসা বাণিজ্য করতো।

শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের স্বামীর এবং সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন একদিন তিনি নবী (স.) কে বললেন, "আমি কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করি। (এভাবে আমি উপার্জন করতে পারি)। কিন্তু আমার স্বামী ও সন্তানদের (আয়ের কোন উৎস) কিছুই নেই। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি কি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারেন? নবী (স.) বললেন, হ্যাঁ তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার। এজন্য তুমি পুরস্কার লাভ করবে।[৪৬৪]

রাসূল (স.) খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ)[৪৬৫] কে তার স্বামী থেকে আলাদা থাকতে বললেন। তখন তিনি রাসূল (স.) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামীর ব্যয় নির্বাহের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি তার ব্যয় নির্বাহ করে থাকি। সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিভাবে জীবন যাপন করবে?[৪৬৬]
যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) স্বহস্তে কাজ করে আল্লাহর পথে তা দান করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যয়নাব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীলা ছিলেন। কারণ তিনি স্বহস্তে কাজ করতেন ও সাদাকাহ করতেন।[৪৬৭]

---

৪৬২. **আল-মাদখালু লিইবনিল হাজ্জ,** প্রথম খন্ড, পৃঃ ২১৫।
৪৬৩. **তবকাতে ইবনে সা'দ,** ৮ম খন্ড, পৃঃ ২২০।
৪৬৪. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবাকাতে ইবনে সা'দ,** ৮ম খন্ড, পৃঃ ২১২; আল ইসাবা ফীত তামীযিস্ সাহাবা' গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় একই বিষয়ের উল্লেখ আছে।
৪৬৫. **খাওলা বিনতে সালাবা (রাঃ):** বনি আওস গোত্রে খাওলা বিনতে সা'লাবার জন্ম, তিনি নবী করীম (স.) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। খাওলা (রাঃ) এর স্বামী আওস বিন সামিত ছিলেন কঠোর মেজাজের অধিকারী এবং বার্ধক্যের কারণে তার মেজাজ আরও তিক্ত ও কর্কশ হয়ে গিয়েছিলো। জাহেলী যুগের আরবদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে বলতঃ "তোমার পৃষ্ঠদেশ আমার মায়ের মত।" খাওলা বিনতে সা'লাবার স্বামী একথা বললে এ ব্যাপারে ফয়সালার জন্য নবী (স.) এর দরবারে হাযির হলেন স্বামী পরিত্যক্ত খাওলা (রাঃ)। তিনি রাসূল (স.) কে বললেন, আমি শপথ করে বলছি আমার স্বামী আমাকে রাগ করে একথা বলেছেন। তিনি আমাকে তালাক দেননি। রাসূল (স.) বললেন, আমার মনে হয় তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ। রাসূল (স.) এর কথা শুনে খাওলা (রাঃ) এর দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আমার জীবনের কঠিন তাকলীফ ও বিরহ বিচ্ছেদের অভিযোগ করছি। "হে আল্লাহ আমার জন্য যা কল্যাণকর হয় তাই তোমার নবীর মারফত আমাকে জানিয়ে দাও।" হযরত আয়েশা (রাঃ) খাওলা (রাঃ) এর ফরিয়াদ দেখে আল্লাহর দরবারে কাঁদলেন। অত:পর খাওলা (রাঃ) এর পক্ষেই আল্লাহপাক ফয়সালা করে দিলেন। নাযিল হল সূরা আল মুজাদালার ১ও ২ নং আয়াতঃ "আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন সেই মেয়ে লোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের দুইজনেরই কথা-বার্তা শুনতে পেয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনা দানকারী।" (আল কুর'আন, **সূরা আল মুজাদালাহ,** আয়াতঃ ১-২)। এ কারণেই মহিলা সাহাবীদের মধ্যে খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ) বিশেষভাবে মর্যাদাবান।
৪৬৬. যেহেতু খাওলা (রাঃ) ও তার স্বামীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল এ সম্পর্কিত সমাধান হওয়ার আগে রাসূল (স.) তাদেরকে আলাদা থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণেই খাওলা বিনতে সালাবা (রাঃ) রাসূল (স.) কে প্রশ্ন করেছিলেন। (মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবাকাতে ইবনে সা'দ,** ৮ম খন্ড, পৃঃ ২৭৬)।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) নিজের সহধর্মিণী যয়নাবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন।[৪৬৮] হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[৪৬৯] যে, হযরত যয়নাব (রাঃ) হস্তশিল্পে খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করতেন এবং তা সেলাই করে আল্লাহর পথে দান করতেন।[৪৭০]

সাদ ইবনে সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা চতুর্দিকে নকশা করা একখানা 'বুরদাহ' নিয়ে নবী (স.) এর কাছে এলো। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'বুরদাহ' কাকে বলে তা কি তোমরা জান? তাকে বলা হলো, হ্যাঁ জানি। নকশা করা পাড়বিশিষ্ট কাপড়। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এ কাপড় খানা আমি নিজ হাতে তৈরী করেছি।[৪৭১]

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক আনসারী মহিলা রসূল (স.) কে বললো, আমার একজন কাঠমিস্ত্রী ক্রীতদাস আছে অন্য একটি বর্ণনায় আছে[৪৭২] সে তার ক্রীতদাসকে আদেশ করলে সে তারাফা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে একটি মিম্বর তৈরী করে দিল।[৪৭৩]

শিক্ষকতা

রাসূল (স.) এর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি অসংখ্য নারী ও পুরুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। আয়েশা বিনতে তালহা (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে লোক আসত।[৪৭৪]

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) এর মত পন্ডিত ও ফিকাহবিদ সাহাবা হযরত আয়েশা (রাঃ) জ্ঞান ও পান্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মত আরো অনেকের অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূল (স.) এর সাহাবারাও কোন হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করতাম এবং ঐ বিষয়ে তাঁর কাছে কোন না কোন জ্ঞান লাভ করতাম।[৪৭৫] সুতরাং নারীদের শিক্ষাদানের অধিকারও রাসূল (স.) এর সময়ের নারীরা ভোগ করেছেন।

সেবামূলক কাজ

ইসলামের শত্রুদের ব্যর্থ করে দেয়ার কাজে নারীরা সরাসরি যতটা অংশগ্রহণ করেছে পরোক্ষভাবে তার চেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছে বাতিলের শক্তি সমূহের মোকাবিলার কাজে। যুদ্ধে নারীরা তীর না ছুঁড়লেও বিভিন্নভাবে যোদ্ধাদের সহযোগীতা করেছে। আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন সৈনিক আহত হলে তাকে সাহায্য করত এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হলে তার জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ছুটত।[৪৭৬] রুবাই বিনতে মু'আওয়েয

---

৪৬৭. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবীদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উম্মুল মু'মীনীন হযরত যয়নাবের ফযিলত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৪।

৪৬৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কোন মহিলাকে দেখার পর মনে এ ভাবের উদয় হওয়া যে তার স্ত্রী বা ক্রীতদাসী এলে তার সাথে মিলিত হতো এমনকি দূষণীয় নয়, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২৯।

৪৬৯. বর্ণনাটি হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ আছে এবং এ বর্ণনা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ।

৪৭০. **ফাতহুল বারী**, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৯-৩০।

৪৭১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ তাঁতি, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২২২।

৪৭২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হিবা ও তার মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বন্ধুর কাছে কিছু চাওয়া, ৬ খন্ড, পৃঃ ১২৭।

৪৭৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কাঠমিস্ত্রী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২২২।

৪৭৪. **আল আদাবুল মুফরাদাত**, অনুচ্ছেদ; আল কিতাবাতুল ইলমে নিসা ও জাওয়াবিহিন্না। 'আল আদাবুল মুফরাদাত' এটি একটি হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে রাসূল (স.) এর জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ৬৪৪ টি অধ্যায় রয়েছে। হাদীস সংখ্যা ১৩২২ টি। হিন্দুস্থান থেকে ১৩০৪ হিজরীতে, ইস্তাম্বুল থেকে ১৩০৬ হিজরীতে এবং কায়রো মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকীর সম্পাদনাসহ ১৩৪৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। (**তারিখুত্ তুরাসিল আরাবী**, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৮; **মু'জুমুল মাতবু'আহ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৩৪)।

৪৭৫. **তিরমিযী শরীফ**, আবওয়াবুল মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বাবু ফাদলি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা।

৪৭৬. জালালুদ্দীন আনসার উমরী সাইয়েদ, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (স.) এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা সেখানে লোকজনদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং যুদ্ধে নিহত ও আহতদের মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।[৪৭৭] নবী (স.) এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরেকজন মহিলা সাহাবী বলেন, আমরা আহতদের মলম লাগিয়ে পট্টি ও ব্যান্ডেজ করতাম, অসুস্থদের ওষুধ ও পথ্য দিতাম এবং সেবা করতাম।[৪৭৮]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে সুলাইম (রাঃ) মুজাহিদদের সেবা করেছিলেন।[৪৭৯] উম্মে সালিত নামক একজন আনসারী মহিলা সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি আমাদের মশক ভর্তি করে পানি এনে দিচ্ছিলেন।[৪৮০]

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেন, বহু মুসলিম মহিলা নবী (স.) এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৪৮১] হাশরাজ ইবনে যিয়াদের দাদী এবং আরো পাঁচজন মহিলা এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তিনি নবী (স.) এর কাছে যুদ্ধেক্ষেত্রে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমরা এজন্য এসেছি যে, আমরা পশমী কাপড় বুনবো এবং তা দ্বারা আল্লাহর পথে সাহায্য করব। আমাদের কাছে আহতদের জন্য ওষুধ আছে। আমরা তীরন্দাজদের তীর যুগিয়ে সাহায্য করব এবং প্রয়োজনে মুজাহিদদের ছাতু গুলিয়ে খাওয়াব।[৪৮২]

উম্মে আতিয়া আনসারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি রাসূল (স.) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি পেছনে তাঁবুর পাহারায় থাকতাম এবং সবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম।"[৪৮৩]

ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা

রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা ঝাঁড়ফুকের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। 'সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন এক আনসারীর পাঁজরে ঘা হলে তাকে জানানো হলো যে, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ ঘা উপশমের জন্য ঝাঁড়ফুঁক করে থাকেন। সে (আনসারী লোকটি) তার (শিফা বিনতে আবদুল্লাহ) কাছে গিয়ে তাকে ঝাড়ফুক করতে বললে সে বললো, আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে আমি আর এজন্য ঝাড়ফুঁক করি না। এতে আনসারী লোকটি রাসূল (স.) এর কাছে গিয়ে শিফা বিনতে আবদুল্লাহ যা বলেছিল তা জানালো। তখন রাসূল (স.) শিফাকে ডেকে এনে বললেন, তুমি যা পড়ে ঝাড়ফুঁক করো তা আমাকে শুনাও। তিনি তাঁকে তা শুনালে তিনি বললেন, এ দিয়ে তুমি ঝাড়ফুঁক করতে থাকো আর হাফসাকে যেমন লেখা শিখিয়েছো তেমনি এই ঝাঁড়ফুঁকও তাকে শিখিয়ে দাও।[৪৮৪]

---

[৪৭৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নারীদের আহত ও নিহত মুজাহিদদের ফেরত পাঠানো, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪২০।

[৪৭৮]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়র অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আন নিসাউল যাসিয়াত; **মুসনাদে আহমদ**, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৮৪। তবে বর্ণনার ভাষা মুসলিমের।

[৪৭৯]. আমি আবু বকরের কন্যা আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে সুলাইম (রাঃ) উভয়কে প্রস্তুত হয়ে মানুষের সেবা করতে দেখলাম। তারা এত দ্রুত এ তৎপরতা চালাচ্ছিলেন যে, আমি তাদের পায়ে পরিহিত মল দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা মশকে পানি ভরে তা কাঁধে বহন করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পানি পান করাচ্ছিলেন। তারপর ফিরে গিয়ে আবার ভর্তি করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পিপাসা নিবৃত্ত করছিলেন। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল মাগাযী, গায্ওয়াতু উহুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইযহাম্মাত তায়েফাতান; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, কিতাবুল জিহাদ ওয়াল খায়বর অধ্যায়)।

[৪৮০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হামলুদ নিসায়ে লকিরাব।

[৪৮১]. **সীরাতে ইবনে হিশাম**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৫।

[৪৮২]. **আবু দাউদ শরীফ**, কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফিল মারআতে ওয়াল আবদে ইয়াখদিমান।

[৪৮৩]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জিহাদ ও সায়ের অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যুদ্ধে বিজয়িনী মহিলাদের গণিমতের মাল দেয়া হতো, কিন্তু অংশ দেয়া হতো না, খন্ড, পৃঃ ১৯৯।

[৪৮৪]. মূলঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, **রসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স.) তার (উম্মে সালামার) ঘরে একজন দাসী দেখলেন যার চেহারা রোদে পোড়া মত ছিল। তিনি বললেন, তাকে ঝাঁড়ফুঁকের ব্যবস্থা করো। কারণ সে বদ নজরের শিকার হয়েছে।[৪৮৫]

গৃহকর্ম

রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা গৃহের সকল কাজ সম্পাদন করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় যুবায়ের আমাকে বিয়ে করেন তখন পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও ঘোড়া ছাড়া তার না ছিল কোন ধন-সম্পদ, না ছিল দাস-দাসী। আমিই তার ঘোড়াকে খাওয়াতাম, পানি পান করাতাম, চর্ম নির্মিত পানির বড় বালতি সেলাই করতাম এবং আটার খামির তৈরী করতাম আর রাসূল (স.) তাকে জায়গীর হিসেবে যে ভূমি দান করেছিলেন সেই ভূমি থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে আনতাম। উক্ত ভূমি খন্ডটি দুই তৃতীয়াংশ ফারসাখ[৪৮৬] দূরে অবস্থিত ছিল। অবশেষে আবু বকর (রাঃ) (আসমার পিতা) আমার জন্য একজন খাদেম পাঠালেন। সেই তখন থেকে ঘোড়ার রাখালি করতো। তিনি যেন এভাবে আমাকে মুক্ত করলেন।[৪৮৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা দিয়ে সমাজ ও সংসার জীবনে পুরুষের পাশাপাশি জাতীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। তাই বলা যায়, ইসলাম শুধু নারীকে কাজ করার অনুমতিই দেয়নি বরং তার জীবনের গতি ও অনুভূতি অনুযায়ী যে সব চাহিদা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় সেগুলোকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য তাকে আহবান জানিয়েছে এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শরীয়াতের সীমা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দিয়েছে।

---

৪৮৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, চিকিৎসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ চোখের রোগের ঝাঁড়ফুঁক করা, ১২ খন্ড, পৃঃ ৩১১; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ চক্ষুরোগ, জ্বর প্রভৃতি রোগে ঝাঁড়ফুঁক করা, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৮।

৪৮৬. ফারসাখ দৈর্ঘ্য পরিমাপের একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এক ফারসাখ তিন মাইলের সমান।

৪৮৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আত্মমর্যাদা বোধ, ১১ খন্ড, পৃঃ ২৩৪; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ গায়ের মাহরাম নারীকে সওয়ারীর পেছনে উঠিয়ে নেয়া, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি

সৃষ্টির প্রথম থেকেই পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দানের ব্যাপারে মহান আল্লাহর একটি স্থায়ী নিয়ম ও রীতি প্রচলিত আছে এবং মানবজাতি যতদিন থাকবে ততদিন তা একই ধারায় প্রবর্তিত হবে। মানব জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং ইসলামী রাজনীতির মূলকথা এই যে, আদেশ প্রদান ও আইন রচনার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। ইসলাম যে ধরণের রাষ্ট্র গঠন করে তাতে একটি আইনসভা থাকা জরুরী। এ আইনসভা মুসলিম জনগণের আস্থা সম্পন্ন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে। এই আইনসভার গঠন ও কার্যপরিচালনা বিধি এবং সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। প্রত্যেক যুগের পরিস্থিতি পরিবেশ ও প্রয়োজনের দাবি অনুসারে এর আলাদা আলাদা ধরণ ও রূপ অবলম্বন করা যেতে পারে।[৪৮৮]

জন্মগতভাবে নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত কারণে একে অপরের উপর কোন প্রধান্য নেই, মৌলিকতার দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে কোন একজনের শ্রেষ্টত্ব নেই। বরং একে অপরের পরিপূরক।[৪৮৯] তাই ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে যে কোন নিরপেক্ষ গবেষণা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে এবং ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে।[৪৯০] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর ঈমানাদর পুরুষ ও ঈমানদার মহিলা একে অপরের সহায়ক। এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে।"[৪৯১]

নারী ও পুরুষ একে অপরের সহায়ক সমর্থক ও সাহায্যকারী। শুধু সামাজিকভাবেই নয় রাজনৈতিকভাবেও তারা একে অপরের সহায়ক এবং তাদের অধিকার আছে পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করার।[৪৯২] আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাফে (রাঃ) বলেন, "রাসুল (স.) যখন কোন রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক কর্মকান্ডে লোকদের সমবেত করার উদ্দেশ্যে 'হে মানবমন্ডলী' বলে সম্বোধন করতেন তখন উম্মে সালামা (রাঃ)[৪৯৩] উক্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন। লোকেরা এ ব্যাপারে

---

[৪৮৮]. রাষ্ট্রের ব্যাপারে নীতিগতভাবে কতগুলি বিষয় স্থির করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে (১) রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড পরামর্শের ভিত্তিতে চালাতে হবে। (২) সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। (৩) কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেও গ্রহণ করা যাবে না। (৪) কুর'আন ও সুন্নাহতে যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা সর্বসম্মতভাবে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় হিসেবে গৃহীত হবে, তা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হবে। (৫) যে সব ব্যাপারে কুর'আন ও সুন্নাহর কোন নির্দেশ থাকবে না সে সব ব্যাপারে মুসলিম জনপ্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং তাদের সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। (৬) নাগরিকদের মধ্যে সরকার ও জনগণের আইন সভা অথবা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশের মধ্যে যে কোন বিবাদ ঘটলে তার নিস্পত্তি যাতে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে করা যায়, সেজন্য একটা যুগসই ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। (সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান**, ঢাকাঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ১ম সংস্করণ, জুন ১৯৯৭, পৃঃ ৩২০-৩২২)।

[৪৮৯]. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, **ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকারঃ একটি সমীক্ষা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ২০০৫, পৃঃ ১৯৭।

[৪৯০]. মুহাম্মদ আবদুল হাই শেখ, **নারী অধিকার**, (ঢাকাঃ মাহবুব প্রকাশনী, ২০০০), পৃঃ ২৫৫।

[৪৯১]. আল কুর'আন, **সুরা আত তাওবা**, আয়াতঃ ৭১।

[৪৯২]. সভ্যতা সংস্কৃতির সব উথান উন্নতিই নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। তাদের একজনকে সভ্যতার অঙ্গন থেকে বহিস্কৃত করে শুধুমাত্র অন্য একজনের উপর সবকিছু চাপিয়ে দিয়ে সভ্যতা সংস্কৃতিকে অগ্রসর করে নেওয়া যায় না।

[৪৯৩]. রাসূল (স.) এর স্ত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন তুললে তিনি জবাবে বলতেন, আমিও মানবমন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত। কেননা এখানে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।"[৪৯৪]

নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার

বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের মতো সুসভ্য দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। খৃষ্ট ধর্মেও নারীর মতামত প্রকাশের অধিকার নেই। বাইবেলে বলা হয়েছে, "......স্ত্রীলোকেরা মন্ডলীতে চুপ করে থাকুক, কারণ কথা বলার অনুমতি তাদের দেয়া হয়নি।"[৪৯৫] অথচ ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বে নারীকে পুরুষের ন্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার এবং ভোট প্রদানের অধিকার দিয়েছে। নির্বাচন হচ্ছে জনগণ কর্তৃক এমন কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নিযুক্ত করার নাম, যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন ও সরকারের তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পন্ন করে। সুতরাং নির্বাচন বা ভোট দান মূলত, প্রতিনিধি নিয়োগ করার জন্য। ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের পছন্দসই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই প্রতিনিধিরা আইন পরিষদে গিয়ে তাদের ভোটাধিকারের পক্ষে কথা বলে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে। নারী যদি কোন ব্যক্তির ওপর তার অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চায় এবং সমাজের একজন সদস্যা হিসেবে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে চায় তবে নারীর এ কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।[৪৯৬]

তবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান মেনে চলতে হবে।[৪৯৭] নারী-পুরুষ একে অপরের সহায়ক, সমর্থক ও সাহায্যকারী। সহায়ক শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয় বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। তাই নারী ভোট দিতে পারে এবং ভোট পেয়ে নির্বাচিত হতে পারে এবং আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারে। জনসাধারণের জন্য কল্যাণমুলক কাজ কর্মে অংশগ্রহণ করার অধিকারও তার রয়েছে।[৪৯৮] পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। .....এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে।"[৪৯৯]

নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামে সরাসরি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়ায় এই অধিকারকে মূলগত শরীয়তসম্মত বলে বিবেচনা করা যায়। এ বিষয়ে ড. মুসতাবা আস সিবায়ীর[৫০০] বলেছেন, "পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইসলাম নারীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। কেননা, ভোটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। এক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ নেই।"[৫০১]

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলাম নারীকে শুধু ঘরের কাজেই প্রাধান্য দেয়নি বরং ঘরের বাইরেও পুরুষের মত কাজ করার, মতামত প্রকাশের, ভোটদানের এবং জনকল্যাণমুলক কাজে অংশগ্রহণ করার সমান অধিকার প্রদান করেছে। নারীজাতি শুধু নারী বলে কেবল ঘরের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকতে

---

[৪৯৪]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, (দিল্লীঃ মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৩৮); মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, **ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকারঃ একটি সমীক্ষা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ২০০৫, পৃঃ ২০৭।

[৪৯৫]. **ইঞ্জিল শরীফ**, ১ করিন্থীয় ১৪:৩৪।

[৪৯৬]. ডঃ মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার) ২০০৪, পৃঃ ১০৪।

[৪৯৭]. ভোটদানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, মেয়েদের ভোটদানের স্থান পুরুষদের থেকে যেন আলাদা হয়। পরিবেশ যেন অনুকুল হয়। অন্যথায় নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে শরীয়াতের সীমা লংঘন হবার আশংকা দেখা দেয়। যেসব মুসলিম দেশে নারীর ভোটাধিকার চালু রয়েছে সেখানে মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা ভোট কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এই শর্ত পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে। (ডঃ মুস্তাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪)।

[৪৯৮]. মুহাম্মদ আব্দুল হাই শেখ, **নারী অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫।

[৪৯৯]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাওবা**, আয়াতঃ ৭১।

[৫০০]. তিনি ছিলেন দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া কলেজের প্রধান এবং শরীয়া বিষয়ের অধ্যাপক। তার যে মতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা একদল শরীয়া বিশেষজ্ঞের মত।

[৫০১]. ড. মুসতাবা আস সিবায়ী, **আর মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন**, (দামেশকঃ মকতবা মালাইন, ১৯৮৮), পৃঃ ১৫৫; মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, **ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার : একটি সমীক্ষা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ২০০৫, পৃঃ ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

হবে ঘরের বাইরের কোন কাজে কিছুমাত্র উৎসুক থাকবে না এবং প্রয়োজনের সময় তাতে কিছুমাত্র অংশগ্রহণ করতে পারবে না, ইসলামী বিধানে এমনটি নেই।

ইসলামে নারী নেতৃত্ব

সাধারণত বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা পরিবেশের উপযোগী ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী সেটাকেই শরীয়ত সম্মত বলে ধরে নেওয়া হয়। তাছাড়া নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে আল কুর'আনে সরাসরি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। তবে নারী নেতৃত্বের বিষয়টি নিয়ে কুর'আনে স্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় এসম্পর্কে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। তাই বিষয়টিকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে নারীর নেতৃত্ব দানের ধরণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

(১) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নেতৃত্ব দান
(২) রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্যান্য পদে নেতৃত্ব দান

(১)রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নেতৃত্ব দান

'নারী রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না' এরকম কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা আল কুর'আনে নেই। তবে একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল (স.) বলেছেন, "যে জাতির নেতৃত্ব নারীর হাতে অর্পিত সে জাতির কল্যাণ নাই।"[৫০২] রাসূল (স.) এর হাদীসটির সাথে পবিত্র কুর'আনের সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতটিকে নারীর রাষ্ট্রপ্রধানের পদে নিয়োগের বিপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "পুরুষরা নারীদের পরিচালক।"[৫০৩] এ সম্পর্কে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ মতামত এই যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই নির্দেশ পারিবারিক জীবনের সাথে জড়িত। তবে বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে ইসলামের নীতিমালা ও আইনের ক্ষেত্রে নারীর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি আপত:দৃষ্টিতে নিরুৎসাহজনক। তবে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থান এবং সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে জনপ্রতিনিধিত্বের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।
তবে ইসলামে নারীকে রাষ্ট্রপ্রধানের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত কারণে এ পদে অধিষ্ঠিত হলে কতিপয় অনস্বীকার্য বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

---

[৫০২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ কিতাবুন নাবী (স.) ইলা কিসরা ওয়া কায়সার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৩৭। তবে এটাও উল্লেখিত আছে রাসূল (স.) এর এই হাদীসটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে এবং একটি বিধর্মী সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারেন যে, পারস্যবাসীরা তাদের মৃত শাসনকর্তা কেছরার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে তখন তিনি এ কথা বলেছিলেন। উক্ত হাদীস দ্বারা সাধারণভাবে সব অবস্থায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য তা প্রমাণ করে না। (মোঃ মাসুদ রানা, **ইসলামে নারীর মর্যাদা ও বাংলাদেশের নারী সমাজ**, ***ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা***, ৪৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃঃ ৭৭)।
[৫০৩]. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াতঃ ৩৪। পবিত্র কুর'আনুল কারীমের সুরা আন নিসার ৩৪ নং আয়াতটিকে বিভিন্ন তাফসীরকারক বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন তাফসীরে শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসীরই এই আয়াতটিকে পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে মাওলানা মওদুদী (রহ.) তাফহীমুল কুর'আনে বলেছেন, কাউয়াম বা পরিচালক সেই লোককে বলা হয়, যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যাপারে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে চালাবার, রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করার এবং উহার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। উক্ত আয়াতে বিশিষ্টতা অর্থ মর্যাদা সম্মান ও ইজ্জত নয়, যেমন সাধারণ লোকদের ধারণা। এখানে শব্দটির অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে পুরুষদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা স্বভাবতঃ এমন কিছু বিশিষ্টতা ও শক্তিমত্তা দান করেছেন যা স্ত্রীদের দেয়া হয়নি কিংবা অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে। একারণে স্ত্রী লোকদের স্বভাব এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে তাদের পারিবারিক জীবনে পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণ ও খবরদারীর অধীন হয়ে থাকাই বাঞ্চনীয়। (সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৫)। উক্ত আয়াতে কাউয়াম বা পরিচালক শব্দ দ্বারা যে কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে তা যদি গোটা সামাজিক ব্যবস্থার জন্যই হয়ে থাকে তাহলে যেসব পরিবারে মেয়েরা উপার্জন ও ব্যয় করে সেখানে قوام (কাউয়াম) বা পরিচালক হবে কে? এ প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্রপরিচালনার পাশাপাশি নামাজের জামাতে ইমামতি[৫০৪] করতে হয়। ইসলামের পরিভাষায় রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে ইমামত ও রাষ্ট্রপ্রধানকে ইমাম বলা হয়। ইসলামী ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মতে, নামাযের ইমামতিকে ইমামতে সুগরা এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে ইমামতে কুবরা বা বড় ইমামতি বলা হয়। নারী রাষ্ট্রের প্রধান হলে তাকেও একই দায়িত্ব পালন করতে হবে। মুসলমানদের নামাযের মধ্যে কতিপয় অঙ্গভঙ্গি রয়েছে। যেমনঃ কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় যদি কোন মহিলা ইমাম পুরুষ মুসল্লিদের সামনে নামাজের উক্ত অঙ্গ-ভঙ্গি করতে থাকে এবং নারীদের কোমল সুরে সুরা কিরাত পড়তে থাকে তবে বিশৃংখলা ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে। কারণ মুসল্লিদের মন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে নারীর দিকে চলে যেতে পারে। এছাড়াও মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নারীর জন্য নামায নিষিদ্ধ থাকে। এরূপক্ষেত্রে নামাযের ইমামতি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে বিভিন্ন স্থানে গমন করতে হয়, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়, প্রয়োজনবোধে বিদেশ ভ্রমণ করতে হয় এবং বিদেশী পুরুষ রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে একান্তে বৈঠক করতে হয়।[৫০৫] এছাড়াও রাষ্ট্রপ্রধানকে সকলশ্রেণীর জনগণের সাথে মেলা মেশা করতে হয়।[৫০৬] নারী যদি কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয় তাহলে তাকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন, তার পর্দার খেলাপ হতে পারে, বৈশিষ্ট্যগত কারণে সে পুরুষের সাথে মিশতে পারবে না, প্রয়োজনে একজন পুরুষ যত দ্রুত সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হবে নারীর পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

তৃতীয়ত: ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নারীর। এ কাজে তাকে সার্বক্ষণিক আন্তরিকতার সাথে আত্মনিয়োগ করা উচিত এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালন থেকে তার মনোযোগ ছিন্ন করে এমন কোন কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় যার ফলে পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই কারো কারো মতে, নারীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ পারিবারিক ও সাংসারিক জীবন বিনাশ করে। তবে একথা যে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তা রাসূল (স.) এর সময়কালীন মহিলা সাহাবীদের কর্মতৎপরতা প্রমাণ করে।[৫০৭]

---

[৫০৪]. হযরত মুহাম্মদ (স.) ও পরবর্তী খলিফারা নামাজের জামাতে ইমামতি করতেন। তবে বর্তমান যুগে কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে নামাযের ইমামতি করতে হয় এরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। তাই এ যুক্তি বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়।

[৫০৫]. এই রকম প্রয়োজনে অবশ্যই তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে হবে। নারীর প্রতিনিধিত্বের তৃতীয় যে সমস্যা হয়ে থাকে ইসলাম মুহাররম আত্মীয়ের সাথে ছাড়া নারীদের জন্য সফর নিষিদ্ধ করেছে। কোন মুহাররমের সংগে ছাড়া কোন নারী সফর করবে না এবং কোন মুহাররমকে সংগে না নিয়ে কোন পুরুষ কোন মেয়ের কাছে যাবে না। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেয়েদের হজ্জ করা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৪৬)। জনপ্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে সফর অবশ্যম্ভাবী হলে মুহাররম আত্মীয়ের সাথে নিয়েই সফর করা সম্ভব। এটা এমন কোন শর্ত নয়। যা বাস্তবে পুরণ করা অসম্ভব।

[৫০৬]. রাসূল (স.) বলেন, মেয়েদের কাছে একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাকো। আনসারদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল দেবরের ব্যাপারে কি বলেন? রাসূল (স.) বলেন, দেবররাতো মৃত। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মাহরামের সংগে ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের কাছে যাবে না এবং স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর কাছে যাওয়া, ১১ খন্ড, পৃঃ ১৪৬; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ অপরিচিতার সাথে নিরিবিলিতে বসা এবং তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৭। মেয়েদের সাথে নিরিবিলিতে বসা, এই বসা যদি নিরিবিলি ও একাকী হয় তবেই নিষিদ্ধ অন্যথায় নিষিদ্ধ নয়। ইমাম বুখারী এই অধ্যায়ের ভিত্তিতে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, মুহাররম (যার সাথে বিয়ে হারাম) ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের কাছে একাকী যাবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মেয়ের কাছে কোন পুরুষ যাবে না।

[৫০৭]. মহিলা সাহাবীদের সংগ্রামী জীবন, ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ বা কুরবানী, হিজরত, জীবন দান, ইত্যাদি থেকে দেড় হাজার বছর আগে নারীরা যদি ঈমানের পক্ষে লড়াই করতে করতে শহীদ হতে পারে, দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত করার জন্য বাপ-মায়ের ভিটামাটি ছেড়ে হিজরত করতে পারে। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের উৎসাহিত করে, সেবা শুশ্রূষা করতে পারে, আক্রান্ত হলে কাফের সৈন্যদের মোকাবেলা করতে পারে, রাজনৈতিক তথ্য আদান প্রদানে রাজনৈতিক দূতের ভূমিকা পালন করতে পারে, যে কোন বিপদ মোকাবিলায় উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণে সহযোগিতা করে থাকে তাহলে, বিশ শতাব্দীর এই যুদ্ধে দ্বীন ইসলামের হেফাজতের এ লগ্নে নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। রাসূল (স.) এর যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে যারা এই কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগহণ করেছেন এবং যারা নেপথ্যে থেকে এই কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই রাজনৈতিক গতিধারার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থেকেছেন, প্রস্তুতি নিয়েছেন, প্রভাব খাটিয়েছেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। একাজ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত: জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে জনগণের সুখ শান্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে হয়। বিশেষ করে সংকটময় মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে সদা সর্বদায় নিযুক্ত থাকতে হবে। অথচ নারীর শারীরিক গঠন, তার জৈবিক উপাদান ও মানসিক অবস্থা সাধারণত এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মোটেই উপযোগী নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৫০৮] কিন্তু নারীরা অনেক আগে থেকেই দৈহিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ ধরণের অসংখ্য দায়িত্ব পালন করেছেন একথা ইতিহাস প্রমাণ করে।[৫০৯]

পঞ্চমত: গর্ভধারণ নারীর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন একজন নারীর গর্ভধারণের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে অথবা নারী যদি রাষ্ট্র প্রধান থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে থাকে তাহলে

তাৎক্ষণিক কোন ঘটনা নয় বরং নিরবিচ্ছিন্ন ঘটনা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রচেষ্টাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ইতিহাস প্রমাণ করে এই সকল ত্যাগী নারীদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই সকল মায়েদের তত্ত্বাবধানে তাদেরই আদর্শে লালিত পালিত হয়েছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত মুজাহিদগণ। যা তাদের পারিবারিক জীবনকে বিনাশ করেনি। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা:) ছিলেন প্রথম মুসলমান এবং প্রথম মহিলা সাহাবী। যিনি ৪০ বছর বয়সে আল্লাহর রাসূল (স.) কে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা:) একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূল (স.) যখন ৪০ বছর বয়সে নবুয়াত পেলেন তার আগ পর্যন্ত প্রতিবছর একমাস তিনি লোকালয় থেকে দূরে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ইবাদত করে কাটাতেন। আর খাদীজা (রা:) দূর্গম পথ অতিক্রম করে তাঁর জন্য খাদ্য নিয়ে যেতেন। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, (দেওবন্দ: আল মাতাবাতুর রুহীমিয়া, ১৩৮৭ হি:), পৃ: ২। হযরত খাদীজা (রা:) এর গর্ভে রাসূল (স.) এর ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এরপরও রাসূল (স.) এর নবুয়াতের পর চরম নির্যাতনের দশ বছর এবং নবুওয়াতের পূর্বের পনের বছর রাসূল (স.) কে হেরা পর্বতে খাবার পৌছান, ব্যবসা পরিচালনা করা, ছয়টি সন্তান গর্ভেধারণ করা, লালন করা এবং সর্বক্ষণিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় সহযোগী ছিলেন হযরত খাদীজা (রা:)। স্বয়ং রাসূল (স.) তাঁর এ কাজে এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম। তিনি আমাকে খাদিজা (রা:) এর চাইতে উত্তম স্ত্রী দেননি। যখন জনগণ আমাকে অস্বীকার করল তখন সেই খাদিজাই সর্বপ্রথম আমার নবুয়াতের উপর ঈমান এনেছিল। যখন মক্কার লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন সে আমাকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল, তিনি নিজের ধন সম্পদ আমার জন্য কুরবানী করে দিয়েছেন। একমাত্র তারই ঔরশে আল্লাহপাক আমাকে সন্তান-সন্তুতি দান করেন।

৫০৮. ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরাই পুরুষের চেয়ে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে জাতীয় সংকট নিরসনে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে উম্মে সালামা (রা:) এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত সাফিয়া (রা:) খন্দক যুদ্ধের সময় সকল মহিলাদের সহ 'কারা রামন কেল্লায় অবস্থান করছিলেন। বনু কোরায়যার এই কেল্লার মালিক ছিল হাসান (রা:)। তাকে এই কেল্লায় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। ইহুদীদের দ্বারা এই কেল্লা আক্রান্ত হলে হযরত হাসান (রা:) মোকাবেলা করতে অক্ষম হলেন তখন হযরত স্যাফিয়া (রা:) তাৎক্ষনিকভাবে ঐ ইহুদীকে আঘাত করেন এবং শত্রু পক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ঐ ইহুদীর গলা কেটে কেল্লার বাইরে ছুড়ে ফেলে দেন । ইহুদীরা এই খন্ডিত মস্তক দেখে ভিতরে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে মনে করে ভয়ে সবাই পালিয়ে যায়। (**উসওয়ায়ে সাহাবিয়াত**, পৃ: ২৮)। উম্মে আম্মার (রা:) ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করে পুরুষের মতই অতুলনীয় বীরত্ব, দুর্দমনীয়, সাহসিকতা ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী সাহাবীদের অবর্তমানে উম্মে আম্মারা দ্রুত রাসূল (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তীর ও তরবারী চালাতে শুরু করে দিলেন। ঐ সময় শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর ও বল্লমের আঘাতে উম্মে আম্মার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। স্বয়ং নবী করীম (স.) তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (স.) বলেন, আমি ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখি উম্মে আম্মারা (রা:) আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছে। তার পুত্রকে আহত করেছিল যে ব্যক্তি, তাকে সামনে পেলে তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করে, তাকে হত্যা করে স্বীয় পুত্রের ওপর আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। একজন অশ্বারোহী সৈন্য তার ওপর আক্রমণ চালালে তিনি ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করেন এবং ফিরে যাওয়ার সময় ঐ সৈন্যের অশ্বের পা কেটে দিলেন। রাসূল (স.) স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠলেন, আজ উম্মে আম্মারা তুলনাহিন সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তার হাতখানা শহীদ হয়ে যায় (**তাবাকাতে ইবনে সায়াদ**) মহিলা সাহাবীদের এরকম অসংখ্য নজীর রয়েছে যারা সংকটে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শারিরীক গঠন, মানসিক অবস্থা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। (মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪-৫৫)।

৫০৯. আজনাদিন এর যুদ্ধে হযরত ইকরামা শহীদ হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর হযরত খালিদ ইবনে সায়ীদের সাথে ইকরামা (রা:) উম্মে হুকাইম (রা:) এর পুনর্বিবাহ হয়। কিন্তু বাসর রাতেই রোমানদের আক্রমণ শুরু হওয়ায় উম্মে হুকাইম (রা:) প্রতিরক্ষা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাতজন সৈন্যকে খতম করতে সক্ষম হন। এখানে নারীর স্বভাবসুলভ আবেগকে তিনি কোরবানী করছেন। (**আল ইস্তিয়াব**) ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াজীদ নাম্মী মহিলা সাহাবীর হাতে নয়জন রোমান সৈন্য নিহত হয় (মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫)।

Dhaka University Institutional Repository

তা রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অপরদিকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে তার মস্তিস্কের উপর চাপ পড়ে যার প্রভাব গর্ভের ভ্রূণের উপর পড়ে এবং এতে ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি হয়।[৫১০]

ষষ্ঠত : সন্তান জন্মদানের পরে তাকে লালন পালন করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ মায়ের। বিশেষ করে সন্তানকে দুগ্ধদান করা। এক্ষেত্রে নারী যদি রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরু দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকে তাহলে সে সন্তানের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে পারবে না। অথচ পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।"[৫১১]

উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীকে রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন হতে সরাসরি নিষেধ না করলেও তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, তার প্রতি অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য তাকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হতে নিরুৎসাহিত করে। তাছাড়া ইসলামে নিজ নিজ গৃহে সসম্মানে অবস্থান করতে এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় সেজেগুজে বাইরে বের না হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।[৫১২] আর এক্ষেত্রে অবশ্যই একজন নারীকে আল্লাহর নির্দেশিত শরীয়তের সীমা রক্ষা করে চলতে হবে।[৫১৩] তবে দ্বীনের প্রয়োজনে এবং সমাজের বৃহত্তম কল্যাণে কাউকে যদি নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতেই হয় সেক্ষেত্রে শরীয়তের যথাবিহিত নির্দেশনা পালন করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে হাদীসের পরোক্ষ নির্দেশ লংঘিত না হয়।[৫১৪]

(২) রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্যান্য পদে নের্তৃত্ব দান

ইসলাম নারীদের রাষ্ট্রপ্রধান হতে নিষেধ করে না বা বাধাও দেয় না তবে রাসূল (স.) এর হাদীস বিশ্লেষণ করলে যে মত পাওয়া যায় তা হচ্ছে, নারীরা যদি রাষ্ট্রপ্রধান হয় তাহলে সে রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে না বা কল্যাণ নাই। আর ইসলামে কোন অকল্যাণকর কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৫১৫] কিন্তু হাদীস দ্বারা সরাসরি নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন হতে নারীদের প্রত্যক্ষভাবে নিষেধ করা হয়নি। তাই রাষ্ট্রপ্রধান

---

[৫১০]. নারীর গর্ভধারণের এই প্রকৃতিগত দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করেছিলেন বিবি খাদীজা (রাঃ), উম্মে আম্মারা (রাঃ), উম্মে হুকাইম (রাঃ) এর মত সাহাবীরা এবং সাথে সাথে হিজরত, জেহাদ, দাওয়াত দান, জ্ঞনার্জন, সহ সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়া অথবা রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্ব পালন করা, নির্দিষ্ট এবং খুবই সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরং এই প্রতিনিধি নির্বাচন ইসলামের সম্প্রসারণ, ইসলাম সম্পর্কে সমাজের ভূল ধারণা অপনোদন এবং সাথে সাথে ইসলামের সঠিক ধারণাকে তুলে ধরার দায়িত্ব সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরজ।

[৫১১]. আল কুর'আন, **সূরা আল বাক্বারা**, আয়াতঃ ২৩৩।

[৫১২]. এখানে নিজের গৃহে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে নিষেধ করা হয়েছে বর্বর জাতির মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু দেখা যায় নারীরা রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঘরের বাইরে কাজ করেছেন রাসূল (স.) এর অনুমতি সাপেক্ষে। তাই এর দ্বারা বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না।

[৫১৩]. মহিলাদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত পোশাক এবং শরীয়তের সীমা সচেতনভাবে মেনে চলা অন্যতম শর্ত। 'তোমরা নিজেদের গৃহ মধ্যে অবস্থান কর'- এ আয়াতের পূর্বাপর আয়াতগুলোর সমস্ত আয়াতই রাসূল (স.) এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর'- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মূলত এ অংশটুকু নিসন্দেহে নবী (স.) এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। (আবদুল হালীম আবু শুককাহ, **রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫)। যদি ধরে নেয়া হয় যে উক্ত আয়াতে সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাহলে সুন্নাত কি এক্ষেত্রে কুর'আনের ব্যাখ্যায় পরিণত হবে না? কারণ রাসূল (স.) এর যুগের মু'মিন মেয়েরা গৃহমধ্যে অবস্থানের নির্দেশ কার্যকর করেছিল আবার প্রয়োজনে বাইরে বের হয়েছিল এবং কাজও করেছিল। তাছাড়া তাদের গৃহের মধ্যে অবস্থান করা তাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাড়ায়নি।

[৫১৪]. কেননা মনে রাখতে হবে বর্তমান অবস্থায় ইসলামের আইন, ইসলামী বিধান দ্বীনের হুকুম আহকামের বিপক্ষে জাহেলী ধ্যানধারণার অনুসারী নারীরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এবং কর্ম তৎপর। তাই দ্বীনের উপর অনুসারী নারীদেরকেই এই দ্বীন বিরোধী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লামা তাবারী (রহ.) সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন যে, তিনি নারীর নেতৃত্ব ও বিচার কার্যকে জায়েজ মনে করতেন (**ফাতহুল বারী**, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৯৭)।

[৫১৫]. আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম দল, যাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করো, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চলো।" (আল কুর'আন, **সূরা আল ইমরান**, আয়াত : ১১০)।

Dhaka University Institutional Repository

হতে যেখানে সরাসরি নিষেধ করা হয়নি সেখানে জনপ্রতিনিধিত্বের অন্যান্য পদে নের্তৃত্ব দান করা নারীর জন্য সম্পূর্ণ বৈধ ও অনুমোদিত।

ইসলামের নীতিমালায় জনপ্রতিনিধিদের সাধারণত দুটো কাজ করতে হয় ১) আইন ও বিধিমালা রচনা করা। ২) সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করা।

আইন রচনার কাজ থেকে নারীকে নিবৃত্ত করার কোন কারণ ইসলামে নেই। কেননা আইন রচনায় যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো জ্ঞান। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান এবং সরকার ও জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞানই এর আওতাভুক্ত। ইসলামে জ্ঞানার্জনে নারী ও পুরুষকে শুধু সমান অধিকার দেয় না বরং জ্ঞানার্জনকে উভয়ের জন্য অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করে। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু বিদূষী মহিলা রয়েছেন, যারা হাদীস, ফেকাহ ও সাহিত্যে অগাধ পন্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং আছেন।[৫১৬]

হযরত ওমর (রা:) এর শাসন আমলে আরবদের প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানরা বিয়েতে মোটা অঙ্কের মোহর ধার্য শুরু করে। ওমর (রা:) বিষয়টির প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মোহরের সর্বোচ্চ একটা সীমা নির্ধারণ করে দিতে চাইলেন।[৫১৭] এই উদ্দেশ্যে ওমর (রা:) একদিন মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলমানরা বিয়েতে মোটা অঙ্কের মহর ধার্য কর না। কেননা, এই দুনিয়াতে সামান্যতম সম্মান ও গৌরবের বিষয় হলেও এটা আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে এর কোন গুরুত্ব থাকলে নবী করীম (স.) সকলের চাইতে বেশি এরূপ করার অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা মোটা অঙ্কের মহর ধার্য করতে পারতেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তিনি নিজের বিয়েতে বার ওকিয়ার বেশি মহর ধার্য করেননি।" ওমর (রা:) এর এই বক্তব্য শুনে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পিছনের আসন থেকে দাড়িয়ে গেল। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। মহিলাটি বললেন, আল্লাহ কুর'আন শরীফে মহরের কোন সীমা নির্দিষ্ট করে দেননি। ওমর সীমা নির্ধারণ করার কে?[৫১৮] ওমর (রা:) উপস্থিত লোকদের সামনে বলতে বাধ্য হলেন যে, একজন নারীর দাবীই সত্য, ওমরের প্রস্তাব ভূল। এরপর তিনি এ বিষয়ে কঠোর বিধি আরোপ করা থেকে নিবৃত হলেন।[৫১৯] সুতরাং একজন নারীর আপত্তির কারণে নতুন আইন প্রণয়ন করা হতে আমীরুল মুমিনীন বিরত থাকলেন।

এবার সরকারের নির্বাহী তৎপরতার তত্ত্বাবধান প্রসঙ্গ। এ কাজটি দুই প্রকারের হতে পারে, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান।[৫২০]

সুতরাং আইন রচনা বা নির্বাহী তৎপরতার তত্ত্বাবধান এই দুই কাজের ক্ষেত্রে নারীকে জন প্রতিনিধি হওয়ার অযোগ্য সাব্যস্ত করে এমন কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উক্তি ইসলামে নেই।[৫২১]

রাসূল (স.) এর যুগে বহু সংখ্যক মহিলা একত্রিত হয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (স.) এর কাছে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেত্রী পদে বাছাই করে তার মাধ্যমেই কথা বলেছেন। সেই মহিলা প্রতিনিধি যা কিছু বলেছেন তাতে তিনি নিশ্চয়ই সকলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বর্তমানে যেমন কোন

---

৫১৬. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।

৫১৭. মুহাম্মদ আব্দুল হাই শেখ, **নারী অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৭।

৫১৮. এই মহিলা ছিলেন একজন সাধারণ নারী। তিনি একজন বিখ্যাত মহিলা হলে নিশ্চয়ই তার নাম হাদীসে উল্লেখ থাকত। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, একজন সাধারণ মহিলা একজন রাষ্ট্র প্রধানের প্রস্তাবের উপর অনাস্থা আনতে পারে। ঐ মহিলা একটি কুর'আনের আয়াত পড়ে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল, "আর তোমরা যারা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক তবে তাকে এক স্তূপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফেরত নিবে। (আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াতঃ ২০)।

৫১৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই শেখ, **নারী অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৮।

৫২০. আল কুর'আন, **সুরা আত তওবা**, আয়াতঃ ৭১।

৫২১. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনের পক্ষ থেকে যে কেউ প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।[৫২২] একবারের ঘটনায় হযরত জায়েদ (রাঃ) এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমার পশ্চাতে মুসলিম মহিলাদের যে দল রয়েছে আমি তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি, তাদের সকলেই আমার কথা বলেছেন এবং আমি যে মত পোষণ করি তারাও সেই মতই পোষণ করেছেন।"[৫২৩]

মহিলা প্রতিনিধিত্বের এরকম আরো ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন বেশ কিছু সংখ্যক মহিলার পক্ষ থেকে জনৈক মহিলা রাসূল (স.) এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেছিলেন, আপনাদের খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহর প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। যেদিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হব। জবাবে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে। তারা সমবেত হলে রসূল (স.) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে শিক্ষা দান করলেন।"[৫২৪] রাসূল (স.) এর সময়ে নারীরা নানাবিধ আদর্শিক ও জাতীয় প্রয়োজনে সমবেত হতো এবং কোন কোন সময় তাদের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের মধ্য থেকেই প্রতিনিধি নিযুক্তির মাধমে রাসূল (স.) ও খিলাফতের যুগে তার সমাধান করা হত।

পরামর্শ ও মতামত প্রকাশ

কুর'আন হলো মুসলমান জাতির সংবিধান বা শাসনতন্ত্র। সকলের মতামত নিয়ে কুর'আন হাদীসের আলোকে ফেকাহবিদরা নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতেন। এই কুর'আন শরীফের একটি আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করে হযরত উমর (রা.) এর আনীত প্রস্তাব বা বিলের উপর অনাস্থা পেশ করেন।[৫২৫]

হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ) নাম্নী এক মহিলা সাহাবীর সাথে তাঁর দেখা হলে ঐ মহিলা সাহাবী তাঁকে উপদেশ দিতে থাকলেন, "হে উমর আমি তোমাকে উকাজের মেলায় দেখেছি, তুমি ডান্ডা দিয়ে ছোট ছেলে মেয়েদের ভয় দেখিয়ে বেড়াতে। তখন তুমি ছোট ছিলে। সে সময় লোকেরা তোমাকে 'উমাইর' বলে ডাকত, পরে তুমি যখন যুবক হলে, তখন থেকেই লোকেরা তোমাকে 'উমর' বলে ডাকতে শুরু করে। তারপর খুব বেশি দিন অতিবাহিত হতে না হতেই তুমি আমীরুল মু'মিনীন হয়ে গেলে। এখন তোমাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। চিন্তা করে দেখ, মহান আল্লাহ তোমাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাই জনসাধারণের সাথে তোমার স্বভাবগত কঠোর আচরণ করা ঠিক না।[৫২৬] বরং জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। মনে রেখো যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর আযাবের ভয় থাকে সে কিয়ামতকে দূরে মনে করতে পারেনা। আর যার মনে মৃত্যুর ভয় আছে সে বেপরোয়া ও লাগামহীন জীবন যাপন করতে পারেনা। সে বরং সব সময় নেকী অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। উমর (রাঃ) এর সঙ্গী খাওলা (রাঃ) কে বাধা দিলেন। হযরত

---

[৫২২]. বর্তমানের সংগঠন, নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধিত্ব এই প্রক্রিয়ায়ই হয়ে থাকে।

[৫২৩]. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতুল আসমা বিনতু যায়েদ ইবনু সাকাম। হাফেয মুনযিরী বাযযার ও তাবারানী থেকে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন। (**আত তারগীব ওয়াত তারহীব**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৩৬)।

[৫২৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কুর'আন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী পুরুষ নির্বিশেষে তার সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ তাকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবে কোন কাটছাট না করেই বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন, ১৭ খন্ড, পৃঃ ৫৫; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, শিষ্টাচার ও আত্মীয়দের সাথে সদাচার অধ্যায়ে, অনুচ্ছেদঃ মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

[৫২৫]. হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে জনৈক মহিলা কুর'আনের সূরা নিসার ২০ নং আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে ওমর (রাঃ) এর আনীত মোহরানার নির্ধারণ সম্পর্কিত আনীত প্রস্তাব বা বিলের উপর অনীহা জ্ঞাপন করে। ফলে এ আইনটি বাতিল হয়ে যায়। ইসলাম নারীকে মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত মহিলা মসজিদে ওমর (রাঃ) এর মহর সম্পর্কিত আইনটি মুসলমানদের সামনে পেশ করার সময় উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি মসজিদের পিছনের সারি থেকে উঠে দাড়িয়ে হযরত ওমর (রাঃ) এর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। (মুহাম্মদ আবুদল হাই, **নারী অধিকার**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭-২৫৮)।

[৫২৬]. আল ইসতিআব, ইবন আবদুল বার, **তাযকিরাতুল খাওলা বিনতু সা'লাবা (রাঃ)** এর বরাতে জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

উমর (রাঃ) বললেন, তাকে বলতে দাও। তুমি কি জান না তিনি হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা (রাঃ)।"[৫২৭]

জীবনের যে সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী, তুলনামূলকভাবে ভাল ও বেশি জানে সে ব্যাপারে তাদের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে সমাজকে উপকৃত হতে হবে। নারী সমাজের সাথেও পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত জানা ছিল রাসূল (স.) এর একটা স্থায়ী রীতি।[৫২৮]

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) নবী (স.) এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (স.) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোন কোন সময় মেয়েরা এমন মতামত পেশ করত যা তিনি গ্রহণ করতেন।[৫২৯] এই পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোন বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। হুদাইবিয়ার সন্ধির[৫৩০] একটি শর্ত ছিল, এই বছর মুসলমানরা ওমরা না করেই ফিরে যাবে তাই রাসূল (স.) সাহাবায়ে কেরামদের হুদাইবিয়াতেই ইহরাম খুলে ফেলা ও সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুগুলো জবাই করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু এই সন্ধি ও সন্ধির শর্তসমূহ দেখে বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন সে কারণে তারা কেউ রাসূল (স.) এর নির্দেশ পালনে কোন তৎপরতা দেখালেন না। এ অবস্থা দেখে রাসূল (স.) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)[৫৩১] এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি সাহাবাদের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরামর্শ দিলেন আপনি এরপর কাউকে আর কিছু না বলে যা কিছু করণীয় আপনি নিজেই অগ্রসর হয়ে করে ফেলুন। দেখবেন, সকলেই আপনার দেখাদেখি সব কাজ করবেন। নবী (স.) তার পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যখনই তিনি করণীয় সব কাজ করলেন, সাহাবায়ে কিরামগণও তাঁর অনুসরণ শুরু করে দিলেন।"[৫৩২]

এভাবে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) এর সঠিক ও যথাযথ পরামর্শে উপস্থিত অচলাবস্থা দূর হল এবং প্রমাণ করে দিল তাদের (নারী) পরামর্শ জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জানাযা পড়া হয় ইসলামের প্রথম দিকে তা মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিল না। হযরত আসমা

---

[৫২৭]. খোলাফায়ে রাশেদার চার খলিফার মধ্যে হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা কড়া মেজাজের। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (স.) হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, স্বয়ং ইবলিশ ওমরকে এত ভয় পায়, যে রাস্তায় ওমর হাটে সে রাস্তায় ইবলিশও হাটে না। অর্ধেক পৃথিবীর শাসক হযরত উমর (রাঃ)। যিনি আশারায়ে মোবাশশারাদের একজন এবং যিনি রাসূল (স.) এর ঘনিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। এমন একজন ব্যক্তিকেও তাঁর শাসন নীতির ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবী খাওলা বিনতে সালাবা পরামর্শ প্রদান করেন। সুতরাং এটাই প্রমাণিত যে, রাসূল (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে নারীরা রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিল। (জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩ - ১৫৪)।

[৫২৮]. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

[৫২৯]. **উয়ূমুল আখবার, লি ইবনে কুতাইবা**, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭।

[৫৩০]. হুদাবিয়ার সন্ধিঃ মক্কা হতে এক মনযিল দুরে অবস্থিত একটি কূপের নাম হুদায়বিয়া। উক্ত কূপের সংলগ্ন স্থান সমূহ হুদায়বিয়া নামে পরিচিত। এখানেই কুরায়েশদের সাথে রাসূল (স.) এর চুক্তি হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই চুক্তিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

[৫৩১]. হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (স.) এর ষষ্ঠ স্ত্রী। মহিলাদের মধ্যে উম্মে সালামা (রাঃ) সর্বপ্রথম হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর উম্মে সালামা (রাঃ) মহানবী (স.) কে চরম সংকটময় মূহুর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে মুসলিম জাতির ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে আছেন। ইমামুল হারামাইন বলেন, মহিলা জগতের ইতিহাসে সঠিক সিদ্ধান্ত দানের মত এত বড় নযীর আর নেই (যুরকানী, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭২)। জ্ঞানের দিক থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পরই ছিল উম্মে সালামা (রাঃ) এর স্থান। ইসাবা গ্রন্থে উম্মে সালামা সম্পর্কে বলা হয়েছে, Umma Salamah (R) prossessed physical charms, and was endowed with a high degree of brain power, perception, insight and adjudication. তিনি সুন্দর করে কুর'আন তেলাওয়াত করতে পারতেন। উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে ৩৭৮ টি হাদীস বর্ণিত আছে। উম্মে সালামা (রাঃ) ৮৪ বছর বয়সে হিজরী ৬৩ সনে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়।

[৫৩২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুত শুরুত, অনুচ্ছেদঃ আশশুরত ফিল জিহাদ ওয়াল মাসালিহাতু মা'আ আহলিল হারব; নুরুল ইয়াক্বীন ফি সীরাতে সাইয়্যেদুল মোরসালীন, পৃঃ ১৯১ এর বরাত দিয়ে মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিনতে উমাইস (রাঃ) হাবশায় খ্রিষ্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখেছিলেন। তিনি এর পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয়।[৫৩৩]

সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল (স.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের পরামর্শ গ্রহণ করে নারীদের প্রগতির দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন।

রাসূল (স.) এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনগণও তার কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ইবনে সিরীন হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে উমর (জ্ঞানী লোকদের সাথে) পরামর্শ করতেন। এমনকি (সে সব বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারিণী) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। তাদের মতামতে কল্যাণকর কোন দিক থাকলে বা কোন বিষয় দেখলে তিনি তা গ্রহণ করতেন।[৫৩৪]

হযরত শিফা (রাঃ) হিজরতের পুর্বেই ঈমান এনেছিলেন। তিনি নবী করীম (স.) এর নিকট বায়আতও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধি বিবেচনায় খুবই মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। জীবনীকার ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন, "পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন তার সন্তুষ্টির জন্য এবং অন্যদের তুলনায় বেশি মর্যাদা দিতেন।"[৫৩৫]

হযরত আলী (রাঃ) নিজ খিলাফতের যুগে বিরোধীদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মদীনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের কামীল নাখয়ীকে তার পক্ষে কাজ করতে আহবান জানালেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে শরীক না হয়ে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আলী (রাঃ) এর কন্যা উম্মে কুলসুম এর কাছে অক্ষমতা এবং গন্তব্য স্থানের কথা জানালেন। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, তিনি সিরিয়া রওনা হয়ে গেছেন। হযরত আলী (রাঃ) উমায়েরকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নিলেন।[৫৩৬] যে মূহুর্তে তিনি যোদ্ধাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন ঠিক সেই মূহুর্তে উম্মে কুলসুম এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহর ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। আপনাকে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বাস্তবে অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি তার জামিন হচ্ছি। তিনি আপনার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। হযরত আলী (রাঃ) উম্মে কুলসুমের দেয়া এ খবর এবং আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তার মতামতের ওপর আস্থা স্থাপন করে অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং যোদ্ধাদের অভিযান বাতিল করলেন।[৫৩৭]

যে সময় আয়েশা (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এর হন্তাদের থেকে কিসাস নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, সে সময়ের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, লোকজন উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে ও তার গভর্ণরদের দোষ বর্ণনা করে। তারা মদীনায় এসে আমাদের কাছে গভর্ণরদের বিরুদ্ধে যা বলে আমরা তা নিয়ে পরামর্শ ও চিন্তা ভাবনা করি। আমরা দেখতে পাই হযরত উসমান (বাঃ) প্রতিটি অভিযোগের ব্যাপারে নির্দোষ, খোদাভীরু এবং নিজের দায়িত্ব পালনে পূর্ণরূপে সচেতন, আর তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা পাপী, অপরাধী, প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী। আর যা প্রকাশ করছে তার সম্পূর্ণ উল্টোটা করার জন্য চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতা চালাচ্ছে।[৫৩৮]

এই বক্তব্য থেকে জানা য়ার, হযরত আয়েশা (রাঃ) সরকার এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মের গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করতেন। এছাড়াও সাধারণ মানুষের সমস্যা ও বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তাঁর গভীর ও নিকট সম্পর্ক ছিল এবং জনগণ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্যও তার কাছে আসত। তিনি এ সব ব্যাপারে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতেন।[৫৩৯]

---

[৫৩৩]. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইবন সা'দ**, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৬।
[৫৩৪]. আল সুনানুল কুবরা, **বায়হাকী**।
[৫৩৫]. আল ইসতিবাব ফী আসমাইল আসবাব, তাযকিরাতু শিফা, তাযকেরাতু শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ।
[৫৩৬]. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।
[৫৩৭]. তাবারী, **তারীখুর রাসুল ও ওয়াল মুলুক**, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৬৪-১৯৭।
[৫৩৮]. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।
[৫৩৯]. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উসমান (রা:) এর পর কে খলীফা হবে এ মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বসরার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং নিজ গোত্রের নেতা আহনাফ হযরত তালহা (রা:) ও যুবায়ের (রা:) ছাড়াও হযরত আয়েশা (রা:) এর কাছেও যান পরামর্শ গ্রহণের জন্য।[৫৪০]

হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে অবরোধ করে রাখার সময় আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা:) এর দশ হাজার সঙ্গী তাকে ছেড়ে হাজ্জাজের সাথে চলে যায়। এমনকি তার দুই ছেলে হামযা এবং যুবায়েরও আশ্রয়প্রার্থী হয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যায়। আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা:) তার মা আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) এর কাছে গিয়ে নিজের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে পরামর্শ চাইলেন।[৫৪১] জবাবে তার মা বললেন, বেটা, তুমি নিজেকে সবার চেয়ে ভাল করে জান। তুমি নিজেকে যদি সত্যিই হকের অনুসারী বলে মনে কর এবং হকের প্রতি মানুষকে আহবান করে থাকো তাহলে ধৈর্য্য ধারণ কর। দেখ, তোমার বহু সঙ্গী সাথী শত্রুর বিরুদ্ধে উমাইয়ার ছেলেদের হাতে তুলে দিও না। যা নিয়ে এরা খেলতে থাকবে। তবে তুমি যদি মনে কর এসব কিছুই তুমি দুনিয়ার স্বার্থের জন্য করেছ। তাহলে তুমি দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মানুষ। এ জীবন যখন একদিন নিঃশেষ হবেই তাহলে তা আল্লাহর পথে হবে না কেন? দ্বীনকে দুর্বল করে তুমি চিরস্থায়ী তো হতে পারবে না।" হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা:) মায়ের এই ইচ্ছা ও আবেগকে সমর্থন করলেন এবং লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করলেন।[৫৪২] এভাবে সত্যের পক্ষে মহিলা সাহাবীরা প্রাণ উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা উহুদ যুদ্ধের শহীদদের বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করে কুৎসা রটালে হিন্দা বিনতে আসমা তৎক্ষণাত কবিতার মাধ্যমেই তার কঠোর জবাব দেন।[৫৪৩]

ধর্ম রক্ষার সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ

ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার জন্য মুসলিম নারীরা একদিকে যেমন তীর ও তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন অন্যদিকে সাহিত্য, বক্তৃতা, উপদেশ ও নানারকম মুল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। ইসলামের ক্রমবিকাশে নারীদের বস্তুগত শক্তি ও সাংস্কৃতিক শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে। ধর্ম রক্ষার কাজে নিয়োজিত নারীদের উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতায় বহুসংখ্যক লোক ধর্মের জন্যে জানমাল ও যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিতে উৎসাহিত হয়েছেন।[৫৪৪]

ইবনে আবদুল বারী নবী করীম (স.) এর ফুফু আব্দুল মুত্তালিব দুহিতা আরওয়া সম্পর্কে লিখেছেন, ঈমান গ্রহণের পর তিনি সর্বশক্তি দিয়ে নবী করীম (স.) এর সাহায্য সহায়তা করতেন এবং তাঁর পুত্রকে নবী করীম (স.) এর সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তার লক্ষ্যকে নিজের জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য বারবার উৎসাহিত করেছিলেন।[৫৪৫]

হযরত খানসা (রা:)[৫৪৬] তার চারটি সন্তান নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। রাতের শুরুতেই (যুদ্ধ শুরুর আগে রাতে) তিনি তাঁর পুত্রদেরকে একত্রিত করে যে নসীহত করেছিলেন তা এক ঈমানদার ও

---

৫৪০. তাবারী, **তারিখুর রসুল ওয়াল মুলুক**, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৯৭।
৫৪১. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮।
৫৪২. **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, ৮ম খন্ড, পৃ: ৩০; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৯।
৫৪৩. ইবনে হিশাম, **সীরাত ইবনে হিশাম**, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪১-৫৯।
৫৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবুদর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।
৫৪৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮। রুফাইদা সম্পর্কে আলোচনায় ইমাম বুখারী তাঁর আল আদাবুল গ্রন্থের ২১৩ ও ২১৪ পৃষ্ঠার "কায়ফা আশযাহাত" অনুচ্ছেদে বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তাবাকাতে ইবন সা'দ গ্রন্থে রুফাইদার স্থলে কুআইবার নাম উল্লেখিত হয়েছে। (**আল ইসতিআব ফীল আসমাইল আসহাব**, ৮ম খন্ড, পৃ: ২১৩)।
৫৪৬. হযরত খানসা (রা:): তামাদর ছিল তাঁর নাম আর উপাধি হচ্ছে খানসা। তিনি ছিলেন কায়েস গোত্রের সুলায়ম শাখার মেয়ে। তার পিতার নাম ছিল আমর ইবনুস সরিদ। প্রথমে সুলায়ম গোত্রের রাওয়াহা বিন আব্দুল উজ্জার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তার মৃত্যুর পর মারওয়ান ইবন আবু আমেরের সঙ্গে দাম্পত্য সূত্রে সম্পর্কিত হন। হযরত খানসা (রা:) এর বার্ধক্যের কালে রিসালাতের ও ইসলামের দাওয়াত পান। তখন তিনি হিজরত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তাঁর চারটি ছেলে শহীদ হলে এর দশবছর পর ২৪ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খানসা (রা:) তাঁর চারটি

Dhaka University Institutional Repository

মুজাহিদ জননীর সন্তানের জন্য নসীহত হিসেবে ইতিহাসে লিখিত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আমার প্রাণ প্রিয় পুত্ররা তোমরা নিজেদের আগ্রহ উৎসাহে ঈমান গ্রহণ করেছ। কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ ব্যতীতই তোমরা হিজরত করে মদীনায় এসেছ। খোদার শপথ, তোমাদের মা এক, পিতাও তোমাদের এক। তোমাদের মা তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেননি। তোমাদের নানার বংশ মর্যাদাও কলঙ্কিত করেননি। তোমরা এক শরীফ ও গর্বিত নারীর সন্তান। তোমাদের জন্য, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার বদলে আল্লাহ তা'য়ালা বিপুল ও বিরাট সওয়াব রেখেছেন। আল্লাহ যদি মঞ্জুর করেন এবং নিরাপদে সকাল হয়, তাহলে সজাগ অন্ত:দৃষ্টি সহকারে খোদার সাহায্য চাওয়া ও পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। যুদ্ধ ভয়াবহ হলে নির্ভিকচিত্তে ও অকুণ্ঠ মনে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। কাফির শত্রুবাহিনী যখন প্রবল বিক্রমে ও অন্ধ আবেগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন তাদের সেনাধ্যক্ষই হবে তোমাদের আক্রমনের লক্ষবিন্দু। এইভাবে যুদ্ধ করে তোমরা ইহকালে বিজয় ও পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হওয়ার অধিকার নিয়ে ফিরে আসবে।[৫৪৭] মহীয়সী জননীর নিকট থেকে সন্তানরা এই আবেগময়ী উপদেশ পেয়ে তরবারি হাতে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন। এরপর তাদের দেহ রক্ত রঞ্জিত অবস্থায়ই পাওয়া গিয়েছিল।[৫৪৮]

হযরত খানসা (রা:) এর পরামর্শেই তার পুত্ররা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সন্তানদের এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলেছিলেন যে, সকলেই ধর্ম রক্ষার জন্য শাহাদাত বরণ করেন। এরকম আরো মহিলা সাহাবী দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। মক্কার জীবনে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের উপর যখন অত্যাচার নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল। কুরাইশরা নবী (স.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল আবু সাইফীর (রা:) কন্যা রকীফা নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

উম্মে আম্মার (রা:) যিনি ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে করতে শহীদ হয়ে যান। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু আনহা মাত্র ১৭ জন লোকের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি দীর্ঘদিন ইসলামের জন্য সার্বক্ষনিক সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযী আল্লাহু আনহা এর মত পুত্র তৈরী করেছিলেন।

রাসূল (স.) এর সময়ে মুসলিম নারীরা কোনরূপ বিপর্যয় বা অসংলগ্নতা দেখতে পেলেই তা দুর করতে এবং গোটা সমাজকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণমুখী করে গড়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। ঐতিহাসিক ইবনে আব্দুল বারী লিখেছেন, মহিলা সাহাবী সামুরা বিনতে নুহাইক (রা:) হাটে বাজারে ঘুরে ফিরে ভাল ও কল্যাণময় কাজের আদেশ করতেন এবং খারাপ ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর হাতে একটা চাবুক থাকত। কাউকে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখলেই তিনি তা দিয়ে তাকে প্রহার করতেন।[৫৪৯]

অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ

অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী সমাজ অতীতে কখনো শাসকের রক্তচুক্ষ, রাজদন্ড, কোন ব্যক্তির প্রতাপ প্রতিপত্তিকে ভয় করেনি। তাদের ঈমান ও আবেগ সর্বদা প্রকাশ্য শত্রুর মোকাবিলা করেছে। ইসলামের অনুসারীরা তৎকালীন শাসকের বিপর্যয় কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ইতিহাসে প্রখ্যাত স্বৈরাচার শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা:)

পুত্রকে একই সাথে যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করে ঈমানের যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে। (ইবনে কুতাইবা, **তাবাকাতুল শোয়াবা**, পৃ: ১৯৭)।

[৫৪৭]. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮; মুহাম্মদ আব্দুল রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯।

[৫৪৮]. হযরত খানসা রাযী আল্লাহু আনহার চারজন ছেলে ছিল। এরা সবাই কাদেসিয়ার যুদ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের নাম হলো আব্দুল্লাহ, আবু দাজরা (প্রথম স্বামীর), কাযেগ ও মযারিয়া (দ্বিতীয় স্বামীর)। হযরত খানসা রাযী আল্লাহু আনহা তার পুত্রদের জেহাদের ময়দানে সাহসিকতার সাথে লড়াই করার জন্য এক আবেগময়ী বক্তব্য রেখেছিলেন যা তাদের জেহাদে যেতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

[৫৪৯]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

কে শুলে চড়িয়ে শহীদ করে দেয়ার পর তার জননী হযরত আসমাকে[৫৫০] গিয়ে বলে যে, আপনার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা:) আল্লাহর ঘরে বে-দ্বীনী ও নাস্তিকতার প্রচার করছিলেন বলেই আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আসমা (রা:) তাকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠলেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আবদুল্লাহ আদৌ কোন বে-দ্বীন ছিলেন না। তিনি তো তাঁর পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণকারী ছিলেন। রোযাদার ও তাহাজ্জুদ গুজারী ছিলেন। আসলে তুমিই তার উপর অমানুষিক জুলুম করেছ। রাসূল (স.) আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, সকীফ গোত্রের দুজন মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিতীয়জন প্রথম জনের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট হবে। কেননা, সেই অধিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। এ গোত্রের প্রথম মিথ্যাবাদী হল মুসাইলিমা আর দ্বিতীয়জন তুমি।[৫৫১]

এখানে একজন মহিলা সাহাবীর অন্যায়ের প্রতিবাদে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য আর এক বর্ণনায় জানা যায়, হযরত মুআবিয়া (রা:) হযরত আয়েশা (রা:) কে লিখেছিলেন যে, আমাকে অল্প কথায় এমন কিছু উপদেশ দিন, যা আমি সব সময় সামনে রাখতে পারি। তাই হযরত আয়েশা (রা:) তাঁকে নিম্নে উল্লেখিত নবী (স.) এর অত্যন্ত কার্যকর বাণীটি লিখে পাঠান যা মানদন্ডের অধিকারীদের পথ নির্দেশনা দিতে সক্ষম।

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে মানুষ তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। (আর সেক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে সে সরকার পরিচালনা করে)।"[৫৫২]

রাসূল (স.) এর সময়ে নারীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত

কুরআনের আলোকে নারীদের হিজরত

দারুল কুফর থেকে হিজরত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ: পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "নিজেদের উপর জুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের জান কবয করেছে (তখন) তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমরা কেন আশায় নিমজ্জিত ছিলে? উত্তরে তারা বলেছিল, আমরা অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতারা বলেছিল আল্লাহর জমিন কি তোমাদের জন্য প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে পারতে? এই লোকদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। তা বড়ই নিকৃষ্টতম গন্তব্য স্থান। তবে নারী, পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থেই অসহায় ও দুর্বল, যাদের বাড়ীঘর ত্যাগ করে হিজরত করার কোন পথ ও উপায় ছিল না .... আশা করা যায় আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই ক্ষমা প্রদর্শনকারী ও অব্যাহতি দানকারী। আল্লাহর পথে যারা হিজরত করবে, তারা এ দুনিয়ার আশ্রয় নেয়ার মত অনেক স্থান ও জীবন যাপনের অনেক সুযোগ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজ বাসগৃহ থেকে বের হবে এবং পথের

---

[৫৫০]. আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু আনহুকে যাতুন নেতাকাইন নামে ডাকা হত। যার অর্থ 'কোমব বন্ধ'। তাঁকে "দু কোমর বন্ধ বিশিষ্ট নারী" এই জন্য বলা হত যে, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আবু বকর (রা:) সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওনা হচ্ছিলেন, তখন হযরত আসমা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খানাকে দুই টুকরা করে একখন্ড দ্বারা তাঁদের খাদ্য দ্রব্য এবং অপর খন্ড দ্বারা পানির মশকটি বেঁধে দিয়েছিলেন। আবার কারো কারো মতে, ২য় খন্ডটি নিজের কোমরেই বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা:) এর স্ত্রী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা:) এর মাতা। বর্ণিত আছে যে, মাত্র ১৭ জন লোকের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার বোন পুত্র আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা:) কে শহীদ করে দেয়ার পর যখন শূলি কাঠ হতে লাশ নামিয়ে দাফন করা হল, এর দশ দিন মতান্তরে ২০ দিন পর একশত বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার নিকট থেকে বহু লোকই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

[৫৫১]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মিথ্যাবাদী ছাকিফ তার ঘাতক, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৯০; **মুসনাদে আহমদ**, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৩১৫, জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত পৃ: ১৫০; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০।

[৫৫২]. **তিরমিযী শরীফ**, আবওয়াবুয যুহদ অধ্যায় এর বরাতে জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২; মাওলানা আবদুর রহীম, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে, তাকে উত্তম পুরস্কারে ভুষিত করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে পড়বে। আল্লাহ যথার্থই ক্ষমাশীল ও একান্তই দয়াবান।"[৫৫৩]

মদীনায় হিজরতকালে মুসলিম পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণঃ আল্লাহ বলেন, "হে নবী আমি তোমার সেই স্ত্রীদেরকে তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি, যাদের মোহরানা তুমি পরিশোধ করে দিয়েছ এবং ঐসব মহিলাদের মধ্য হতে যাদেরকে দাসী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার মালিকানাভুক্ত করে দেয়া হয়েছে তাদেরকেও এবং তোমার সেই সব চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদেরকেও তোমার বিবাহের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।"[৫৫৪]

আল্লাহ আরও বলেন, "হে ঈমানদান লোকেরা! যখন তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঈমানদার মহিলারা হিজরত করে মদীনায় আসে, তখন তোমরা তাদের ঈমানের ব্যাপারটা যাচাই করে নাও।"[৫৫৫]

নারীদের বাইআত গ্রহণ

রাসূল (স.) এর আনুগত্যের শপথ বা বাই'আত গ্রহণকালে পুরুষদের সাথে মেয়েদেরও অংশগ্রহণঃ আল্লাহ বলেন, "হে নবী! মহিলারা যদি তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য আসে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার, চুরি না করার, যিনা না করার, সন্তানদের হত্যা না করার এবং অন্য পুরুষের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে নিজ স্বামীর নামে চালিয়ে না দেয়ার ও তোমার পক্ষ থেকে আরোপিত সমস্ত ভাল কাজের আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তুমি তাদের বাই'আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করো। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ এর দোয়া করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল।"[৫৫৬]

ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধ পুরুষের সাথে নারীর সহযোগীতা ও অংশগ্রহণঃ আল্লাহ বলেন, "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পস্পরের বন্ধু ও সাথী। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও খারাপ কাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে। অবশ্যই আল্লাহ এসব লোকদের প্রতিই দয়াবান হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরম জ্ঞানী।"[৫৫৭]

ঈমানী পরীক্ষা ও নির্যাতন-নিপীড়নে পুরুষের সাথে নারীদের জড়িত হওয়াঃ আল্লাহ বলেন, "ধ্বংস হয়েছে গর্তকারীরা .... যেসব গর্তে ইন্ধনপূর্ণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ছিল। আর তারা এই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের চারপাশে বসে ছিল। মুমিনদের প্রতি যে নির্মম নির্যাতন করছিল তারা তা উপভোগ করছিল। মুমিনদের উপর জুলুম নির্যাতনের কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা এক মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, আসমান ও জমিনের একমাত্র বাদশাহী যার এবং সেই আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন। যে সব লোক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের উপর নিপীড়ন ও জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে ও পরবর্তীতে

---

[৫৫৩]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা**, আয়াতঃ ৯৭-১০০। যায়েন ইবনে মুনির বলেন, আয়াতে দুর্বলতাকে কেবলমাত্র নারীদের সাথে বিশেষিত করা হয়নি বরং নারী ও পুরুষের মধ্যে এ ব্যাপারে সমতা দেখানো হয়েছে। (**ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪২৫)।

[৫৫৪]. আল কুর'আন, **সূরা আল আহযাব**, আয়াতঃ ৫০।

[৫৫৫]. আল কুর'আন, **সূরা আল মুমতাহিনা**, আয়াতঃ ১০। হিজরত করে আসা মহিলাদের এই বলে শপথ করানো হতো 'আমি শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার রসূল (স.) এর মহব্বতে এবং ইসলামে আকৃষ্ট হয়েই হিজরত করেছি।' তারপর তাদেরকে রসূলের (স.) হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য পেশ করা হতো। (**ফাতহুল বারী**, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪২৫; **ফাতহুল বারী**, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬২)।

[৫৫৬]. আল কুর'আন, **সূরা আল মুমতাহিনা**, আয়াতঃ ১২। হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, পুরুষদের বাইআত বা আনুগত্যের শপথ কখনো কখনো মেয়েদের শপথের ভাবানুযায়ীই নেয়া হতো। হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা রসূল (স.) এর চারপাশে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী বসেছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "তোমরা আমার কাছে এসে আমার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না তোমাদের সন্তানকে অন্যের সন্তান বলে চালিয়ে দেবে না, আমার দেয়া যাবতীয় সৎ কাজের নির্দেশ অমান্য করবে না....।" (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী (স.) এর আনসারদের প্রতিনিধি, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২২২)।

[৫৫৭]. আল কুর'আন, **সূরা আত তাওবা**, আয়াতঃ ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

এসব অপকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে তওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে দগ্ধের সাজা নির্ধারিত।"[৫৫৮]

আল্লাহ আরও বলেন, "যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে বিনা অপরাধে নির্যাতন করে ও কষ্ট দেয় তারা নি:সন্দেহে বিরাট মিথ্যার দোষ ও গুনাহর বোঝা নিজের উপর চাপিয়ে নিয়েছে।"[৫৫৯]

আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সে সব দুর্বল ও অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য আল্লাহর পথে লড়াই করছো না, যারা নিপীড়নের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ জনপদ হতে নাজাত দাও, যার অধিবাসীরা সীমাহীন অত্যাচারী এবং তোমার খাস রহমতে আমাদের জন্য কোন বন্ধু ও কোন দরদী সাহায্যকারী তৈরি করে দাও?"[৫৬০]

সত্য যাচাইয়ের জন্য পরস্পরের প্রতি অভিশাপ অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ: আল্লাহ বলেন, "ঈসার উদাহরণ আদমের মতই। আদমকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করে বলেন, জীবন্ত মানুষ হয়ে যাও আর সাথে সাথে আদম একজন জীবন্ত মানুষ হয়ে গেছে। এ ঘটনার সঠিক সংবাদ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে জানানো হচ্ছে। কাজেই সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। আদম ও ঈসার জন্মের নির্ভূল জ্ঞান বা সংবাদ তোমার কাছে পৌছার পর কেউ যদি তোমার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক করতে আসে, তাহলে বলে দাও, আমি তোমাদের অভিশাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি, যেখানে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও আপনজনকে উপস্থিত করব, তোমরাও তোমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও আপনজনকে উপস্থিত কর। তারপর আমরা সম্মিলিত হয়ে বিণীতভাবে আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করবো যে, আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।"[৫৬১]

অপরাধ দমনে নারীদের অংশগ্রহণ: আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী প্রত্যেককেই একশত করে বেত্রাঘাত কর। এদের উপর আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন তোমরা দয়া পরবশ হয়ে না পড়। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাক, তাহলে তার প্রশ্নই আসে না। আর এ বেত্রাঘাতের অনুষ্ঠান যেন জন সমক্ষে হয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুমিন যেন তাদের উভয়ের এ সাজা প্রত্যক্ষ করে।"[৫৬২]

আল্লাহ আরও বলেন, "চোর পুরুষ হোক বা নারী উভয়েরই হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সাজা। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।"[৫৬৩]

নারীদের সুনাম ও সুখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রাম: আল্লাহ বলেন, "যারা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী নারীদের সম্পর্কে অপবাদ রটায় অথচ তার সমর্থনে প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না এ ধরণের অপবাদকারীদেরকে আশীটি করে বেত্রাঘাত কর। এই অপরাধীদের সাক্ষ্যও কখনো গ্রহণ করো না। এসব

---

[৫৫৮]. আল কুর'আন, **সূরা আল বুরুজ,** আয়াত: ৪-১০।
[৫৫৯]. আল কুর'আন, **সূরা আল আহযাব,** আয়াত: ৫৮।
[৫৬০]. আল কুর'আন, **সূরা আন নিসা,** আয়াত: ৭৫।
[৫৬১]. আল কুর'আন, **সূরা আলে ইমরান,** আয়াত: ৫৯-৬১। তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, "হে নবী! বলে দাও এসো আমরা আমাদের ও তোমাদের স্ত্রী-পরিবার, ছেলে-মেয়ে, ও আপনজনকে ডাকি।" আল কুর'আনে উক্ত কথার মাধ্যমে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এসো আমরা তাদেরকে অভিশাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত করি। উক্ত তাফসীরে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দলের আকেব ও তাইয়েব নামক দুই শীর্ষ স্থানীয় নেতা রাসূল (স.) এর কাছে আসে। (তারা হযরত ঈসা (আ:) কে আল্লাহর বান্দা বলে স্বীকার করত না।) হযরত ঈসা (আ:) আল্লাহর বান্দা কিনা এ কথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে অভিশাপ অনুষ্ঠানের জন্য তারা রসুল (স.) এর সাথে পরবর্তী দিন ধার্য করে। পরের দিন তাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নবী (স.) হযরত আলী (রা:), ফাতেমা (রা:), হাসান (রা:) ও হুসাইন (রা:) সহ নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে উক্ত নেতাদের ডেকে পাঠালে তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অসম্মতি প্রকাশ করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, **সূরা আল ইমরান,** আয়াত: ৬১)।
[৫৬২]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর,** আয়াত: ২।
[৫৬৩]. আল কুর'আন, **সূরা আল মায়েদা,** আয়াত: ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের লোকেরাই হলো ফাসেক। হ্যাঁ, পরবর্তীতে তারা যদি তওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাকারী ও অতীব দয়ালু।"[৫৬৪]

আল্লাহ আরও বলেন, "যারা চরিত্রবান, সরলমনা ও মুমিন নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করে, তাদের প্রতি এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে অভিসম্পাত করা হয়েছে। তাদের জন্য ভীষণ কষ্টকর আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে। সেদিন তাদের জিহ্বা ও হাত-পা তাদের এসব অসৎ আচরণ ও ঘৃণিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে এসব কাজের পুরস্কার পুরোপুরি দেবেন, যারা যা পাবার যোগ্য তাদেরকে তাই দেয়া হবে। তারা সেদিন বুঝতে পারবে যে, বস্তুত আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য দিয়েই প্রতিষ্ঠাকারী।"[৫৬৫]

হাদীসের আলোকে নারীর বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ

কাফের অধ্যুসিত সমাজ ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করা: হযরত মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, ...মুমিন মহিলাগণ হিজরত করে এসেছিলেন। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মু'ঈত যখন রসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসেছিলেন তখন তিনি ছিলেন পরিণত বয়স্কা। তার পরিবারের লোকেরা তাকে ফিরিয়ে নিতে রসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) তাকে ফিরিয়ে দেননি।"[৫৬৬]

বাইয়াতে অংশগ্রহণ: উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাইয়াত গ্রহণকালে রাসূল (স.) আমাদের থেকে এ মর্মে শপথ করালেন যে, আমরা (কারোর মৃত্যুতে) কাঁদবো না। আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন মহিলা ছাড়া কেউ সে অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারেনি। তারা হলেন, উম্মু সুলাইম, উম্মুল আলা, আবূ সাব্‌রার কন্যা মু'য়াযের স্ত্রী এবং আরো দু'জন মহিলা....।[৫৬৭]

পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা (যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে): হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হাফসার গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান, তোমার পিতা (পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করেননি? আমি বললাম, তিনি এটা করতে পারেন না। তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি এটা করতে পারেন। তারপর আমি এ ব্যাপারে আব্বার সাথে কথা বলব বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম ...।"[৫৬৮]

অত্যাচারী শাসককে অস্বীকার করা: আবু নওফল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:....হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর হত্যাকান্ডের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) এর কাছে এলো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর শত্রুর সাথে আমি যে আচরণ করেছি সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? জবাবে তিনি বললেন, 'আমি মনে করি তুমি তার পার্থিব জীবন নষ্ট করেছ আর সে তোমার পরকালীন জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছিলেন, সাকীফ গোত্রে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও একজন ঘাতক রয়েছে। মিথ্যাবাদীকে[৫৬৯] আমরা দেখেছি আর ঘাতক হিসেবে তোমাকে ছাড়া আর

---

[৫৬৪]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াতঃ ৪-৫।
[৫৬৫]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর**, আয়াতঃ ২৩-২৫।
[৫৬৬]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, শর্ত সম্পর্কিত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইসলামের দৃষ্টিতে যে সব শর্ত আরোপ বৈধ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৪১।
[৫৬৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কান্নার উপর কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪২০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ চিৎকার করে কান্নার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৬।
[৫৬৮]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নেতৃত্বদান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ উত্তরসুরী নিয়োগ ও প্রত্যাখ্যান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৫।
[৫৬৯]. এই মিথ্যুক ব্যক্তি হচ্ছে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুখতার ইবনে আবু উবাইদ সাকফী।

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে দেখিনা। আবু নওফল বলেন, এরপর হাজ্জাজ তার কথার প্রতিবাদ না করে সেখান থেকে উঠে গেল।"[৫৭০]

সামরিক অভিযানে নারীর অংশগ্রহণ

খাদ্য সরবরার, সেবা-শুশ্রূষা ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন: রবী বিনতে মুআউওয়ায (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে আমরা যুদ্ধে যেতাম। সেখানে যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো সেবা-শুশ্রুষা করা এবং যুদ্ধে হতাহতদের মদীনায় ফিরিয়ে আনার কাজই আমরা করতাম।"[৫৭১]

হযরত উম্মে আতিয়াহ আনসারী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে ৭টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি পুরুষদের বাহনের পিছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম। আর আহতদের ও রুগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম।"[৫৭২]

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন লোকজন রাসূল (স.) কে ছেড়ে চলে গেলেন .....সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মু সুলাইমকে তাদের কাপড় আঁট-সাঁট করে বাঁধা দেখেছি, তখন তাদের পায়ের মলগুলি দেখা যাচ্ছিল। তারা উভয়েই মশক ভরে পিঠে করে পানি বয়ে এনে লোকদের পান করাচ্ছিলেন।[৫৭৩]

স্বাধীন মতামত প্রকাশ

হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: ......আল্লাহর শপথ। তিনি মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের জন্য যা বন্টন করে দিয়েছেন জাহেলিয়াতের যুগে থাকলে আমরা এর বিন্দু পরিমাণও তাদেরকে দিতাম না। তিনি বলেন: একবার আমি একটি বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি যদি এরকম করতেন তাহলে ভাল হতো। আমি তাকে বললাম, তোমার এখানে কি কাজ? আমার কাজে তোমার নাক গলাবার দরকার নেই। জবাবে সে বলল, হে ইবনে খাত্তাব! আপনার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। আপনি চান না আপনার সাথে কেউ কথা কাটাকাটি করুক। অথচ আপনার মেয়ে (হাফসা) রসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে কথা কাটাকাটি করে থাকে। এমন কি তিনি কোন কোন দিন রাগও করেন।"[৫৭৪]

হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা কুরাইশরা মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম। এরপর আমরা আনসারদের সংস্পর্শে এলাম। তাদের মেয়েরা তাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। তাই আমাদের মেয়েরাও আনসার মেয়েদের স্বভাব গ্রহণ করতে শুরু করল। এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল। আর আমি এটা অপছন্দ করতে লাগলাম। এতে সে আপত্তি করে বলল, আপনি কেন এটা অপছন্দ করবেন? আল্লাহর শপথ, রসূল (স.) এর স্ত্রীগণও তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে। এমনকি তাদের একজন তো অভিমান করে সারাদিন ধরে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। হযরত উমর

---

[৫৭০]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মিথ্যাবাদী ছাকিফ ও তার ঘাতক, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৯০।
[৫৭১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মহিলাদের আহত ও শহীদদের মৃতদেহ বহন করে আনা সংক্রান্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৪২০।
[৫৭২]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: গাজী মহিলা যোদ্ধাদের পুরুষ যোদ্ধাদের মত অংশ না দিয়ে তাদের জন্য বিশেষ অংশ বরাদ্ধ, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৯৯।
[৫৭৩]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: হযরত আবু তালহা (রা:) এর গুণাবলী, ৮ম খন্ড, পৃ: ২২৮; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: পুরুষের সাথে মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৯৬।
[৫৭৪]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, তাফসীর অধ্যায়, ১০ খন্ড, পৃ: ২৮৩; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: 'ইলা', ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) বলেন, এ ঘটনায় আমি খুবই শঙ্কিত হলাম।"[৫৭৫] হাফেয ইবনে হাজার বলেন,.........হাদীসে নারীদের উপর অধিকতর চাপ প্রয়োগকে নিন্দা করা হয়েছে। কেননা রাসুলুল্লাহ (স.) কুরাইশদের নীতি বর্জন করে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে আনসারদের নীতি অবলম্বন করেন।"[৫৭৬]

নারী কর্তৃক পুরুষের নিরাপত্তা দান

উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ...হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইবনে হুবায়রাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। অথচ আমার ভাই আলী বলছে সে তাকে হত্যা করবে। রাসূল (স.) বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছ আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম।[৫৭৭]

শাসকের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান

আবদুর রহমান ইবনে শাম্মাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি মিসরের বাসিন্দা। তিনি বললেন, এই যুদ্ধে তোমাদের এই শাসক তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করেছে? তিনি বললেন, আমরা তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি। আমাদের কোন উট মারা গেলে তিনি তাকে উট দিতেন। কারো দাস না থাকলে তাকে দাস দিতেন এবং কেউ অর্থ-কড়ি ও খোরপোশের অভাব অনুভব করলে তাকে অর্থ-কড়ি ও খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতেন।[৫৭৮]

রাজনৈতিক বিষয়ে নারী কর্তৃক পুরুষকে দিক নির্দেশনার দৃষ্টান্ত

হুনায়েন যুদ্ধের দিন উম্মে সুলায়েম রসুলুল্লাহ (স.) কে দিক-নির্দেশনা দান করেনঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মে শারীক হুনায়েন যুদ্ধের দিন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাদের ছাড়া তোলাকাদেরকে (মক্কা বিজয়ের পর নবী স. যাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন) কি হত্যা করা হবে? রাসূল (স.) বললেন, হে উম্মে সুলাইম! আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি ইহসান করেছেন।[৫৭৯]

আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সালিশীর দিন হাফসা (রাঃ) তার ভাই আবদুল্লাহকে পরামর্শ দান করেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি একদিন (উম্মুল মুমিনীন) হাফসার কাছে গেলাম। সে সময় তাঁর চুল থেকে পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন খিলাফতের বিষয়টি নিয়ে লোকজন কি কান্ড করছে। (হযরত আলী রাঃ ও আমীর মুয়াবিয়ার বিবাদের প্রতি ইংগিত) শাসন কর্তৃত্ব ও ইমামতের কিছুই আমাকে দেয়া হয়নি। হাফসা (রাঃ) বললেন, তুমি গিয়ে তাদের সাথে শরীক হও। তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি নিজেকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখায় তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার আশংকা হয়। তিনি বারবার বলায় তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) যেতে বাধ্য হলেন।[৫৮০]

---

[৫৭৫]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেয়ের বিবাহকালে পিতার উপদেশ, ১১ খন্ড, পৃঃ ১৯০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইলা ও স্ত্রীকে দূরে রাখা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৬৮।

[৫৭৬]. **ফতহুর বারী**, ১১ খন্ড, পৃঃ ২০২।

[৫৭৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, ফারদুল খুমুস অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোক কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৮৩; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, মুসাফিরের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ চাশতের নামায......., ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৮।

[৫৭৮]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ন্যায়বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমের শাস্তি, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৮।

[৫৭৯]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে (থেকে) মেয়েদের যুদ্ধ, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৯৬।

[৫৮০]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, **সহীহ বুখারী**, কিতাবুল মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ), অনুচ্ছেদঃ আহযাব যুদ্ধ, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা

দাব্বা ইবনে মিহসান আল আনযী (রাঃ) নবী (স.) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন, তোমাদের ওপরে এমন সব শাসক নিয়োগ করা হবে যাদের কিছু কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কিছু কাজ অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি অপছন্দ করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে রক্ষা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকবে ও মেনে নেবে তার অবস্থা ভিন্ন হবে। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না? তিনি বললেন, যতক্ষণ তারা নামায আদায় করবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না।[৫৮১]

আবদুর রহমান ইবনে শাম্মাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেলে তিনি বললেন,..... আমি আমার এই ঘরে বসে রাসূল (স.) কে যা বলতে শুনেছি তাই তোমাকে বলছি, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হলো, কিন্তু সে তাদের কষ্টের কারণ সৃষ্টি করলো, তুমিও তাকে কষ্ট দিও। আর যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হলো এবং সে তাদের সাথে কোমল আচরণ করলো, তুমিও তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করো।[৫৮২]

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (স.) এর সময়ে মুমিন নারীদের জীবনের লক্ষ্যই ছিল ইসলামকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তারা নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কখনও দ্বিধাবোধ করেনি। তাই ইসলামও নারীদেরকে রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অধিকার ও প্রগতি দান করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এই অধিকারকে বিপথে পরিচালিত না করে বা অপব্যাখ্যা না করে বরং নারীর প্রাপ্ত অধিকার সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ইসলাম সমুজ্জল থাকবে। আর এই দায়িত্ব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের। রাসূল (স.) বলেছেন, 'নারী পুরুষের সহোদরা'। আর মুসলিম নারীর বিজয় মুসলিম মানুষের বিজয়। তাই সমাজের অর্ধেক নারী জাতিকে পিছিয়ে রাখার অর্থ সমাজকে কর্মহীন করে দেয়া। আর সমাজের অর্ধাংশ যদি অকর্মণ্য থেকে যায় তাহলে সেই সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

---

[৫৮১]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নেতাদের শরীয়ত বিরোধী কাজের বিরোধীতা ওয়াজিব, তবে নামায পড়লে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৩।

[৫৮২]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ন্যায়বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমের শাস্তি, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯০০-২০০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে নারীর অবস্থান(১৯০০-১৯৭১)

বৃটিশ শাসনামলে নারীর অবস্থান (১৯০০-১৯৪৬ সাল)
পাকিস্তান শাসনামলে নারীর অবস্থান (১৯৪৭-১৯৭০ সাল)
মুক্তিযুদ্ধে নারীর (১৯৭১ সাল)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯৭২-২০০০)

পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান
শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান
কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান
বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান

- ভোটার হিসেবে নারীর অবস্থান
- রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে নারী
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে নারী

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে নারী
নারী ও সংরক্ষিত আসন
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নারী
বাংলাদেশের আইনে নারীর অবস্থান
সংবিধানে নারীর অবস্থান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯০০-১৯৭১)

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, যার পরিচয় বাঙ্গালি ও বিভিন্ন জাতিসত্তার সমাজ বিন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির নারীসমাজ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদি দ্বারা পশ্চাৎপদ, অবহেলিত ও নানা বঞ্চনার শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। নারীদেরকে আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে শিক্ষাহীন, অসহায়, অক্ষম ও অধিকার বঞ্চিত করে এতই দুর্বল করে রাখা হয়েছিল যে, তৎকালীন নারীসমাজ ব্যতিক্রম কিছু চিন্তা বা পরিবর্তনের কথা ভাবতেও পারেনি। নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েও মুক্তির স্বাদ গ্রহণের কথা চিন্তা করার সাহস তাদের ছিল না। নারীদের ধর্মীয় পবিত্রস্থানে যাওয়া এবং বোরকা ও ঢাকা গাড়ি ছাড়া বাইরে চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিলো। বাড়িতে জেনানা[১] মহলে নারীরা ছিল অবরুদ্ধ।[২] হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা ও নানারকম সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসনামলে বাংলার বহু নারী ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তন করলেও ধর্মান্তরিত নারীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেনি। তাই নব্য মুসলিম বিধবারা হিন্দুদের মত বৈধব্যকাল পালন করতো। এছাড়াও সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সুবিধা লাভের অধিকার অভিজাত নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও বাংলার নারী সমাজের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।[৩] তাই নারীরা তাদের পারিবারিক সামাজিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবীতে আন্দোলন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা কিছুটা অধিকার লাভ করে।

প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান

প্রাচীন সমাজে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুরা নারী ব্যবসা ও অন্যান্য দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত ছিল। যার প্রভাব সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপরও পড়ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের জাতি সমন্বয় ঘটেছিল।[৪] এসকল জাতি সমূহের মধ্যে নারী সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় কোন কোন সমাজে নারী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল আবার কোন সমাজে চরমভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী সমাজের দুঃখ ও দুর্দশার চিত্র দৃশ্যমান হয়।

---

[১]. জেনানা বলতে অন্দর মহলে নারীদের আব্রু ও মর্যাদা সহকারে অবস্থানের আলাদা মহলকে বুঝানো হয়, যা মুসলিম নারীদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিচায়ক ছিল। সেখানে যে কোন পুরুষের যখন তখন প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত ছিল। এটা নারীদের জন্য অবরোধ নয়। তবে প্রয়োজনে নারীর বাইরে যাওয়ার অধিকার এবং পুরুষের ভিতরে প্রবেশের অধিকার ইসলাম অনুমোদন করেছে।

[২]. ডুবু গালিচান, **উইমেন আন্ডার পলিগেমি**, পৃঃ ১৯৯; উদ্ধৃতি, ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, (কলকাতাঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃঃ ১৮। ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নারীদের পর্দা করা ফরজ। তাই পর্দার উদ্দেশ্যে বোরকা পরার নির্দেশ ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ। তাই এ নির্দেশ নারীদের অবরোধের পর্যায়ে পড়েনা।

[৩]. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

[৪]. নীহার রঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস**, আদিপর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, (কলিকাতাঃ লেখক সমবায় সমিতি, ফাল্গুন ১৩৭৩), পৃঃ ১২৭। বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনধারার যে ভিত্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে তার পুরো রূপায়নই ঘটেছে অ্যালপাইন ও আদি অস্ট্রেলীয় জাতির দ্বারা। পরে আর্য ভাষাভাষি আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠীর বিস্তার ঘটলেও তা বাঙালীর সমাজ জীবনের উঁচু স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, গভীরে প্রসারিত হতে পারেনি। এই আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিল বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ২০০২, পৃঃ ১)।

Dhaka University Institutional Repository

দ্রাবিড় সমাজে নারী

আর্যদের পূর্বে বাংলাদেশে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বসবাস ছিল। সে সময় সমাজে জাতিভেদ ছিল না, বিয়েও হতো বিভিন্ন জাতির মধ্যে। দ্রাবিড়দের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাতে নারীর প্রধান্য ছিল। এদের একদল যেমন নারীর প্রাধান্য মানত তেমনি এদের উচ্চতর অংশ বৈরাগ্য ও সন্যাস ধর্মকে নারীর ভূষণ মনে করত।[৫] দ্রাবিড়দের মধ্যে নারীদেরই প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড়দের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা স্বেচ্ছায় পুরুষ নির্বাচন করে সংসার করত। নারীর এই প্রাধান্যের কারণেই সে সময় বংশ ও অধিকার পুত্রগত ছিল না, ছিল কন্যাগত।[৬]

আর্য সমাজে নারী

বৈদিক যুগে আদর্শ হিসেবে নারীর স্থান প্রথম প্রথম কিছুটা উচুতে ছিল। কেননা পূর্ব যুগের জাতি দ্রাবিড়দের মাতৃতন্ত্রের প্রভাব আর্যদের মধ্যে প্রথমদিকে কিছুটা কার্যকর ছিল। মাতৃরূপই যে নারীর যথার্থ স্বরূপ তা বৈদিক যুগে আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।[৭] প্রাচীন সাহিত্যে আর্যদের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজে নারীদের সম-অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়,[৮] আবার মেয়েদের অন্ত:পুরে অবরোধ প্রথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। নর-নারীর পার্থক্য আর্যসমাজের প্রথমদিকে একবারেই ছিল না। নারীর জন্য প্রাণহানিকর সহমরণ প্রথাও[৯] তখন ছিল না। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, খুব প্রাচীনকালে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার আর্যজাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনার্যদের কাছ থেকেই এই প্রথা আর্য সমাজে প্রবেশ করেছে। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলা অঞ্চলে গ্রিকদের প্রভাব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সেসব অঞ্চলে সতীদাহ বেশী হতো।[১০] তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহ সামাজিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতো না তবে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। বৈদিক যুগে নারীরা ছিল সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু আর্যদের আগমনের কারণে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।[১১] এবং আর্যসমাজে ক্রীতদাস প্রথার আবির্ভাব ঘটে।[১২] এরফলে সম্মানজনক অধিকার থেকে সরিয়ে বিবাহ প্রথার মধ্য দিয়ে নারীকেও সমাজের দাস হতে হয় এবং নারীর দাস শ্রমের উপর গড়ে উঠে বাঙালী পরিবার প্রথা।[১৩] শুধু বাঙালী নারীর জীবনেই এমনটা ঘটেনি, মানব জাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে, এটা পৃথিবীর সব সমাজেই প্রমাণিত হয়েছে।[১৪]

---

৫. ক্ষিতিমোহন সেন, **প্রাচীন ভারতে নারী**, (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৮২), পৃ: ৮২-৮৫।

৬. ক্ষিতিমোহন সেন, **প্রাচীন ভারতে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮২-৮৫।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭। আর্যসমাজে প্রথমদিকে নারীর মাতৃত্ব ছিল শ্রদ্ধার বিষয়। 'জায়া" কথার অর্থ স্ত্রী, কিন্তু এর মধ্যে মাতৃত্বই মূল কথা, অর্থাৎ যার মধ্যে নিজে জন্মগ্রহণ করা যায় তিনিই জায়া।

৮. মহাভারতে কোথাও কোথাও মেয়েদের অশাস্ত্রীয় বললেও নারীদের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বেদে মন্ত্রে কেউ কেউ নারীদের অধিকার না দিলেও জানা যায় বহু বেদমন্ত্র মেয়েদের রচিত। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ ব্রম্মবাদিনী বিজ্ঞজনের সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন। (প্যারীচাঁদ মিত্র, **এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্ববস্থা**, কলিকাতা, ১৮৮০)।

৯. স্বামী মৃতুবরণ করলে তার সাথে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা ছিল তাকে সহমরণ প্রথা বলা হয়।

১০. ক্ষিতিমোহন সেন, **প্রাচীন ভারতে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪।

১১. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪। বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান দুটি জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। এ সময়ে সমাজে সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে সামাজিক অসাম্য দেখা দেয়। দ্রাবিড়দের যুগে যে সমাজ ছিল ঐক্যবদ্ধ, সেই সমাজ হয়ে উঠে বৈষম্যপূর্ণ। উপজাতি গোষ্ঠীর কিছু কিছু সদস্য ধনী হয়ে উঠে, পাশাপাশি দেখা দেয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী। চাষের জমি ও পশুর মালিকানা, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ও জমির উপর অধিকারের দাবি নিয়ে বিশেষ সুবিধাবাদী সম্প্রদায়ের সূচনা ঘটে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২)।

১২. যুদ্ধবন্দীদের শ্রম সহজে ও বিনা পারিশ্রমিকে পাওয়ার সুবিধার জন্য প্রথমে যুদ্ধবন্দীরাই দাস হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু ক্রমেই ধনীর ঘরে সমাজের গরিব মানুষ ক্রীতদাস হতে শুরু করে। দরিদ্র মেয়েরাও গৃহকর্মে নিয়োজিত হয়। ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্ব সম্পন্ন বৈদিক আর্যসমাজকে অপরিণত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলা হয়। ইতিপূর্বে উৎপাদন ব্যবস্থায় একচ্ছত্র শক্তি হিসেবে নারীর যে ক্ষমতা ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে পুরুষের দখলে চলে যায়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩)।

১৩. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭।

১৪. আগস্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, (কলিকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৩), পৃ: ১২।

Dhaka University Institutional Repository

তবে পরবর্তীতে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীদের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। বংশ রক্ষার জন্য আর্যদের পিতৃশাসিত যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা শুরুর সাথে সাথে পরিবার ও সমাজে নারী শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমাজে পুত্র সন্তানকে বলা হতো আত্মজ অর্থাৎ আত্মার রূপ। পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষার জন্য নিজ সন্তান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে স্ত্রীকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখা হতো। পরিবারের কর্তা হলেন স্বামী। দ্রাবিড় মেয়েদের যেসব অধিকার ছিল তা পরিবর্তন হওয়ার ফলে সমাজে নারীর পদমর্যাদারও পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক এই পরিবর্তন নারীকে স্বামী ও ছেলের উপর নির্ভরশীল করে তুলল। বিয়ে পদ্ধতির দ্বারা মেয়েরা সম্পত্তির মত হস্তান্তরিত হতো। বিয়ের সময় টাকা দিয়ে স্ত্রী কিনে নেওয়ার প্রথার মধ্য দিয়ে পুরুষ স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে স্ত্রীকে ব্যবহার করার অধিকার পেল। এবং টাকার বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করতে বা জুয়া খেলায় স্ত্রীকে বাজি ধরতে দ্বিধা করত না।[১৫]

মাতৃধারার পরিবর্তনে সমাজব্যবস্থার এই পর্যায়ে পিতৃধারায় বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ব্যবস্থা শুরু হয়। সম্পত্তি পিতৃধারায় পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হতে থাকে। ঘর এবং বাইরের সকল কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে কুক্ষিত হওয়ার কারণে বাংলার নারী তার সমস্ত অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা হারিয়ে পুরুষের সেবাদাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ করল। সন্তান জন্মদানের মাধ্যম হিসেবে তো বটেই, বংশধরের মধ্যে বেঁচে থাকার ও সম্পত্তির অধিকার অক্ষুন্ন রাখার নিশ্চয়তার জন্য স্ত্রীকে শুধু স্বামীর ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সতীত্ব রক্ষার জন্য নারীকে অন্য পুরুষের চোখের আড়ালে নির্দিষ্ট গন্ডিতে আটকে রাখা হতো, তার মুখমন্ডল, শরীর সব ঢেকে রাখা হতো।[১৬]

দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করতো। সুতা কাটা, তাত বুনা, পণ্যসামগ্রী একস্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা, কৃষিকাজ করে জমিতে ফসল ফলানোর মত কঠিন কাজ করে দরিদ্র মেয়েরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। এরপরেও তাদের উপর পুরুষরা অমানুষিক অত্যাচার চালাত। স্বামীর প্রভুত্ব ও পরিবারের দাসত্ব মেনে নিয়েই মেয়েরা জীবনযাপন করত। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী ও স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের অধীনেই নারীকে থাকতে হতো। স্ত্রীকে ত্যাগ করার অধিকার পুরুষের থাকলেও স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার স্ত্রীর ছিল না। স্ত্রী কোন কারণে অবিশ্বাসী হলে সমাজ ও ধর্মে তার জন্য ভয়ানক শাস্তি নির্ধারিত ছিলো। পুরুষ উচু বংশের হলেও নিচু বংশের নারীকে বিয়ে করতে পারত কিন্তু নারী উচু বংশের হলে নিচু বংশের পুরুষকে বিয়ে করতে পারত না।[১৭]

প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই বাংলার মেয়েরা তাদের অধিকার হারিয়ে নির্যাতিত হতে থাকে। নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামী মারা গেলে পরিবারের বংশ রক্ষার জন্য স্বামীর আত্মীয়রা দাবি করলে স্ত্রী বাধ্য থাকত স্বামীর ভাই বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সন্তান গর্ভে ধারণের করতে। নারী নির্যাতনের, নারী বৈষম্য ও শোষণের ধারক এসব সামাজিক-ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় গোষ্ঠী ও সম্পত্তি রক্ষার নীতির সাথে যুক্ত প্রাচীন সামাজিক প্রথার মধ্যে।[১৮]

বৌদ্ধ সমাজে নারী

তৎকালীন সময়ে অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজ নতুন শাসকের প্রচারিত ধর্ম গভীর আগ্রহের সাথে গ্রহণ করত। যেকোন নতুন ধর্ম, বিশ্বাস বা আন্দোলনে নারী প্রধান প্রচারক ও সমর্থক হয়েছে।[১৯] পূর্ব প্রচলিত সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসনের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি লাভের আশায় নারীসমাজ নতুন শাসকের প্রতি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করত। এমনকি প্রত্যেক নতুন শাসকের সমর্থিত ধর্ম গ্রহণেও তারা ব্যাপকভাবে

[১৫]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
[১৬]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।
[১৭]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।
[১৮]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
[১৯]. নতুন শাসকের প্রচারিত ধর্মে সমর্থন করার অন্যতম কারণ ছিল, প্রত্যেক নতুন শাসক তার নতুন নীতি প্রচার করার সময় নারীর জন্য ঘোষিত প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সহনীয় সংস্কার সাধন করতেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫)।

Dhaka University Institutional Repository

এগিয়ে আসত। এমনি ধারায় গৌতম বুদ্ধ[২০] হিন্দু ব্রাম্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার চালিয়ে বাঙালীর নারী জীবনে নতুন চেতনা সৃষ্টি করেন। এরফলে পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তির দর্শন প্রচার করে অপুত্রক হওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে বৌদ্ধ ধর্ম নারীকে মুক্তি দিল। বাবার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষায় মেয়ের অধিকার স্বীকৃত হল।[২১] কিন্তু বৌদ্ধধর্মে নারীদের মঠজীবনের অধিকার স্বীকৃত হলেও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়নি।[২২] এই মঠজীবন নারীর পারিবারিক জীবনের শৃংখলা ভেঙ্গে তাদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। এর ফলে নারী তার নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলল এবং ধীরে ধীরে তারা উচছৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। গণিকাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জনে নারী নিজেকে নিয়োজিত করল। এ সময়ে নারী কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করলেও মূলত নারীর সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অবস্থানগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি।[২৩]

হিন্দু সমাজে নারী

হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা ও শ্রেণীভেদের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সমাজের জাতপাত অনুযায়ী নারী ও শুদ্র ছিল নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান অন্যান্য সমাজের মতই করুণ ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। নারী জাতির নিজস্ব সত্তা হিন্দু সমাজে স্বীকৃত ছিল না। হিন্দু ধর্মে নারী জাতির বিধিলিপি নির্দেশ করা হয় এই বলে যে, শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী ও স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের অধীনেই নারীকে থাকতে হবে। স্ত্রীকে ত্যাগ করার অধিকার স্বামীর থাকলেও স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার স্ত্রীর ছিল না। স্ত্রী কোন কারণে অবিশ্বাসিনী হলে ধর্ম ও সমাজ তাকে কঠিন শাস্তি দিত, মৃত্যুদন্ডও দিতেও কার্পণ্য করত না। কিন্তু পুরুষ বহুগামী হলেও তার জন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। পুরুষ নীচু বংশের মেয়ে বিয়ে করতে পারত কিন্তু উচু বংশের মেয়ে নীচু বংশের কোন ছেলেকে বিয়ে করতে পারত না। মোটকথা নারীর কোন অধিকারই প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সমাজে স্বীকৃত ছিল না। নারী ছিল পুরুষের হাতের পুতুল। পুরুষ তার ইচ্ছামত নারীর উপর অধিকার প্রয়োগ করত।[২৪]

মুসলমান সমাজে নারী

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মুসলিম শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদান করেছে সেই অধিকারও বাংলার মুসলিম শাসকরা নারীদের ভোগ করতে দিলেন না। ইসলামের পর্দা প্রথার দোহাই দিয়ে নারীকে অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখা হলো। নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও পাঠান ও মোঘল শাসনামলে বাংলার নারী সমাজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।[২৫]

---

২০. গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক।
২১. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
২২. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
২৩. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
২৪. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪-৬।
২৫. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসনামলে নারীর অবস্থান (১৯০০-১৯৪৬ সাল)

১৭৬৫ খ্রী: ইংরেজদের দেওয়ানি গ্রহণের পর থেকেই বাংলায় শুরু হয় ইংরেজ শাসনামল। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নারীদের সামাজিক মর্যাদা অধিকারের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কোন তারতম্য ঘটেনি। ব্রিটিশ শাসকের অধীনে মুসলিম সমাজের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত ও করুণ ছিল।[২৬] সামাজিক জীব হিসেবে নারীদের কোন স্বীকৃতি ছিল না। তারা অন্দরমহলে বন্দী গৃহপালিত প্রাণীর মত জীবন যাপন করত। পর্দাপ্রথার কঠোর বেড়াজালে তারা ছিল বন্দী। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা গ্রহণের সকল সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার থেকে নারীসমাজ ছিল বঞ্চিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রেনেসা আন্দোলনে হিন্দু সমাজের মেয়েদের অধ:পতিত অবস্থার উন্নতি হয়, কিন্তু সেই রেনেসাসের দীপ্তি মুসলমান সমাজের পর্দা ঠেলে আর অগ্রসর হয়নি। ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় জীবন ধর্মের আহবানে হিন্দু সংস্কারবাদীরা সমাজের উপেক্ষিত নারী সমাজের নিরক্ষতা অবসানের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু সেই সৌভাগ্য ঘটেনি নির্যাতিত মুসলিম নারীদের ভাগ্যে।[২৭] ফলে তারা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই থেকে যায়।

ইসলাম নারীকে সম্মান ও স্বাধীনতা প্রদান করলেও তৎকালীন ইসলাম ধর্মাবলম্বী বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ নারীজাতিকে অসম্মান ও পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। পুরুষের প্রণীত অনুশাসনের নির্যাতনে তারা নির্জীব হয়ে পড়েছিল, নিজেদের অধিকার বিষয়ে তাদের কোন অনুভববোধও ছিল না। 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকা তৎকালীন বঙ্গ মুসলিম নারীর সামাজিক চিত্র তুলে ধরে বলে, "…..বঙ্গ মোসলেমের সামাজিক অবস্থা দর্শনে আজ স্পষ্টই অনুমিত হচ্ছে যে, ইসলাম মতবাদে নারীকে যতোধিক মাত্রায় সম্মান ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী বঙ্গ মোসলেম আজ নারীজাতিকে ততোধিক মাত্রায় অসম্মান ও পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে। ইসলাম নারীজাতিকে সম্মান স্বাধীনতা ও শান্তি-প্রীতির সাথে সংসার ধর্ম পালন করবার যে অধিকার প্রদান করেছে, এই বঙ্গ মোসলেম মহিলা সমাজ সে অধিকার উপভোগ করা তো দূরের কথা স্বপ্নেও একবার চিন্তা করবার অধিকার তার নেই। বঙ্গ-মোসলেম মহিলাগণের সামাজিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ইসলাম যে তাদেরকে সামাজিক পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্মান দান করে বিশ্ব নারী জাতির সম্মান রক্ষা করেছে এই কথাটি একবারও তারা অনুভব করতে পারছে না। আজ সমাজের নির্মম নির্যাতনে তারা জীবনের রসাস্বাদনে এমনই নীর্জিব হয়ে পড়েছে। বঙ্গ মোসলেম মহিলা যে, নিজেকে 'আমি মানবতার পূর্ণ অধিকারিণী মোসলেম মহিলা' বলে হৃদয় ভরা গৌরব অনুভব করবেন সে ভাগ্য পুরুষ জাতির পাশবিক অত্যাচারে ভার আর নেই।"[২৮]

---

[২৬]. ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর ভারতীয় উপমহাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (১৭৯৩) ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন (১৮২৮) প্রণীত হয় এবং ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক উক্ত নীতিগুলো মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে মারাত্মক আঘাত হানে। ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেরকই তাদের জমির মালিকানা হারায়। ফলে অভিজাত মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, **মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক**, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ: ৪২)। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন মুসলমানদের ভাগ্য একেবারে উলট-পালট করে দেয়। কারণ মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা লাখেরাজ সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। এই আইন মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাতস্বরূপ ছিল, কারণ মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা লাখেরাজ সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল (W.W. Hunter, **The Indian Muslims**, Bangladesh First Edition, Dacca, 1975, p: 167). ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত উক্ত নীতিসমূহের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে (তাহমিনা আলম, **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ: ১)।

[২৭]. ছবি রায়, **বাঙলার নারী আন্দোলন**, (কলিকাতা, তা.বি) পৃ: ১৪৫।

[২৮]. **'বঙ্গ-মোসলেম সমাজে মহিলা-জীবন'**, মহিলা-মহফিল, মোয়াজ্জিন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৫ (১৯২৮), পৃ: ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

নানাবিধ কঠোর ও উৎপীড়ক বিধি নিষেধের অনুশাসনে বাধা ছিল তৎকালীন মুসলিম নারীসমাজের জীবন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সওগাত পত্রিকার সম্পাদক তৎকালীন নারীর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, "নারীদের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিন্ডবৎ করে রেখেছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। তাদের বাংলা শিক্ষার বিরুদ্ধেও সমাজের কঠোর নির্দেশ বলবৎ ছিল। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীর জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ধর্মের দোহাই দিয়ে অবরোধের কঠোরতা এদের কর্মশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছিল। গুরুতর অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হতো না পর্দা নষ্ট হওয়ার ও দোজখে যাওয়ার ভয়ে। কঠোর অবরোধের নিগ্রহ ছাড়াও উৎপীড়ন, অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা ছিল সে যুগের নারীদের সারা জীবনের সঙ্গী। প্রতিবাদের ভাষা তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। বাল্যবিবাহ প্রথা অত্যধিক পরিমাণে চালু ছিল। ফলে অকাল মাতৃত্বের জন্য মেয়েরা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়তো। স্বামীর খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হতো। মুসলিম সমাজে নারীদের জন্য ইসলামের বিধান ছিল কার্যত অচল।"[২৯] বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

অবরোধ ও পর্দাপ্রথা

প্রাচীন যুগ থেকেই অবরোধ প্রথার প্রচলন ছিল। অবরোধের মূল উদ্দেশ্যই ছিল নারীকে পুরুষ থেকে আলাদা করে রাখা। মূলত নারীকে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা হিসেবে অবরোধ প্রথা চালু হয়। আঠারো শতকেও বাংলার নারী অবরোধ প্রথার অধীন ছিল এবং এই প্রথা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে প্রচলিত ছিল। তৎকালীন সমাজে নারীকে ইসলামের পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে গৃহকোণে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। নারীর অবরুদ্ধ জীবনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আল এসলাম পত্রিকায় বলা হয়, "…..,বায়ুই আমাদের প্রধান খাদ্য। বিশুদ্ধ বায়ু জীবন ধারণের পক্ষে যেরূপ হিতকর ও স্বাস্থ্যজনক, এরূপ আর কিছুই নয়। কিন্তু…..আমাদের মহিলাবৃন্দ, এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করবার জন্য কখনও সুবিধা পান কি? তারা যদি কখনও পালকী বা যানে কোনও স্থানে গমন করেন, তাহলে তার উপর এমন করে পর্দা এটে দেয়া হয় যে, বায়ু পর্যন্ত প্রবেশ করে না। ফলতঃ আমাদের মহিলারা সারা জীবনের মধ্যে একটি ঘন্টাও নির্মল বায়ু সেবন করবার সুযোগ পান না…..। এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ভ্রমণ জনিত শারীরিক অঙ্গ সঞ্চালনের অভাবে, আমাদের মহিলারা দিন দিন দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং শ্রীশূন্য হয়ে পড়ছে।"[৩০] প্রচলিত পর্দাপ্রথার কঠোরতা নারীকে আলো, বাতাস, স্বাস্থ্য, জ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। অবরোধ ও পর্দার কবলে পড়ে নারী পুরুষের বিলাস সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।[৩১]

অবরুদ্ধ নারী সম্পর্কে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় বলা হয়, "এই অবরুদ্ধ অবস্থায় তার কর্মক্ষেত্র বলে কিছু নেই বললে খুব অত্যুক্তি হবে না। তার মনুষ্যত্বের ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মহিমা নাই-সে কিছু ভাবতে পারে না।……।"[৩২] অবরোধ শৃংখলিত ও মুক্ত আলো বাতাস হতে বঞ্চিত নারী সভ্যতার আলো হতে বঞ্চিত। এ প্রসঙ্গে সওগাত পত্রিকায় বলা হয়, "সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন আছে বলে সেখানে সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি। মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথা দেখলে প্রত্যেকের হৃদয় বিচলিত হয়। মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ মুসলমান রমণীর জন্য চিররুদ্ধ।"[৩৩] তৎকালীন সময়ের প্রচলিত

---

[২৯]. মুহম্মদ নাসিরউদ্দিন, **'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ'**, (ঢাকাঃ ১৯৮৫), পৃঃ ৪৭৮-৪৭৯।

[৩০]. ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, **'স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা'**, আল্ -এস্লাম, ২য় ভাগ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৩ (১৯১৭), পৃঃ ৬০০। এই অবরোধ প্রথা ইসলাম বিরোধী এবং তাই এটা দূর করার আহ্বান জানিয়ে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়, স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথা, স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য ভীষণ প্রতিকূল, এটি সাক্ষাৎ ঈশ্বরদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং যারা যথার্থ মোসলমান বলে পরিচিত হতে চান, তারা এই অনিষ্টকর অবরোধ প্রথা দূর করার জন্য বদ্ধ পরিকর হোন। (ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, **'স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা'**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০১)।

[৩১]. আবুল হোসেন, **'নারীর অধিকার'**, সাধনা, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৮ (১৯২১) পৃঃ ১৯২।

[৩২]. মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা, **'পর্দ্দা' মাসিক মোহাম্মদী** , ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য, ১৩৪০ (১৯৩৩), পৃঃ ৫৬০।

[৩৩]. রিজাউল করীম, **'গৌরবের যুগে মুসলিম রমণী'**, সওগাত, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৪ (১৯২৭), পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

অবরোধ প্রথাকে সোনার খাচার সাথে তুলনা করা যায়। সমাজের অবরোধ প্রথার ফলে নারী ভীরু, দুর্বল ও চিন্তাশক্তিহীন প্রাণীতে পরিনত হয়েছিল। সাধারণ হিন্দু নারীও অন্য পুরুষের দৃষ্টির বাইরে অন্ত:পুরের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জীবন কাটাত। গৃহকেন্দ্রিক পূজা অর্চনা, পতিসেবা, সন্তান পালন, গৃহকর্ম, সতীত্ব রক্ষা এসবই ছিল তার সমাজ নির্ধারিত কাজ। হিন্দু নারীর মত মুসলিম নারীরাও গৃহকর্ম, ধর্মকর্ম, স্বামীসেবা, সন্তান লালনপালন করেই গৃহ অভ্যন্তরে দিনাতিপাত করতেন।[৩৪]

অবরোধ প্রথা অনুযায়ী নারীরা স্বামীর আদেশ নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর পক্ষে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া অথবা কোনো অর্থকরী কাজ করা সম্ভব ছিল না। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নারীকে জনসম্মুকে নিয়ে আসাকে চরম অসম্মানজনক মনে করত। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন থাকলেও এর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। মুসলমান নারীদের একান্ত আত্মীয় স্বজনদের সম্মুখে যাওয়ার সময় পর্দা করতে হত না আর হিন্দু নারীদের বৈবাহিক সুত্রে পুরুষ আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল। তবে পর্দা প্রথা সামাজিক বিধির এক অখন্ড উপাদান হওয়া সত্ত্বেও নিম্নশ্রেণী বা গরিবদের ক্ষেত্রে তা শিথিল ছিল, কিন্তু মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর জন্য বেশী কঠোর ছিল। এই কঠোরতার অন্যতম কারণ ছিল উচু শ্রেণীর নারীরাই পর্দার বাধন ছিন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তবে হিন্দু মুসলিম, ধনী গরীব, উচু নীচু শ্রেণী প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য যাই থাক সকল পর্যায়ের নারীকেই আমৃত্যু পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার নামে পর্দা প্রথার শৃংখলে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকতে হত।[৩৫]

উনবিংশ শতাব্দীর অভিজাত রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে বিদ্যমান কঠোর পর্দাপ্রথা নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিল বলে সরকারী এক রিপোর্টে পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজে অতি অল্প বয়স থেকেই নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সম্মুখে যাওয়া বাঙালী মুসলিম নারীর জন্য নিষিদ্ধ ছিল।[৩৬] কঠোর পর্দাপ্রথার ফলে শিশু আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হতো। অনেক স্থলে ৭/৮ বৎসরের বালিকাদেরকে পর্যন্ত ঘরের বাইরে যেতে দেয়া হতো না। যে শিশুকে দেখলে পাপাত্মার মনেও স্বর্গের আনন্দ এবং প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয়, তাদেরকে পর্যন্ত বাইরের মুক্ত আলো এবং বায়ু হতে বঞ্চিত করা হয়।[৩৭] তৎকালে প্রথা অনুসারে নারীকে অন্ত:পুরে যতবেশী আবদ্ধ রাখা হত সমাজ তাকে ততবেশী আভিজাত্যের প্রতীক বলে মনে করত। অবরোধের কঠোরতা অনুসারে ভদ্রবংশের মাপকাঠি নির্ধারিত হতো। যার গৃহে যত কঠোর অবরোধ প্রচলিত থাকত তিনি তত ভদ্র বলে পরিচিত হতেন।"[৩৮]

১৩১১ বঙ্গাব্দে নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধর্ম্ম এবং শিক্ষা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে সাহিত্যিক ইমদাদুল হকের[৩৯] বক্তব্যে তার সমকালীন মুসলিম নারী সমাজের নীপিড়নের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়। তিনি বলেন, "এখন আমরা নারী জাতিকে গৃহকোণে লুকিয়ে রাখি, বহুমূল্য মণিকাঞ্চনের ন্যায় সাবধানে, অথবা ভঙ্গুর কাচ

---

৩৪. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

৩৫. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৩৬. মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া এ সম্পর্কে বলেছেন, "অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবেমাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই আমাকে স্ত্রীলোকদের হতে পর্দা করতে হতো। ছাই কিছুই বুঝতাম না যে, কেন কারো সম্মুখে যেতে নাই; অথচ পর্দা করতে হতো। পুরুষদেরতো অন্ত:পুরে যেতে নিষেধ, সুতরাং তাদের অত্যাচার আমাকে সইতে হয়নি। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি অথচ তাদের তাদের দেখতে না দেখতে লুকাতে হবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াতে আসতো; অমনি বাড়ির কোন লোক চক্ষুর ইশারা করত, আমি প্রাণভয়ে যত্রতত্র কখনও রান্নাঘরে ঝাপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করে জড়িয়ে রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাতাম। (বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, **'অবরোধবাসিনী' মাসিক মোহাম্মদী**, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৭ ১৯৩০, পৃঃ ৭৫১)।

৩৭. ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, **স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা**, আল-এসলাম, ২য় ভাগ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৩ (১৯১৭), পৃঃ ৫৯৯।

৩৮. রিজাউল করিম, **'গৌরবের যুগে মুসলিম রমণী'**, সওগাত, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৪ (১৯২৭), পৃঃ ২৩।

৩৯. সাহিত্যিক ইমদাদুল হক সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, মরহুম কাজি ইমদাদুল হক, **'বিবিধ প্রসঙ্গ'** সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৩ (১৯২৬), পৃঃ ৫১-৫২; সৈয়দ এমদাদ আলী, **'খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক'**, সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃঃ ১৫৯-১৬৪; আরও দ্রষ্টব্য, সৈয়দ এমদাদ আলী, 'খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক' সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃ: ২৩৫-২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্যের ন্যায় যত্নে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখি, শিক্ষা দিই না, অজ্ঞান করে রাখি, কোনক্রমে মেফ্‌তাহুল জান্নাত খানা পড়িয়ে, ধর্ম্মের নিয়ম কানুনগুলি সাড়ম্বরে ঘড়ির কলের ন্যায় পালন করে যেতে অভ্যস্ত করে দিই, এবং মনে করি এটাই যথেষ্ট, স্ত্রীলোকের পক্ষে আর অধিক আবশ্যক কি?"[৪০]

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনে[৪১] তৎকালীন নারীর সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন, "আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হয়ে গিয়েছি যে, তাদের গৃহসজ্জা (drawing room এর ornament) বৈ কিছুই নই। আমরা .....তাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হয়ে পড়েছি।"[৪২]

তখনকার সমাজে নারীর 'মানুষ' হিসেবে রান্না-বান্না ও সন্তান লালন পালন করা ছাড়া অন্য কোন কর্তব্য ছিল না। পরিবারে মুসলিম নারীর অবস্থান সম্পর্কে আরও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, "বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয়, একথা অস্বীকার করবার নেই। ..রান্না-বান্না করা ও সন্তানের জননী হওয়াই এখন এদেশে সাধারণ মুসলিম রমণীর কর্তব্য; এবং শুধু এই কর্তব্য পালন করেই তারা

---

৪০. ইমদাদুল হক, **'ধর্ম্ম ও শিক্ষা'**, নবনূর, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১০ (১৯০৪), পৃঃ ৪০৬।

৪১. বাঙালী মুসলিম সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংকটময় মুহূর্তে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলার এক রক্ষণশীল সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার জন্ম তারিখ নিয়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও তিনি যে, ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এটা সর্বজন স্বীকৃত। বেগম রোকেয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শামসুন নাহার মাহমুদ রোকেয়া জীবনীতে লিখেছেন, "১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেগম রোকেয়া জন্ম গ্রহণ করেন" (শামসুন নাহার মাহমুদ, **রোকেয়ার জীবনী**, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃঃ ৫)। কবি আব্দুল কাদির, **'রোকেয়া রচনাবলীতে'** সম্পাদকের নিবেদনে লিখেছেন, "১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রংপুর জেলার অন্তঃবর্তী পায়রাবন্দ গ্রামে রোকেয়ার জন্ম হয়" (আব্দুল কাদির, **রোকেয়া রচনাবলী**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃঃ ৭)। একই গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় লেখা হয়েছে, "তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল অনতিদীর্ঘ, (১৮৮০-১৯৩২) ৫২/৫৩ বছর। বেগম রোকেয়ার জন্মশত বার্ষিকীতে (১৮৮০-১৯৮০) First day cover সহ দুটো স্মারক ডাকটিকেট ও খাম উদ্বোধনী হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এতে শুধু ১৮৮০ উল্লেখ ছিল (বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ক্রোড়পত্র- Salient features of commemorative stamps on the birth century of Begum Ruqkiah, Dacca-1980). ৫০ পয়সার ছয় লক্ষ এবং ২ টাকার চার লক্ষ ডাকটিকেট অষ্ট্রিয়ার Bruder Rosewhaum মুদ্রিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে হাসিনা জোয়ার্দ্দার ও শফিউদ্দিন জোয়ার্দ্দার এর লেখা 'Begum Rokeya more-the Emancipator' ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০ রোকেয়ার জন্ম বলে উল্লেখ করেন" (হাসিনা জোয়ার্দ্দার ও শফিউদ্দিন জোয়ার্দ্দার, **Begum Rokeya:The Emancipator**, 1980, পৃঃ৯)। এই তথ্য রোকেয়ার ছোট বোন হোমায়রা তার পুত্র আমির হোসেনকে জানিয়েছেন। আমির হোসেনের স্ত্রী আয়শা জাফর এ তথ্য পরিবেশন করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে আব্দুল মান্নান সৈয়দ, "বেগম রোকেয়ার জন্মতারিখ লিখেছেন ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০" (আব্দুল মান্নান সৈয়দ, **বেগম রোকেয়া**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃঃ ৯৯-১০০)। কবি সুফিয়া কামাল, 'আমার জীবনে রোকেয়া' প্রবন্ধে লিখেছেন, "উনি তো হঠাৎ করেই মারা গেলেন। সকাল বেলায় ওজু করতে বসে ৯ তারিখ ডিসেম্বরে। ওঁর জন্ম দিনও ছিল ডিসেম্বরের ৯ তারিখ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ " (কবি সুফিয়া কামাল, **'আমার জীবনে রোকেয়া'**, সচিত্র সন্ধানী, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৮০, পৃঃ ৩৩)। এই তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ শামসুল আলম, 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য কর্মে' লিখেছেন, "ওর জন্ম দিনও ছিল ডিসেম্বরের ৯ তারিখ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে" (মুহাম্মদ শামসুল আলম, **'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনঃ জীবন ও সাহিত্য কর্ম'**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃঃ ৭৯)। বেগম রোকেয়ার জন্ম সম্পর্কে রওশন জাহান যে বক্তব্য দিয়েছেন তা ১৯৮৮ সালে City University of New York এর Feminist Press থেকে প্রকাশিত তাঁর Sultana's Dreams selections from the seclveled one's লিখেছেন,"Rokeya Sakhawat Hossain was born in 1880 in paira band a small village in the district of Rangpur in the north of present day Bangladesh, at the time of her birth a part of the colonial British province of Bengal Presidency. Her date of birth is uncertain, which is not surprising in region when even to-day lacks a will regulated system of registers births and deaths. Thought some maintainthat she was born on December 9 ,1880 Citing her nephew as the source this date is open to dout."(রওশন জাহান, City University of New York এর Feminist Press, Sultana's Dreams selections from the seclveled one's, p: 37). লায়লা জামান বলেন, "রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হয়" (লায়লা জামান, **জীবনী গ্রন্থমালা ৩**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পৃঃ ১১)।

৪২. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, **'আমাদের অবনতি'**, নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১১ (১৯০৪), পৃঃ ২০৯-২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের পর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। একটিবারও বুঝি তাদের মনে এই চিন্তা জাগে না যে, তারাও সকলের মত মানুষ্যের জন্ম নিয়ে দুনিয়ায় এসে থাকে, এবং মানব জীবনের কর্তব্য এর চেয়ে অনেক বড়।"[৪৩] আদিম সমাজে নারী ছিল পুরুষের প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি, তার ইন্দ্রিয় সুধার খাদ্য, তার পরিশ্রম করার যন্ত্র, তার বাণিজ্যের জন্য তার আদান প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপহার। সমাজ সেই আদিম দিনের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অনেক স্থানে দেখা যায় যে, নারী ও পশুর মধ্যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নেই।[৪৪]

তৎকালে সন্তান লালন-পালন করাই রমণীর প্রধান ও একমাত্র কর্তব্য ছিল। সুসন্তানের জননী হওয়ার মধ্যে নারীর গৌরব লুক্কায়িত আছে বলে নারীরা মনে করতো। যারা মাতৃরূপে রাজা রামমোহন, বিবেকানন্দ, রাসবিহারী, জগদীশচন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, গোখলে, মালবীয় প্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠদের কোলে করে মানুষ করেছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে, তারা সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার করবেন, শৈশবে মাতৃ-দত্ত শিক্ষার প্রভাবেই তাদের প্রকৃতি ও চরিত্র গঠিত হয়েছিল।[৪৫] একই মতবাদ আল এসলাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, "নারীর নারীত্বই মাতৃত্বে। তার জীবনের সকল সময়ই ব্যয়িত হবে উপযুক্ত সন্তান পালনে। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে তারা যাবে না- স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে দেশে স্বাধীনতার জন্য নগরে ঘুরে ফিরবে না এবং অফিস আদালতও করতে যাবে না। গৃহে অবস্থান করেই তাদের সকল সাধনা পূর্ণ হবে মহৎ সন্তান পালনে ....।"[৪৬]

নারীর এই অবরুদ্ধ জীবনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। শৈশবে পিতার অধীনে এরপর স্বামীর অধীনে বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীনে নারীর জীবন পরিচালিত হত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিল। বিভিন্ন বয়সে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় নারী সমাজ যুগে যুগে শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে।

অবরুদ্ধ বা বন্দী জীবন যাপন করার কারণেই বিভিন্ন সময়ে নারীর উপর নেমে এসেছে বিভিন্ন রকম নির্যাতন। ভারতে সতীদাহ প্রথা, চীনদেশে মেয়েদের পা বেধে রাখার প্রথা, আফ্রিকায় অল্পবয়সী মেয়েদের যৌনাঙ্গচ্ছেদ করার রীতি, ইউরোপের নবজাগরণের সময় ব্যাপকহারে মেয়েদের ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা, আমেরিকায় স্ত্রীরোগ ও মানসিক চিকিৎসার নামে নারী হত্যা ইত্যাদি সবই নারীদের উপর অত্যাচারের নিদর্শন।[৪৭] তাছাড়া নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য নারী নির্যাতনের মাত্রাও ছিল অধিক।[৪৮]

সতীদাহ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার প্রচলন রয়েছে।[৪৯] ভারতবর্ষের রাজপরিবার ও অভিজাত পরিবারগুলিতে সহমরণ প্রথা প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত।[৫০] এ প্রথা প্রথমদিকে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে লক্ষ্য

---

[৪৩]. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, **'বাংলার মুসলিম নারী'**, মাতৃ-মঙ্গল, ভারত বর্ষ, ১৩শ বর্ষ, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩২ (১৯২৫), পৃঃ ৯১।

[৪৪]. অধ্যাপক কাজী আনোয়ার কাদির, **'বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক গলদ'**, মোয়াজ্জিন, ৩য় বর্ষ, বন্যা-দুর্ভিক্ষ সংখ্যা, আষাঢ়-চৈত্র, ১৩৩৮, পৃঃ ১৬৩।

[৪৫]. শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, **'বীণার তান'**, ভারতবর্ষ, ৫ম বর্ষ, ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৪ (১৯১৭), পৃঃ ৪৪৫।

[৪৬]. মোহাম্মদ আব্বাস আলী, **'এসলাম ও নারী' শরীয়তে এসলাম**, ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ, ১৩৪৫ (১৯৩৮) পৃঃ ১১১।

[৪৭]. ড. চিত্ত মন্ডল, নারী নির্যাতন নারী আন্দোলন, (কলকাতাঃ নবজাতক প্রকাশন, ২০০৬), পৃঃ ১০৮।

[৪৮]. বাংলাদেশে পর্দা ও অবরোধ প্রথার কারণে নারী বাইরের পৃথিবী থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সামাজিক সকল অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। অবরোধের ফলে নারী ভীরু দুর্বল ও চিন্তাশক্তিহীন প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল। প্রচলিত পর্দা নারীকে সূর্যের আলো দেখা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। ইসলামের পর্দা প্রথার দোহাই দিয়ে নারীকে এমনভাবে আবদ্ধ রাখা হত যার ফলে তারা অসূর্যম্পশ্যা উপাধি লাভ করত। কোন মানুষের সাথেই তারা দেখা সাক্ষাত করতে পারত না। মুক্ত বাতাস গ্রহণ থেকেও তারা বঞ্চিত হত। এর ফরে তাদের জীবনীশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে তারা নানা রোগে আক্রন্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করত। অথচ ইসলামে পর্দা প্রথার দোহাই দিয়ে নারী নির্যাতন করার কোন বিধান নেই। (ডাঃ এম. এ মালেক, **অবরোধ প্রথার অপকারিতা**, মাসিক মোহাম্মদী, **২য় বর্ষ**, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৫ (১৯২৯) পৃঃ ২৬৯)।

[৪৯]. ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পুর্বে ভারতের ইতিহাসে সতীদাহের প্রাচীনতম ও প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় পাঞ্জাবের কাথিয়ানদের মধ্যে। এছাড়াও গ্রীক ঐতিহাসিক ডিকোরাস সিকুলাই এর লেখা থেকে জানা যায়, ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজান্ডার যখন

Dhaka University Institutional Repository

করা গেলেও পরবর্তীকালে ব্রাম্মণ, কায়স্থ, চন্ডাল, তাতি, নাপিত, রাজমিস্ত্রিদের মধ্যেও চালু হয়। তবে সতীদাহপ্রথা ভারতবর্ষে এককভাবে প্রচলিত ছিল না। বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম ও জাতির মধ্যেও স্বামীর চিতায় স্ত্রীর আত্মাহুতি দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, অ্যাসিরিয়া, লিবিয়া, ব্যবিলন, প্রাচীন জার্মান, স্লাভ, চিন, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও জাতিবর্গের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল।[৫১]

আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে থেকেই বিভিন্ন সংস্কৃতি-সাহিত্যে সতীদাহের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। সাহিত্যিকদের মধ্যে বাৎসায়ন, ভাস, কালিদাস, শুদ্রকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মা স্বামীর আরোগ্য লাভ অসম্ভব জানতে পেরে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। একই সময় নেপালের রানী রাজ্যবতীও সতী হন।[৫২] ৭০০ থেকে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সতীর সংখ্যা উত্তর ভারতের কাশ্মীরে বৃদ্ধি পায়। কাশ্মীরের রাজপরিবারের মধ্যে সতীদাহ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র বিবাহিত স্ত্রীরাই নয়, উপপত্নীরাও রাজাদের সঙ্গে সহমরণে যেত।[৫৩] তবে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যেও খুব কম সতী দাহ করার ঘটনা পাওয়া যায়। লিপি, সাইথিয়া, পল্লব, চোল ও পান্ডব রাজপরিবারের মধ্যে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সতী দাহ করার ঘটনা পাওয়া যায় না।[৫৪]

পরবর্তীতে গুপ্তোত্তর ও মধ্যযুগে সতীপ্রথার প্রচলন এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটে। তখনকার সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর নারী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারত না। বিধবা নারীর জন্য মাত্র দুটি পথ খোলা থাকত। **এক.** আমরণ বিধবা হয়ে থাকা, **দুই.** অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেয়া। বৈধব্য জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিধবারা অধিকাংশ সময়ে দ্বিতীয় পথই বেছে নিত।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সহমরণ প্রথা ক্রমে বেড়েই চলছিল এবং এ সময়ে এই নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা রোধ করার জন্য কোন হিন্দু নেতা চেষ্টা করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৫৫] তবে মুসলমান শাসকরা এই প্রথা বন্ধ করতে না পারলেও কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৬] তৎকালীন সমাজে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও সহমরণের প্রবণতা দেখা যায়। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে অনেক মুসলমান মহিলারা সহমরণে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত।[৫৭]

ভারত আক্রমণ করেন তখন ভারতবর্ষে এ প্রথা রীতিমত প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে একমাত্র অথর্ববেদেই সহমরণের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতেও সতীপ্রথা লক্ষ্য করা যায়। মাদ্রী, দেবকী, মদিরা, ভদ্রা ও রোহীনী সহমৃতা হন। রামায়ণের উত্তরকান্ডে দেবকীর জননীর সতী হওয়ার বর্ণনা আছে। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, কলকাতাঃ অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ২০০৫, পৃঃ ২২)।

[৫০]. সাধারণভাবে সহমরণের উৎস সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগেও অনেকের মধ্যে এরকম ধারণা ছিল যে মৃত্যুর পরবর্তী কোন অধ্যায় আছে যেখানে মৃতের জীবিতকালের মতোই সবকিছুর প্রয়োজন হয়। সেই মরণোত্তর অধ্যায়েও পুরুষের স্ত্রীর প্রয়োজন হত এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে রাজার মৃত্যু হলে তার স্ত্রীকে আত্মবলিদান করতে বাধ্য করা হত। (রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়, **সতীদাহ ভারতের কলংক**, দেশ, ১৯৮৭, পৃঃ ৪২)।

[৫১]. Kane, P.V, **History of Dharmasastra**, Vol- II, Part I, Puna, 1941, p: 625.

[৫২]. A.S. Altekar, **The Position of Women in Hindu Civilisation**, 1956, p: 123.

[৫৩]. A.S. Altekar, **The Position of Women in Hindu Civilisation**, 1956, p: 128.

[৫৪]. Ibid, p: 128.

[৫৫]. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, **'বিদ্যাসাগর' বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি'** (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা, কলিকাতা, ১৩৭৬), পৃঃ ৮৫।

[৫৬]. ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব সতীদাহ বন্ধ করা আদেশ দেন। কিন্তু তার আদেশ সেভাবে কার্যকর হয়নি। তবে তার মত শাসনকর্তাদের সতর্ক পর্যবেক্ষণের ফলে অরেক নারীর জীবন রক্ষা পায়। (সুশীল চৌধুরী, **'A Note on sati in Medieval India' 'Proceedings of the History Congress'** রাঁচি ১৯৬৪ খন্ড ২ ও ৩, পৃঃ ৮০, ৮২)।

[৫৭]. সুশীল চৌধুরী, **'A Note on sati in Medieval India' 'Proceedings of the History Congress'** রাঁচি ১৯৬৪ খন্ড ২ ও ৩, পৃঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগের মত আধুনিক যুগেও সতীদাহের মত ঘৃণ্য প্রথাটির চিত্র বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ভয়াবহ প্রথা বাংলাদেশের হুগলি জেলাতেই সবচেয়ে বেশী ঘটেছিল।[৫৮] ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এর কাগজপত্র (হাউস অব কমন্স) ও ইন্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের রেকর্ড, লন্ডন থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮১৫ থেকে ১৮২৭ খ্রীষ্টব্দের মধ্যে হুগলীতে সতী হয়েছেন ১২৪৩ জন। যার মধ্যে বর্ধমানে ৮৫০ জন, নদিয়ায় ৭৬৭ জন, কলকাতায় ৫২৬ জন, জঙ্গলমহলে ৩৬০ জন, চব্বিশ পরগনায় ৩৩৭ জন, ঢাকায় ২৫২ জন, যশোরে ২২০ জন, বাখরগঞ্জে ২১৭ জন, মোদিনীপুরে ১৭৯ জন, ত্রিপুরায় ১৫০ জন, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ১১৩ জন, রংপুরে ১০১ জন, চট্টগ্রামে ৪৯ জন, ময়মনসিংহে ২৪ জন। অন্যান্য জেলার মধ্যে হুগলীতেই সতী সংখ্যা বেশী ছিল এবং উচ্চবর্ণের মধ্যেই এর সর্বাধিক আধিক্য ঘটেছিল।[৫৯] হুগলী জেলায় ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে যে অধিকাংশ সতীদাহ সম্পন্ন হত তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে হ্যালিডে[৬০] বলেছেন, "Such things were frequent in Hoogly as the banks of that side of the river were considered particularly propitious for such sacrifice."[৬১]

হুগলী ও নদীয়ায় কুলিন ব্রাম্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে বেশী সতীদাহ হত।[৬২] যদিও হুগলীতে প্রায় সমস্ত জাতের মধ্যেই সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৩] হুগলী ও নদীয়ায় এক ব্যক্তির সঙ্গে একাধিক নারীর সতী হওয়ার ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি অভূতপূর্ব সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরলোকগত এক কুলীন ব্রাম্মণের ৪০ জন স্ত্রী ছিল, তার মৃত্যুকালে ১৮ জন জীবিত ছিল। যে ১৮ জন জীবিত ছিল তারা সকলেই স্বামীর সতী হয়েছিলেন। সেই চিতার দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক দশ-বারো গজ।[৬৪] ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার বাগনাপাড়ায় এক কুলীন ব্রাম্মণের একশত স্ত্রী ছিল। কুলীনের মুত্যু হলে সাইত্রিশজন স্ত্রী সহমৃতা হন। তিনদিন ধরে তার চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল।[৬৫] ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া ও হুগলীতে ৬টি স্থানে স্বামীর সঙ্গে একাধিক স্ত্রী সহমরণে যায়।[৬৬] উল্লেখ্য যে, সতীদাহের সময় প্রায় সব

---

[৫৮]. হুগলীতে সতীদাহ বেশী হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল অধিক পূণ্য অর্জন। সে সময় বাংলার গঙ্গার পশ্চিমধারে 'ত্রিবেণী' ও 'নিমাইতীর্থ' ছিল প্রসিদ্ধ পূণ্যতীর্থ। এখানকার পূণ্যশ্মশানকে বাণারসীর মণিকর্নিকার ঘাটের সাথে তুলনা করা হত। কাশীতে মৃত্যুর মত এখানে মৃত্যুও ছিল মহাপূণ্যজনক ব্যাপার। দুরদুরান্ত থেকে পায়ে হেটে এসে বহু ক্লান্ত সতী সেখানকার গঙ্গায় স্নান করে, তার গহনা বিলিয়ে দিয়ে স্বামীর জলন্ত শবটি আলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে (গঙ্গার পূর্ব তীরের চেয়ে পশ্চিম তীর বেশী পবিত্র বলে বিবেচিত হত) শেষ নিঃশ্বাস ফেলার বাসনা নিয়ে অনেক মুমূর্ষ ব্যক্তিও বর্ধমানের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে হুগলীতে আসত, সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও আসত। স্বামীর দেহাবসানের পর অনেক সময়ই তারা সহমরণে যেত। গঙ্গাতীরে শেষকৃত্য করার জন্য অনেক দুর দুরান্ত থেকে শবদেহ নিয়ে আসা হত অনেক সময় সঙ্গে সহমরণে ইচ্ছুক রমণীরা আসত। (স্বপন বসু, **সতী**, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮২, পৃঃ ১৭৪-১৭৫)।

[৫৯]. Gr. Br Parliamentary Papers, House of Commons India Office library records (London). বিনয়ভূষণ রায়, **'বাংলার সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন'**, (কলিকাতা, ১৯৮৬), পৃ: ৪৮।

[৬০]. ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালিডে হুগলি জেলাশাসক ছিলেন। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫)।

[৬১]. শ্রীকৃঞ্চ গোপাল পাকড়াশী, **তিনশতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র**, রিষড়া, হুগলী, ১৩৮২, পৃঃ ২৩২।

[৬২]. কৌলিন্যপ্রথার ব্যাপক প্রভাবের জন্য হুগলী অঞ্চলে সতীপ্রথার কতটা প্রসার ঘটেছিল তা হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ ৫/২/১৮২৯ সালে সরকারের কাছে প্রদত্ত বিবরণীতে তথ্য সহযোগে উপস্থাপন করেন, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়া এই তিন জেলায় ১,২০,০০০ কুলীন ব্রাম্মণ ও ৬০,০০০ কায়স্থ পরিবারের বাস ছিল। এসব কুলীন ব্রাম্মণরা ৫০, ৬০,৭০টি কখনো ১০০টি করে বিবাহ করত। এই সব কুলীনদের মৃত্যু হলে বহুসংখ্যক পত্নী সতী হত। (Bengal Judicial-Criminal Cons. No. 9, 4.2.1829.)

[৬৩]. বিনয়ভূষণ রায়, **'বাংলার সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন'**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

[৬৪]. W. Ward, **A View of the History: Literature and Mythology of the Hindos**, Voll-II, (Serampur, 1815), p: 305.

[৬৫]. সুধীরকুমার মিত্র, **হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ**, প্রথম খন্ড, (কলিকাতা, ১৯৯১), পৃঃ ১৯১।

[৬৬]. হুগলী ও নদীয়ায় সতীদাহের ৫টি ক্ষেত্রে ২ জন করে এবং শান্তিপুরে ধনী গৃহস্থ বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৩ জন নারী স্বামীর সাথে সহমরণে যায়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির ৭৯টির মধ্যে ৭৭টি ক্ষেত্রে এবং নদীয়ার সবকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ উপস্থিত ছিল। (বিনয়ভূষণ রায়, **'বাংলার সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন'**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২)।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রেই পুলিশ উপস্থিত থাকত।[৬৭] ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬টি জেলায় ৪৩৩ জন সতী হয়েছে তার মধ্যে ৩৯১টি ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত ছিল।[৬৮] তবে পুলিশের পক্ষ থেকে কোন নারীর প্রতি সতী হওয়ার জন্য বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেনি বলে জানা যায়।[৬৯] সতীদাহের আইনসম্মত শেষ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে হুগলি জেলার চুচুড়ায় সতীদাহ বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার কয়েকদিন আগে। সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. হ্যালিডে, ডা. ওয়াইজ ও একজন ধর্মযাজক উপস্থিত ছিলেন।[৭০]

সতীপ্রথা যে বাধ্যতামূলক ছিল না সে বিষয়ে কোন মতভেদ পাওয়া যায় না। সতীদাহের কারণ সম্পর্কে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সতীদাহের জন্য শিশুকাল থেকেই মেয়েদের উৎসাহ দিত। কার্যত কোমলমতি শিশুদের অন্তরে এ কথা প্রবেশ করিয়ে দিত যে পতি হলেন সাক্ষাৎ দেবতা। পতিপরায়ণতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবারই দরকার নেই। তাই পতির সাথে সহমরণে যেতে হবে নিজের জন্য এবং স্বামীর জন্য। স্ত্রী সহমরণে গেলে স্বামী তার যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত হবে। শুধু তাই নয় ব্রাম্মণ, উপকারী ও বন্ধু ঘাতককে একমাত্র সহনৃতা স্ত্রীরাই পাপমুক্ত করতে পারেন। সহমৃতা মাত্রেই স্বর্গে অরুন্ধতীর সমান মহীয়সী হবেন। মানবদেহে প্রায় সাড়ে তিনকোটি লোম থাকে। হিন্দু নারীদের ধারণা ছিল সহমৃতা সাড়ে তিনকোটি বছরই স্বর্গে থাকবেন এবং স্বামীর সঙ্গে পরম আনন্দে বাস করবেন। সহমৃতা স্বামীকে নরক থেকে টেনে বের করে স্বর্গসুখ দান করে। শুধু স্বামী নয় সে পিতা, মাতা এবং শ্বশুর তিন কুলকেই পবিত্র করে। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের এই ধরনের প্রচার সতীদাহের মত নারকীয় ঘটনাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ভবিষ্যৎ সুখের এই প্রলোভনে মেয়েদের সতী হওয়া থেকে বিরত রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সময়ও তাদের শরীরী ভাষায় এতটুকু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যেত না।[৭১]

অতি স্বল্প সময়ে লোকের চোখে দেবী হয়ে ওটার লোভ ছাড়াও বৈধব্য জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক মেয়ে স্বেচ্ছায় সতী হয়েছে। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুত মেয়েদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বা কোন রাজপুত রাজার মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রীর সম্মান রাখার জন্য সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। শত্রুপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করলে পরাজিত রাজার স্ত্রী ও মেয়েদের অধিকার

---

[৬৭]. ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতী সম্পর্কে সরকার কিছু বিধিনিষেধ জারি করে, এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ম্যাজিষ্টেটরা তাদের এলাকায় সতীর বাৎসরিক রিপোর্ট দাখিল করতে থাকে। এই সময় পুলিশকে প্রত্যেকটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে স্বেচ্ছায় শাস্ত্রানুসারে মেয়েটি সতী হচ্ছে কি না তা দেখার নির্দেশ দেয়া হয়। কোন কোন জেলার লোকেরা অবশ্য এ ব্যাপারে পুলিশী হস্তক্ষেপ পছন্দ করত না। সেজন্য তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশে খবর দিত না, কতিপয় ক্ষেত্রে ঘটনা শেষ হওয়ার পর খবর দিত। (স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৯)।

[৬৮]. স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১-৮২।

[৬৯]. বিনয়ভূষণ রায়, **'বাংলার সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন'**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।

[৭০]. সতীপ্রথার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হ্যালিডে সাহেবের বিবরণ উল্লেখ করা হলো, আসাধারণ সাহসী এক নারী তার স্বামীর জামাকাপড়ের সঙ্গে সহমরণে যেতে উদ্যতা। মহিলাটি চিতার দিকে এগোচ্ছে তখন ধর্মযাজকটির অনুরোধে হ্যালিডে স্বয়ং সহমরণে উন্মুখ নারীকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন এবং এ ধরণের স্বেচ্ছামরণের কষ্ট ও যন্ত্রণা যে কী দুর্বিসহ সে সম্পর্কে উক্ত মহিলাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার অনুরোধ ও সুপরামর্শের উত্তরে সদ্য বিধবাটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ শিখায় নিজের আঙুল স্বেচ্ছায় পুড়িয়ে সাহেবকে দেখিয়েছিলেন। আঙুল ঝলসে ফোস্কা পড়ে শেষে কালো হয়ে গিয়েছিল, তবুও তার হাত একটুও নড়েনি। তার মুখ থেকে কোন শব্দও বের হয়নি বা মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হয়নি। এ সময় মেয়েটি হ্যালিডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন?" হ্যালিডে তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে জানালেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ'। মেয়েটি তখন আগুন থেকে আঙ্গুলটা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এখন কি আমি সতী হতে পারি?" হ্যালিডে মেয়েটির প্রত্যয়, দৃঢ়তা, অঙ্গীকার এবং পারলৌকিক বিশ্বাসের গভীরতায় বিস্মিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিতে বাধ্য হলে সে চিতার কাছে গিয়ে দু'তিনবার তা প্রদক্ষিণ করার পর চিতায় আরোহণ করল। তার উপর হাল্কা কিছু ডালপালা চাপানো হলো, হ্যালিডের আপত্তির জন্য তাকে চিতার সঙ্গে বাধা হয়নি। মহিলাটির ৩০ বছরের এক ছেলে চিতায় অগ্নিসংযোগ করে। অনুমরণের এই ঘটনাটিতে হ্যালিডে সাহেব চিতার খুব কাছে দাড়িয়ে থাকলেও তিনি কোনও চিৎকার শোনেননি, বা বিধবাটিকে নড়াচড়াও করতে দেখেননি। (C.E. Buckland, **Bengal Under the lieutenant Governors,** 1901, Vol-I, p: 160.

[৭১]. Dr. Kali Kinkar Dutta, **Educational and Social Amelioration of Women in Pre. Meeting**, p: 67; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৪৩-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

পেয়ে যেত স্বাভাবিকভাবেই। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুতমেয়েরা নিজেরাই বিষ খেয়ে মারা যেত।[৭২]

কুলিন মেয়েদের সমস্যা সমাজে প্রকট ছিল। কুলীন পুরুষ বহুসংখ্যক বিয়ে করতেন। কুলীনমেয়েরা শিশু বয়সে বা যে কোন বয়সেই হোক না কেন বিয়ের পর কুলীন স্বামীর ঘর করতে পারত না। অনেক সময় স্বামীকে চোখে দেখাই সম্ভব হত না। ১৮৫৩ সালে অবিভক্ত বাংলার এক সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, সে সময়ের কলকাতায় ১০ হাজার পতিতা মেয়ে ছিল কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী। সুন্দরী কুলীন মেয়েদের বিষ খাইয়ে মারার বহু ঘটনাও সে যুগে ঘটেছে।[৭৩] বিধবাদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাবও তাকে সতী হতে উদ্বুদ্ধ করত। বিধবা ভ্রষ্টা হলে বংশ কলঙ্কিত হওয়ার আশংকাতেও স্বামীর আত্মীয়রা অনেক সময় সহমরণে যেতে উৎসাহ দিত।[৭৪] নিঃসন্তান বিধবার ভরণপোষণের দায়িত্ব কে নেবে সে প্রশ্নও অনেক সময় সহমরণের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তাছাড়া নিঃসন্তান সম্পদশালিনী বিধবার মৃত্যু হলে সম্পত্তি গ্রাস করা যাবে সহজেই এই ভেবেও আত্মীয়স্বজন ও সমাজপতিরা বিধবাকে সতী হতে ইন্ধন যুগিয়েছে।[৭৫]

বাংলার মতো ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এত সতীদাহ হতো না। তার অন্যতম কারণ ছিল অন্যান্য এলাকার নারীরা যৌথ পরিবারে বাস করেও মৃত স্বামীর সম্পত্তির দাবি করতে পারত না। একমাত্র ‘দায়ভাগ’[৭৬] এর জন্যই বাংলার সন্তানহীন বিধবা নারীদের যৌথ পরিবারে বাস করে মৃত স্বামীর সম্পত্তির উপর দাবি রাখার অধিকার ছিল। এরফলে সম্পত্তি রক্ষার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিধবা নারীদের সতী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করত। কোন মেয়ে সতী হলে ব্রাহ্মণরা আর্থিকভাবে লাভবান হত। কোনও কোনও ধনী পরিবার থেকে এজন্য তাদের ২০০ টাকা পর্যন্ত প্রাপ্তিযোগ ঘটত। আর এই অর্থপ্রাপ্তির লোভে ব্রাম্মণরা অনেককে সতী হওয়ার প্ররোচনা দিত। ব্রাম্মণদের প্ররোচনায় অনেক নারী সতী হতো।[৭৭]

তবে সতীপ্রথা বাধ্যতামুলক ছিল না। সতী হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের প্ররোচিত করা হত, কিন্তু তাদেরকে সতী হতে বাধ্য করার বা বল প্রয়োগের[৭৮] ঘটনার উল্লেখ তেমন পাওয়া যায় না। দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মেয়েই স্বেচ্ছায় সহমরণে যেত। বহু নারী সতী হবার সংকল্প ঘোষণা করে পরে মত পাল্টেছেন, কেউ শেষ মূহুর্তে চিতায় উঠতে অস্বীকার করেছেন। কেউ প্রাণভয়ে জলন্ত চিতা থেকে লাফিয়ে পড়েছেন,

---

৭২. তৎকালীন রাজপুত মেয়েরা সাহসিকতার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করত। এ কারণেই এটা অত্যন্ত সত্য যে অবিভক্ত বাংলায় বা ভারতবর্ষে সে সময় বাঙালি মেয়েদের মরতে হত না। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯)।

৭৩. কুলীন পুরুষের কাছে কন্যাকে বিয়ে দেয়ার পর মেয়ের বাবা-মা কুলীন জামাইয়ের বাৎসরিক খরচ দিতেন। বিবাহিত কুলীন মেয়েরা বাবা-মা মারা গেলে দাসত্ব করে, ঝি গিরি করে জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। এই যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য অধঃপতিত সমাজের প্রলোভনের হাতছানিতে বহু কুলীন মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। (চিত্র দেব, **অন্তঃপুরের আত্মকথা**, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪ খ্রীঃ, পৃঃ ১০)।

৭৪. The Friend of India, **The Burning of Windows**, July 1819.

৭৫. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

৭৬. মূলত দায়ভাগ আইন হলো হিন্দু বিধবা নারীর মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তাধিকারী হওয়ার আইন। দায়ভাগ বা উত্তরাধিকার আইনের প্রবর্তক জীমূতবাহন সন্তানহীন বিধবাদের মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। স্বামীর মৃত্যুর সময় যৌথ পরিবারে বাস করলেও বিধবা নারী স্বামীর সম্পত্তির দাবি করতে পারবে। পরবর্তীতে দায়ভাগ আইন সন্তানহীন বিধবাদের স্বামীর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে, কিন্তু তা বাংলার দুর্বলচেতা মহিলাদের কাছে অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। কারণ সম্পত্তির লোভে পুরুষ সদস্যরা নারীদের সহমরণে যেতে বাধ্য করে। দায়ভাগ আইনের কারণেও অনেক নারীকে সহমরণে যেতে হয়েছে। (A.S. Altekar, **The Position of Women in Hindu Civilisation**, 1956, p: 139, 261.)

৭৭. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৭৮. ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের সমাচার দর্পণের সবকটি সংখ্যা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এতে মোট ২৫টি সহমরণের ঘটনায় ৩৪ জন স্ত্রীলোকের সহমৃতা হওয়ার সংবাদ আছে। এই ৩৪টির মধ্যে ৩৩টি ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কোনও ঘটনা ঘটেনি। একটি মাত্র ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের উপক্রম হলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মেয়েটি রক্ষা পায়। (**সমাচার দর্পণ**, সংখ্যা ৩৩৫, ১৬ অক্টোবর, ১৮২৪)। এছাড়া টাভার্নিয়ের পিটার ম্যান্ডি, নিকোলাস, উইদিংটন, উইলিয়াম হজেস, হরওয়েল সহ বেশীরভাগ ইউরোপীয় লেখক দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মেয়েই যে স্বেচ্ছায় সতী হত, একথা স্বীকার করেছেন। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১)।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কেউ পুলিশ বা আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ঘরে ফিরেছেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৯টি মেয়ে সতী হতে এসে ফিরে গিয়েছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ২২টি মেয়েকে নানাভাবে সতী হওয়া থেকে নিবৃত করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয় স্বজন ও পুলিশের হস্তক্ষেপে ১৯টি মেয়ে সতী হওয়া থেকে বিরত ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪/২৫টি মেয়ে সতী হতে এসেও শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরে যায়।[৭৯]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[৮০] ১৮১৮ সালে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সতীদাহের মত নৃশংস প্রথার হাত থেকে নারীদের বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন। রামমোহনকে দেখে গোড়া হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠপোষকরা সতীপ্রথা কায়েম রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করেন। তারা সতীদাহ নিবারক নিয়মবিধি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সনাতনধর্মীরা সরকারের কাছে প্রতিবাদলিপি পেশ করেন। রাজা রামমোহন রায় ও তার সহযোগীরা ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে পাল্টা আবেদন করেন যে, প্রতিটা শাস্ত্র অনুসারে এবং যেকোন দেশের মানুষের বুদ্ধি অনুসারে এসব ঘটনা নরহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৮১]

শুধু প্রতিবাদলিপি, আবেদন-নিবেদন পেশ ও বই লেখা ইত্যাদিতেই রাজা রামমোহন রায় ব্যস্ত ছিলেন না, তিনি তার সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে সতীদাহের ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাজ ছিল ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া, সতীদাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া, দাহ থেকে বিধবাকে রক্ষা করা এবং আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়িত করা।[৮২]

---

৭৯. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯-৩০।

৮০. সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাক্ষণে বাংলাদেশে এই প্রথা তীব্ররূপ ধারণ করে। এই সময় দেশের কিছু সচেতন ব্যক্তি ছাড়া সকলেই এ প্রথা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রচারে ক্লান্ত খ্রিষ্টান মিশনারীরাই নিজেদের স্বার্থে প্রথম এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন। ১৮০৪ এর এপ্রিল থেকে অক্টোবর এই ৬ মাসে কলকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনারীরা সতী বিষয়ে সমীক্ষা চালান। তাতে দেখা যায়, ওই ৬ মাসে এই অঞ্চলে ১১৬টি মেয়ে সতী হয়েছে। (C. Buchanan, **Christian Researches in Asia**, 5th Ed. London, 1812, p: 40.) উইলিয়াম কেরিও এই সময় এ প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের সাহায্যে সতী প্রথা সম্পর্কে শাস্ত্রে কোথায় কী বলা হয়েছে তা সংগ্রহ করেন। তিনি এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে একটি আবেদন প্রস্তুত করে মি. উডনির মারফত সপার্ষদ ওয়েলসির নিকট প্রেরণ করেন। (J.C.Marshman, **The Life and Times of Carry, Marshman and Ward**, Vol-I, London, 1859, p: 222.) কিন্তু সরকার এতে কোন আগ্রহ দেখালেন না। এতে মিশনারীরা ক্ষান্ত না হয়ে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে সতীর বাৎসরিক হিসাব তৈরী হতে লাগল, শিশু সন্তানের মায়েদের সতী হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অব সার্কিটের চতুর্থ বিচারপতি এডওয়ার্ড ওয়াটসন নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রারকে আইন করে এ প্রথা বন্ধ করার সুপারিশ করেন, এবং তা করলে বিন্দুমাত্র আশংকার কারণ নেই তা জানান। (**Bengal Judicial-Criminal Cons. No. 4**, 30.7.1819.) ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জে এইচ হ্যারিংটন সতী প্রথা বেআইনি ও দন্ডনীয়-এই মর্মে একটি ড্রাফট রেগুলেশন করে পাঠান। (**Parliamentary Papers, House of Commons**, 1830, Vol-28, p: 130, 134.) কিন্তু গভর্ণর জেনারেল আর্মহাস্ট সতীপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভায় সতীপ্রথা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হত। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭-৩৮)।

৮১. নির্মল সেনগুপ্ত রাজর্ষি রামমোহন, **সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**, প্রগুক্ত, পৃ ৫১, রাজা রামমোহন রায় সহমরণের ক্ষতিকর দিক ও শাস্ত্রে এর অনুমোদন আছে কি নেই এসব বিষয়ে দুটি বই লেখেন। সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্যাতনের সম্বাদ (১৮১৮) এবং সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্যাতকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) শিরোনামে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫)।

৮২. এমনকি রাজা রামমোহন রায় নিজেই শ্মশান ঘাটে যেতেন, বোঝাতে চেষ্টা করতেন এবং সতীদাহ বন্ধ করতেন। এজন্য বহুবার তাকে স্বর্থান্বেষী মানুষের হাতে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হলেও তিনি তার প্রতিজ্ঞায় স্থির ছিলেন। (নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪)। সতীদাহ করার সময় জোর কর ভাং, ধুতরা পাতার রস বা ঐ রকম নেশার জিনিস খাইয়ে আগুনে ফেলে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা হত এবং খুব বেশি ধুপের ধোঁয়া তৈরী করা হত যাতে অন্য লোক দেখতে না পায়। মৃত্যুর ভয়াবহ করুণ আর্তনাদ ঢাকবার জন্য রাজ্যের ঢাক ঢোল কাঁশি শাখ এত জোরে বাজান হত যে, কেউ যেন তার চিৎকার, কান্না, অনুনয় বিনয় না শোনে। (শরৎ রচনাবলি, **নারীর মূল্য**, ৪র্থ খন্ড, পৃ ৫৭১-৫৭২; কনক মুখোপাধ্যায়, **উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর**, পৃ: ৯)।

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৫ খ্রী: কলকাতার কাছে সতীদাহের একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। কলেরায় মৃত এক যুবকের বিধবা পত্নী চিতায় আগুন দেওয়ার পর সবার অলক্ষ্যে চিতা থেকে নেমে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। শ্মশান যাত্রীরা চিতার মধ্যে সতীকে দেখতে না পেয়ে জঙ্গল থেকে ধরে এনে তাকে মাঝ নদীতে ডুবিয়ে মারে।[৮৩] রাজা রামমোহন রায় এই মর্মান্তিক সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য সমাজের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, প্রতিরোধ আন্দোলন করেই নিশ্চুপ ছিলেন না বরং তিনি হিন্দু শাস্ত্র থেকে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে বহু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে প্রমাণ করলেন যে, বিধবার সহমরণ শাস্ত্র অনুমোদন করেননি বরং বিধবার সাত্তিকতা ও শুদ্ধাচারের কথাই শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৯ সালের ৪ই জানুয়ারি লর্ড বেন্টিক সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যে ডিক্রি জারি করে তার মুখবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিগুলো লিপিবদ্ধ ছিল।[৮৪]

১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী সতীদাহের পক্ষের সমাজপতিরা প্রতিবাদ জানিয়ে বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন জানায় সতীদাহ প্রথা চালু রাখার জন্য। রামমোহন রায় পাল্টা আবেদন নিয়ে বিলেতে গেলেন। কমন্স সভাতেও তিনি তার বক্তব্য পেশ করেন। ১৮৩২ সালের ১২ জুলাই প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে সতীদাহ বন্ধের আইন চুড়ান্তভাবে ঘোষিত হয়।[৮৫] রাজা রামমোহন রায় নারী সমাজের প্রতি এই জঘন্য সমাজ স্বীকৃত হত্যাযজ্ঞ বন্ধের মাধ্যমে পাক ভারত উপমহাদেশের অগণিত বিধবার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন।[৮৬] নারী জাগরণে রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ ভুমিকার একটি অংশ হচ্ছে সতীদাহ প্রথা বন্ধে সাফল্য অর্জন।

বিধবা বিবাহ

তৎকালিন হিন্দুসমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের নামে নারী সমাজের প্রতি যেসব নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রচলিত ছিল, সেগুলোর মধ্যে সতীদাহ, বিধবার বিয়ে না দেওয়া, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রথা ও সামাজিক বিধি নিষেধের দুর্ভোগ মেয়েদের পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর, পরনির্ভরশীল, অসহায় ও নিষ্পেষিত করে রেখেছিল। নারী সমাজকে এসব

---

[৮৩]. এই ঘটনায় দেশের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রামমোহন রায়ের বন্ধু সহযোগী দল ও কলকাতাবাসী ইংরেজরা প্রতিবাদ করেন তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড আর্মহার্স্ট। এতবড় নিষ্ঠুর ঘটনার পরও তিনি সতীদাহ বন্ধের আইন জারি করতে সাহস করেননি। তবে তিনি কিছু নিয়ম জারি করে সতীদাহকে নিয়ন্ত্রিত করেন। নিয়মগুলি হল: ক) কোন সহমরণ নারীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে ছাড়া অন্যভাবে দাহ করা যাবে না বা অন্যকোন ভাবে হত্যা করা যাবে না। খ) সহমরণকামী বিধবাকে নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে অনুমতি নিতে হবে, অন্যের মাধ্যমে অনুমতি নিলে হবে না। গ) বিধবার সহমরণে সহায়ক কোন ব্যক্তি চাকরি পাবে না। ঘ) সহমৃতা বিধবার পতির কোন সম্পত্তি থাকলে সরকার তা বাজেয়াপ্ত করবে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬)।

[৮৪]. রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের শাস্ত্রকথা প্রমাণসহ বই লিখে ব্যাপকভাব প্রচার করতে থাকেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬)।

[৮৫]. প্রিভি কাউন্সিলের এজলাস দুপক্ষের আবেদন বিবেচনার জন্য বসে। এজলাস লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল লর্ড চ্যাপেল, ফার্স্ট লর্ড অব দি অ্যাডমিরালটি, লর্ড আর্মহাস্ট, লর্ড জন রাসেল, মার্কুইস অব ওয়েলেসলি, মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন প্রমূখের পাশে রাজা রামমোহন রায়ও বসেছিলেন, দীর্ঘ আলোচনার পর সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। রামমোহন রায়ের পরিকল্পনা ছিল সমাজের অন্যান্য সংস্কারমূলক আন্দোলনের পাশাপাশি নারী প্রগতির জন্য কাজ করবেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের আন্দোলনেই তার ২১ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে, বিধবা বিয়ে চালু করা, বাল্যবিয়ে বন্ধ করা, স্ত্রী শিক্ষা চালু করার যে পরিকল্পনা ও লক্ষ্য ছিল তা পূরণ করার সময় তিনি পাননি। অসুস্থ অবস্থায় ১৮৩৩ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই মহান সংস্কারক মারা যান। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬)।

[৮৬]. ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে। (ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, পৃ: ২২; উদ্ধৃতি: **এশিয়াটিক জার্নাল**, ভলিয়্যুম ২৩, পৃ: ৬৮৯)। সে সময়ের সরকারি হিসাবে জানা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হয়েছে। শুধু কলকাতা ও আশে পাশের এলাকাগুলোতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫২৮ জন। (নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩)। ১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫ হাজার ১২৮ টি বালক-বালিকা পিতৃ মাতৃহীন হয়। বঙ্গদেশের যত সতীদাহ হয়, তার সাত অংশের এক অংশই হয়েছে শুধু হুগলীতে। এই হুগলীতেই রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়, তিনি স্বয়ং ছিলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী। (**এশিয়াটিক জার্নাল**, ভলিয়্যম ২৩, পৃ: ৬৮৯)। ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ঢাকা জেলায় একশত পঁচানব্বই জন বিধবা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীর চিতায় আরোহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত পরিকল্পনাগুলো নবযুগের মনীষীরা আত্মীয় সভার মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন।[৮৭]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার নারী সমাজ বাঁচার অধিকার পেল রামমোহন রায়ের কাছ থেকে। আর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা, সম্মান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচার পথ খুজে পেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) চেষ্টায়।[৮৮] বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ ও বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে বহু লেখালেখি, তর্ক উত্থাপন ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা চালু করার ব্যাপারে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন।[৮৯]

বাংলাদেশের ব্রাম্মণ সমাজের কয়েক শ্রেণীর মধ্যে বহু বিবাহের অভিশাপ অগণিত নারীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। কৌলিন্যের নামে একগাছা পৈতের জোরে হৃদয়হীন পুরুষ একাধিক নিরীহ ও যুবতীর পাণিগ্রহণ করে তাদেরকে দরিদ্র ও অবহেলার মধ্যে রাখত। একজনের মৃত্যুতে বহু বালিকা ও যুবতী বিধবা হয়ে বৈধব্য জীবনের অসহ্য যন্ত্রনা নীরবে ভোগ করত। দেখা গেছে মাত্র তিন চার বছর বয়সেও অনেক বালিকা বিধবা হয়েছে।[৯০]

শিক্ষিত ও উদার পরিবারের বিধবাদের প্রতিও রূঢ় ও নির্দয় আচরণ করা হত।[৯১] সুন্দরী যুবতী যে স্ত্রীকে একদিন বাড়ীর সৌভাগ্য এবং দেবী হিসেবে গণ্য করা হত, বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাগ্যে জুটত চরম অবহেলা এবং নিষ্ঠুর আচরণ। সমাজ বৈধব্যের জন্য বিধবাকেই দায়ী করত। মনে করা হত যে, পূর্বজন্মে স্বামীকে প্রতারণা অথবা হত্যা করার জন্যেই এ জীবনে বৈধব্য ঘটেছে। সুতরাং কঠোর আচার পালনের মাধ্যমে বিধবার প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। বিধবার কোন সন্তান না থাকলে অথবা অবিবাহিতা কন্যা থাকলে সে বিধবাকে আরও বেশী পাপী বলে গণ্য করা হত।[৯২] বিধবাকে পাপ ও অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হত এবং সে কারণে বিবাহ ও অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানে বিধবার উপস্থিতি অমঙ্গলজনক

---

[৮৭]. রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে আত্মীয়সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৌলীণ্য প্রথা, কন্যা বিক্রি, পণ প্রথা, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬-১৯)।

[৮৮]. সামাজিক মান মর্যাদা সম্পন্ন পন্ডিত পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানা বাধার মধ্য দিয়েও কৃতিত্বের সাথে ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতি:শাস্ত্র, বেদান্ত সংস্কৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ইংরেজি ছাড়াও ফোর্ট উলিয়াম কলেজে শিক্ষকতার সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "প্রথম থেকেই তার জীবন সমস্ত প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে। দরিদ্র বাবার দরিদ্র ছেলে "গয়ার সাগর" নামে বাংলাদেশের মানুষের মনে চিরদিনের জন্য স্থান করে নিয়েছেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **চরিত্র পুজা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**, ভাদ্র ১৩০২; **রবীন্দ্র রচনাবলী**, চতুর্থ খন্ড, ১৯৬৫ খ্রী:, পৃ: ৪৯০)।

[৮৯]. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের শুরু মায়ের প্রেরণায়। এর পিছনে কারণ ছিল। সংস্কৃতি কলেজের নানাবিধ কাজের মধ্যে তীব্র সমাজ সংগ্রামে ব্যাপৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে তার মা কাঁদতে কাঁদতে এসে ছোট এক বালিকার বৈধব্যের কথা উল্লেখ করে বললেন, এত শাস্ত্র পড়লি তাতে বিধবার কি কোন উপায়,নেই? এরপর থেকে মা ও ছেলে বিধবা সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হলেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **চরিত্র পূজা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**, প্রাগুক্ত; **রবীন্দ্র রচনাবলী**, চতুর্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯২)।

[৯০]. ১৮৮১ সালে ১০ বছরের বয়স এমন বালিকাদের মধ্যে ১৩.৬% বিবাহিত এবং ৬% বিধবা ছিল। (**Report on the womens of Bengal 1901**, Vol-VI, p: 2, Colcutta Bengal Secretariat Press, 1902, p: 266); এসব বালিকারা বিয়ের অর্থই বুঝত না। অথচ এদেরকে বৈধব্যের আচার সমূহ পালন করতে হত। এসব আচারের মধ্যে ছিল একাদশীর দিনে নির্জলা উপবাস, নিরামিষ এবং একবার মাত্র আহার, মেঝেতে শয়ন, মোটা ও নিরলংকার বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি। (রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, **তিথিতত্ত্বম**, কলিকাতা, ১৯০৬, পৃ: ৫৫); প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্যেই যেসব আচার পালন করা দু:সাধ্য ছিল সেসব আচার এবং তদুপরি আজীবন ব্রম্মচর্য পালন কমবয়সী বিধবাদের পক্ষে যে কি দুর্বিসহ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। অনেক সময়ে এসব কারণেই কোনও কোনও বিধবা আজীবন কৃচ্ছসাধন করার পরিবর্তে সহমরণকে স্বাগত জানাত। (Max Muller, quoted in M. F. Billington, **Women in India**, Re-printed: New Delhi, 1973, p: 113.)

[৯১]. L. Scrafton, **A history of Bengal before and After Plassey** (Re-printed: Kolkata, 1975), p: 9; M. F. Billington, **Women in India**, ibid, p: 121.

[৯২]. P. Remabai Saraswari, **The High Caste Hindu Women**, 1887, (2nd ed. Philadalphia), p: 60-70.

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। ভুলক্রমে কোন অনুষ্ঠানে কোন বিধবা উপস্থিত হলে এবং পরবর্তীতে ঐ পরিবারে কোন দুর্ঘটনা বা মৃত্যুজনিত ঘটনা ঘটলে উক্ত ঘটনার জন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিধবাকে দায়ী করা হত এবং এজন্য তাকে নানারকম তিরস্কার ও গঞ্জনা সহ্য করতে হত।[৯৩]

পরিবারে বিধবার কোন স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। বিধবা ও দাসীর মধ্যে সামান্যই পার্থক্য ছিল। নিজের পরিবারে বিধবা কার্যত দাসীর মতোই বাস করত।[৯৪] অবশ্য বিধবাদের এই অমর্যাদা কেবল উনবিংশ শতাব্দীর কোনও ঘটনা নয়। মুসলিম আমলে বিধবাদের অবস্থা কমবেশী এমনই ছিল।[৯৫]

শিশু বিধবাকে একাদশীর দিনে জলবিন্দু না দিয়ে বৃদ্ধ পিতা বালিকা স্ত্রীর সঙ্গে বিলাসমগ্ন থাকতেন। সমাজের এই অসহনীয় মানসিক শারিরীক অত্যাচার সহ্য করা এবং কঠিন আচারাদি পালন করা নারীর জন্য কঠিন ছিল। এছাড়াও বাল্যবিধবা যখন ধীরে ধীরে যৌবন লাভ করত, তখন অন্যান্য সকল মানব মানবীর মত যৌবনের সকল ধর্মই তার মধ্যে জেগে উঠত। নিজেদের সংযত করতে ব্যর্থ হওয়ায় উনিশ শতকে বহু বিধবাই ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় সতীত্ব বিসর্জন দেয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ভাল ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই অসতী বিধবাদের হয় গর্ভপাত করাতে হতো অথবা আত্মহত্যা করতে হতো। তা না হলে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে হত।[৯৬]

সতীদাহ প্রথা রোধ এবং বিধবা বিবাহের সুযোগ না থাকার ফলে কলকাতায় পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৩ সালে কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট এক প্রতিবেদনে জানান যে, তখন কলকাতায় ১২,৪১৯ জন পতিতা ছিল। এদের ১০,০০০ এরও বেশী ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ১৮৬৭ সালে কলকাতার হেলথ অফিসার অন্য এক প্রতিবেদনে জানান যে, তখন কলকাতার পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে তিরিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এদের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু।[৯৭] এই প্রচুর সংখ্যক হিন্দু পতিতার শতকরা ৯০ ভাগই ছিল বিধবা।[৯৮]

অনেক সময় দেখা গেছে কঠিন দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনও কোনও বিধবা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হত।[৯৯] নারী জাতির এহেন করুন দুর্দশা দেখে হিন্দু শাস্ত্রকারদের পর্বত সমান বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন।[১০০]

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর হিন্দু বিধবার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে। রাজা রামমোহনের জীবিতকালে বিধবার সংখ্যা বেশি ছিল না কেননা সতীদাহের ফলে বিধবাদের বেঁচে থাকারই

---

৯৩. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

৯৪. সোমপ্রকাশ, **হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইবে কিনা**, ২রা আষাঢ়, ১২৯২ (১৮৮৫), সাবাস 8 (কলিকাতা, ১৯৬৬), পৃ: ৩৪০; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, **বিধবা বিবাহ**, চৈত্র ১৭৭৬ (১৮৫৫), পৃ: ১৫৪-৫৬।

৯৫. T. Roy Choudhuri, **Bengal under Akbar and Jahangir**, (Colcutta, 1953), p: 187-88.

৯৬. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪।

৯৭. Quoted in K. M. Banerjee, **Kulin Polygamy**, Culcutta Review, Vol-XI VII, No, 93, 1868, p: 142.

৯৮. শিশির কুমার ঘোষ, **বিধবা বিবাহ**, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১মার্চ ১৮৬৯।

৯৯. অভয়ানন্দ বন্দোপাধ্যায়, **অগত্যা স্বীকার প্রকরণ**, (কলিকাতা, ১৮৬১), পৃ: ৩৪-৩৫।

১০০. হিন্দু বিধবার দু:খ দুর্দশার সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপটি তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল বারংবার। বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জের বিধবা বালিকার জীবনের দু:সহ অবস্থার সঙ্গে তার চাক্ষুস পরিচয় ঘটেছিল। বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রকৃতি কেন হয়েছিল, সে সম্পর্কে স্বয়ং বিদ্যাসাগর তার স্ব গ্রামবাসী স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সিংহকে বলেছিলেন, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের একটি বাল্য সহচরী ছিল। এই সহচরী তার কোন প্রতিবেশী কন্যা। বিদ্যাসাগর তাকে খুব ভালবাসতেন। মেয়েটি ছোটবেলায় বিদ্যাসাগরের কাছে প্রায় সব সময়ই থাকত। তিনি যখন কলকাতায় পড়তে আসেন তখন মেয়েটির বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের কয়েকমাস পরেই তার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হওয়ার পর বিদ্যাসাগর কলেজের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন। বাড়ী গিয়ে তিনি তার অভ্যাসমত কে কি খেয়েছেন জানতে চাইতেন কিন্তু সেবার গিয়ে জানতে পারলেন তার বাল্য সহচরী কিছু খায়নি কারণ তার একাদশী, বিধবাকে একাদশীতে খেতে নেই। একথা শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন থেকেই তিনি বিধবার দু:খ মোচনের সংকল্প করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ১৩/১৪ বছর। (বিহারীলাল সরকার, **বিদ্যাসাগর**, কলিকাতা, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৭৪)।

Dhaka University Institutional Repository

কোন পথ ছিল না। পরবর্তীকালে বিধবাদের সমস্যা সমাধানে রামমোহন রায়ের উত্তরসূরীরা এগিয়ে এলেন।[১০১] এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ ব্যাপারে লেখালেখি এবং এর পক্ষে বিপক্ষে তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে।[১০২] সে সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সমাজোন্নতি বিধায়নী সুহৃদ সমিতির সহায়তায় বিধবা বিয়ের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এর আগে বিধবা বিয়ের আইন করার লক্ষ্যে ভারতীয় ল' কমিশন বিভিন্ন আঞ্চলিক আদালতের মতামত চেয়েছিল। অপরদিকে প্যাঁরিচাদ মিত্র ব্রিটিশ ভারতীয় সোসাইটির পক্ষে "নোটিস অন দি ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স" (১৮৫৩) বইয়ে প্রস্তাব করেন যে, বিধবা বিয়ে বিষয়টি যেন আইনসভার এখতিয়ারের বাইরে থাকে।[১০৩]

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে নানারকম তর্ক বিতর্ক চলাকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রখর বুদ্ধিমত্তা দ্বারা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে) শিরোনামে যুক্তিসম্মত বই রচনা করেন। বিরোধীরা এই বইয়ের ক্ষুরধার যুক্তি খন্ডনের চেষ্টা করলে, তিনি ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এভাবেই তিনি সমাজের কদর্য অনাচারের স্বরূপ উদঘাটিত করে বিধবা বিয়ের আইন প্রণয়নের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১০৪]

১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর আইন পরিষদে বিধবা বিবাহের পক্ষে আইনের একটি খসড়া পেশ করেন আইন পরিষদের সদস্য জে.পি.গ্রান্ট। ১৮৫৬ সালে এই খসড়া আইনটি দ্বিতীয়বার পেশ করা হয়। তখনও এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ চলতে থাকে। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিয়ের আইন তৈরীর সব বাধা দুর করে বিধবা বিয়ের আইন ভারতীয় ব্যাবস্থাপক সভায় পাস হয়ে গভর্ণর জেনারেল দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।[১০৫] এই আইন পাস হওয়ার পাঁচ মাস পর ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে।[১০৬]

১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০টি বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসব বিয়ের খরচ বাবদ ৮২ হাজার টাকার দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করেছিলেন। এজন্য তাঁর ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল।[১০৭]

---

[১০১]. প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** (কলকাতাঃ বুক ট্রাষ্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬), পৃঃ ৮৩।

[১০২]. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দি রিফর্মার (১৮৩৮ সালের ২৫ নভেম্বর) এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত বেঙ্গল স্পেক্টার (১৮৪২ সালের জুলাই সংখ্যা) পত্রিকা দুটিতে হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিয়ের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বিধান উল্লে-খসহ প্রবন্ধ বের হয়েছিল। উনিশ শতকের স্বনামখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিয়েকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখেন। এই বিতর্কের সূত্র ধরেই "বাল্যবিবাহের দোষ" বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি লেখা সর্বশুভকরী পত্রিকায় ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে ছাপা হয়। (প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২; সূত্র ইন্দ্রমিত্র করুনাসাগর বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২৭৭)।

[১০৩]. প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫, সূত্র বিমান বিহারী মজুমদার, হিষ্ট্রী অব ইন্ডিয়ান সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াজ ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ, চ্যাপ্টার চার।

[১০৪]. ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ৯৮৬ ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনে এক আবেদন সরকারের নিকট পেশ করা হয়। ভারতের আরো বহু স্থান থেকে বহু ব্যক্তির আবেদন সরকারের কাছে পৌছতে থাকে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১)।

[১০৫]. জে. পি. গ্রান্টের দুঃসাহসিক তেজস্বিতার প্রেরণা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তীব্র সামজিক আন্দোলনের যুক্তি। বিধবা বিবাহ বিষয়ে তার লেখা বই এবং বহু লেখালেখি সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল বিধবা বিবাহ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২)।

[১০৬]. এই বিধবা মেয়েটির নাম কালীমতি। মাত্র চার বছর বয়সে বিয়ে ও ছয় বছর বয়সে বিধবা হয়ে কালীমতি তখন ১০ বছরের বালিকা মাত্র। কিন্তু বৈধব্য জীবনের নানাবিধ বিধি-নিষেধের ফলে ওই বালিকা বয়সেই তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কালীমতির বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের ব্রজপন্ডিত সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র শ্রীশ চন্দ্র (বন্দোপাধ্যায়) বিদ্যারত্নের সঙ্গে। এই বিয়ের খরচ বাবদ ১০ হাজার টাকার ব্যয়ভার ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহন করেছিলেন। সে সময়ের বহু গুণীজন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১)।

[১০৭]. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ করাতে গিয়ে ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। তাকে এই ঋণমুক্ত করার জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট ও এডুকেশন গেজেট এর সম্পাদকবৃন্দ এবং অন্য কয়েকজন ব্যক্তি "বিধবা বিবাহ তহবিল" খোলার

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তিনি একজন সমাজ কর্মীরূপে, নেতারূপে বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেছেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা আন্দোলন করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার পুত্র নারায়নচন্দ্র ১৮৭০ সালে জনৈকা বিধবাকে বিবাহের উদ্যোগ নিলে তিনি তা সমর্থন করেন।[১০৮]

বহুবিবাহ

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে বহুবিবাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কৌলিন্য প্রথার জন্যই হিন্দু সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ঘটে। বিশেষত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন সমাজে ব্রাম্মণ্য অনুশাসন আরো প্রবল করার জন্য এই কৌলিন্য প্রথার নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেন। এই কৌলিণ্য প্রথা হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে বহুবিবাহের হার বৃদ্ধি করতে ব্যাপক ভুমিকা রাখে। উনিশ শতকেও কুলীন নামক হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রবল সামাজিক সমস্যা ছিল। পুরুষরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত এবং নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করত। অবস্থানগতভাবে স্বাস্থ্যবান পুরুষ একাধিক বিয়ে করবে, এটাকেই মেয়েরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিত। কাজেই মনকেও তারা সেভাবে গড়ে তুলত। অনেক কুলীনের ৫০-৬০ জন স্ত্রী ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র তার বাড়ীতে জায়গা পেত। তৎকালীন সময়ে সম্পত্তি বৃদ্ধির অনুপাতে স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেত।[১০৯]

অনেক কুলীন ব্রাম্মণের পেশাই ছিল বিয়ে করে জীবিকা নির্বাহ করা। উনবিংশ শতাব্দীতে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনরা বিয়ে করার সময় এককালীন পণ নিত। অর্থলোভের আশাতেই তারা একাধিক বিবাহ করত। নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্বশুরবাড়ি যেত। টাকা না নিয়ে এরা শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান, গোসল, খাওয়া দাওয়া কিছুই করত না। এমনকি স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলত না।[১১০] দীর্ঘদিন পর কুলীন জামাই বেড়াতে এলে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন তাদের সাধ্যমতো জামাইয়ের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতো। প্রথমেই কুলমর্যাদাস্বরূপ জামাইয়ের হাতে কিছু টাকা তুলে দিত। অর্থের পরিমাণ দেখে তিনি কখনও খুশি হতেন, কখনও হতেন না। রাতে শোবার আগে জামাতা স্ত্রীর কাছে টাকা চাইত। সমকালীন একজন নারীর রচনা থেকে জানা যায়, কুলীন স্ত্রীরা বছরের পর বছর চরকা কাটা টাকা জমা করে রাখত স্বামীর মন পাওয়ার প্রত্যাশায় কিন্তু তবুও অর্থের পরিমাণ দেখে স্বামীরা সাধারণত খুশি হতো না।[১১১]

কুলীন স্বামীরা অধিকাংশ স্ত্রীদের নিয়ে ঘর করতো না। এমনও দেখা গেছে অনেক স্ত্রীর সঙ্গে তাদের বছরের পর বছর দেখা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সারাজীবনে একবারও স্ত্রীর সঙ্গে তাদের দেখা হতো না। এরফলে সমাজে ব্যাভিচারের যথেষ্ঠ প্রাদুর্ভাব ঘটত।[১১২] স্বামীরা স্ত্রীদের মানুষ বা আত্মীয় বলে মনে করত না। যার ফলে স্বামী কিছু অর্থলোভে তার একপক্ষের অকুলীন শ্যালকের সাথে অন্য এক স্ত্রীকে জোর করে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত।[১১৩] কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা এতই বেশী হত যে, তারা অনেকে স্ত্রীর সংখ্যা ও নাম মনে রাখতে পারত না। সেজন্য তারা বিবাহিতা স্ত্রীদের নাম ও পরিচয় একটি খাতায় লিখে রাখতো। পরে তারা প্রয়োজন বোধ করলে বা সময় পেলে খাতা দেখে শ্বশুরবাড়ি যেত, কারণ তাতে কিছু

উদ্যোগ নিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপত্তি জানান। সেজন্য এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেই এই ঋণ শোধ করেন। (প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১)।

১০৮. পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা বিবাহ বিষয়ে তার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে তার বিরোধ বাঁধে। তখন তিনি বলেন, আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমি উদ্যোগ গ্রহণ করে অনেকের বিবাহ দিয়েছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করে কুমারী বিবাহ করলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাতে পারতাম না। (প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২)।

১০৯. ইবরাহিম খাঁ, **'বাতায়ন'**, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃঃ ৮৩।

১১০. অবোধ বন্ধু, **এতদ্দেশীয় বিবাহপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা**, ভাদ্র ১২৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯৮।

১১১. বামাপ, **কুলীন বহুবিবাহ (কবিতা): বামাগণের রচনা**, পৌষ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৯০।

১১২. নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি, **কলিকুতুহল**, ১৮৫২, এ গ্রন্থের কপিতে প্রকাশের স্থানটি উল্লিখিত নেই, পৃঃ ৩৮।

১১৩. **বামাপ**, সংবাদ, মাঘ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থোপার্জন হতো। কুলীন জামাই শ্বশুরবাড়ি গেলে তার মর্যাদার জন্য নানা উপলক্ষ্যে টাকা দিতে হত। টাকা না দিলে তারা স্ত্রীর সাথে শয়ন করত না।[১১৪]

প্রকৃতপক্ষে, বিবাহ যখন জীবিকার উপায় বলে গণ্য হয় তখন ব্যবসায়ীর মতো সমস্ত বিবেক বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে কুলীন স্বামীর পক্ষে অর্থ প্রাপ্তির আশায় সব রকমের অন্যায় কাজ করাই সম্ভব ছিল। বহুবিবাহ সম্পর্কে এমন ঘটনাও রয়েছে যে, একটি বালক তার চেয়ে বয়সে বড় তিন সহোদরাকে বিয়ে করেছে।[১১৫] উচ্চবর্ণের ব্রাম্মণ যারা অর্থলোভে অথবা পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ২০/৩০ টি বিয়ে করত, তাদের স্ত্রীদের দু:খের শেষ থাকত না। স্বামীর মৃত্যুর পর এদের সামনে দাসীবৃত্তি করা, বাঁচার জন্য পাপের পথে পা বাড়ানো বা সতী হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। বাংলাদেশে এই বহুবিবাহের ফলে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটত। স্ত্রীদের দু:খ ও দুর্দশা অবলোকন করে উনিশ শতকে বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে কৌলিণ্য প্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রথম প্রতিবাদ জানান।[১১৬] ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females accoding to Hindu low of inheritance'- এ রাজা রামমোহন রায় তীব্র ভাষায় বহুবিবাহ প্রথার সমালোচনা করেন। তার মতে, "Polygamy a frequent source of he great misery in native females".[১১৭]

উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে বহুবিবাহ বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। খ্রিষ্টান মিশনারীরা এ সময়ে তাদের পত্র পত্রিকায় এ প্রথার সোচ্চার সমালোচনা আরম্ভ করে। একই সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখি শুরু হয়। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যালকাটা অবজার্ভার পত্রিকায় 'Polygamy of Kulin Brahman's'- নামক লেখায় ৫ জন বহু বিবাহকারীর নাম ও বিবাহসংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এরা হলেনঃ ব্রজ বন্দোপাধ্যায়, বিবাহসংখ্যা-৪৩, মুড়াগাছার কালীঠাকুর বিবাহসংখ্যা- ৬০, সাতগাছি বেগুনির শ্রীধর চ্যাটার্জি, বিবাহসংখ্যা-৬০, শান্তিপুরের কাছে জনৈক কুলীন, বিবাহসংখ্যা- ১০০, রামলোচন, বিবাহসংখ্যা-৬০।[১১৮]

---

[১১৪]. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বিদ্যাসাগর' **'বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি'** (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগরের বক্তৃতামালা), কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৬-৭৮।

[১১৫]. **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯৯।

[১১৬]. রামমোহন কুলীন স্ত্রীদের প্রতি মানুষের সহানুভুতি জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সতীদাহ ও অন্যান্য সংস্কার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে কুলিনদের বহুবিবাহ বিষয়ে তিনি খুব বেশী মনযোগ বা সময় দিতে পারেননি। কুলীন স্ত্রীদের অনাদর ও কৃচ্ছসাধনার চেয়ে একটি বিধবাকে পুড়িয়ে মারার সমস্যা স্বভাবতই তার কাছে বেশী নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার মাধ্যমে সমাজের লোকদের সচেতন করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬)।

[১১৭]. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭।

[১১৮]. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় ২৭ জন কুলীনের নাম ও বিবাহসংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর ৩৫ বছর পর বিদ্যাসাগর তার 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচারে' ব্রাম্মণদের অত্যাচার প্রায় নিবৃতি হয়েছে এই প্রতারণা বাক্যের অসারতা প্রমাণ কল্পে হুগলি জেলার ১৩৩ জন কুলীনের নাম, বয়স বাসস্থান ও বিবাহসংখ্যা উল্লেখ করেন। (**বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ**, দ্বিতীয় খন্ড, সমাজ 'বহুবিবাহ...' ২০ আগস্ট, ১৯৭২, পৃঃ ২০১-২০৫)। ঐ বইতেই বিদ্যাসাগর প্রসিদ্ধ জনাই গ্রামের ৬৪ জন বহুবিবাহকারীর একটি তালিকা দেন। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬-২০৮)। এছাড়াও বিদ্যাসাগর বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের দুটি তালিকা সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর জীবনীকা চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় এই পুস্তকাকারে অমুদ্রিত বিবরণের কথা তার বিদ্যাসাগর জীবনীতে উল্লেখ করেন। মোট ১৭৭টি গ্রামের ৬৫২ জনের বহুবিবাহকারীর ৩৫৬৮ টি বিবাহের কথা এই তালিকা থেকে জানা যায়। এই তালিকার সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি বরিশাল জেলার কলসকাঠি গ্রামের জনৈক ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫৫ বছর বয়সেই তিনি ১০৭টি মেয়েকে উদ্ধার করেছিলেন। (চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, **বিদ্যাসাগর**, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৬, পৃঃ ২৭২)। অবশ্য বাংলার বিবাহ সংখ্যার রেকর্ড তিনি দিতে পারেননি। উইলিয়াম ওয়ার্ড ১২০টি বিবাহকারীর সংখ্যা জানিয়েছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের লেখা থেকে ১৮০টি বিবাহকারী এক ব্যক্তির কথা জানা যায়। কুলীনদের নাম ও বিবাহকারীর সংখ্যা সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮)।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুবিবাহকারী কুলিনদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, মোট ৮৬টি গ্রামের ১৯৭ জন কুলীন সন্তান সে সময়ে বহুবিবাহ করেছিলেন, তারা সর্বমোট ১২৮৮ জন বঙ্গ রমণীর পানি গ্রহণ করেছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ 'জনাই' গ্রামের ৬৪ জন কুলীন ১৬২টি বিবাহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে যিনি অধিক সংখ্যায় বিবাহ করেছিলেন তাদের দুজনের প্রত্যেকের গৃহিনীর সংখ্যা ছিল ১০ জন।[১১৯]

কৌলিন্য প্রথাই বহুবিবাহের অন্যতম কারণ ছিল। কৌলিন্য প্রথার কুফল নিয়ে জ্ঞানান্বেষণ ও এনকোয়েরার নামে ইয়ং বেঙ্গলের দুটি মুখপত্রে আলোচনা চলতে থাকে। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' এই প্রথার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এর সম্পাদকীয়তে এ প্রথাকে ধিক্কার জানিয়ে বলা হয়, "Now Coolin Polygamy, as we have already shown is injurious to society, by increasing adultery both among the wives of the Coolins and among those who are by this system deprived by wives, by demoralizing the nation, and by checking the increase of population. All these evils are directly opposed, to the ends of civil Government, and as the cause of them is not enjoined in the Shastras the Government ought to abolish it."[১২০] পরবর্তীতে সংখ্যার পর সংখ্যায় কৌলিন্য প্রথাকে আক্রমন করে তা বন্ধের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। শুধু রিফর্মারই নয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার দর্পণে আধুনিক কৌলিন্য রীতি যে শাস্ত্রসম্মত নয় এবং এর অশেষ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়ে সর্বদ্বারী বিবাহ প্রচলন ও কন্যা বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।[১২১]

সমাজের সচেতন মানুষরাও এই প্রথার তীব্র নিন্দা জানান। পরবর্তীতে এই প্রথা বন্ধের জন্য সমাজের বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিরা সরকারের নিকট অনেক সুপারিশমালা পেশ করেন। সেসব সুপারিশমালায় বহুবিবাহের কুফল ও সমাজের উপর তার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। জনগণের দাবি ও যুক্তিকে মেনে নিয়ে বাংলার সরকার এই প্রথা বন্ধের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিটি গঠন করেন। কিন্তু সমাজের কতিপয় সুবিধাবাদী ব্যক্তির বাঁধার কারণে এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহের অভাবে আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়নি।[১২২]

বাল্যবিবাহ

প্রাচীন হিন্দু যুগ থেকে বাল্যবিবাহ বাঙালী সমাজের উপর গুরুতর এক অভিশাপ ছিল। এটি অনেক পুরনো প্রথা।[১২৩] খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পর থেকে নারীকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য যৌবনের আগেই বিয়ে দিয়ে তাকে রুদ্ধ করে রাখা হয়।[১২৪] মধ্যযুগে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়।[১২৫] ষোড়শ শতাব্দীর

---

[১১৯]. চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, **বিদ্যাসাগর**, (কলিকাতা, ১৯৯০), পৃঃ ২৫২-২৫৩। ১৮৬৫ সালের পরবর্তী কয়েকবছর বিদ্যাসাগর হুগলীর বহু গ্রামে ঘুরে ঘুরে অমানুষিক পরিশ্রম করে বহুবিবাহ করা কুলীনদের সন্ধান করে একটি তালিকা তৈরী করেন। তবে যারা পাঁচটির কম বিবাহ করেছিলেন তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩)।

[১২০]. **The Reformer**, 7 April !833.

[১২১]. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**, ২য় খন্ড, মাঘ ১৩৫৬, পৃঃ ২৫২-২৫৩।

[১২২]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ২০০১), পৃঃ ৫৫-৫৬।

[১২৩]. ঋগ্বেদের যুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। সে সময় সাধারণত ১৬/ ১৭ বছর বয়সের আগে কন্যার বিয়ে হত না এবং গৃহকর্মের সঙ্গে তাদের শিক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা ছিল। ছেলেদের মতো মেয়েদেরও উপনয়ন হত এবং তারা যজ্ঞ করতে পারত। স্ত্রী লোকেরা যে উচ্চশিক্ষা লাভ করতেন তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, ঋগ্বেদের অনেক স্ত্রীলোকের রচনা। এবং এইজন্য তাদেরকে ঋষি বলা হয়েছে। (শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বিদ্যাসাগর' **'বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি'** (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগরের বক্তৃতামালা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১)।

[১২৪]. সুকুমারী ভট্টাচার্য, **ভারত ইতিহাসে নারী**, (কলিকাতা ১৯৮৯), পৃঃ ১৪।

[১২৫]. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান স্মার্ত রঘুনন্দন ঘোষ এর মতামতই বাংলাদেশে বেদবাক্যের মতো গৃহীত হতো।[১২৬] এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রঘুনন্দের বিধি অনুসারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল।[১২৭]

মুসলিম-পূর্ব ও মুসলিম আমলে বাংলায় বাল্যবিবাহ খুবই জনপ্রিয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পাঁচ বছর বয়সেও কন্যার বিয়ে হত। তবে সাত বছরই বিয়ের জন্য আদর্শ বয়স বলে বিবেচিত হত। এগারো বছরের কন্যাকে রীতিমত বয়স্ক বলা হত।[১২৮]

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকায় বলা হয় যে, দেশের আটআনা কন্যার বিবাহ দশ এগারো বয়সে, সাত আনা উনিশ গন্ডা তিন কড়া দু'ক্রান্তি কন্যার বিয়ে হয় বারো তেরো বছর বয়সে। আর কেবল এক ক্রান্তির বিয়ে হয় বেশী বয়সে। এরা হয় কুলীন কন্যা নয়তো ব্রাম্মণ।[১২৯] বলাবাহুল্য শিক্ষিত ও ধনী পরিবারগুলিও বাল্যবিবাহের ব্যাপারে কোন অংশে পিছিয়ে ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও বাল্যবিবাহ সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল।[১৩০]

উনিশ শতকের বহু সমাজ সংস্কারক বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ।[১৩১] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪ বছর বয়সে ৬ বছরের পাত্রীকে বিবাহ করেছিলেন, কেশবচন্দ্র সেন ১৮ বছর বয়সে ৯ বছরের পাত্রীকে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১ বছর বয়সে ৫ বছরের পাত্রীকে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯ বছর বয়সে ৮ বছরের পাত্রীকে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৬ বছর বয়সে ১১ বছরের পাত্রীকে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭ বছর বয়সে ৭ বছরের পাত্রীকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩ বছর বয়সে ১১ বছরের পাত্রীকে, নবীনচন্দ্র সেন ১৯ বছর বয়সে ১০ বছরের পাত্রীকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৪ বছর বয়সে ৮ বছরের পাত্রীকে এবং অমৃতলাল ১৫ বছর বয়সে ৯ বছরের পাত্রীকে বিবাহ করেছিলেন।[১৩২] এদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত জীবনে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন বলেই বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বলা হয়, ২০ বছর আগে মেয়েদের সাধারণত সাত আট বছর বয়সে বিয়ে হত। এখন হয় দশ এগারো বছর বয়সে।[১৩৩] ১৮৮০-র দশকে বিভিন্ন রচনা থেকে জানা যায় যে, বিয়ের বয়স ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৩৪] ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের লোক গণনার হিসেব থেকে জানা যায়,

---

[১২৬]. ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান স্মার্ত রঘুনন্দন ঘোষ লিখেছেন, "কন্যার রজদর্শন হইবার পূর্বেই কন্যাদান প্রশস্ত। ৮ বৎসরের কন্যাকে গেওরী বলে, ৯ বৎসরের কন্যা 'রোহিণী', ১০ বৎসরের কন্যা 'কন্যক' এবং এরপর 'রজঃস্বলা' হয়। অতএব দশ বৎসরের মধ্যে যত্ন সহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্তব্য। .....যে কন্যা ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপ্রদত্তা হয়ে পিতৃগৃহে বাস করে তার পিতা ব্রম্মহত্যা পাপের ভাগী হয়; এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ং বর অন্বেষণ করে বিবাহ করা উচিত। (রঘুনন্দন, **উদাহতত্ত্ব**, পৃঃ ৪৬৮)।

[১২৭]. রঘুনন্দন ঘোষ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পদাংক অনুসরণ করেই বিধি দিয়েছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কার এই মতটিকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়ে বিনা বিচারে তা পালন করত এবং গৌরীদান করলে ওই কন্যার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃকুলের একুশ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ছয় পুরুষের অক্ষয় স্বর্গবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হবে বলে প্রচার চলত। (P.V. Kane, **History of Dharmosastra**, II, p: 440.)

[১২৮]. T.R Choudhuri, **Bengal Under Akbar and Jahangir**, Calcutta 1953, p: 186; মধ্যযুগে বাল্যবিবাহের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু মেয়েদের নয় এসময় ছেলেদেরও অল্প বয়সে বিয়ে হতে শুরু করে। আইন-ই-আকবরীতে ষোলো বছরের চেয়ে কম বয়সি ছেলের বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে যা বাল্যবিবাহেরই পরোক্ষ প্রমাণ। (H. Blochman, **The Ain-I-Akbari**, Calcutta, 1873, p: 195,203,277.) সাধারণভাবে দশ বছরের ছেলেকেই বিবাহযোগ্য মনে করা হত। কুলীনরা সদ্য ভূমিষ্ঠ বালককেও বিয়ের উপযুক্ত মনে করত। (**তত্ত্বপ**, জুন-জুলাই ১৮৫৬, পৃঃ ২৯৮)।

[১২৯]. **বামাপ**, আশ্বিন ১২৭৯, পৃঃ ১৯২।

[১৩০]. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

[১৩১]. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।

[১৩২]. স্বপন বসু, **সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর**, দেশ ২৭ জুলাই ১৯৯১, পৃঃ ৩৬।

[১৩৩]. সোমপ্রকাশ, **বাল্যবিবাহ ও হিন্দু হিতৈষিনী**, সাবাস ৪, ২৫ ভাদ্র ১২৮৫, পৃঃ ২৮৫-৮৬।

[১৩৪]. **বামাপ**, নববর্ষ, বৈশাখ ১২৮৯,পৃঃ ৮০; দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, **বিবাহ সংস্কার**, ২ মে ১৮৭৩, এডুকেশন গেজেট।

Dhaka University Institutional Repository

তখন ৫ বছর পর্যন্ত বয়স এখনকার মেয়েদের ১৩.৩ জনের, ১০ বছর পর্যন্ত বয়স এখন মেয়েদের শতকরা ৬৬.৬ জনের এবং ১৫ বছর পর্যন্ত বয়স এখন মেয়েদের শতকরা ৮৭.১ জনের বিয়ে হয়ে গেছে, এ সময়ে ১০ ও ১৫ বছর পর্যন্ত বয়স এমন ছেলেদের যথাক্রমে শতকরা ৫.৪ ও ২৩.৪ জনের বিয়ে হয়েছিল। এই পরিসংখ্যান দিয়েই সংস্কার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭২ সালের 'বিশেষ বিবাহ আইন' গৃহীত হওয়ার পরেও হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ নিয়মিত হত। পাত্রীর একবছর একমাস এবং পাত্রের তিনবছর দুমাস বয়সে বিয়ে হচ্ছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। এমনকি সম্প্রদানের সময় সোজা হয়ে না বসতে পারায় বউকে একটি ধামায় (এক ধরণের গোলাকার পাত্র) বসিয়েও বিয়ে দেয়া হত।[১৩৫]

১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' পাশ হয়। এই আইনের ২ ধারায় বিয়ের বয়স বেঁধে দেয়া হয়েছে। ছেলের ক্ষেত্রে ২১ বছর, মেয়ের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। আইন অমান্য করলে শাস্তির বিধান নির্ধারণ করা হয়।[১৩৬] আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হলেও একবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহের অসংখ্য ঘটনা ঘটছে।

কন্যা বিক্রয়

কুলীনদের বহুবিবাহের ফলে অকুলীন সমাজে পাত্রদের জন্য কন্যার অভাব ঘটে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের আর্থিক সুবিধা আদায়ের কাজে লাগান অকুলীন কোনো কোনো মেয়ের অভিভাবক। কুলীনের কাছে পণ দিয়ে কন্যা বিয়ে না দিয়ে অকুলীনের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে কন্যা দান করতে শুরু করেন। বহুবিবাহ বেড়ে যাওয়ায় কন্যার অভাব যত তীব্র হয়ে ওঠে, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুসারে কন্যাপণও তত বাড়তে থাকে। ফলে আর্থিক প্রলোভন বংশজ ও ক্ষত্রিয় ব্রাম্মণদের বহু পরিবারকেই কন্যা বিক্রয়ী পরিবারে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে কুলীনদের বহুবিবাহের মত অকুলীনদের ব্যবসায়ে ও জীবিকা নির্বাহের উপায়ে পরিণত হয়। আঠারো দশকেই এই প্রথার সূচনা ঘটে এবং উনিশ শতকে ব্যাপকভাবে এর বিস্তার ঘটে।

১৮৩৬ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এক পত্র লেখক এ জাতীয় কন্যা বিক্রয়ের উল্লেখ করে বলেন যে, কন্যার দারুণ অভাবহেতু অনেক সময় নীচ শ্রেণীর এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অজ্ঞাত কুলশীল কন্যাদেরও কম দামে কিনে এনে ব্রাম্মণকন্যা বলে চড়া দামে পাত্রস্থ করা হচ্ছে। পাত্রের কুলগত ও সামাজিক মর্যাদা যত নীচু এবং কন্যার কুলগত ও সামাজিক মর্যাদা যত উচু হত, মেয়ের বাবা তত পণের অংক বৃদ্ধি করতেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই জাত, বংশ বিবেচনা করা হত না। মেয়ের বাবা মনের মত অর্থ পেলে পাত্রের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি বয়স প্রভৃতি কিছুই বিচার করতেন না। এবং চার পাঁচজন ক্রেতা থাকলে নিলাম ডাকের ন্যায় সর্বোচ্চ অর্থদাতাকেই কন্যা দান করতেন। অধিক টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে তুলনামুলকভাবে অসৎ পাত্রের হাতেই কন্যা দান করা হত। [১৩৭]

অন্যদিকে পণের পরিমাণ কন্যার বয়সের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। একেবারে শিশু একটি কন্যা এক'শ টাকায় পাওয়া গেলে বালিকা কন্যা কমপক্ষে তিন চার গুণ দামে বিক্রি হতো। ৮-৯ বছরের কন্যার জন্য পাত্রকে সেকালে সাত আটশ থেকে শুরু করে হাজার টাকা পর্যন্ত পণ দিতে হত। কিশোরী কন্যার দাম বারো'শ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্ররা একটি বালিকা কন্যার জন্য ১৮৭০ এর দশকে সাতশ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হত।[১৩৮]

---

[১৩৫]. **মধ্যস্থ**, ৪ জৈষ্ঠ্য ১২৮০, পৃঃ ১১৭।

[১৩৬]. একুশ বছরের কোন পুরুষ বা আটারো বছরের কোন মহিলা কোন শিশুর সাথে বিবাহ চুক্তি সম্পাদন করলে তার ১ মাস মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে একুশ বছরের কম বয়স্ক পুরুষকে ও আঠারো বছরের কম বয়স্ক নারীকে 'শিশু' ও 'নাবালক' হিসাবে গণ্য করা হবে। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২)।

[১৩৭]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

[১৩৮]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০০ শতকেও অর্থলোভে শ্রোত্রীয় ও বয়শজদের মেয়েকে বেশী বয়সে বিয়ে দেয়া হত। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দাম বেড়ে যেত বলে অনেক অভিভাবক তুলনামুলক বেশী বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতেন। এ সময়ে সাত-আটশ টাকার অনেক মূল্যমান ছিল। অর্থের অভাবে অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকত। কেউ কেউ বৃদ্ধ বয়সে বংশ রক্ষার জন্য সারা জীবনের সঞ্চয় ও সম্বল বিক্রি করে দুই তিন বছরের একটি কন্যা শিশুকে বিয়ে করত। কেউ কেউ ঋণ করে বিয়ে করে চিরজীবন সেই ঋণ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকত। কেউ কেউ 'পরিবর্ত' বা 'বিনিময়'[১৩৯] বিয়ে করত। কন্যা বিক্রয় প্রথা অনুযায়ী যাদের বিয়ে হত সেসব কন্যা স্বামীগৃহে প্রায়শই সুখী হতো না। কিন্তু বিক্রেতা পিতার কাছে কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ মোটেই বিচার্য বিষয় ছিল না।[১৪০] এই প্রথা প্রচলিত থাকার কারনে বংশ পরম্পরায় অনেকে দরিদ্র হয়ে যেত এবং পরিবারগুলোতে চির অশান্তি বিরাজ করত।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

উনবিংশ শতাব্দীর অভিজাত রক্ষণশীল পরিবারের নারীরা ছিল শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যস্ততা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে তৎকালীন বাঙালী মুসলিম সমাজে চরম অবনতি ও অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান সমাজে বিদ্যমান কঠোর পর্দাপ্রথা নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিল বলে সরকারী এক রিপোর্টে পাওয়া যায়।[১৪১] রক্ষণশীলদের বিরোধীতার ফলে তৎকালে নারীশিক্ষা বিষয়টি মুসলিম সমাজে অচল হয়ে পড়ে।[১৪২]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়, কিন্তু দু:খজনক যে, নারীশিক্ষা প্রশ্নে বাঙালী মুসলমান সমাজে তখনও রক্ষণশীলদের প্রভাবই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকার এক তথ্য থেকে জানা যায়, সেই সময় মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা দেবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল না।[১৪৩] শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লক্ষণীয় কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না বলে বামাবোধিনী পত্রিকায় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় মন্ত

---

[১৩৯]. পরিবর্ত বা বিনিময় বিয়ে সেই যুগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এই রীতি অনুযায়ী অবিবাহিত কোন পৌঢ় বা বৃদ্ধ কোন বালিকার অভিভাবক হলে তিনি তাকে একটি পাত্রে সম্প্রদান করে বিনিময়ে সেই পাত্রের কোনো আত্মীয় কন্যাকে নিজে বিয়ে করতে পারতেন। এক্ষেত্রে কাউকে পণ দিতে হত না। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে এক ভাই হয়ত বিয়ে করতেন, শর্ত থাকত ভাইয়ের কন্যা হলে সেই কন্যাদের বিনিময়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা 'পরিবর্ত' বিয়ে করবেন। (মালেকা বেগম, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫)।

[১৪০]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫-৮৬।

[১৪১]. তাহমিনা আলম, **'বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালী মুসলিম নারী সমাজ**, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ: ২০। নারীশিক্ষা সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "সমাজে প্রচলিত কঠোর পর্দা প্রথাই মুসলিম নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ, তাই তিনি এর কঠোরতা শিথিল করার প্রস্তাব উথাপিত করেন এবং সমসাময়িক তুর্কী মুসলিম মহিলা সমাজের উন্নত অবস্থা ভারতীয় মুসলমানদের অনুসরণমূলক দৃষ্টান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। (Sayyid Ameer Ali, **'The Influence of Woman in Islam'**, The Nineteenth Century, May, 1899, p: 755-774, Quoted in K.K. Aziz, op. cit., p:184.)

[১৪২]. আমীর আলী কর্তৃক 'Central National Mohammadan Association' এর অচলাবস্থা দূর করার জন্য একটি ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বহু বিতর্কিত নারীশিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে এমন একটি সমাধান বের করা যা প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীল দুই দলেরই গ্রহণযোগ্য হবে। (ওয়াকিল আহমদ, **সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন**, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৩-৮৪, পৃ: ১১৬)। কিন্তু এ বিষয়ে তারা কোন সমাধান খুজে পেয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। তবে একথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড রিপনকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে মুসলিম নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে পৃথকভাবে কিছু বলা হয়নি। (**Central National Mohammadan Association of Calcutta And the Memorandum Presented to Lord Ripon**, 1882, op, cit, p:15.)

[১৪৩]. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ২৫ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫, পৃ: ৮৬। আরো দ্রষ্টব্য, Shahanaz Husain, **'Glimpes in the Condition of Bengali Muslim Women during the later half of the Nineteenth Century : A Study Based on the Bamabodhini Patrika'**, The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Vol.iii. 1978,p.21.)

Dhaka University Institutional Repository

ব্য করা হয়।[১৪৪] অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। এরও পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বালিকার বিদ্যা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়।[১৪৫] তবে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলিম নারীসমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার তেমন একটা উল্লেখযোগ্য হারে হয়নি।[১৪৬] ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যায় লোকগণনা রিপোর্টে কলকাতায় নারীশিক্ষার অগ্রগতির অবস্থা সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ: "স্ত্রী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদের মধ্যে।"[১৪৭] তবে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উচু অভিজাত পরিবারে নারী শিক্ষার প্রচলন থাকার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, গ্রাম বাংলার গরিব সাধারণ নারী পুরুষ সবযুগেই শোষিত বঞ্চিত ছিল।[১৪৮]

সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই নারী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যদিও খ্রিষ্টধর্মের প্রসার করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এই উপলক্ষ্যে ১৮১১ সালে প্রায় ৪০ জন বালিকা নিয়ে উইলিয়াম কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ধর্ম শিক্ষার জন্য প্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১৪৯] ১৮১৮ সালে চুচুড়ায় মেয়েদের জন্য আলাদা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির রবার্ট মে।[১৫০] এরপর ১৮১৯ সালের মে জুন মাসে কলকাতায় স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশনারিদের স্ত্রীদের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম

---

১৪৪. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ৫০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৮৬৭, পৃঃ ৬০৪।

১৪৫. **সমাচার দর্পণ**, ২৭ ডিসেম্বর, ১৮২০, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, **মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮**, (ঢাকা, ১৯৬৪), পৃঃ ৩১ ও ৫২ পৃষ্ঠার ১৩ নং তথ্য নির্দেশ।

১৪৬. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ১২০ সংখ্যা, আগষ্ট, ১৮৭৩, পৃঃ ১৪৩ ও ১৮২, মার্চ, ১৮৮০, পৃঃ ১৪৯।

১৪৭. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ২০৪ সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৮৮২, পৃঃ ২৬২।

১৪৮. শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতে অনেক সুশিক্ষিত নারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। (Radhakumud Mookherji, **Ancient Indian Educaltion: Brahamanical and Buddhist**, Macmellan, London, 1747 এবং A.S. Sltekar, **Education in Ancient India**, India book shop, Banaras. 1951.) যদিও ভারতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সুশৃংখল কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল কিনা সে সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্ভবত নারীদের জন্যে নিয়মিত বিদ্যালয় পদ্ধতির শিক্ষা তখনও চালু হয়নি। যে সব নারী শিক্ষালাভ করেছিলেন, তারা বাড়িতেই বিশেষভাবে নিযুক্ত শিক্ষক বা পন্ডিতদের কাছে চিত্রকলা দর্শন এবং সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। (K. L. Joshi and P. D. Shukla, **Women and Education in Indian society, In women and Education**, UNESCO, Paris, 1953. p: 87. 103.) মুঘল আমলেও পারিবারিক পরিমন্ডলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মক্তবকে ঘিরে নারী শিক্ষা প্রচলিত ছিল। এ শিক্ষাকে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নারী শিক্ষা ভারতে শুরু হয় উনিশ শতকে। (Krishneala Ray, **Education in Medieval India**, B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1984, p: 25-33.)

আবহমান কাল থেকে ভারতের মুসলমান শাসকগণ জনগণের শিক্ষা বিস্তারকল্পে মুসলিম মনীষীদেরকে জায়গীর তমঘা, আয়মা, মদদে-মায়াশ প্রভৃতি নামে লাখেরাজ ভূসম্পত্তি দান করতেন। এ সকল ভূ-সম্পত্তির অনেক ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশই ছিল শিক্ষায়তনগুলোর ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত। প্রায় সকল প্রাইমারী স্কুল, মক্তব এবং বহু উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব লাখেরাজ সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। ইংরেজরা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত এসব লাখেরাজ সম্পত্তি দখল করে নেয়। বর্ধমানের স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর মিঃ টৌনার একদিনের ৪২৯ জন লাখেরাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ফলে বহু স্কুল কলেজের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। বহু বনেদী বংশ উৎখাত হয়ে যায়। বহু সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী বেকার হয়ে পড়ে। (**Pandit Jawaherlal Nehru: The Discovery of India**, p: 376-77).

১৮৯২ সালে সবরকম শিক্ষার বাহন হিসেবে স্কুল কলেজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সহসা সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রবর্তন হয়। শিক্ষিত এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে তৎকালীন নারী জাতির কোন খতিয়ান পাওয়া যায় না। হঠাৎ এ পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সুফল ভোগ করে। বিভিন্ন কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করে তারা সরকারি চাকরীতে এক চেটিয়া অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অংগনে পট পরিবর্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারসমূহ জীবিকার্জনের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দরিদ্র, অনাহার ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ঢাকাঃ বালাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৪, জিলহজ্জ ১৪১৪, পৃঃ ১০৪-১০৫)। মুসলমান শাষকদের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

১৪৯. প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, পৃঃ ৫৮।

১৫০. গৌতম নিয়োগী, **ছিলে সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী**, শারদীয়া দেশ, ১৩৯৩, পৃঃ ৪৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে ছাত্রীদের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রথমে গৌরী বাড়িতে একটি, পরে আরো কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা প্রথম বছর ছিল ৮ জন, দ্বিতীয় বছর হয়েছিল ৩২ জন।[১৫১]

শিক্ষার যে কাঠামো ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছিল তা ব্রিটিশদের দ্বারা প্রবর্তিত। তবে তা ভারতীয়দের উন্নতিকল্পে নয় বরং তা গৃহিত হয়েছিল তাদের প্রয়োজনে।[১৫২] মিশনারিরা তাদের ধর্মের প্রসার করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে। ১৮৩০-১৮৭০ সাল সময়কালের পূর্বে কলকাতা এবং ঢাকাসহ অন্য কয়েকটি এলাকায় নারী শিক্ষার ব্যাপারে বহু প্রচেষ্টা চলতে থাকে। আশ্চর্যজনক হলেও দেখা যায় যে, খ্রিষ্টান মিশনারিদের নির্দেশনায় কলকাতায় নারীশিক্ষার প্রারম্ভকালে যে প্রকল্প পরিচালিত হয় সেখানে মুসলমান মেয়েদের উপস্থিতি ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রায়শই স্থানীয় অধিবাসীদের তত্ত্বাবধানে এই স্কুলগুলো পরিচালিত হত।[১৫৩] মিশনারিরা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে বলে অভিভাবকরা বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮২৯ সালে সোসাইটির পরিচালনায় ২০টি স্কুল চালু থাকার পরও ধর্মীয় প্রচারের কারণে পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনটি স্কুল ছাড়া সব স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।[১৫৪]

মিশনারীদের উদ্যোগের ফলে নারী শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। মেরী অ্যান কুক[১৫৫] (যিনি পরবর্তীতে মেরী উইলসন হয়েছিলেন) নামের এক নারী প্রথম এ দেশে এসেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডের আহবানে। তিনি ১৮২১ থেকে ১৮২২ সালের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে আটটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একজন মুসলিম নারীর সাহায্যে তিনি কলকাতায় শ্যামবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় গঠন করেন। এই মহিলার পরিচয় আজও অজ্ঞাত। অজ্ঞাত ঐ মুসলিম মহিলার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ঐ স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়ে পয়তাল্লিশে দাড়িয়েছিল।[১৫৬]

মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এসে ১৮২৪ সালের মধ্যে বাঙালি মেয়েদের জন্য ৪টি স্কুল খোলেন। লেডি আর্মহাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় লেডিজ সোসাইটি ফর নিটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালের ২৫ মার্চ। দেশীয় প্রগতিশীল বিত্তবান রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ

---

[১৫১]. গৌতম নিয়োগী, **ছিলে সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪০, সুত্রঃ প্রিসিলা চ্যাপমান, **হিন্দু ফিমেল এডুকেশন ১৯৩৯**।

[১৫২]. অর্থাৎ কোন নীতিটি উপনিবেশকে সাহায্য করবে কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার ভিত্তিতে ভারতের শিক্ষাকে অগ্রসর করার ব্রিটিশ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমা ধারার একটি শ্রেণী তৈরি করা, যারা ঔপনিবেশিক শক্তিকে সেবা করবে। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪-১০৮)।

[১৫৩]. সমাচার দর্পণ এর ১৮২০ সালের ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, "শুক্রবার সকাল দশটায়" কলকাতার গৌরী বাড়িতে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫০ জন হিন্দু এবং মুসলমান মেয়ে ঐ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। (সোনিয়া নিশাত আমিন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, অনুবাদঃ পাপড়ীন নাহার, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০২, পৃঃ ১১১)।

[১৫৪]. নারী শিক্ষার প্রতি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আচরণ নির্মম হয়ে দেখা দিয়েছিল, এই নির্মমতার অভিযোগে মিশনারী স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের ধর্মান্তরিত করেছে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮)।

[১৫৫]. বিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি নামে বিলেতের খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহযোগীতায় মেরী কুক ভারতে আসেন। তিনি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮২১ সালে তিনি কলকাতায় যান। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮)।

[১৫৬]. নারী শিক্ষার জন্য এই অজ্ঞাত মুসলিম মহিলার উদ্দীপনা অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কারণ সেকালে পুরুষরাই ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিল না। (প্রিসিলা চ্যাপম্যান, **Hindu female Education,** ১৮৩৯, লন্ডন)। দুর্ভাগ্যবশত এ সকল বিদ্যালয় ক্ষণজীবী হয়েছিল এবং কোলকাতায় স্বনামধন্য জে. ই. ডি. বেথুন স্কুল (J.E. D. Bethune School) প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে মিশনারীদের দ্বারা ধর্মান্তরিত করার কারণে। এদের প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো বলে হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মুসলমান মেয়েদের স্কুলে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২)।

Dhaka University Institutional Repository

রায়, রাজা শিবকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তি এই সমিতির ব্যয়ভার বহন করতেন ও উৎসাহ দিতেন।[১৫৭] তবে মিশনারিদের প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষা দেওয়া হত বলে হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে ঘরে শিক্ষা দেয়া হত। সনাতনীভাবে মুসলমান মহিলারা শিক্ষার উপাদান গ্রহণ করেছিলেন অন্দর মহলের কঠোর বেড়াজালের মধ্যে। উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ও আশরাফদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা গুণগত দিক থেকে ছেলেদের শিক্ষার অনুরূপই ছিল। মেয়েদের পর্দার মধ্যে রাখা হত সাত বছর বয়স থেকেই। তারা মূলতঃ মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করত ধর্মীয় এবং নৈতিকতা বিষয়ে। মেয়েদের কুরআন পাঠ শিক্ষা ও কিছু উর্দু এবং মৌলিক হিসাবের দক্ষতা অর্জনের জন্য ওস্তাদজী বা মহিলা শিক্ষক রাখা হত।[১৫৮]

মিশনারিদের পরিচালিত স্কুলগুলো বাদ দিলেও ঐ সময় শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্যোগেও স্কুল প্রতিষ্টা করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮২৮ সালে মেয়েদের জন্য আনুষ্ঠানিক বালিকা বিদ্যালয়ের (Central female Shcool) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।লেডী এমহার্স্ট স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং স্কুলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই বিদ্যালয়ের জন্য তার স্ত্রীর অনুরোধে ২০,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। একই সময় আরেকটি মিশনারি বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল যার নাম The Ladies Asssociation বা নারী সংঘ। ১৮২৭ সালে বিরানব্বই জন মেয়ে নিয়ে কলকাতায় এই স্কুল স্থাপিত হয়। প্রায় ১৬০ জন বালিকা এই স্কুলে পড়েছিল, এদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।[১৫৯]

১৮৫০ থেকে নারী শিক্ষার নর্মাল স্কুলগুলোর উদ্যোগ কৃতকার্যতা অর্জন শুরু করতে থাকে। নারী শিক্ষায় অবদান রাখার আকাঙ্খা নিয়ে মিস মেরী কাপেন্টার এবং মিস এনেট আক্রয়েড, এই দুই জন ইংরেজ নারী ১৮৬০ এবং ১৮৭০ এর দশকে ভারতে এসেছিলেন।[১৬০] সেই সময় কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, মধুসদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় নারী শিক্ষার সমর্থনে প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখে পুরস্কার পেয়েছেন। এরপর পরই কালীকৃষ্ণ ও নবীন কৃষ্ণ মিত্র স্কুল খুললেন ১৮৫৭ সালে। মিস কার্পেন্টার নারী শিক্ষার একটি সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যেখানে মহিলারা শিক্ষক হওয়ার প্রশিক্ষণ পাবে। ১৮৬৩-১৮৬৪ সালে ঢাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল বা নর্মাল স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬ জন। ১৮৬৭-১৮৬৮ সালে পুর্ববঙ্গের ছয়টি নর্মাল স্কুলে ছয়জন শিক্ষয়ত্রী ছিলেন।[১৬১] ১৮৮৬-৮৭ সালে চারটি ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের জন্য ২৪২ জন ছাত্রী পড়ত। ১৮৯৯-১৯০০ সালে তা বেড়ে ৭০১ জন হয়েছিল। মেরী কার্পেন্টারের কার্মোদ্যোগ এ দেশের মনীষীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।[১৬২]

১৮৮১-১৮৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ[১৬৩] :

---

১৫৭. মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এসে চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে যোগ দেন। ১৮২৩ সালে মিশনারি সোসাইটির পাদরি আইজাক উইলসনকে তিনি বিয়ে করেন। ২৪ বছর ধরে তিনি মিশনারী সোসাইটির মাধ্যমে বাংলার নারী সমাজের জন্য শিক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের কাজ করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮)।

১৫৮. কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক দ্বারা মেয়েদেরকে ইংরেজি শিক্ষা এবং কিছুটা সেলাই, এমব্রয়ডারি এবং মাঝে মাঝে সংগীত শিক্ষা দেয়া হত। (এটা ব্রাহ্ম, হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে বহুল জনপ্রিয় ছিল, যাদের গার্হস্থ্য সংস্কৃতির স্যাথে সংগীত ছিল একত্রিত) মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হত তাদের পরবর্তী জীবন অর্থাৎ স্ত্রীর ভুমিকাতে কার্যকর করার জন্য। (সোনিয়া নিশাত আমিন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০২, পৃঃ ১১০)।

১৫৯. শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, **বাংলার স্ত্রী শিক্ষা, ১৮০০-১৮৫৬**, (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ৫)। শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল উল্লেখ করেন যে, মুসলমান মেয়েরা দীর্ঘদিন লেখাপড়া চালিয় যায়নি। (প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯)।

১৬০. মেরী কার্পেন্টার এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামমোহন রায়ের বিলেতে। ব্রিষ্টলে তাদেরই বাড়িতে ১৮৩৩ সালে। সেখানে তিনি রামমোহন রায়ের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হন বাংলার নারীদের বিষয়ে কাজ করার জন্য। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর। অবশেষে ৫৯ বছর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে এসে প্রথমে বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই), পরে সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আতিথ্যে ছিলেন আহমেদাবাদে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০)।

১৬১. উল্লেখ্য শিক্ষিকার অভাবে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটতে পারেনি। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০)।

১৬২. গৌতম নিয়োগী, **শারদীয়া দেশ**, ১৩৩৯, পৃঃ ৪৪৩।

১৬৩. M. Azizul Haque, op. cit. p: 37-38.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রীসংখ্যা	মুসলমান ছাত্রীসংখ্যা	হার
উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	----	----
মাধ্যমিক ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭,৪৫২	১,৫৭০	৮.৯
শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪১	----	----

পূর্বোক্ত তালিকাটি সমসাময়িক বাঙালী মুসলমান নারীসমাজে শিক্ষার অচলাবস্থার এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিফলন।

নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৮৪০ সালে রাজা রামমোহন রায় ও তার পরবর্তী অনুসারী কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগন হিন্দু নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা উন্নত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানবতাবাদী ব্রাম্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন হিন্দু নারী সমাজ উন্নয়নের জন্য। হিন্দু নারীদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত সমাজ সচেতন হলেও মুসলিম নারীরা অবহেলিত রয়ে গেল। পরবর্তীতে মুসলিম নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলার নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সমঝোতামুলক মনোভাবের সাথে ইসলামী চেতনার সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন।[১৬৪]

সৈয়দ আমীর আলী নারী শিক্ষা এবং নারী জাগরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই সমসাময়িক পত্রিকায় অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। একই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম মেয়েদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়।[১৬৫] বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসের সংখ্যায় শিক্ষা বিভাগের ১৮৭১-১৮৭২ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, কলিকাতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১০টি এবং তারমধ্যে ১৪টি ছিল বালিকা বিদ্যালয়। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অসাহায্যপ্রাপ্ত উভয় স্কুলে সর্বমোট ছাত্রী

---

[১৬৪]. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম নবাবগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজ এক চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালি তথা সমগ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ কোম্পানির শাসকবর্গের ভাষা এবং নতুন পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না এবং শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও ছিল না। (তামমিনা আলম, **বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ. জুন ১৯৯৮, পৃ: ৬০); ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব তথা আযাদী আন্দোলনের শতশত মুসলমানকে গ্রেফতার ও বন্দী করে। তদানীন্তন কমিশনার মি: টেইলার বন্দীকৃত মুসলমানদেরকে বিনা বিচারে অতি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিকভাবে প্রতিনিয়ত কিছু সংখ্যক করে তার বাংলোর ময়দানের ফাসির মঞ্চে ঝুলিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে থাকেন এবং এ আন্দোলনের নেতা আহমুদুল্লাহর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে প্রথমে মৃত্যুদন্ড এবং পরে মৃত্যুদন্ডাদেশ রহিত করে যাবজ্জীবন দীপান্তর ও যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহইয়া আলীরও যাবজ্জীবন দীপান্তর দেয়া হয় এবং তিনি আন্দামানে ইন্তেকাল করেন। আহমুদুল্লাহর অন্তিম ইচ্ছা ছিল সহোদরের পাশেই সমাহিত হতে কিন্তু ইংরেজ সরকার তার এ ইচ্ছা পুরণ করেনি। তবে সাদিকপুরের পারিবারিক বাসগৃহটি ভুমিস্মাৎ করে সেখানে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মিত হয়। একবস্ত্রে খালি হাতে পরিবারের নারী শিশুদের গৃহ থেকে উৎখাত করা হয়। পৈশাচিকতার এখানেই শেষ নয় পরিবারের সুবৃহৎ পারিবারিক কবর স্থানটি চাষ দিয়ে উৎখাত করা হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়। যুক্তিসংগত কারণেই মুসলিম সমাজ তখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিলো। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৭-২৭৮)।

[১৬৫]. সমকালীন সমাচার দর্পণ এ তথ্যটি তুলে ধরে বলে, ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশটার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হয়েছিল। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানদের বালিকা সর্বমোট প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়েছিল। (**সমাচার দর্পণ**, ২৭ ডিসেম্বর, ১৮২০, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, **মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮**, ঢাকা: ১৯৬৪, পৃ: ৩১ ও ৫২ পৃষ্ঠার ১৩ নং তথ্য নির্দেশ)। স্যার সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে। ১৮৮৫ সালে লাহোরের 'আঞ্জুমান-এ-হিমায়েত-এ ইসলাম' নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিল। পশ্চিম ভারতের মুসলিম নারীরা অন্যধর্মের নারীদের চেয়েও বেশি শিক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছেন কারণ এসব স্থানের মুসলিম সংগঠনগুলো নারী শিক্ষার জন্য দৃঢ় ভুমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা ছিল ৭৩২ জন। এর মধ্যে মাত্র ৫৮ জন ছিল মুসলমান ছাত্রী। ১৮৮০ সালে ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের মোট ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল মাত্র একজন।[১৬৬] তবে উনবিংশ শতাব্দীতে মানসিকতার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই শতাব্দির আশির দশকে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী।[১৬৭] ১৮৮৩ সালে এই সংগঠন অন্ত :পুর শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করা, উক্ত পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্নস্থানে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম বছর সর্বমোট ৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, ১৪ জন উর্দু ভাষায় এবং ২৩ জন বাংলা ভাষায়। তন্মধ্যে উর্দু বিভাগে ১২ জন ও বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল।[১৬৮]

ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট এলিয়ট বীটন বা বেথুন ১৮৪৯ সালের ৭ মে তারিখে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেয়েদের সাফল্য লক্ষ্য করে ১৮৭৯ সালে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেথুন কলেজকে ১৮৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করা হয়। নারীশিক্ষার ইতিহাসে ১৮৮৩ সাল স্মরণীয় উজ্জ্বল একটি বছর। এই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু স্নাতক ডিগ্রীর সার্টিফিকেট লাভ করেন।[১৬৯]

উনিশ শতকের শেষ দিকে তিনটি মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ১. বেথুন কলেজ ২. লা মার্টিনিয়ের ৩. লরেটো হাউজ। প্রথমটিতে সকল ধর্মের সকল জাতির মেয়েরা পড়ার সুযোগ পেত, পরের দুটিতে শুধুই ইউরোপীয় মেয়েরা ভর্তি হতে পারত। কিন্তু শিক্ষার এত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ১৯০০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩৭ জন নারী বি.এ ডিগ্রি লাভ করেছেন। এর মধ্যে একজনও মুসলিম নারী ছিল না। ১৯২২ সালে সুলতান বেগম নামের এক বাঙালী মুসলিম নারী আইন বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই ছিলেন তখন উচ্চ শিক্ষিত প্রথম মুসলিম মহিলা।[১৭০]

উল্লেখ্য যে, ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগে পরিচালিত মেয়েদের স্কুলগুলোতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হত এ কারণে কেউ এসব স্কুলে মেয়েদের পড়াতে আগ্রহী ছিলেন না। এই সংকট দুর করার জন্য শুধু হিন্দু পরিবারের মেয়েদের জন্যই বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণ করা হত না। মূলত সে কারণেই মুর্শিদাবাদের নওয়াব বেগ ফেরদৌস

---

[১৬৬]. **বামাবোধিনী পত্রিকা,** ১৮২ সংখ্যা, আগস্ট ১৮৮০, পৃঃ ১৪৯।

[১৬৭]. আব্দুল আজীজ, ফজলুল করিম, ফজলুর রহিম, আবদুল মজিদ, হেমায়েত উদ্দীন প্রমুখ মনীষীগণ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী বংশের মনীষী ঢাকা মাদ্রাসার তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লা আল ওবায়দীর নিকট হতে এ সম্মিলনীর বিষয়ে তারা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িক পত্রে, বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ,** ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৮ খ্রিঃ পৃঃ ৬২)।

[১৬৮]. এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কলিকাতা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, প্রভৃতি স্থানে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েরা অন্তঃপুরে বসেই স্ব স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারতো। মৌখিক পরীক্ষা অভিভাককের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নেয়া হতো। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি, মুসলিম নারী সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩)। নারী শিক্ষাকে মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে অধ্যাপক মেরাজ উদ্দিনের সহযোগিতায় মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য বাংলা পাঠ্য বই তোহফাতুল মোসলেমীন (১২৯০) গ্রন্থখানি রচনা করেন। নওশের আলী খান ইউসুফজী বঙ্গীয় মুসলমান (১৮৯১) পুস্তকে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর নারী শিক্ষা বিস্তারের সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন। (মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ঢাকাঃ **মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সাহিত্যিক,** ১৪শ বর্ষ, বসন্ত, সংখ্যা ১৩৮৪, পৃঃ ১-২১; ওয়াকিল আহমদ, **বাংলার বিদ্যাসভা : ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সপ্তম সংখ্যা, জুন ১৯৭৮, পৃঃ ১২৪-১৩০)।

[১৬৯]. উল্লেখ্য যে, চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু বেথুন কলেজ থেকে মহিলাদের মধ্যে স্নাতক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্দমুখী বসু ১৮৮৪ সালে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং কাদম্বিনী বসু মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। (**Hundred Years if the University of Calcutta,** Calcutta, University of Calcutta, 1975.)

[১৭০]. **সমাচার দর্পণ,** ১ জানুয়ারী ১৮৪০, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

মহলের আনুকূল্যে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়।[১৭১] মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার বিষয়টি মূলত পর্দাপ্রথার কঠোর বিধি নিষেধের জন্য বাধাগ্রস্ত ছিল। মুসলিম মেয়েদের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই যুগে কলকাতায় শ্যামবাজারের নামহীন একজন মুসলিম মহিলা শিক্ষাব্রতীর কথা জানা যায় যিনি ইংরেজ শিক্ষাব্রতী মিস কুকের শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে সক্রিয় সহযোগীতা করেছেন।[১৭২]

পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যে নারী জাগরণ ছড়িয়ে পড়ায় মেয়েরা অধিক পরিমাণে স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। পরে শিক্ষা লাভ করে স্বনামধন্য হয়েছিলেন এমন বহু মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সৈয়দা জাহানারা হায়দার (১৯১৭-১৯৮৮) এবং মেহেরুন্নেছা ইসলাম (জন্ম ১৯২১) উভয়েই যথাক্রমে ১৯৩৩ ও ১৯৩৮ সালে ফয়জুন্নেছা[১৭৩] বালিকা বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হন এবং পরে কলকাতার ভিক্টোরিয়ায় ইনিস্টিটিউট থেকে বি.এ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা নারী জাতির পথ প্রদর্শক।[১৭৪]

যখন এ দেশীয় মুসলমান পুরুষদেরকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর করানোর জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ আমীর আলী প্রমূখ নেতৃবর্গ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সময়ে নবাব ফয়জুন্নেছা মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন।[১৭৫] পরবর্তিকালে মুসলিম নারীদের মধ্যে করিমুন্নেসা খানম, হুগলীর আগা মোতাহারের মেয়ে জমিদার মন্নুজান, তাহেরুন্নেসা, লতিফুন্নেসা এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন[১৭৬] যারা নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[১৭৭]

---

[১৭১]. তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

[১৭২]. অজ্ঞাতনামা শিক্ষানুরাগী এই মহিয়সী মহিলা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করা নিজের পাড়ায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় কলকাতায় মির্জাপুর, এন্টাল, জানবাজার প্রভৃতি এলাকার মুসলমানগণও তাদের পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। উচ্চবিত্ত বা ভদ্রসমাজের তুলনায় নিম্নবিত্তদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ ছিল বেশি। (**ইসলাম প্রচারক**, ৩য় বর্ষ, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০০, প্রচার সংবাদ পৃঃ ৩০৬। সূত্রঃ ধুর্জটি প্রসাদ দে, **বাংলার মুসলমান সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলন ও সমাজ সচেতনতা ইতিহাস অনুসন্ধানে**, কলকাতাঃ ১৯৮৭, পৃঃ ২৯১)।

[১৭৩]. নবাব ফয়জুন্নেছা এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কুমিল্লা জেলার হোসনাবাদ সরগনার লাকসামের কিছু দুরে ১৮৩৪ সালে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর জন্ম। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় ভাগে ফয়জুন্নেছার আবির্ভাব হয়, যখন বাঙালি ও মুসলমানরা ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছিল। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর থেকে মুসলিম জাতির জীবনে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের ধারা অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। যার ফলে মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা থেকে দুরে সরে গিয়েছিল। একাধারে নবাব ফয়জুন্নেছা, সমাজকর্মী, সাহিত্যিক, জনদরদী, শিক্ষানুরাগী এবং সুশাসক ছিলেন। ১৯০৩ সালে ৬৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ফয়জুন্নেছা সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে। যখন এ দেশীয় মুসলমান পুরুষদেরকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর করানোর জন্যে নেতৃবর্গ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সে সময় নারী শিক্ষার কথা ফয়জুন্নেছা শুধু ভাবেননি তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এক দুঃসাহসী ভুমিকা পালন করেছেন। (রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পুর্ববঙ্গের মুসলিম সামাজ**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-৭)।

[১৭৪]. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬।

[১৭৫]. রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পুর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

[১৭৬]. বাংলার নারী শিক্ষার সাথে যার নাম সবার আগে স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যিনি তার জীবনের সকল অর্থবিত্ত, মেধা, মনন, শ্রম ব্যয় করেছিলেন নারী শিক্ষার জন্য। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসের সাথে নবাব ফয়জুন্নেসার মত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদানও অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও বিশ শতকের বাংলার নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। (শামিমা ইসলাম, **বেগম রোকেয়া, অর্জনের ইতিহাস**, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৯১, খ্রীঃ পৃঃ ১৭)। তিনি বাংলার সর্বপ্রথম নারীবাদীদের একজন। রোকেয়া সে সময় এমন একটি প্রত্যয় দৃষ্টি এবং প্রাণশক্তি প্রকাশ করেছিলেন যা আজও মানুষকে অভিভুত করে। তিনি ছিলেন একজন লেখক, তাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবী। তিনি বিনা, দ্বিধায় বাংলায় নবজাগরণের স্থপতি রামমোহন অথব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারীর স্থান পেতে পারেন, যদিও তাকে শুধু মুসলমান নারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক মহিয়সী নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয় ভেবে তার ভুমিকাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মুক্তিকামীদের মতো রোকেয়াও শিক্ষার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েছিলেন শৃংখল মোচনের পূর্বশর্ত হিসেবে। (আবদুল মান্নান

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৭ সালে তৎকালিন গভর্নরের স্ত্রী লেডী ম্যাকেনজি কলকাতায় মেয়েদের একটি মাদ্রাসা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব শামসী জাহান ফেরদৌস এ কাজে সহায়তা করেন। ১৯০৫ বা ১৯০৯ সালে খুজিস্তা আকতার বানু "খোস্তো আকতার মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" নামে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যিনি সরোয়ার্দি বেগম নামেও পরিচিত। এটি ১৯৩৮ সালে মাধ্যমিক স্কুল হিসাবে চালু ছিল। খুজিস্তা আকতার সম্পর্কে এরচেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' স্কুল[১৭৮] প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঁচ বছরের মধ্যে স্কুলটি উচ্চ প্রাথমিক, সাত বছরের মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক এবং বিশ বছর পর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

নারী শিক্ষা বিস্তারের সূচনালগ্নে ঢাকার অবস্থান

নারী শিক্ষা বিস্তারের সূচনালগ্নে বৃহৎ ঢাকা তখন নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। এবং ১৮২৪ সালে ঢাকার খ্রীষ্টান মহিলা বিদ্যালয় চার্লস লিওনার্ড কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর কারণে ১৮২৬ সালে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে চট্টগ্রামের মাদারবাড়ি, মুরাদপুর, ভালয়া দিঘিতেও একটি করে স্কুল ছিল। ১৮৭৬ সালে ডা. আনন্দচরণ খাস্তগীর চট্টগ্রামে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে তার জামাতা এই স্কুলকে ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।[১৭৯]

এ সময়ে (১৯০৭ সালে) প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্ডার ডাফ বালিকা বিদ্যালয়ে জোরালোভাবে নারী শিক্ষা বিস্তার ঘটলে স্কুল সমুহের পরিদর্শক মি. মার্টিন সরকারের কাছে ১৮৬২ সালে সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের উদ্যোগে এই অঞ্চলে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপনের আবেদন করা হয়। বিবেচনা সাপেক্ষে ভারত সরকার মঞ্জুর করেন যে, "পরীক্ষামুলকভাবে এক বছরের জন্য ঢাকায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের

সৈয়দ, **বেগম রোকেয়া**, ১৯৮৩ খ্রিঃ প্রবিশক; সোনিয়া নিথাম আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬)।

[১৭৭]. ১৯০৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জাস্টিস আমীর আলীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রচার আন্দোলন হয়েছিল। এছাড়াও প্রখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচারক শেখ জমিরুদ্দিন, স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে ১৯০১ সালে রাজশাহীতে উদ্দীপনামুলক ভাষণ দিয়ে সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। এরকম বহু ধর্মপ্রাণ উদার ব্যক্তি স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে সমাজকে সচেতন করে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমান ওলামার সভাতেও স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪)।

[১৭৮]. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে তথ্যগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন ১৯০৯ সালে ৩রা মে বেগম রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন ইন্তেকাল করেন। বেগম রোকেয়া মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর ৫ মাস পরে ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভাগলপুরে কিছুকাল এই স্কুল চলার পর জনাব সাখাওয়াতের প্রথম স্ত্রীর একমাত্র কন্যা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বেগম রোকেয়ার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করেন। অবশেষে ১৯১০ সালের শেষ দিকে বেগম রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। সেই সাথে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটিও কোলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এরপর ৮ জন ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালে ১৬ই মার্চ শুরু হলো সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের কাজ। (শামীমা ইসলাম, **বেগম রোকেয়া অর্জনের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪)। একই মত প্রকাশ করেন লেখক গোলাম মুরশিদ, **রামসুন্দরী থেকে বেগম রোকেয়া**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ২০০০, পৃঃ ১২৯)। নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার মহান ব্রতকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ**, প্রাগুত্ত, পৃঃ ৬৪)। পরবর্তীতে তিনি সামান্য সম্পদ ও শক্তি নিয়ে কোলকাতায় ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭); রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়টি অবিভক্ত বাংলার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২)। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল চালু করেন ভাগলপুরে ১৯০৯ সালে। কিন্তু স্বামীর প্রয়াত পূর্ব স্ত্রীর মেয়ে ও জামাই তাকে ভাগলপুর ত্যাগে বাধ্য করে। কলকাতায় গিয়ে তিনি ১৯১৩ সালের ১৬ মার্চ নতুন করে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' নাম দিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০)।

[১৭৯]. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হোক।"[১৮০] এর ফলস্বরূপ ১৮৬৩ সালের ১১ই মে ঢাকায় প্রথম সরকারি নর্মাল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৬ জন ছাত্রী নিয়ে। ১৮৭২ সালের পর এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৮১]

ঢাকার প্রথম আনুষ্ঠনিক বালিকা বিদ্যালয় ইডেন ফিমেল স্কুল। ১৮৭৮ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারের নিকট ইডেন স্কুলের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। এরফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন বালিকা বিদ্যালয়। উল্লেখ আছে যে, ১৮৭৮ সালে Ashley Eden ঢাকায় বলিকাদের জন্য একটি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১৮২] স্কুলটি পুরানো ঢাকার লক্ষ্মী বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮০ সালে ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে একজন ছিল মুসলমান। ১৯১১ সালে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা দাড়ায় ২৫ জনে। ১৮৯৬ সালে বাঙালি মেয়েদের ৬টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ছিল ইডেন বালিকা বিদ্যালয়।[১৮৩] ইডেন বালিকা বিদ্যালয় প্রশিক্ষণ ক্লাস এবং আবাসিক সুবিধাসহ একটি চমৎকার বিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এ সময় নারী শিক্ষার ইতিহাসে এটা ছিল উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে এই স্কুল কামরুন্নেসা স্কুলের সাথে যুক্ত হয়।[১৮৪]

এই শতাব্দীর গোড়াতে ইডেনে যেসব মহিলা লেখাপড়া করেছেন এবং পরবর্তীকালে বাংলায় মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে স্বনামধন্য হয়েছেন। তাদের নামের দীর্ঘ তালিকা মিসেস আখতার ইমাম[১৮৫] উল্লেখ করেছেন। মিসেস আখতার ইমামের বড় বোন আলতাফুন্নেসা বেথুন থেকে পাস করে পরবর্তী সময়ে স্কুল পরিদর্শক এবং কোলকাতার মহিলা প্রশিক্ষণ স্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। মিসেস জাহান আরা হায়দার ১৯৩৩ সালে কুমিল্লার ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে ইডেন কলেজে ভর্তি হন ।[১৮৬]

---

[১৮০]. Government of India to Government of Britain, 23 March, 1863, Bengal Beluchation Consultations, XV, 70. march 1863, p:140, উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দীন আহমেদ, পৃ: ৭০, ৮৮।

[১৮১]. সরকারের অনুপ্রেরণায় ব্রাম্মসমাজের প্রতিনিধিদল যেমন, দীননাথ সেন, অভয়দত্ত এবং কালীপ্রসন্ন ১৮৭০ সালে নিজস্ব বালিকা বিদ্যালয় অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার বাৎসরিক ১৫০ রুপি অনুমোদন করেন এই সভার জন্য। (হিন্দু সমাজের মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের আনুকুল্য অনুদান অনেক বেশী ছিল। (আদিনাথ সেন, **স্বর্গীয় দীননাত সেনের জীবন ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ**, কলিকাতা: ধুর এন্ড সন্স, ১ম খন্ড, ১৯৪৮, পৃ: ১৪৬-১৪৮)।

[১৮২]. হাসমত আরা, **ইতিহাসের বন্ধুর পথ পেরিয়ে দ্বীপালী হল কামরুন্নেসা**, দৈনিক দিনকাল জুন ২১, ১৯৮৯। এস. এম. আলীও তার **Education and Culture in Dhaka during the last Hundred years** এর ১৮৭৮ সালে এই ঘটনার উল্লেখ করেন।

[১৮৩]. বামাবোধিনী পত্রিকা ১৯৮০ সালের মার্চ সংখ্যা ১৮২; **Progres of Education in India 1896-97**, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্যালোচনা ১৮৯৮, পৃ: ৩৩।

[১৮৪]. ১৮৭৩ সালে "শুভ সাধিনী সভ্য" নামে একটি বয়স্ক নারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। শুধু ব্রাম্মরা না হলেও প্রধানত ব্রাম্ম মেয়েরাই সেখানে পড়ত। এই স্কুলটি মেরী কর্পেন্টার পরিদর্শনের পর উৎসাহিত হয়ে বাংলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকে অনুরোধ করেছিলেন ঢাকায় অন্য আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার ব্রাম্মণ নবকুমার এবং সজসুন্দর মিত্র প্রস্তাব করেন যে, বয়স্ক নারী শিক্ষা স্কুলকে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হোক। ১৮৭৮ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্কুলটি উদ্বোধন করা হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধান্ত নেন যে, স্কুলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে সরকারের কাছে। লেফটেনেন্ট গভর্ণর Ashley Eden এর নামানুসারে স্কুলের নতুন নাম হবে ইডেন মহিলা স্কুল। সংগঠনের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং ঐ বছরেই সেপ্টেম্বরে ইডেন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (**Bengal Education consultaton**. ১৮৭৮, উদ্ধৃতি, শরীফ উদ্দীন আহমেদ, ঢাকা; **A Study in Uban History and Development**, London: Curzon ress, 1986, P-72.)

[১৮৫]. আখতার ইমাম ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইডেন স্কুলের কৃতি ছাত্রী ছিলেন।

[১৮৬]. মিসেস জাহান আরা তৎকালীন অধিকাংশ মহিলাদের মতই কঠোর পর্দা পালন করতেন এবং সর্বদা বোরকা পরতেন। মিসেস ইমাম, জাহান আরা এবং নিজেকে প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েজ মহিলা (অনার্সসহ) হিসেবে বর্ণনা করেন। এছাড়াও ইডেন থেকে যেসব মুসলিম ছাত্রী পাস করেন তারা হলো মিসেস ইমামের সহপাঠী মালেকা আখতার বানু, যিনি জ্ঞানকে পেশা হিসেবে নিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এই তালিকায় আরো যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন আফসারুন্নেসা, সিতারা বেগম, জামসেদুন্নেসা, লুৎফুন্নেসা, জোহা, জোবায়দা খাতুন, রুমু বিলকিস বানু , নুরজাহান বেগম, লায়লা আজুমান্দ বানু। এরা সকলেই পরবর্তীকালে লেখক শিক্ষাবিদ, সম্পাদক এবং শিল্পী হিসেবে খ্যাত হন। (সোনিয়া নিশাাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

ইডেনে যেসব মুসলিম ছাত্রীরা পড়ালেখা করেছেন তাদের অনুসরণ করে বাংলার অবহেলিত নারী সমাজের অনেকে কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা দুর করে শিক্ষার আলোয় স্মরণীয় বরণীয় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।[১৮৭] গণিতে প্রথম মাষ্টার ডিগ্রিধারী মুসলিম মহিলা ফজিলাতুন্নেসা জোহা ১৯২১ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন কবি নজরুল তার সম্মানে একটা কবিতা লিখেছেন। ১৯২৭ সালে ফলিত গণিত বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি গৌরব উজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী হন। ১৯২৮ সালে তিনি স্টেটস স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেত যান।[১৮৮]

ফজিলাতুন্নেসা ১৯৪৮-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঢাকার ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা পদে নিযুক্ত ছিলেন। তার সময়ে ইডেন মহিলা ইন্টারমিডিয়েট কলেজটি ডিগ্রী কলেজে পরিণত হয়। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মহিলা অধ্যক্ষা হন এবং পরে কোলকাতার বেথূন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন।

দিপালী সংঘের অবদান

১৯২০-১৯২৮ সালের মধ্যে দীপালী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগ[১৮৯] তার সহযোগীদের নিয়ে ঢাকায় ৪টি মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ।[১৯০] দীপালী-১ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে। লীলা নাগ সে সময় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এই স্কুলটি কামরুন্নেসা স্কুলে পরিণত করার ক্ষেত্রে নেপথ্য ভুমিকা রাখেন।[১৯১] এভাবেই ১৯২৪ সালে কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা স্কুল স্থাপনের ৫০ বছর পর এবং রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপনের ১৩ বছর পর কামরুন্নেসা স্কুল স্থাপিত হয়। ইতোমধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অধিক সংখ্যায় স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। নবাব ফয়জুন্নেছা এবং বেগম রোকেয়া তাদের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটা নমনীয় হয়ে এসেছিলো। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কলেজ প্রতিষ্ঠা

শতাব্দীর চতুর্থ দশকের দিকে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। অনেকেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মেয়েদের মধ্যেও উচ্চ শিক্ষা

---

[১৮৭]. আখতার ইমাম, **ইডেন থেকে বেথুন**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৯০ খ্রিঃ পৃঃ ২৩)।

[১৮৮]. একজন মুসলিম মহিলার উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা ঐতিহাসিক উদাহরণ ছিল তৎকালিন সমাজে। ফজিলাতুন্নেসার বিলেত যাওয়ার ঘটনাটিকে আদর্শ হিসেবে তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মুসলিম প্রগতি আন্দোলনের অগ্রদুত জনাব নাসিরুদ্দীন সওগভত পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। মুসলমান বাঙালি মহিলার বিলেত যাত্রা উপলক্ষ্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষভাবে একটি গান লিখে নিজ কণ্ঠে সে দিনের সভায় গেয়েছিলেন। কবি জসিম উদ্দীনও ফজিলাতুন্নেসার বিলেত যাত্রা উপলক্ষ্যে বিদায় অভিনন্দন নামে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী**, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, সংস্করণ, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ খ্রিঃ পৃঃ ৩৮)।

[১৮৯]. লীলা নাগের জন্ম ১৯০০ সালে সিলেটে। ১৯১৭ সনে ঢাকা ইডেন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর বেথুন থেকে বি. এ. পাস করেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও একমাত্র ছাত্রী। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। ১৯২৬ সালে লীলা নাগ দিপালী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করেন। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী**, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭-২৮)।

[১৯০]. দীপালী-১ যা অচিরেই কামরুন্নেসা স্কুলে পরিণত হয়। দীপালী-২ বর্তমানে বাংলাবাজার গার্লস স্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির বর্তমানে শেরে বাংলা স্কুল এবং পুরানা পল্টন গার্লস স্কুল। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫)।

[১৯১]. কথিত আছে যে, নবাব খাজা আহসানুল্লাহর চারজন স্ত্রী ছিল। যাদের একজনের নাম কামরুন্নেসা। (হাসমত আরা এবং সোনিয়া নিশাত আমীনের সাথে পরীবানুর পৌত্রী মিসেস সারোয়ার খানের সাক্ষাৎকার) কামরুন্নেসার তিন মেয়ে ছিল, মেহেরবানু পরিবানু ও আকতার বানু। আকতার বানু একজন সাহসী নারী হবার ফলে তার লম্পট স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে স্বাধীনভাবে এস্টেট দেখাশুনা করতে শূরু করেন। যোগেশচন্দ্র নামে একজন আইনজীবী তার সহযোগী এবং পরামর্শদাতা ছিলেন। দুর্ঘটনায় যোগেশচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে আকতার বানু তার নিজস্ব এস্টেট থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য জমি দান করেন। সেই সাথে মেয়েদের শিক্ষার জন্য দিপালী সংঘের জন্য এক খন্ড জমি দান করেন। সেই স্কুলটিকে আকতার বানু মায়ের নামে (কামরুন্নেসা) করেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৬ সালে কোলকাতার বিভিন্ন কলেজে ১০৯৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৮৭৬ জন ছিলেন হিন্দু এবং ৩৭ জন মুসলমান।[১৯২]

১৯৩৯ সালে বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অধীনে ৩৫ জন ছাত্রী নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক বিভাগের ক্লাস শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের প্রাক মুহূর্তে মোট ১৫২ জন ছাত্রীর মধ্যে ১২০ জন মুসলমান ছাত্রী ছিল।[১৯৩]

১৮৫৪ সালে স্যার উডের শিক্ষা নীতিমালায় ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো নারী শিক্ষা বিষয়ে তাদের নীতিমালা ঘোষণা করে। এই নীতিমালার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা সরকারী সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। তবে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের কারণে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।[১৯৪]

মূলত ১৯০৫ সালের পর থেকে নারী শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকারি অর্থের বরাদ্ধ বৃদ্ধি পাওয়া।[১৯৫] ১৯০৫ সালে এই প্রদেশে ৩টি মাধ্যমিক ইংলিশ স্কুল ছিল। ১৯১১ সালে তা ৫টিতে দাড়ায়। তার মধ্যে একটি কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা স্কুল।[১৯৬] ইংরেজদের পক্ষ হতে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য আলাদা স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিন্দু সন্তানদেরকে ইংরেজ ও ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপ এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল।[১৯৭] একথা নি:সংকোচে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানরা জন্মগত, জাতিগত ও ধর্মের দিক দিয়ে যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে।[১৯৮] তারপরও অনেক সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার এবং সমাজের উদ্যোগের কারণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়। যথা:

- আর্দশগতভাবে নারীরা নিজেদের শিক্ষা অর্জনকে অর্থবহ করে তোলার যোগ্যতা অর্জন করে।
- বস্তুত তারা ধীর গতিতে গড়ে ওঠে পেশাগত চাকরি নির্ভর কাজের জন্য। এভাবেই নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ সুগম হয়।

---

১৯২. J. A. Salik, **Muslim Girls College-The purdah**, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ পত্রিকা, ১৯৮৯, পৃ: ২৩।

১৯৩. স্যার জন উডহেড পার্ক সার্কাসে কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রথমে কলেজটি মুসলমানদের জন্য নির্মিত হলেও পরে অমুসলিমদেরও সেখানে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। তবে ১৯৪৭ সালের পুর্ব পর্যন্ত হোস্টেল শুধু মুসলিম মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ছিল। ১৯৪৭ সালের পর হোস্টেলটি সব ধর্মাবলম্বির জন্য খুলে দেয় হয়। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৭)।

১৯৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার হিন্দু, ধনিক, বণিক, বেনিয়া শ্রেণী, ব্যাংকার প্রভৃতির সাথে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। বলা বাহুল এতে উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত ছিল। ইংরেজদের আগমনের পর তারা মুসলিম সমাজের প্রতি যে বর্বর ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করেছে যার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন হান্টার সাতেব তার গ্রন্থে, প্রতিটি জেলায় সাবেক নবাবদের কোন না কোন বংশধর ছাদহীন ভগ্ন প্রাসাদে শৈবালে পুর্ণ জরাজীর্ণ পুকুর পাড়ে অন্তর্জ্বালায় ধুকে ধুকে মরছে। ইংরেজদের আগমণের পর তৎকালিন ভারতে গোটা মুসলিম জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার মুসলমানরা। ফলে মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল তাও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। (W. W. Hudter, **Indian Mussalmans**, Bangladesh Edition, 1975, p: 167.) ফলে মুসলমানরা বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৬-১৪৭)।

১৯৫. শীলা বোস, **রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশ**, ঐতিহাসিক, ২ এপ্রিল, ১৯৮৮।

১৯৬. এম. কে. ইউ. মোল্লা. **The New Provinced of Eastern Bengaal and Assam**, Journal of Institute of Bangladesh studies, (Rajshahi, 1981). p: 95.

১৯৭. M.Fazlur Rahman, **The Bengali Muslims & English Education**, p: 48-51; Quoted from the rules, aprove by the subscribes and general meeting held on 27 August. 1816. Calutta Christon Observer. July 1832. p: 72.

১৯৮. আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষার জন্য ১৮৭৮ সালে ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল, ঢাকার কামরুন্নেসা এবং ইডেন অথবা কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা শুরু হয় ১৯২২ সালের পর থেকে।[১৯৯]

১৯৩৯ সালে লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মহিলাদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো তৈরি হয়। ১৯২৩ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নারী শিক্ষা সম্পর্কিত পুরানো আদর্শের দেয়াল ভেদ করে স্কুল কলেজ অভিমুখে নারীদের যাত্রা শুরু হয়। এই অঞ্চলে নারী শিক্ষার অবকাঠামো যখন গড়ে উঠে, তখন একইভাবে জনপ্রিয় পত্রিকাসমুহে নারী শিক্ষার প্রসার নিয়ে আদর্শগত বিতর্ক উত্থাপিত হতে থাকে। এই বিতর্ক নারীশিক্ষাকে প্রভাবিত করে।[২০০]

১৯০০-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলোতে বিষয়ের দিক দিয়ে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে তিন ধরনের রচনা প্রকাশিত হতো। যেমন: ১. নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ওকালতি, ২. নারী শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা এবং ৩. নারীর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত। এই সব বিবরণ, অভিমত, এবং বক্তব্য পর্যালোচনা করে পরিষ্ফুট হয় যে, নারী শিক্ষার সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের পক্ষ হতেই শিক্ষার বিষয়ে সাহসিক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে। তৎকালিন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল পদক্ষেপ ছিল নির্ভীক ও প্রতিবাদধর্মী। এভাবে বিংশ শতাব্দীর সুচনা লগ্নে মুসলিম শিক্ষিত পুরুষ সমাজে স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সরকারের পক্ষ থেকেও নারী শিক্ষার প্রসারকে উৎসাহিত করা হয়। ঢাকার কথাগ্রন্থে বলা হয়েছে, 'নারী শিক্ষার প্রসারে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং ১৯০৮-১৯০৯ সালের মধ্যে প্রদেশে ৮১৯টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যায় ২৫,৪৯৩ জনে। ১৯১০-১৯১১ সালে ৪,৫৫০টি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্টিত হয় এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১,১৩১,১৩৯ জন। আরেক তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৯০১ সালে পূর্ব বাংলায় ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৫৬৪ জন। ১৯০৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১৬,৪৬৮ জন এবং ১৯১১ সালে ৫৬,৬৮৩ জন।[২০১]

১৯০৬ সালে প্রথমবারের মত ইডেন স্কুলে মহিলা শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং এর প্রভাবে পূর্ব বাংলায় মহিলা শিক্ষকের অভাব দূর করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়। সরকার মুসলিম নারীদের শিক্ষা প্রসারের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। মুসলিম সমাজের পর্দার কঠোরতা লক্ষ করে মুসলিম বালিকাদের জন্য বাড়ীতে বসে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও সরকার প্রদান করে।[২০২]

---

[১৯৯]. সরকারি রিপোর্ট এবং সমসাময়িক স্মৃতিচারণ থেকে তার প্রমাণ মেলে। পুর্ববাংলা এবং আসামকে নতুন প্রদেশ ঘোষণার বিষয়টি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৭০-১৯৯২ সালে শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। ১৯০১-১৯০২ সালে বাংলায় স্কুলে ৫৭, ৭২৬ জন মেয়ের মধ্যে মাত্র ৬, ৩২ জন ছিল মুসলিম। ১৮৮১-৮২ সালে মাধমিক স্তরের ১০৫১ জনের মধ্যে ১০ জন মুসলিম। ১৯৩১-৩২ সালে ইংলিশ হাইস্কুলে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৩৮৫৫ জন, তার মধ্যে ৯৫ জন মুসলমান। ১৯৩১-৩২ সালে ৩৯৪ জন মেয়ে (হিন্দু এবং মুসলিম) ম্যাট্রিক পাস করে। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১০৪৯ জনে দাড়ায় (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারী আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪)। মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রতি ইংরেজদের নিপীড়নমূলক আচরণ, বাস্ত ভিটা থেকে উৎখাত, হিন্দুদের অগ্রাধিকারের কারণে মুসলিম মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল।

[২০০]. বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য নানাভাবে আলোচনা পর্যালোচনা হতে থাকে। সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত তরুণের কাজ শীর্ষক এ প্রবন্ধে মুজিবর রহমান বলেন, স্ত্রী শিক্ষা যে সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তা বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীতে আপনাদেরকে বুঝাতে হবে না। যে বাড়িতে বা যে সমাজে শিক্ষার আলো ঢুকতে পারে না সে বাড়ি বা সে সমাজের শিশুদের শিক্ষাদানে কি যে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। (মুজিবর রহমান, **তরুণের কাজ**, সওগাত, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪, ১৯২৭ খ্রীঃ পৃ: ৪৪৯)। স্ত্রী শিক্ষা না হলে উন্নতির আশা সুদুর পরাহত। পুর্বকালে মনীষীগণ স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা বুঝতে পেরেছিলেন বলে তারা স্ত্রী জাতিকে উপযুক্ত শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। (মো: আহাদ আলী, **হেড পন্ডিত স্ত্রী শিক্ষা, শরিয়তে ইসলাম**, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৭, ১৯৩০, খ্রী: পৃ: ৮৪)।

[২০১]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), পৃ: ১৮৩।

[২০২]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের শুরুতে এসে সমগ্র বাংলায় নারীশিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়।[২০৩] এই শতকে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন জেলাতে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে যশোর জেলায় মধুসুদন তারাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুল নামে মেয়েদের একটি স্কুল ছিল। খুলনাতে ছিল, খুলনা করোনেশনস গার্লস হাইস্কুল। ১৯৪০ সালে ঢাকায় ছিল, মুন্সিগঞ্জ এ. ভি. গার্লস হাইস্কুল ও নারায়ণগঞ্জ মর্গান গার্লস স্কুল। ফরিদপুরে দুটি স্কুল ছিল, ফরিদপুর ঈষাণ ইনস্টিটিউশন (মহিলা বিভাগ) ও মাদারীপুর ডোনাভান গার্লস স্কুল। বরিশালে তিনটি স্কুল, বরিশাল জগদীশ সারস্বত গার্লস স্কুল, বরিশাল সদর গার্লস স্কুল, বরিশাল সৈয়দউন্নেসা গার্লস হোম। ময়মনসিংহে চারটি স্কুল ছিল, ময়মনসিংহ এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউট (মহিলা বিভাগ), ময়মনসিংহ রাধাসুন্দরী গার্লস স্কুল, ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুল ও টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী গার্লস স্কুল। চট্টগ্রামে দুটি স্কুল ছিল, চট্টগ্রাম অপর্ণাচরণ গার্লস হাইস্কুল ও ডা. খাস্তগীর গার্লস স্কুল। নোয়াখালীতে ছিল, নোয়াখালী উমা গার্লস হাইস্কুল। কুমিল্লায় ছিল, কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা হাইস্কুল (বালিকা বিভাগ), কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা (মহিলা বিভাগ) ও চাঁদপুর লেডি প্রতিমা মিটার গার্লস হাইস্কুল। রংপুরে ছিল, রংপুর গার্লস স্কুল এবং সিলেটে ছিল, সিলেট গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল ও মৌলভীবাজারে ছিল, এ. এ. জুবিলি গার্লস হাইস্কুল।[২০৪]

উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বরিশাল বি. এম কলেজে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছাত্রী পড়ত। ১৯৪০ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৭৮৪ জন ছাত্রীর মধ্যে আই. এ ক্লাসে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪৭ জন, আই.এস.সি তে ৯ জন, বি.এ ক্লাসে ৩০ জন। ১৯৪০ সালে সিলেট এম.সি কলেজে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৩০ জন। এই কলেজে ১৯২৫ সালে ছাত্রীদের জন্য আলাদা কমনরুম এর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪০ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে দুইজন মেয়ে পড়ত। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজেও স্বল্পসংখ্যক ছাত্রী ছিল। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে মেয়েদের জন্য আলাদা বিভাগে আই.এ. ও বি.এ পড়ানো হতো। ১৯৪০ সালে এখানে আই.এ ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ৬১৬ ও ছাত্রীসংখ্যা ৭১ জন ছিল এবং বি.এ ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ৩০৫ ও ছাত্রী সংখ্যা ১৬ জন ছিল। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ১৯৪০ সালে ১৬ জন ছাত্রী ছিল। নোয়াখালীর ফেনী কলেজেও গুটিকয়েক ছাত্রী ছিল। সিলেটের হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজেও কয়েকজন ছাত্রী ছিল। রেবতীরমণ দত্ত ১৯২৬ সালে চট্টগ্রামে দুটি বালিকা বিদ্যালয় চালু করেন। মুক্তকেশী গার্লস হাইস্কুল ও ড. বিভুতিভূষণ হাইস্কুল। তার প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের আশুতোষ কলেজেও কিছু মেয়ে পড়ত। ১৯৪০ সালে বরিশালে ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজেও ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা পড়ত। এসব কলেজ থেকে মেয়েরা বি.এ পাস করতো। বি.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছিলেন বি.এম কলেজের তিন ছাত্রীঃ শান্তিসুধা ঘোষ (১৯২৮), বিভা সেনগুপ্ত (১৯৩০) ও লীলা দাশগুপ্ত (১৯৩৭)। এছাড়া বাঙালী মুসলিম মেয়েদের মধ্যে যারা প্রথম হন, তারা হলেন, ডাইয়োশেসান কলেজ থেকে সৈয়দা ঘাওয়ার (১৯২৩), সুলতানা মুয়াদিজাদা (১৯২৩), লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে ইসলাম আবেদা (১৯৪৪), এবং জাহান আকতার (১৯৪৫) নন কলেজিয়েট থেকে শিক্ষা লাভ করেন।[২০৫]

---

[২০৩]. ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘোষণা করা হয়, মেয়েদের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যে প্রথম হবে তাকে কেশবচন্দ্র সেন প্রাইজ দেওয়া হবে। এই পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা থেকে পূর্ববঙ্গের মেয়েদের নাম চিহ্নিত করলে বাংলাদেশের তৎকালীন সময়ের নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। তাদের নাম ও স্কুলের বিবরণঃ ১৯২০ সালে সাবিত্রী দত্ত - ইডেন গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা, ১৯২১ সালে সুফলা রায় - ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল, ১৯২৪ সালে শান্তিসুধা ঘোষ - বরিশাল সদর গার্লস হাইস্কুল, ১৯২৫ সালে মৈত্রেয়ী রায় - ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল, ১৯২৬ সালে জোৎস্নাকুমারী দেবী - ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল, ১৯২৮ সালে অপরাজিতা ঘোষ - বরিশাল সদর গার্লস হাইস্কুল, ১৯২৯ সালে পান্না গুহ - চট্টগ্রাম ডা. খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুল, ১৯৩০ সালে কিরণবালা দত্ত - ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল, ১৯৩১ সালে কল্যাণী সেন - ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল, ১৯৩৮ সালে কল্যাণী দেবী - ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল, ১৯৪০ সালে কনক পুরকায়স্থ - সিলেট গভর্ণমেন্ট গার্লস হাইস্কুল, ১৯৪১ সালে শোভনা ধর - চট্টগ্রাম ডা. খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুল, ১০৪৩ সালে লতিকা নন্দী - ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল, ১৯৪৫ সালে ঊষা সাহা - রাজশাহী পি. এন গার্লস হাইস্কুল। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪)।

[২০৪]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪।

[২০৫]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪-১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে মুসলিম প্রধান এলাকায় শুধু মুসলিম মেয়েদের জন্য লেডি ব্রেবোর্ন কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৫ জন মুসলমান মেয়েকে নিয়ে কলেজটি আই. এ ক্লাশ শুরু করে। মুসলমান ছাত্রী বেশী না পাওয়ায় পরের বছর থেকে অমুসলিম ছাত্রীদেরও ভর্তি করা হয়। তবে হোস্টেলে শুধু মুসলিম ছাত্রীরাই থাকতে পারত। ১৯৪৭ এর আগে কলেজের ছাত্রীসংখ্যা দাড়ায় ১৫২ জন, তার মধ্যে মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা ১২০ জন। কলেজের গভর্নর বডিতে ছিলেন বেগম হামেদা মোমিন, ফারা বানো খানম, হাসিনা মুর্শেদ, এস.বি.গুপ্ত প্রমুখ। মুসলিম অধ্যাপিকাদের মধ্যে ছিলেন ফার্সি ভাষায় রাজিয়া সুলতানা আহমেদ, বাংলার শামসুন্নাহার মাহমুদ এবং উর্দুর ফাতেমা বেগম।[২০৬]

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানেও মেয়েদের পড়ার খবর জানা যায়। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লীলা নাগ ইংরেজীতে এম.এ পাস করেন। ১৯২৫ সালে সংস্কৃত ও বাংলায় এম.এ পাস করেন লতিকা রায়, লীলা রায় ও অরুবালা সেনগুপ্ত। বি.এ ও বি.এস.সি পরীক্ষাতেও দেখা গেছে, ১৯৩৮ সাল থেকে ক্রমশ বেশী সংখ্যায় পাস করেছে। এ সময় পূর্ববঙ্গ থেকে বি.এ পাস করেন ২৫ জন মেয়ে, ১৯৩৯ সালে ২১ জন, ১৯৪০ সালে ১৯ জন বি.এ এবং ২ জন বি.এস.সি পাস করেন, ১৯৪৪ সালে বি.এ পাস করে ৪৫ জন, বি.এস.সি ৩ জন, ১৯৪৭ সালে বি.এ পাস করে ৫৩ জন, বি.এস.সি ২ জন।[২০৭]

এম.এ পাসের ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে সুলতানা বেগম নামে এক বাঙালী নারী আইন বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি পান। ফয়জি পরিবারের তিনবোন আতিয়া, জোহরা ও নাজলি মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যান। ১৯২৭ সালে ফজিলাতুন্নেসা (১৯০৫-১৯৭৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃটেন গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা, পাস ও বিদেশ যাত্রা মুসলিম সমাজে হইচই সৃষ্টি করে। ১৯৩৮ সালে ২৬টি বাঙালি মেয়ে এম.এ পাস করে। তার মধ্যে রাজিয়া সুলতানা আহমেদ ফার্সি ভাষায় প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হন। একই বছর ৬ জন ছাত্রী এম.এস.সি পাস করেন। ১৯৩৯ সালে এম.এ পাস করেন ৩৯ জন ছাত্রী এবং এম.এস.সি তে ২ জন ছাত্রী। ১৯৪০ সালে ৪৬ জন ছাত্রী এম.এ ও ৩ জন ছাত্রী এম.এস.সি পাস করেন। ১৯৪১ সালে এম.এ পাস করেন ৪৫ জন, এম.এস.সি তে ৮ জন। আরবী ভাষায় এম. এ তে সৈয়দা ফাতিমা খাতুন প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হন। ১৯৪২ সালে এম.এ তে ২৮ জন ও ৫ জন এম.এস.সি পাস করেন। উর্দু ভাষায় প্রথম হন সৈয়দা ফাতিমা বেগম। ১৯৪৪ সালে এম. এ পাস করেন ৬৪ জন ছাত্রী ও এম.এস.সি পাস করেন ১৬ জন। ১৯৪৫ সালে এম.এ পাস করেন ৭৭ জন এবং এম.এস. সি পাস করেন ১২ জন ছাত্রী। আরবী ভাষায় ১ম ও ২য় হন দুজন মেয়েঃ লতিফা খাতুন ও হালিমা খাতুন। ১৯৪৬ সালে এম.এ পাস করে ১০৭ জন এবং এম.এস.সি ১৫ জন ছাত্রী। ১৯৪৭ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮১ ও ১।[২০৮]

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রক্ষণশীলদের নানাবিধ বাধা সমাজে থাকলেও শিক্ষার ধারা এগিয়ে চলে। ১৯২১ একুশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে, পাশাপাশি কো-এডুকেশন শিক্ষাব্যবস্থাও ক্রমশ জোরদার হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এই ধারা আরও বেগবান হয়। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলদের বাধা বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যকারীতা হারিয়েছে। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও পড়াশোনা করছে। বরং ছাত্রদের চেয়ে বর্তমানে ছাত্রীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগ করছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অনেক কম। বর্তমানে শিক্ষার কোন ক্ষেত্রেই মেয়েদের জন্য আইনগত কোন বাধা নেই। মেয়েরা যতটুকু পিছিয়ে আছে তার মূল কারণ হলো দারিদ্রতা, পরিবারে অসহযোগীতা। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা অত্যন্ত সাবলীলভাবে চলাফেরা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কো-এডুকেশন পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কিছু বাধার জন্য নারী শিক্ষার হার এখনও অনেক কম।

---

[২০৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫।
[২০৭]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫।
[২০৮]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের চলমান নারী আন্দোলন নারী শিক্ষার বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া বিশ শতকের শুরুতে যে আন্দোলন শুরু করেছিল তা এখনও ব্যাপকভাবে এনজিও, নারী সংগঠন ও সরকারের কর্মসূচীতে যুক্ত হলেও দেখা যাচ্ছে নারী শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটছে না।[২০৯]

কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

আঠারো শতকের কবি সাহিত্যিকদের রচনা থেকে কর্মজীবি নারীর কথা জানা যায়। আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে কুজড়ানী ও ঘেসেড়ানী, ঘুটে কুড়ানী, পাটনী ও মালিনী ইত্যাদী নারী চরিত্রের[২১০] উল্লেখ রয়েছে। চর্যাপদের যুগ থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্যে এ ধরণের শ্রমজীবি নারী চরিত্র রয়েছে যারা পর্দা, বিয়ে, শিক্ষা লাভ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজের নির্দিষ্ট নিয়ম পালন ছাড়াই জীবন কাটিয়েছে।[২১১]

উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকেই পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে নারীরা চাকরিতে প্রবেশ করে। পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে প্রথম বেছে নিয়েছিলেন পাবনার বামাসুন্দরী দেবী। ১৮৬৩ সালে ২০ বছরের এই তরুণী একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ষাটের দশকে বরিশালে মনোরমা মজুমদার নানা বৈরিতার মধ্যে শিক্ষকতা শুরু করেন। সবেতন চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথম ছিলেন ঢাকার রাধামণি দেবী। বর্ষীয়সী রাধামণি ছিলেন ঢাকাস্থ মহিলা নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ১৮৬৬ সালের শুরুতে তিনি মাসিক ৪০টাকা বেতনে শেরপুর স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভায় শিক্ষকতার চাকুরি পান। ১৮৭৮ সালে মনোরমা মজুমদার ঢাকা সরকারি বয়স্ক বালিকা বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় কৃষি সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন মাসে ৬০ টাকা বেতনে ও ৩০ টাকা যাতায়াত ভাতায় নিযুক্ত হন বিদ্যালয়সমুহের মহিলা পরিদর্শক। ১৮৮০ সালে রাধারানী লাহিড়ী ৬০ টাকা বেতনে বেথুন বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ১০০ টাকা বেতনের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন (১৮৮৬)। চন্দ্রমুখী বসু, প্রথম মহিলা এম. এ. ১৮৮৪ সালে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন; দু বছর পরে (১৮৮৬) তিনি তত্ত্বাবধায়ক পদে উন্নীত হন (বেতন ১৫০ টাকা)। ১৮৮৬ সালে কামিনী সেন বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে বেথুন কলেজের প্রভাষক। তবে কামিনী সেনকে চাকরিতে ঢুকতে অনেক পারিবারিক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। বহু কষ্টে পিতার অনুমোদন নিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করলেও বিয়ের পর কামিনী রায়ের চাকরি ছাড়তে হয়েছে। ১৮৯০ সালে কুমুদিনী খাস্তগীর বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে একে একে সহকারী প্রধান শিক্ষক (১৮৯১) প্রভাষক (১৮৯৬) ও বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা (১৯০২) হন। ১৮৯০ সালে শরৎ চক্রবর্তী অমৃতসরে আলেকজান্দ্রা খ্রীষ্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কামিনী বসু প্রধান শিক্ষিকা পদে দেবাদুন বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। ১৮৯১ সালে অঘোরকামিনী রায় শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৩ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ডাফারিন হসপিটালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। কামিনী সেনের ছোট বোন যামিনী সেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে ও কাঠমাণ্ডুতে চিকিৎসক হিসেবে চাকুরি করেন। ১৮৯৫-১৮৯৬ সালে সরলাদেবী চৌধুরানী হায়দ্রাবাদের মহারাণীর সহকারী হিসেবে চাকরি নেন। তাঁর বেতন ছিল সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অকল্পনীয়, ৪৫০ টাকা মাসে। এই চাকরি গ্রহণের আগে তাঁকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে পিতা জানকীনাথ ঘোষাল, মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ও মাতামহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদন নিতে হয়। চাকরিজীবী মহিলাদের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেমপ্রভা বসু, সুরবালা ঘোষ, সুরবালা মিত্র, রাজলক্ষ্মী সেন, মহামায়া বসু প্রমুখ। আর এভাবেই দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙ্গালি নারীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন চাকরী করেছেন। ১৯০১ সালের হিসাব অনুযায়ী কলকাতায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন ৭২৫ জন নারী। তাঁদের মধ্যে অধ্যক্ষা, অধ্যাপক, শিক্ষকতা পেশায় ৫৮৭ জন, প্রশাসন ও পরিদর্শনে ৬ জন, চিকিৎসায় ১২৪ জন, চিত্র গ্রহণে ৪ জন, লেখক, সম্পাদক, সাংবাদিক ৪ জন।

---

[২০৯]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬।

[২১০]. কুজড়ানীঃ যারা ফল বিক্রি করত। ঘেসেড়ানীঃ ঘাস বিক্রেতা। ঘুটে কুড়ানীঃ যারা ঘুটে কুড়ায়। পাটনীঃ যে খেয়া পারাপারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মালিনীঃ বাগান পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত নারী। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬-১৭)।

[২১১]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র বঙ্গদেশে তখন ১১৫৬ জন মহিলা শিক্ষক, ৭৪৯ জন সেবিকা ও ৬৬ জন কেরানি পদে কর্মরত ছিলো। প্রথম দিকে যে দুটি পেশায় মেয়েরা অধিক হারে নিয়োজিত হয়েছেন, সে দুটি হলো, শিক্ষকতা ও চিকিৎসা বা ধাত্রীবিদ্যা। সম্মানজনক জীবিকা অর্জন ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার মধ্য দিয়েই বাঙ্গালি নারীর স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।[২১২]

বিশ শতকে নারী শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এই শতকের প্রথমদিকে নারীরা শিক্ষকতা, টেলিফোন অপারেটর, রিসেপশনিষ্ট, স্টেনো টাইপিস্ট ইত্যাদি চাকরীতে যোগদান করে। ১৯০১ সালের আদমশুমারী তথ্য থেকে জানা যায়, সে সময় কলকাতার ৭২৫ জন মেয়ে চাকরী করতো। এদের মধ্যে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিল ৫৮৭ জন, প্রশাসন ও পরিদর্শক ৬ জন, চিকিৎসক ১২৪ জন, ফটোগ্রাফার ৪ জন, লেখক সম্পাদক ৪ জন। ১৮৯১ সালের চেয়ে চাকরিজীবী নারীর সংখ্যা এ সময়ে দিগুণ ছিল।[২১৩]

রাজনীতিতে নারী

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর আগমনের পথটি শুরু থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্য সভা করা বা সমিতি গড়ে তোলা বাঙালী নারীর জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে নারীরা সবসময়ই পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আঠারো উনিশ শতকে নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তবে বিশ শতকের প্রথমদিকে দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে বাঙালী নারীর অংশ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। কয়েকজন প্রগতিশীল নারী পুরুষের হাত ধরে নারী জাগরণ তথা নারী মুক্তির জন্য ঘরের বাইরে বের হয়েছিল। মূলতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে নারী জাগরণ ও আন্দোলন এর মাধ্যমেই নারীর অধিকার সচেতনতা গড়ে উঠেছে এবং এর প্রকাশ ঘটেছে নারীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, লেখালেখি ও আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে। সমাজের শিক্ষিত নিরক্ষর নির্বিশেষে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার নারীরা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। অহিংস ও সহিংস উভয় প্রকার সংগ্রামেই বাঙালী নারী সমান সাহসিকতা দেখিয়েছে। শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধির ফলেই রাজনৈতিক মঞ্চে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকতর হয়। রাজনৈতিক সভায় স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ছিলেন উনিশ শতকের প্রথম বাঙালী নারী প্রতিনিধি। তাঁর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৬) জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতেন।

অধিকার আদায়ের সূচনা পর্বে বাংলার নারী আন্দোলনের প্লাটফর্ম হলো একটি মহিলা সমিতি। যার নাম ছিল 'ভাগলপুর মহিলা সমিতি'। রামতনু লাহিড়ী এবং অপর কয়েকজনের নেতৃত্বে ১৮৬৩ সালে একদল নারী এই সমিতি গড়ে তুলেছিল। উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নীপিড়ন থেকে নারীকে মুক্ত করা। এরপর ১৮৬৬ সালে বাঙালী নারী বিভিন্ন সভায় যোগ দিতে শুরু করেন এবং নিজ নিজ উদ্যোগে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৭৯ সালের ৮ আগষ্ট রাধা রাণী লাহিড়ী, কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ নারী মিলে বঙ্গীয় মহিলা সমাজ বা বেঙ্গল লেডিস অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। ৪১ জন নারী সদস্য নিয়ে এই অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রা শুরু করলেও পরে এর সদস্য সংখ্যা একশ ছড়িয়ে যায়।[২১৪]

১৮৮৫ সালে গঠিত হয় কংগ্রেস। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ছয় জন নারী যোগ দেন। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন বাঙালী। ওই দুজনের একজন হলেন

---

[২১২]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩-৮৪।
[২১৩]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯২-১৯৩।
[২১৪]. গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, (ঢাকা: নিউজ নেটওয়ার্ক, ২০০৩), পৃ: ৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ড. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং অপর জন জানকী নাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী। ১০ বছর পর ১৯০১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে দু'শ নারী প্রতিনিধি অংশ নেন।[২১৫]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও তার বিরুদ্ধে গড়ে উঠা স্বদেশী আন্দোলন বাংলার নারী সমাজকে দ্রুত রাজনীতিমুখী করে তোলে। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে কলকাতার নতুন ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মঙ্গল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশ নারী উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী দিবস পালিত হয়। নারীরা এই দিবসে 'অরন্ধন' ও 'রাখী বন্ধন' পালন করেন। ১৯০৫-১৯০৮ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং বাংলার নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।[২১৬]

১৯০৬ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৬১-১৯২৩) একটি মহিলা সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯০৭ সালে স্বদেশী আন্দোলনে সংযুক্তির কারণে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক কারারুদ্ধ হলে প্রায় দু'শ নারী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার, আন্দোলনের তহবিলে অলংকার প্রদানসহ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ উত্তোরোত্তর যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি এর প্রভাব শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। তার মানবতাবাদী তৎপরতায় নারী সমাজও উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৮ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থনে একটি নারী কমিটি গঠন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য জানুয়ারী ১৯০৯ সালে নিষিদ্ধ করা হয় 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'। নিষিদ্ধকৃত অন্য সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্রতী, ঢাকা অনুশীলন, সুহৃদ, সাধনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নারী স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।[২১৭]

স্বদেশী আন্দোলনের সুত্র ধরেই এদেশে গড়ে উঠে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন। নারী সমাজ সহিংস আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বিপুল সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১৯১৭ সালে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। সরোজিনী নাইডু,[২১৮] মার্গারেট কাজিনস,[২১৯] এ্যানি বেসান্ত[২২০] প্রমুখ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনকে ১৯১৮ সালে সমর্থন দেয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৫ এর মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। তবে বৃটিশ শাসনমুক্ত ভারত ও পাকিস্তানী নারীরা কার্যকরীভাবে ভোটাধিকার পায় ১৯৫০ সালে।

প্রথম দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন রাজনীতিতে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের সবারই আগমন ঘটেছিল পারিবারিক সূত্র ধরে। গান্ধীজির নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৭ সালে অ্যামি বেসান্ত ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ব্যাপক হারে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। ওই সময় নারীর উপর নেমে আসা বৃটিশদের অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুম নারীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অসহযোগ আন্দোলনে নারী কর্মীদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেন বাসন্তী দেবী। উর্মিলা দেবী ১৯২১ সালে 'নারী কর্ম মন্দির'

---

[২১৫]. কংগ্রেসের পাশাপাশি তখন ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স (১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেস অধিবেশন শেষে একই মঞ্চে এই সংগঠনের সভা বসত। সেই সভাতে নারীরাও অংশগ্রহণ করত। ১৯০২ সালে এইরকম এক অধিবেশনে এক হাজার পুরুষের মধ্যে ৫০ জন মহিলা ছিলেন। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, আমি **নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৬)।

[২১৬]. জাতীয়বাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নারীরা স্বদেশী পণ্য ব্যবহার ও উৎপাদন শুরু করেন। চরকা কাটা সূতা দিয়ে কাপড় তৈরী ও তা ব্যবহারের জন্য ঘরে ঘরে ব্যাপক উৎসাহ ছিল। আন্দোলনের ব্যয় বহনে সহযোগীতার মানসে নারীরা জাতীয় তহবিলে নিজেদের অলংকার দান করেন। বহু নারী স্বদেশ বান্ধব সমিতিতে অর্থ ও অলংকার প্রদান করেন। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭)।

[২১৭]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯।

[২১৮]. সরোজিনী নাইডু ১৮৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[২১৯]. মার্গারেট কাজিনস জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৮ সালে।

[২২০]. এ্যানি বেসান্ত ১৮৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্টা করে মেয়েদের সত্যাগ্রহের শিক্ষা দেন। এর মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে হেমপ্রভা মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, দৌলতুন্নেসা, আশালতা সেন, নেলী সেনগুপ্তা, মোহিনী দেবী, সরলা গুপ্ত প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং নিজ উদ্যোগে একটি করে নারী সংগঠন করে নারীকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করতে শুরু করেন।[২২১]

অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের বাইরে আন্দোলনের আরেকটি ধারা তখন লক্ষ্য করা যায়। সেটি ছিল বিপ্লবী আন্দোলন। এই দু'টি ধারাতেই নারীর অংশগ্রহণ ছিল স্বপ্রণোদিত। বিশ থেকে তিরিশের দশক পর্যন্ত অনেকগুলো বিপ্লবী সংগঠনের জন্ম হয়। ওই সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীলা নাগ (রায়), কমলা দাস গুপ্ত, মনোরমা বসু প্রমুখ।[২২২]

১৯২৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন বিক্ষোভে বিপুল সংখ্যক নারী যোগ দেন।[২২৩] ১৯৩২ সালে ইংরেজ গভর্নর স্টানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে বিপ্লবী নেত্রী বীণা দাসের নয় বছর কারাদন্ড হয়। আবার গভর্ণর অ্যান্ডরসনকে হত্যা পরিকল্পনায় সহযোগিতা করার জন্য ১৯৪৩ সালে উজ্জ্বলা মজুমদারের ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১৯৩২ সালের ১৪ জুন চট্রগ্রাম জেলার ধলঘাট থানায় পটিয়া গ্রামে ইংরেজী বাহিনীর বিরুদ্ধে বন্দুক যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ মাষ্টারদা সূর্যসেনের জীবন রক্ষা এবং তাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এক সহসী বিপ্লবী নারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখে তিনি ছয় জন সহযোদ্ধা নিয়ে চট্রগ্রামে ইউরোপীয় ক্লাব দখল করে নেন। পরে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।[২২৪]

বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপশি অবিভক্ত বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনেও নারীর অংশগ্রহণ সক্রিয় ছিল। ১৯২১ সালে সন্তোষ কুমারী দেবী পশ্চিম বাংলার গৌরীপুর চটকল শ্রমিকদের নিয়ে গৌরপুর শ্রমিক সমিতি গঠন করেন। শ্রমিকদের অধিকার সচেতন করে তুলতে তিনি বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন যার নাম ছিল 'শ্রমিক'। তার নেতৃত্বেই ১৯২১-২২ সালে চটকল ধর্মঘট এবং ১৯২৭ সালে বেঙ্গল নাগপুর ও খরগপুর রেল ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতায় হাওয়া এবং ১৯২৮-২৯ সালে চটকল ধর্মঘটে প্রভাতী দাশ গুপ্ত সক্রিয় ভুমিকা রাখেন। তবে এরই মাঝে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয়নারী সমাজ নারীর ভোটাধিকারের বিষয়ে আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এর আগে ১৯১৭ সালে সেক্রেটারী অব স্টেটমন্টেগু ভারত সফরে এলে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৪ জন নারীর একটি দল প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান। এর পাশাপাশি তারা রাজনৈতিক নেতা ও অভিজাত পুরুষ সমাজের কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন সভায় উথাপিত নারীর ভোটাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। মুলত এর পর থেকে নারী সংগঠনগুলো সংগ্রাম শুরু করে। ১৯২৩ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম সুলতানা মুয়াজ্জেদা এবং কবি কামিনী রায়ের নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধি দল নারীর ভোটাধিকারের দাবি নিয়ে লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই সময় ভোটাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক সমর্থন যোগায় ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চট্রগ্রামসহ বেশ কয়েকটি জেলার মহিলা সংগঠন।[২২৫]

১৯২৩ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারীর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর আগেও ১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংস্কার বিল এর মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। তবে ওই ভোটাধিকার কার্যকর হয় ১৯২৯ সালে। ওই বিল অনুযায়ী তিনটি শর্ত সাপেক্ষে নারীর

---

[২২১]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
[২২২]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।
[২২৩]. কমলা দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, (কলকাতাঃ ১৯৬০), পৃঃ ৪২-৪৩।
[২২৪]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
[২২৫]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

ভোটাধিকার কার্যকর হতো। শর্ত তিনটি হলঃ (ক) নারীকে বিবাহিত হতে হবে, (খ) নারীকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে এবং (গ) নারীকে শিক্ষিত হতে হবে।

তবে এটা স্পষ্ট যে, নারীকে রাজনৈতিক ভাবে দমিয়ে রাখতেই ঐসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। তখন নারী শিক্ষার বিস্তারও বাধাহীন ছিল না। ফলে ভোটাধিকারের উল্লিখিত তিনটি শর্ত পুরণ করে মাত্র তিন লাখ ১৫ হাজার নারী ভোটাধিকার লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে গোটা ভারষতবর্ষের নারীর জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার আইন পাস হয়। এবং রাজ্য সভায় ১৫০টি আসনের মধ্যে ছয়টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এই ভোটাধিকার লাভের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে নারীর সরব অংশগ্রহণ শুরু হয়।[২২৬]

বিট্রিশ আমলে বাংলার কৃষক আন্দোলনেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। জমিদার ও জোতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তিরিশের দশক থেকে শুরু করে চল্লিশের দশক পর্যন্ত পুর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যে আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-তেভাগা আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন করে বাংলার নারীরা জোতদার জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সাহসী মানসিকতার পরিচয় দেন। ওই সময়ে সাহসী নারী নেত্রী সরলা বালার নেতৃত্বে নড়াইল এলাকার কয়েকশ নারী জমিদার শ্রেণীর শোষণের প্রতিবাদ জানাতে ঝাটা বাহিনী গঠন করেছিলেন। এছাড়া, দিনাজপুরের দ্বীপেশ্বরী, কালিয়াডাঙ্গীর জয়মনি ও রোহিনী, রাণীশংকৈলের তাঞ্চানী, বীর গঞ্জের কুলেশ্বরী, সেতাবগঞ্জের ভুত্বেরী, ফুলবাড়ীর বধুমনি ও যমুনা, দেবীগঞ্জের বুড়িমা প্রমুখ নারী তৎকালীন জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে আন্দোলন জোরদার করতে বলিষ্ঠ ভুমিকা রেখেছিলেন।[২২৭]

১৯৪৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির মহিলা সদস্যদের গঠিত মহিলা আত্নরক্ষা সমিতি সমাজ সেবামুলক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে বাংলার নারীসমাজকে সংগঠিত করেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে সমিতি পাঁচ হাজার নারীকে একত্র করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে যায় এবং আরও লঙ্গরখানা খুলে দেয়ার দাবি জানায়। মহিলা আত্নরক্ষা সমিতির নেত্রীদের মধ্যে অন্যতম আন্দোলনকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন গীতা রায় চৌধুরী, মনোরমা মাসিমা, জুঁইফুল বসু, মনিকুন্তা সেন, অমিয়া সেন, রেনু বসু, অণিমা সিংহ, শান্তি দত্ত, কনক দাস গুপ্ত (মুখার্জী), শচী লাহিড়ী (বিশ্বাস), মুক্তি ঘোষ (মিত্র) বাণী দাস গুপ্ত প্রমুখ।[২২৮]

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮০০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্য ছিল ক্রান্তিকাল। এই দু:সময়ে পুরুষের পাশাপাশি মুসলিম নারীরা শিক্ষা আন্দোলনসহ রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে পাক ভারত উপমহাদেশের নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ।

---

[২২৬]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
[২২৭]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
[২২৮]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান শাসনামলে নারীর অবস্থান (১৯৪৭-১৯৭০ সাল)

ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমাগত সাত বছর যাবত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে এবং লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে এবং তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানই হলো বর্তমান বাংলাদেশ।[২২৯]

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর কংগ্রেস নেত্রী জোবেদা খাতুন কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং 'মহিলা মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জোবেদা খাতুনের নেতৃত্বে মহিলা মুসলিম লীগের কর্মীরা ঘুরে ঘুরে গণভোটকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে শর্তহীনভাবে শ্রম বিনিয়োগ করেন।[২৩০] ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের ফলে শামসুন নাহার মাহমুদ স্বামী পুত্রসহ তদানিন্তন পূর্ব পকিস্তানে চলে আসেন এবং ঢাকা শহরে বসবাস শুরু করেন। পাকিস্তান শাসনামলে সমাজকল্যাণমুলক কাজের পাশাপাশি মুসলিম লীগ সরকারের রাজনৈতিক কাজেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন সংঘ, কমিটি বা প্রতিষ্ঠান ছিল না (সরকারী বা বেসরকারী) যার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না।[২৩১]

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পত্নী বেগম লিয়াকত আলী খান 'অল পাকিস্তান ওমেনস এসোশিয়েশন' সংক্ষেপে 'আপওয়া' নামে একটি নারী সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পাকিস্তান শাখা গঠিত হয়। সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বেগম নুরুল আমীন, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। পরবর্তীতে বেগম শামসুন নাহার এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[২৩২] ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানের তরুণী ও নারীরা প্রাথমিক চিকিৎসা ও ত্রাণ পুনর্বাসনের ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং রিফিউজি মহিলা শিশুদের কল্যাণে কাজ করেন। এছাড়াও এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সংগঠন ছিল উইম্যান্স ভলান্টারী অ্যাসোসিয়েশন (১৯৪৮)।[২৩৩]

পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে ১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বেগম রানা লিয়াকত আলী খান মহিলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সক্রিয় ১০০ জন মহিলার এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আগত মহিলাদের নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় আপওয়া সংগঠন।[২৩৪] করাচি, লাহোর, পেশোয়ারের ছোট বড় শহর ও

---

[২২৯]. আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪।

[২৩০]. বাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী**, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১)।

[২৩১]. শামসুন নাহার মাহমুদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্ত্রী শিক্ষা বোর্ড, প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটি, বিভিন্ন সরকারি ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়, কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য ছাড়াও বিভিন্নভাবে পাকিস্তানের গঠনমুলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮)।

[২৩২]. দেশ বিভাগের পর পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয়দের স্ত্রীরা বা মহিলা মুসলম লীগের নেত্রীবৃন্দ (যারা ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন) দেশ বিভাগের পর অবাঙালি মুসলিম জনগণ ভারত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে থাকে এবং বিহার থেকে ব্যাপকহারে মুসলিমরা পুর্ব পাকিস্তানে আসে। সরকার এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১; আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, **শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, পৃঃ ৩৬)।

[২৩৩]. ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হলে মেয়েরাও যেন দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য মেয়েদেরকে ন্যাশনাল গার্ড হিসেবে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার আহবান জানান হয়। অল্প সময়ের মধ্যে করাচিসহ সর্বত্র ২ হাজার ৪০০ মহিলার সমন্বয়ে তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। এই সামরিক প্রশিক্ষণ মুসলিম নারী জাগরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। (Khawar Mumtaz and Farida Shaheed, Eds, **Woman of Pakistan,** (U. S. A.: Zed books Ltd. London, New Jew Jersey, 1987. p: 52).

[২৩৪]. ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে ১৬ বছরের উর্ধ্বের সকল মহিলার জন্য উন্মুক্ত এই সংগঠনটি মহিলাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত সচেতনতা সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরের মহিলাদের মধ্যে কাজ করতে সচেষ্ট হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের মহিলারা সেই সংগঠনের কাজে যুক্ত হতে থাকে। এই সংগঠনের মূল সংগঠকরা ছিলেন মুলত সরকারী উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের স্ত্রী। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারী পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে এই সংগঠনের কাজ করতে হতো।[২৩৫] বাড়ির বাইরে মেয়েদের পেশাগত কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা, মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধির জন্য কুটির শিল্প কেন্দ্র চালু করা, অর্থকরী উৎপাদনমুখী শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে পুর্ব পকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়[২৩৬] এবং ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছিল গভর্ণর হাউসে।[২৩৭]

মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন জেলা ও শহরে জনগণের বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন, সংগ্রাম, মিটিং, মিছিল করতে থাকে। এ সময়ে অনেক নারী ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবেশীদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করতেন। তারা অভাবগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্য দান, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা, শীতবস্ত্র বিতরণ, সেলাই, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দান এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের পর থেকে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে কাজ করেন।

১৯৪৮ সালের ৮ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সভায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সংসদে নারীর সমঅধিকার, সমমর্যাদা ও শরিয়ত আইনে মুসলিম মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়গুলো অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিতে সনদটি সংসদে গৃহীত হয়।[২৩৮] এই সনদটি গৃহীত হওয়ার পিছনে বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্ল-াহর প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য।

দেশ বিভাগের আগে পুর্ববাংলার প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশি। দেশ ভাগের পর দলে দলে হিন্দু ভারতে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে দলে দলে মুসলমান নরনারী পাকিস্তান এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রী শিক্ষক ঘাটতি দেখা দেয় মারাত্মক আকারে। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ সরকার চাপের মুখে পড়ে। ছাত্র শিক্ষক শূণ্যতার কবলে পড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তৎকালীন সময়ে জোবেদা খাতুন নারী শিক্ষার বিস্তারে এই প্রচন্ড বাধা দুর করার বাসনা নিয়ে শহর থেকে শহরতলী ঘুরেছেন ছাত্র সংগ্রহসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার জন্য এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহের জন্য।[২৩৯] একই রকম ছাত্র শিক্ষক শূন্যতা সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলাগুলোতেও।
সমাজ উন্নয়নের কাজ ও নারীর অধিকার নিয়ে বিভিন্ন মহিলা সংঠনের কাজ শুরু হলেও শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার জন্য আগ্রহী মহিলাদের কোন সংগঠন ছিল না। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেগম' পত্রিকা এবং ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেগম ক্লাব'। বেগম

---

[২৩৫]. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds), **Women of Pakistan**, Ibid, p: 552.
[২৩৬]. বেগম সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী এবং যুইফুল রায় ও নিবেদিতা নাগকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে পুর্ব পকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়। মুলতঃ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, কমিউনিষ্ট মহিলা কর্মী যুইফুল রায়, নিবেদিতা নাগ, পুর্ণিমা বকশী, রীনা চক্রবর্তী, মজিরা খাতুন, মনোরমা বসু, হেনাদাস জ্যোৎস্না নিয়োগী প্রমুখ পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে ছিল ঘোর বিরোধী ছিল। তাই তাদের মন মানসিকতা ও কর্মকান্ডেও তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪)।
[২৩৭]. **সাপ্তাহিক বেগম**, সওগাত প্রেস, পাটুয়াটুলী, ডিসেম্বর, ১৯৫০।
[২৩৮]. **Women of Pakistan**, Ibid, p: 56.
[২৩৯]. সিলেটে কলেজই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল কলেজ নিয়ে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে থাকে। ঢাকার ইডেন কলেজ ও স্কুল নিয়েও চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায় ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলকে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে ১৫ই নভেম্বর এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্রী ও শিক্ষকগণ। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

ক্লাব এবং পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানের মহিলাদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠে। বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী।[২৪০]

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়ার আগেই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার দাবিদারদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রশীদ সিলেট সফরে এলে ছাত্র সমাজের পাশাপাশি একটি নারী প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানায়।[২৪১] ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে গুলি বর্ষণের খবরে নারী সমাজের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টনে এক বিশাল নারী সমাবেশ হয়। ১২ নভেম্বর অভয় দাস লেনে বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে নারী সমাজ বিক্ষোভ করে। ওই সময় নারায়ণগঞ্জের মডার্ন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করা হয়।[২৪২] ভাষা আন্দোলনে আরও যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, রওশন আরো বাচ্চু, সুফিয়া খান, হালিমা খাতুন, নাদেরা বেগম, সারা তৈফুর প্রমুখ।[২৪৩]

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নুরজাহান মোর্শেদ দৌলতুন্নেসা খাতুন,[২৪৪] বদরুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমদ, বেগম সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুনন্নেসা আহমদ, মেহেরুন্নেসা খাতুন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিন জন সদস্য আইন পরিষদে নির্বাচিত হন।[২৪৫] ওই সময়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন নেলী সেন গুপ্তা। তাদের এ বিজয় নারী সমাজের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে[২৪৬] এবং নারীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নুরজাহান মোর্শেদ, রাজিয়া বানু, বেগম দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী করা হয়।[২৪৭] পাকিস্তান আইনসভায় দুজন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৭ সালে বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের নির্বাচিত

---

২৪০. ১৯৫৪ সালে ১৫ ডিসেম্বর বেগম ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের প্রগতিমনা লেখিকা, সমাজসেবিকা, শিল্পী, রাজনৈতিক নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২)।

২৪১. রাষ্টভাষা বাংলা চালুর দাবি নিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে যারা স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, তারা হলেন জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহের বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসি খানম চৌধূরী, নুরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন প্রমুখ। এ স্মারকলিপি পাঠানোর খবর পেয়ে তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরীর কাছে এ অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন। সেখানে উল্লেখ ছিল, সিলেটের পুরুষরা যা পারেনি আপনারা তাই পারলেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী**, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)।

২৪২. এই বিক্ষোভকালে আরো কতিপয় মহিলা গ্রেপ্তার হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন নিশ্চিত তথ্য জানা যায়নি। ঢাকা ও চট্টগ্রামে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান রাষ্টভাষা বাংলার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)।

২৪৩. গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

২৪৪. গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন নেছা খাতুন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬। নারী আন্দোলন নেত্রী দৌলতুননেসা খাতুন ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দৌলতুননেসা খাতুন ৯২ (ক) ধারায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষততাচ্যুত করলে প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় হন এবং ১১ মাস কারা ভোগ এবং ৩ মাস অন্তরীণ থাকেন।

২৪৫. ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ডিক্রী জারি করেন। এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের গণ পরিষদের তদানীন্তন স্পীকার পূর্ব পাকিস্তানের মুসলীম লীগের নেতা তমিজউদ্দিন খান পুর্ব পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। বহু রাজনৈতিক জটিলতা শেষে সারা পাকিস্তান থেকে জরুরি অবস্থা ও পুর্ব পাকিস্তান থেকে ৯২ (ক) ধারা উঠিয়ে নেয়া হয়। এতে পুনরায় আইনসভার কাজ শুরু হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২, গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন নেছা খাতুন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)।

২৪৬. গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন নেছা খাতুন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

২৪৭. শত বছরে বাংলাদেশের নারী, **নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য ছিলেন এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ মুসলিম লীগ নেত্রী ছিলেন।[২৪৮] নারীদের আইনগত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দুজন মহিলা প্রতিনিধি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪৮ সালে বাজেট অধিবেশনে নারীদের কাজের অধিকার ও সুযোগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য মহিলা প্রতিনিধিরা জোরালো প্রস্তাব রাখেন। এ দুই মহিলা নেত্রীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে বিষয়টি সংসদে উথাপিত হয় এবং মুসলিম মহিলার ব্যক্তিগত আইনের শরীয়ত বিল (১৯৪৮) কার্যকরী হয় ১৯৫১ সালে।[২৪৯] ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের পর সরকারি দমননীতির ফলে সব ধরণের আন্দোলনই কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

মুসলীম লীগ সরকারের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মাওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, গণতান্ত্রিক দল এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠিত হয়েছিল দেশের প্রথম যুক্তফ্রন্ট। এক কালের মুসলিম লীগ নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধূরী এই সময় দলত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন কিন্তু তিনি জয়ী হননি। নুরজাহান মোর্শেদের প্রতিদ্বন্দী হিসেবে মুসলিম লীগ থেকে দাড়িয়েছিলেন শামসুন্নাহার আহমেদ। তিনিও পরাজিত হন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আই পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা নুরজাহান মোর্শেদ, বেগম রাজিয়া বানু ও বেগম দৌলতুননেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়।[২৫০]

১৯৫৬ সালে চুড়ান্তভাবে যে সংবিধান রচিত হয় তাতে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করা ও মহিলাদের ভোটে মহিলাদের নির্বাচনের আইন ঘোষিত হল। এই নির্বাচনের ফলে মহিলারা সাধারণ আসন ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে দুই ভোট দেয়ার অধিকার পেয়েছিল। এছাড়াও ১৯৫৭ সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের তৃতীয় অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের মধ্যে নুরজাহান মোর্শেদ যোগ দিয়েছিলেন।[২৫১]

মূলত সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। মিউনিখের সম্মলনে এই কমিটির পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা যোগ দেন। মুসলীম লীগ সরকার কর্তৃক জমিদারি প্রথা বাতিল করা হয়। এ সময় জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় জমিদার গৃহিণী, কন্যা ও পরিবারের মহিলারা রিক্সা শোভাযাত্রা করে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে জমিদারি ব্যবস্থা বজায় রাখা অথবা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপুরণ দেওয়ার দাবি জানান।[২৫২]

---

[২৪৮]. **Women of Pakistans**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫। বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার সালমা সোবহানের মা, আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বোনের মেয়ে।

[২৪৯]. মুসলিম মহিলার ব্যক্তিগত আইনের শরীয়ত বিল ১৯৪৮ কার্যকরী করার দাবিতে সংসদীয় নেত্রী জাহানারা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৫)।

[২৫০]. ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চে সেই সংবিধান চালূ হয়েছিল। এ সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তন এই দুটি প্রদেশের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। উভয় প্রদেশে ১৫০ জন করে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনসহ পার্লামেন্টারি শাসন প্রতিষ্ঠার বিধান দেওয়া হল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪০)।

[২৫১]. পূর্বপাকিস্তানে সে সময় সরকারি উদ্যোগে সোশ্যাল ওয়ার্ক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল সকল স্তর ও সকল মতের সমাজ কল্যাণমুলক কাজে যুক্ত মহিলাদের নিয়ে সভা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের নারী-পুরষকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সভানেত্রী ছিলেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের স্ত্রী এবং সহ সভানেত্রী ছিলেন নুরজাহান মোর্শেদ। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২)।

[২৫২]. ধনী নারী, জমিদারের কন্যা ও স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলারা মূল্যবান গাড়ির পরিবর্তে রিকসা শোভাযাত্রা করে প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করেন। এরা সরকারের কাছে স্মারক লিপি প্রদান করে জানান যে, জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির ফলে ৮০ লাখ লোক অনশনের সম্মুখীন হবে। (**সাপ্তাহিক বেগম**, ১৯৫৬-৫৭)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯ সালে থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় সভানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে কিছু কিছু সমাবেশ মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির সুযোগে বিভিন্ন সমিতির সদস্যারা একত্রিত হতে শুরু করে।[২৫৩] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬১ সালে নারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিততে পারিবারিক আইন ১৯৬১ প্রণীত হলে পূর্ব পাকিস্তানের মাওলানা আব্বাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ, পশ্চিম পাকিস্তানের মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীসহ ওলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানিয়ে বলে যে, 'মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১' পবিত্র কুর'আনের কিছু বিধানের পরিপন্থি।[২৫৪] ষাটের দশকে আলেম উলামা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পারিবারিক আইন সংশোধনীর দাবি সোচ্চার থাকলেও নারী সমিতির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে কোন সংশোধনী ছাড়াই আইনটি গৃহীত হয়।[২৫৫] আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও নারীর অবস্থান ও মর্যাদা আগের তুলনায় কোন অংশেই বৃদ্ধি পায়নি।

সংবিধানে প্রাপ্ত নারীর ভোটে নারী সদস্য নির্বাচনের অধিকার অনুযায়ী ১৯৬২ সালের সংবিধানে ২০ ধারায় জাতীয় পরিষদে ৬টি ও প্রত্যেক প্রদেশের ৬টি আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রাষ্ট্রপতি দ্বারা সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনে প্রার্থী মনোনয়ন হওয়ার পদ্ধতি চালু হয়। কয়েকজন মহিলাকে এ সময় মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[২৫৬]

১৯৬৪ সালে জানুয়ারিতে শামসুন্নাহার মাহমুদ নির্বাচকমন্ডলীর বিলের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আইন পরিষদসহ নির্বাচকমন্ডলীতে ২৫ শতাংশ আইন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবী জানান পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যা বেগম রোকাইয়া আনোয়ার। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যা গেম জি. এ. খান ও বেগম মমিনুন্নেসা আহাদের বিরোধিতার ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।[২৫৭] জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে ৬ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে ১০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহিলা সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে আইন পরিষদের মাধ্যমে সদস্যা নির্বাচিত হবেন। সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। একই বিধিবলে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ অযোগ্য ঘোষিত হলে সেই আসন শূণ্য হয় এবং উক্ত আসনে উপনির্বাচন হয়।[২৫৮]

---

[২৫৩]. ১৯৬০ সালের শুরুতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন নারী সংগটনগুলো সাংগঠনিক কাজ পুনরায় শুরু করে। গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি, শিশু রক্ষা সমিতি, আপওয়া, শিশুকল্যাণ পরিষদ ছাড়াও ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন, ইসলামিক মহিলা মিশন, নিখিল পাকিস্তান সমাজ কল্যাণ সমিতির পূর্ব পাকিস্তান শাখা ইত্যাদি মহিলা সংগঠন সামরিক শাসনের মধ্যেও তাদের বার্ষিক সম্মেলন সাহিত্য সভা ইত্যাদি কর্মসুচি পালন করেছেন। (খোকা রায়, **কংগ্রেসের তিন দশক**, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃঃ ১৬০)।

[২৫৪]. ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনের কয়েকটি ধারা, যেমন চার বিয়ে নিয়ন্ত্রণ, তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু কুর'আন এবং সুন্নাহ একজন পুরুষকে চার বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। কুর'আন ও সুন্নাহ স্পষ্ট ভাষায় তালাকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির পথনির্দেশ করেছে। উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও নির্ধারিত আইন রয়েছে। সুতরাং এটি অত্যন্ত সংগত কারণেই ইসলামী আইনেরই বিরুদ্ধাচারণ।

[২৫৫]. এ দেশের নারী সমাজ দুর্বার আন্দোলন করে সামরিক জান্তার কাছ থেকে তাদের ন্যায্য পারিবারিক অধিকার আদায় করলেও বাস্তবে সমাজ জীবনে এর সুফল পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। পরিবারিক আইন ১৯৬১ প্রণীত হলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান পরবর্তিত হয়নি। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৯)। আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানের কোন উন্নয়ন হয়নি কারণ এতে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টিকর্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আইন কেউ প্রণয়ন করতে পারে না।

[২৫৬]. **Women of Pakistan**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০।

[২৫৭]. উক্ত প্রস্তাবটির মূল বক্তব্যটি কি তা অবশ্য জানতে পারিনি।

[২৫৮]. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারী সমাজের উল্লিখিত অবস্থানের সাথে সাথে নানাবিধ সামাজিক কমিশনে পূর্ব পাকিস্তানের আপওয়ার সদস্যা ছাড়াও অন্য সমাজসেবী মহিলাদের যুক্ত করা হচ্ছিল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০)।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় সামরিক সরকার প্রধান আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে ময়মনসিংহের মহিলাদের প্রতিনিধি স্থানীয় চারজন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করে নারী সমাজের কিছু দাবি পেশ করেন।[২৫৯] তখন পূর্ব পাকিস্তানের সম্মিলিত নারী সমাজের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসটির নাম হয় 'রোকেয়া হল'।

১৯৬২ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এর সর্বত্র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত সরকার বিরোধী ও গণতন্ত্রকামী দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গঠনের জন্য প্রগতিশীল দল সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকরি হয়নি। অবশেষে খাজা নাজিমুদ্দিনের উদ্যোগে পাঁচটি বিরোধী দল নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ দফা কর্মসুটি নিয়ে কমিটি গঠন করে। ১৯৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধীদল বা কমিটি মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনীত করে।[২৬০]

নির্বাচনকালে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বাইরে পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে এদেশের নারী সমাজ বিভিন্নমুখী কাজ এবং ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে পুরো দুই দশকে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও অধিকার অর্জনের বিষয়টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে এ সময় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ময়দানে সক্রিয় ছিল।[২৬১] ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত যুদ্ধের সময় সরকারী উদ্যোগ ও মহিলা সংগঠন আপওয়ার উদ্যোগে সাধারণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও নার্সিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৯৬৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছয় দফা কর্মসুচি দিয়ে আন্দোলন শুরু করে।[২৬২] ১৯৬৯ সালে সালে সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে ১৯ জানুয়ারী আন্দোলনকারী ছাত্রীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। একই বছরের ২০ জানুয়ারী আসাদ শহীদ হওয়ার পর প্রতিটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। ২৪ জানুয়ারী আসাদ হত্যার প্রতিবাদে হরতাল পালনের সময় ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা হাতে পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে গেলে তার পেছনে হাজার হাজার নারী পুরুষ পল্টন ময়দানের দিকে এগিয়ে যান। এর কিছুদিন পর ৭ ফেব্রুয়ারী নারী সমাজের উদ্যোগে শহীদ মিনার থেকে শোক মিছিল বের করা হয়।[২৬৩]

---

[২৫৯]. ময়মনসিংহের মহিলা প্রতিনিধিদের পেশকৃত দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ (১). স্বামী স্ত্রী দুই জনই সরকারি কর্মচারি হলে উভয়কে একইস্থানে কাজের সুবিধা দান। (২) মহিলাদের জন্য সি. এস. এস পরীক্ষাদানের সুযোগ ও পরবর্তিতে সি. এস. এস অফিসার হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০)।

[২৬০]. মিস ফাতেমা জিন্নাহ গার্লস গাইডের প্রধান ও নার্সিং সমিতির উপদেষ্টা ছিলেন। মাওলানা মওদুদীসহ সকল ইসলামী দল মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন করেন। অপরপক্ষে সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে জোর প্রচার চালানো হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলার নির্বাচন জায়েজ নয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দেলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬)।

[২৬১]. পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম বাংলার নারী সমাজ পশ্চাৎপদ অবস্থায়, শিক্ষার অভাবে, অর্থনৈতিক কষ্টে, অবরুদ্ধ পরিবেশে, বঞ্চিত ছিল তার ন্যায্য অধিকার থেকে। দীর্ঘদিনের নারী আন্দোলনে অভিজ্ঞ শামসুন্নাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল দৌলতুননেসা খাতুন, জামায়াতে ইসলামীর হামিদা বেগম, নাইয়ার বানু, মুনিরা বেগম প্রমুখ নেত্রী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর শামসুন্নাহার মাহমুদ দৌলতুন নেসা, জোবেদা খাতুন প্রমুখ নেত্রী মনে করলেন সরকারি দলের মাধ্যমে নারী সমাজের প্রগতি সম্ভব নয়। তাই তারা যে যেখানে থেকেছেন সেখানেই গড়ে তুলেছেন স্থানীয় বেসরকারি মহিলা সংগঠন। (মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬)।

[২৬২]. ষাটের দশকে সামরিক আইন ভঙ্গ করে দেশে আন্দোলন সংগ্রাম করে ক্রমান্বয়ে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রণীত শাসনতন্ত্র বাতিল করে সাড়ে তিন বছর স্বৈরশাসন চালু রাখেন। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন এক শাসনতন্ত্র জারি করেন। ১৯৬২ সালের ১ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং ৮ জুন রাওয়াল পিন্ডিতে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ২৪ জুন পূর্ব পাকিস্তান এর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেন ৯ জন নেতা এক বিবৃতিতে আইয়ুব খানের জারিকৃত শাসনতন্ত্র গ্রহণীয় নয় বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসুটি দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। (অধ্যাপক গোলাম আজম, **জীবনে যা দেখলাম**, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০২, পৃঃ ২৬২-২৬৩)।

[২৬৩]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য বোরকা পরা মহিলা শহীদ আসাদ এর শোক মিছিলে যোগ দেন।[২৬৪] এ সময় মহিলা সমাজ রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বিবৃতি দেওয়া, পথসভা, সমাবেশ ইত্যাদি কাজ করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনে নারী সমাজের সমর্থন সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন মহিলা নেত্রীর উদ্যোগে 'পুর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল।[২৬৫]

১৯৭০ সালে ৪ এপ্রিল বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্টিত হলো 'পুর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ছিল একমাত্র সংগঠন যে সংগঠন সারা দেশের মহিলাদের সংগঠিত করে এবং সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আহবান জানায়।[২৬৬] বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদই পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[২৬৭]

মুক্তিযুদ্ধে নারী (১৯৭১ সাল)

১৯৬৯ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পরপরই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সুত্রপাত ঘটে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার ওপর পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দীর্ঘ নয় মাস হানাদার পাক সেনাদের দ্বারা প্রায় ১৪ লাখ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী, পুত্র, কন্যা বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন এবং ধর্ষিতা হয়েছেন প্রায় সাড়ে চার লাখ নারী। ১৯৯১-২০০২ সাল পর্যন্ত দেশের ৪২টি জেলার ৮৫টি থানায় পরিচালিত গবেষণা জরীপে গৃহীত অসংখ্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে ২৬৭ জনের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, একাত্তরে ঐসব স্থানে দুই লাখ দুই হাজার পাঁচশ সাতাশিজন নারী ধর্ষিত হয়েছেন। গবেষণায় প্রাপ্ত সামরিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একাত্তরে নির্যাতিত নারীদের মধ্যে ৫৬.৫০ ভাগ মুসলিম, ৪১.৪৪ ভাগ হিন্দু এবং ২.০৬ ভাগ খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়।[২৬৮] ১৯৭১ সালে যুদ্ধের নয় মাসে ৪২টি জেলার নির্যাতিত নারীর সংখ্যা নিম্নরূপ[২৬৯]:

মাস	নারী নির্যাতন	
	একদিনে	এক মাসে
মার্চ	৫৯৭ জন	১৮৫২৭ জন
এপ্রিল	১১৬৬ জন	৩৫০০০ জন
মে	১০৩২ জন	৩২০০০ জন
জুন	৮৩৩ জন	২৫০০০ জন
জুলাই	৬৭৭ জন	২১০০০ জন
আগষ্ট	৩৮৭ জন	১২০০০ জন
সেপ্টেম্বর	৫০০ জন	১৫০০০ জন
অক্টোবর	৬১২ জন	১৯০০০ জন
নভেম্বর	৪৬৬	১৪০০০
ডিসেম্বর	৩৫৪	১১০০০

---

[২৬৪]. কবি সুফিয়া কামালের ১৯৬৯ সালের ব্যক্তিগত দিনলীপি থেকে অপ্রকাশিত। গ্রন্থকারের কাছে সংরক্ষিত।

[২৬৫]. এই সংগ্রাম কমিটির নেত্রী ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, আহবায়িকা মালেকা বেগম, প্রয়াত বদরুন্নেসা আহমদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আমেনা আহমেদ নুরজাহান মোর্শেদ, সেলিনা বানু, নুরজাহান কাদের, সারা আলী, রাজিয়া বানুর নাম উল্লেখযোগ্য। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছাত্রী নেত্রীদের ভূমিকা ছিল প্রধান। রাজধানী সহ বাংলাদেশের সর্বত্র মহিলা ও ছাত্রী নেত্রীরা সফর করে করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন মহিলা সংগ্রাম পরিষদের শাখা। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০-৬১)।

[২৬৬]. মালেকা বেগম, **বাংলাদেশের নারী আন্দেলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২; মালেকা বেগম, **নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক**, ঢাকাঃ অন্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০২, পৃঃ ৫৮।

[২৬৭]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

[২৬৮]. ডা. এম এ হাসান, **মুক্তিযুদ্ধ ও নারী**, (ঢাকাঃ তাম্রলিপি, ২০০৮ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৭।

[২৬৯]. বিগত ৩০ মাসব্যাপী ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ৪২টি জেলার ৮৫টি থানায় গবেষণা জরিপ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে মাত্র ৪২টি জেলাতেই দুই লাখ দুই হাজার পাঁচশ সাতাশ জন নির্যাতিতা নারীর পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। (ডা. এম এ হাসান, **মুক্তিযুদ্ধ ও নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২)।

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য নারী শশরীরে যুদ্ধ করে, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা করে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাক্তার নুরুন্নাহার বেগম চট্টগ্রামে 'মহিলা মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এই সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রী ও মহিলাদের সংগঠিত করে সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। ঢাকার একটি পরিবারের তিন বোন আসমা, রেশমা ও সায়মা গোপনে স্টেনগান, এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড সংগ্রহ করত এবং অপারেশনে যাবার পূর্বমুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের হাতে তুলে দিত। ডাঃ রেনুবালা ছিলেন রেলওয়ে হাসপাতালের সহকারী সার্জন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সেবা করতেন। শুটার আতিমা মওলা[২৭০] মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরুষ ও মহিলাদের বন্দুক চালনা শিক্ষা দেন। প্রীতিলতা শশরীরে যুদ্ধ করেছেন। ১১নং সেক্টরে হামিদুর রহমানের সাথে কাজ করেছিলেন বগুড়ার ফেরদৌস আরা ডলি। বন্দুক, এলএমজি, স্টেনগান ধরেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করেছেন। টাঙ্গাইলের শুকরী বেগম, জামেলা বেগম এবং মাজেদা বেগম এর মত বহু মহিলা মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে ক্যাম্পে রান্নার কাজ, বন্দুক ধোয়া মোছা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার হেমায়েত বাহিনীতে ২৪ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিল।[২৭১] এছাড়াও অসংখ্য নাম না জানা নারী রয়েছেন যারা জীবন ও সম্ভ্রম হারিয়ে এদেশকে স্বাধীন করেছেন।

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ৭ কোটি বাঙালি নর নারীর জীবন মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।[২৭২] স্বাধীনতার মাত্র দুদিন আগে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে এ দেশের সেরা বুদ্ধিজীবি, অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক, সহিত্যিক, শিল্পীদের হত্যা করা হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়[২৭৩] এবং পৃথিবীর মানচিত্রে নুতন একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত সম্ভ্রমহারা অগণিত মা, বোন, অগণিত ভাইয়ের জীবন দানকে জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে শ্রদ্ধাভরে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার অসংখ্য নারীর আত্নত্যাগের কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল।[২৭৪]

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ছাত্রদের নিয়ে সশস্ত্র ছাত্রী ব্রিগেড গড়ে তোলে। ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন রোকেয়া খানম (কবীর) এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা। এই ব্রিগেডের ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে পরবর্তী সময়ে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় মহিলা ব্রিগেড গঠন করেন। মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে ছাত্রলীগ পরিচালিত ছাত্রী ব্রিগেড যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ফোরকান বেগম, মমতাজ বেগম ইকু ও ফেন্সি জেসমিনের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। যুদ্ধকালে রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মালেকা বেগম। আগরতলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোকেয়া কবীর। চিকিৎসা সহায়তা ও রাজনৈতিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করণের কাজ করেছেন ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, ডা.ফৌজিয়া মোসলেম, আয়েশা খানম, সাইদা কামাল টুলু, মনিরা আক্তার, ফরিদা আক্তার, মুশতারী শফি প্রমুখ। যুদ্ধের সময়, কোলকাতায় পদ্মা পুকুর এলাকায় নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত গোবরা ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন বর্তমান ও আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরী। তাকে সহযোগিতা করেছেন কৃষ্ণা রহমান ও ফজিলাতুন নেসা। ঐ ক্যাম্পের প্রায় চারশ নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ নারীকে আত্ন-বিশ্বাসী করে তোলে এবং সেটাই পরে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহস যোগায়।[২৭৫]

---

[২৭০]. ১৯৫১ সালের জাতীয় প্রতিযোগীতায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪)।

[২৭১]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২-১২৬।

[২৭২]. মালেকা বেগম, **নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

[২৭৩]. রাজধানী ঢাকার শহীদ মিনারে কবি বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসমাবেশ হয়েছিল। সে সভায় সকলে মিলে শপথ নিয়েছিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন। (সুফিয়া কামাল, **একাত্তরের ডায়েরী**, ঢাকাঃ জ্ঞান প্রাকশনী, ১৯৮৯)।

[২৭৪]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

[২৭৫]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯৭২-২০০০)

বাংলাদেশে পরিবার ও সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ অনুসারে। পরিবার ও সংসারের প্রধান হচ্ছে পুরুষ। তবে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে। অর্থাৎ নারীর আয়ে সংসার চলে এমন পরিবার দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেই বেশী দেখা যায়। যার ফলে নারী পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। সামাজিক রীতি অনুসারে জন্মগতভাবেই মেয়েশিশু তার বাবার পরিবারের অস্থায়ী সদস্য। বিয়ের মধ্য দিয়েই নারী জীবনের সার্থকতা ধরা হয়। ছেলে সন্তান জন্ম দিতে না পারলে নারীর সামাজিক মূল্য শুণ্য হয়ে যায়। যৌতুকের কারণে নারীর প্রতি নির্যাতন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতা, যৌন নিপীড়ন, নারী পাচার, নারী হত্যা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসেবেই প্রকট আকার ধারণ করছে। তবে বাংলাদেশের নারীরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেমন চরমভাবে বঞ্চিত, নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আবার তেমনি পরিবারিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতে পারছে না।

পরিবার ও সমাজে নারী

বাংলাদেশে পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থানগত দিক দুইটি। যথা: শিশু নারী ও প্রাপ্ত বয়স্ক নারী। এই দুই অবস্থাতেই নারীকে পরিবার ও সমাজে চরমভাবে অবহেলিত ও নির্যাতিত হতে হয়। বিস্তারিত নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

শিশু নারীর অবস্থান

নারী জন্ম থেকে পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে গড়ে ওঠার পূর্বে সে শিশু[২৭৬] হিসেবে পরিবার কর্তৃক প্রতিপালিত হয়। তখন থেকেই পরিবার ও সমাজে শুরু হয় মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য। পরিবার ও সমাজে ছেলে ও মেয়ে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক সত্তা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠের পর ক্রমান্বয়ে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর পিতামাতাসহ আপনজন কর্তৃক পরিবারের মধ্যেই নারী প্রথম বৈষম্যের শিকার হয়। পরিবারের গন্ডির বাইরে সমাজে, শিক্ষাঙ্গণে, কর্মক্ষেত্রে, এমনকি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আইনে মেয়ে-শিশুর প্রতি নানারূপ বৈষম্যমূলক আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। অথচ এরূপ বৈষম্য বাংলাদেশের সংবিধানেরও পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষকে সমানভাবে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে।

---

[২৭৬]. একটি মানব সন্তান কত বছর পর্যন্ত শিশু বলে গণ্য হবে, তা নিয়ে যথেষ্ঠ মতভেদ রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সব মানব সন্তানকে শিশু বলা যাবে। আই এলও'র শিশু শ্রমের সংজ্ঞায় আবার ধরা হয়েছে ১৫ বছর। ১৯৬৫ সালে The Majority Act অনুযায়ী আঠার বছর পূর্ণ হলে সাবালক হয়। ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে ১৪ বছর, ১৯৩৮ সালে শিশু নিয়োগ আইন ১৫ বছর, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন ১৬ বছর পর্যন্ত শিশু বলে গণ্য করা হয়। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ২০০০ এর ২ (ট) ধারায় বলা হয় "শিশু অর্থ অনধিক চৌদ্দ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি।" একই তারিখে সংসদে পাশ হওয়া ও একই তারিখে প্রকাশিত ২০০০ সালের ৭নং আইন জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন ২০০০ এর ২ (ছ) তে বলা হয়। "শিশু অর্থ অনধিক ১৬ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি।" বিভিন্ন আইনে শিশুদের বয়স সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী মুসলমানদের বিয়ে সামাজিক চুক্তি; বিয়েতে ছেলেও মেয়ের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছরের কথা বলা হয়েছে। সার্ক দেশসমূহে ১৯৯০ সালকে মেয়ের-শিশু বর্ষ হিসেবে পালন করে এবং বিশ বছর পর্যন্ত মেয়েদের শিশু বলে গণ্য করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশে সাধারণভাবে বিবাহ পর্যন্ত মেয়েরা পিতামাতা তথা অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল থাকে। বর্তমান সমাজে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সী মেয়েদের মেয়ে-শিশু বলে বিবেচনা করা হয়। (আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫, পৃঃ ৩৫-৩৬)।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু নারীর প্রতি বৈষম্যের ধরণ

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজের নানান রীতি-নীতি ও সামাজিকতার নামে মেয়েদের উপর বিভিন্ন ধরণের নিগ্রহ বঞ্চনা চলছে। এ ধারা মানবসভ্যতার শুরু থেকেই বিদ্যমান। বাংলাদেশের সমাজে মেয়ে-শিশুরা ছেলেদের চেয়ে নিম্নে অবস্থান করে। জন্মগতভাবে মেয়েরা শারীরিক, মানসিক, প্রতিভাগত, জ্ঞানগত-সর্বদিক দিয়েই ছেলেদের তুলনায় পেছনে থাকে বলে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। তাই ছেলেরাই সংসার চালাবে, সমাজের নেতৃত্ব দেবে, রাষ্ট্র পরিচালনা করবে-এটি স্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়। সেজন্য লেখাপড়া, খেলাধুলা ও খাদ্যে তাদের অগ্রাধিকার পাওয়াটা যুক্তিযুক্ত। অপরদিকে মেয়েরা ঘরে থাকবে, সংসার করবে, সন্তান জন্ম দেবে, সন্তান লালন-পালন করবে; তাই অত লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই, এসবই গ্রামবাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাধারণ অভিব্যক্তি। শুধু গ্রাম নয়, শহরাঞ্চলেও নারীরা জন্ম থেকে নানারকম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশে শিশু নারীরা যেসকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা নিম্নরূপ:

জন্ম নিবন্ধন

জন্ম নিবন্ধন শিশুর নাগরিক জীবনে পদার্পণের প্রথম পদক্ষেপ ও নাগরিকত্বের প্রথম সার্টিফিকেট। এটি শিশুর অধিকার রক্ষা ও পরিচয় জানার আইনগত ও বৈধ দলিল। এর মাধ্যমে শিশুর বয়স, কখন ও কোথায় সে জন্মগ্রহণ করেছে, কে তার পিতা-মাতা ইত্যাদি তথ্য সঠিকভাবে জানা যায়। সহজভাবে বলা যায় জন্ম নিবন্ধন হলো সরকার বা রাষ্ট্রের খাতায় শিশুর নাম অন্তর্ভূক্তি। জন্মের পর শিশুর নাম পরিচয় থাকার অধিকারসহ নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা নিশ্চিতকরণের জন্য জন্ম নিবন্ধন করা প্রয়োজন।[২৭৭] জন্ম নিবন্ধন শিশুর আইনগত অধিকার। শিশু জীবনের শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র অত্যন্ত জরুরী।কিন্তু দেখা যায়, এক্ষেত্রেও ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। জন্মনিবন্ধনের ক্ষেত্রে ছেলেকে মেয়ের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। আবার দরিদ্র পরিবারে অল্প বয়সে মেয়ে বিয়ে দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বয়স বৃদ্ধি করে বিবাহ দেয়া হয়। তাই জন্মনিবন্ধন করলে মেয়ের বয়স বৃদ্ধি করতে না পারার আশংকাতেই কন্যার জন্ম নিবন্ধন করতে আগ্রহী হয় না।

বাংলাদেশে জন্মনিবন্ধনের চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। ইউনিসেফ পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শতকরা ১০ ভাগেরও কম শিশুর জন্ম নিবন্ধন হয়েছে। এ সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের ঘাটতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈধ প্রমাণপত্র হিসেবে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র ব্যবহার না করা ও জন্ম নিবন্ধন আইন প্রয়োগের দুর্বলতার কারণে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সার্বজনীন হয়নি। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, দেশের শিশুদের মধ্যে ৮৮ শতাংশের জন্ম নিবন্ধন হয়নি। আর শতকরা ৭৪ শতাংশের এ সম্পর্কিত কোন ধারণা নেই। ২০০৫ সালে প্রাপ্ত তথ্যমতে ১৭ টি জেলা, ৩টি পৌরসভা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে মোট ৫২ লাখ ৩৯ হাজার ৬ শত ৪২ জন শিশুর জন্মনিবন্ধন করা হয়েছে। প্ল্যান বাংলাদেশ এর তথ্যমতে, বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি শিশুর মধ্যে মাত্র ৬৭ লাখ শিশুর জন্ম নিবন্ধন হয়েছে।[২৭৮] জন্ম নিবন্ধন না করার ফলে মেয়েশিশুরা প্রতিনিয়ত তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খাদ্য ও পুষ্টি

মানব জীবনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারে নারীরা সাধারণত অবশিষ্ট শ্রেণী হিসেবে গণ্য হয়। পুরুষের খাদ্য গ্রহণের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই নারীদের গ্রহণ করতে হবে এ রীতি যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে। এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ট নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণ

---

[২৭৭]. চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, (ঢাকা: জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন সেন্টার স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, ২০০৫), পৃ: ৯।

[২৭৮]. সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত এক জরীপে দেখা গেছে, জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে বাংলাদেশের বেশীরভাগ ইউনিয়ন পরিষদে কোনো তথ্য নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি চৌকিদার এ বিষয়ে কিছুই জানে না এবং কোনো রেজিষ্টারও সংরক্ষণ করে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরাও এ ব্যাপারে সচেতন নয়। এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাও নেই। (চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপার। কম খাদ্য ও কমপুষ্টি জোগানদাতা পরিবারের খাদ্য বন্টনের ওপর পরিচালিত অনেক গবেষণাতেই দেখা গেছে যে, নারীদের দৈনিক ক্যালোরির ঘাটতি প্রচুর এবং তারা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে। পরিবারে খাদ্য ঘাটতি পুরুষের ১৯.৬%, পক্ষান্তরে নারীদের ক্ষেত্রে ঘাটতি হয় ২২%।[২৭৯] ইউএনডিপির রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, পুরুষের ক্যালোরি ও আমিষ গ্রহণ যেখানে ১৯২৭ কিলোক্যালোরি ও ৪১.৪ গ্রাম; নারীদের সেখানে ১৫৯৯ কিলোক্যালরি ও ৩২.৭ গ্রাম।[২৮০] ছেলে-শিশুরা যেখানে ৫.০% ভাগ অপুষ্টির শিকার; মেয়ে-শিশুরা সেখানে ১৪.০% ভাগ অপুষ্টির শিকার।[২৮১] খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তা এক গবেষণামূলক জরীপে[২৮২] ফুটে উঠে। গ্রাম ও শহরের মোট ১২৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ৬৪ জন মনে করে তাদের মা খাবারের সময় ভালো অংশ দেয় ছেলেদেরকে; যা শতকরা ৫১.৬ ভাগ। মাত্র ১৭ জন উত্তরদাতা মনে করে, তাদের মা মেয়েদেরকে খাবারের ভালো অংশ দেয়, যা শতকরা ১৩.৭ ভাগ। আর ৪৩ জন মনে করেন যে, খাবারের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। গ্রামের মধ্যে এই বৈষম্য অপেক্ষাকৃত বেশি। গ্রামের ছাত্রীদের মধ্যে ৩২ জন (৫৬.১%) মনে করে মা খাবারের ক্ষেত্রে ছেলেদের অগ্রাধিকার দেয়; যেখানে শহরে ৩২ জন তথা ৪৭.৮% ভাগ। খাবারে ছেলেদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি মা-বাবারাও স্বীকার করেন। ১০০ জন মাতা-পিতার মধ্যে ৩৮ জন (৩৮.০%) মনে করেন খাবার পরিবেশনে ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান অংশ দেয়া হয়। ২৩ জন (২৩%) মনে করেন ছেলেদেরকে বেশি ও ভালো অংশ দেয়া হয়।[২৮৩]

স্বাস্থ্য

মেয়েরা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয়। অধিকাংশ মেয়েরা ঝাঁড়ফুঁক, দোয়া-তাবিজ, কবিরাজি অর্থাৎ সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে।[২৮৪] স্বাস্থ্যসেবায় মেয়েদেরকে যে গুরুত্ব কম দেয়া হয় তা এক গবেষণা জরীপে ফুটে ওঠে। ১২৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭৯ জন (৬৩.২%) শারীরিক বিশেষ অসুস্থতায় (রজ:স্রাবে) ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করায়। ২৭ জন (২১.৬%) কষ্ট হলেও চিকিৎসা করায় না। ১৯ জন (১৫.২%) এখনও সনাতনী চিকিৎসা গ্রহণ করে। যেমন-ঝাঁড়ফুঁক, ফকির, কবিরাজি চিকিৎসা ইত্যাদি। এদের সংখ্যা গ্রামে বেশি; গ্রামে ১২ জন (২১.১%) যা শহরে মাত্র ৭ জন (১০.৩%)। শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে মা-বাবা কার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন-এ প্রশ্নে ১২৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪ জন (১১.১%) মনে করেন মা-বাবা মেয়েদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। ৮২ জন (৬৫.১%) মনে করেন মা বাবা উভয়ের অসুস্থতায় গুরুত্ব দেন; তবে ৩০ জন (২৩.৮৭%) ছাত্রী মনে করে মা-বাবা এখনও ছেলেদের অসুস্থতার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। ৯৭ জন মাতা-পিতার মধ্যে ২০ জন (২০.৬%) মনে করেন তারা মেয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন, ৪৮ জন (৪৯.৫%) মনে করেন সকলের প্রতি অসুস্থতার সময় সমান গুরুত্ব দেন। তবে ২৯ জন (২৯.৯%) মনে করেন ছেলেদের অসুস্থতায়ই গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি।[২৮৫] নারীর চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হলেও মেয়েদের

---

[২৭৯]. খাদিজা খাতুন, লতিফা আকন্দ, জাহানারা হক, শওকত আরা হোসেন এবং ফারজানা নাঈম সম্পাদিত, **নারী ও উন্নয়ন : প্রসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, (ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫), পৃ: ১১১।

[২৮০]. প্রাগুক্ত।

[২৮১]. প্রাগুক্ত।

[২৮২]. মেয়েশিশুরা যে বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার, সেসব যে শুধু স্বেচ্ছাকৃত তা নয় বরং অনেকগুলোই অনিচ্ছাকৃত ও অবজ্ঞার কারণে ঘটে থাকে। পরিবার, সমাজ-সংস্কৃতিতে মেয়ে-শিশুদের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক মনোভাব ও প্রবণতা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে ৬৫ কিলোমিটার দুরত্বে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার দহগ্রাম এবং ঢাকা জেলার রায়ের বাজার এলাকার কতিপয় পরিবারের উপর গবেষণা জরিপ চালানো হয়। গ্রাম ও শহরের শূণ্য থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ে-শিশু এবং সন্তান আছে এমন পিতা-মাতাকে বেছে নেয়া হয়। গবেষণার সুবিধার্থে হাইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের লক্ষ্যভুক্ত করা হয়। যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় তাদের ৪৫.৭% গ্রামের এবং ৫৪.৩% শহরের অধিবাসী। (আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯)।

[২৮৩]. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

[২৮৪]. সম্পাদনায়: সালেহউদ্দীন আহমেদ, মুল: গোলাম সাত্তার, সিরাজ হোসেন খান, সাহান শরীফ আহামেদ, **নির্যাস খন্ড-১**, (ঢাকা: গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্রাক, ১৯৯৫), পৃ: ৬৩।

[২৮৫]. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

চাইতে দ্বিগুণেরও অধিক ছেলেদেরকে চিকিৎসাকেন্দ্রে আনা হয় এবং মেয়েদের তুলনায় অনেক ঘন ঘন পুরুষদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৮৬]

পরিবারে পুরুষদের খাদ্য ঘাটতি যেখানে ১৯.৬%, সেকানে মেয়েদের খাদ্য ঘাটতি ২২.%।[২৮৭] পুরুষের দৈনিক ক্যালোরি ও আমিষ গ্রহণ যেখানে ১৯২৭ কিলোক্যালোরী ও ৪১.৪ গ্রাম; মহিলাদের সেখানে ১৫৯৯ ও ৩২.৭। ক্যালোরি ও আমিষ-ঘাটতির জন্যে মেয়ে-শিশু, ছেলে-শিশুদের তুলনায় অপুষ্টির শিকার হয়, যা থেকে শারীরিক অসুস্থতা এবং দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। ইউএনডিপি-র ১৯৯৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে যেখানে ৫.০% ছেলে অপুষ্টিতে ভোগে সেখানে ১৪.০% মেয়ে অপুষ্টিতে ভোগে।[২৮৮] কিশোরী মায়েদের সন্তান-প্রসবকালে মারা যাওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি থাকে। যেসব কিশোরীর বয়স ১৫ বছর বা বেশী তাদের সন্তান প্রসবকালে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ২০ বছর বয়সী মহিলাদের তুলনায় দ্বিগুণ; আর যেসব মেয়ের বয়স ১৫ বছরের নিচে তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি পাঁচগুণ বেশি। বাংলাদেশসহ ৫৪টি দেশে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনের বেশি মহিলা প্রথম সন্তানের মা হচ্ছে বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগে।[২৮৯]

শিক্ষা

বর্তমানে বাংলাদেশে এখনও ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা শিক্ষালাভের কম সুযোগ পায়। কারণ এখনও অনেক পিতামাতার ধারণা মেয়েকে লেখাপড়া করালে বিয়ের পর সে স্বামীর ঘরে চলে যাবে। আর ছেলে হল বংশের প্রদীপ তাই মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের শিক্ষার প্রতি তারা বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এক গবেষণা জরীপে ১২৯ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২০ (১৫.৫%) মনে করে, পিতা-মাতা তাদের পড়ালেখায় গুরুত্ব দেয়; ৬৯ জন (৫৩.৫%) মনে করে পিতা-মাতা সকল সন্তানের পড়ালেখায় সমানভাবে গুরুত্ব দেয়। ৪০ জন (৩১.০%) মনে করে পিতা-মাতা ছেলেদের পড়ালেখায় বেশি গুরুত্ব দেয়। অন্য এক জরীপে 'ছেলে ও মেয়েকে কতটুকু লেখাপড়া করাতে চান?' এরূপ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯.৫ ভাগ পিতামাতা মেয়েদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করাতে চান; যা ছেলেদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.৪%। মেয়েদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করাতে চান শতকরা ৩৪.৫ ভাগ; যা ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১.৪%। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে চান শতকরা ৫৬.০ ভাগ পিতা-মাতা; আর ছেলেদেরকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান শতকরা ৭৬.২ ভাগ পিতা-মাতা। কেন লেখাপড়া করাতে চান?– এর উত্তরে মেয়েদের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৯.৫ ভাগ বলেন, ভালো বিয়ে দেয়ার জন্য; যা ছেলেদের ক্ষেত্রে মাত্র ১.৫%। ভবিষ্যতে নিজের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারবে এজন্যে মেয়েদের লেখাপড়া করাতে ইচ্ছুক ৮.৩% ভাগ, যা ছেলেদের ক্ষেত্রে মাত্র ৬.০%। মানুষ হয়ে ভালোভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে-এজন্যে মেয়েদের লেখাপড়ার পক্ষপাতী মাত্র ৩২.১% পিতা-মাতা; যা ছেলেদের ক্ষেত্রে ৯২.৫%। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ পিতা-মাতাই ছেলেদেরকে ভবিষ্যতে কর্মজীবনে ভালো করার ইচ্ছায় লেখাপড়া করাতে চান। বস্তুত, এজন্যেই ছেলে ও মেয়েদের লেখাপড়ায় পার্থক্য হয়ে থাকে। মেয়েদেরকে কর্মজীবনে প্রবেশের লক্ষ্যে লেখাপড়া করাতে ইচ্ছুক পিতা-মাতার মধ্যে মাত্র ১৩.৬% গ্রামের; যা শহরের ক্ষেত্রে ৫২.৫% ভাগ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে; যা ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ায় বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে।[২৯০]

পোশাক-পরিচ্ছেদ

ফ্যাশন, আর্থিক সামর্থ্য, ধর্ম ও সমাজ বিবেচনা করেই দেশে পোশাক পরার বিধান রয়েছে। আর এজন্যেই ছেলে-মেয়ের পোশাক-পরিচ্ছদে তারতম্য ঘটে। পোশাক-পরিচ্ছদে মেয়েদের রুচি-অরুচি কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। ছোটবেলা থেকেই পিতা-মাতা নিজেদের রুচি-পছন্দ অনুযায়ী পোশাক ক্রয় করে থাকে।

---

[২৮৬]. হাসিনা আহমেদ, **বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ**, (ঢাকাঃ সনিকে, ১৯৮৯), পৃঃ ১৩।

[২৮৭]. খাদিজা খাতুন, লতিফা আকন্দ, জাহানারা হক, শওকত আরা হোসেন এবং ফারজানা নাঈম সম্পাদিত, **নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।

[২৮৮]. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।

[২৮৯]. **The Progress of Nations 1999**, UNICEF, (Bangladesh 2000), p: 17.

[২৯০]. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শতকরা ৩১.২ ভাগ ছাত্রীর পিতা-মাতা নিজেদের পছন্দে মেয়েদের জন্যে পোশাক ক্রয় করেন। অর্থাৎ তারা মেয়েদেরকে নিজের পছন্দমতো পোশাক পরাতে চাই। অপরদিকে ৩০ জন মাতা-পিতা (৩০.৯%) মনে করেন জামা, কাপড়, জুতা ইত্যাদি কেনায় ছেলেদের বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়; ২৭ জন (২৭.৮%) মনে করেন মেয়েদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়; আর ৪০ জন তথা ৪১.২% মনে করেন যে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমানভাবে গুরুত্ব দেন।[২৯১]

বাইরে চলাফেরা

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মেয়েরা এখন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মতো পুরোপুরি অবরোধবাসিনী নয়। তবুও একজন ছেলে যেভাবে পাড়া-মহল্লায়, গ্রামে-হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতে পারে, একটি মেয়ে কি সেভাবে পারে না; বা তাকে বেড়াতে দেয়া হয় না। সমীক্ষায় দেখা যায়, ১২৮ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২৬ জন (২০.৩%) বলেছে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় ছেলেদের সমান সুযোগ পায়। আর ১০২ জন (৭৯.২%) বলেছে যে, তারা ছেলেদের সমান সুযোগ পায় না। মেয়েদের চলাফেরায় বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও খারাপ। যেখানে শহরে শতকরা ৭২.৫ ভাগ চলাফেরার সুযোগ কম পায়, সেখানে গ্রামে এ হার ৮৮.১ ভাগ।[২৯২]

ঘরের বাইরে বেড়াতে যাওয়া ঘোরাফেরা করা, রাস্তাঘাটে হাঁটা, বাজারে যাওয়া এসব যেন ছেলেদের জন্যই। আর যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ বৈষম্যের ফলে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যেই এ বোধ জন্মেছে যে, মেয়েরা ঘরে থাকবে, ছেলেরা বাইরে যাবে। পিতা-মাতারা মনে করেন, ছোটবেলায় বাইরে মেয়েরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফিরা করলে বড় হলে উক্ত অভ্যাস থেকে যাবে, যা মান-সম্মানের জন্য ক্ষতিকারক হবে। তাই তারা চান ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা ঘরে থাকার অভ্যাস করুক। সে জন্য মেয়েদের উপর চলাফেরায় নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় যে ছেলেরা বেশি সুযোগ পায়, তা মাতা-পিতার মতামত থেকেও বুঝা যায়। তাছাড়া নিরাপত্তার অভাববোধ থেকেও মেয়েদের কম বাইরে যেতে দেয়া হয়। ৯৮ জন মাতা-পিতার মধ্যে ১২ জন (১২.২%) মনে করেন মেয়েরা সুযোগ পায়, ১৪ জন (১৪.৩%) মনে করেন উভয়ে সমান সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে ৭২ জন অর্থাৎ শতকরা ৭৩.৫ ভাগ মনে করেন ছেলেরাই আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় সুযোগ বেশি পেয়ে থাকি।[২৯৩]

সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে পরিবারের সকল কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। পরিবারের সকল সম্পদের মালিকও পুরুষ। সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই ধারণা সর্বত্র বিরাজমান যে পুরুষরাই শ্রেষ্ঠ, নারী-পুরুষের অধীন, নারী অবুঝ। সিমোন দ্য, বোভোয়ার[২৯৪] নারীকে 'চিরশিশু' বলে মত প্রকাশ করেছেন; যার মানে হল এমন একটা সম্প্রদায় বা জাতি, যাকে মনে করা হয় অবুঝ, অপরিপক্ব, নিজেদের ভালোমন্দ নিজেরা মূল্যায়ন করতে সক্ষম নয়। শিশুরা যেমন কল্যাণ-অকল্যাণ বিশ্লেষণ করে সঠিকটি নিরূপণ করার ক্ষমতা রাখে না; মাতা-পিতা ও পরিবারের বড়রাই তাদের জন্য কোনটি কল্যাণ কোনটি অকল্যাণ তা নির্বাচন করে দেন। তাই নারী কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার সামর্থ্য ও ক্ষমতা রাখে না। প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদেরকেই যেখানে চিরশিশু বা অনন্তকালের শিশু বলা হয়েছে সেখানে মেয়ে শিশুরা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। পিতার অবর্তমানে ছেলেরাই সংসারের কর্তা। আর তাই পরিবারের কোনো বিষয়ে মতামত প্রদান কিংবা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন কোনো ক্ষেত্রেই মেয়ে-শিশুর অংশগ্রহণ থাকে না।[২৯৫]

---

২৯১. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫১।
২৯২. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১-৫২।
২৯৩. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।
২৯৪. বোভোয়ার, সিমোন দ্য, **দি সেকেন্ড সেক্স**, অনুবাদ- হুমায়ন আজাদ, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃঃ ৩২৮।
২৯৫. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

খেলাধুলা ও বিনোদন

বাংলাদেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে পরিবারের অনেক প্রভাব রয়েছে। পিতা-মাতারা খেলাধুলাকে সন্তানদের লেখা-পড়ার অন্তরায় হিসেবে মনে করেন। অধিকাংশ শিশুদের ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা চান খেলাধুলার মনোনিবেশ না করে তাঁর সন্তান লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করুক। সাম্প্রতিককালে খেলাধুলায় ছেলেদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ততবেশি নয়। গবেষণায় দেখা যায়, ১২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৮ জন (৬.৩%) মনে করে খেলাধুলায়, টিভি দেখাসহ বিভিন্ন বিনোদনে মেয়েরা বেশি সুযোগ পায় এবং ৩০ জন (২৩.৬%) মনে করে উভয়ে সমান সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে ৮৯ জন (৭০.১%) মনে করে ছেলেরাই খেলাধুলা ও টিভি-দেখাসহ বিভিন্ন বিনোদনের ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পায়। বিনোদনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তা শহরের তুলনায় গ্রামে আরও প্রকট। যেখানে শহরে ছেলেরা সুযোগ পায় ৬৪.৩%, সেখানে গ্রামে ছেলেরা সুযোগ পায় ৭৭.২ শতাংশ।[২৯৬]

বাল্যবিবাহ

বিবাহ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবনের একটি আনন্দঘন উৎসব। কিন্তু বিবাহটি যদি হয় বাল্যবিবাহ[২৯৭] তাহলে সেখানে উৎসবের পরিবর্তে ডেকে আনে সর্বনাশা করুন পরিণতি। বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলের বেলায় প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হয় ২১ বছর ও মেয়ের বেলায় ১৮ বছর। এ বয়সের আগে বিয়ে দিলে আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যারা কম বয়সে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দেবে তাদের সকলেই শাস্তি ভোগ করবে। তারপরও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইনের দৃষ্টিতে বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও বাংলাদেশের সমাজে তা বিভিন্নভাবে প্রচলিত আছে। ইউনিসেফ পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, এ দেশের শতকরা ৪৮ শতাংশ মেয়েদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয়। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের ৫ শতাংশ বিবাহিত। প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশী মেয়ে ১৫ বছর পার হওয়ার আগেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেয় এবং ১০০ জন মায়ের মধ্যে ১২ জনই সন্তান প্রসব করে অপরিণত বয়সে।

বাংলাদেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স কম। ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সী ২জন মেয়ের মধ্যে ১ জন এবং ২০ জন ছেলের মধ্যে ১ জন বিবাহিত। এক্ষত্রেও ছেলে ও মেয়ের মধ্যে চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ৫০ শতাংশ মেয়ের বয়স ১৮ বছর হওয়ার পূর্বেই বিয়ে হয়ে যায়। এদের মধ্যে দুই পঞ্চমাংশ ১৭ বছরের পূর্বেই গর্ভধারণ করে। এদেশের ২০ শতাংশ মেয়ে ১৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই 'মা' হয়। ইউনিসেফ পরিচালিত অন্য এক জরীপে দেখা গেছে যে, ১৯৭৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ৬২ লাখ ৪৩ হাজার ৩ শত মেয়েশিশুর রেজিস্ট্রেশনবিহীন এবং যৌতুকসহ বিবাহের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ৩ লাখ ১২ হাজার ১শত ৬৫ জনের বয়স ১৪ বছরের বেশী নয়। আদশুমারী অনুসারে ১৯৬০ সালে বাল্যবিবাহের হার ছিল ৩২ শতাংশ, ১৯৯০ সালে এ হার কমে দাড়ায় ৩০ শতাংশে। সরকারী পরিসংখ্যান মতে, ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শতকরা ৫ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ৪ শতাংশ শিশু নারী বিবাহিত।[২৯৮] ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে ছেলেদের বিয়ের গড় বয়স ছিল ২২.৯৮ মেয়েদের বয়স ছিল ১৩.৯, ১৯৭৪ সালে ছেলেদের ২৪.৯, মেয়েদের ১৬.৫, ১৯৮১

---

[২৯৬]. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪-৫৫ ।

[২৯৭]. ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে বাল্যবিবাহ বলতে ঐ বিবাহকে বোঝায় যেখানে বর ও কনে উভয়ে শিশু। অর্থাৎ বাল্যকালে বা নাবালক বয়সে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিয়ে হলে সেটাকেই বাল্যবিবাহ বলা হয়। বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংশোধন করে ছেলেদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ২১ বছর এবং মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়। (আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩; চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১)।

[২৯৮]. বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মেয়েরই বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের কম বয়সে। বিশ্বের ৫৩টি দেশ থেকে পাওয়া উপাত্তে দেখা গেছে বাল্যবিবাহের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। অতি সম্প্রতি এক জরীপে জানা যায় যে, বাংলাদেশের এই বাল্যবিবাহের হার এখনো বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে। (বিডিএইচএস ২০০৫; চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২)।

Dhaka University Institutional Repository

সালে ছেলেদের ২৫.৬, মেয়েদের ১৭.৮ এবং ১৯৯০ সালে ছেলেদের ২৫.১, মেয়েদের ১৮.২।[২৯৯] এ পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের বিশেষ করে মেয়েদের বাল্য বিবাহের চিত্রই ফুটে ওঠে। যদিও নব্বই দশক থেকে মেয়েদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধি পায়। ঐ পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় ছেলেদের সর্বোচ্চ বিয়ের হার ২৫-২৯ বছর; মেয়েদের হল ১৫-১৯ বছর।[৩০০] বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন থাকলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা ও অসচেতনতার কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতা উর্ধ্বমুখী।[৩০১]

পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায়, শিক্ষা নেই এমন নারীদের বিবাহের বয়স ১৫ বছরের নিচে। মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছালে বিবাহের গড় বয়স ২০ বছরে গিয়ে দাঁড়ায়।[৩০২] বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র ১৫.০ ভাগ মেয়ে-শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।[৩০৩] অর্থাৎ শতকরা ৮৫ ভাগ মেয়ে-শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায় না; আর এদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিয়ের বয়স ১৫ বছরের নিচে। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ব্যাপকহারে প্রচলিত।[৩০৪] ইউনিসেফ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালে কয়েকটি দেশে ১৩ কোটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়; এদের মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ মেয়েশিশু। অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি বাল্যবিবাহকে এর উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩০৫]

শিশু নারীর প্রতি বৈষম্যের প্রভাব

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিণতিই হল মেয়ে-শিশুর প্রতি সামাজিক বৈষম্য। পরিবারে মেয়ে-শিশুরা নানাভাবে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পোশাক-পরিচ্ছদে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে; এবং চলাফেরায়, খেলাধুলায়, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পক্ষপাতদুষ্ট রীতি-নীতি, বিচার-সালিশের মাধ্যমে মেয়ে-শিশুরা চলাফেরায়, খেলাধূলায়, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বে একচেটিয়া প্রাধান্য পুরুষের থাকায় তারা শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। আর রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও শুধু নারী হয়ে জন্ম নেয়ার কারণে নারীরা আইনগত ভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, নায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য এবং বৈষম্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ কী ধরনের প্রভাব ফেলছে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

---

২৯৯. খাদিজা খাতুন, লতিফা আকন্দ, জাহানারা হক, শওকত আরা হোসেন এবং ফারজানা নাঈম সম্পাদিত, **নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, (ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫), পৃঃ ১০।

৩০০. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১০।

৩০১. ২০০৪ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের মেহেরপুর জেলায় ৯ মাসে অর্ধ শতাধিক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর বিয়ে হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪র্থ কিংবা ৫ম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রীদের অভিভাবকরা মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে ৭০ ভাগের বিয়ে হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বেসরকারী সংগঠন জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, জয়পুরহাট জেলাতেই শতকরা ৮০ ভাগের বেশী বাল্যবিবাহ হচ্ছে। শুধু মেহেরপুর আর জয়পুরহাট নয় বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলাতেই বাল্যবিবাহের আধিক্য সম্পর্কে সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে জানা যায়। (চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩)।

৩০২. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৩০৩. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

৩০৪. **বাল্যবিবাহের কুফলঃ** বাল্যবিবাহের ফলে অল্পবয়সে মা হয় বলে নারীর শারীরিক পূর্ণতা আসে না এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এছাড়া মানসিক পরিপূর্ণতা আসে না বলে স্বামী, শাশুড়িকে বুঝে চলতে পারে না। এতে উভয়বিধ কারণে তার উপর মানসিক নির্যাতন, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও চলে। ফলে তালাক, আত্মহত্যাসহ নানারকম অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে থাকে। (আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩)।

৩০৫. চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু নির্যাতন

মেয়েরা পরিবার-সমাজে অধঃস্তন মর্যাদার অধিকারী; তারা পুরুষ কর্তৃক, সমাজ কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত। এরূপ অধঃস্তনতা, শোষণ-বঞ্চনার কারণে নারীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি কণ্যাভ্রূণ হত্যা, মেয়ে-শিশু হত্যাসহ নানান অমানবিক নির্যাতনও পরিদৃষ্ট হয় বিভিন্ন সমাজে। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস, কোথাও জাত্যাভিমান, কিংবা কোথাও বিবাহের সম্ভাব্য সংকট থেকে পরিত্রাণের আশায় বা কোথাও পারিবারিক, সামাজিক রীতি অনুসরণের মাধ্যমে কন্যা শিশুর প্রতি অমানবিক নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩০৬] যা নিম্নরূপঃ

কন্যাভ্রুণ হত্যাঃ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে সভ্যতা একদিকে যেমন সুখ-শান্তি সমৃদ্ধিময় হয়ে উঠেছে, অপরদিকে মানুষের হিংস্রতাও চরম আকার ধারণ করছে। আধুনিক কালে আল্ট্রাসনোগ্রাফি মানবদেহের রোগ সনাক্তকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞানের এ প্রযুক্তির মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান ও তার লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়। এর ফলে কন্যাসন্তান চান না এমন পিতা-মাতারা সন্তান ভূমিষ্ঠের আগেই কন্যাভ্রূণ বিনষ্ট করে ফেলছেন।[৩০৭] বিশ শতকের আশির দশকে সামাজিক-আর্থিক কারণে ভ্রূণ হত্যার বিষয়টি শহরাঞ্চলে শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তা এখন ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রামাঞ্চলেও আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে প্রায় সকল স্তরের মধ্যে গর্ভস্থ্য কন্যাভ্রূণ বিনষ্টের ঘটনা ঘটে চলছে।

যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানিঃ বর্তমান সমাজে প্রতিনিয়ত মেয়েরা বিভিন্নভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শুধু মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণেই তারা এ ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। মেয়ে-শিশুরা যেসকল ধরণের যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তা হলোঃ ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, পাচার ও কেনাবেচা ইত্যাদি।

নারী শিশুদের প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে চলাফেরায় তিরস্কার, উপহাস করা, শিস দেয়া, ছলে-বলে-কৌশলে নগ্নছবি তুলে নগদ টাকা আদায়, বিয়ে করতে বা অন্য কোন কাজ করতে বাধ্য করাসহ নানাবিধ নিপীড়ন-হয়রানির শিকার হতে হয়। বাংলাদেশে শতকরা ৬৭.৭ ভাগ ছাত্রী কোনো না কোনোভাবে সহপাঠী দ্বারা যৌন হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। শতকরা ৭৮.৯ ভাগ ছাত্রী রাস্তাঘাটে বখাটে ছেলেদের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়ে থাকে।[৩০৮]

---

৩০৬. খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গ্রীক নৃপতি সোলোন আইন করে পিতামাতাকে শিশুহত্যার অনুমতি দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত সমরনায়ক কেইয়াস মেরিয়াস ঘোষণা করেছিলেন, তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করলে নিজ শিশুকন্যাকে দেবতার সম্মুখে বলি দেবেন। রোম সম্রাট প্রথম ভ্যালেন্টিনিয়ান বিশ্বের প্রথম নৃপতি হিসেবে গণ্য, যিনি শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করে আইন প্রবর্তন করেছিলেন। আবার ৩৭৪ খ্রীঃ শিশুহত্যার শাস্তি ছিল মৃত্যু। ফ্রান্সে শার্লেমান (৭৪২-৮১৪ খ্রীঃ) শিশুহত্যার অপরাধে মৃত্যুদন্ডের বিধান চালু করেন। পৌত্তলিক আরবেরা তাদের শিশুকন্যাদের জীবন্ত কবর দিত। নিউজিল্যান্ডে জন্মমাত্র মা শিশুকন্যার নাক টিপে হত্যা করত। চীনে খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় শিশুকন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। অনেকে কন্যাকে দাসী হিসেবে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিত। ১৮৩৮ সালে ক্যান্টেন প্রদেশের শাসনকর্তা শিশুকন্যা হত্যার প্রতিরোধে হুকুম জারি করেন। ভারতে আদিকাল থেকেই শিশুকন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। দাক্ষিণাত্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে তথা সমগ্র আর্যাবর্তে শিশুকন্যার হত্যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। অভীদাস বলেন, বাংলার অঞ্চলের মানুষেরা দেবতার কাছে মানত রক্ষার্থে গঙ্গা বা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী' থেকে জানা যায় তিনি শিশুকন্যা হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান করে ফরমান জারি করেছিলেন (১৫২০খ্রীঃ)। এর প্রায় এক শতাব্দী পর অম্বরের রাজা এক শত নয় গুণে গুণান্বিত জয় সিং (দ্বিতীয়) শিশুকন্যা হত্যা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে পণ ও বিবাহের- ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে আদেশ জারি করেছিলেন। তিনি তাঁর আদেশ বলবৎ করতে পারেননি। বিধান প্রবর্তনের অল্পকাল পরেই ২১ সেপ্টেম্বর (১৭৪৩ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইংরেজ শাসন আমলে ১৮১১ সালে এডোয়ার্ড মুরের Hindo Infacticide বই প্রকাশিত হয়। রেভা. জেমস কোগস সতীদাহ, শিশুহত্যা ইত্যাদি মানবতাবিরোধী সামাজিক দুর্যোগের ওপর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই Indians Cries to British Humanity (১৮২৯) লিখেন। তাছাড়া ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের শিশুহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা ও পত্রাবলির বেশ কয়েক খন্ড (১৮১২-১৩, ১৮২৪ ও ১৮২৮) প্রকাশ করে। (অভী দাস, **কন্যা জন্ম কন্যা বিসর্জন**, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, পৃঃ ৭-১১)।

৩০৭. মাহমুদ শামসুল হক, **বাঙালী নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

৩০৮. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ: শিশু নারীর প্রতি সংঘটিত নৃশংসতার মধ্যে ধর্ষণ খুবই ভয়াবহ একটি নির্যাতন। সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণে নারীর জীবনে ধর্ষণ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও নাজুক ব্যাপার। অথচ সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে তা যেন ক্রমেই বেড়ে চলছে। এটা এক ধরণের যৌনবিকৃতি। পুরুষের অসীমাবদ্ধ যৌনলালসা নিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। নিস্পাপ শিশুর অসহায়ত্ব, অবুঝতাকে পুঁজি করে ঘরে-বাইরে পুরুষ তার যৌনলালসা পূরণ করে মনোবৈকল্যের নিবৃত্তি ঘটায়। ৬ মাসের কন্যাসম শিশুটিকেও রেহাই দেয় না।[৩০৯] বিশ শতকের শেষের দিক থেকে ধর্ষণ ও ধর্ষিতা হত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মা-বাবাকে বেঁধে মেয়েকে, চাকরির প্রলোভনে আটকে রেখে, কিংবা কোনো নির্জনস্থানে আটকে রেখে ধর্ষণ কিংবা ছোট শিশুকে ফুসলিয়ে ধর্ষণ কিংবা গণধর্ষণ এখন পত্র-পত্রিকার নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা। ঢাকা শিশু হাসপাতালের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের (CDC) প্রতিবেদনে বলা হয় যে, শিশুরোগীদের ৫ থেকে ৭ ভাগ হল যৌন-নিপীড়নের শিকার, অপরদিকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে যৌন-নিপীড়নের শিকার একটি বা দুইটি শিশু আসে।[৩১০]

১৯৯৯ সালে ৪৬০টি ধর্ষণের ঘটনা প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। যেখানে ২৫৫টি শিশু একক পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিত হয়, ১৪৬টি শিশু গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ২৩টি শিশু ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়।[৩১১] সম্প্রতি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনাও বেড়ে গেছে উদ্বেগজনক হারে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা হল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য যেমন-পুলিশ, বিডিআর,[৩১২] আনসার বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ধর্ষণ। দিনাজপুরের ইয়াসমিন, চট্টগ্রামের সীমা, ঢাকার তানিয়ার মতো শিশু-মেয়েরা আইন রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

অ্যাসিড নিক্ষেপ: মেয়ে-শিশুদের নির্যাতনের নতুন মাত্রা হল অ্যাসিড নিক্ষেপ। গত শতাব্দীর শেষে দুই দশকে মূলত অ্যাসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে মেয়েদের শরীর, মুখ ঝলসে দেয়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা বৃদ্ধি পায়। কু-প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায়, প্রেমের ডাকে সাড়া না দেয়ায় ক্রোধান্বিত পুরুষ অ্যাসিড নিক্ষেপ করে। ১৯৯৭ সালে নারী নির্যাতন বিষয়ক কেসের শ্রেণীবিন্যাস থেকে দেখা যায় ২১২টি অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।[৩১৩] ১৯৯৯ সালে ৭২টি কিশোরী অ্যাসিডদগ্ধ হবার কেস এন্ট্রি হয়।[৩১৪] বাংলাদেশের সামাজিক-সংস্কৃতি বাস্তবতার কারণে অ্যাসিড নিক্ষেপের অধিকাংশ ঘটনার থানায় কেস হয় না।

পাচার ও বেচাকেনা : প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষরা কখনও অর্থের জন্য, কখনও নিজের স্বার্থ আদায়ের জন্য বাঙালি মেয়েদের অন্যের নিকট বিক্রি করত, কিংবা উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করত।[৩১৫] বর্তমান সমাজেও এধারা অব্যাহত আছে এবং বিশ্বব্যাপী নারী-পাচারের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেছে। নারী-ব্যবসায়ী-আন্তর্জাতিক এই চক্রের হিংস্র থাবার শিকার বাঙালী মেয়েরাই বেশী। দেশ-বিদেশের পতিতালয়ের জন্য মেয়ে সংগ্রহ করাই পাচার চক্রের প্রধান কাজ। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের যৌনদাসী, বন্ডেড শ্রম, বারসেবী প্রভৃতি কাজের জন্য বাঙালি মেয়েদের পাচার করা হয়। কত মেয়ে-শিশু পাচার হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায় না। তবে ১৯৯৬ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৬২টি শিশুর মধ্যে ৫৮টি বালিকা পাচার হওয়ার

---

[৩০৯]. জাহানারা হক, **ক্ষমতায়ন**, সংখ্যা-২, সম্পাদক- হামিদা আখতার বেগম, (ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮), পৃ: ৩১।

[৩১০]. **Human Rights in Bangladesh 1999**, (Dhaka: Ain O Salish Kendro (ASK), 2000, p: 115.

[৩১১]. **Human Rights in Bangladesh 1999**, ibid, p: 115.

[৩১২]. বর্তমানে এই বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

[৩১৩].আহাদ উদ্দিন হায়দার, **নারী-শিশু নির্যাতন, প্রতিরোধ ও আইন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**, (খুলনা: রূপান্তর, ১৯৯৮), পৃ: ২১।

[৩১৪]. **Human Rights in Bangladesh 1999**, Loc, cit.

[৩১৫]. চতুর্দশ শতকের শেষভাগে সেন রাজাদের শাসনামলে পর্তুগিজ, হার্মাদ, বর্গি ও মগ দস্যুরা হানা দিয়ে ধরে নিয়ে যেত বাঙালি মেয়েদের। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পূর্ববাংলার ভাটি অঞ্চলে পর্তুগিজ ও আরাকান জলদস্যুরা প্রায়ই লুটতরাজ চালাত। অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে ধরে নিয়ে যেত মেয়েদের, বিশেষত যুবতীদের। (মাহমুদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৬)।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য পাওয়া যায়।[৩১৬] বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি ১৯৯৯ সালে ১১৬ জন শিশুকে পাচারকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে।[৩১৭]

দাঙ্গা-যুদ্ধের শিকার : বিভিন্ন সময় গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ-দাঙ্গা, জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং যুদ্ধে মেয়েরা প্রতিপক্ষের নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, অপদস্থ করা, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার মানসে প্রতিপক্ষের নারী ও মেয়ে শিশুদের আক্রমণ করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে এটি একটি কৌশল হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। ১৯২৬, ১৯৪৬ সালসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় প্রতিপক্ষের নারীদের উপর যৌন-নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে।

শিশু পতিতাবৃত্তি: পতিতালয় পরিচালনাকারীদের নিকট খদ্দের আকৃষ্ট করার জন্যে কিশোরী পতিতা খুবই পছন্দনীয়। আর তাই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেয়ে-শিশুদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রি করে পতিতালয়ে। পতিতালয় ছাড়াও শহরে অনেক ক্ষেত্রে ছোট আকৃতির (মিনি-পতিতালয়) রয়েছে। একশ্রেণীর অর্থলোভী পাষন্ড এ ধরনের পতিতাকেন্দ্রে একাধিক মেয়ে রেখে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। অভিজাত শ্রেণী সাধারণত এসব পতিতাকেন্দ্রের খদ্দের হয়ে থাকে। মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাচালানীরাও এসব কেন্দ্রের খদ্দের। পতিতালয় যে আকারে আর যেভাবেই পরিচালিত হোক না কেন, পতিতাদের সিংহভাগ প্রলোভনে, প্রতারিত হয়ে আসে এবং পতিতা হিসাবে কাজ শুরু করে বা করতে বাধ্য হয়; আর এদের একটা বড় অংশ অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু নারী।

মেয়ে শিশুরা ছোট, দুর্বল, অবলা, অধঃস্তন- পুরুষদের এ ধরনের মনোবৃত্তিই মেয়েদের প্রতি নির্যাতন করতে উদ্বুদ্ধ করে। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, ক্ষমতাবান, বুদ্ধিমান; অতএব তারই সাজে নারীকে শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা শাস্তি দেয়া- এ বোধই নারী-নির্যাতনের জন্য দায়ী। আর এ বোধ জন্মেছে যুগ যুগ ধরে চলমান সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণের জন্য। বৈষম্য-বঞ্চনা আর আচার-আচরণ, রীতি-নীতিই পুরুষকে করেছে ক্ষমতাবান; আর ক্ষমতার বহি:প্রকাশই হল নারী-শিশু-নির্যাতন।

শিশু মৃত্যু

দারিদ্র, অপুষ্টি, চিকিৎসাহীনতা, সামাজিক অসচেতনতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কারণে শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিসেফ এর রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটির কাছাকাছি। এদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ বা পঁচাত্তর লাখ কিশোরী অপুষ্টির শিকার। এই অপুষ্টিতে বেড়ে ওঠা কিশোরীরা বাল্যবিবাহের কারণে নানাবিধ শারিরীক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।[৩১৮] অল্পবয়সে বিবাহ ও সন্তান জন্মদানের কারণে শিশুদের মৃত্যুঝুকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাল্যবিবাহের কারণে শারিরীকভাবে উপযুক্ত হওয়ার পুর্বেই অপরিণত বয়সে যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও সন্তান ধারণের কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প বয়সে বিবাহ ও সন্তান ধারণের কারণে বালিকাবধুদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং সন্তানরাও হয় অপরিপক্ক ও রুগ্ন। ইউনিসেফ এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গর্ভসংক্রান্ত জটিলতায় বাংলাদেশে বছরে প্রতি হাজারে ৫ জন মা মৃত্যুবরণ করে।[৩১৯] এছাড়াও জন্মের সময় প্রতি হাজারে ৯০ জন শিশু মারা যায় এবং একমাস বয়সী ৭০ জন শিশু মারা যায়। অথচ উন্নত দেশে এই অবস্থায় ১০ হাজারে ১ জন শিশু মারা যায়। ইউনিসেফ প্রকাশিত আর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেয়েদের বাল্যবিবাহের কারণে বছরে ২ লাখ শিশুর জন্ম হয় অল্প ওজন ও মারাত্মক অপুষ্টি

---

৩১৬. **Human Rights in Bangladesh 1999**, Loc, cit. p: 117.

৩১৭. **Human Rights in Bangladesh 1999**, Loc, cit. p: 117.

৩১৮. চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মেয়েদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সন্তান ধারণের জন্য সবচেয়ে সর্বনিম্ন উপযুক্ত বয়সসীমা হচ্ছে ১৮ বছর। এর পূর্বে মেয়েদের গর্ভধারণ করলে তাদের কোমরের হাড় বিকশিত হতে পারে না। (চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪)।

৩১৯. জাপানে মাতৃত্বজনিত কারণে প্রতি লাখে ১ জন নারী মৃত্যুবরণ করে। (চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে।[৩২০] সুতরাং বাল্যবিবাহের কারণে শিশু মা ও ভুমিষ্ঠ্য শিশু উভয়ের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। বাল্যবিবাহের কারণে শিশুদের জীবনে তাৎক্ষনিক নেতিবাচক প্রভাবের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী কুফল অনেক গভীর। বাল্যবিবাহ একটি মেয়ের জীবনে গভীর মানসিক, শারিরীক ও আবেগগত ক্ষতের সৃষ্টি করে, যা তার সারাজীবনের সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিশুদের বিশেষ করে মেয়েশিশুদের ব্যক্তিগত বিকাশ ও উন্নয়ন ও বিকাশের পথ বন্ধ করে দেয় বাল্যবিবাহ।[৩২১]

মানসিক বিকাশ

ভবিষ্যতে একজন ব্যক্তি হিসাবে পরিবারের সদস্য হিসাবে ও একজন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর কতগুলো ন্যূনতম দক্ষতা (Life skils) অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। এ দক্ষতা মানসিক ও সামাজিক। মানসিক দক্ষতার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্মচিন্তা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রভৃতি। সামাজিক দক্ষতাগুলোর মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা, জেদ ও আবেগের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো ও সুসম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। এক গবেষণায় দেখা যায়[৩২২] স্কুলের ছেলে-মেয়েরা যতই উপরের শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই তারা জীবন-দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। অর্থাৎ উপরের ক্লাসে ওঠার সাথে সাথে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে মেয়েরা চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যতই উপরের শ্রেণীতে ওঠে ততই মেয়েদের সংখ্যা কমতে থাকে। আর তাই মেয়েরা মানসিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। স্বাভাবিক চলাফেরায় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে মেয়েরা অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না; যা সামাজিক দক্ষতা ও মানসিক বিকাশের অন্তরায়। এসব অন্তরায় নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।[৩২৩] আর একজন সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যে যে মানসিক বিকাশের প্রয়োজন তা হয় না।

পরিবার ও সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর অবস্থান

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শারিরীক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ক্রমান্বয়ে সে অসহায়ত্ব কাটিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিবার ও সমাজে তার প্রতি বৈষম্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বরং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার প্রতি বৈষম্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হতে হতেই সে শিশু থেকে পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরও তার প্রতি বৈষম্য কমে না বরং বৈষম্যের সাথে নতুন মাত্রা যোগ হয়, তাহল নির্যাতন, বঞ্চনা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সমাজেও নারীর প্রতি চলছে চরম বৈষম্য, নিপীড়ন ও নির্যাতন। পরিবার ও সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর অবস্থান নিম্নরূপ:

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধ

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। যুগ যুগ ধরে পিতৃতন্ত্র এমন এক কাঠামোতে রূপ নিয়েছে, যা নারীকে ক্ষমতাবলয় থেকে করেছে বিচ্ছিন্ন আর পুরুষকে করেছে ক্ষমতাবান। ফলে সমাজ-সংস্কৃতির সকল সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এখন পুরুষের স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার সব অলিতে গলিতে পুরুষের দাপট। এ প্রসঙ্গে নারীবাদী কেইট মিল বলেন, "....This is so because our society like all other historical civilization is a partriarchy, The fact is evident at once

---

৩২০. চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।

৩২১. চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।

৩২২. সম্পাদনায়-হাসান শরীফ আহামেদ, **নির্যাস খন্ড-৩**, (ঢাকা: গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক, ১৯৯৬), পৃ: ৪৫।

৩২৩. আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির আনুকূল্য পাওয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব গঠনের বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান ধাপ হল ব্যক্তির মধ্যে আস্থা (Confidence) সৃষ্টি হওয়া। আস্থা সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষাগত ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন এবং সে যোগ্যতা কাজে লাগানোর সুযোগ অপরিহার্য। এছাড়া মতামত প্রদানের সুযোগ থাকলে এবং সিদ্ধান্ত তৈরিতে অংশগ্রহণ থাকলে ব্যক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবোধ জন্মে, আস্থা তৈরি হয়; যা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক-সংস্কৃতির বঞ্চনার শিকার মেয়েদের মধ্যে তাই ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে সৃষ্টি হয় না। (আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু: সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৩।)

Dhaka University Institutional Repository

if recalls that the military, industry, technologies, universities, science and political office and finance – in sort every avenue of power within the society, including the coercive force of the police, is entirely in male hands."[৩২৪]

পুরুষতন্ত্রের যে বিরাট পাথর হাজার বছর ধরে সমাজের ওপর চেপে আছে তাও একটি ক্ষমতার বহি:প্রকাশ। এই ক্ষমতা অন্যান্য বৈষম্যের মধ্যে নিজের নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি, শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বত্র লিঙ্গ বৈষম্যকে মহিমান্বিত রূপ দিয়েছে। এই পুরুষতন্ত্র সমষ্টিকভাবে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে লিঙ্গ-বৈষম্যের পক্ষে ক্ষমতার বলয় তৈরী করেছে। নারী এর বাইরে পা বাড়ালে সংঘাত সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে যেমন উদ্যত হয় শারিরীক আক্রমণ, তেমনি উদ্যত হয় ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের নামে নির্যাতনের নানাবিধ উপকরণ। কোনো পুরুষ যদি পুরুষতন্ত্রের শৃংখলের বাইরে পা বাড়াতে উদ্যত হয় তাহলে সেও একঘরে হবার উপক্রম হয়, তাকে হাস্যাস্পদ করে তুলবার বহু অস্ত্র জোগান দেয় সামাজিক অধিপতি সংস্কৃতি।[৩২৫] পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীর উৎপাদন ক্ষমতা বা শ্রমশক্তি, নারীর সন্তান-উৎপাদন ক্ষমতা, যৌনজীবন, নারীর গতিশীলতা, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই হল নারীদের প্রতি বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতন, নিস্পেষণের অন্যতম কারণ।

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারী অর্থনৈতিক স্বাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীও সেই মূল্যবোধ ধারণ করে এবং প্রাত্যাহিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায়। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধস্তন ও পুরুষকে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখতে চায়। পুরুষ তার সংসার ও পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূরণে তৈরী করেছে নানারকম মূল্যবোধ। নারীর মূল্যবোধ তৈরীতে এগুলো সূচক হিসেবে কাজ করে। নারীর শিশুবয়সের জন্য খেলনা থেকে শুরু করে তার পোশাক, শিক্ষার বিষয়বস্তু, চলাফেরার ধরণ, কথা বলার ধরণ, পেশা নির্বাচন সবকিছু সম্পর্কেই মূল্যবোধ তৈরী করা হয় এই প্রয়োজন পুরণকে সামনে রেখে। পিতৃতান্ত্রিক আকাংখা পূরণে যে মূল্যবোধ তৈরী করা হয় সেখানেই নারী হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং পুরুষ বিনা নারীর কোন গতি নাই এরুপ ধারণা বিদ্যমান থাকে। তাই জন্ম মাত্রই নিকৃষ্ট ভেবে নারীকে শিশু বয়সেই ছুড়ে দেয়া হয় বৈষম্যমূলক অবস্থানে। আবার এই বৈষম্যকে স্থায়ীকরণ করতে নারী যাতে তা মেনে নেয় সেজন্য বৈষম্যের অনুকুলে তৈরী করা হয় মূল্যবোধ।[৩২৬]

পরনির্ভরশীলতা

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, সমস্যা মোকাবিলা ও সমাধানে নারীর অংশগ্রহণ অপ্রয়োজনীয় ভাবা হয়, যাতে করে নারী নেতৃত্ব প্রদানে পুরুষের মতো অংশীদার না হতে পারে। নারী যেন কোন অবস্থাতেই স্বাবলম্বী হতে না পারে সেজন্য নারীকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা এবং পছন্দমতো পেশা বেছে নিতে দেয়া হয় না। সেই সঙ্গে সম্পদশালী হতেও বাধা প্রদান করা হয়। নারী যেন সম্পদশালী হতে না পারে সেজন্য উত্তরাধীকারী হিসেবে সে যতটুকু সম্পদ পায় ততটুকুও গ্রহণ না করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পদ গ্রহণ করলে সম্মান হানি হবে এই মর্মে অপপ্রচার চালানো হয়। উক্ত অপপ্রচারের তোয়াক্কা না করে কোন নারী যদি উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পদ গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানে তার আপন আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কের ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। এবং সমাজের লোকেরা তাকে নানাভাবে তিরস্কার করতে থাকে। সম্পর্কচ্ছেদ এবং সমাজের লোকের তিরস্কারের ভয়েও অনেক নারী তার উত্তরাধিকারের দাবী উথাপন করে না এবং একপর্যায়ে তারা পিতার সম্পত্তি ভোগ করতে ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায় পরিবার ও সমাজের কারণেই বা তাদের সুবিধার স্বার্থেই নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কোন মূল্যবোধ তৈরী করা হয় না। পরিবার ও সমাজে বিরাজমান

---

৩২৪. Millet, 1969, p: 24-25.

৩২৫. আনু মুহাম্মদ, **নারী, পুরুষ ও সমাজ**, (ঢাকা: সন্দেশ, ১৯৯৭), পৃ: ১২৩-১২৪।

৩২৬. চিত্তরঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, (ঢাকা: জেন্ডার অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কমিউনিকেশন সেন্টার, ২০০৭), পৃ: ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধই নারীকে আর্থিক ও মানসিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখে। ফলে পরনির্ভরশীলতা ও মূল্যবোধের বেড়াজালে ঘুরপাক খেয়ে নারী আরো অধিকারহীন, মর্যাদাহীন, সম্পদহীন ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।[৩২৭]

বিবাহ

পারিবারিক আইনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিয়ে। মেয়েদের অবস্থান নির্ধারণে বিয়ে ব্যবস্থা তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সংঘটিত বিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এক্ষেত্রে মেয়েদের কোন মতামত গ্রহণ করা হয় না। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিয়ে হচ্ছে চুক্তি বিশেষ। বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যেমনঃ বয়স, সম্মতি, দেনমোহর, কমপক্ষে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সাক্ষী, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি।[৩২৮] মুসলিম পারিবারিক আইনে বিয়ে ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বয়সঃ বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলের বেলায় প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হয় ২১ বছর ও মেয়ের বেলায় ১৮ বছর। এ বয়সের আগে বিয়ে দিলে আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যারা কম বয়সে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দেবে তাদের সবারই শাস্তি হবে। বাংলাদেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বিয়ের বয়স কম। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের বয়সের হার ছিল ২২.৯৮, মেয়েদের ছিল ১৩.৯, ১৯৭৪ সালে ছেলেদের ২৪.৯, মেয়েদের ১৬.৫, ১৯৮১ সালে ছেলেদের ২৫.৬, মেয়েদের ১৭.৮ এবং ১৯৯০ সালে ছেলেদের ২৫.১, মেয়েদের ১৮.২। এ পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের বিশেষ করে মেয়েদের বাল্য বিবাহের চিত্রই ফুটে ওঠে। যদিও নব্বই দশক থেকে মেয়েদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধি পায়। পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় ছেলেদের সর্বোচ্চ বিয়ের হার ২৫-২৯ বছর; মেয়েদের হল ১৫-১৯ বছর।[৩২৯]

পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায়, শিক্ষা নেই এমন নারীদের বিবাহের বয়স ১৫ বছরের নিচে। মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছালে বিবাহের গড় বয়স ২০ বছরে গিয়ে দাঁড়ায়।[৩৩০] বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র ১৫.০ ভাগ মেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভর্তি হয়।[৩৩১] অর্থাৎ শতকরা ৮৫ ভাগ মেয়ে-শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায় না; আর এদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিয়ের বয়স ১৫ বছরের নিচে। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ এখনও ব্যাপকহারে প্রচলিত।

সম্মতিঃ বিয়েতে ছেলে-মেয়ের সম্মতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বিয়ের দিন বা বিয়ের আসরেই মেয়েদের সম্মতি নেয়া হয়। এ-ধরনের সম্মতি আসলে আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে পূর্বে কিছু জানে না। বিয়ে একটি মেয়ের কাছে সারা জীবনের ব্যাপার, তার সমগ্র জীবনে এর প্রভাব পড়বে। অথচ সাধারণত পিতার ইচ্ছাতে বিয়ের কার্যক্রম স্থির হয় ও সম্পন্ন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিয়ের পূর্বে মেয়েদের সম্ভাব্য জীবনসাথীর সাথে পরিচয় হয় না। মেয়ে যদি কখনও বিয়েতে অসম্মত হয়, তবে ভয় দেখিয়ে, এমনকি মারধোর করে বিয়েতে রাজি করানো হয়ে থাকে। অসম্মতিতে বিয়ে হলে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহজে মেনে নিতে পারে না; এর ফলে দাম্পত্যজীবন সুখকর হয় না। মানসিক অশান্তি দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে শারিরীক নির্যাতন, এমনকি বিয়ে-বিচ্ছেদও ঘটে থাকে।

---

[৩২৭]. চিত্তরঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।
[৩২৮]. **ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
[৩২৯]. খাদিজা খাতুন,লতিফা আকন্দ, জাহানারা হক, শওকত আরা হোসেন এবং ফারজানা নাঈম সম্পাদিত, **নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
[৩৩০]. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
[৩৩১]. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

দেনমোহর: দেনমোহর হল বিয়ে নামক চুক্তির অনুষঙ্গরূপে যে অর্থ বা সম্পত্তি স্বামী স্ত্রীকে দিতে অঙ্গীকার করে থাকে।[৩৩২] দেনমোহর হল স্ত্রীর সম্মানস্বরূপ যে সম্পদ বা অর্থ স্বামী স্ত্রীকে দেয় বা দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। দেনমোহরের টাকা স্ত্রী যে কোন কোন সময় দাবি করতে পারে এবং স্বামী পরিশোধ করতে বাধ্য। অথচ বাস্তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মোহর যথাযথভাবে পরিশোধ করা হয় না। বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় না বলে মোহরের কোন প্রমাণ থাকে না, ফলে পরবর্তীতে মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ এবং তা আদায়ে অনেক ক্ষেত্রে ঝামেলা সৃষ্টি হয়।

বয়স্ক নারী নির্যাতনের ধরণ

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। নারী নির্যাতনের ঘটনা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে লক্ষণীয়ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পারিবারিক পর্যায়ে পরিবারের সদস্যগণের আচরণে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের আচরণে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের আচরণে নারী যে সহিংস নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তাতে মাত্রার তারতম্য থাকলেও একে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। পরিবার শান্তির নীড় এই কথাটি প্রবাদে থাকলেও ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সকল স্তরের নারীই পরিবারে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বিয়ের আগে পিতা-মাতার সংসারে নানা অনুশাসন, বিধি-নিষেধ, শারীরিক নির্যাতন, এমনকি নিকটাত্মীয় কর্তৃক যৌন হয়রানি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে অধিক হারে ঘটছে। বিয়ের পর নারীকে মুখোমুখি হতে হয় নতুন চ্যালেঞ্জের।[৩৩৩]

অধিকাংশ পরিবারে নারী কর্তৃক নারী নির্যাতিত হয়। সেক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা পালন করেন শাশুড়ী ও ননদরূপী নারী। কন্যা সন্তান জন্মদানের কারণেও নারী নির্যাতনের শিকার হয়। পুত্র সন্তান জন্ম না দিতে পারলে স্বামীকে পরিবারের অন্য সদস্যরা দ্বিতীয় বিবাহ দেয়। পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেক নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যে নারী সম্পত্তিহীন তার উপর অত্যাচার ঘটে খুব সামান্য বিষয় নিয়ে। নারীরা পরিবারের সমস্ত গৃহকর্ম করে থাকে। চাকরীজীবি নারী চাকরীও করে আবার গৃহকর্মও করে, আবার সন্তানের সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করাও তার উপর বর্তায়। তারপরও পরিবার ও সমাজে নারীর ত্যাগও অবদান স্বীকৃত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে যৌথ পরিবারে নারীকে শুধু স্বামী নয় তার আত্মীয়-স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখতে ব্যর্থ হলেও গঞ্জনার শিকার হতে হয়। যৌতুক সংক্রান্ত বিষয়ে সহিংসতাই শুধু নয়-ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বামীর যৌন দাবি মেটানো, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার, স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ ও বন্ধ্যাকরণে বাধ্য করা, গর্ভাবস্থায় পরিবারের সদস্যদের অসহযোগী মনোভাব, পুত্র সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা, উপার্জিত সমুদয় অর্থ (কর্মজীবী নারীদের ক্ষেত্রে) পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া, পারিবারিক কোন কাজে স্বামী কিংবা আত্মীয়-স্বজন অসন্তুষ্ট হলে কটুক্তি করাসহ নানা বিষয়ের অবতারণার শিকার হয়ে থাকেন।[৩৩৪]

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা, ছাত্রী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, প্রশিক্ষণের নামে এনজিও প্রতিষ্ঠানে নারী ধর্ষণ ইত্যাদি খবর সাম্প্রতিককালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সাধারনণভাবে মানুষ যা ভাবেনি তা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নারী সহিংসতার বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়েছে। সমাজে পথ চলায় নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ছিনতাইকারীর ভয় ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের আচরণ, চাহনি, অযাচিত ইঙ্গিত, অযাচিত স্পর্শ, কুৎসিত ভাষায় কথা বলা, টিপ্পনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩৩৫]

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে পরিবার ও রাষ্ট্র থেকে নারীকে উদ্বুদ্ধ করা হয় কিংবা চাপ সৃষ্টি করা হয় আবার একই পদ্ধতি গ্রহণের দায়ে মৃত্যুর পর নারীর জানাযা না পড়া ও পরিবারকে একঘরে করার ঘটনাও এ সমাজে ঘটে থাকে। নারীকে প্রলুব্ধ করে ছল-চাতুরী, প্রবঞ্চনা কিংবা বল প্রয়োগে

---

৩৩২. **ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড**, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৬০।

৩৩৩. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২ খ্রীঃ), পৃঃ ১৫৫-১৫৬।

৩৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬।

৩৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

গর্ভবতী করে কিংবা সন্তান জন্মদানের পর পিতৃত্বকে অস্বীকার করে, সমাজের সালিশ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিবাহিত জীবনে সন্তান জন্মদানে ব্যর্থ নারী যেমন পরিবারে ও আত্নীয়-স্বজনের কাছে নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হন-অন্যদিকে একপেশে ফতোয়ার দ্বারা অভিযুক্ত নারীর চুল কেটে দেয়া, মাথা নেড়া করা, জুতা মারা, দোররা মারা, পাথর ছুড়ে মারা তথা সমাজচ্যুতির রায় দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করে তাকে আত্নহননের পথে ঠেলে কিংবা পতিতাবৃত্তির মতো অগ্রহণযোগ্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে।[৩৩৬]

সাম্প্রতিকালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। একসময় কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণকে সমালোচনা করা হলেও বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কর্মজীবী ও শ্রমজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে। যেমন: গার্মেন্টস সেক্টর, নির্মাণ কাজ, অফিস আদালত এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাত ও কারখানার উৎপাদন ইত্যাদি। গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারীর সংখ্যা বেশী হলেও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বৈষম্য ও পুরুষ সহকর্মীদের অমার্জিত আচরণের প্রতিবাদ অনেক ক্ষেত্রেই তারা করতে পারেন না। এভাবে তারা অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হন। এসব সমস্যা নির্মাণ শ্রমিক কিংবা কারখানা শ্রমিকের বেলায়ও প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সকল নারী অফিস আদালতে কাজ করেন তারাও বিভিন্নভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সহকর্মীর দ্বারা যৌন হয়রানি ও অপমানের স্বীকার হয়ে থাকেন।[৩৩৭]

উপরোক্ত সহিংসতা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় কর্ম কান্ডের সাথে ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠী বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশ্রয়ে বিভিন্ন সময়ে নারীর ওপর সহিংস আচরণ করছে। ১৯৯৫ সালে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যাকে নারী সংগঠন ও সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সহিংসতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাতে কাজ করে ফেরার পথে অনেক গার্মেন্টস কর্মী পুলিশ বাহিনীর সদস্য কর্তৃক অযথা হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হন। নিরাপত্তা হেফাজতের নামে থানায় আটকে রেখে নারীর ওপর সহিংস আচরণের ঘটনাও নতুন নয়। সীমা চৌধুরী ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আসামীরা বেকসুর খালাস পেলেও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক সীমা চৌধুরী ধর্ষণের মামলার রায় নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।[৩৩৮]

বাংলাদেশে প্রতিদিনের খবরে সহিংসতার যে ধরণ পাওয়া যায় তা সহিংসতার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। অসংখ্য ঘটনার খবর পত্রিকায় স্থান না হলেও প্রকাশিত ঘটনাগুলো থেকে নারী নির্যাতনের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে গৃহাভ্যন্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, পথ চলায় নারীরা প্রায়শ যে সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছেন তার অনেকটাই অপ্রকাশিত থেকে যায়। এক গবেষণা জরীপে দেখা যায় যে, ৪০% নারী বিয়ের প্রথম মাসের মধ্যেই সহিংসতার শিকার হয়েছেন, কারো কারো ক্ষেত্রে বিয়ের অল্প পরেই তা শুরু হয়েছে। প্রথম তিন মাসের মাঝে আরও ৩০%, চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ১৮% এবং অন্যরা ষষ্ঠ মাস থেকে প্রথম বছরের মাঝেই নিপীড়িত হয়েছেন।"[৩৩৯] ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সংঘটিত নারী সহিংসতার ধরণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধর্ষণ, হত্যা বা খুন, আত্মহত্যা, যৌতুক, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, ফতোয়া ইত্যাদি। এছাড়া নারী পাচার, গৃহ পরিচারিকা নির্যাতন, জোরপূর্বক পতিতা উচ্ছেদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে এবং রাস্তাঘাটে সংঘটিত হয়রানি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে।[৩৪০]

বাংলাদেশের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা তথ্য ১৯৮২-১৯৮৮ সময়কালে বাংলাদেশে নারী সহিংসতার কারণ হিসেবে পারিবারিক বিবাদ, সম্পত্তি সংক্রান্ত ঝগড়া, যৌতুক, প্রেম, স্বামীর পরীকায়া

---

[৩৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬।
[৩৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬-১৫৭।
[৩৩৮]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭।
[৩৩৯]. Roushan Jahan, **Hidden Danger: Women and Family Violence in Bangladesh,** (Dhaka: Women for Women, 1994), p: 68.
[৩৪০]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম অথবা দ্বিতীয় বিয়ে, যৌন সম্বন্ধীয় ঘটনা এবং চরম দারিদ্র্য প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছে। ৭৫০ জনের মাঝে পরিচালিত এই গবেষণা জরীপে দেখা যায়, পারিবারিক বিবাদের শিকার ২১৪ জনের মধ্যে ১৬৩ জন নারী, সম্পত্তি সংক্রান্ত ঝগড়ায় আক্রান্ত ৭৭ জনের মধ্যে ১৫ জন নারী, যৌতুকের স্বীকার ৯৮ জনের মধ্যে ৯৪ জন নারী, প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে সহিংসতার শিকার ১৪ জনের ১২ জন নারী, অবৈধ সম্পর্ক কিংবা দ্বিতীয় বিয়ের কারণে সহিংসতার শিকার ১২ জনের মধ্যে ১১ জন নারী। যৌনতার কারণে সহিংসতার শিকার ১৪ জনের মাঝে ১৩ জন নারী, চরম দারিদ্র্যের কারণে সহিংসতার শিকার ৬ জনের মধ্যে ৫ জন নারী। গবেষণায় ব্যবহৃত অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত সহিংসতার শিকার ৯৫ জনের মধ্যে ৬৯ জনই নারী। এ ছাড়া ১৯৬ টি সহিংস ঘটনার কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখিত কারণসমুহের মধ্যে খুনের শিকার ৪৫৭ জন নারী-পুরুষের মধ্যে নারী ৩২৬ জন, পিটুনি অথবা ছুরিকাহতের ঘটনার শিকার ৩৫ জনের মধ্যে ২৫ জন নারী, ধর্ষনের শিকার হয়েছেন ১০ জনই নারী, এসিড নিক্ষেপের শিকার ১৭ জনের ১৫ জন নারী এবং অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ঘটনায় ৮ জনের মধ্যে ৬ জনই নারী। এ ছাড়াও কারণ উল্লেখিত হয়নি এমন ক্ষেত্রে খুনের শিকার ১৬১ জনের মধ্যে ১০১ জন নারী, পিটুনি অথবা ছুরিকাহতের ঘটনার ১৪ জনই নারী, এসিড নিক্ষেপের ফলে আহতদের ৬ জনই নারী এবং অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ৭ জনই নারী।[৩৪১]

নারী নির্যাতনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল যৌন সংক্রান্ত (১৭.৫%) অর্থনৈতিক (৬৫.৮৩%) শারীরিক (৭৮.৩৩%) এবং মানসিক (৮১.৬৭%)।[৩৪২] ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, “Gender violence is a violence against women that result in phusical mental, sexual coercion on urbitrars deprivation and a violaton of human rights.”[৩৪৩] নিম্নে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র নিম্নরূপঃ ০১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯।[৩৪৪]

সহিংসতার ধরণ	ধর্ষণ	হত্যা	আত্মহত্যা	যৌতুক	অপহরণ	এসিড নিক্ষেপ	ফতোয়া
জানুয়ারী	৫২	২৫	২৭	০৯	০৬	০৩	০২
ফেব্রুয়ারী	৪৮	৪৬	৩০	০৮	১২	০৫	০২
মার্চ	৬২	৫৩	১৪	১২	১৪	১০	০৪
এপ্রিল	৯৮	৫৩	৪৬	১৩	১৫	১১	০২
মে	৬২	৪৫	২০	০৭	১০	০৯	০২
জুন	৫৮	৩০	২৪	১২	১৩	১৪	-
জুলাই	৮১	৪৮	২৮	১৬	০৫	০৮	০২
আগষ্ট	৬০	৪০	২৯	১৪	০৯	১২	-
সেপ্টেম্বর	৬২	৪০	২০	১১	১৯	১১	০২

---

৩৪১. Roushan Jahan, **Hidden Danger: Women and Family Violence in Bangladesh**, Ibid, 1994, p: 53-55.

৩৪২. শিরিন সুলতানা, **বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন**, (ঢাকাঃ এম. এস. এস মনোগ্রাফ, সকগই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮), পৃঃ ২৯৭।

৩৪৩. ড. খালেদা সালাহউদ্দিন, **নারী নির্যাতন ও জাতীয় অঙ্গীকার**, আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্মরণিকা, ১৯৯৯ খ্রীঃ, এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক ও লিঙ্গীয় নির্যাতন (যৌতুক আদায়ে নিয়মিত নারী পাচার, লিঙ্গীয়, বৈষম্য, স্ত্রীকে মারধর করা, নারী কন্যা, শিশু ধর্ষণ, শারীরিক অত্যাচার, যৌন হয়রানী, পতিতা বৃত্তিতে নির্যাতন করা ইত্যাদি) শ্রেণীভুক্ত নারী নির্যাতনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও ঘৃণ্য হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন। কেননা, প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তথা পারিবারিক ব্যবস্থায় পারিবারিক নির্যাতনের শিকার কোন নারীকে আইনী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর এই অবস্থা সমগ্র জীবনব্যাপী চলতে থাকে। (মোঃ নুরুল ইসলাম, **নারীর নিরাপত্তায় বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক আইনঃ একটি পর্যালোচনা**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা- ৬৬, ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রিঃ, পৃঃ ১৩৫)।

৩৪৪. তথ্যসূত্রঃ দি ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক রাইটস (আইডিআর), তথ্য সংরক্ষণ সেল।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর	৭৪	৭২	৬১	২২	১০	০৬	০৬
নভেম্বর	৩৮	৩৮	৩৯	০৮	১০	১০	০১
ডিসেম্বর	৩৫	৪২	৩৬	১০	১০	০৬	০৩
মোট	৭৩০	৫৩২	৩৭৪	১৪২	১৩৩	১০৫	২৬

এছাড়া নিম্নের চিত্র থেকে নারী নির্যাতনের আরও ভয়াবহ রূপ ফুটে ওঠে।[৩৪৫] যেমন:

সময়	ধর্ষণ	এসিড নিক্ষেপ	গুরুতর আহত	অন্যান্য	মোট	নির্যাতিত শিশু
১৯৯৭	১৩৩৬	১১৭	২০৬	৪১৮৪	৫৮৪৩	৪৫৩
১৯৯৮	২৯৫৯	১৩০	২০০	৪০৯৮	৭৩৮৭	৬৭৬
১৯৯৯	৩৫০৪	১২২	২৩৯	৪৮৪৫	৮৭১০	৫৫৯
২০০০	৩১৪০	১২৭	২৯৭	৬৯৭১	১০৫৩৫	৪৪৯
২০০১	৩১৮৯	১৫৩	৩৫১	৯২৫৬	১২৯৫৮	৩৮১
মোট	১৪১২৮	৬৪৯	১২৯৩	২৯৩৬৩	৪৫৪৩৩	২৫১৫

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত নারী নির্যাতনের মোট সংখ্যা হলো:

সাল	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
সংখ্যা	১৩৬৯	৫১৩	১৬৪৫	১৯৪৫	৩১৩১	৫৭৯২	৫৬১৮	৫৯০৮	৬৯২২	৬০৫৪

ধর্ষণ

বাংলাদেশে নব্বই এর দশক থেকে নারী নির্যাতন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে সারাদেশে ৫২৬ জন নারী ধর্ষণের[৩৪৬] শিকার হয়েছে।[৩৪৭] ১৯৯৯ সালে ৭৩০ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৭৩০টি ধর্ষণের মধ্যে ২৭৫ জনকে গণধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। উক্ত বছরে সর্বোচ্চ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এপ্রিলে ৯৮টি এবং সর্বনিম্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ডিসেম্বরে ৩৫টি। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩ বছরের বালিকা থেকে ৫৭ বছর বয়সের বৃদ্ধা পর্যন্ত। ৩ থেকে ১০ বছর বয়সের বালিকাদের ৮৫ জন, ১১ থেকে ২০ বছর বয়সী ১৮২ জন এবং ২১ থেকে উর্ধ্ব পর্যন্ত মোট ১০৬ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে। এছাড়া বাকিদের বয়স জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৪৮৭টি এবং ১৯৯৮ সালে তা ছিল ৮৪৩টি। সার্বিক হিসাবে গড়ে প্রতিদিন ২টি করে ধর্ষণের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে অনেক ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট বা মামলা হয় না। এছাড়াও লোকলজ্জার ভয়ে দাম্পত্য জীবনে ধর্ষণ (Marital rape) এবং নিকটাত্মীয় যাদের

---

[৩৪৫]. মাহমুদ কবীর, **বাংলাদেশের নারী**, (ঢাকা: সূচীপত্র, ১ম প্রকাশ, ২০০৩), পৃ: ৮১।

[৩৪৬]. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারী ধর্ষণের নৃশংস ঘটনাকে বিভিন্ন রচনায়, খবরে, বক্তৃতায় সাধারণত মা-বোনের সম্ভ্রম হানি, মা বোনের ইজ্জত হরণ ইত্যাদি শব্দে বর্ণনা করা হয়। এছাড়া সাম্প্রতিকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া গণধর্ষণের ঘটনার পরও ধর্ষণ শব্দটির পরিবর্তে শ্লীলতাহানি কিংবা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের পরামর্শ এসেছে। তবে এর স্পষ্ট প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এভাবে যে, "সভ্রমহানী" 'শ্লীলতাহানী" "ইজ্জতহানী" এ ধরনের শব্দ কখনো ধর্ষণের প্রতিশব্দ হয়ে ওঠেনা। ধর্ষণ শব্দটির মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও অত্যাচারের যে তীব্রতা প্রকাশিত হয়, তা সভ্রমহানির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। "সম্ভ্রমহানী" শব্দটি ব্যবহার করলে মনে হয় আসলেই তার মান সম্মান চলে গিয়েছে। তাহলে অর্থ এই দাড়ায় যে ধর্ষিত হলেই সম্মানহীন। প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ নারীর জন্য 'সতীত্ব' 'সম্ভ্রম' 'শ্লীলতা' 'ইজ্জত' ইত্যাদি মতাদর্শিক শব্দ নির্মাণে ভাষার মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। একজন নারী যখন ধর্ষিতা হয় তখন তার সম্ভ্রমহানী ঘটেছে বলে ধর্ষকের অপরাধ লঘু হালকা করে দেয়া নয় বরং শব্দ ব্যবহার করে নির্দিষ্টভাবে অপরাধের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। (নাজমুন নাহার, **সম্ভ্রমহানী কি ধর্ষণের প্রতিশব্দ?** ভোরের কাগজ, অক্টোবর ১২, ১৯৯৮, ঢাকা; ধর্ষণ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রকাশনা সংকলনে পুন:মুদ্রিত, অশুচি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ: ১০৮)।

[৩৪৭]. **দৈনিক ইত্তেফাক**, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ এমন ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যৌন নিপীড়ন (Incest) প্রকাশিত হয় না। সরকারিভাবে 'নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ বিধান' প্রণয়ন করে ধর্ষণের জন্য গুরুতর শাস্তি প্রস্তাব করা হলেও প্রস্তাবিত আইনে ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। ধর্ষিত নারী সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয়ে, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের কারণে আদালতে মামলা খুব কম করে। ধর্ষণের নৃশংসতা নারীর জীবনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। শরীরের ক্ষতের চেয়েও মানসিক বিকারগ্রস্ততা তাকে গোপনে ধ্বংস করে দেয়।[৩৪৮] এবং আক্রান্ত নারীকে সকল পরিস্থিতি মেনে নিতে হয়, তাকে যেমন মেনে নিতে হয় কোনো পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণ তেমনি মেনে নিতে হয় পুরুষ অভিভাবক (পিতা, ভাই) কর্তৃক পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যানের মতো আচরণ।[৩৪৯]

হত্যা বা খুন

বাংলাদেশে হত্যা বা খুন এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। নারীরাও এই জীবন নাশকারী অপরাধের কবল থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশে এর আধিক্য সম্পর্কে জানা যায়, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে মোট ৫৩২ জন নারীকে হত্যা বা খুন করা হয়েছে। প্রকাশিত খবর অনুসারে আক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নারী খুন হয়েছে, যার সংখ্যা ৭২ জন এবং জানুয়ারী মাসে এসংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন ২৫ জন। গড়ে প্রতি দিন ১ জনের বেশী নারী খুন হয়েছে। খুনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 'যৌতুক'।[৩৫০] এছাড়াও পারিবারিক কলহ, ধর্ষণের পর হত্যা পরকীয়া প্রেমের কারণে হত্যা, সন্ত্রাসী ঘটনায় হত্যা ইত্যাদি প্রনিধানযোগ্য। পারিবারিক পরিমন্ডলের ঘটনাবলীতেই অধিকাংশ নারী হত্যার শিকার হয়েছেন। যৌতুক ও পারিবারিক কলহের কারণে নারী তার নিকটাত্মীয় ও প্রিয়জনদের হাতেই খুন হয়েছেন বেশী। এছাড়া ধর্ষণকারীদের হাতে ছাত্রী, গৃহবধূ, শিশু কিংবা কিশোরী খুন হয়েছে।

আত্মহত্যা

পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের ৩৭৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। গড়ে প্রায়

---

৩৪৮. একজন ধর্ষিত নারীর বিপদগ্রস্ততা সম্পর্কে এক গবেষণায় মেঘনা গুহঠাকুরতা উল্লেখ করেন, "...অনেক ক্ষেত্রেই তার নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ... সেহেতু সেও চলে যেতে চায় অন্য কোনোখানে।" (মেঘনা গুহঠাকুরতা, **নারীদের দৃষ্টিতে ধর্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন**; মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য, সম্পাদিত, **নারীঃ প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি**, ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭, পৃঃ ১৪১)।

৩৪৯. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২), পৃঃ ১৫৮।

৩৫০. বঙ্গীয় শব্দকোষ "যৌতুক" এর অর্থ শ্বশুর-শাশুড়ি কর্তৃক দম্পতিকে প্রদত্ত উপহার। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে 'Dowry' বা যৌতুক শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ হলো-যে অর্থ বা সম্পদ তার স্বামীর জন্য নিয়ে আসেন বা পত্নীর সঙ্গে (বিবাহের সময়) যে ধন দেওয়া হয়। স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রীর জন্য যে উপহার দেন তাও যৌতুক। (সুব্রত সেন, **পণপ্রথা শাস্ত্রে ও সমাজে**, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃঃ ২৬)। বিভিন্ন ভাষায় এর নাম বিভিন্ন হলেও প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। প্রাচীনকালে গল দেশে (ফ্রান্স) স্ত্রী বিবাহের পর স্বামী গৃহে নিয়ে যেতেন। এথেন্সেও নববধূ অর্থ ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পদ নিয়ে স্বামীগৃহে যাবেন এটি ছিল সাধারণ রীতি। স্পার্টা ও রোমে যৌতুক এনে বধূ পতিগৃহে বিশেষ সম্মান লাভ করতেন। প্রাচীন আয়ারল্যান্ডে সোনা, রূপা তামা, কাপড়, ঘোড়া, জিন, গরু, শুকর এমনকি জমি ও বাড়ি ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দেয়া হতো। প্রাচীন চীনেও বরের পিতা কন্যার পিতাকে শর্ত অনুযায়ী পণ দিতে বাধ্য থাকতেন। সাধারণ অর্থে মূল্যে কন্যাপণ দিতে হতো। প্রাচীন ভারতেও কন্যাপণ প্রথা ছিল।" (সুব্রত সেন, **পণপ্রথা শাস্ত্রে ও সমাজে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭)।০ বাংলাদেশে 'সাজা বিয়ে'র প্রচলন ছিল। 'সাজা বিয়ে'তে ছেলে পক্ষের দায়িত্ব ছিল মেয়েকে সাজিয়ে নেয়া। এবং এই দায়িত্ব বাধ্যতামুলক ছিল। সাজানোর সকল সামগ্রী ছেলে পক্ষকে বহন করতে হতো। (মিলু সামসুন নাহার, **ডিমান্ড ও নারী নির্যাতন**; বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান সম্পাদিত, **বাংলাদেশে নারী নির্যাতন**, ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৭, পৃঃ ৫৫)। প্রাচীনকাল থেকে Dowry প্রচলিত ছিল, কখনো তা কন্যাকে কিংবা কন্যাপক্ষকে দেয়া হতো আবার কখনো তা বরকে দেয়া হতো। প্রাচীন ভারত ও বাংলাদেশে কন্যাপক্ষকে দেয়া Dowry আজকের প্রেক্ষাপটে এসে উল্টোরূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের ৪০-৫০ দশকের বিয়ের ক্ষেত্রে রূপান্তর শুরু হয়েছে। সনাতন 'সাজা বিয়ে'র স্থান দখল করেছে যৌতুক বিয়ে। (সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিনই একজন নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এই আত্মহত্যার কারণ নানাবিধ। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী পারিবারিক কলহ, পরিবারের সদস্যদের প্রতি অভিমান, যৌতুকের দাবি, পরকীয়া প্রেম, ফতোয়া, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। অনেক সময় হত্যা করে আত্মহত্যা বলে ঘটনা আড়াল করার প্রচেষ্টা হয়েছে। 'আত্মহত্যা 'অর্থ হলো স্বেচ্ছায় যে কোন ব্যক্তির মৃতুবরণ করার ঘটনা। কিন্তু সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে যেসব ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত করা হয়, তার অনেকটা হয়তো স্বেচ্ছায় মৃত্যু নয়। অনেক সময় বাহ্যিকভাবে যা স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া মৃত্যু, তা আত্মহত্যা নাও হতে পারে।[৩৫১] এক গবেষণা তথ্যের উদাহরণ থেকে এ ধরণের মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন, গবেষণায় পারিবারিক পর্যায়ের সহিংসতার শিকার ১০ জন নারীর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ৪ জনের আত্মহননের চেষ্টার কথা বলা হয়েছে। সফল হলেই তা 'আত্মহত্যা' নামে ভূষিত হতো, যা প্রকারান্তরে হত্যারই ঘটনা। পরিবারে, সমাজে সহিংসতার শিকার হয়ে অবদমিত, অপমানিত, জীবন যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ্য হয়ে নারী অনেকটা বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হন।[৩৫২]

যৌতুক

বাংলাদেশের পরিবারে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের চিত্র মহামারীর মতো ছড়িয়ে আছে। পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতন সমাজে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। নারী নির্যাতনের উপর দশ বছরের এক গবেষণা জরীপে দেখা গেছে, শতকরা ৩১ ভাগ নারী হত্যার কারণ পারিবারিক কলহ। এই কলহের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌতুক। শাশুড়ী-ননদের অত্যাচার, গহনা বিক্রি নিয়ে বিবাদ এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ। যৌতুকের কারণে প্রায়ই নারীর উপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ একত্রে যৌতুকের কারণে নারীর উপর নির্যাতন চালায়। যৌতুক আদায় করতে না পারলে বউ নামক নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে তারা একটুও দ্বিধা করে না। ১৯৯৯ সালে যৌতুকের শিকার হয়েছেন ১৪২ জন নারী। এর মধ্যে ৮৩ জন গৃহবধু তাদের স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনের নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন এবং নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে আত্মহত্যা করেছেন ৭ জন। আক্টোবর মাসে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ২২ জন এবং মে মাসে ছিল তা সর্বনিম্ন ৭ জন। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শুধু যৌতুকের জন্যই ২৯% নারী নির্যাতনের শিকার হন। পিতা মাতা কর্তৃক যৌতুকের জন্য স্ত্রীর ওপর চাপ প্রয়োগ করার বেদনা নিয়ে ১৯৯৯ সালে ১ জন পুরুষও আত্মহত্যা করেছেন।[৩৫৩]

অপহরণ

বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৫২৬টি, তন্মধ্যে ১৩৩ জন নারী অপহৃত হয়েছেন। নারী অপহরণের কারণের মধ্যে শত্রুতা, ধর্ষণাকাঙ্খা, প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কারণগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো, বলপূর্বক নারীর জীবনকে পর্যুদস্ত করা এবং পুরুষতান্ত্রিক দাম্ভিকতার প্রকাশ করা। অনেক ক্ষেত্রে অপহরণের ঘটনাকে পারিবারিকভাবে লুকানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা সমাজে জানাজানি হলেও নারীকেই বিপদে পড়তে হয়। এজন্য প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে সকল অপহরণের ঘটনার সংখ্যাগত ধারণা পাওয়া যায় না।[৩৫৪]

এসিড নিক্ষেপ

১৯৯৯ সালে এসিড নিক্ষেপের শিকার ১৬৮ জনের মধ্যে নারী ১০৫ জন (৬২.৫)%। গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৯ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন। প্রায়ই শিশু, বালিকা, গৃহবধু এই নৃশংসতার শিকার হচ্ছেন। সাধারণত প্রেমে ব্যর্থ হওয়া, প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়া, যৌতুকের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হওয়া

---

৩৫১. Shaheen Anam, **Stop, Please Stop This Violence**, The Daily Star; আলী রিয়াজ, **ভয়ের সংস্কৃতি বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের প্রকৃতি এবং পরিসর**, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ: ৫৫-৫৬।

৩৫২. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬০-১৬১।

৩৫৩. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬১।

৩৫৪. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক কলহ ইত্যাদি কারণে নারী এসিড দগ্ধ হচ্ছেন। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এসিড দগ্ধের ঘটনায় শতকরা ৬ ভাগের মৃত্যু ঘটে এবং শতকরা ৯৪ ভাগের নিদারুণ যন্ত্রদায়ক ক্ষতি হয়। গ্রাম ও শহরে এই ভাগের তারতম্য রয়েছে। গ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী। গ্রামে ৯% এবং শহরে ৪% এসিড আক্রান্তের মৃত্যু ঘটে।[৩৫৫] এসিড দ্বগ্ধ নারীদের শরীর ঝলসে যাওয়া, পুড়ে গিয়ে ক্ষতি সাধন তাকে শুধু শারীরকভাবেই ভোগান্তির শিকার করে না বরং মানসিকভাবেও সমাজের প্রতি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। মূলতঃ এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে না পেরে নারীর প্রতি চরম প্রতিহিংসা পরায়ণতা ও প্রতিশোধ প্রবণতা থেকে হচ্ছে।[৩৫৬] এসিড আক্রান্ত হয়ে অনেক নারী অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে প্রতীবন্দী জীবনযাপন করে। আর এই প্রতিবন্দী জীবন নিয়ে অন্যের উপর বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে।

ফতোয়া

বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৯৯ সালে ফতোয়ার[৩৫৭] ঘটনার শিকার হয়েছেন ২৬ জন নারী। এ ছাড়া কতিপয় দরিদ্র পুরুষ এবং এনজিও কর্মকান্ড ফতোয়ার শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশে প্রগতিশীল অনেক ব্যক্তিকেই ফতোয়াবাজরা মুরতাদ[৩৫৮] ঘোষণা করেছে। ফতোয়ার টার্গেট সাধারণত নারী এবং বিশেষজ্ঞ স্থানীয় পর্যায়ে কায়েমী স্বাথবাদীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে ধর্মের নামে ফতোয়া জারি করা হয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন স্থানে এনজিওদের দরিদ্রদের জন্য সচেতনতা কার্যক্রম ও ঋণ কর্মসুচীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছে। অনেক সময় মৌলবাদী গোষ্ঠী ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা না করায় ফতোয়ার ইতিবাচক দিক ক্ষুন্ন হচ্ছে।[৩৫৯]

গৃহপরিচারিকা নির্যাতন

নারীর প্রতি সহিংসতার আরেক রূপ হচ্ছে গৃহপরিচারিকা নির্যাতন। অনেকে ক্ষেত্রে গৃহ পরিচারিকাদের কাজে নিয়োগ দেয়ার আগে তাদের প্রতি আপাত সহানুভূতিশীলতা প্রদর্শন করা হলেও পরবর্তী সময়ে এই সম্পর্ক অনেকটা দাস-মালিকের সম্পর্কে রূপ নেয়। গৃহকর্মে নিয়োজিত হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের নারী ও শিশু। বিভিন্ন সময়ে তাদের ওপর যে নিপীড়ন ও সহিংসতার ঘটনা প্রকাশিত হয়, সেখানে পরিবারের নারী পুরুষ উভয়ের অত্যাচারের তথ্য পাওয়া যায়। নানা সন্দেহবশে গৃহকর্ত্রী কর্তৃক তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হন। এছাড়া গৃহপরিচারিকা ধর্ষণ কিংবা অবৈধভাবে গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাও জানা যায়। সাম্প্রতিককালে নির্যাতনের শিকার হয়ে শিশু গৃহপরিচারিকাদের মৃত্যুর খবরও প্রকাশিত হয়েছে। জনৈক গবেষকের মতে, "গৃহকর্ত্রী ও গৃহপরিচারিকার মধ্যকার দ্বন্দ্ব অনেকে পুরনো এবং এটি সহজে অবসান হওয়ার নয়। এখানে কোনো পক্ষই পরস্পরকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। গৃহকর্ত্রী কাজে সন্তুষ্ট নন, অন্যদিকে পরিচারিকা মনে করেন উপযুক্ত প্রাপ্য পাচ্ছে না। তার ওপর এই পেশায় কাজের সময়সীমা, বিশ্রাম, নিরাপত্তা ইত্যাদি বলতে কিছু নেই। টাকার অঙ্কের বাইরেও আছে শ্রমের মূল্য, কাজের স্বীকৃতি ও সম্মান, যা তারা কোথাও পায় না। তার ওপর রয়েছে অহেতুক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। যার ফলশ্রুতিতে ঘটছে গৃহপরিচারিকা নিপীড়ন।"[৩৬০]

---

৩৫৫. Latifa Akanda and Ishrat Shamim, **Women and Violence: A Comparative Study of Rural and Urban Violence Against Women in Bangladesh**, (Dhaka: Women for Women, 1985), p: 23-27.

৩৫৬. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২।

৩৫৭. ফতোয়া শব্দের অর্থ মীমাংসা করা।

৩৫৮. যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাদেরকে মুরতাদ বলে।

৩৫৯. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২।

৩৬০. **দৈনিক প্রথম আলো**, ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯; সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

নারী পাচার

নারী পাচার নারীর প্রতি সহিংসতার এক চরম রূপ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র নারীদের কাজের লোভ দেখিয়ে দেশের বাইরে পাচার করে দেয়া হয়। নারী পাচারকারীদের একটি সংঘবদ্ধ দল বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন বয়সী নারীদের পাচার করে। চাকরির আশায় প্রতারিত হয়ে এই নারীরা কখনো বিক্রি হয়ে যান কোনো পতিতালয়ে। কখনো বা তারা কোনো বাড়িতে ঝি চাকরানীর কাজ কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে গড়ে উঠা ছোটখাটো কারখানায় কাজ করে। অচেনা দেশে পাচারকৃত নারীরা নানা সমস্যার শিকার হন। পাচারকারী ধরা না পড়লে, পাচারকৃত কোনো নারী পালিয়ে আসতে না পারলে কিংবা কোনো গোষ্ঠী তাদের উদ্ধার করতে না পারলে এই পাচারের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না বলে পাচারের সঠিক তথ্য সম্পর্কে নিশ্চত হওয়া যায় না। 'নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ বিধান, ১৯৯৫' এর ৮ ধারায় নারী ও শিশু পাচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু এই বিধান থাকা সত্ত্বেও নারী পাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে পাচারকারী ব্যক্তি, পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ জন্য দীর্ঘদিন পরে কখনো পাচারকৃত নারীদের উদ্ধার করা গেলেও পাচারকারীদের সন্ধান না পাওয়ায় তারা শাস্তি প্রাপ্তি থেকে মুক্ত থাকে।[৩৬১]

পতিতা উচ্ছেদ

পতিতাবৃত্তি সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয় একটি পেশা। আর এই পেশায় নিয়োজিত সকলেই নারী। অথচ এই নিন্দনীয় পেশা কোন নারী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে না। বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণেই নারীরা এই নিন্দনীয় পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২৭% নারী দারিদ্র্যের কারণে, ৪২% নারী বিক্রি হয়ে, ৭% নারী স্বেচ্ছায়, ১১% নারী পতিতালয়ে জন্ম নেয়ার কারণে এবং ৮% নারী অন্যান্য সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে পতিতাবৃত্তিতে আসে। ৭% নারী পতিতাবৃত্তিতে স্বেচ্ছায় আসে এই তথ্য পাওয়া গেলেও গবেষক অন্যত্র দেখিয়েছেন, প্রেমিক কর্তৃক মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, স্বামীর বহুবিবাহের কারণে কিংবা চাপে পড়ে অনেকে এই পেশায় আসে। তাই বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় আসা নারীও যে বাধ্য হয়েই এই পেশায় আসে তা বলা যেতে পারে। দারিদ্র্যের কারণে যে এক ব্যাপক সংখ্যক নারী এই পেশায় আসতে বাধ্য হয় এর প্রমাণ পাওয়া যায় ৩৩% পতিতা কর্তৃক পরিবারে নিয়মিত টাকা পাঠানোর ঘটনা থেকে।[৩৬২]

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম পতিতালয় নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও ঢাকার নিমতলী থেকে পতিতাদের উচ্ছেদ করা হয়। পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ হিসেবে সরকারিভাবে তাদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব করা হয়। পতিতাদের মতামতকে মূল্য না দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদেরকে পতিতালয় ত্যাগে বাধ্য করে। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার আগে ও পরে তাদের ওপর যে দৈহিক নির্যাতন ও মানসিক নিপীড়ন করা হয়েছে তা নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় সহিংসতার নামান্তর বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু উচ্ছেদের প্রাক্কালে অসহায়, দরিদ্র ও পরিস্থিতির শিকার এই নারীদের পরবর্তী অবস্থার কথা বিবেচনায় আনা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া নারী ও তাদের পরিবারের দুর্দশার দায়ভার রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরই বর্তায়। কেননা, রাষ্ট্রই তাদেরকে পতিতাবৃত্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।

কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি সহিংসতা

কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষ সহকর্মী কিংবা নিয়ন্ত্রক পুরুষ কর্মকর্তা দ্বারা যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়। তবে সামাজিক কারণে এসব ঘটনাবলী অপ্রকাশিত থেকে যায়। বাংলাদেশে যৌন হয়রানির কোনো সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকায় আক্রান্ত নারী যথাযথভাবে অভিযোগ উত্থাপন করতে সক্ষম হয় না।

---

[৩৬১]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪।
[৩৬২]. Ahsan ul Haque Helal, **Vulnerability of Commercial Sex Workers: Viewpoint from Tangail Brothel**, (Dhaka: Unpublished, 1999), p: 24.

Dhaka University Institutional Repository

অনেকসময় দীর্ঘদিন ধরে মানসিক কষ্ট চেপে রাখতে গিয়ে নারীর স্বাভাবিক জীবন-যাপন বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া অনেক কর্মস্থলে মৌলিক অধিকার ভোগ করার পরিবেশ না থাকায় অনেক নারীর পক্ষে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও চাকরি করা সম্ভব হয় না।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষক কর্তৃক বা সহপাঠী কর্তৃক ছাত্রীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ হারে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনার সংবাদ, প্রতিবাদ ইত্যাদি মিলিয়ে শিক্ষাঙ্গণে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনার বহি:প্রকাশ ঘটে। পরবর্তীতে আন্দোলনের মুখে এ ব্যাপারে তদন্ত হয় এবং ছাত্র নামধারী কিছু ধর্ষকের মুখোষ উন্মোচিত হয়। এ ঘটনা আরো উন্মোচন করে ধর্ষণকারীদের সমর্থকদের চেহারা এবং ধর্ষণের শিকার নারীর ব্যাপারে ক্ষমতাবানদের ভূমিকা।[৩৬৩] তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রভাব পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও, যেখানে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে।[৩৬৪]

পরিশেষে বলা যায়, মানব সভ্যতার বিনির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়কে প্রয়োজন। নারী পুরুষের পরস্পরের সহযোগীতা সহমর্মিতা, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন আছে কোমলতা ও নমনীয়তার তেমনি প্রয়োজন আছে কঠোরতার। এছাড়াও প্রয়োজন দক্ষ আনুগত্যশীল পরিবার পরিজনের। নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যে যাকেই বাদ দেয়া হবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, নারীর অধস্তন অবস্থান প্রভৃতি নারী নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। তাই নারী নির্যাতন বন্ধে সরকারীভাবে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নারী নির্যাতন বন্ধে শুধু নীতিমালাই যথেষ্ট নয় বরং প্রয়োজন পারিবারিক কাঠামো থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বত্র নারীর পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম একটি মৌলিক অধিকার হলো শিক্ষা। এটি শুধু মানুষের মৌলিক অধিকারই নয় বরং মানব উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। তাই মানব জাতির মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েই সমভাবে শিক্ষা লাভের অধিকারী। কিন্তু বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে সর্বদাই বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্নে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১ জন। ১৯৩৩ সালের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে কোন সার্বক্ষনিক নারী শিক্ষিকা ছিলেন না।[৩৬৫] বর্তমানে নারী শিক্ষক ও নারী শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে, তারপরও পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশের সর্বত্র এরূপ অবস্থা বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রক্ষণশীলদের নানাবিধ বাধা সমাজে থাকলেও শিক্ষার ধারা এগিয়ে চলে। মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে, পাশাপাশি কো-এডুকেশন শিক্ষাব্যবস্থাও ক্রমশ জোরদার হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এই ধারা আরও বেগবান হয়।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলদের বাধা বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যকারীতা হারিয়েছে। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও পড়াশোনা করছে। বরং ছাত্রদের চেয়ে বর্তমানে ছাত্রীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগ করছে। তারপরও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অনেক কম। বর্তমানে শিক্ষার কোন ক্ষেত্রেই মেয়েদের জন্য আইনগত কোন বাধা নেই। মেয়েরা যতটুকু পিছিয়ে আছে তার মূল কারণ হলো দারিদ্রতা ও পরিবারের অসহযোগীতা। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা অত্যন্ত সাবলীলভাবে

---

[৩৬৩]. রেহনুমা আহমেদ, **'আমি চরিত্রহীন'** কবিতা থেকে উদ্ধৃত, ধর্ষণ বিরোধী ছাত্রী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

[৩৬৪]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

[৩৬৫]. বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং শত শত শিক্ষক রয়েছেন। আগের তুলনায় নারী শিক্ষার্থী ও নারী শিক্ষকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তারপরও পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষক এবং নারী শিক্ষার্থীর হার অনেক কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে ক্রমান্বয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এখন পর্যন্ত কোন নারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, এই বিভাগটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চালু আছে।

Dhaka University Institutional Repository

চলাফেরা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কো-এডুকেশন পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কিছু বাধার জন্য নারী শিক্ষার হার এখনও অনেক কম। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের নারীদের শিক্ষা লাভের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে নারী জাতির তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

অর্থনীতিবিদদের মত অনুসারে মানব উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম হল শিক্ষা।[৩৬৬] তাই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহে গৃহীত শিক্ষা পরিকল্পনা বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে নির্ধারণ করা হয়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭২-৭৮)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সবার জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করা। সত্তর এর দশকে শতকরা ৪০ জন কন্যাশিশু বিদ্যালয়ে যেত। এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫৫% উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে পরিকল্পনা শেষে ১৪.১ লাখ পুত্র শিশুর সাথে তুলনামুলকভাবে ১১.৪ লাখ কন্যা শিশু স্কুলে ভর্তি হবে।[৩৬৭]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, গ্রাম ও শহরের মানুষের শিক্ষাগত বৈষম্য দুর করা, শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু বৈষম্য দুর করা ইত্যাদি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমণযোগ্য ৭০% ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো এবং শতাব্দীর শেষে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষাকাল সমাপ্ত করার জন্য বিদ্যালয়ে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এছাড়াও শিক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য হ্রাস করা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার শিক্ষকগণকে চাকরিকালীন ও চাকরি পূর্বকাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা। শিক্ষা সুযোগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা।[৩৬৮]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) শিক্ষাখাতে উন্নয়নের জন্য সরকারী খরচ (ব্যয় বরাদ্ধ) ধরা হয় ২৩৮২ কোটি টাকা, যা জাতীয় আয়ের দুই শতাংশ।[৩৬৯] ১৯৯০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয় এবং পরে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায়। ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

---

[৩৬৬]. **UNDP Human Development report, 1993.**

[৩৬৭]. হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদ বাংলাদেশের নারী**, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, মার্চ-২০০২), পৃঃ ৭০। এই সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশের কোন উল্লেখ ছিল না। ফলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার এবং স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষিত এই যুব সমাজ বাংলাদেশের সম্পদ না হয়ে সমস্যায় পরিণত হয়েছে। নীতিহীন উচ্ছৃংখল জাতি কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। (মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, **আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা**, ঢাকাঃ আশা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ খ্রিঃ, পৃঃ ১৪১)।

[৩৬৮]. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উল্লিখিত প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী পুরুষের শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নারী স্বাক্ষরতা উন্নয়নের অন্যতম অংশ বলে গণ্য করা হয়। নারী স্বাক্ষরতার হার ৭০ এর দশকে ১৬.৪৩, ৮০ দশকে ১৭.৫২ ছিল। ৯০ এর দশকে ২৫.৪৫ এ উন্নীত হয়। (১৯৭৪-৯৫- ব্যানবেইজ রিপোর্ট -১৯৯৭, পৃঃ ১১৬; হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদঃ বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১-৭২)।

[৩৬৯]. **মানসম্মত শিক্ষাপত্র**, গণসাহায্য সংস্থা, জুলাই ১৯৯৬, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী চালু হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে ১ জানুয়ারী থেকে তা দেশজুড়ে পরিপূর্ণভাবে চালু হয়।[৩৭০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে ক্রমান্বয়ে নারী পুরুষের শিক্ষার ব্যবধান কমে আসতে থাকে।[৩৭১]

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে ড. কুদরত এ খুদা[৩৭২]র নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন নারী শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে তাদের প্রতিবেদনে নারী শিক্ষা শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজন করে।[৩৭৩] নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে এ প্রতিবেদনে তেরটি সুপারিশ করে বলা হয়, মেয়েদের শিক্ষা এমন হতে হবে যা তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক কাজে লাগে। পাঠ্যসুচিতে শিক্ষার যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্যবিধি খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্য সংরক্ষণ সূচি, সূচি শিল্প, পুতুল ও খেলনা তৈরী, হাস মুরগি পালন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মেয়েদের জন্য তাদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যেমন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, নার্সিং এবং প্যারামেডিকেল কাজ ইত্যাদি শিক্ষাদান এবং প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য মেয়েদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে।[৩৭৪]

স্বাক্ষরতা বিস্তারে উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৭৪ সালে নিরক্ষরতা দুরীকরণে বয়স্ক শিক্ষার কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে দেশে গণশিক্ষা কর্মসুচী চালু থাকলেও নানা কারণে তা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আশির দশকে জাতীয় পর্যায়ে সীমিত আকারে গণশিক্ষা কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সমাজ ও গণ সম্পৃক্ততার অভাবে সেই কর্মসুচি ব্যর্থ হয়ে যায়। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করার ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে সচেতন কর্ম প্রচেষ্টার উন্মেষ ঘটে। এর সাথে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক উৎসাহ, উদ্যম ও সহযোগীতা।[৩৭৫] উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বয়সের ২৪ লাখ ৬৮ হাজার নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করা হয়। এদের অর্ধেকেরও বেশি ছিল নারী।[৩৭৬] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া-লেখা করত ২৩ শতাংশ ছেলেমেয়ে। এই হার ১৯৮৫ সালে প্রথম ৪০ শতাংশে উন্নীত হয় আর ১৯৯০ সালে তা ৪৫ শতাংশ ছুয়ে যায়।[৩৭৭]

মেয়েশিশুদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বেতন মওকুফসহ নানা ধরণের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।[৩৭৮] নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের আলোকে ১৯৯৫ সালে পৃথকভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

---

[৩৭০]. আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, (ঢাকাঃ জন অধিকার, ২০০০), পৃঃ ৪২।

[৩৭১]. হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদ : বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২।

[৩৭২]. ড. কুদরত এ খুদা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন।

[৩৭৩]. নারী শিক্ষা শীর্ষক অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয় সমাজের সব মানুষের সকল বৃত্তির পূর্ব বিকাশ, গৃহের মান ও পরিবেশ উন্নতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য নারী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। শিশু চরিত্র অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয় মাতৃ পরিবেশে। অথচ শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে পাথেয় করে সংসার জীবন নির্বাহ করে। অনতিবিলম্বে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট**, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৯৬)।

[৩৭৪]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট**, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৯৬।

[৩৭৫]. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৭-৯৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১৯৬।

[৩৭৬]. সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি প্রায় ৪ শত ৩৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচি বাস্তবায়িত করেছে। সরকারি উদ্যোগে গৃহীত কর্মসুচিকে এ ব্যাপারে ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা করছে। ১৯৭২-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলি ১৯ লাখ ৯৬ হাজার ৫৫৯ জন নারীকে স্বাক্ষর করেছে। পরবর্তী দশকে এ হার আরও বৃদ্ধি পায়। (Mahubul Haq and Khadiza Haq, **Human development in South Asia**, Oxford, karachi, 1998, p:120.)

[৩৭৭]. কামরুন্নেসা বেগম (১৯৯২), প্রাথমিক শিক্ষানীতি প্রতিবেদন, জাহানারা হক (১৯৯৫), ইউনেস্কো (১৯৯৮), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

[৩৭৮]. বর্তমানে মেয়েদের ডিগ্রী পাস পর্যন্ত অবৈতনিকভাবে (বেতন মুক্ত) শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়।[৩৭৯] তা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। এই বৈষম্যের কারণে নারী জাতি শিক্ষাক্ষেত্রে খুব বেশী অগ্রগতি লাভ করতে পারছে না। ফলে তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। আর এই অশিক্ষার ফলে নারী নিম্নমানের জীবনযাপন করছে, সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিশু জন্ম ও মৃত্যুহার।

১৯৯২ সালে প্রাপ্ত এক তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশে শিক্ষার লিঙ্গ ভিত্তিক অসামঞ্জস্যতা (হিসাব শতাংশে) নিম্নরূপ[৩৮০]:

	পুরুষ	মহিলা
শিক্ষিতের হার (১৫ বছর)	৪৫.৫	২৪.২
বিদ্যালয়ে ভর্তির হার		
প্রাথমিক	৭৭.৭	৬১.৪
মাধ্যমিক	৩২.০	১৫.০
মাধ্যমিক উত্তর	১২.২	২.৩
	পুরুষ	মহিলা
শিক্ষিতের হার (১৫ বছর)	৪৫.৫	২৪.২
বিদ্যালয়ে ভর্তির হার		
প্রাথমিক	৭৭.৭	৬১.৪
মাধ্যমিক	৩২.০	১৫.০
মাধ্যমিক উত্তর	১২.২	২.৩
ঝরে পড়ার হার		
প্রাথমিক	৫৮.৩	৫৪.৩
মাধ্যমিক	৫৭.৬	৬৫.৮
শিক্ষকের হার		
প্রাথমিক	৮০.০	২০.০
মাধ্যমিক	৮৮.৭	১১.৩
মাধ্যমিক উত্তর	৮৭.৪	১২.৬
শিক্ষাখাতে মাসিক ব্যয়	১১.৪	--
মোট পরিমাণ	২৫.৩	৩১.০
শতকরা হার	৬৯.০	

১৯৯৯ সালের এক রিপোর্টে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষায় যুক্ত এনজিও জোট Campaign for Popular Education তাদের Education Watch 1999 রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, প্রাইমারি স্কুলে এখন ঝরে পড়ার হার ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ২৬.৬ শতাংশ। তবে শ্রেণীকক্ষে মেয়েদের গড় উপস্থিতি এখনো অনেক কম, মাত্র ৬২ শতাংশ।[৩৮১]

১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ৪৯৯৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু মেয়েদের জন্য ছিল ৪৮১ টি। জনসংখ্যার হিসাবে স্কুল কম হলেও মেয়েরা বিপুল সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ১ কোটি ৩৭ লাখ ১৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬২ লাখ ৪৫ হাজার ছিল ছাত্রী। সম্ভবত শিক্ষায় ছাত্রীদের এই বিপুল আগ্রহের কারণেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও

---

৩৭৯. আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

৩৮০. তথ্যসূত্র: বি বি এস: উইমেন এন্ড মেন ইন বাংলাদেশ, ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস, ইউনিসেফ (১৯৯২), সিচুয়েশন অ্যানালিসিস অব চিলড্রেন অ্যান্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

৩৮১. Education Watch 1999, Campe-UPL. August 1999. Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯২ সালে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৮১টি, ১৯৯৩ সালে তা বেড়ে হয় ৩৬৮৪টি। তারপরও দেশের এক চতুর্থাংশ স্কুল বয়সী মেয়ে স্কুলে যায় না। এমনকি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের পরও এই অবস্থা বিরাজমান। অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রী হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ১৬ লাখ ৫৬ হাজার, যা সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর ৩৬ শতাংশ। এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২ লাখ ৭৫ হাজার, যা সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর ৩১ শতাংশ। এভাবে ক্রমহ্রাসমান ধারায় স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা ৮৭ হাজার ৫২৬ জন। যা ঐ পর্যায়ের সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর ২৭ শতাংশ। স্নাতক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৭টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮-৮৯ সালে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ছিল ৭৮.৮৬:২১.৬৬। ছাত্রীসংখ্যা ১১,৯২৩ জন। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে সরকারীভাবে দেশে নতুন করে আরো দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর দেখা যায়, সর্বমোট ৬৩০০৬ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১৪,৬২৫ জন। যা এক চতুর্থাংশেরও কম।[৩৮২]

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ[৩৮৩]:

	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩
ছাত্র	৩৬৭৯৭	৩৬৯০৩	৪০৬৯৭	৪০৬৮৩	৪৮৩৮১
ছাত্রী	৯৮৬২	১০৯০০	১১৯২৩	১২০৩৯	১৪৬২৫
মোট	৪৬৬৫৯	৪৭৮০৩	৫২৬২০	৫২৭২২	৬৩০০৬

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নানাবিধ পরিকল্পনা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের কারণে বাংলাদেশে মেয়েদের স্কুলে আগমনের হার বৃদ্ধি পেলেও স্থায়িত্ব খুব কম। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশায় স্কুলে ভর্তি হলেও একটি বড়সংখ্যা নানাবিধ কারণে পড়ালেখা শেষ হওয়ার পূর্বেই স্কুলত্যাগ করছে।[৩৮৪] প্রতিবছর যে সংখ্যক মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তার শতকরা ৩৫ জন মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে।

শিক্ষা প্রসারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

শিক্ষার একধাপ থেকে আরেক ধাপে মেয়েদের ঝরে পড়া ঠেকাতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নোরাড, আইডিএ ও এডিবি'র সহায়তায় ৬২৬ কোটি টাকার একটি বৃত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এতে মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ কোটি ১৯ লাখেরও বেশী ছাত্রী আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করতে ৪৬০টি থানায় একটি করে বাছাই করা ইউনিয়নে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী চালু করা হয়। ২০ হাজার বিদ্যালয়ের ১৫ লাখ শিক্ষার্থীকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনার লক্ষ্যে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে ১৪০ কোটি টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ৭০৫ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়। এবং সরকারের ধারণা এই বিপুল পরিমাণ সহযোগীতা প্রদানের ফলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটবে।[৩৮৫]

দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে যে শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে নারী শিক্ষা বিষয়ে ভিন্ন একটি অধ্যায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া নারীদের অধিকতর শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত নারীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ প্রদান করেছে। এরফলে ছেলের জন্য শিক্ষাখাতে খরচ হয় মাসে ২৫ টাকা, সেই তুলনায় মেয়ের জন্য খরচ হয় ১১ টাকা। অর্থাৎ পুরুষের শিক্ষা খরচ

---

৩৮২. আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩-৪৪।

৩৮৩. তথ্যসূত্র: স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক অফ বাংলাদেশ ১৯৯৪।

৩৮৪. মেয়েদের স্কুল ত্যাগের অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পর্দা প্রথার চাপ, পরিবারের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, ঘরের কাজ, বাল্যবিবাহ, নিরাপত্তাহীনতা বোধ, পাঠ্যসূচীর সঙ্গে বাস্তব জীবনের অসংগতি, মহিলা শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের কমনরুম, হোস্টেল এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগের স্বল্পতা ইত্যাদি। (আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪)।

৩৮৫. আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৬৯ ভাগ আর নারীর শিক্ষা খরচ শতকরা ৩১.০ ভাগ। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের তালিকাভুক্তির হার ছিল ৩৩.৯ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার হার ১৯৯১ সালে ছিল ৬৫.৯ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে বয়স নির্বিশেষে পুরুষ শিক্ষার হার ছিল ৩১.০ শতাংশ। কিন্তু মহিলাদের শিক্ষার হার ছিল এর প্রায় অর্ধেক, শতকরা ১৫ ভাগ। তবুও সামগ্রিক শিক্ষানীতির মধ্যে নারীদিরকে সম্পৃক্ত করা, নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা ও মর্যাদার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি।[৩৮৬]

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এত প্রচেষ্টার পরও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশে এখনও ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে অশিক্ষার হার হচ্ছে ৭৪.৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ ধারায় স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যথা: গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা, বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিকে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৩৮৭]

শুধু সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নয় বরং বাংলাদেশের চলমান নারী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নারী সংগঠনগুলোও নারী শিক্ষার বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া বিশ শতকের শুরুতে যে আন্দোলন শুরু করেছিল তা এখনও ব্যাপকভাবে এনজিও, নারী সংগঠন ও সরকারের কর্মসূচীতে যুক্ত হলেও দেখা যাচ্ছে নারী শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটছে না। নারীশিক্ষা সম্পর্কে নারী সংগঠনগুলোর গবেষণা অব্যাহতভাবে রয়েছে এবং তা যথাযথভাবে সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অর্থানুকুল্যের অব্যাহত প্রচেষ্টায় এবং দেশের নারী উন্নয়নমূলক সংগঠন ও এনজিও সংগঠনের কর্মকান্ডের ফলে নারীশিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এখনো পারিবারিক বাজেট থেকে মেয়ের তুলনায় ছেলের জন্য শিক্ষাখাতে বেশী খরচ হয়। মূলত পরিবারের মানসিকতার কারণেই এখনো নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। তবে আশার কথা এই যে, নারীদের অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে এবং নারীর উন্নয়নের জন্য শিশু অধিকার (১৯৯৩) ও নারী অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৯৩), মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচী (১৯৯২) ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যসহ নানা কর্মসূচীর (১৯৯৬-১৯৯৮) মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।[৩৮৮] সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে স্বাক্ষরতার হার ১৯৯১ সালের ৩৫% এর তুলনায় বেড়ে ২০০০ সালে ৬৪% এ দাড়িয়েছে; মোট তালিকাভুক্তির হার ১৯৯০ সালের ৬০% এর তুলনায় বেড়ে ২০০০ সালে ৯৬% এ পৌঁছেছে। বিদ্যালয় ত্যাগের হার ১৯৯০ সালের ৬০% হতে কমে ২০০০ সালে ৩৩% এ নেমে এসেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রকৃত তালিকাভূক্ত শিশুর সংখ্যা মোট ১৫.৫ মিলিয়ন। তার মধ্যে ছেলে ৭.৮ মিলিয়ন আর মেয়ে ৭.৯ মিলিয়ন।[৩৮৯]

সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা অনেকটাই অবহেলিত এবং নারী পুরুষের মধ্যে যথেষ্ঠ বৈষম্য রয়েছে। আর এই বৈষম্যগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য নারী সংগঠনগুলো জোরদার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে মোট বিদ্যালয়ের ০.৫৬ শতাংশ ও মাধ্যমিক স্তরে ২০ শতাংশ বালিকা বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ শতাংশ নারীর জন্য বরাদ্ধ থাকলেও শিক্ষাদান পর্যায়েও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৬০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের সরকারি নীতি সত্ত্বেও এই সংখ্যা বর্তমানে ৩০ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরেও মোট শিক্ষকের মাত্র ১৫ শতাংশ মহিলা। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক ২ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশ মহিলা।[৩৯০]

---

[৩৮৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৬।

[৩৮৭]. আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।

[৩৮৮]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭। বর্তমানে মেয়েরা ডিগ্রী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ালেখা করছে।

[৩৮৯]. সম্পাদনা: সালমা খান, **বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি এনজিও-র ভূমিকা নারী ২০০৩**, বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও কোয়ালিশন বাংলাদেশ (এনসিবিপি) সচিবালয় (ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ২০০৩), পৃ: ১৪৯, ১৫০।

[৩৯০]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব আন্দোলন, আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদার কারণে বাংলাদেশ গত এক দশকের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের গত এক দশকে নারী শিক্ষা. বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদের মতে, এই সাফল্য এসেছে মূলত সংখ্যাগত দিক থেকে, মানসম্মত শিক্ষা এখনো অর্জিত হয়নি।[৩৯১] উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাথমিক পরিসংখ্যান অত্যন্ত হতাশাজনক। গড়ে মাত্র ১৯% নারী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যথাক্রমে ১২% এবং ১১% ছাত্রী, আর স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ৩১% ছাত্রী রয়েছে। যার মধ্যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে ৩৫%; অন্যান্য মহাবিদ্যালয়গুলোতে ৩৮%, বি আই টি-তে ৪.৪%, কৃষি কলেজে ৯% এবং আইন কলেজে ১৬%। তবে পূর্বের চেয়ে মহাবিদ্যালয়গুলোতে ক্রমান্বয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩৯২]

বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বা প্রতিকুল অবস্থা মোকাবেলা করে যেসব মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের অধিকাংশই বাস্তবে তা কাজে লাগাতে পারছে না। যেমন, দেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে ১৬টি বিভাগে ভর্তি হওয়া এবং ১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে পাস করে বের হওয়া ১১৫ জন মেয়ে শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত এক জরীপে দেখা গেছে, এদের ৫৩ জন তাদের অর্জিত জ্ঞান ব্যক্তিগত জীবন যাপনের বাইরে কোথাও কাজে লাগাতে পারেনি। বাকি ৬২ জন বিভিন্ন ধরণের চাকুরীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যার ৮০ শতাংশই বেসরকারি। বর্তমানে অনেক চাকুরী বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।' তারপরও নারীদের কর্মে অনুপ্রবেশ আশানুরূপ ঘটছে না।[৩৯৩]

আদমশুমারী ২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৩৭%, সেখানে নারী শিক্ষার হার ৩৩.৪%। বয়স্ক শিক্ষার হার যেখানে ৪৭.৫%, সেখানে নারী শিক্ষার হার ৪০.৮% এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর হার ৪৬.২%, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা ৩৭%, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার সুযোগ অনেক সীমিত।[৩৯৪]

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তার উন্নয়ন ও বিকাশ হয়েছে পূর্বপুরুষের অতীত ইতিহাস, নিরন্তর সংগ্রাম ও অব্যাহত সাধনার মাধ্যমে। সুতরাং বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আশা আকাঙ্খা, ইতিহাস ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ঢাকা বিষশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগনর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই ঐতিহ্যগত অবস্থান আশংকাজনক পর্যায়ে। তাই সার্বিকভাবে দেশের উন্নতি করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দুর করে সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ কোন জাতির জাতিসত্তা নির্মাণে ভূল ও বিভ্রান্তি একটি জাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরুপ। তাই নারী শিক্ষা বিস্তারেও গুণগত, মান সম্পন্ন ও জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

---

[৩৯১]. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), **World Education report**, Paris, 1998.

[৩৯২]. সালমা খান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫০-১৫১।

[৩৯৩]. নানান প্রতিকুলতায় ভরা দীর্ঘ শিক্ষাজীবন সাফল্যের সাথে অতিক্রম করার পরও যারা কর্মহীন বসে আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, পারিবারিকভাবে তাদের ঢাকা বা দেশের অন্যত্র কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়। তাছাড়া ঢাকায় চাকুরিকালীন থাকার জায়গার অভাব রয়েছে। অনেক নারীকে বিয়ের জন্য অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। কেউ বা আগে চাকুরী করতেন কিন্তু বিয়ের পর ছেড়ে দিয়েছেন বা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সংসার, সন্তান ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের পর তারা চাকুরী করতে সক্ষম নন। অনেকে আবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্মানজনক বেতনের উপযুক্ত চাকরী পাচ্ছেন না। (আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬)।

[৩৯৪]. আদমশুমারী ২০০১, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, মোঃ নুরুল ইসলাম, **মানবাধিকার ও সমাজকর্ম**, (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃ: ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার[৩৯৫] অর্ধেক নারী। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান পুরুষের অধস্তন পর্যায়ে। নারীদের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের হার পুরুষের তুলনায় ৭৬ শতাংশ কম।[৩৯৬] অথচ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিক্রমায় নারীর অবদান অসীম। কিন্তু জাতীয়ভাবে নারীর অবদানের কোনো মূল্যায়ন নেই। বাংলাদেশের প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীর উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ ধরা হয়। নারীরা এককভাবে গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন করছে কিন্তু তার এই কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই অদৃশ্য অবদান স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়, যা পরিমাপ করা হয় না। নারী মোট কাজের তিনভাগের দুইভাগ সম্পাদন করে। কিন্তু তারা মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ করে এবং মোট সম্পদের ১ শতাংশেরও কম মালিকানা লাভ করে।[৩৯৭] উৎপাদনশীল পরিমন্ডলে নারীকে সবসময়ই অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী হিসেবে মনে করা হয় বলেই তাদের এই অবস্থা। অথচ নারী সমানভাবে ভোগকারী ও উৎপাদনকারী। গৃহকর্মের স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ হিসেবে নারীকে বেকার এবং নিষ্ক্রিয়রূপে চিত্রিত করেছে। এ কারণে দেশের ১০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশকে 'গৃহবধু' বা 'ঘরনী' নামে আখ্যায়িত করে তাদেরকে রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তি থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে। এখনো পরিসংখ্যানে নারীর অর্থনৈতিক অবদানের কোন স্বীকৃতি নেই। পরিসংখ্যানে নারীর কাজের ঘন্টা পুরুষের চেয়ে কম দেখানো হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম সময় এবং উৎপাদন সময়ের মধ্যে যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ার কারণেই নারীর কাজের সময়কে পরিসংখ্যানগত ভাবে পরিমাপ করা হয় না। অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও নারীর অবস্থান সম্পর্কে যে চিত্রটি উঠে আসে তা আশাব্যঞ্জক নয়।[৩৯৮] নিম্নের সারণী থেকে মেয়েদের কাজের ধরণ ও আর্থিক বঞ্চনার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

সারণী: ১ : বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের কাজের ধরণ অনুযায়ী সময়ের ব্যবহার : ১৯৭৫-৯৪।[৩৯৯]

সমীক্ষা / বৎসর	দৈনিক গড় কাজ (ঘন্টায়) / কাজের ধরণ					
	আয় উপার্জনকারী কাজ		ব্যায় সাশ্রয় কাজ		সমস্ত কাজ	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯৭৫	৯.০২	১.৭৪	১.০৬	৯.১৮	৬.৮	৯.৫
১৯৭৯	৭.০৪	১.৬১	১.২৯	৬.৬৮	৮.৩৩	৮.২৯
১৯৮০	৫.৯	৩.৯	০.৯	৫.৬	৬.৮	৯.৫
১৯৮৮	-	-	-	-	-	-
ব্যস্ত মৌসুম	৯.৪৩	২.৬৭	৪.২৩	৭.৯৩	৯.৭২	৯.২৫
মন্দা মৌসুম	৭.৫০	২.৭২	৩.৪০	৮.১৬	৭.৮৬	৯.১১
১৯৯৩	-	-	-	-	-	-
ব্যস্ত মৌসুম	৬.৯	৩.৯	০.২	৮.২	১০.৬	১৩.০

---

৩৯৫. ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বমোট মানুষ ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাজার ২৩৩ জন। এরমধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৪১ হাজার ৪১৯ এবং নারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৩৪ লাখ ৫ হাজার ৮১৪ জন। অর্থাৎ দেশে প্রতি ১০৩.৮ জন পুরুষের অনুপাতে নারী হচ্ছে ১০০ জন। (**বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা**, ২০০৫)। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই অনুপাত ছিলো প্রায় ১০৬ জন পুরুষ। (চিররঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, ঢাকা: স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ২০০৭, পৃ: ৩৫)।

৩৯৬. সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন**, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ:৭৮।

৩৯৭. **দৈনিক সংবাদ**, ১৯ সেপ্টেম্বর , ২০০৫।

৩৯৮. চিররঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫-৩৬।

৩৯৯. সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৯-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যম মৌসুম	৪.৯	২.৮	০.৪	৮.৪	৮.৮	১২.২
মন্দা মৌসুম	৪.৯	১.৯	০.২	৭.২	৮.৩	১০.৫
সারা বছর	-	-	-	-	৯.২	১১.৯
১৯৯৪	৬.৭৫	১.৫৩	০.৬৪	৬.২৫	৭.৩৯	৭.৭৮

সারণী : ২: বাংলাদেশের শহর এলাকার চিত্র: মাসিক গড় বেতন এবং দৈনিক কর্ম ঘন্টা, সাল ১৯৯১।[৪০০]

পেশা	দৈনিক কাজের গড় (ঘন্টায়)		মাসিক গড় আয় (টাকায়)	
	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ
পেশাজীবী	৫.৪	=	২০৫৪	৩৯৮৮
সরকারি চাকরি	৮.১	=	২৩৭৮	৪১৫৫
বেসরকারি চাকরি	৮.০	=	৩৭০৬	৫৮৮১
ব্যাংক/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৮.০	=	২৩৩৭	৭০৭৫
ব্যবসায়	৪.৭	=	২৩৩১	১০৭৩১
কারখানা শ্রমিক	১০.৬	=	৮৮৫	৩৭০৮
দিনমজুর	৭.৩	=	৬৬৫	২৮২৩
দক্ষ শ্রমিক	-	১১৩	-	৩৫১০
গৃহস্থালি কাজ	৯.৪	=	৫৮৯	১১৪১
সব ধরণের পেশা	৯.৯	=	১৩২১	৪৬২০

সারণী : ৩: অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের হার (১৯৭৪-২০০৩)।[৪০১]

	১৯৭৪	১৯৮৩-১৯৮৪	১৯৯৫-১৯৯৬	১৯৯৯-২০০০	২০০১-২০০৩	২০০২-২০০৩	
	-	-	-	-	-	নারী	পুরুষ
নারী শ্রমশক্তি (অর্থনৈতিকভাবে)	০.৯	২.৫	৫.৪	৮.৫	১০.৩	-	-
সক্রিয় নারী জনগোষ্ঠী (মিলিয়ন)	-	-	-	-	-	-	-
অর্থনৈতিক (অংশগ্রহণ)	৪.০	৮.০	১৫.৪	২৩.৯	২৬.১	-	-
সক্রিয়তার হার (%)	-	-	-	-	-	-	-
শ্রমশক্তির গড় বৃদ্ধির হার (%)	-	-	-	-	-	৬.৫	৩.৮

১৯৯৫-৯৬ সালে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার ছিল প্রায় ১৬ শতাংশ, ২০০১-২০০৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ। উল্লেখ্য যে এই অংশগ্রহণ শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ১৯৭৪ সালে ছিল মাত্র ৪ শতাংশ এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ৮ শতাংশ।[৪০২] বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করছে এবং নানাপ্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। অথচ তারা ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৫০ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের ধারায় নারী-পুরুষের সমকাজে সমবেতনের নির্দেশ বাংলাদেশে রয়েছে। এটি রাষ্ট্রীয় শ্রম আইনেও স্বীকৃত। তারপরেও নারী শ্রমিক মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বেসরকারি

[৪০০]. সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮০।
[৪০১]. চিররঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।
[৪০২]. চিররঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানে সস্তা শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করেই মেয়েদের নিয়োগ করা হয় এবং সরকার নির্ধারিত শ্রম-মজুরির চেয়ে অনেক কম বেতন দেওয়া হয়। নারী শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়ার পক্ষে দুটি যুক্তি উথাপন করা হয়। **এক.** মেয়েদের রোজগার হচ্ছে বাড়তি আয়, **দুই.** মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা কালীন সুযোগ সুবিধা, শিশু রক্ষণাকেন্দ্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি জন্য তাদের ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী ব্যয় হয়। তবে এ যুক্তিগুলো যথাযথ বলে বিবেচিত নয়।[৪০৩]

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তক ৩২টি পোশাক শিল্প কারখানায় পরিচালিত একটি নমুনা জরিপে দেখা যায়, একই জাতীয় শ্রমে পুরুষ শ্রমিকের মাসিক গড় মজুরী ১৩৪৪ টাকা আর নারী শ্রমিকদের মাসিক গড় মজুরী ৮৮৬ টাকা।[৪০৪] ১৯৯৩ সালে বিআইডিএস পরিচালিত আরেকটি জরিপে দেখা যায়, গার্মেন্টস শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পেও নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে মজুরীর বৈষম্য। এসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে খাদ্য পানীয় ও তামাক শিল্প, কাঠ, কাগজ, প্রকাশনা শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাষ্টিক, লোহা ইত্যাদি শিল্প। এসব শিল্পে পুরুষ শ্রমিকদের গড় সর্বমোট মাসিক আয় (বোনাস ও ওভারটাইম সহ) যেখানে ২৪৯৮ টাকা, সেখানে নারী শ্রমিকদের সর্বমোট মাসিক আয় ১৫২৯ টাকা।

কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

সামাজিক সংস্কারের কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে নারীদের চাকরীতে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন নতুন নতুন পেশায় নারীরা যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর একটি অঙ্গ সংগঠন, যার নাম ছিলঃ W.A.C.I (Womens Auxilliary cops of India). কতিপয় দুঃসাহসী বাঙালী মেয়ে এসব চাকরীতে যোগ দেয়। দুঃস্থদের সেবাকল্পে নার্সের চাকরীতে মেয়েরা যোগ দেয়। স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশের ১৯৯৩ সালের তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, জনসংখ্যায় পুরুসের তুলনায় নারী অর্ধেক হলেও বেসামরিক শ্রমশক্তিতে নারীর চেয়ে ১১.১ মিলিয়ন বেশী পুরুষ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশের বেকার পুরুষের তুলনায় বেকার নারীর সংখ্যা বিশ লাখ বেশী। গৃহকর্মের চাকরীতে নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশী।[৪০৫]

ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহত দারিদ্রের পটভূমিতে বাংলাদেশের নারীরা অধিকতর সংখ্যায় উপার্জনের লক্ষ্যে গৃহের বাইরের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে। ইটভাঙা, শহর ও গ্রামের রাস্তা সংস্কার ও তৈরীর কাজে মাটি কাটা, জমিতে ফসল ফলানো, ঝাড়া-বাছাই, ধান সিদ্ধ ইত্যাদি কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে নারী শ্রমিকদের অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমগ্র গার্মেন্টস শ্রমিকদের শতকরা ৮৬ ভাগ নারী। কলকারখানায় শ্রমজীবী নারীর সংখ্যা কয়েক বছরে তুলনামুলকভাবে বেড়েছে। বর্তমানে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, ফার্মে সর্বত্রই মেয়েদের পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৪০৬]

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে খুবই সস্তা এবং অধিকতর দরিদ্র হওয়ায় দর কষাকষির ক্ষমতা না থাকায় শ্রমবাজারে নারী ১ম কাতারে চলে আসে। এছাড়াও সত্তরের দশক থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলো এন.জি.ও সংস্থার কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে।[৪০৭] এ সমস্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব নারীকে শ্রমশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে নারী সম্প্রদায়কে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত ও প্রভাবিত করে। নারীর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর থেকে সরকারও

---

[৪০৩]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।
[৪০৪]. সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।
[৪০৫]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩-১৯৪।
[৪০৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।
[৪০৭]. নারী শিক্ষা, নারীকে ঋণদান, নারীর সচেতনায়, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মসুচির আওতায় বিদেশ থেকে এনজিওগুলো কোটি কোটি ডলার আনে। কিন্তু সঠিকভাবে সকল অর্থ এই সকল খাতে কখনোই ব্যয় হয় না। এর ফলে ১৯৭১ সালে দরিদ্র ভূমিহীন ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। বর্তমানে বাংলাদেশের শতকার ৬৭ ভাগ মানুষ দুবেলা খেতে পায় না। প্রকৃতপক্ষে বিগত ২৫ বছরেও এদেশের নিরন্ন বস্ত্রহীন দরিদ্র জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। (আসদার হোসেন, **অভিশপ্ত এনজিও এবং আমাদের ধর্ম স্বাধীনতা ও নারী**, ঢাকাঃ প্রতিক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৭ খ্রীঃ, পৃঃ ১৪-১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক অংকের টাকা পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করতে থাকে। নারীদের জন্য ১৯৮০-১৯৮৫ সালে আলাদা মহিলা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।[৪০৮]

স্বাধীন-পূর্বকালে শ্রমজীবী নারীর সংখ্যা ছিল ৮ লাখ, স্বাধীনতা পরবর্তী ১৪ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, কিশোরী, তরুণ ও শিশু নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে বেশী। শিশু শ্রমিক বৃদ্ধির হার যেখানে শতকরা ১.৫ ভাগ, সেখানে মেয়েদের বৃদ্ধির হার ৫.১ ভাগ। শহর ও গ্রামেও এই সংখ্যা বৃদ্ধির পার্থক্য লক্ষণীয়। গ্রামে যেখানে মেয়ে শিশু শ্রমিক বাড়ছে ২.৯ হারে, সেখানে শহরে বাড়ছে ১২.৩ ভাগ হারে। তরুণী শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ১২.৩ সেখানে পুরুষ শ্রমিকের হার ৩৪.৪। গ্রামে এই বৃদ্ধির হার ১৬.৯, কিন্তু পুরুষ শ্রমিক বৃদ্ধির হার ৪.৮।[৪০৯] তাসত্ত্বেও নারী শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে পুরুষের চেয়ে কম।

জাতীয় শ্রম শক্তি জরিপ ১৯৮৯-এ শ্রম শক্তি কর্মকাণ্ডসমূহের সম্প্রসারিত সংখ্যা দেয়ার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে নারী কর্তৃক সম্পাদিত কাজসমূহকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যা জারিপে নারীদের অনেকে বেশি অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রথাগত সংজ্ঞা অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনশক্তি হিসেবে যাদের বয়স ১০ বছর বা তার বেশী এবং যারা সপ্তাহে ১৫ ঘন্টার বেশি কাজ করেন তাদেরকে বিবেচনা করা হয়। অথচ এই বিবেচনায় কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পশুপালন থেকে শুরু করে ফসল মাড়াই বা সিদ্ধ করা ইত্যাদি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে মুল্যায়ন করা হয় না। পূর্বেকার বিবেচনায় ১৯৮৫-৮৬'র শ্রমশক্তি জরিপে যে শ্রমশক্তি ছিল ৩ কোটি ৯ লাখ যার মাঝে পুরুষ শ্রমশক্তি ছিল ২ কোটি ৭৭ লাখ এবং নারী শ্রমশক্তি ধরা হতো ৩২ লাখ। অথচ নতুন ভাবে মুল্যায়নের ফলে ১৮৮৯ সালের শ্রমশক্তি জরিপে নারীর শ্রমশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২ কোটি ১০ লাখ। ১৯৯১ সালের জরিপে নারী শ্রমশক্তি দেখানো হয় ২ কোটি ১ লাখ এবং পুরুষের শ্রমশক্তি ১৯৮৯ এর জরিপে ২ কোটি ৯৭ লাখ থেকে বেড়ে ৩ কোটি ১১ লাখ হয়।[৪১০] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান নিম্নরূপঃ

গৃহস্থালী কাজে

গৃহস্থালীর কাজে নারী সমাজের বৃহৎ একটি অংশ নিয়োজিত এবং নারীরা তাদের কর্মসময়ের বড় অংশ এই কাজে ব্যয় করলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে দেশের মোট শ্রমশক্তির অর্ধেক নারী, যা সংখ্যায় প্রায় ২ কোটি। এর মধ্যে বয়সাশ্রয়ী গৃহস্থালি কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারী শ্রমশক্তির ৮৩ শতাংশই অবৈতনিক গৃহস্থালি শ্রমিক, ১০ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, ৪.৫ শতাংশ বেতনভোগী শ্রমিক এবং শতাংশ ২.৫ শতাংশ দিনমজুর।

কৃষিক্ষেত্রে নারী

বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই, নিরাপত্তাহীন জীবনের কারণে ক্রমাগত নারী শ্রমিকের সংখ্যা দীর্ঘতর হচ্ছে। সংকীর্ণ গৃহকোণ ছেড়ে অধিকতর সংখ্যায় নারীরা যে সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে বলা হয়েছে, দেশে ৬ লক্ষ ১০ হাজার মহিলা কৃষি শ্রমিক রয়েছে। বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তির ৮৮ শতাংশ কাজ করে কৃষিখাতে। ১৯৮৪

---

[৪০৮]. ১৯৭৩-৮০ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য ২৯৮ মিলিয়ন টাকা বরাদ্ধ করা হয়। ১৯৮০-৮৪ পঞ্চব্যার্ষিক পরিকল্পনায় ৯০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্ধ করা হয়। ১৯৮৫-১৯৯০ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৫০০ মিলিয়ন টাকা উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ করানো, নারী শিক্ষার প্রসার, দক্ষ কারিগর তৈরিই ছিল এসকল অর্থায়নের মুল উদ্দেশ্য। নারী উন্নয়নের জন্য হাস মুরগি এবং ডেইরি খামার গড়ে তোলা, কুটির শিল্প গড়ে তোলা ইত্যাদি। (হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদঃ বাংলাদেশের নারী**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০২, পৃঃ ২৮০-২৯)।

[৪০৯]. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪-১৯৫।

[৪১০]. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২), পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সালের জানুয়ারিতে গৃহীত পরিসংখ্যান রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২ কোটি ৮৭ লাখ শ্রমশক্তির মধ্যে ২ কোটি ৬৩ লাখ হচ্ছে পুরুষ, বাকি ২৪ লাখ মহিলা।[৪১১] ১৯৭৪ সালে কৃষিক্ষেত্রে মালিক পর্যায়ে ছিল ১৮.৩২ জন মহিলা। অংশীদার মালিক ১.৭৬ জন মহিলা। ভাগ চাষী ৩.৮৬ জন নারী এবং কৃষি মজুর ৭.৮৫ জন নারী।[৪১২] উল্লেখ্য যে অতীতকাল থেকে এ দেশের গ্রামীণ নারীরা কৃষিকাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে, যা কোনো পরিসংখ্যাণে বা অর্থনৈতিক মানদন্ডে হিসেব করা হয় নি। ২০০২-২০০৩ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের কর্মরত নারীর ৫৮.৬ শতাংশ কৃষি খাতে এবং ৪১.৪ শতাংশ অন্যান্য খাতে কর্মে নিয়োজিত। গ্রামীণ নারীর ৭৩.৬ শতাংশ কৃষিতে কাজ করে।[৪১৩] সময়ের পরিমাপ এবং গুরুত্বের দিক বিবেচনায় কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

চা শিল্পে নারী

চা শিল্প বাংলাদেশে অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চা শিল্পে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪৯০০০ জন। ১৯৮০ সালে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, চা শিল্পে নারী ৪৯০০০ জন থেকে নেমে ৪৮০০০ জনে আসে।[৪১৪] ২০০১ সালে দেশের ১৫৮টি চা বাগানে শ্রমিক জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ। এরমধ্যে সরাসরি শ্রমিক একলক্ষ। বাগান থেকে চা পাতা তোলার কাজটি করে মূলত নারী শ্রমিকরা, যাদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের প্রায় ৫২ শতাংশ।[৪১৫] শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩ অনুযায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চা মিশ্রণ শিল্পে সরাসরি শ্রমিকের সংখ্যা ১৭৪৯২৭ জন, যা মোট শ্রমিক সংখ্যার ৫২.৬ শতাংশ। মূল কায়িক শ্রমজনিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪১৬]

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নারী

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নারীরা ব্যাপকভাবে নিয়োজিত। বাংলাদেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প তথা চিংড়ী শিল্পে নারীরা নিয়োজিত রয়েছেন। এ শিল্পের ঝুকিপূর্ণ কাজগুলো নারীরা করে থাকে। শ্রমশক্তি জরিপে ২০০২-২০০৩ অনুযায়ী সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পে ১২৭৮, অভ্যন্তরীণ মৎস্য শিল্পে ৭৭৯৭ (চিংড়ি শিল্প ব্যতীত) মৎস্য চাষ ও অন্যান্য জলসম্পদে ৭০৯২ এবং মৎস্য সংক্রান্ত সেবা খাতে ৮১৫ সংখ্যক নারী কর্মরত রয়েছে।[৪১৭]

বস্ত্রশিল্পে নারী

বাংলাদেশের রপ্তানীখাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারীর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে তৈরী পোশাক শিল্প। আর এই পোশাক শিল্প বর্তমানে নারী শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল। বস্ত্রশিল্পে ১৯৮০ সালে ৭০০০ মহিলাকর্মী নিয়োজিত ছিল।[৪১৮] ১৯৮৫ সালে দেশের ৪৮০ টি গার্মেন্টস কারখানায় ৩০ হাজার নারী শ্রমিক কর্মরত

---

[৪১১]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৪। ১৯৪৭ সালের সেনসাস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শহরের ৫০০০ মহিলা চাকরির সন্ধানে আছেন। এ সকল মহিলারা বয়স মুলত ১৫ থেকে ২৪ এর মধ্যে সীমিত। অন্যদিকে শতকরা ২৮ ভাগ মহিলাই নিষ্ক্রিয়। এ দেশের শতকরা ৬৬ ভাগ মহিলাই গৃহবধু হিসেবে চিহ্নিত। (প্রাগুক্ত)।

[৪১২]. স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রীঃ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ম্যান পাওয়ার সার্ভে ১৯৮০।

[৪১৩]. চিত্তরঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, (ঢাকা: স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৭), পৃ: ৩৮; সম্পাদনায় সেলিনা হোসেন ও ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

[৪১৪]. হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদ: বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮।

[৪১৫]. চিত্তরঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০; সম্পাদনায় সেলিনা হোসেন ও ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন**, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ: ১৬৯।

[৪১৬]. সম্পাদনায় সেলিনা হোসেন ও ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯।

[৪১৭]. সম্পাদনায় সেলিনা হোসেন ও ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯-১৭০।

[৪১৮]. পোশাক শিল্পে ৯০ এর দশকে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে চা ও পোশাক শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকের কাজের পরিবেশগত বাধা ও সুযোগ সুবিধার অভাবের কারণে শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এসব নারী

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। আশির দশকে পোশাক শিল্পে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ছিল ২,২৫০০০ জন। অন্যান্য সূত্র থেকে জনা যায় ৯০ এর দশকের শুরুতে এ শিল্পে এক মিলিয়ন নারী শ্রমিক নিয়োগ পেয়েছে এবং এ সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪১৯] গোশাক প্রস্তুতকারক সংগঠন বিজিএমইএ দাবী করে, সদ্য বিকশিত পোশাক শিল্পে প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে যার প্রায় ৮০ শতাংশ নারী।[৪২০]

কুটিরশিল্পে নারী

নারীর হস্তশিল্প জাত পণ্য গ্রামবাংলার অতীত আভীজাত্য। বাংলাদেশের গ্রামে ৭০ দশক থেকে প্রায় অর্ধশত প্রকার ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে নারী শ্রমিক নিত্যদিন অবদান রাখছে। বর্তমান শতাব্দীতে শহর ও গ্রামে কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ও মৃৎশিল্পসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ওষুধ শিল্প, টেক্সটাইল, চা শিল্প এবং পাটশিল্পের মতো শিল্পে[৪২১] বা অকৃষি কর্মকান্ডে নারীর অবদানের যথাযথ কোনো পরিসংখ্যান সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে পাওয়া যায় না। বিআইডিএস এর এক গবেষণা জরীপে দেখা গেছে, জরিপকৃত মোট ২১২৭৬ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ১০ বছরের উর্ধ্ব বয়সী ২১১৩ হাজার কুটির শিল্পে নিয়োজিত। আর এই কর্মে নিয়োজিত মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ নারী। এই গবেষণায় বিভিন্ন শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় মোট নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে ঘানি শিল্পে ৪২.৫ শতাংশ, ধানভানা ৫৬.০ শতাংশ, মাদুরশিল্পে ৬২.৮ শতাংশ, বাঁশ ও বেত শিল্পে ৮৯.০ শতাংশ, ছোবড়া শিল্পে ৬৪.৩ শতাংশ, তাঁত বোনায়ে ৩৭.৬ শতাংশ এবং মৃৎশিল্পে ৪৭.৯ শতাংশ নারী শ্রমিক নিয়োজিত।[৪২২]

সাংবাদিকতায় নারী

সাংবাদিকতা পেশায় বর্তমানে ব্যাপক হারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদপত্র, তথ্য প্রিন্ট মিডিয়া ছাড়াও বর্তমানে টেলিভিশন সাংবাদিকতায় পুরুষের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক নারী নিয়োজিত। কিন্তু তারপরও তা পুরুষের তুলনায় অনেক কম। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রেস ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, ৫১টি দৈনিকে পুরুষের বিপরীতে মাত্র ১.৪ শতাংশ মহিলা সাংবাদিক রয়েছে। কিন্ত বর্তমানে এইসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার কাজে নিয়োজিত ৮৯২২ জন কর্মীর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৪৬৩ জন।[৪২৩]

সরকারী চাকুরীতে নারী

বর্তমানে সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা কর্মরত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর জন্য ১০% চাকরি সংরক্ষণের ঘোষণা দেয়।[৪২৪] কিন্তু বিভিন্ন কারণে ঐ আদেশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় ১৯৮৫ সালে সবিস্তার ব্যাখ্যাসহ নারীর জন্য গেজেটেড পদে ১০% এবং নন

শ্রমিকের অধিকাংশই অবিবাহিত এবং অল্পবয়স্ক, যার ফলে এরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়। (ইন্সপেক্টা অব ফ্যাক্টরসি, মিনিষ্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার বাংলাদেশ, ১৯৮১ খ্রিঃ)।

[৪১৯]. শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারী শ্রমিকের বেশিরভাগ শ্রমিকেরই কোন নিয়োগপত্র নেই। সুতরাং কোন কারণ ছাড়াই তাদের যে কোন সময় কর্মচ্যুতি করা যেতে পারে। তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নূন্যতম মজুরি নেই। ছুটি নেই বা বোনাসের ব্যবস্থা নেই, নারী শ্রমিকের জন্য পরিচর্যার কোন ব্যবস্থা নেই, টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। নারী সহকর্মীদের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। (হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদঃ বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮)।

[৪২০]. চিত্তরঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

[৪২১]. হান্নানা বেগম, **মানবসম্পদঃ বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।

[৪২২]. UNICEF, 1998, Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh.

[৪২৩]. জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ, ২০০২-২০০৩; সম্পাদনায় সেলিনা হোসেন ও ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

[৪২৪]. সরকার কর্তৃক ১০% সংরক্ষিত চাকরির ঘোষণা নিয়োগ দাতাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণ, নারীর যোগ্যতার অভাব এবং সাধারণ মানুষের বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এ আদেশটি সর্বপর্যায়ে যথাযথভাবে পালিত হয়নি। পরবর্তীতে এই আদেশ কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদঃ বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪)।

Dhaka University Institutional Repository

গেজেটেড পদে ১৫% চাকরি সংরক্ষণের বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকদের ৬০% পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। এবং বর্তমানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৩০% কোটা সংরক্ষিত রয়েছে। সরকারী চাকরিতে নারীর নিয়োগ খুব ধীরে হলেও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সত্তরের দশকে সরকারি চাকরিতে উপসচিব থেকে উপরের পদে ৩৮ জন মহিলা কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন। উপসচিব ও নিচের পদে ৭১০ জন মহিলা নিয়োজিত ছিলেন। ৪র্থ শ্রেণী ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারী পদে ১৯,৮৯৪ জন মহিলা নিয়োজিত ছিল। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিল ২৭৭৮ জন।[৪২৫] আশির দশকে সরকারি চাকরিতে ১ম ও ২য় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার ছিলেন ২৬৪৪ জন মহিলা। ৩য় শ্রেণী ও নন গেজেটেড স্টাফ ছিলেন ৫৪৫৫৬ জন মহিলা।[৪২৬] নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর শতকরা হার ছিল ৪.৫ জন, ২য় শ্রেণীর ৬.৪ জন, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের হার ৪.৯ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের হার শতকরা ৩.১ জন।[৪২৭]

অন্য একটি পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নব্বইয়ের দশকে সচিব পদে কোন মহিলা কর্মকর্তা ছিল না। অতিরিক্ত সচিব পদও মহিলা শূন্য ছিল। যুগ্ম সচিব পদে ৪ জন মহিলা কর্মরত ছিলেন। উপসচিব পদে ৪ জন মহিলা কর্মরত ছিলেন।[৪২৮] দেশের পুলিশ বিভাগ এবং আনসার ভিডিপিতেও মহিলা নিয়োগ করা হয় আশির দশক থেকে। নব্বইয়ের দশকে নারী শ্রমশক্তির মধ্যে সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ছিল ৮ জন মহিলা, ইনসপেক্টর অব পুলিশ ছিল ৪০ জন মহিলা, সাব ইনসপেক্টর ৬৬ জন মহিলা, সহকারী সাব ইন্সপেক্টর ৭৬ জন এবং কনস্টেবল ২৬৬ জন।[৪২৯]

২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ (সচিবালয়), অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিল ৯০৭১ জন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৯৯৮ জন, ৭৭২৬৯ জন এবং ১৩৯৬৯ জন। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী দক্ষতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। উচ্চতর সরকারী পদ,[৪৩০] ব্যাংক, বীমা, মন্ত্রী পরিষদ, পুলিশ সার্ভিস, রাজস্বখাত সর্বত্রই নারীর দৃপ্ত পদচারণা রয়েছে। ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী একমাত্র ধর্ম মন্ত্রণালয়ে কোন নারী কর্মরত নেই।[৪৩১] পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

---

[৪২৫]. Salma Khan. **The Fifty Percent Women in Development and policy in Bangladesh**. সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সরকারি চাকরিতে নারী নিয়োগের শতকরা হার ছিল ৬. ৬০ শতাংশ। (সরকার মাহাবুদ্দিন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২০-৩২১)।

[৪২৬]. পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে নারীর নিয়োগের হার ৭০ এর দশকের তুলনায় ৮০ এর দশকে বাড়েনি বরং কমেছে, যার পরিমাণ ৬.৩০ শতাংশ। (হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদঃ বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫)।

[৪২৭]. উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, মহিলা নিয়োগের হার ১৯৯৪ সালে বৃদ্ধি হয় ৪.৫। ১৯৯৭ সালে এটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০. ৪। ৪র্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ এবং ৩য় শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রায় আড়াই গুণ। (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, **Gender Dimension in Development**, Misintry of Women and Children Appears Govt. of The peoples Republic.)

[৪২৮]. দিলারা চৌধুরী, আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, **উইমেনস পার্টিসিপেশন ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স স্কোপ নেচার অ্যান্ড লিমিটেশন**, সিডো, অক্টোবর, ১৯৯৩ খ্রিঃ)।

[৪২৯]. বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে ক্রমান্বয়ে এ সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। পুলিশ হেড কোয়ার্টার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদঃ বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪)।

[৪৩০]. বাংলাদেশে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার হলোঃ সচিব পদে শূন্য, অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্ম সচিব ১৪ জন, উপ-সচিব ১৩৪ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ২০৫ জন, সহকারী সচিব ২৩৩ জন। (**দৈনিক আমার দেশ**, ২৪ এপ্রিল, ২০০৬; চিত্তরঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০)।

[৪৩১]. সূত্রঃ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৪ এর বরাতে সম্পাদনায় সেলিনা হোসেন ও ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য খাতে নারী শ্রম

১৯৭৪ সালে উৎপাদনশীল কারখানায় প্রধানত প্যাকারের কাজে নিয়োজিত ছিল ৪০০০ মহিলা। অন্যদিকে হিমাগারগুলোতে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত আছে প্রায় ৩ হাজার মহিলা। বাস, ট্রেন ও বিমান কর্মীদের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র মহিলা। খনিতে কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৩০০০। শহরাঞ্চলে ২৬ শতাংশ কর্মজীবী নারী ম্যানুফাকচারিং খাতে, ৫ শতাংশ উৎপাদন খাতে, ৪ শতাংশ সেবাখাতে এবং মাত্র ১.৭ শতাংশ কারিগরি খাতে নিয়োজিত রয়েছে।[৪৩২] বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক প্রশিক্ষণ দান, সচেতনতা সৃষ্টি সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, গ্রুপ গঠন, ঋণদান প্রভৃতি সেবা সহায়তাসহ নারীদের আত্ম কর্মসংস্থানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আনুমানিক প্রায় ২০ লাখ নারী ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা গ্রুপভিত্তিতে আত্ম কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছে কেবল গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালিত কর্মসুচির আওতায় আছে ১৩ লাখ ৫০ হাজার নারী। গ্রামীণ এলাকার এসব নারী মুলত হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, রেশম পোকা উৎপাদন, ধান থেকে চাল তৈরি, গরু-ছাগল হাঁস-মুরগি পালন, তেল উৎপাদন ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত। এছাড়াও তারা ছোট খাট ব্যবসা, দোকান, কৃষিকাজ, সামাজিক বনায়ন নার্সারি, মাছের পোনা উৎপাদন প্রভৃতি কাজ করছে।[৪৩৩]

তুলনামুলকভাবে বাংলাদেশের শিল্পখাত জাতীয় উৎপাদনে ৯.৩ শতাংশ এবং কর্মস্থানে মাত্র ৮ শতাংশ অবদান রাখে। গত কয়েক বছরে গামের্ন্টস, ফার্মাসিউটিক্যাল, ইলেকট্রনিক, টেলিফোন, টেলিযোগাযোগ ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি রপ্তানিমুখি শিল্পে নারীর অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। পাট, বস্ত্র ও চা শিল্পে, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, স্থাপত্যশিল্প, আইন পেশা, কাগজ শিল্প, বেসরকারি ও কনফেকশনারি, কাঁচ কারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োজিত হচ্ছে। ক্যাডার সার্ভিসে মহিলারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিযুক্ত হচ্ছে এবং সচিব, যুগ্মসচিব ও পুলিশের এসপি পদে কর্মরত রয়েছে।[৪৩৪] বিভিন্ন ধরণের অপ্রচলিত পেশায়ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচারপতি, উকিল, ট্রাফিক পুলিশ, নিরাপত্তা প্রহরী, ডেইরী ফার্ম ও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহকারী, সেনাবাহিনী, ড্রাইভিং, রিকশা পেইন্টিং, মৃতদেহ সৎকার সংক্রান্ত, ব্যবসা, রেডিও, চাবী তৈরী, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি ধার দেয়ার কাজ, ধাত্রীর কাজ, টিভির মেকানিক, শিপিং ম্যানেজমেন্ট, কেমিষ্ট, তবলা বাদক, ভিডিও ক্যাসেট এবং অন্যান্য বিনোদন সামগ্রী ভাড়া প্রদান, বীমা কর্মী, হোমিও প্যাথ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, প্রোজেকশন, চলচ্চিত্র উৎপাদন ও বিতরণ ইত্যাদি ঝুকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা অংশগ্রহণ করছে।[৪৩৫]

উপরোক্ত আলোচনায় কর্মক্ষেত্রে নারীর বিস্তৃত অংশগ্রহণের একটি পরিস্কার চিত্র ফুটে উঠেছে। অথচ এই বিস্তৃত অংশগ্রহণ আজও জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হয়নি। যার কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত অংশগ্রহণকেই কেবল অস্বীকার করা হয়নি বরং সে ন্যায্য মজুরী থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

---

[৪৩২]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।
[৪৩৩]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।
[৪৩৪]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।
[৪৩৫]. সম্পাদনায় সেলিনা হোসেন ও ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১-১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক অবস্থান

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় কোন দেশের নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে ঘটবে এবং কতটুকু ঘটবে। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি যদি অগ্রাধিকার না পায় তাহলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। আর এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক নীতিমালা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর আগমনের পথটি শুরু থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্য সভা করা বা সমিতি গড়ে তোলা বাঙালী নারীর জন্য ছিল কঠিন। তারপরও কয়েকজন প্রগতিশীল নারী পুরুষের হাত ধরে নারী জাগরণ তথা নারী মুক্তির জন্য ঘরের বাইরে বের হয়েছিল।

স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম একটি পূর্বশর্ত হলো, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। গণতন্ত্র বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে ঠিক এ কথাই বলা হয়েছে। ঘোষণায় বলা হয়, "The schievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and their differances."[৪৩৬] কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর তিন দশকেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান জোরালো হয়নি। দেশের রাজনৈতিক অংগনে তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। আর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমিত হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই।

বাংলাদেশের কত সংখ্যক নারী সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন, তার সঠিক কোন হিসাব পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে চারভাবে বিবেচনা করা যায়। যা নিম্নরূপ:

- ভোটার হিসেবে;
- রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে;
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে এবং
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে।

ভোটার হিসেবে নারীর অবস্থান

ভোট দেয়া একজন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। ভোটার হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে ১৯৯৬ সালের পরিসংখ্যান বেশ আশাব্যাঞ্জক বলেই প্রতীয়মান হয়। ঐ বছর অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মোট ভোটারের অর্ধেক নারী অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ নারী ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তবে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। যেমন, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৫২৬ জন। আর নারী প্রার্থী ছিলেন মাত্র ৩৮ জন।[৪৩৭] ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সে সময় ৮৪% নারী ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করে।[৪৩৮]

---

৪৩৬. Universal Declaration on Democracy, updated by the Council of the Interparlamentary Union, Cairo, 1997.

৪৩৭. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬।

৪৩৮. মাহমুদ কবীর, **বাংলাদেশের নারী**, (ঢাকা: বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩), পৃ: ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে নারী

রাজনীতিতে নারীর সম্পৃক্ততার অন্যতম দিক হলো, রাজনৈতিক দলে তাদের প্রতিনিধিত্ব। এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুবই সীমিত; যদিও দেশের সবচেয়ে বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পদে রয়েছেন দু'জন নারী। একজন শেখ হাসিনা, দ্বিতীয় জন বেগম খালেদা জিয়া।[৪৩৯] দুজন নারীরই রাজনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশের ইতিহাস প্রায় একই ধরনের।[৪৪০] দুজন নারী রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানের পরও লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের পদচারণা একেবারেই নগণ্য। অবশ্য কিছু সংখ্যক মহিলা ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে যুক্ত, যাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। অন্যদিকে এদের মাঝে এমনও কেউ-কেউ আছেন যাঁদের রাজনীতিতে আগমন ষাটের দশক থেকে। তারপরও আরো তিন দশক পেরিয়ে নব্বই দশকের মধ্যভাগেও দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। দেশের শীর্ষ পর্যায়ের চারটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও জামায়াতে ইসলামীকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, সব দলেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কম। দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর উপস্থিতি খুবই স্বল্প। দেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটির প্রেসিডিয়ামে রয়েছেন মোট ১৪ জন সদস্য। তার মধ্যে নারী সদস্য মাত্র চারজন। আর বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিএনপির নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সর্বোচ্চ কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ১২ জন। তার মধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র একজন।[৪৪১]

বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত অর্থাৎ যে অধিকারই আলোচনা করা হোক, এটা অনস্বীকার্য যে, নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে।[৪৪২] অথচ বাংলাদেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষকে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলো মৌলিক অধিকারের অন্যতম। এছাড়া সংবিধানে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ধরণের বৈষম্য করা হয়নি।[৪৪৩] তারপরও বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে, রাজনীতিতেও একই অবস্থা বিদ্যমান। মোটকথা প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নসহ সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নগণ্য।

বিগত দু'টি সংসদীয় নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার নিম্নমুখী। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণের হার কম। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ৪৪টি আসনে মোট ৩৬ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ২৯ জন নারী প্রার্থী। নির্বাচনের আগে নারী সমাজের পক্ষ থেকে দাবি

---

৪৩৯. ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে বেগম খালেদা জিয়া সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়কের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

৪৪০. শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন আশির দশকের মধ্য ভাগে। দুজনেই এসেছেন পরিবারের রাজনীতি সম্পৃক্ত প্রধান ব্যক্তিত্বের নৃশংস হত্যার ফলে। দুজনের মধ্যে অবশ্য একটি পার্থক্য ছিল। শেখ হাসিনা যুক্ত-পাকিস্তানের ছাত্র-রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, বেগম খালেদা জিয়া এর পূর্বে কোনোদিনই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন না। (সেলিনা হোসেন ও দয়মন্তী বসু সিং, **নিঃশব্দ বিপ্লব বাংলাদেশের নারী মুক্তির তিন দশক**, কলকাতাঃ বিকল্প প্রকাশনী, তা.বি. পৃ: ৫৭)।

৪৪১. গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

৪৪২. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন 'ভোরের কাগজ' আয়োজিত ক্ষমতায়ন বিষয়ক গোলটেবিলে ডঃ নাজমা চৌধুরী কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ **'নারী ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন,'** ৩ জানুয়ারি, ১৯৯৭। আরো দ্রষ্টব্য, Salma Khan, **The fifty Percent Women in Development and policy in Bangadesh**, (University Press Limited.); R. Bhuiyan, **Legal status of Women in Bangladesh' in Situation of Women in Bangladesh**, (Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985).

৪৪৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছিল, অন্তত ১০ শতাংশ আসনে যেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়। কিন্তু সেই দাবি উপেক্ষিত হয়েছে।[৪৪৪]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের জন্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর রক্ষণশীল মানসিকতা অনেকাংশে দায়ী। রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে নারী এজেন্ডার প্রতিফলন নেই। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে নারী এজেন্ডাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না। ফলে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোয় নারীর প্রবেশগম্যতা সুগম নয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ীই নির্ধারিত হয় দলের কোন কমিটিতে কত জন নারী প্রতিনিধি থাকবেন এবং তাদের ভূমিকা কি হবে। তাই গঠনতন্ত্রে যদি নারী এজেন্ডার প্রতিফলন না থাকে তাহলে দলের বিভিন্ন শাখায় নারীর প্রতিনিধিত্ব আশা করা যায় না।

দেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দল: আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর দলীয় কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দলগুলোর গঠনতন্ত্র বা ঘোষণাপত্রে নারী-পুরুষ সমতার ইস্যুটি অনুপস্থিত। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও উল্লিখিত দলগুলোর গঠনতন্ত্রেই নারীকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, দলের একটি মহিলা শাখা থাকবে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়। তাছাড়া উল্লেখিত চারটি দল তাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রেও নারী ইস্যুকে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন না। নিম্নে উক্ত দলগুলোর গঠনতন্ত্রে নারীর অবস্থান উল্লেখ করা হলো:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন রাজনৈতিক দল। দলটি স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়ী হয়। আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, নর-নারী ও ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা। শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি আওয়ামী লীগের সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। মহিলা আওয়ামী লীগ নামে দলের একটি মহিলা শাখা রয়েছে। দলীয় গঠনতন্ত্রের ২৩ (ঘ) ধারা মতে, মহিলা আওয়ামী লীগের প্রধান সম্পাদিকা পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হবেন। তিনি সংগঠনের একটি ফ্রন্ট গঠন করে সারা দেশে মহিলাদেরকে সদস্যভুক্ত করবেন। মহিলা সম্পাদিকা নারীর বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এবং সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নীতি ও উদ্দেশ্য প্রচার করবেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে নারী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- সমাজের প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা ও নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নারী নির্যাতনের পথ বন্ধকরণ। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন, চাকরি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান বেতন প্রদান এবং মেধানুসারে ও যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকরিতে তাদের সমান অধিকার দেয়া।[৪৪৫]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্টাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বিএনপির মূলনীতি হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা। দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে নারীসমাজ ও যুবসমাজসহ

[৪৪৪]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬-২৭।

[৪৪৫]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সকল জনসম্পদের সুষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক সদ্ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। দলে একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা থাকবেন এবং জাতীয় কাউন্সিলে প্রতি জেলা ও নগর নির্বাহি কমিটি কর্তৃক মনোনীত হবেন দু'জন মহিলা সদস্য। জাতীয় নির্বাহী কমিটির একশ চল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে শতকরা ১০ শতাংশ মহিলা সদস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। বিএনপির ঘোষণাপত্রে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, মহিলা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নারীসমাজকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করা হবে।[৪৪৬]

জাতীয় পার্টি

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন সেনা প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জাতীয় পার্টি গঠন করেন। জাতীয় পার্টির নীতি ও আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে। জাতীয় পার্টির ১০টি মূলনীতির মধ্যে নারী বিষয়ে কোন মূলনীতি নেই। তবে ১৮ দফা কর্মসূচীর মধ্যে যে সব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নারী শিক্ষার প্রসার, রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এছাড়া, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং পেশাজীবি মহিলাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা জাতীয় পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে।[৪৪৭]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মওলানা আবুল আলা মওদুদী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দলটি বিরোধীতা করে বলে স্বাধীনতার পর দেশে জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। আল্লাহ এবং নবীর (স.) প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে বিশ্বাসী এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করা। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতই নির্ধারিত কর্তব্য পালনের পর আরও কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেমন,

- স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং পরিচিত ও অপরিচিত অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের আকীদা পেশ করে তা কবুল করার জন্য আহ্বান জানাবেন।
- নিজের সন্তান সন্ততিকে ইসলামের অনুসারী বানাতে চেষ্টা করবেন।
- স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন যদি জামায়াতে শামিল হয়ে থাকেন তা হলে তিনি আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে তাদেরকে আশাবাদী ও সাহসী করে তুলবেন।
- স্বামী ও মুরুব্বী যদি জাহেলিয়াত-এর মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন, হারাম পথে রোজগার করেন কিংবা গুনাহ কাজে লিপ্ত থাকেন তবে ধৈর্য্য সহকারে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করবেন এবং আল্লাহ ও রাসুলের না-ফরমানী হয় এমন কোন কাজের আদেশ দিলে তা মানতে অস্বীকার করবেন।
- দলের গঠনতন্ত্রের ৪৮ ধারা অনুযায়ী জামায়াতের মহিলা সংগঠন পুরুষদের সংগঠন থেকে আলাদা।

উল্লেখিত ৪টি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৪টি দলের নারী ইস্যুতে মৌলিক পার্থক্য খুবই কম। আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে প্রতিটি নাগরিকের ন্যুনতম চাহিদা মেটানোর কথা বলা হলেও নারী পুরুষের চাহিদাকে আলাদা করে বিবেচনা করা হয়নি। আওয়ামী লীগ পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কথা বললেও নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার ও সম-অংশীদারিত্বের বিষয়ে মূলনীতিতে কিছু বলেনি। একইভাবে বিএনপি'র মূলনীতিতে নারী সমাজের সার্বিক

[৪৪৬]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।
[৪৪৭]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি ও প্রগতির কথা বলা হয়েছে; কিন্তু দলের নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ড এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নারীর সম অংশীদারিত্বের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। জাতীয় পার্টি তাদের মূলনীতিতে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে, অথচ তাদের শাসনামলেই অন্যান্য দলের গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আর এজন্যই জাতীয় পার্টির শাসনামল 'স্বৈরশাসনামল' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে কোন উল্লেখ নেই কারণ তারা নারী নেতৃত্বে বিশ্বাস করে না। অথচ বিগত দিনে সরকার গঠন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তারা নারী নেতৃত্বের অধীনে থেকেছে এবং বর্তমানেও আছে। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি মজলিস-ই-আমেলাতে কোন নারী সদস্য নেই।[৪৪৮] নিম্নে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটির মহিলা সদস্যের সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।[৪৪৯]

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা[৪৫০] নিম্নরূপঃ

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটি সমূহ	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য	%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	জাতীয় স্থায়ী কমিটি জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫ ৭৫	১ ১১	০.১৫ ৮.১৫
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট কার্যনির্বাহী কমিটি	১৩ ৬৫	৩ ৬	০.৩৯ ৩.৯
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৩০ ১৫১	১ ৪	০.০৩ ৬.০৪
জামায়াতে ইসলাম	মজলিশ-ই-শুরা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, মজলিশ-ই-আমল	১৪১ ২৪	- -	০ ০

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে নারী

সমাজে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের তৃণমুল পর্যায়ে মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে। কিন্তু চার স্তর বিশিষ্ট বর্তমানের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দীর্ঘদিনেও জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে জনগণের সম্পৃক্ততা আশানুরূপ হয়নি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম। ১৯৫৬ সালে মাহিলাদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতির পরও ১৯৫৯ ও ১৯৬৯ এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কোন মহিলা নির্বাচিত হয়নি। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিক্রিত দুটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[৪৫১]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত ২১ বছরে ৫টি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৮ এবং ১৯৯২। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ৪৩৫২ টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ১ জন মহিলা রংপুর থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ৪ জন মহিলা নির্বাচিত

[৪৪৮]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৯-৬০।

[৪৪৯]. **নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,** (ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃঃ ১৩৬)।

[৪৫০]. তথ্যসূত্রঃ **রাজনৈতিক দলসমূহের অফিসঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,** (ঢাকাঃ উইমেন ফর ইউমেন, ১৯৯৫), পৃঃ ১৩৬; শিরিন সুলতানা, **ক্ষমতা কাঠামোর নারী,** (ঢাকাঃ সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স, ২০০১)।

[৪৫১]. ফেরদৌস হোসেন, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকা,** *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* জুন ১৯৯৮, পৃঃ ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

হন। ১৯৮৪ সালে ৪৪৪০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ৪ জন মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালে ৪৪০১ টি ইউনিয়ন পরিষদে ৭৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ০১ জন মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[৪৫২] ১৯৯২ সালে ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ সালে বিশ শতকের সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন নারীর ক্ষমতায়নের বিবেচনায় একটি মাইলফলক। নতুন ব্যবস্থার অধীনে এবছর মেম্বার পদে 'সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের' নিয়ম চালু হওয়ায় প্রায় ১৩ হাজার নারী ভোটের রাজনীতিতে উত্তীর্ণ হওয়ার এবং প্রতিদ্বন্দিতা করার সুযোগ পায়। ইউনিয়ন পরিষদের উপরের স্তরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় (উপজেলা পরিষদ) ১৯৮৫ সালে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৮ জন মহিলা প্রার্থীর কেউই নির্বাচিত হননি। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়েদের শহুরে স্থানীয় সরকারের সরাসরি ভোটে অংশগ্রহণের পথও উন্মুক্ত হয়।[৪৫৩]

উক্ত নির্বাচনগুলিতে নারীরা জয়লাভ করতে না পারলেও রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের হার লক্ষ্যনীয়ভাবে বেড়েছে। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩১ বছর পরও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্ব তৈরি করা হয়নি। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে নয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করে এবং তিনটি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে তিন জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান চালু করে। এই পদ্ধতিতে ১৯৯৭ সালের দেশব্যাপী ৪৪৭২ টি মতান্তরে ৪১৯৮টি ইউনিয়নের ১২ হাজার ৮২৮ মতান্তরে ১২ হাজার ৮৯৪টি আসনে ৪৬০০০ মহিলা প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন। এটি ছিল বাংলাদেশের ষষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন।[৪৫৪]

১৯৯৭ সালের এই নির্বাচনে মোট ১০২ জন মহিলা প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে বিজয়ী হন ২০ জন। আর ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সারা দেশে নির্বাচিত হন ২২ জন মহিলা এবং চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দুইশ ৩২ জন মহিলা।[৪৫৫]

২০০০ সালে স্বল্প পরিচালিত ঐ জরিপে দেখা যায়, ঐ সময়ে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের ৫৭.১৪ শতাংশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ২২.৮৫ শতাংশ এবং ১৭.১৪ শতাংশ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন।[৪৫৬]

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান হিসেবে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিম্নরূপ ছিল[৪৫৭]:

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত মহিলা প্রার্থী
১৯৮৪	৪৪০০	---	৪ জন
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ জন
১৯৯২	৪৪৫০	১১৬	১৯ জন
১৯৯৭	৪২৭৬	---	২০ জন

[৪৫২]. তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সমস্ত মহিলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের প্রায় সকলেই স্বামীর অবর্তমানে অথবা উত্তরাধিকার হিসেবে নির্বাচন করেছেন। (সৈয়দা রওশন কাদির, **স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা**, ঢাকাঃ নারী ও রাজনীতি উইমেন ফর উইমেন গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃঃ ৬)।

[৪৫৩]. আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, (ঢাকাঃ জনঅধিকার, ২০০০), পৃঃ ১৭১।

[৪৫৪]. গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮; ফরিদা আক্তার সম্পাদিত, **সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান সমূহ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গে**, (ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৯), পৃঃ ৬১।

[৪৫৫]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

[৪৫৬]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০।

[৪৫৭]. মাহমুদ কবীর, **বাংলাদেশের নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসেবে নারী

জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধান (ধারা ৬৬, ১২২) নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রদান সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী ও পুরুষ সমপর্যায়ে নেই। এ দেশের রাজনীতির বাস্তবতা এই যে, সরকারী ও বিরোধী উভয় দলেরই প্রধান নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিত্ব হলো নারী। তবুও জাতীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ। নারীর এই অধস্তন অবস্থার জন্য যেমন পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামো দায়ী তেমনি সনাতনী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিও অনেকাংশে দায়ী।

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাকিস্তান আমলের চেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এবং আশির দশকের চাইতে নব্বইয়ের দশকে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অনেক বেশি সংখ্যায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। ওই বছর অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে পাঁচ জন মহিলা প্রার্থী বিজয়ী হন। এর আগে ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে কোন মহিলা প্রার্থী সরাসরি ভোটে জয়লাভ করতে পারেননি। তবে ১৯৭৯ সালে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে দু'জন মহিলা প্রার্থী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হন।

১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি আসনে এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সর্বমোট ৩৫ জন নারী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং আটটি আসনে ৪জন মহিলা প্রার্থী বিজয়ী হন। যার মধ্যে খালেদা জিয়া ৫টি আসনে, শেখ হাসিনা, সাজেদা চৌধুরী ও মতিয়া চৌধুরী ১টি করে আসনে জয়লাভ করেন। সংরক্ষিত ও সাধারণ আসন মিলে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪.৮ শতাংশ। ঐ হার ১৯৭৯ সালে ছিল ৯.৭ শতাংশ, ১৯৮৬ সালে ১০.৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ১০.৬ শতাংশ এবং ১৯৯৬ সালে ১১.২১ শতাংশ। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ৩৬ জন নারী ৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে পাঁচ জন প্রার্থী ১১টি আসনে বিজয়ী হন। যার মধ্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জয়লাভ করেন তিনটি আসনে, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া জয়লাভ করেন পাঁচটি আসনে। অন্য তিন আসনে জয়লাভ করেন, আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী, বিএনপির খুরশিদ জাহান হক এবং জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ। পরে আরও ২টি উপ-নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদে আসেন জাতীয় পার্টির তাসমিমা হোসেন ও বিএনপি'র মমতাজ বেগম।[৪৫৮] প্রথম সংসদ থেকে সপ্তম সংসদ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে মোট ১৬৬ জন মহিলা সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এদের মধ্যে একাধিকবার সংসদ সদস্য হয়েছেন ৮ জন। সুতরাং সংসদীয় এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাজনীতিতে নারীর আগমন তরান্বিত করেছে এমন কথা বলা যায় না।[৪৫৯] তবে সরাসরি নির্বাচন এবং সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে সংসদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ৩০০ আসনের সাথে তুলনামূলক বিচারে এখনো তা খুবই কম। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীর শতকরা হার নিম্নরূপ ছিল :

---

[৪৫৮]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮-১৯।

[৪৫৯]. ১৯৭৩ সালে কোন নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন না। তবে নারীর প্রার্থীতা শতকরা হার ছিল ০.৩ । সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ছিল ১৫। ১৯৭৯ সালে নারী প্রার্থী ০.৯ শতাংশ। উপনির্বাচনে জয়ী ০.২ জন মহিলা। সংরক্ষিত আসন ৩০টি। ১৯৮৬ সনে নারী প্রার্থী ০.৩ শতাংশ। সরাসরি জয়ী ৫ জন মহিলা, উপনির্বাচনে ০২ জন। ১৯৮৮ সালে ০.৭ শতাংশ। সরাসরি ভোটে জয়ী ০৫ জন। ১৯৯১ সালে নারী প্রার্থী ১.৫ শতাংশ। সরাসরি ভোটে জয়ী ৪ জন। উপনির্বাচনে জয়ী ০১ জন। মোট ০৫ জন। (**নারী বার্তা**, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা; **নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮; সেলিনা হোসেন ও দয়মন্তী বসু সিং, **নিঃশব্দ বিপ্লব বাংলাদেশের নারী মুক্তির তিন দশক**, কলকাতাঃ বিকল্প প্রকাশনী, তা.বি. পৃঃ ৬৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার।[৪৬০]

বছর	মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে মহিলা জয়লাভ করেছে	উপনির্বাচনে মহিলা জয়লাভ করেছে	মোট মহিলা জয়লাভকারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	জাতীয় সংসদের মহিলা আসনের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	-	-
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	১১*	২	৭	৩০	১১.২১

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বের তুলনায় নারীরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। ১৯৯১ সালের চেয়ে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে নারী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১.৫ শতাংশ আর জুন ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১.৯ শতাংশ।[৪৬১]

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০টি আসনের জন্য মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৭৪ জন। এর মাঝে ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ৩৬ জন নারী ৪৪টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রধান-প্রধান দলগুলোর মাঝে আওয়ামী লীগ এবং গণফোরাম সবচেয়ে বেশী মহিলাকে মনোনয়ন দেয়। আওয়ামী লীগ ৪ জন এবং গণফোরাম ৭ জন মহিলাকে মনোনয়ন দিয়েছিল।[৪৬২]

---

৪৬০. 'নারী বার্তা' প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত; **নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, প্রাগুক্ত; ডঃ নাজমা চৌধুরী, **'উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট : এ গাইড বুক ফর প্যানারস'** (খসড়া রিপোর্ট), ১৯৯৪। শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। (দিলারা চৌধুরী ও আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, **উইমেনস পার্টিসিপেশন ইন বাংলাদেশ পলিটিকসঃ স্কোপ, নেচার এ্যান্ড লিমিটেশন**, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির জন্য প্রস্তুত ফাইনাল রিপোর্ট, অক্টোবর ১৯৯৩; **নারী বার্তা**, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা; **নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১)।

৪৬১. নাজমা চৌধুরী, **'নারীর ক্ষমতায়ন': রাজনৈতিক প্রেক্ষিত**, *ভোরের কাগজ*, ২ নভেম্বর, ১৯৯৬।

৪৬২. ১২ জুন, ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

দল	মোট মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা মনোনয়ন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৩০০	৪
বিএনপি	৩০০	৩
জাতীয় পার্টি	৩০০	৩
ন্যাপ মোজাফ্ফর	১২৮	১
জাসদ (ইনু)	-	১
গণফোরাম	-	৭
জাসদ (রব)	-	১
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	-	২
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন	-	১
ভাসানী ফ্রন্ট	-	১
জাতীয় জনতা পার্টি	-	৪
বাংলাদেশ পিপলস পার্টি	-	২
জনদল	-	১
স্বতন্ত্রঃ	-	৫
মোট	১০২৮	৩৬

(উৎস : **নারীবার্তা**, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা জুন ১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে ৩৬ জন নারী প্রার্থীর মাঝে ৫ জন নারী ১১টি নির্বাচনী এলাকা হতে জয়লাভ করেন। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বি.এন.পি-র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম রওশন এরশাদ, আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং বি.এন.পি.-র বেগম খুরশিদ জাহান হক প্রমুখ প্রত্যক্ষ ভোটে জয়লাভ করেন। শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩টি আসনে, বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫টি আসনে, জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি আসনে জয়লাভ করেন। নারী প্রার্থীদের প্রত্যক্ষ ভোটে জয়লাভের ফলে বর্তমান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের শতকরা হার ২.৩৩ ভাগ এবং সংরক্ষিত আসন সহ শতকরা ১১.২১ ভাগ। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে ১৫টি আসনের উপনির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ আসন থেকে বি.এন.পি-র মমতাজ বেগম এবং পিরোজপুর-২ আসন থেকে জাতীয় পার্টির তাসমিমা হোসেন বিজয়ী হন। অবশ্য দুটি আসনই তাদের দুজনের স্বামীদের ১২ জুন ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ছেড়ে দেওয়া আসন।

১৯৯৬-র নির্বাচনে সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিবরণ[৪৬৩]

প্রার্থী	নির্বাচনী এলাকা	প্রাপ্ত ভোট	মোট প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ	মোট ভোট পড়েছে	মোট ভোট
শেখ হাসিনা	গোপালগঞ্জ-৩ খুলনা-১ বাগেরহাট-১	১,০২,৬৮৯ ৬২,২৪৮ ৭৭,৩৩৭	৯২.১৮ ৫৩.৯৩ ৫১.৩৫	৭৯.৮৩ ৭৯.৭৬ ৮২.৭৬	১,৩৯,৫৩৯ ১,৪৪,৭১৯ ১,৮১,৯৮৬
বেগম খালেদা জিয়া বেগম রওশন এরশাদ	বগুড়া-৬ বগুড়া-৭ ফেনী-১ লক্ষীপুর-২ চট্টগ্রাম-১ ময়মনসিংহ-৪	১,০৩,৭৩৯ ১,৭৪,১৭১ ৬৫,০৬৮ ৫৯,০৯১ ৬৬,৩৩৬ ৭২,১৩০	৫৮.৪৯ ৭২.০৮ ৫৫.৫৬ ৫১.৬৫ ৪৮.১৭ ৩৬.৪৪	৭৮.১৯ ৭৯.৫০ ৭৪.৫০ ৬২.১৯ ৭৮.৫৩ ৬৫.৪৮	২,৯৬,৪১৭ ১,৮৭,৪৪২ ১,৫৭,২৪৮ ১,৮৩,৮৪১ ১,৭৫,৩৪৩ ৩,০২,২৬৬
বেগম মতিয়া চৌধুরী	শেরপুর-২	৬৩,৫৭৪	৪১.০১	৭৩.৪৪	২,১১,০৬১
খুরশিদ জাহান হক	দিনাজপুর-৩	৫১,৮০১	৩১.০২	৭৮.৭৮	১,৯৩,৩০৫

১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচন কয়েকটি কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। এ নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন। এর মাঝে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৮৭,৫৯,৯৯৪ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২,৭৯,৫৬,৯৪০ জন। এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচকমন্ডলী তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে শতকরা ৭৩.৬১ ভাগ ভোট প্রদান করা হয়েছে। ঐ নির্বাচনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলা ভোটাররা নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হন, যার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু মহিলারা বেশি সংখ্যায় ভোট দিলেও মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বির সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি।

বিগত দুটি সংসদ নির্বাচনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার নিম্নমুখী। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণের হার কম। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪৪টি আসনে মোট ৩৬ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে। আর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪২টি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা

[৪৬৩]. 'নারী বার্তা,' প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করেন ২৯ জন নারী প্রার্থী।[৪৬৪] এরই ধারাবাহিকতায় সংসদে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের হার আরও হ্রাস পায়। ২০০১ সালে গঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২ শতাংশ আসনে। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অষ্টম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ৮ জন নারী, তার মধ্যে উপ-নির্বাচনে একজন। আর ৮ জনের মধ্যে মন্ত্রিসভায় ছিলেন মাত্র তিন জন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া ছাড়া মন্ত্রিসভায় অপর দুই নারী সদস্য ছিলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী খুরশীদ জাহান হক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান। বিরোধী দলীয় নেতার আসনে ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর নির্বাচিত অন্য তিন জন নারী সদস্য হলেন, জাতীয় পার্টির (এরশাদ) বেগম রওশন এরশাদ, বিএনপির ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো ও খাদিজা আমীন তালুকদার (উপনির্বাচনে) এবং আওয়ামী লীগের ডা. হামিদা বানু শোভা।[৪৬৫]

নারী ও সংরক্ষিত আসন

স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭৩ সালে গঠিত দেশের প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগ ২৯৩ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয় এবং সংবিধানের ৬৫ ধারায় জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে ১৫ জন নারীকে নিজের দল থেকে মনোনীত করে। যার মেয়াদ ছিল ১০ বছর। এরপর ১৯৭৮ মতান্তরে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০৭টি আসন পেয়ে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে একইরূপে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নিজ দল থেকে মনোনীত করে। দ্বিতীয় সামরিক আইন অধ্যাদেশ-৪ এ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৫টির পরিবর্তে ৩০টি করা হয় এবং সময়সীমা ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছর করা হয়। বিধান অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ফলে ১৯৮৮ সালের ৪র্থ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না। তবে পঞ্চম জাতীয় সংসদে (১৯৯১) ১৪০ টি আসন পেয়ে বিজয়ী বিএনপি সরকার গঠন করে সংবিধানের দশম সংশোধনীতে ধারা-৩, অনুচ্ছেদ-৬৫ তে মহিলাদের জন্য আবার ১০ বছরের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন রাখার ব্যবস্থা করে।[৪৬৬]

তৎকালীন সরকারের শরিক দল জামায়াতে ইসলামীকে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মধ্যে দু'টি আসন ছেড়ে দেয়। আর সপ্তম জাতীয় সংসদে (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে সরকারের শরিক জাতীয় পার্টিকে তিনটি সংরক্ষিত মহিলা আসন ছেড়ে দেয়। সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলারা যেহেতু কোন একটি রাজনৈতিক দলের আনুগত্য নিয়ে সংসদে আসে, তাই তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের কোন সুযোগ ছিল না। শুধু মনোনয়ন প্রদানকারী দলের সিদ্ধান্তে তাদেরকে সমর্থন যোগাতে হয়েছে। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কোন সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেনি। ফলে ক্ষমতাসীন দল সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনকে এতোদিন নিজস্ব 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন বিল পাস করিয়ে নিয়েছে।[৪৬৭]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীন জাতীয় সংসদে মোট আসন সংখ্যা ৩০০টি। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন সমন্বয়ে জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা হলো ৩৩০টি। তবে একক ভৌগলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ আসনের যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না। সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ৬৫ নং ধারার মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছে। ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি এবং এ আসনগুলো দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭৯ সালে নারী দশকের প্রভাবে এ আসন সংখ্যা ৩০-এ বাড়ানো হয়।[৪৬৮] নিয়মানুযায়ী ১৯৮৮ সালের সংসদে কোন সংরক্ষিত আসন ছিল

---

[৪৬৪]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

[৪৬৫]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০।

[৪৬৬]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

[৪৬৭]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

[৪৬৮]. ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত দশ বছর আন্তর্জাতিক নারী দশক। ওই সময়ে নারীদের উন্নতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। (শওকত আরা হোসেন, **'নারী অধিকার ও বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন'**, মানবাধিকার ও উন্নয়ন)।

Dhaka University Institutional Repository

না। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে পুনরায় দশ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এবং এ সিদ্ধান্ত ২০০১ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল।[৪৬৯]

সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। এ আসনে নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী হলেন জাতীয় সংসদের সদস্যগণ। কিন্তু বাস্তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ আসনগুলোর সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন।[৪৭০] সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থীগণই নির্বাচনে জয়ী হন, ফলে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচন বাংলাদেশে কোনো সময়ই হয়নি, যা হয়েছে বা হয় সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থী হিসাবে ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ, ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি, ১৯৯১ সালে বি এন পি (২৮ জন বিএনপি, ২ জন জামায়াতে ইসলামি) এবং ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের (২৭ জন আওয়ামী লীগ ও ৩ জন জাতীয় পার্টি) নারীগণ এ সকল সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করেন।[৪৭১] বিভিন্ন সরকারের সময়ে সংরক্ষিত আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ[৪৭২]:

রাজনৈতিক দলের সাংসদের সংখ্যা		
নির্বাচনের সন	আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দলের প্রার্থী
১৯৭৩	১৫	আওয়ামী লীগ
১৯৭৯	৩০	বি এন পি
১৯৮৬	৩০	জাতীয় পার্টি
১৯৮৮	-	
১৯৯১	৩০	বি এন পি ২৮ + জামায়াতে ইসলামি ২
১৯৯৬	৩০	আওয়ামী লীগ ২৭ + জাতীয় পার্টি ৩

মন্ত্রী সভায় নারী

স্বাধীন বাংলাদেশে বিএনপি সরকারের শাসনামলে প্রথম নারী ব্যক্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।[৪৭৩] এর পূর্বে বাংলাদেশে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের শীর্ষে মহিলারা অনুপস্থিত ছিল। তবে নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা, প্রস্তাবনা, সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় পর্যায়ে

---

৪৬৯. সেলিনা হোসেন ও দয়মন্তী বসু সিং, **নিঃশব্দ বিপ্লব বাংলাদেশের নারী মুক্তির তিন দশক**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

৪৭০. তবে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে মহিলাদের মধ্যেই মতভেদ আছে। এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই বিজয় সুচিত হয়। নির্বাচন পদ্ধতি পরোক্ষ থাকায় সাধারণ মানুষের সাথে এ আসনে মনোনীত মহিলারা তাদের নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব সম্পর্কেও খুব একটা সচেতন নন। মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকা, সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে দশ গুণ বড়। কাজেই এলাকার সাংসদ বা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে যথাযথ ভূমিকা মহিলা সাংসদ পালন করতে পারেনি। মহিলাদের মতে, সংরক্ষিত ৩০টি আসনের স্থলে নির্বাচনী এলাকার প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৬৪টি আসন সংরক্ষিত করতে হবে। নির্বাচন পরোক্ষ না হয়ে প্রত্যক্ষ ভোটে হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন অথবা মনোনয়ন দান করা যায় না। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে বিভিন্ন দলের মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ফলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। দেশের নির্বাচনের সময় একই সাথে দুটি ব্যালট বাক্স থাকবে। ভোটারগণ এক সময়েই দুটি ভোট প্রদান করবেন। তবে এ সকল মতামতের পাশে এখনো অনেকে মনে করেন, মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে অংশগ্রহণের জন্য এখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। তবে সংরক্ষিত আসনে বর্তমানে নির্বাচন না হয়ে যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন হয়, সেটিও একটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জন্য মোটেই মানসম্মত পদ্ধতি নয়। (নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১২ আগষ্ট; আলোচনা সভা : Centre for Analysis and Choice, ৭-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬; কর্মশালা, নারীপক্ষ আলোচনা সভা উইমেন আলোচনা সভায় তাদের এ সকল মতামত ব্যক্ত করেন)।

৪৭১. সেলিনা হোসেন ও দয়মন্তী বসু সিং, **নিঃশব্দ বিপ্লব বাংলাদেশের নারী মুক্তির তিন দশক**, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৬১।

৪৭২. উৎসঃ **নারীবার্তা**, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৬ (উইমেন ফর উইমেন); ***ভোরের কাগজ***, ১৫ মে, ১০ জুন, ১৯৯৬।

৪৭৩. প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম একজন মহিলাকে পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। (আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, ঢাকাঃ জনঅধিকার, ২০০০, পৃঃ ১৭০)।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তা মূল জনসংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য।[৪৭৪]

বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের সময়ে মন্ত্রীসভায় নারী সদস্য সংখ্যা[৪৭৫]

সরকার আমল	মন্ত্রীসভায় মোট সদস্য	মন্ত্রীসভায় মোট পুরুষ সদস্য	মন্ত্রীসভায় মোট নারী সদস্য	শতকরা হার
শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-৭৫)	৫০	৪৭	০২	৪%
জিয়াউর রহমান (১৯৭৯-৮২)	১০১	৯৫	০৬	৫.৯৪%
হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-৯০)	১৩৩	১২৭	০৪	৩%
বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-১৯৯৬)	৩৯	৩৬	০৩	৭.৬৯%
শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০০)	৪৬	৪২	০৪	৮.৬৯%
বেগম খালেদা জিয়া (২০০১-২০০৬)	৬০	৫৭	০৩	৫%

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নারী

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীর এই দেশে আশির দশক থেকে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে নারী নেতৃত্ব। এই উপমহাদেশে নারী নেতৃত্বের পিছনে সবচেয়ে বড় এবং প্রধান যে কারণ রয়েছে তাহলো পুরুষ নেতৃত্বের নৃশংস হত্যাকান্ডের কারণে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্ব।[৪৭৬] যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন রোধে এবং ঐক্য স্থাপনে কার্যকরি ভুমিকা পালন করেছে। সাথে সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয়েই নারী।

---

৪৭৪. আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত মন্ত্রীসভার ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন ছিলেন মহিলা। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ সালে বিএনপি সরকারের আমলে মোট ১০১ জন মন্ত্রীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ৬ জন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সালে জাতীয় পার্টির শাসনামলে মোট ১৩৩ জন মন্ত্রীর ৪ জন ছিলেন মহিলা। বিভিন্ন সরকার আমলে মন্ত্রিসভায় নারী সদস্যের সংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, আনুপাতিক হারে মন্ত্রিসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল শেখ হাসিনার শাসনামলে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যরা নির্বাচিত হতেন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা। ফলে যে দল যখন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, তখন সেই দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ওই সব মহিলা সদস্য। (চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক তথ্য প্রবন্ধকার কর্তৃক নির্বাচন অফিস থেকে সংগৃহীত, ১৯৯৯, উইমেন ফর উইমেন, ক্ষমতায়ন সংখ্যা ৩, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০)।

৪৭৫. Nazmunnessa Mahtab, **Women in Politics (A Keynote Paper)**.

৪৭৬. মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম যে মহিলা একটি দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হন তিনি হচ্ছেন বেনজির ভুট্টো। বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কন্যা। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদন্ডের পর তার স্ত্রী নুসরাত ভুট্টো পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বেনজির ভুট্টো পিতার দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৮৮ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে পিপিপি নেত্রী বেনজীর ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বৃহৎ দুই দলের নেত্রী উত্তরাধিকার সুত্রে দলের প্রয়োজনেই দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় বিদেশে ছিল। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে দলের প্রয়োজনে ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপিতে যোগদান করে রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। (নুর হোসেন মজিদী, **নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে**, ঢাকাঃ কনফিডেন্ট, পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ ১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৯, পৃঃ ১৪৭-১৪৮; সৈয়দা আবদাল আহমদ, নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃঃ ৪৫; এম. আনিসুজ্জামান, **ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা**, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ১১)।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়া

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া[৪৭৭]র রাজনীতিতে আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিকভাবেই ঘটেছে। রাজনীতির সাথে পূর্বে তার কোন সম্পর্ক ছিল না বা তিনি কোন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যও ছিলেন না। বরং তিনি প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা মেজর জিয়াউর রহমানে[৪৭৮]র স্ত্রী হিসেবে নিতান্ত গৃহবধু ছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩০মে মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪৭৯]

আশির দশকের শুরুতে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন শুরু করেন। ফলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ে। জেনারেল এরশাদ দেশে সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিএনপির তিন হাজার নেতা কর্মীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে প্রহসনমূলক বিচার করেন। সরকারের প্রদত্ত মামলা ও হামলার শিকারে জর্জরিত বিএনপির নেতৃত্বের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।[৪৮০] বিএনপির উপর মামলা ও হামলা করেই এরশাদ সরকার ক্ষ্যান্ত হননি বরং বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরকে ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।[৪৮১]

বিএনপির সাংগঠনিক বিশৃংখলা এবং নেতৃত্বের সংকটকে সামনে রেখে বেগম খালেদা জিয়া দল ও দেশের স্বার্থে ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভক্তদের অনুরোধে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৮২ সালের ৮ জানুয়ারী বেগম খালেদা জিয়া সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ বিবৃতির মাধ্যমে রাজনীতিতে পদার্পণের কথা দেশবাসীকে জানিয়ে দেন।[৪৮২]

---

[৪৭৭]. বেগম খালেদা জিয়া ১৯৪৫ সালের ১৫ আগষ্ট দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম এবং বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি ১৯৯১, ১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারী) ও ২০০১ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।।

[৪৭৮]. জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারী বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা।

[৪৭৯]. ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন। তখন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিপুল ভোটে জয়লাভ করে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি সংসদ বাতিল করেন, সংবিধান স্থগিত করেন, সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেন। খালেদা জিয়া স্বামী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গড়ে তোলা দল বিএনপিকে রক্ষা করা ও পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তখন থেকেই তার রাজনৈতিক জীবনের সুত্রপাত ঘটে। (মাহমুদ শফিক, **খালেদা জিয়ার উত্থান**, ঢাকাঃ সূচীপত্র প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০২, পৃঃ ২৯)।

[৪৮০]. সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫-৬৮।

[৪৮১]. শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রফেসর এ. এ মতিন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, এ.কে.এম. মাঈদুল ইসলাম, আবদুল আলীম, ব্যারিষ্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী, কে.এম ওবায়দুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ত্যাগ করে জেনারেল এরশাদের দলে যোগদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ২১ জুন দলের চেয়ারম্যান হিসেবে খালেদা জিয়া দলের নির্বাহী ও স্থায়ী কমিটি বাতিল করেন এবং ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদারকে দলের মহাসচিব নিযুক্ত করেন। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮; রুহুল আমিন, **বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মুলধারার নেতৃত্ব**, ঢাকাঃ হীরা বুক মার্ট, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃঃ ৩৫)।

[৪৮২]. বেগম জিয়া দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, বিগত কিছুকাল যাবৎ আমি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের কার্যকলাপ গভীরভাবে অবলোকন করেছি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে দলের ভিতর বিভিন্ন বিষয়ে একটা ভূল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে, যা দলীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করতে পারে। তাই দেশ ও জাতির বৃহত্তম স্বার্থে এবং দলীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার্থে বিভিন্ন মহলের অনুরোধে সকল দিক বিবেচনা করে দলের স্বার্থে আমি বিএনপিতে যোগ দিয়েছি। দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী যেন নিঃস্বার্থভাবে শহীদ জিয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আমি

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালের ২১ জানুয়ারী দলের চেয়ারম্যান নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। তরুণ নেতাদের চাপের মুখে বেগম জিয়া ৫ জানুয়ারী রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ও বিএনপি দলের চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেন। পরবর্তীতে বিচারপতি আবদুস সাত্তার বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফা বাস্তবায়ন এবং দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার আশ্বাস দেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর বেগম খালেদা জিয়া চেয়ারম্যান পদ থেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এরশাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনতার সংগ্রামী মিছিলে সর্বপ্রথম বেগম খালেদা জিয়া শরীক হন। এরই কয়েকদিন পরে তিনি দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন। সামরিক শাসনের ১ বছর ৭ দিন পর প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৯৮৩ সালে ১ এপ্রিল ঘরোয়া রাজনীতি করার অনুমতি দিলেন।

১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল দলের চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তার বর্ধিত সভা আহবান করেন।[৪৮৩] নয়াবাজার ইউসুফ মার্কেট কার্যালয়ের এই বর্ধিত সভায় ভাষণ দেন দলের সদ্য মনোনীত সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া।[৪৮৪] দলীয় নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে এটাই তার প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা ছিল। বর্ধিত সভার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার সক্রিয় রাজনীতি থেকে অসুস্থতাজনিত কারণে বিরত ছিলেন। তিনি দলের চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন কিন্তু সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মূলত বেগম খালেদা জিয়াই নেতৃত্ব দিতেন। এই সময় বেগম জিয়া এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক যোগযোগ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমমনা দল নিয়ে 'সাত দলীয় ঐক্যজোট' গঠন করেন। ১৯৮৩ সালের ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর, সাতদলীয় ঐক্য জোট ও পনের দলীয় ঐক্য জোটের মধ্যে বৈঠক বসে। বৈঠকে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ৫ দফা দাবী ও কর্মসূচী প্রণীত হয়। এবার বেগম খালেদা জিয়া শুধু বি এন পির নেত্রীই নয় বরং সাত দলীয় জোটের নেত্রী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৪৮৫]

সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৮৩ সালের ১ নভেম্বর প্রথম অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ২৮ নভেম্বরে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ও অন্যান্য আন্দোলনেও তিনি সাহসীকতার সাথে নেতৃত্ব দেন। ১৯৮৪ সালে বেগম খালেদা জিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[৪৮৬]

উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকেই বিএনপিতে নেতৃত্ব সংকট দেখা দিয়েছিল। দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ দল ত্যাগ করে অন্য দলে চলে যান, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর শামসুল হুদা ও প্রফেসর মতিন জেনারেল এরশাদের দলে যোগ দেন। ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিল

তাদের সঙ্গে সবসময় থাকবো। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬; রুহুল আমিন, **বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মুলধারার নেতৃত্ব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫)।

[৪৮৩]. ইতোমধ্যেই শামসুল হুদা ও প্রফেসর মতিন বেগম জিয়াকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোনয়নের বিরোধিতা করেন। তারা আলাদাভাবে বৈঠক আহবান করেন এবং পরবর্তীতে তারাই জেনারেল এরশাদের দলে যোগ দেন। বেগম জিয়া রাজনীতিতে পদার্পণের পর জেনারেল এরশাদের সাথে এ সকল নেতাদের যোগাযোগ উপলব্ধি করে ১৯৮৫ সালে ২৫ জনকে দল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। এদের মধ্যে জাফর ইমাম, মওদুদ আহমদ, সুলতান আহমদ চৌধূরি, মাইদুল ইসলাম রাষ্ট্রপতি এরশাদ সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে। কাজী জাফর, সিরাজুল হোসেন খান, আতাউর রহমান খানও এরশাদ সরকারের দলে যোগদান করেন। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫- ৬৮)।

[৪৮৪]. ১ এপ্রিল ১৯৮৩ সালের বর্ধিত সভায় ২৫১ জন সাবেক এমপির মধ্যে ১৮২ জন এবং জাতীয় কমিটির ১৮০ জনের মধ্যে ১৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন। বর্ধিত সভায় ঐ দিন প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মির্জা গোলাম হাফিজ, জমির উদ্দিন সরকার, মুস্তাফিজুর রহমান, এল কে সিদ্দিকী রফিকুল ইসলাম মিয়া, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬)।

[৪৮৫]. সামরিক শাসন বিরোধী গণতন্ত্রের আন্দোলনে স্পষ্ট ভূমিকা ও সাহসী বক্তব্যের জন্য তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অধিষ্ঠিত হলেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের আপোসহীন নেত্রীর আসনে। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭)।

[৪৮৬]. সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ আজিজ সহ ৬ জন নেতা দল থেকে বেরিয়ে যায়। পরবর্তীতে অন্যরা জাতীয় পার্টিতে যোগ দিলেও শাহ আজিজুর রহমান[৪৮৭] ১৯৮৮ সালের ১৭ জুলাই তার নেতৃত্বের দল বিলুপ্ত করে বিএনপির প্রতি শর্তহীন সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়া এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নিরলস ও আপোসহীন সংগ্রাম এবং পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত একের পর এক চক্রান্তের মোকারেলা করে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতা প্রমাণ করেছেন।[৪৮৮]

বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ আট বছরের নিরলস ও আপোষহীন সংগ্রামের সফল পরিণতি হল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান। প্রবল গণজোয়ারের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় গণঅভ্যুত্থান এবং স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় বছর পর বেগম জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিলেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি এন পি. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হন এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে সরকার গঠন করেন। ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শপথ গ্রহণ করেন। বেগম জিয়া পাঁচ বছর সরকার প্রধান ছিলেন কিন্তু তিন বছর পরেই তার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।[৪৮৯]

বেগম জিয়ার সরকারের শেষ আড়াই বছর ছিল রাজনৈতিক সংঘাতে জর্জরিত। এ সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয় অনেকগুলো সংঘর্ষ। পালিত হয় হরতাল ধর্মঘট ও অসহযোগ কর্মসুচি। ইতিমধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দলীয় সরকারের অধীনে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি জয়লাভ করে এবং বেগম খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের বৃহৎ তিনটি দল অংশগ্রহণ করেননি।[৪৯০] নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আওয়ামী লীগ অন্যান্য সমমনা দলগুলিকে সাথে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে এবং লাগাতার অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ২৫ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে হস্ত ান্তর করা হয়।[৪৯১] ১৯৯৬ সালে ৩০ মার্চ সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার দল সংসদে ১১৬ টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভুত হয় এবং বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে তার দলসহ সংসদে যোগদান করেন।[৪৯২]

পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন বেগম জিয়া। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশব্যাপি সভা, সমাবেশ, লংমার্চ, মিছিল, গণঅনশন, গণমিছিল ইত্যাদি করে তিনি আওয়ামী শাসনের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর বিএনপির নেতৃত্বে চার দলীয়

---

৪৮৭. শাহ আজিজুর রহমানকে ২৬ আগষ্ট ১৯৮৮ সালে সদস্য পদ দেয়া হয়। ১৯৮৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪৮৮. দলের উর্ধ্বতন নেতাদের হারিয়ে আপোসহীন লোভশূন্য সংগ্রামের ধারায় তিনি এক নতুন জেনারেশন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সততা, নিষ্ঠা, লোভ, লালসার উর্ধ্বে সংগ্রামে অনমনীয় মনোভাব দুরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় এবং সর্বোপরি শহীদ জিয়ার স্ত্রী হিসেবে সহজেই তিনি মানুষের হৃদয় আন্দোলিত করেছিলেন। (সৈয়দ আবদাল হোসেন, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯)।

৪৮৯. নুর হোসেন মজিদী, **নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

৪৯০. আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।

৪৯১. মাহমুদ শফিক, **খালেদা জিয়ার উত্থান**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০।

৪৯২. সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যজোট[৪৯৩] গঠন করা হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ সরকার বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[৪৯৪] ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৯৮ টি আসনের ফলাফল ঘোষিত হয়। এর মধ্যে চারদলীয় ঐক্যজোট ২১৩টি আসনে বিজয় লাভ করে।[৪৯৫]

বেগম খালেদা জিয়া তার অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, বুদ্ধি, সুসংগঠিত বিবেচনাবোধ, দুরদর্শিতা, সততা ও সাংগঠনিক যোগ্যতার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় বি এন পি কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মোকাবেলা করেছেন নানা ষড়যন্ত্র ঘাত প্রতিঘাতের, পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনা এটাই বেগম খালেদা জিয়ার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের ভোট বিপ্লবে দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী চারদলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১০ অক্টোবর ২০০১ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বার শপথ গ্রহণ করেন এবং তার নেতৃত্বে একই দিনে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদও শপথ গ্রহণ করেন।

মূলত: সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও দেশের গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়েই বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের সুত্রপাত ঘটে। ইতিমধ্যে তার রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনও দলের ভাঙন রোধ করতে শক্ত হাতে হাল ধরেছেন এবং দলকে সংগঠিত করেছেন। কখনও গণতন্ত্রকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করতে রাজপথে আন্দোলন করেছেন, কখনও দেশকে শক্ত হাতে দক্ষ শাসকের মত নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর এসবই সম্ভব হয়েছে তার ধৈর্য্য, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার কারণে।[৪৯৬]

---

[৪৯৩]. চার দলীয় ঐক্যজোটে ছিলেন: বি এন পি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) এবং ইসলামী ঐক্যজোট। (মাহমুদ শফিক, **খালেদা জিয়ার উত্থান**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২)।

[৪৯৪]. বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১ অক্টোবর ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ভোটার ১ অক্টোবরের নির্বাচনে ভোট প্রদান করে। টানা ৯ ঘন্টা বিরতীহীনভাবে ভোট চলে। (দৈনিক পত্রিকা, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ইনকিলাব, ২ অক্টোবর ২০০১)।

[৪৯৫]. চার দলীয় জোটের বি এন পি ১৯০ টি, জামায়াতে ইসলামী ১৭ টি, জাতীয় পার্টি (নাফি) ৪ টি ও ইসলামী ঐক্যজোট ২ টি আসন পায়। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৯)।

[৪৯৬]. সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা[৪৯৭] সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের[৪৯৮] কন্যা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সেনা অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।[৪৯৯] শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা পিতা নিহত হওয়ার পূর্ব থেকেই দেশের বাইরে ছিলেন। একারণে তারা প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনের সময়ও তিনি দেশের বাইরে ছিলেন।[৫০০] দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে দলের শীর্ষ পর্যায়ে আপোষহীন লড়াই শুরু হলে দলে ভাঙ্গনের উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরসুরী শেখ হাসিনার নাম দলীয় সভানেত্রী হিসেবে প্রস্তাব করা হলে বিরোধের অবসান ঘটে এবং দল ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পায়। শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরে আসার সাথে সাথে আওয়ামী লীগের নেত্রীত্ব গ্রহণ করেন।[৫০১]

পিতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। কাছ থেকে দেখেছেন বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকৌশল, বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ। তাই সরাসরি আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে শেখ হাসিনার কোন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়নি। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ কর্মী বাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকারী হিসেবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে সমর্থন করেন।[৫০২] ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে তিনি সমগ্র বাংলাদেশ সফর করেন এবং আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে পার্টির সকল স্তর থেকে তিনি সহযোগীতা ও সমর্থন লাভ করেন।[৫০৩]

১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার কিছুদিন পর লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন, জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট বাতিল করেন, জাতীয় সংবিধান স্থগিত করেন, দেশে সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সামরিক শাসন জারির এক বছর সাতদিন পর ১ এপ্রিল ১৯৮৩ সালে ঘরোয়া রাজনীতি করার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৮৩ সালে সামরিক শাসক মেজর জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এক দীর্ঘ মেয়াদী আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং

---

[৪৯৭]. শেখ হাসিনা শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। ১৯৭৫ সালে যখন হত্যাকারীরা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেন তখন তিনি এবং তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করার কারণে প্রাণে বেঁচে যান। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বিরোধী দলীয় নারী নেত্রী এবং দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী।

[৪৯৮]. শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তাঁকে হত্যা করা হয়। (হারুন অর রশিদ, **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৬)।

[৪৯৯]. ১৯৭৬ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন হলে জোহরা তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। অবশ্য দলের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে মালেক উকিল সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মিজানুর রহমান চৌধূরী, বেগম সজেদা চৌধূরী, ড. কামাল হোসেন. আবদুস সামাদ আজাদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, মহিউদ্দীন আহমেদ প্রমূখ। (মাহমুদ শফিক, **খালেদা জিয়ার উত্থান**, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০2, পৃ: ২৬)।

[৫০০]. নুর হোসেন মজিদী, **নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৮।

[৫০১]. ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন জারি করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। (রুহুল আমিন, **বেগম খালেদা জিয়া: স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারা নেতৃত্ব**, ঢাকা: হীরা বুক মার্ট, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ: ৭)।

[৫০২]. পরবর্তীকালে মহীউদ্দীন আহমদ ও আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে দলের একটি অংশ বেরিয়ে গিয়ে বাকশাল নামে দল গঠন করলেও পরে তারা আওয়ামী লীগে আসেন। এছাড়াও ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি অংশ বেরিয়ে যায়। (নুর হোসেন মজিদী, **নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৮-১৫৯)।

[৫০৩]. এম আনিসুজ্জামান, **ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেন।[৫০৪] ১৯৮৬ সালে দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হয়। দেশব্যাপী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকালীন সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ[৫০৫] করে ৭৬ টি আসন লাভ করে। শেখ হাসিনা ঐ দিনই সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন এবং ৫০টি আসন পুনঃ নির্বাচনের দাবি করেন।

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ১৯৮৬ সালে ১০ অক্টোবর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ হরতাল আহবান করে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ ও বি এন পি ঐক্যবদ্ধভাবে আপোষহীনভাবে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। অবশেষে সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে এরশাদ সরকারের পতন হয়। পরবর্তীতে অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৫০৬] ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৮৪টি আসন লাভ করে এবং জাতীয় সংসদে প্রথম নারী হিসেবে শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রীর আসন অলংকৃত করেন[৫০৭] আওয়ামী লীগ শুরুর দিন থেকে বি এন পি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৯৬ সালের প্রথমদিকে বিএনপি সরকার এককভাবে নির্বাচন করে পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলগুলো ঐ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচন দেওয়ার দাবীতে অনির্দিষ্ট কালের অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের ফলে বি এন পি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানভুক্ত করে সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[৫০৮]

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সকল দলের অংশগ্রহণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪৬ টি আসনে জয়লাভ করে এবং জাতীয় পার্টি ও জাসদের সহায়তায় সরকার গঠন করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্ণ মেয়াদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা দায়িত্ব পালন করেন।[৫০৯] দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে ১৫ ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস এবং সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। এছাড়াও দেশী বিদেশী বহু চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[৫১০] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নামে নামকরণ করেন।[৫১১] শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্ব শেষ করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ২০০১ সালের ১৫ই জুলাই বিচারপতি লতিফুর

---

[৫০৪]. শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ নেত্রীত্বে শুধু আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত হয়নি, একইসাথে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সর্বস্তরের জনগণকে সংঘবদ্ধ করে এক দুর্বার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনাও তিনি করেছেন। (এম. আনিসুজ্জামান, **ক্রান্তি কালের নেত্রী শেখ হাসিনা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১)।

[৫০৫]. ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৭৬ টি আসনে লাভ করে। ব্যাপক কারচুপি, সহিংস ঘটনার মধ্য দিয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী হাঙ্গামায় কমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও পাঁচ শত আহত হয়। (রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩)।

[৫০৬]. শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ৮৪ টি আসন লাভ করেন এবং বেগম খালেদা জিয়া ও তার দল ১৪৪ টি আসন লাভ করে। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮)।

[৫০৭]. সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

[৫০৮]. জামায়াতে ইসলামীর উদ্ভাবিত ফর্মুলা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করে বিল পাস করা হয়। (নুর হোসেন মজিদী, **নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯)।

[৫০৯]. ২৩ শে জুন ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম সংসদের নির্বাচনে বি এন পি ১১৬ টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে পরিচিত হয়। (সৈয়দ আবদাল হোসেন, **নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬)।

[৫১০]. এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঙ্গার পানি চুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, জননিরাপত্তা আইন পাস এবং ইনডেমনিটি আইন বাতিল করেন। (নুর হোসেন মজিদী, **নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০)।

[৫১১]. দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত শাহবাগে প্রতিষ্ঠিত পি.জি (আই পি জি এম আর) হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল ইউনিভার্সিটি কলেজ (বি এস এম আর এম ইউ সি) রাখা হয়, ঢাকা স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম নাম রাখা হয়। যমুনা সেতুর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু সেতু নাম রাখা হয়। এছাড়াও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১ অক্টোবর অষ্টম সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬৩টি আসন লাভ করে।[৫১২] আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা অষ্টম সংসদের বিরোধী দলের নেত্রীর আসন অলংকৃত করেন।

বাংলাদেশের আইনে নারীর অবস্থান

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর মর্যাদার বিষয়টি বিভিন্ন পর্যায়ে অনাকাঙ্খিত কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নাতীত হয়ে দেখা দিয়েছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, নারী পাচার, যৌতুক, আত্মহত্যা, তালাক, বাল্যবিবাহ এবং স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি এদেশের নারী সমাজের উন্নয়নে তথা সামাজিক নিরাপত্তার অন্তরায়। তাই নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমুহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।[৫১৩] বাংলাদেশ সরকারসহ বিশ্ব সম্প্রদায় জাতিসংঘের এই সকল কর্মসুচিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পারিবারিক, সামাজিক ও নারী অধিকার বিষয়ক আইন

সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। সমাজ-সংস্কৃতি রাষ্ট্রের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, রাষ্ট্রক্ষমতাও সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে। রাষ্ট্রের আইন-কানুনের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। সমাজ-সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারাই আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রে ক্ষমতা-কাঠামোর প্রভাব খুব গভীর ও ব্যাপক। সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে সমাজ-সংস্কৃতিতে পুরুষরাই ক্ষমতাশালী। রাজনৈতিক ক্ষমতাও পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে। তাই প্রণীত আইন-কানুন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলে। আর এর প্রমাণ হল বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনসমূহ। বাংলাদেশ উত্তরাধিকার ব্যবস্থা Personal Law এর আওতাভুক্ত। সম্পদের উত্তরাধিকার ছাড়াও সম্পত্তির দান, উইল, বিক্রয়, ব্যক্তির একান্ত বিষয় যেমন, বিবাহ, তালাক স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলো বাংলাদেশে ব্যক্তিগত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৫১৪] মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের জন্য ব্যক্তিগত আইন রয়েছে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে যে সকল আইন প্রণীত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

বাল্যবিবাহ[৫১৫] নিরোধ আইন (১৯২৯, ১ অক্টোবর): এ আইনটির উদ্দেশ্য ছিল অপরিণতদের সহবাস বন্ধ করা। বিতর্কিত ছিল মূলত মেয়েদেরকে নিয়ে। এটি প্রণীত হয়েছিল বাল্যবিবাহ নিরোধ করার জন্য, প্রতিরোধ বা নিষিদ্ধ করার জন্য নয়। প্রথমে দশ বছর বয়স থেকেই বিয়ে আইনানুমোদিত ছিল। পরবর্তী সময়ে Indian Criminal Law Amendment Act, 1891 ধারাঃ ১ অনুযায়ী সহবাস করার বয়স

---

[৫১২]. ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে চার দলীয় জোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে বি এন পি ও চারদলীয় জোট ২১৩ টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। (সৈয়দ আবদাল আহমদ, **নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯)।

[৫১৩]. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগগুলোর অন্যতম হল জাতিসংঘ কর্তৃক পালিত ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নারী উন্নয়ন দশক। ১৯৯৫ সালে কায়রো সম্মেলন এবং ১৯৯৭ সালে বেইজিং সম্মেলন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক এই সকল উদ্যোগ, আইন, আন্দোলন এবং নানা আয়োজন সবই ব্যর্থতায় পরিণত হচ্ছে এবং নারী তার অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান দিন দিন হারাচ্ছে। (মোঃ নুরুল ইসলাম, **নারীর নিরাপত্তায় বাংলাদেশের প্রচলিত সামাজিক আইনঃ একটি পর্যালোচনা**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৬৬, ফেব্রুয়ারী ২০০০, খ্রীঃ)।

[৫১৪]. **ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড**, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৫৭।

[৫১৫]. বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান নিরোধকল্পে ১৯২৯ সালে "বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন" পাশ হয়। এই আইনের ২ ধারায় বাল্যবিবাহের পক্ষগণের বয়স সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আইনে "শিশু ও নাবালক" বলতে ঐ ব্যক্তিকে বোঝায় যার বয়স পুরুষ হলে একুশ বছরের নীচে এবং নারীর ক্ষেত্রে আঠারো বছরের নীচে হবে। (সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭)।

Dhaka University Institutional Repository

দশ বছর থেকে বারো বছরে উন্নীত করা হয়। সম্মতি দেয়ার বয়স বৃদ্ধিকরণের জন্য নারী সংগঠনগুলো আবেদন করেছিল। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি ১৯২৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী উত্থাপন করা হয়। ১৯২৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এটি পাশ হয় এবং ১ অক্টোবর ১৯২৯ সালে কার্যকর হয়। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ[৫১৬] প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর বিবাহের বয়স ১৬ বছরে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৪ সালে এতে সংশোধনী এনে ছেলে ও মেয়ের বিয়ের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ করা হয়।[৫১৭] তারপরও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইন অমান্য করে এবং বয়স গোপন করে বাল্যবিবাহ দেয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করেন বলে বাল্যবিবাহের বিষয়টি কেউ অভিযোগ হিসেবে উত্থাপন করেন না। এই আইনে স্থানীয় চেয়ারম্যানকেও বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান আদালতে অভিযোগ আনতে পারেন। তবে এই অভিযোগ আনার ব্যাপারে কারো দায়িত্বশীলতা বিশেষ লক্ষ্য করা যায়নি, যার ফলে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতা নেই।[৫১৮] তবে আইনে বাল্যবিবাহের সাথে সম্পৃক্তদের শাস্তির বিধান রয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

শিশু বিবাহকারীর শাস্তি

১৮ বছরের বেশী বয়সী কোন নারী কোন শিশু পুরুষকে অথবা ২১ বছরের কোন পুরুষ যদি কোন শিশু নারীকে বিয়ে করে তাহলে তার ১ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারে। তবে নাবালক মেয়ে বা নাবালক ছেলের কোন শাস্তি হবে না।[৫১৯]

বিয়ে সম্পন্নকারীর শাস্তি

কোনো ব্যক্তি বিয়ের আইনগত বা বৈধ বয়সের কম বর বা কনের বিয়ে সম্পন্ন বা পরিচালনা করলে কিংবা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করলে তার ১ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা তিনি উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারেন।[৫২০]

অভিভাবকের শাস্তি

কোন অভিভাবক যদি বাল্যবিবাহের নির্দেশ প্রদান করে বা বিয়ে বন্ধ করা বিষয়ে গাফিলতি করে তবে ঐ ব্যক্তি ১ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানাসহ উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাল্যবিবাহের কারণে উক্ত ব্যক্তিগণ শাস্তি পেলেও বিয়েটি বৈধ থাকে। অর্থাৎ বিয়ে বাতিল হয় না।[৫২১]

বিয়ে রেজিষ্ট্রি: ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনানুযায়ী মুসলিম পদ্ধতির সকল বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এই বিধান লংঘন করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ১০০০ টাকা জরিমানা ও উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হতে পারে। ১৯৬১ সাল থেকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন

---

[৫১৬]. একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবন যথাঃ বিয়ে, তালাক, অভিভাবকত্ত, মোহর, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ইতাদি মুসলিম পরিবারিক আইন অনুসারে নির্ধারিত হয়। সেজন্য মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে মেয়েরা যেন সুষ্ঠু বিচার পেতে পারে তার জন্য সরকার ১৯৮৫ সালে পরিবারিক কোর্ট স্থাপন করেন। ১৯৮০ সালে যৌতুক বিরোধী আইন, ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন অর্ডিন্যান্স পাস হয়। জাতীয় সংসদে এসিড অপরাধ আইনে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে অ-আপোসযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেওয়ার বিধান পাস করা হয়েছে। অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকার অর্থ দন্ড। এছাড়া এসিড দ্বারা আহত করার জন্য ৭ বছর কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৫১৭]. Taslima Monsoor, **Prevention of child Marriage by the Child Marriage Restraint Act, 1999,** Legal Implications and Social Reality, a Seminar paper. (mimeo)

[৫১৮]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

[৫১৯]. চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

[৫২০]. চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

[৫২১]. চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাবশ্যক করে দেয়া হয়েছে।[৫২২] অথচ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে অশিক্ষিত ও দরিদ্র পরিবারে এবং গ্রামের অধিকাংশ মেয়ের বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হয় না। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন ফরমের (নিকাহনামা) ৫নং অনুচ্ছেদে কন্যা কুমারী, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত নারী কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে; অথচ ছেলের ক্ষেত্রে তদ্রুপ কোন তথ্য চাওয়া হয়নি, বিবাহ রেজিষ্ট্রি ফরমের ১৮ নং ধারায়, "স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়েছে কি না, দিয়ে থাকলে কি কি শর্তে"- এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রয়েছে। অথচ মেয়ের ক্ষেত্রে এরূপ কোন কিছুর উল্লেখ নেই, যা একধরনের বৈষম্য।[৫২৩]

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিয়ে একটি সামাজিক চুক্তি, অথচ চুক্তিতে মেয়ের অধিকার অসম। তালাক, সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং একসঙ্গে চার স্ত্রী রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে ছেলেকে। পক্ষান্তরে নারীকে শুধু মোহরানা ও ভরণ পোষণ প্রাপ্তির অধিকার দেয়া হয়েছে।

হিন্দু বিবাহ আইনঃ ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস করে হিন্দু আইনকে আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরপর ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন, ১৮৬৬ সালে ধর্মচ্যুত হিন্দুর বিবাহ রদ আইন, ১৯২৮ সালে শিশু-বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯৩৭ সালে সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন করা হয়। ভারত বিভাগের পর ভারতে হিন্দু আইনকে সংস্কার ও সংশোধন করে (বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে) যুগোপযোগী আইন পাস হয়।[৫২৪] বাংলাদেশে হিন্দুদের আইনের কোন সংস্কার হয়নি বরং এখনও সনাতন ও গতানুগতিক আইন প্রচলিত রয়েছে।

হিন্দু পুরুষদের বহুবিবাহের রীতি এখনও প্রচলিত। সবর্ণ বিবাহ প্রথাসিদ্ধ; অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হিন্দু আইন বিরোধী ও অসিদ্ধ। এতে সবর্ণ পাত্র-পাত্রী পাওয়া, আবার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক প্রভৃতি মিলিয়ে পাত্র-পাত্রী ঠিক করা এক কঠিন কাজ। হিন্দু মেয়ে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজে যৌতুক প্রথা আজ এক মরণব্যাধি। সবর্ণ বিবাহের প্রথা ও যৌতুক প্রথা প্রভৃতি কারণে হিন্দু মেয়েরা পিতার সংসারে এবং শ্বশুরালয়ে নানা ধরণের মানসিক নির্যাতন এবং শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয়।

হিন্দুধর্মে বিবাহ হয় শাস্ত্রীয় মতে; বিবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের কোন বিধান বা আইন নেই। রেজিস্ট্রেশন হল বিবাহের দলিল। এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, যৌতুক, বহুবিবাহ প্রভৃতি নারী নির্যাতনমুলক কার্যক্রম অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও হিন্দুধর্মে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন করা হয় না।[৫২৫]

---

[৫২২]. শাহনাজ হুদা, **পারিবারিক আইন ও বাংলাদেশের নারী**, সেমিনার পেপার; সম্পাদনা-আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃঃ ১৬৮। ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রি আইন দ্বারা বিবাহ রেজিষ্ট্রি বাধ্যতামূলক এবং বিবাহ বিচ্ছেদের রেজিষ্ট্রি ঐচ্ছিক করা হয়। (শাহনাজ হুদা, **পারিবারিক আইন ও বাংলাদেশের নারী**, সেমিনার পেপার। (mimeo)

[৫২৩]. আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪; চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

[৫২৪]. **ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড**, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৭১।

[৫২৫]. বাংলাদেশের হিন্দু পারিবারিক আইনে বিবাহ বিচ্ছেদকে অনুমোদন না দেয়া হলেও ভারতের আইনে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ভারতের হিন্দু বিবাহ আইন বিবাহ বিচ্ছেদকে অনুমোদন দিয়েছে। (নারী-পুরুষ সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইনের সংস্কার-শীর্ষক আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য, **বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ**, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)। এই আইনের ১৩ ধারা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উপযুক্ত কারণে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে এবং বিচ্ছিন্ন দাম্পত্য পুনরুদ্ধারের জন্যও আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। একই আইনে ১৭ ধারা অনুযায়ী বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের হিন্দু আইনে এরূপ কোন পরিবর্তন হয়নি। (আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, ঢাকাঃ জন অধিকার, ২০০০, পৃঃ ৮৫)। ১৯৯৮ সালের ২৮ আগষ্ট দৈনিক ভোরের কাগজে সাংবাদিক মুন্নী সাহার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইনের ত্রুটিগুলো সংশোধন ও সংস্কারের পক্ষে। এই আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি একটি জরিপ **'Hindu family law: an action study on Proposed reform of hindu family law, 1997'** পরিচালনা করে। এতে দেশের ছয়টি বিভাগের প্রায় ৩০০ হিন্দু নারী-পুরুষ মতামত প্রকাশ করেন। এর মধ্যে দেখা যায়, বর্তমান হিন্দু পারিবারিক আইনে শতকরা ৭৬.৬৭ ভাগ পুরুষ অসন্তুষ্ট এবং মাত্র ২০ ভাগ পুরুষ সন্তুষ্ট। মেয়েদের মধ্যে ৮৪ ভাগ বলেছে, এ আইন একপেশে ও বৈষম্যমূলক। হিন্দু আইনে তালাকের অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন ১৯৫৬: এই আইনে পাশ হবার পূর্বে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া হিন্দু বিধবাগণ তাদের প্রথম বিয়ের কারণে দ্বিতীয় বৈধ বিয়ে করতে রাজী ছিল না। এবং এরূপ বিধবাগণের দ্বিতীয় বিয়ের ফলে জন্ম নেয়া সন্তনেরা অবৈধ বলে গণ্য হত এবং তারা উত্তরাধিকার সুত্রে সম্পত্তির মালিকানা লাভ করত না। যদিও পূর্বোক্ত আইনটি প্রতিষ্ঠিত প্রথার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। কিন্তু এতে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। বর্তমানে বলবৎ আইন দ্বারা হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহের পথে বিরাজমান আইনগত বাধা দুর করা হয়। আইনটির প্রধান দিকগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহের বৈধতা দান: কোন হিন্দু বিধবার ইতোপূর্বে বিয়ে হয়েছিল এবং উক্ত প্রথম স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হবার সময় মৃত ছিল। এমতাবস্থায় মৃত স্বামীর স্মৃতিতে বিধবা থাকার অধিকার পুনর্বিবাহের ফলে ক্ষুন্ন হবে এবং কোন বিধবার দ্বিতীয় বিবাহের কারণে মৃত স্বামীর স্মৃতিতে তার সকল অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।

পুনর্বিবাহের ফলে মৃত স্বামীর সন্তানদের অভিভাবকত্ব: অভিভাবকত্ব মৃত স্বামীর পিতা অথবা পিতামহ অথবা মাতা অথবা মাতামহের নিকট বর্তাবে। এই আইন সন্তানহীন বিধবাকে উত্তরাধিকারী করবে না। কোন বিধবা স্বামীর মৃত্যুর সময় সন্তানহীন থাকলে তিনি তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন না। ধারা: ৭ অনুযায়ী নাবলিকা বিধবার পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে তার পিতা অথবা পিতামহ এবং তাদের অর্বতমানে যারা অভিভাবক অথবা জেষ্ঠ্যভ্রাতার সম্মতি প্রয়োজন। এবং এই আইন অমান্য করলে তার শাস্তি হলো: ধারা ৭ বিধান সত্ত্বে এই আইনের বিরুদ্ধে প্ররোচনাকারী বা সাহায্যকারীর ১ বছর মেয়াদের কারাদন্ড অথবা জরিমানা হতে পারে।

খ্রিষ্টান বিয়ে: খ্রিষ্টান ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২ অনুসারে খ্রিষ্টান বিয়ে আইনসঙ্গত এবং তা গির্জায় অনুষ্ঠিত হয়।[৫২৬] খ্রিষ্টান বিয়ে সম্পর্কে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড এর মতামত হলো: প্রচলিত খ্রিষ্টান পারিবারিক আইন পুরুষের জন্য প্রাপ্তি বয়ে নিয়ে আসে। আর নারী নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপকতর করে। নারীকে ব্যক্তি সত্তার বিত্ত থেকে স্থানচ্যুত করে নারী স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তাকে বহুল্যাংশে বিনষ্ট করে। ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন এখানেও বিদ্যমান।[৫২৭]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে পারিবারিক আইনসমূহে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও ছাড়াও তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ), উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব প্রভৃতি বিষয়ের প্রণীত বিধি-বিধানেও রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য।

দেনমোহর: এটি মুসলিম বিবাহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমগ্র অর্থ চাহিবামাত্র দেয় বলে গণ্য করা হবে।

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯

১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন দ্বারা মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই আইনের ২ ধারা বলে, একজন মুসলিম মহিলা নিম্নলিখিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভের অধিকারী হবেন। যেমন, (১) চার বছর যাবত স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে, (২) স্বামী দুই বছর পর্যন্ত স্ত্রীর ভরণ পোষণ দানে ব্যর্থ হলে, (৩) স্বামী ১৯৬১ সালের সংবিধান লংঘন করে অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করলে, (৪) স্বামী ৭ বা তদুর্ধ সময়ের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হলে, (৫) ৩

থাকার পক্ষে মতামত দিয়েছে ৬০.৬৭ ভাগ নারী এবং ৫৮.৬৭ ভাগ পুরুষ। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে, মেয়েদের পুনর্বিবাহের অধিকারের পক্ষে রায় দিয়েছে ৭২ ভাগ মহিলা ও ৬৮.৬৭ ভাগ পুরুষ। হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে 'বিবাহ নিবন্ধন' প্রয়োজন কি না এ প্রশ্নের জবাবে ৬৫ ভাগ মহিলাই এর প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত দিয়েছে আর ৬২.৬৭ ভাগ পুরুষ এর পক্ষে এবং ৩.৩৩ ভাগ পুরুষ এর বিপক্ষে মত দিয়েছে। এবং ৩৪ ভাগ পুরুষ কোন মন্তব্য করেনি। (*দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৮ আগষ্ট, ১৯৯৮)।

[৫২৬]. **ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭-৭৯।

[৫২৭]. **ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

বৎসর পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, ৬) পুরুষত্বহীনতা থাকলে, ৭) স্বামী পাগল, কুষ্ঠ ব্যাধিতে দীর্ঘদিন আক্রান্ত থাকলে, ৮) ১৬ বছরে স্ত্রীর বিয়ে এবং ১৮ বছরের পূর্বে অস্বীকার করলে, (৯) স্বামী নিষ্ঠুর আচরণ করলে, (১০) স্বামী কলংকিত জীবন যাপন করলে, (১১) স্বামী ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা দিলে, (১২) স্ত্রী বৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর এবং তার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা দিলে, (১৩) স্ত্রীকে দুর্বিণীত জীবন যাপন বাধ্য করলে ।

কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে চাইলে তিনি যে কোন পদ্ধতির নোটিশের ঘোষণার পর চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দেবেন এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের নকল প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের পুনর্মিলনের উদ্দেশ্য সালিশ পরিষদ গঠন করবেন। এবং সালিশ পরিষদ এ জাতীয় পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন ব্যক্তি এ ধারায় বিধান লংঘন করলে ১ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা ৫ বছর টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

বহুবিবাহ: ধারা ৬ অনুসারে, পূর্বাহ্নে সালিশ পরিষদের নিকট থেকে লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন পুরুষ একটি বিবাহ বলবৎকালে অপর একটি বিবাহ করতে পারবে না। বর্তমানে স্ত্রীদের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে এ জাতীয় কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন ১৯/4 অনুসারে রেজিষ্ট্রী হবে না। যে পুরুষ সালিশ পরিষদের অনুমতি ব্যতীত অপর একটি বিবাহ করে তাহলে তাকে বর্তমান স্ত্রীদের তাৎক্ষণিক অথবা বিলম্বিত দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে এবং স্ত্রীদের অভিযোগক্রমে অভিযুক্ত হলে তার এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা হবে।

যৌতুক নিরোধ আইন (১৯৮০): এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল যৌতুক আদান প্রদান ও যৌতুকের দাবি নিষিদ্ধ করা। এই আইন অনুসারে যৌতুক বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত কোন সম্পত্তি বা বিবাহের একপক্ষ অপরপক্ষকে বা বিবাহের কোন পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের যে কোন পক্ষকে মজলিশে বিয়ের পূর্বে বা পরে প্রদান করতে অঙ্গীকার করে।

যৌতুক দাবি করার শাস্তি: কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর কনের অভিভাবকের নিকটে যৌতুক দাবি করলে তাকে ১ বছরের কারাদন্ড বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হতে হবে। এ আইনটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইন (বিশেষ বিধান) ১৯৯৯ এ সংজ্ঞাটি পরিবর্তন করা হয়েছে।[৫২৮]

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫: এই অধ্যাদেশ ১৯৮৫ সালের ১৫ জুন হতে বলবৎ হয়েছে। ৫টি বিষয় সম্পর্কিত মামলা এই আদালতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার রয়েছে, যেমন, ভরণপোষণ, দেনমোহর, অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান, বিবাহ বিচ্ছেদ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার।[৫২৯] দেনমোহর ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, ফলে তারা পারিবারিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন না।[৫৩০]

ভরণপোষণ: ১৯৬১ সালের (MFLO) এর ৯ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যানের মাধ্যমে খোরপোষ দাবি করার বিধান রয়েছে। পারিবারিক আদালতেও ভরণপোষণের দাবিতে মামলা করা যায়। ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারানুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনানুযায়ী একজন মুসলিম নারীর স্বামী

---

[৫২৮]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।
[৫২৯]. গাজী শামছুর রহমান, **পারিবারিক আদালত আইন**, (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল লি:, ১৯৯৮), পৃ: ৩।
[৫৩০]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

যদি ২ বছর খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হন তবে স্ত্রী বিয়ে বিচ্ছেদের দাবিতে মামলা দায়ের করতে পারেন।[৫৩১] তবে ২ বছর পূর্বে সে এটি করতে পারেন না যা এই আইনের একটি সীমাবদ্ধতা।[৫৩২]

অভিভাবকত্ব আইনঃ এ আইনে পিতাকে সন্তানের আইনানুগ অভিভাবক ও মাতাকে স্বাভাবিক অভিভাবক বলে গণ্য করা হয়। এটি সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য। ছেলে সন্তানকে ৭ বছর ও কন্যা সন্তান বয়:প্রাপ্তি অর্জন না করা পর্যন্ত হিফাজতের অধিকার মায়ের।[৫৩৩] পরবর্তী সময়ে আদালত সন্তানের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তাকে মায়ের হেফাজতে দিতে পারেন। মা দ্বিতীয় বিয়ে করলে সন্তানের তত্ত্বাবধানের অধিকার হারান কিন্তু পিতা দ্বিতীয় বিয়ে করলে তা হারান না, যেটি ত্রুটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[৫৩৪]

ভূ-সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রধান সম্পদ হল ভূমি। ভূ-ভিত্তিক কৃষি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। অথচ এই ভূমির উপরই মেয়েদের মালিকানায় রয়েছে বিরাট এক বৈষম্য। নিম্নে বাংলাদেশের আইনে প্রধান তিনটি ধর্মের নারীদের ভূসম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করা হলোঃ

মুসলিম আইনে নারীর উত্তরাধিকারঃ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী নারী-কন্যা, মাতা ও স্ত্রী হিসেবে সম্পত্তির অধিকারী। ভূসম্পত্তিতে নারীদের উত্তরাধিকার নিম্নে প্রদত্ত হল।[৫৩৫]

কন্যা হিসেবে

পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার নিম্নরূপঃ

- মৃত ব্যক্তির যদি এক কন্যা থাকে এবং কোনো পুত্র না থাকে তবে কন্যা অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।
- যদি মৃত ব্যক্তির কোনো পুত্র না থাকে এবং তার দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে তবে তারা মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ সম্মিলিতভাবে পাবে।
- মৃত ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে পুত্র থাকলে, প্রত্যেক পুত্র কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে। অর্থাৎ এক কন্যাসন্তান পিতার সম্পত্তির অর্ধেক পায়, একের বেশি কন্যাসন্তান পায় তিন ভাগের দু'ভাগ। পুত্রসন্তান থাকলে কন্যাসন্তান এক পুত্র সন্তানের প্রাপ্যের অর্ধেক পায়। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী পুত্রসন্তান না থাকলেও পিতার সম্পূর্ণ সম্পত্তি কন্যাসন্তান পায় না, কিছু অংশ আত্মীয়রা পায়। এক্ষেত্রে মুসলিম শিয়া আইন ব্যতিক্রম। পুত্রসন্তান না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি কন্যা পায়। মুসলিম আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি তার বংশ ছাড়া অন্য কাউকে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি দান করতে পারে না এবং বংশে অন্য কেউ থাকলে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাকে উইল করতে পারে না।

স্ত্রী হিসেবে

- মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান নিম্নগামী অধঃস্তন বংশধর বিদ্যমান না থাকলে স্ত্রী সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে।
- মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকলে, স্ত্রী (এক বা একাধিক থাকলে) এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে আটভাগের একভাগ পাবে।

---

[৫৩১]. গাজী শামছুর রহমান, **মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য**, (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল লিঃ, ১৯৯৬), পৃঃ ৫৪।
[৫৩২]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।
[৫৩৩]. গাজী শামছুর রহমান, **মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪।
[৫৩৪]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮-৬৯।
[৫৩৫]. **উন্নয়ন পদক্ষেপ**, পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চদশ সংখ্যা, সম্পাদকঃ রঞ্জন কর্মকার, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

মা হিসেবে

- মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান এমন অধঃস্তন বংশধর বিদ্যমান থাকলে মা ছয়ভাগের একভাগ সম্পত্তি পাবে।
- যদি মৃতের সন্তানাদি বা ছেলের সন্তানাদি না থাকে এবং একজনের বেশি ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মা মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে।

বোন হিসেবে

- মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী কিছু না থাকলে এবং মাত্র একজন বোন থাকলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। আর একাধিক বোন থাকলে তারা তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে।
- মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, পিতা অথবা দাদা বর্তমান থাকলে বোন কোনো সম্পত্তি পাবে না।

হিন্দু আইনে নারীর উত্তরাধিকারঃ হিন্দু পারিবারিক আইনে নারীদের অবস্থা ভীষণ নাজুক। কোনো হিন্দু নারীর পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। যা আছে তা হল জীবনস্বত্ব। অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় ভোগ করতে পারবে, বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না। তাও আবার সকলে পারবে না। হিন্দু আইনে নারীর আইনগত অবস্থান নিম্নরূপ[৫৩৬]:

কন্যা হিসেবে

- মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং স্ত্রী থাকলে কন্যা তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মোটেই পাবে না।
- উপরোক্তরা কেউ না-থাকলে কন্যাদের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যার দাবি প্রথম।
- বন্ধ্যা কন্যা, পুত্রসন্তানহীনা কন্যা, বিধবা কন্যা এবং যেসব কন্যার সন্তান আছে তারা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

স্ত্রী বা বিধবা হিসেবেঃ ১৯৩৭ সালে সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাস হওয়ার পর হতে বিধবা এক পুত্রের সমান অংশ জীবনস্বত্ব পায়। অর্থাৎ বিধবা নারী প্রাপ্ত সম্পত্তি শুধু জীবিত অবস্থায় ভোগ করতে পারে; দান বা বিক্রি করতে পারে না।

মা হিসেবেঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, স্ত্রী এবং পিতা বর্তমান থাকলে মা'র কোনো উত্তরাধিকার নেই।

বোন হিসেবেঃ বোন কোনো অবস্থাতেই তার ভাইয়ের সম্পত্তি পাবে না।

উল্লেখ্য যে, ভারতে ১৯৫৬ সালে Hindu Disposition of Property Act. পাস হওয়ার পর সেখানে এখন পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যা সমান অংশীদার। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু আইনের এ ধরণের কোনো সংস্কার বা পরিবর্তন না হওয়ায় হিন্দু নর-নারীদের অধিকার পূর্বের অবস্থায় রয়ে গেছে।[৫৩৭]

খ্রীষ্টান আইনে নারীর উত্তরাধিকার

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মেয়েদের উত্তরাধিকার নিম্নরূপ[৫৩৮]:

কন্যা হিসেবে অধিকারঃ উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ মোতাবেক পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যা সমান ভাগ পায়।

---

৫৩৬. **উন্নয়ন পদক্ষেপ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।
৫৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।
৫৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী হিসেবেঃ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে বিধবা স্ত্রী এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পাবে। সন্তান না-থাকলে খ্রীষ্টান বিধবা তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পুরোটা পাবে।

মা হিসেবেঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা এবং পিতা বর্তমান থাকলে মা কোনো সম্পত্তি পাবে না।

বোন হিসেবেঃ মৃতের পিতা ও সন্তান জীবিত থাকলে বোন কোনো সম্পত্তি পায় না। তাদের অবর্তমানে মা ও ভাইদের সঙ্গে বোনেরা সমান অংশে সম্পত্তি পায়।

উপরে উল্লেখিত আইনে স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সম্পত্তিতে অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। আইনে উল্লেখ থাকলেও গ্রামবাংলায় মেয়েরা পিতার সম্পত্তি পায় না বা নেয় না। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের অংশীদারিত্ব কার্যকর নেই। এ প্রসঙ্গে মাহবুবুর রহমান এবং ইউলেম ভেন সেনডেলের সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল এই ৫০ বছরে ভূ-সম্পদের নারীর অধিকার কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে সেটাই ছিল তাদের অনুসন্ধানের বিষয়। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার কাগজে মাত্র। তারা সম্পত্তির মালিক হয়নি। সমাজ মনে করে বাড়ির মেয়ে শুধু 'আসবে-যাবে-খাবে'।[৫৩৯]

ধারা-৪ঃ অনুযায়ী উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এরূপ বিধানও রয়েছে যে, যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বন্টনের সময় উক্ত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তান জীবিত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে, যা তাদের পিতা অথবা মাতা জীবিত থাকলে লাভ করত।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ সালের পূর্বে দাদা জীবিত থাকতে বাবা মারা গেলে নাতি নাতনিরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারতো না। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ MFLO প্রবর্তন করে সেটির আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। অর্থাৎ দাদা জীবিত থাকাবস্থায় পিতা জীবিত থাকলে সন্তানরা যেভাবে সম্পত্তির অংশ পাবে মারা গেলেও একইভাবে পাবে।[৫৪০] এ পরিবর্তনে ধর্মীয় কোনো বাধা যদি না থাকে তবে ছেলে ও মেয়ে সমান অনুপাতে সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে কি না তা বিবেচ্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকারের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না। সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকারের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ধর্মকে দোষারোপ করা হচ্ছে।[৫৪১]

বাংলাদেশে পারিবারিক ক্ষেত্রে কার্যকর যে মুসলিম আইন রয়েছে তাহলোঃ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরীয়ত) ১৯২৯, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, মুসলিম বিবাহভঙ্গ আইন ১৯৩৯ (৮নং), মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৪, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) আইন ১৯৮৩ ও ১৯৯৫ ইত্যাদি।

তবে এসকল আইন প্রণীত হলেও সার্বিকভাবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকারের আইন কার্যকর করার কোনো পদক্ষেপ ছিল না। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) নারীর জীবনধারণ ও তাকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণমূলক কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রি করার আইন এবং ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রিকরণের বিধিমালার প্রণয়ন করে মৌখিক বিবাহ ও মৌখিক তালাকের সংকট কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৯৭৫ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রামের দুঃস্থ বিধবাদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচি যুক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

---

[৫৩৯]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।
[৫৪০]. গাজী শামছুর রহমান, **মুসলিম পরিবার আইনসমুহের ভাষ্য**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।
[৫৪১]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।

বিশ্ব নারী দশকের (১৯৭৬-১৯৮৫) কর্মসুচি এবং পরবর্তী ২০০০ সাল পর্যন্ত গৃহীত কর্মসুচিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়ম রক্ষার জন্য 'উন্নয়ন, সমতা ও শান্তি'র স্লোগানকে সামনে রেখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য কর্মসুচি গ্রহণ করলেও তা সরকারি রাজনৈতিক দলের মহিলাদের ও সরকারি সংস্থার মধ্যেই সীমিত ছিল।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণ সংক্রান্ত (সিডও) সনদের প্রতি সরকার আংশিকভাবে স্বীকৃতি দেন ব্যাপক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। নারীবর্ষ ও নারীদশক পালনের বেসরকারি তৎপরতার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো আলোচ্য দলিলের (সিডও সনদ) গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং ১৩টি নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওই দলিলের প্রতি সরকারের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে। জাতিসংঘের ঢাকাস্থ তথ্যকেন্দ্রের সহায়তায় দলিলটির বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সারাদেশে প্রচারিত হয় এবং ৫০ হাজারের অধিক নারীর স্বাক্ষরসহ দাবিনামা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ মহিলা সংগঠন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সরকার দলিলটির আংশিক স্বীকৃতি দেন। মুসলিম আইনের পরিপন্থী বলে সরকার এই সনদের ২, ১৩ (ক) ও ১৬ (গ) নং ধারার প্রতি অস্বীকৃতি জানায়।

স্বাধীন বাংলাদেশে নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্যাতনকারীদের শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই আইনের লংঘনকারীদের শাস্তির দেওয়ার বিধান রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০

এই আইন সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নিবর্তক শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। এবং ১৯৯৫ সালে উক্ত আইনটি সংশোধন করা হয় এবং এ্যাক্ট হিসেবে প্রণয়ন করা হয়। ২০০০ সালে সংসদে এই আইনটিতে নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত কতিপয় ঘৃণ্য অপরাধের জন্য বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

ধর্ষণ ও শাস্তিঃ

বাংলাদেশে বলবৎ ১৯৬০ সালের দন্ডবিধির ভাষ্য- এর ৩৭৫ ধারায় 'ধর্ষণ' এবং ৩৭৬ ধারায় নারী ধর্ষণের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। নারী ধর্ষণ বলতে নারীর বিনা অনুমতিতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতীত্ব হরণকে বুঝায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলতে প্রত্যক্ষ আগ্রহের অভাব এবং সম্মতি ব্যতিরেকে বলতে স্বাধীনভাবে অনুমতি না দেওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কোন ব্যক্তির মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা আসক্ত হয়ে সম্মতি প্রদান করলে তাকে স্বাধীন সম্মতি বলা যায় না।[৫৪২]

৩৭৬ ধারা অনুসারে, যে ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করে, তার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া অর্থদন্ডেও দন্ডিত হতে পারে, যদি না ধর্ষিতা নারীটি তার নিজ স্ত্রী হয় এবং সে ১৩ বৎসরের কম বয়সী না হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যা দুই বছর পর্যন্ত বা অর্থ দন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।

---

[৫৪২]. ৩৭৫ ধারায় বিধৃত সংজ্ঞানুসারে 'যে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ছাড়া নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বর্ণনাধীন যে কোন অবস্থায় কোন নারীর সাথে যৌন সহবাস করে তাহলে সে ব্যক্তি নারী ধর্ষণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। **প্রথমতঃ** তার (নারী) ইচ্ছার বিরুদ্ধে। **দ্বিতীয়তঃ** তার (নারী) সম্মতি ছাড়া। **তৃতীয়তঃ** তার (নারী) সম্মতিতে, যদি সেক্ষেত্রে তাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখিয়ে সম্মতি আদায় করা হয়। **চতুর্থতঃ** তার (নারী) সম্মতিতে, যে ক্ষেত্রে লোকটি জানে যে, সে তার স্বামী নয় এবং সে (নারী) বিশ্বাসে সম্মতি দেয় যে, সে (পুরুষ) এমন একজন পুরুষ যার সাথে সে আইনানুগভাবে বিবাহিত নয় অথবা সে নিজেকে তার সাথে আইনানুগভাবে বিবাহিত নয় বলে বিশ্বাস করে। **পঞ্চমতঃ** তার সম্মতিসহ বা ব্যতিরেকে যে ক্ষেত্রে সে চৌদ্দ বছরের কমবয়সী হয়। তবে এ ধারার ব্যতিক্রম হচ্ছে, কোন পুরুষ দ্বারা স্ত্রীর সাথে যৌন সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর বয়স তের বছরের কম না হলে নারী ধর্ষণ বলে গণ্য করা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ ১৯৮৩

নারী নির্যাতনে নিবর্তক শাস্তি বিধান করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিম্নে আলোচিত হল:

যদি কেউ যে কোন বয়সের নারীকে অপহরণ করে (ক) পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অথবা বেআইনী কর্মে নিযুক্ত করার জন্য (খ) এরূপ নারীকে কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করার জন্য (গ) অথবা নারীকে বেআইনী সহবাসে প্রলুব্ধ বা বাধ্য করে তবে ঐ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যা জরিমানাযোগ্য।

নারী ব্যবসা পরিচালনায় শাস্তি: যদি কেউ যে কোন বয়সের নারী আমদানি ও রপ্তানি, বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করে তবে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি: যদি কেউ যৌতুকের জন্য কোন নারীর মৃত্যু ঘটায় বা চেষ্টা করে বা আঘাত দেয় তবে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ধর্ষণকালে মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি: যদি কেউ ধর্ষণ করার সময় কোন নারীর মৃত্যু ঘটায় বা ধর্ষণের পর খুন করে তবে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫: এই আইনটি ধর্ষণ, নারী পাচার, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, শিশু পাচারের শাস্তি, ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টার শাস্তি, মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি, ক্ষয়কারী, বিষাক্ত অথবা দাহ্য দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি ও অপরাধের তদন্ত ইত্যাদি রোধ করা এবং তরান্বিত করার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। এটির কয়েকটি ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় ১৯৯৯ সালে এটির সংশোধনী আনয়নের জন্য নারী সংগঠন কর্তৃক খসড়া প্রস্তাব দেয়া হয়।[৫৪৩]

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অবস্থান

নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে মৌলিক অধিকারসহ সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদান করা হয়েছে। সমাজে নারীসহ অন্যান্য দুর্বল অংশকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা দেয়ার অঙ্গিকারও সংবিধানে রয়েছে।[৫৪৪] প্রশাসনে নারীর উচ্চপদে চাকরি করার সাংবিধানিক কোন বিধি নিষেধ নেই। এমনকি সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান হতেও কোন বাধা নেই। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলেও বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। নর-নারী নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ৯, ১০, ২৭, ২৮(১)(২)(৩)(৪) এবং ২৯(১), ৬৬, ১২২ নং ধারায় নারীকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদানসহ নারী-পুরুষ সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের

---

৫৪৩. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯।

৫৪৪. নারী পুরুষ নির্বিশেষে সংবিধানে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভোটাধিকার, চাকরিতে অধিকার, বাক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, আইনের সমান অধিকার, সভা সিমিতির অধিকার, নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির অধিকার, সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার, সভা সমিতির আয়োজন করার ও সভা সমিতিতে যোগদান করার অধিকারের প্রেরণা গ্রহণের অধিকার, বিবাহ সম্পর্কিয় অধিকার ইত্যাদি। (**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত। ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ তারিখে গৃহীত সবশেষ অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংশোধনীসহ সকল সংশোধনী পকেট সাইজ সংকলন)।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের কোথাও নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ধরণের পার্থক্য করা হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো নিম্নরূপ[৫৪৫]:

ধারা - ৯: রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমুহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।[৫৪৬]

ধারা - ১০: জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।[৫৪৭]

ধারা - ১৪: রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে কৃষক, শ্রমিক এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমুহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান ।[৫৪৮]

ধারা - ১৫: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা। (খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিণাম বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।[৫৪৯] (গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার।[৫৫০]

ধারা - ১৭: (ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতিতে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।[৫৫১]

ধারা - ১৮: (১) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন।[৫৫২] এবং বিশেষত: আরোগ্যে প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[৫৫৩]

ধারা - ১৯: (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিকতা ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন

---

[৫৪৫]. উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাগুলি হুবহু সংবিধানের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধু ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫৪৬]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** দ্বিতীয় ভাগ, স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্টান সমুহের উন্নয়নে, ধারা ৯। এই ধারায় স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫৪৭]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান,** দ্বিতীয় ভাগ, জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, ধারা ১০।

[৫৪৮]. দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে বাংলাদেশের জনগণের অনগ্রসর অংশেই নারীর অবস্থান এবং আর্থ সামাজিক দিক থেকে নারীদের স্থান সবচেয়ে দুর্বল। সুতরাং সংবিধানের ১৪ নং ধারাটি বাংলাদেশের দরিদ্রতম নারী জাতির বেলায় প্রযোজ্য।

[৫৪৯]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** ধারা ২০ (১) এবং ধারা ১৫ (খ)। এই ধারা অনুযায়ী কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরি নির্ধারণের বিধান উল্লেখ রয়েছে। এখানে নারী বা পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই ।

[৫৫০]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** দ্বিতীয় ভাগ, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, ধারা ১৫ (ক) ও (গ)। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে।

[৫৫১]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** ধারা ১৭ (ক)। অবৈতনিক ও বাধ্যমুলক শিক্ষা প্রাইমারী শিক্ষা ছেলেমেয়ে (৬ থেকে ১০ বছর) উভয়ের জন্য বাধ্যতামুলক নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য গ্রাম এলাকায় দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক এবং উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে।

[৫৫২]. বাংলাদেশের শতকরা ৬৩৪ জন দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। আর মেয়েরা এই দরিদ্রের মধ্যেও দরিদ্রতম। বিশেষত: অধিকাংশ মায়েরা পুষ্টিহীনতার কারণে প্রতি বছরে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের প্রসবকালীন জটিলতার কারণেও প্রতিবছর অসংখ্য নারীর মৃত্যু হচ্ছে।

[৫৫৩]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** ধারা ১৮(১) ও (২)। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, ইসলামী শরীয়তে হারাম জিনিসকেও আরোগ্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম দেশে শরীয়তে নিষিদ্ধ মদসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তকেও হারাম হিসেবে পাস করা উচিত। মদপান, গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলাকে সংসদের বিল পাসের মাধ্যমে আইগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। এর ফলে সামাজিক পরিবেশ উন্নত হবে এবং যুব সমাজের নৈতিকতার মান উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। ইসলামের দৃষ্টিতে মদপান, গণিকাবৃত্তি এবং জুয়াখেলা দুটোই হারাম বা অবৈধ।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।[৫৫৪]

ধারা - ২০: (১) কর্ম হইতেছে নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী, এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কায়িক সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

ধারা - ২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

ধারা ২৮ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।[৫৫৫]

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা বাধ্যবাধকতা বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।[৫৫৬]

ধারা - ২৯ (১) : প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।[৫৫৭]

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই (ক) নাগরিকদের কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[৫৫৮]

ধারা - ৩১ : আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সুনাম ও সম্পত্তির হানি ঘটে।

ধারা -৩২ : আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবনও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।[৫৫৯]

---

৫৫৪. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** দ্বিতীয় ভাগ, সুযোগের সমতা, ধারা ১৯, ১, ২, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০। এই ধারা অনুযায়ী সামাজিকভাবে নারীরাও পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে এবং রাষ্ট্রের পরিচালক এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫৫৫. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধারা ২৮ ১। ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচারও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। (২০০০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত) ১৯৯৬ সালের ২৮ শে মার্চ তারিখের গৃহীত সর্বশেষ অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংশোধনীসহ সকল সংশোধনী পকেট সাইজ সংকলন।

৫৫৬. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধারা ২৮, ২, ৩, ৪, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৫৫৭. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** ধারা ৪০ এবং ধারা ২৯ (১) ও (২)। এই আইনের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী ও পুরুষ প্রজাতন্ত্রের যে কোন পদ বা অন্য যে কোন পেশা তার যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রহণের অধিকার রাখে।

৫৫৮. এই আইনের আওতায় বর্তমান সরকার (চার দলীয় ঐক্যজোটের সরকারের প্রধানমন্ত্রী মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য পড়ার খরচ ও উপবৃত্তি চালু করেছে। বর্তমানে ডিগ্রী পর্যন্ত মেয়েরা বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়াও নারীর উন্নয়ন, দারিদ্রতা বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

৫৫৯. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা। ধারা ৩২, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৩৪ (১) : সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডণীয় অপরাধ বলিয়া গন্য হইবে।[৫৬০]

ধারা ৩৬ : জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুন:প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[৫৬১]

ধারা ৩৭ - : জনশৃঙ্খল বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[৫৬২]

ধারা - ৩৮ : জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করিবার অধিকার থাকিবে।[৫৬৩]

ধারা - ৩৯ : (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।[৫৬৪]

ধারা - ৪০ : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহনের এবং যে কোন আইন সঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

ধারা - ৪২ : (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামুলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা দখল করা যাইবে না।[৫৬৫]

ধারা - ৬৫ : (৩) সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যহতি পরবর্তি সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যহতি পরবর্তিকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইনানুযায়ী পুর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।[৫৬৬]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্থায়ী সংবিধান ১৯৭২ সালে বিধিবদ্ধ হয়। এ সংবিধানে নারীর বিশেষ অধিকার নিশ্চিত করা হয়। ১৯৯৭ সালের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা বলা হয় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ক্ষেত্রে নবম ও দশম অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহে মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার কথা বলা হয়। ১৯৭৮ সালের বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনী আদেশে বলা হয়, জাতীয় সংসদের ১৫ বছরের জন্য ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পূর্বে ১৫টি আসন সংরক্ষিত ছিল ১০ বছরের জন্য।

---

[৫৬০]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** ধারা ৩৪ (১), যবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।

[৫৬১]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** তৃতীয় ভাগ, চলাফেরার স্বাধীনতা। ধারা ৩৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০। এই আইনের আওতায় একজন নারী তার প্রয়োজনে যে কোন জায়গায় যেতে এবং আসতে এবং বসবাস করতে পারবে যুক্তিসংগত কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া।

[৫৬২]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** তৃতীয় ভাগ, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধারা ৩৭, পৃঃ ২০। এই ধারার বিধান অনুযায়ী একজন পুরুষের মত একজন নারীও সভা সমাবেশে যোগদানের অধিকার রাখে।

[৫৬৩]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** তৃতীয় ভাগ, সংগঠনের স্বাধীনতা, ধারা ৩৮, পৃঃ ২০। এই ধারা অনুযায়ী একজন নারী স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরোধী নয়, এরকম সংগঠন করার অধিকার রাখে।

[৫৬৪]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশের সংবিধান,** ধারা ২৭, আইনের দৃষ্টিতে সমতা; ধারা ৩১, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার; ধারা ৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।

[৫৬৫]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** তৃতীয় ভাগ, সম্পত্তির অধিকার, ধারা ৪২ (১), এই আইনে যে কোন নারীর সম্পত্তির মালিক হওয়া, সম্পদ বিলি বিক্রি হস্তান্তর করার অধিকার রয়েছে। তবে অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে।

[৫৬৬]. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** ধারা ৬৫ (৩), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১। মহিলারা নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের প্রতিনিধির দ্বারা তাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এই ৩০টি সংরক্ষিত আসন ছাড়াও মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বি এন পি থেকে একজন (বেগম খালেদা জিয়া) এবং আওয়ামী লীগ থেকে তিনজন (আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, মতিয়া চৌধুরী ও সাজেদা চৌধুরী) প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনী আইন দ্বারা সংবিধানের ৬৫ (৩) নং অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়। এই সংশোধনী দ্বারা সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আসন আরও দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ১৫ বছর সময় উত্তীর্ণ হবার ফলে এই সংশোধনী আইনের প্রয়োজন হয়। তবে শর্ত থাকে যে, এই দফায় কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিবৃত্ত করিবে না।"

জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দিতা এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও সংবিধান নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেনি। এ বিষয়ে সংবিধানের ৬৬(১) (২) এবং ১২২ ধারায় বলা হয়েছে-

ধারা- ৬৬ : (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সংসদ সদস্য হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।

ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

[আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;]

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

ধারা - ১২২ : (২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি।

- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
- (খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;
- (গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;
- (ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

সাংবিধানিক এই স্বীকৃতির পরও দেশের নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বলা হয় ওই পদ্ধতি দেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেকটা সুগম করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারা বা উপাধারায় নারী পুরুষের কোন প্রকার বৈষম্য করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে সংবিধান ছাড়াও নারীর অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হযেছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐ সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাহলে বাংলাদেশের নারী সমাজ অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সম্মানজনক ও বিশ্বের বুকে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ

নারী উন্নয়নকল্পে বিশ্বের নারী প্রগতিবাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের ধারা প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জোরদার হয়েছে। তবে পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই কতিপয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল।[৫৬৭] বাংলাদেশ সরকারও নারী উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্যোগ ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্যোগ

বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর শেষ ও ৭০ এর দশকের প্রারম্ভে একদল উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তৃতীয় বিশ্বে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে তাতে নারীরা যতক্ষণ না এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন, ততক্ষণ বিশ্বের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এ ধারণাকে Women in Development (WID) নামে সম্বোধন করা হয় যা উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধারা সৃষ্টি করে এবং ১৯৭৬-৮৫ সময়কে আন্ত র্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। তাছাড়া ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সব ধরনের নারী বৈষম্য দূরীকরণের সনদ Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW)[৫৬৮] অনুমোদন করে। জাতিসংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলন, যথাঃ মেক্সিকো (১৯৭৫), কোপেনহেগেন (১৯৮০), নাইরোবী (১৯৮৫) এবং বেইজিং (১৯৯৫)।[৫৬৯] নারী দশক, নারী বর্ষ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন বিশ্বব্যাপী নারীদের সচেতনতা এবং অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের নারীদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশে সিডো সনদ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন ও শিক্ষিত সমাজ সরকারের কাছে আবেদন জানানোসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করছে।

জাতিসংঘ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর মুক্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। এই আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের নারীরা জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছেন। ১৯৪৫ সালে নারী পুরুষের

---

[৫৬৭]. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে গঠিত সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল এলায়েন্স অব উইমেন, ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ক্যাথলিক উইমেন, ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল লীগ ফর পীস এন্ড ফ্রিডম, ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন, ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিজনেস এ্যান্ড প্রফেশনাল উইমেন।

[৫৬৮]. সিডো সনদ বাস্তবায়নের পশ্চাৎপদে রয়েছে তিন দশকের দীর্ঘ ইতিহাস। জাতিসংঘ এবং বিশ্বের সচেতন নারী সমাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী নারীর পশ্চাৎপদতা ও বৈষম্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ Commission of states of woman (নারীর মর্যাদা কমিশন) নামে একটি কমিটি প্রতিষ্টা করে, নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করাই ছিল যার প্রধান উদ্দেশ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে নারীর মর্যাদা কমিশনের কার্যক্রম এবং সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটা ছিল নারী পুরুষের সমতা স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। (তাহমিনা আখতার, **'মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ পেক্ষাপট'**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃঃ ১৩৪-১৩৫)। পরবর্তীতে জাতিসংঘে নারীর রাজনৈতিক অধিকার, বিবাহিত নারীর নাগরিকত্ব, বিবাহের সম্মতি দাসত্ব ও পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের সঠিক রূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসন বিষয়ক একটি ঘোষণা গৃহীত হয় যাতে উক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও নারীর অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করার অধিকার বিধৃত হয়। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে প্রণীত হয় বিখ্যাত সনদ সিডো। (বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, **"বাংলাদেশের নারী সমাজের স্থিতিসত্তা ও আইনগত অধিকার","মানবাধিকার ও উন্নয়ন সমীক্ষা"**, হিউম্যানিষ্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ২৩-২৪)।

[৫৬৯]. সম্পাদনাঃ আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হয়।[৫৭০] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ১ ডিসেম্বর ৮৮০ জন সদস্য নিয়ে 'বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন' (ডওউঋ) নামে একটি আন্তর্জাতিক নারী সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠন নারীর মর্যাদার বিষয়টিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোকে বিচার করতে থাকে।[৫৭১] এছাড়াও এই সংগঠন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের নারী উন্নয়ন কল্পে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সনদ ও দলিল রচিত হয়েছে।[৫৭২] ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার এবং সরকারি যে কোনো দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে।[৫৭৩] ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়সসীমা এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন অনুমোদন করে।[৫৭৪]

১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ সাধন বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি। উক্ত ঘোষণাপত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহা অপরাধ' বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের ২৫ তম অধিবেশনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয় এবং আলোচ্য দলিলটির খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া স্থিরকৃত হয়। উক্ত কমিশনের অধিবেশনে গৃহীত দলিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধির দ্বারা মাতৃত্ব রক্ষা, সমান কাজে সমান মজুরি, নারীর শ্রমরক্ষা, শিশুর নিরাপত্তা ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত নারীবর্ষকে (১৯৭৫) সামনে রেখে দেশে দেশে নারী সমাজের প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীর স্বার্থে নতুন নতুন আইন তৈরীর তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। দীর্ঘ তিন শতকের উপলব্ধিকে সামনে রেখে, জাতিসংঘের নানাবিধ পদক্ষেপের পরেও ফল লাভের কেন্দ্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষ ঘোষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল জাতিসংঘ।[৫৭৫] পরবর্তীতে নারী অধিকার রক্ষায় যে সকল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫)

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে 'সমতা' উন্নয়ন ও শান্তি'– এই শ্লোগান ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি 'বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (The World Plan Action) গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষণার প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এই সম্মেলনে নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করে এবং নারীদেরকে যে কোনো ধরনের

---

[৫৭০]. শাহিন রহমান, **জেন্ডার প্রসঙ্গ**, (ঢাকা: স্টেপস্ স্টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮), পৃ: ১৫।

[৫৭১]. বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন এর ঘোষণায় বলা হয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল নারীকে WIDF একত্রিত করতে চায়, যেন তারা নাগরিক হিসেবে, মা হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে অধিকার আদায় করতে পারে, শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারে।

[৫৭২]. ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদ, ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ সভায় স্বীকৃত নারীর প্রতি পুরনো ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত আচার আচরণ ও আইনের নির্মূলকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা এবং ১৯৬৩-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সভায় ও ঘোষণায় নারীর প্রতি প্রদর্শিত সকল বৈষম্য দুর করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

[৫৭৩]. মালেকা বেগম, **"নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ"**, **নারী: রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ**, সম্পাদনা মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, (ঢাকা: সমাজ নীরিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯০), পৃ: ১০০।

[৫৭৪]. শাহিন রহমান, **জেন্ডার প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

[৫৭৫]. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০১-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান হয়। মেক্সিকো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ[৫৭৬] :

- আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (World Plan Action) অনুমোদন করা।
- ১৯৭৬-৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক ঘোষণা করা।
- নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।
- নারীবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা – যার নাম দেয়া হয় United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW).[৫৭৭]

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)

১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW (সিডও)।[৫৭৮] বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল পরিণতি ছিল এই সনদ। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।[৫৭৯]

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপারিশমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষার সমান সুবিধা ও পাঠক্রম অনুসরণে সমান সুযোগ, নিয়োগ ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সিডও সনদে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা। ১ থেকে ১৬ ধারা নারী পুরুষের সমতা সংক্রান্ত, ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক, এবং ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডওর প্রশাসন সংক্রান্ত। সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, "নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধির বিকাশ ব্যাহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।"[৫৮০] সিডও সনদের নারীসংক্রান্ত ধারাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অনুচ্ছেদ - ১ ঃ এই কনভেনশনে "নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অভিব্যক্তির অর্থ হবে, যেকোন ধরণের পার্থক্য, বিয়োজন অথবা প্রতিবন্ধক, যা লিঙ্গের ভিত্তিতে করা হয় এবং যার ফলে বা কারণে বৈবাহিক মর্যাদা নিরপেক্ষভাবে এবং নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে প্রাপ্য নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

---

[৫৭৬]. Jahanara Huq et.al. **Beijing Process and Follow-up. Bangladesh Perspective,** (Dhaka: Women for Women, 1997), p: 14-16.

[৫৭৭]. সম্পাদনা: আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬২-২৬৩।

[৫৭৮]. জাতিসংঘ পরিষদে গৃহীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।

[৫৭৯]. সম্পাদনা: আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৩।

[৫৮০]. সম্পাদনা: আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক, পৌর অথবা অন্যকোন ক্ষেত্রের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, উপভোগ অথবা অনুশীলনকে খর্ব করে।[৫৮১]

অনুচ্ছেদ - ২ ঃ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ এর সকল ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের নিন্দা করে তা দূর করতে সর্বপ্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বনে একমত এবং অবিলম্বে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য পরিহারের নীতি অবলম্বনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করবে:

- ইতিপূর্বে জাতীয় সংবিধান অথবা অন্যান্য যথাযথ আইনগত উপায়ে নারী-পুরুষের সমতার নীতি বাস্তবে রূপায়িত না হয়ে থাকলে তা এতে অঙ্গীভুত হবে এবং আইন ও অন্যান্য যথাযথ উপায়ে এই নীতির বাস্তব রূপায়ণ নিশ্চিত করবে;
- নারীদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যথাযথ আইনগত ও অন্যান্য বিধিবিধান গ্রহণ করবে;
- পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের আইনানুগ সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং যেকোন ধরণের বৈষম্যমূলক তৎপরতা থেকে উপযুক্ত জাতীয় বিচারাদালত এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীদের কার্যকর সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক যেকোন কাজ বা তৎপরতায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখবে এবং নিশ্চয়তা বিধান করবে যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাধ্যবাধকতা অনুসারে কাজ করবে;
- যেকোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক অনুসৃত নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দুর করার জন্য সকল প্রকার যথাযথ উপায় গ্রহণ করবে;
- নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক প্রচলিত আইন, বিধিবিধান, প্রথা এবং তৎপরতাসমূহ পরিবর্তন অথবা রদ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে;
- নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক সকল প্রকার জাতীয় ফৌজদারী দন্ডের বিধান বাতিল করবে।[৫৮২]

অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারী সমাজের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অনুশীলন ও উপভোগের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করবে।[৫৮৩]

অনুচ্ছেদ - ৪ ঃ (ক) নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বেগবান করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা এই কনভেনশনে বর্ণিত বৈষম্য বলে গণ্য হবে না। তবে এটাকে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা অথবা পৃথকমান বজায় রাখার উপায় বলে গণ্য করা হবে না। এই সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা সুযোগ-সুবিধা এবং আচরণের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌঁছার সাথে সাথে রহিত বিবেচিত হবে।
(খ) মাতৃকালীন সুরক্ষার লক্ষ্যে এই কনভেনশনে গৃহীত ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা ও বৈষম্য বলে বিবেচিত হবে না।[৫৮৪]

অনুচ্ছেদ - ৫ ঃ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকার যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

- কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথাগত এবং অন্যান্য সকল প্রকার তৎপরতা যেসব গড়ে উঠেছে লিঙ্গের কারণে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বিবেচনা করা থেকে অথবা নারী-পুরুষের জন্য বাধাধরা নিয়মকানুনের উপর

---

[৫৮১]. গাজী শামছুর রহমান, **নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন (ভাষ্য সহ)**, (ঢাকা: বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, জুন ১৯৯৪), পৃ: ১২।
[৫৮২]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০।
[৫৮৩]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।
[৫৮৪]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬।

ভিত্তি করে সেগুলো অপনোদনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের আচরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নমুনা পরিবর্তন করবে;

- মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কর্ম এবং সন্তান প্রতিপালন ও তার বিকাশে নারী-পুরুষের যৌথ দায়িত্বের স্বীকৃতির জন্য যথাযথ উপলব্ধিসহ পারিবারিক শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করবে। এই বিষয়টি উপলব্ধিতে নিতে হবে যে, সকলক্ষেত্রেই সন্তানের স্বার্থ প্রাথমিক ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়।[৫৮৫]

অনুচ্ছেদ - ৬ ঃ নারী সংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যবসায় এবং দেহপসারিণী হিসেবে নারীদের অপব্যবহার দমন করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ আইনগত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।[৫৮৬]

অনুচ্ছেদ - ৭ ঃ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও গণজীবনে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে এবং পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীর নিম্নবর্ণিত অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধান করবে ঃ

- সকল প্রকার নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদানের অধিকার এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে প্রার্থী ও নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ;
- সরকারের নীতি নির্ধারণ ও নীতিসমূহ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, জনকল্যাণে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি, সেই সঙ্গে কার্যভার গ্রহণ এবং সর্বস্তরের সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনা;
- দেশের গণজীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সংগঠনসমূহের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ।[৫৮৭]

অনুচ্ছেদ - ৮ ঃ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকেই নারীদেরকে আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজ করার সুযোগ সুনিশ্চিত করতে সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।[৫৮৮]

অনুচ্ছেদ - ৯ ঃ ১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীর জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা ধারণ করার অধিকার প্রদান করবে। বিশেষভাবে বিদেশীর সাথে কোন নারী পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হলে অথবা বিবাহিত অবস্থায় স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তন হলে, স্ত্রীকে স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে বাধ্য না করা এবং স্ত্রীকে যাতে জন্মসূত্রে স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় গৃহীত বা অর্জিত জাতীয়তা হারাতে না হয় অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রকে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ শিশুর জাতীয়তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকার প্রদান করবে।[৫৮৯]

অনুচ্ছেদ - ১০ ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং বিশেষভাবে নারী-পুরুষের সমতার নীতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে ঃ

- গ্রাম ও শহর অঞ্চল নির্বিশেষে পেশা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা লাভ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার এবং সকল ধরণের শিক্ষামূলক প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য অভিন্ন শর্ত হবে। এই সমতা প্রাক স্কুল পর্যায়; সাধারণ কারিগরি, বৃত্তিমুলক এবং উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাসহ সকল ধরণের বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হবে;

---

[৫৮৫]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।
[৫৮৬]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০।
[৫৮৭]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।
[৫৮৮]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।
[৫৮৯]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

- অভিন্ন পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অভিন্ন পরীক্ষা, সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী, বিদ্যালয় ভবন ও প্রাঙ্গণ এবং শিক্ষা উপকরণসমূহ অভিন্ন মানসম্পন্ন হবে;
- সহশিক্ষা উৎসাহিতকরণ এবং এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক সংস্করণ, বিদ্যালয় কার্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে যেকোন পর্যায়ের যেকোন ধরণের গতানুগতিক ধারণার অপনোদন করবে;
- শিক্ষামূলক বৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক মঞ্জুরী থেকে উপকৃত হওয়ার অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে;
- শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য যত কম সময়ে সম্ভব হ্রাস করার জন্য বয়স্কশিক্ষা ও ব্যবহারিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচীসহ সম্প্রসারিত শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে;
- নারীদের শিক্ষাজীবনের মাঝ পথে ঝরে যাওয়া বা বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার কমাতে হবে এবং অকালে স্কুল থেকে ঝরে যাওয়া বালিকা ও নারীদের জন্য শিক্ষামুলক কর্মসূচী সংগঠন করবে;
- খেলাধুলা ও শরীরচর্চামুলক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অভিন্ন সুযোগ থাকবে;
- পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও নির্দেশনাসহ সুনির্দিষ্ট শিক্ষামুলক তথ্য লাভের অধিকার থাকবে।[৫৯০]

অনুচ্ছেদ - ১১ ঃ ১. নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে তাদের অভিন্ন অধিকার সুনিশ্চিত করতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে, বিশেষভাবে ঃ

- মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের কাজ করার অবিচ্ছেদ্য অপ্রতিরোধ্য অধিকারের অংশ হিসেবে নারীদের কাজ করার অধিকার;
- অভিন্ন নির্বাচন নীতিমালাসহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ;
- বৃত্তি ও কর্ম পছন্দের অবাধ অধিকার, পদোন্নতি, কর্মের নিরাপত্তা এবং চাকরির সুবিধা ও শর্তেও সমতার অধিকার এবং শিক্ষানবিসকালসহ পেশাগত প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণ ও পৌণঃপুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;
- সমমানের কাজের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধাসহ সমান মজুরী এবং সমআচরণ সেই সঙ্গে কাজের মানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি পোষণ করা;
- অবসর জীবন, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অসমর্থতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার ব্যাপারে অন্যান্য অক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সেই সঙ্গে সবেতন ছুটির অধিকার;
- প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার নিশ্চয়তাসহ কাজের শর্ত ও পরিবেশ স্বাস্থ্য সুরক্ষামুলক ও নিরাপদ হওয়ার অধিকার;

২. বিবাহ বা মাতৃত্বের কারণে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করা এবং তাদের কর্মের অধিকার কার্যকরভাবে সুনিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ উপায় অবলম্বন করবেঃ

- গর্ভধারণ বা মাতৃত্বজনিত কারণে কর্মচ্যুতি, বিশেষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার হওয়াকে এবং বৈবাহিক কারণে চাকরিচ্যুত হওয়ার মত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা;
- সবেতন মাতৃত্ব ছুটির প্রবর্তন অথবা পূর্ববর্তী কর্ম, পদমর্যাদা জৈষ্ঠ্যতা কিংবা সামাজিক ভাতা ইত্যাদির হানি না করে সমতুল্য সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন, কর্মস্থলে অর্পিত দায়িত্ব পালন, সেই সাথে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণে সহায়তা করার প্রয়োজনে সামাজিক স্তরে পরিপূরক সেবাধর্মী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা, বিশেষ করে শিশুদের তত্ত্বাবধানের সুযোগ-সুবিধামূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা;
- নারীদের জন্য ক্ষতিকর বা হানিকর হতে পারে, গর্ভধারণকালীন সময়ে তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

---

[৫৯০]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এই অনুচ্ছেদের আওতায় নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা সম্বলিত বিধিবিধান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময়ে সময়ে পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কার, বাতিল বা সম্প্রসারণ করা হবে।[৫৯১]

অনুচ্ছেদ - ১২ ঃ ১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অবসান ঘটাতে এবং পরিবার পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা লাভ সুনিশ্চিত করতে সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।

২. এই অনুচ্ছেদের ১ অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ নারীদের জন্য অন্ত:সত্ত্বা অবস্থায়, সন্তান প্রসবকালে এবং সন্তান জন্মদানের পরে যথাযথ সেবা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিখরচায় সেবা এবং যতদুর সম্ভব গর্ভকালে ও স্তন্যদানের সময়ে পর্যাপ্ত পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করবে।[৫৯২]

অনুচ্ছেদ - ১৩ ঃ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে। বিশেষ করে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তাদের সমতুল্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেঃ

- পারিবারিক সুযোগ সুবিধার অধিকার;
- ব্যাংক ঋণ, বন্ধক এবং অন্যান্য ধরনের আর্থিক ঋণের অধিকার;
- বিনোদনমুলক কর্মকান্ড, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার।[৫৯৩]

অনুচ্ছেদ -১৪ ঃ ১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ, গ্রামীণ নারীগণ যে সকল বিশেষ সমস্যা মোকাবেলা করে এবং অর্থের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন অর্থনৈতিক কাজসহ পরিবারের অর্থনৈতিক সংগ্রামে টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা বিবেচনায় আনবে এবং গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের ক্ষেত্রে এই কনভেনশনে বর্ণিত ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।

২. নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মে তাদের অংশগ্রহণ এবং তা থেকে সুফল ভোগের নিশ্চয়তা বিধানের সকল উপায় অবলম্বন করবে, বিশেষ করে নারীদের নিম্নবর্ণিত অধিকারসমুহের নিশ্চয়তা বিধান করবেঃ

- সর্বস্তরের উন্নয়নমুলক পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ;
- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য পরামর্শ ও সেবাসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবার পর্যাপ্ত সুযোগ;
- সামাজিক নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা থেকে সরাসরি সুফল ভোগ;
- কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ক্রিয়ামুলক শিক্ষাসহ সব ধরণের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ এবং সেই সঙ্গে সকল প্রকার সমষ্টিগত ও সম্প্রসারিত সেবা থেকে উপকৃত হওয়া;
- কর্মসংস্থান অথবা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে সমভাবে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাবলম্বী ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা;
- সকল ধরণের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ;
- কৃষিকার্য, অর্থসংস্থান ও ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা, যথাযথ প্রযুক্তি এবং ভুমি ও কৃষিজমি পুনর্বিন্যাস সেই সঙ্গে ভুমি সংস্কার কার্যক্রমে সমান সুবিধা লাভ;
- বাসস্থান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত জীবনমান উপভোগ।[৫৯৪]

---

[৫৯১]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০-৯১।
[৫৯২]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।
[৫৯৩]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ - ১৫ ঃ ১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ আইনের সম্মুখে নারী-পুরুষের সমতার বিধান প্রতিষ্ঠা করবে।

২. রাষ্ট্রসমুহ পৌর ও দেওয়ানী বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে অভিন্ন প্রকৃতির আইনগত অধিকার নারীদেরকে প্রদান করবে; এজন্য রাষ্ট্র নারীদেরকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। বিশেষ করে চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পত্তি পরিচালনায় তারা আদালত এবং ট্রাইবুন্যালের সর্বস্তরে সমান আচরণ ও ব্যবহার লাভ করবে।

৩. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমুহ নারীদের অধিকার ক্ষুণ্ন ও বাধাগ্রস্ত হয়, অথচ পূর্ব থেকেই প্রচলিত আইন অনুযায়ী সিদ্ধ সব ধরণের চুক্তি এবং সকল ধরণের ব্যক্তিগত দলিল আইনানুগভাবে বাতিল ও নাকচ বলে গণ্য করবে।

৪. ব্যক্তির স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আইন আবাসস্থল পছন্দ এবং ভিন্ন দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করবে।[৫৯৫]

অনুচ্ছেদ - ১৬ ঃ ১. বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য অংগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমুহ সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে। বিশেষ করে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার বিধান করবে ঃ

- বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন অধিকার;
- জীবন সঙ্গী নির্বাচনের অবাধ অধিকার এবং তাদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার;
- বিবাহ অটুট থাকাকালীন অবস্থায় এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার সময় সমতুল্য অধিকার ও দায়িত্ব;
- বিবাহ সম্পর্কজনিত পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন, সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে পিতামাতার সমান অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে, সকল ক্ষেত্রে সন্তানের কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তা সর্বাগ্র গণ্য বলে বিবেচিত হবে;
- সন্তান সংখ্যা নিরূপণ, সন্তান ধারণ ও দু'সন্তানের জন্মের ব্যবধান সম্পর্কে সঠিক ও দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতুল্য অধিকার এবং নারী সমাজের জন্য উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে যথাযথ প্রক্রিয়া ও প্রয়োগ পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তথ্য সংগ্রহের অধিকার;
- সন্তান-সন্ততির অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন, দত্তকগ্রহণ অথবা দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অনুরূপ প্রথাধর্মী আনুষ্ঠানিকতা সন্তানের স্বার্থ ও মঙ্গলের প্রতি সর্বাধিক বিবেচনা প্রসূত পন্থা নির্ণয় নারীদের পুরুষের সমতুল্য অধিকার;
- পারিবারিক পদবী, পেশা ও বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ব্যক্তিগতভাবে সমঅধিকার;
- বিনামুল্যে অথবা উপযুক্ত মুল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, বিষয় সম্পত্তি অর্জন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, ভোগদখল এবং বিলিবন্টনের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমঅধিকার।

২. নাবালেগ সন্তানের বাগদান ও বিবাহ আইনসিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না। আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে বিবাহের ক্ষেত্রে একটি সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারিত থাকবে এবং সকল বিবাহই সরকারীভাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা বা হওয়া বাধ্যতামুলক থাকবে।[৫৯৬]

[৫৯৪]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৮।
[৫৯৫]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।
[৫৯৬]. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক দলিলের তুলনায় সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রভাব গভীর এবং স্থায়ী। ১৯৪৮ সালে গৃহীত হওয়ার পর থেকে এ ঘোষণাটি সর্বকালের সর্বাধিক পরিচিত এবং জনপ্রিয় দলিলসমুহের অন্যতম। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সমস্ত বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষনীয়।[৫৯৭] বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও দেশীয় আইনেও সার্বজনীন মানবাধিকারের প্রভাব সুগভীরভাবে বিস্তৃত। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, জামাইকা, উগান্ডা, কেনিয়া সাইপ্রাস ও মাল্টার মত উন্নত এবং অনুন্নত দেশের সংবিধানে নারীর পক্ষে ঘোষিত মানবাধিকারসমুহ মর্যাদা সহকারে স্থান পেয়েছে।

কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০)

এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মেলনে নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনের উপবিষয় (Sub-theme) ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান। কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ[৫৯৮]:

- জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।
- উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমতা আনতে হবে।
- তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানোর মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে।
- নারীদের বিরুদ্ধে সবধরনের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।[৫৯৯]

নাইরোবি সম্মেলনে (১৯৮৫)

জাতিসংঘ নারী দশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবীতে।[৬০০] এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু 'সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা। ২০০০ সাল নাগাদ এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (The Nairobi forward-looking strategies for the advancement of women) গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা, মজুরিবিহীন কাজের স্বীকৃতি, মজুরীযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।[৬০১]

উক্ত ঘোষণার বিভিন্ন অংশ রয়েছে, যেমন ঃ নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমি; সমতা; উন্নয়ন ও শান্তি; বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা। বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন, (১) খরায় আক্রান্ত নারী, (২) শহরের দরিদ্র নারী, (৩)

---

[৫৯৭]. গাজী শামছুর রহমান, **'মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার'**, (ঢাকা: বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা), পৃ: ৩৩।
[৫৯৮]. Jahanara Huq et.al.পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ১৬-১৮।
[৫৯৯]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৪।
[৬০০]. **The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women**, United Nations, 1985.
[৬০১]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধ নারী, (৪) যুবতী নারী, (৫) অপমানিত (Abused) নারী, (৬) দুঃস্থ নারী, (৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী, (৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, (৯) পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী, (১০) শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারী, (১১) বিনা বিচারে আটক নারী, (১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, (১৩) অভিবাসী নারী, (১৪) সংখ্যলঘু এবং আদিবাসী নারী।[৬০২]

নারীর অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করা সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলিলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে।[৬০৩]

নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন : রিওডিজেনেরো (১৯৯২)

রিওডিজেনেরো সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচাইতে বেশী দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারণেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানী, পানি, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোনো বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কিত। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমুহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।[৬০৪]

জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্ম পরিকল্পনা

১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল সমুহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া। এই সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপি এবং আঞ্চলিক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হওয়ার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা নারীর উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে। এই সম্মেলনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনা ১৪টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়কে চিহ্নিত করে যেমন-নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সুযোগ এবং অংশ গ্রহণে নারীর অসমতা, পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্বের স্বীকৃতির অভাব ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের অভাব, নারীর মানবিক অধিকার খর্ব, স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগের অভাব এবং অসমতা, গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক চিত্র, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভুমিকা স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি।[৬০৫]

---

[৬০২]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৪-২৬৫।

[৬০৩]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫।

[৬০৪]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫।

[৬০৫]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫-২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন (ICPD) ১৯৯৪

১৯৯৪ সালের কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংস্থার তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র, ক্ষুধা, রোগ ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। সম্মেলনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে যে, পরিবারের আয়তন সীমা বৃদ্ধি রাখতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা সবসময় কমসংখ্যক শিশু চায়, কারণ তারাই এতে সরাসরি ভুক্তভোগী। সম্মেলনে সবাই একমত হন যে, সবচাইতে প্রয়োজন হচ্ছে দায়িত্বশীল যৌন আচরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত এবং যৌনবাহিত রোগ থেকে কমবয়সীদের রক্ষা করা।[৬০৬] তবে যৌনতা এবং প্রজনন, স্বাস্থ্য বিষয়, বয়োসন্ধিকালে যৌনশিক্ষা ও সেবা এবং গর্ভপাত ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্মেলনের সবচাইতে বিতর্কিত বিষয় ছিল। বেশ কিছু মুসলিম দেশ ক্যাথলিক পন্থীগণ সম্মেলনের খসড়া কর্মপরিকল্পনার কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যার ফলে জাতিসংঘ এবং ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে। অবশেষে কিছু আপত্তি সত্ত্বেও সম্মেলনে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়।[৬০৭]

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫)

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১১৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র দুরীকরণ, পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং নিরাপদ ও যথার্থ সমাজ নির্মাণ। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির মাঝে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন। এই সম্মেলনেও একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।[৬০৮]

বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫)

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে সর্ববৃহৎ চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়।[৬০৯] এই সম্মেলনে ১৮৯টি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসাবে একটি কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই কর্মপরিকল্পনা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, নাইরোবী কর্ম-কৌশল, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ আয়োজিত শিশু, পরিবেশ মানবাধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা। আরো গুরুত্ব দিয়েছে বিশ্ব আদিবাসী আন্তর্জাতিক বর্ষ, আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ, সহনশীলতার জন্য জাতিসংঘ বর্ষ, গ্রামীণ নারীর জন্য জেনেভা ঘোষণা এবং নারী নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতি। বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে, ২০০০ সালের মধ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্ম-কৌশলের লক্ষ্যসমুহের অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন এক অন্যতম এজেন্ডা। নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্মকৌশল দ্রুত বাস্তবায়িত করাই এর লক্ষ্য। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে, নারীর অধিকার, সমতা ও উন্নয়নে বাধা আছে বহু রকমের। ৩৬২টি প্যারাগ্রাফসমৃদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বা 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরণের কৌশল ও সরকারী-বেসরকারী স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্দিষ্ট করেছে। বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: ক) নারী ও দারিদ্র খ) নারীর

---

[৬০৬]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৬।
[৬০৭]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৬।
[৬০৮]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৬।
[৬০৯]. **জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনঃ ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ৩) নারী ও স্বাস্থ্য ৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত ৬) নারী ও অর্থনীতি ৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ৮) নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৯) নারীর মানবাধিকার ১০) নারী ও তথ্য মাধ্যম, ১১) নারী ও পরিবেশ ১২) মেয়ে শিশু।[৬১০]

পরিশেষে বলা যায় আন্তর্জাতিক নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন যুগিয়ে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে যুক্ত কয়েক হাজার সংগঠন গ্রামবাংলা জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন গড়ে তুলেছে।

নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান হল, স্থানীয় সরকার কাঠামোর ইউনিয়ন পরিষদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ওইসব আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা। এবং সরকারী হিসাব অনুযায়ী, দেশের ১৩ হাজারের বেশী নারীকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়াও 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' বা সিডওর দু'টি সংরক্ষিত ধারা প্রত্যাহার এবং 'নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ দমন আইন' প্রণয়ন সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে বিবেচিত।[৬১১] সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭' ঘোষণা।

নারীর অগ্রগতি এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা মুলত কয়েকটি কারণে অনস্বীকার্য। যেমনঃ

- সরকার হচ্ছে দেশের মুল পরিকল্পনা ও সম্পদ বন্টনকারী।
- বেসকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যাতে নারী উন্নয়নে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে সরকারের অনুকুল পরিবেশ গঠনে বিশেষত্ব রয়েছে।
- নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমুহ পালনে সরকার দায়বদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রধান।
- নারীর মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারী ভুমিকাই মুখ্য।[৬১২]

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভুমিকা সুনিদিষ্টভাবে উল্লেখিত ছিলনা। নারী ইস্যু এসেছে কেবল মুক্তিযোদ্ধা ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ খাতের অধীনে।[৬১৩]

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ অর্থাৎ জাতীয় মহিলা সংস্থা নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগ নারীদের জন্য জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ঢাকায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে এসব প্রকল্পের কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। পরে আরো দুটি নতুন নারী উন্নয়ন প্রকল্প সংযোজন করে সব প্রকল্পগুলো ১৯৭৮-১৯৮০ সালে অন্ত বর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় নারী ইস্যুকে কল্যাণমুলক থেকে উন্নয়ন মুলক ক্ষেত্রে রূপান্তরের ক্ষীণ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দিকে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে মহিলা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর

---

[৬১০]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭।
[৬১১]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
[৬১২]. ফারজানা নাঈম, **"জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকরণে সরকারের ভূমিকা"**, **জেন্ডার এবং উন্নয়নঃ নীতিমালা, কৌশল এবং আভিজাত্য বিষয়ক বিশেষ সংকলন**, (ঢাকাঃ জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ, ১৯৯৮), পৃঃ ৩২।
[৬১৩]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়'।[৬১৪]

দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) নারী উন্নয়নের বিষয়টি স্থান পায় এবং বিশেষ ও পৃথক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) প্রথমবারের মত মুলধারা এবং লিঙ্গ এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মুল ধারায় নারীদের নিয়ে আসা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়।[৬১৫] পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের মুল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা।[৬১৬]

সমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালে কোন সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন (পিএফএ) অনুমোদন ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর থেকে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারি উদ্যোগগুলো[৬১৭] নীম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) টাস্ক ফোর্স ও কোর গ্রুফ গঠন: ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্সকে সহায়তার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে একই সময় গঠিত হয় 'কোর গ্রুপ' নামে ছোট কর্ম-পরিকল্পনা গ্রুপ। কোর গ্রুপের সদস্যরা সকলেই নারী আন্দোলনের কর্মী।[৬১৮] মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এই কোর গ্রুপ নিয়মিত কাজ করেছে। নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে কোর গ্রুপের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালের ২৫শে মে কর্মপরিকল্পনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সরকারের সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে পৌছে দেয়া হয়। সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করে কর্ম-পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেন।[৬১৯]

(২) জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নমুলক কাজের পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরুপণ: ১৯৯৬ এর আগষ্ট মাসে কোর গ্রুপের সহায়তায় মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সেক্টরাল চাহিদা নিরুপণ কমিটি' গঠিত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে সমন্বিত কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ১৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক কাজ পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরুপণ করা হয় এগুলো হলো: ১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৪) কৃষি মন্ত্রণালয় ৫) আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬) পরিবেশ মন্ত্রণালয় ৭) মৎস ও পশুপালন মন্ত্রণালয় ৮) শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় ৯) স্থানীয় সরকারী বিভাগ ১০) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ১১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২) তথ্য মন্ত্রণালয় এবং ১৩) শিল্প মন্ত্রণালয়।[৬২০]

(৩) জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি: নারী সংগঠন ও এনজিও জাতীয় ও বেইজিং প্রস্তুতি কমিটি প্রাক বেইজিং মতবিনিময় সুপারিশ ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক কাজের পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরুপণ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা খসড়া তৈরি করা হয়। জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা চুড়ান্ত অনুমোদন ও জাতিসংঘে প্রেরণের পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের ৮ই মার্চ তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' ঘোষণা করেন। নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণার কারণ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে তখন বলা হয়, নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারা

---

[৬১৪]. শাহীন রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮।

[৬১৫]. Rounaq Jahan, **The Elusive Agenda: Mainstreaning Women in Development**, (Dhaka: University Press Limited, 1995), p: 26.

[৬১৬]. শাহীন রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

[৬১৭]. বেইজিং ফলো-আপ' ৯৯, **পলিসি লিডারশীপ অ্যান্ড এডভোকেসী ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি** (পাস), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ: ৭-১৬।

[৬১৮]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৮-২৬৯।

[৬১৯]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৯।

[৬২০]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কোনভাবেই উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই সমাজের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন ও অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন এ সম্পর্কে সকলের স্পষ্ট ধারণা। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনার ১২টি বিবেচনার ইস্যুকে সম্পৃক্ত করে মোট ১৪টি ইস্যু 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীর মানবধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দুরীকরণ, সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ভুমিকা ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গৃহায়ণ ও আশ্রয়, নারী ও পরিবেশ, নারী ও গণমাধ্যম, বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ নারী-এই ১৪টি মুল ইস্যু ও ৬টি সাব ইস্যুর (নারীর দারিদ্র দুরীকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থান, সহায়ক সেবা ও নারী ও প্রযুক্তি, নারীর খাদ্য নিরাপত্তা) ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সার্বিক একটি ইতিবাচক পরিচয় তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের নির্যাতিত এবং অবহেলিত নারী সমাজের ভাগ্য উন্নয়ন করা এই নীতির প্রধান লক্ষ্য।[৬২১] 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ১৯৯৭' এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীতিমালা নিম্নরূপঃ

- জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ। অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্য নীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা। সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া। নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভুমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।
- নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবা যত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।
- কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত ও সমান সুযোগ দেয়া।
- রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পযন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহনে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্টান সমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ নেয়া।
- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং

---

[৬২১]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রীপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।[৬২২]

(৪) উন্নয়নে নারী বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ পর্যালোচনার পদক্ষেপ: বিদেশী ৮টি সহযোগী সংস্থার[৬২৩] সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সালের শেষে দিকে উন্নয়নে নারী বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য পর্যালোচনার প্রক্রিয়া শুরু করে। এ প্রক্রিয়ার প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে। ৯টি পর্বে এই প্রক্রিয়ার অনুশীলন চলে ১৯৯৫ সালের আক্টোবর থেকে ১৯৯৬ সালের আক্টোবর পর্যন্ত।[৬২৪]

(৬) নারী উন্নয়ন পরিষদ গঠন: চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের সভাপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে নারী সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সেক্টরের উন্নয়নমুলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন কাজ সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে গঠিত "জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ" ১৯৯৭ সাল থেকে কাজ শুরু করেছে।[৬২৫]

(৭) জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ: জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা দেওয়ার জন্য নামমাত্র একটি প্রকল্পের কাজ চলছে।[৬২৬] এ ছাড়া জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ও উন্নয়নে নারী বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ পর্যালোচনার পদক্ষেপ সমীক্ষায় সুপারিশ ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নারী উন্নয়নের উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালনে শক্তিশালী করণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নীতি ও কার্যবিধি সংশোধন ও নতুন করে তা প্রণয়নের বিষয়টি জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকেও নারী উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া শুরু হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

স্বরাষ্ট্র, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় : নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র, আইন ও বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চারটি পুলিশ স্টেশনে নারী বিষয়ক ইনভেস্টিগেশন সেল গঠন, পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল স্থাপন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার সংজ্ঞা হিসেবে বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন এর সংজ্ঞাকে গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।[৬২৭]

---

[৬২২]. গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫-২৬। সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে মতবিনিময় ও আলোচনার পর বেইজিং ফলোআপের লক্ষ্যে আন্ত-মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স এর কাছে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত হলে খসড়া জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা চুড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনাটি ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের দপ্তরে পেশ করে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সরকারের নীতি ও কর্মসুচিতে নারী উন্নয়নের মুল ধারার কৌশলকে এর পরিকল্পনায় প্রাধান্য দিয়েছে। তবে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের নীতি পর্যালোচনা করে জানা গেছে তাদের সুনির্দিষ্ট নারী উন্নয়ন নীতি নেই। সেন্ট্রাল মন্ত্রণালয়গুলোর এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ম্যানডেটসমুহে নারীর অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের উল্লেখ নেই। সেজন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা কার্যধারা, দায়িত্ব ম্যানডেট, অধ্যাদেশ ইত্যাদি নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে পুনর্লিখিত ও সংশোধিত করতে হবে। (সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৯-২৭০)।

[৬২৩]. ডেনমার্ক, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইউনিসেফ, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড , সুইডেন ও ইউএনডিপি।

[৬২৪]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭০।

[৬২৫]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭০-২৭১।

[৬২৬]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭১।

[৬২৭]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম মূলত নারী ও শিশুর পুষ্টি সমস্যা দূর করা, বাল্য বিবাহের মন্দ দিক সম্পর্কে প্রচার, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার, এইডস ও যৌনরোগ বিরোধী প্রশিক্ষণ ও প্রচার কাজে সীমাবদ্ধ রয়েছে।[৬২৮]

তথ্য মন্ত্রাণালয় : তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় 'বাংলাদেশের শিশু ও মহিলাদের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম' শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষার পাশাপাশি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের প্রতিপাদ্য নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।[৬২৯]

শিক্ষা মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্তকরণ, ৭৯টি প্রকল্পে নারী স্বার্থ সংরক্ষণ ও নারীকে সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।[৬৩০]

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় : নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের ৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের আইনটি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক বলে সরকার পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমনঃ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত বিভিন্ন প্রকল্প কমিটিতে এক চতুর্থাংশ পদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে বাধ্যতামূলকভাবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।[৬৩১]

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা নারী হলেও জাতীয় নারী ইস্যুতে তারা সব সময় যে একমত পোষণ করেন, তা নয়। অনেক বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।[৬৩২] বিগত দুটি সংসদীয় নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিম্নমুখী। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণের হার কম। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪৪টি আসনে মোট ৩৬ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করেন। আর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪২টি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন ২৯ জন নারী। নির্বাচনের আগে নারী সমাজের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল অন্তত ১০ শতাংশ আসনে যেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়। কিন্তু সেই দাবি পূরণ হয়নি।[৬৩৩]

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে ১৯৯৭ সালে সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" শীর্ষক এক প্রকাশনায় বলা হয়, নারীর ব্যাপক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি চাকুরিতে কোটা প্রবর্তন হলেও সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদের সংখ্যা

---

[৬২৮]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।
[৬২৯]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১-২৭২।
[৬৩০]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২।
[৬৩১]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২।
[৬৩২]. উদাহরণস্বরূপ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যবস্থার মেয়াদ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করা যায়। এই ইস্যুতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সপ্তম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সংসদে একটি বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যারিষ্ঠতা না থাকায় তৎকালীন সরকারের একার পক্ষে বিলটি পাস করানো সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে বিরোধী দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিরোধী দল সংসদে হাজির হয়ে উত্থাপিত সেই বিলের প্রতি সমর্থন জানায়নি। ফলে সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যবস্থা বহাল রাখা আর সম্ভব হয়নি। সপ্তম সংসদেই ওই পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটেছে। এভাবে নারী ইস্যুতে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেত্রীর মধ্যে সমঝোতার অভাব নারী সমাজের স্বার্থ ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। (গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬)।
[৬৩৩]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০,৯৭,৩৩৪টি। তার মধ্যে মহিলা রয়েছেন ৮৩,১৩৩ টি পদে। অর্থাৎ মহিলারা আছেন মাত্র ৭.৬ শতাংশ পদে। উপ-সচিব হতে সচিব পর্যায়ে নারীর সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও নিচে। বিসিএস ক্যাডারভুক্ত উচ্চ পদেও নারীর সংখ্যা নগণ্য। বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার উচ্চ পদে অতি সীমিত সংখ্যক নারী নিয়োজিত রয়েছেন। পুলিশ বিভাগে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেনাবাহিনীতেও নারী নিয়োগ সীমিত। এই তথ্য বেশ কিছুকাল পূর্বের হলেও বর্তমানে ওই পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।[৬৩৪]

দেশে বর্তমান নারী-শিক্ষার হার ২৫.৫ শতাংশ। নারীশিক্ষা প্রসারে বিগত ও বর্তমান সরকারের বেশ কিছু পাইলট প্রকল্পের কারণে স্কুল থেকে মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধিকাংশই নারী কেন্দ্রিক। তৈরি পোষাক শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ৯০ ভাগ। কৃষিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৪৩ শতাংশই নারী। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারে গতি সঞ্চার করছেন। কিন্তু তাতেও নারীর ক্ষমতায়ন তরান্বিত হয়নি। কেননা নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্ব, যা অনেকটাই নিশ্চিত হয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে।[৬৩৫]

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে শুধু এই সাংবিধানিক স্বীকৃতি নয়, এর বাইরেও রয়েছে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সনদ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকার ওইসব সনদে সই করে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। আন্তর্জাতিক ওইসব সনদের মধ্যে অন্যতম হলো, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং Convention on the Elimination of all forms of Descrimination Against Women (CEDAW)। এছাড়া, জাতিসংঘের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ঘোষণা, ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম নারী সম্মেলনে নারীদশক ঘোষণা, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেন দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনের মাধ্যমে নারীদশকের মধ্যভাগে অগ্রগতি পর্যালোচনা, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে নারীর জন্য অগ্রমুখী কর্মকৌশল গ্রহণ এবং একই বছরে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমর্থন ছিলো জোরালো।

'সিডও' সনদের কয়েকটি ধারা বাদ রেখে বাংলাদেশ সরকার সেটি অনুমোদন করে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর। নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সিডও সনদের ৭ নম্বর ধারায় (নারীর রাজনৈতিক জীবনধারা ও অধিকার) বলা হয়, "শরিক রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে, যেসব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে,

- সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;
- সরকারি নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন;
- দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

এছাড়া, নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে ১৯৫২ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের ১ নম্বর ধারায় বলা হয়, "কোন ধরনের বৈষম্য ছাড়া পুরুষের সাথে সমানভাবে সকল নির্বাচনে নারীর ভোট দেয়ার অধিকার থাকবে।" ধারা ৩ এ বলা হয়, "কোন বৈষম্য ছাড়া পুরুষের সাথে সমানভাবে জাতীয় আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সকল সরকারি কাজ সম্পাদনে নারীর অধিকার থাকবে।"

---

[৬৩৪]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭-২৮।
[৬৩৫]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তারও আগে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত মানবাধিকার বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়, মানব সমাজের প্রত্যেক সদস্যের আত্মমর্যাদা ও সম-অধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির মূলভিত্তি। তাতে আরও বলা হয়, মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, রাজনীতি, মতামত, সামাজিক অবস্থান, জন্ম বা অন্য যে কোন কারণ নির্বিশেষে সবাই এই ঘোষণায় বর্ণিত স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবেন। কোন দেশ বা ভূখন্ডে রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। কাজেই মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা অনুসারে অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ঘোষণাকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ পরে সকল মানুষ ও জাতির জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে আখ্যায়িত করে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের নির্যাতিত অসহায় নারী সমাজের উন্নয়নে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে ১৪ লক্ষ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হন, এরমধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারের পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ:

- চাকরিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়া।
- শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে এককালীন সাহায্য দেওয়া।
- পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনীর হাতে নির্যাতিতা মেয়েদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেওয়া। চাকরিতে তাদের জন্য বিশেষ ভোটের বন্দোবস্ত করা।
- নির্যাততা ও অসহায় নারীদের আশ্রয় দান এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড স্থাপন। ১৯৭৪ সালে আইন প্রণয়ন করে এই বোর্ডকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়।
- পরিত্যক্ত অসহায় শিশুর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধায়) আদেশ নামে দত্তক সম্পর্কিত একটি সিভিল আইন প্রণয়ন করা হয়।
- ভ্রুণ বিনষ্ট বা অ্যাবরশন করার জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়ায় পরিবার পরিকল্পনার একটি পদ্ধতি হিসেবে 'এম আর' আইনত সিদ্ধ করে গর্ভপাতের অধিকার দেওয়া হয়।
- চা বাগানের নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও সমকাজে সমমজুরি বিষয়ে এক আইন প্রণীত হয়। সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রীর পদে মহিলা নিয়োগ করা হয়।[৬৩৬]

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত নতুন সংবিধানে নারীসমাজের সমঅধিকারের কথা স্বীকার করা হয়। সংবিধানের ১০, ১৫,১৮,১৯,২৭,২৮,২৯ ধারায় বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নারীর সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। ১৫ নং ধারায় বিধবা নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। ১৮ নং ধারায় পতিতাবৃত্তি নিরোধের জন্য কার্যকর পদক্ষেপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ২৭ নং ও ২৮ নং ধারায় আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের বিষয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে, নারী ও শিশুর স্বার্থে এবং তাদের প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বিশেষ আইন প্রণয়নে কোন বাধা থাকবে না। সংবিধানের ৬৫ নং ধারায় নির্বাচিত ৩০০ সাংসদ কর্তৃক পরোক্ষ ভোটে ৩০ টি সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে ৬৫ ধারার এই উপধারা স্থগিত হয়ে যায়, কিন্ত ১৯৯০ সালে দশম সংশোধনীর মাধ্যমে তা পুনরায় বলবৎ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে সংরক্ষিত আসন ছিল ১৫ টি ১৯৭৯ সালে তা ৩০টি করা হয়। সংবিধানে নারীর সমঅধিকার স্বীকার করার পরও এর ২৯ ধারার 'গ' অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নারীর পেশাগত সমঅধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। এই ধারাবলে ১৯৭৬ সালে সকল কর্মক্ষেত্রের ১০% আসন মহিলাদের জন্য নির্ধারিত করার পর বলা হয়েছে, কারিগরী পদ ও প্রতিরক্ষা বিভাগে এই কোটা অধিকার থাকবে না। ১৯৮৫ সালে নন-গেজেটেড চাকরিতে মহিলাদের কোটা ১৫% এ উন্নীত হলেও গেজেটেড পর্যায়ে বলবৎ রয়েছে।[৬৩৭]

---

[৬৩৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩।
[৬৩৭]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২-২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব নারী দশকের (১৯৭৬-১৯৮৫) কর্মসূচী এবং পরবর্তী ২০০০ সাল পর্যন্ত গৃহীত কর্মসূচীতে বাংলাদেশ সরকার নিয়ম রক্ষার জন্য 'উন্নয়ন, সমতা ও শান্তি'র শ্লোগানকে সামনে রেখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করলেও তা সরকারী রাজনৈতিক দলের নারীদের ও সরকারী মহিলা সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[৬৩৮]

পরিশেষে বলা যায়, নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নারীরা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনীতি, শিক্ষা, কর্ম ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে। এবং বিভিন্নক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের পাশাপশি সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখছে। কিন্তু এত প্রচেষ্টার পরেও নারীর নিরাপত্তা যে নিশ্চিত হচ্ছে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিদিনের পত্র পত্রিকা প্রদত্ত তথ্য দ্বারা। তাই নারীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নির্যাতনমূলক মানসিকতার পরিবর্তন ও আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আর এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

---

[৬৩৮]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-২০০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১) বিভিন্ন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারী প্রগতি আন্দোলন- সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, সহবাস সম্মতি আইন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কন্যা বিক্রয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	শিক্ষাক্ষেত্রে নারী প্রগতি আন্দোলন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১) নারী প্রগতি আন্দোলনে সম্পৃক্ত কতিপয় নারী
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	স্বাধীন বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯৭২-২০০০) নারী প্রগতি আন্দোলনের দাবিসমূহ নারী প্রগতিবাদী সংগঠন ও এনজিও

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১)

বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা ঘরের চার দেয়ালে অবরুদ্ধ ছিল। শিক্ষাহীন অনগ্রসর সমাজে নানারকম অবমাননাকর ধ্যান-ধারণা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ইতাদি বদ্ধমূল হয়েছিল। নানা প্রথা বিধি নিষেধ জারি করে প্রকারান্তরে নারীকে শোষণ ও নির্যাতন করা হতো।

প্রচলিত হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি, বিধবাদের প্রতি সামাজিক অনুশাসন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন এসব থেকে মুসলিম আইন ছিল ভিন্ন এবং এ আইনে নারীর অধিকার কিছুটা সংরক্ষিত ছিল।[১] কিন্তু সমাজে কৌলিণ্য, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু বিক্রয়, পতিতাবৃত্তি, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদি সামাজিক প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এসব প্রথা ও সামাজিক বিধি নিষেধের দুর্ভোগ মেয়েদের পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর, পরনির্ভরশীল, অসহায় ও নিষ্পেষিত করে রেখেছিল। হিন্দু পরিবারগুলোতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে একাধিক নারীকে বিধবা হতে হতো এবং বিধবা নারীকে সতী হিসেবে তাদের স্বামীর চিতায় জীবন্ত আত্মাহুতি দিতে হতো।[২] সামান্য অর্থের বিনিময়ে কন্যাশিশুকে বিক্রি করা হত। পক্ষান্তরে মুসলিম নারীরা অবরোধ ও পর্দাপথার কঠোরতায় ছিল নির্জীব প্রাণবিশেষ।

মোটকথা হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর নারীদের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এতই অসহায়, দুর্বল, অধিকারহীন ও অক্ষম করে রাখা হয়েছিল যে, নিপিড়ীত হয়েও নিজেদের মুক্তির কথা তারা ভাবতে পারত না। এমনি সময়ে যারা সমাজের সার্বিক প্রগতির জন্য চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির নতুন দিক নিয়ে চর্চা শুরু করেন তারা মানবিক আবেদন থেকে নারী সমাজের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসেন, নারী নিপীড়ন বন্দের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন তৈরীর পক্ষে আন্দোলন করেন। নারীকে তার অধিকার আদায়ে সচেতন হতে সহযোগীতা করেন। তাই বলা যায় সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনই বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তথা নারী প্রগতির সূত্রপাত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে সমাজ ব্যবস্থায় সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, ক্যেলিন্য প্রথা, বিধবাদের বিবাহ না হতে দেওয়া, বহুবিবাহ, অবরোধ, কঠোর পর্দাপ্রথা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা নারীর জীবনকে বঞ্চনা ও নীপিড়নের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। নারীর দু:খ-দুর্দশা, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিপীড়ন অবলোকন করে কতিপয় বিবেকবান পুরুষ নারীকে দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩),[৩] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-

---

[১]. পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন এবং নারীর অধিকার প্রদান কখনও করা হয়নি বরং পুরুষের কর্তৃত্ব প্রধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নারীর ওপর নির্যাতন ও অধিকার হরণ হয়েছে নানাভাবে।

[২]. স্বামীর চিতায় স্ত্রীর এই জীবন্ত সহমরণকে সতীদাহ বলা হতো। অসহায় বিধবা মেয়েদের সতীদাহের সময় পূণ্যবতী বলা হতো। অথচ বেঁচে থাকার সময় কোন মর্যাদা পাওয়া তো দুরের কথা, নানাভাবে তাদের লাঞ্ছিত হতে হতো। সতীদাহ প্রথার সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পারিবারিক সম্মান জড়িত ছিল। বিধবা মেয়েরা পুনরায় বিয়ে করলে বা পরিবার ছেড়ে চলে গেলে পারিবারিক সম্মান ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে সতীদাহ প্রথার মত লোমহর্ষক নারী হত্যাকান্ড সমাজ স্বীকৃত ছিল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮)।

[৩]. রামকান্তের পুত্র রামমোহনকে ফার্সী উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র পাটনায় পাঠান উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। সেখানে তিনি ফার্সীতে পান্ডিত্য অর্জন করেন। কুর'আনে নারী জাতির প্রতি সুবিচার এবং সদ্ব্যবহারের যে সব কথা আছে সেগুলোও রাজা রামমোহনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। হিন্দু সমাজে সে সময়ে নারী জাতির প্রতি সুবিচার করা হত না। তখন পন্ডিত

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০- ১৮৯১) প্রমুখ ব্যক্তি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তারা সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। নতুন যুগ ও নতুন আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলার জন্য তারা যে কাজ করে গেছেন তার একটি অংশ ছিল নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করা ও নারীকে শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল হতে সহযোগীতা করা। তাদের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে বিস্তার লাভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তির জন্য আন্দোলন

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[৪] ১৮১৮ সালে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সতীদাহের মত নৃশংস প্রথার হাত থেকে নারীদের বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন। রাজা রামমোহন রায় সামাজিক আচার আচরণ ও বিধি নিষেধের মধ্য দিয়ে নারী সমাজের প্রতি মর্যাদাহীনতা প্রকাশিত হতে দেখে সামাজিক সব ধরণের প্রথা যেমন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।[৫] এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৫ সালে 'আত্মীয়সভা' নামে একটি প্রতিষ্টান গড়ে তুলেছিলেন। সেই প্রতিষ্টানের মাধ্যমে তিনি কৌলিন্য প্রথা, কন্যা বিক্রি, পণপ্রথা, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি করার সময় ১৮১১ সালে

নামে পরিচিত এক শ্রেণীর ব্যক্তি হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। নানারকম বিধি নিষেধের বেড়াজালে নারী জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন তারা। কোন নারী বিধবা হলে সমাজপতিরা জোর করে তাকে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করত। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই ভয়াবহ নৃশংস কার্যটি ধর্মের নামে সম্পন্ন করা হত। কুর'আন পড়বার পরে রাজা রামমোহনের মন হিন্দু সমাজের এই নৃশংশ প্রথার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। (শ্রী রামমোহন বিদ্যাসাগর, **মাইকেল ইন্দ্রিভূষণ দাস**, পৃঃ ৭)। রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। বাংলা, আরবি, ফার্সী, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। জেমস মিল রচিত হিষ্টরি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া (১৮১৮) এবং মেরি উলস্টন ক্রাফট রচিত ভিন-ডিকেশন অব দি রাইটস অব ওমেন (১৭৯২) বই দুটি গভীর আগ্রহে পড়েছিলেন এবং বাংলার নারীদের জন্য ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। (গোলাম মুরশিদ, **সংকোচনের বিহ্বলতা : আধুনিক অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া**, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬)।

[৪]. সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাক্ষণে বাংলাদেশে এই প্রথা তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় দেশের কিছু সচেতন ব্যক্তি ছাড়া সকলেই এ প্রথা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রচারে ক্লান্ত খ্রীষ্টান মিশনারীরা নিজেদের স্বার্থেই প্রথম এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। ১৮০৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই ৬ মাসে কলকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনারীরা সতী বিষয়ে সমীক্ষা চালান। তাতে দেখা যায়, ঐ ৬ মাসে এই অঞ্চলে ১১৬টি মেয়ে সতী হয়েছে। (C. Buchanan, **Christian Researches in Asia**, 5th Ed. London, 1812, p: 40.) উইলিয়াম কেরিও এই সময় এ প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের সাহায্যে সতীপ্রথা সম্পর্কে শাস্ত্রে কোথায় কী বলা হয়েছে তা সংগ্রহ করেন। তিনি এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে একটি আবেদন প্রস্তুত করে মি উডনির মারফত সপার্ষদ ওয়েলসির নিকট প্রেরণ করেন। (J.C.Marshman, **The Life and Times of Carry,** Marshman and Ward, Vol-I, London, 1859, p: 222.) কিন্তু সরকার এতে কোন আগ্রহ দেখাননি। এতে মিশনারীরা ক্ষান্ত না হয়ে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে সতীর বাৎসরিক হিসাব তৈরী হতে লাগল, শিশু সন্তানের মায়েদের সতী হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অব সার্কিটের চতুর্থ বিচারপতি এডওয়ার্ড ওয়াটসন নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রারকে আইন করে এ প্রথা বন্ধ করার সুপারিশ করেন, এবং এ প্রথা বন্ধ করলে কোন সমস্যা হবে না এরূপ বিশ্বাস রাখতে বলেন। (Bengal Judicial-Criminal Cons. No.4, 30.7.1819.) ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জে এইচ হ্যারিংটন সতী প্রথা বেআইনি ও দন্ডনীয় এই মর্মে একটি ড্রাফট রেগুলেশন করে পাঠান। (Parliamentary Papers, House of Commons, 1830, Vol-28, p: 130,134.) কিন্তু গভর্ণর জেনারেল আর্মহার্স্ট সতীপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভায় সতীপ্রথা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হত। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮)।

[৫]. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, (কলিকাতাঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭), পৃঃ ৩৪; প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, **বাংলার নারী জাগরণ**, (কলিকাতাঃ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

রংপুরে অবস্থানকালে তার বড় ভাই জগমোহন রায় পরলোকগমন করেন। এই সময় তার স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করা হয়। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ৩৯ বছর বয়সে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, সতীদাহ প্রথা চিরতরে বন্ধ না করে তিনি নিরস্ত হবেন না।[৬]

১৮১৫ সালের শুরুতে তিনি কলকাতায় এসে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ইতিপূর্বে ১৮১৩ সালে লর্ড মিয়া সতীদাহ প্রথা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দেশ জারি করেন এবং ১৮১৭ সালে তা চুড়ান্ত রাজবিধি হিসেবে প্রচারিত হয়।[৭]

সতীদাহ নিবারক বিধি প্রচারের সাথে সাথে গোড়া হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠপোষকরা সতীপ্রথা কায়েম রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং তারা সরকারের কাছে প্রতিবাদলিপি পেশ করেন। রাজা রামমোহন রায় ও তার সহযোগীরা ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে পাল্টা আবেদন করেন যে, প্রতিটি শাস্ত্র অনুসারে এবং যেকোন দেশের মানুষের বুদ্ধি অনুসারে এসব ঘটনা নরহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৮]

শুধু প্রতিবাদলিপি, আবেদন-নিবেদন পেশ ও বই লেখা ইত্যাদিতেই রাজা রামমোহন রায় ব্যস্ত ছিলেন না, তিনি তার সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে সতীদাহের ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাজ ছিল ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া, সতীদাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া, দাহ থেকে বিধবাকে রক্ষা করা এবং আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়িত করা।[৯]

সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য সমাজের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে চুড়ান্ত সংগ্রাম করে, প্রতিরোধ আন্দোলন করেই রামমোহন রায় নিশ্চুপ হননি। তিনি হিন্দু শাস্ত্র থেকে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে বহু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে প্রমাণ করেন যে, বিধবার সহমরণ শাস্ত্র অনুমোদন করেননি বরং বিধবার সাত্তিকতা ও শুদ্ধাচারের কথাই শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৯ সালের ৪ই জানুয়ারি লর্ড বেন্টিক সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যে ডিক্রি জারি করলেন তার মুখবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়।[১০]

১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী সতীদাহের পক্ষের সমাজ পতিরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন জানায় সতীদাহ প্রথা চালু রাখার জন্য। রামমোহন রায় পাল্টা আবেদন নিয়ে

---

[৬]. যদিও ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন, তবু সমাজ সংস্কারে তার দৃঢ়চেতা মন সক্রিয় ছিল বলেই সতীদাহের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য আন্দোলন সমাজে বিস্তার লাভ করে এবং তা সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। (নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাম্ম সমাজ,** কলিকাতাঃ ১৯৭২, পৃঃ ৫১)।

[৭]. উল্লেখ্য যে ইংরেজ সরকার বহুদিন ধরেই সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভেবেও স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক বিরুদ্ধতার কথা বিবেচনা করে সতীদাহ বিষয়ে শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত জানার চেষ্টা করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪)।

[৮]. নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাম্ম সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১। রাজা রামমোহন রায় সহমরণের ক্ষতিকর দিক ও শাস্ত্রে এর অনুমোদন আছে কি নেই এসব বিষয়ে 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্যাতনের সম্বাদ' (১৮১৮) এবং 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্যাতনের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) শিরোনামে দুটি বই রচনা করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫)।

[৯]. এমনকি রাজা রামমোহন রায় নিজেই শ্মশান ঘাটে যেতেন, সতী না হওয়ার জন্য নারীদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন, অনেকক্ষেত্রে তিনি সফল হতেন। এজন্য বহুবার তাকে স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হলেও তিনি তার প্রতিজ্ঞায় স্থির ছিলেন। (নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪)। নারীদের আগুনে নিক্ষেপ করার সময় জোর কর ভাং, ধুতরা পাতার রস বা নানারকম নেশাজাতীয় দ্রব্য খাওয়ানো হত এবং এত বেশি ধুপের ধোঁয়া তৈরী করা হত যাতে অন্য লোক দেখতে না পায়। মৃত্যুর ভয়াবহ করুণ আর্তনাদ ঢাকবার জন্য রাজ্যের ঢাক, ঢোল, শাখ সজোরে বাজান হত যাতে কেউ আগুনে নিক্ষিপ্ত নারীর চিৎকার, কান্না, অনুনয় বিনয় না শোনে। (শরৎ রচনাবলি, **নারীর মূল্য**, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৭১-৫৭২; কনক মুখোপাধ্যায়, **উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর**, পৃঃ ৯)।

[১০]. রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের শাস্ত্র কথা প্রমাণসহ বই লিখে ব্যাপকভাব প্রচার কতে থাকেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বিলেতে গেলেন। কমন্স সভাতেও তিনি তার বক্তব্য পেশ করলেন। ১৮৩২ সালের ১২ জুলাই প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে সতীদাহ বন্ধের আইন চুড়ান্তভাবে ঘোষিত হয়।[১১]

রাজা রামমোহন রায় নারী সমাজের প্রতি এই জঘন্য সমাজ স্বীকৃত হত্যাযজ্ঞ বন্ধের মাধ্যমে পাক ভারত উপমহাদেশের অগণিত বিধবার জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন।[১২] নারী জাগরণে রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ ভূমিকার একটি অংশ হচ্ছে সতীদাহ প্রথা বন্ধে সাফল্য অর্জন।[১৩]

বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর হিন্দু বিধবার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য যে, রাজা রামমোহনের জীবিতকালে বিধবার সংখ্যা বেশি ছিল না, কারণ সতীদাহের ফলে তখন বিধবাদের বেঁচে থাকারই কোন অধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে সতীদাহ প্রথা বন্ধের ফলে সমাজে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। বিধবাদের কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তাদের কাছে মনে হতে থাকে যে এরূপ জীবনের চেয়ে সতীপ্রথা শ্রেয় ছিল। পরিবার ও সমাজে বিধবারা নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। এই বিধবাদের সমস্যা সমাধানে রামমোহন রায়ের উত্তরসূরীরা এগিয়ে এলেন।[১৪] এরই ধারাবহিকতায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ ব্যাপারে লেখালেখি এবং এর পক্ষে বিপক্ষে তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে।[১৫] তৎকালীন সমাজে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কঠোর বিরোধীতা করেন। হিন্দু শাস্ত্রকারদের পর্বত সমান বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন।[১৬]

---

[১১]. প্রিভি কাউন্সিলের এজলাস বসে দুপক্ষের আবেদন বিবেচনার জন্য। এজলাস লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল লর্ড চ্যাপেল, ফার্স্ট লর্ড অব দি অ্যাডমিরালিটি, লর্ড আর্মহাস্ট, লর্ড জন রাসেল, মার্কুইস অব ওয়েলেসলি, মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন প্রমূখের পাশে রাজা রামমোহন রায়ও বসেছিলেন, দীর্ঘ আলোচনার পর সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬)।

[১২]. ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে। (ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, পৃঃ ২২; উদ্ধৃতিঃ **এশিয়াটিক জার্নাল** ১৮২৭, ভলিয়্যুম ২৩, পৃঃ ৬৮৯)। সে সময়ের সরকারি হিসেবে জানা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হয়েছে। শুধু কলকাতা ও আশেপাশের এলাকাগুলোতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫২৮ জন। (নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ**, ১৯৭২, পৃঃ ৫৩)। ১৮১৫ সাল ১৮২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫ হাজার ১২৮ জন বালক-বালিকা পিতৃমাতৃহীন হয়। বঙ্গদেশের যত সতীদাহ হয়, তার সাত অংশের এক অংশই হয়েছে শুধু হুগলীতে। এই হুগলীতেই রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। (**এশিয়াটিক জার্নাল**, ১৮২৭, ভলিয়্যুম ২৩, পৃঃ ৬৮৯)। ১৮১৫ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত হুগলীতে সতীর নথিভুক্ত ঘটনা মোট ১২৩৮টি, তারমধ্যে ব্রাম্মণ, কায়স্থ. বৈদ্য অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চবর্ণের সংখ্যাই ৬২০। পাশাপাশি অসংখ্য নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সতীর সংখ্যা মাত্র ৬১৮। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫)।

[১৩]. এছাড়াও রাজা রামমোহন রায়ের পরিকল্পনা ছিল সমাজের অন্যান্য সংস্কারমূলক আন্দোলনের পাশাপাশি নারী প্রগতির জন্য কাজ করবেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের আন্দোলনেই তার ২১ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে, বিধবা বিয়ে চালু করা, বাল্য বিয়ে বন্ধ করা, স্ত্রী শিক্ষা চালু করার যে পরিকল্পনা ও লক্ষ্য তার ছিল তা পূরণ করার সময় তিনি পাননি। অসুস্থ অবস্থায় ১৮৩৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬)।

[১৪]. প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর,** সামাজিক ব্যক্তিত্ব (কলিকাতাঃ বুক ট্রাষ্ট, ফেব্রুয়ারি - ১৯৮৬), পৃঃ ৮৩।

[১৫]. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দি রিফর্মার (১৮৩৮ সালের ২৫ নভেম্বর) এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত বেঙ্গল স্পেক্টার (১৮৪২ সালের জুলাই সংখ্যা) পত্রিকা দুটিতে হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিয়ের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বিধান উল্লেখসহ প্রবন্ধ বের হয়েছিল। উনিশ শতকের স্বনামধন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিয়েকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখেন। এই বিতর্কের সূত্র ধরেই-"বাল্যবিবাহের দোষ" বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি লেখা সর্বশুভকরী পত্রিকায় ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে ছাপা হয়। (প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, প্রাগুক্ত, পৃ ১২; সূত্র ইন্দ্রমিত্র করুনাসাগর বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২৭৭)।

[১৬]. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট হিন্দু বিধবার দুঃখ দুর্দশার সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জের বিধবা বালিকার জীবনের দুঃসহ অবস্থার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। তারমধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রকৃতি কেন হয়েছিল, সে সম্পর্কে তার নিজস্ব উক্তি থেকেই জানা যায় যে, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের সূচনায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের সংস্পর্শে এসে বাঙালী অভিজাতদের মধ্যে বিধবাদের প্রতি পূর্বের চেয়ে কিছুটা সহানুভূতি প্রদর্শন করতে দেখা যায়। বিধবার উপর কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং ঐ অনুশাসন প্রয়োগে সমাজপতিদের দৃঢ় মনোভাব সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন পত্রিকায় বিধবা বিবাহ প্রচলনের স্বপক্ষে লেখা ছাপা হতে থাকে। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর বিধবাদের বিয়ে নিয়ে ইয়ং বেঙ্গলরা প্রথম কথা বলেন। ১৮৩৩-১৮৩৪ সালে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭ সালে সমাচার দর্পণে শান্তিপুরের এক বিধবা সরকারের কাছে বিধবা বিবাহ আইন প্রনয়নের জন্য দাবি জানায়। ঐ পত্রিকায় একই দাবি জানিয়ে আরেকটি পত্র ছাপা হয়। ১৮৩৭ সালে আইন প্রনয়নের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিধবা বিবাহ সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুত্রপাত ঘটে। সরকার ১৮৩৭ সালের জুন মাসে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইন প্রনয়নের ঔচিত্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিচারকদের কাছে মতামত চান। বিচারকগণ মানবিক দিক থেকে এমন আইন প্রনয়নের যুক্তি মেনে নিয়েও অভিমত দেন যে, এতে ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর মনে আঘাত লাগবে। তবে বিচারকগণ একথাও বলেন যে, পুনর্বিবাহ প্রথা চালু না থাকার ফলে সমাজে বহু অনাচার হচ্ছে। এসব অভিমতের জন্য সরকার আইন প্রণয়নে বিরত ছিলেন।

এর আগে বিধবা বিয়ের আইন করার লক্ষ্যে ভারতীয় ল' কমিশন বিভিন্ন আঞ্চলিক আদালতের মতামত চেয়েছিল। অপরদিকে প্যারিচাদ মিত্র ব্রিটিশ ভারতীয় সোসাইটির পক্ষে "নোটিস অন দি ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স" (১৮৫৩) বইয়ে প্রস্তাব করেন যে, বিধবা বিয়ে বিষয়টি যেন আইনসভার এখতিয়ারের বাইরে থাকে।[১৭]

বিধবা বিবাহ বিষয়ে নানারকম তর্ক বিতর্ক চলাকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রখর বুদ্ধিমত্তা নিয়েই "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা" এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে) শিরোনামে যুক্তিসম্মত বই লেখেন। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা ঐ বইয়ের ক্ষুরধার যুক্তি খন্ডনের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তিনি অক্টোবর মাসে একই শিরোনামে দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এভাবেই তিনি বিধবা বিয়ের আইন প্রণয়নের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১৮]

সমাজের কদর্য অনাচারের স্বরূপ উদঘাটিত করে তিনি সোচ্চার হলেন বিয়ের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে।[১৯] ১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর আইন পরিষদে বিধবা বিবাহের পক্ষে আইনের একটি খসড়া পেশ করেন আইন পরিষদের সদস্য জে.পি. গ্রান্ট। ১৮৫৬ সালে এই খসড়া আইনটি দ্বিতীয়বার পেশ করা হয়। তখনও এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ উঠতে থাকে। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিয়ের আইন তৈরীর সব বাধা দুর করে বিধবা বিয়ের আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাস হয়ে

একজন বাল্য সহচরী ছিল। এই সহচরী তার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর তাকে খুব ভালবাসতেন। মেয়েটি ছোটবেলায় বিদ্যাসাগরের কাছে প্রায় সব সময়ই থাকত। তিনি যখন কলকাতায় পড়তে চলে যান তখন মেয়েটির বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের কয়েকমাস পরেই তার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হওয়ার পর বিদ্যাসাগর কলেজের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন। বাড়ী গিয়ে তিনি তার অভ্যাসমত কে কি খেয়েছেন জানতে চাইতেন কিন্তু সেবার গিয়ে জানতে পারলেন তার বাল্য সহচরী কিছু খায়নি কারণ তার একাদশী, বিধবাকে একাদশীতে খেতে নেই। একথা শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেলেছিলেন। সেদিন থেকেই তিনি বিধবার দু:খ মোচনের সংকল্প করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ১৩/14 বছর। (বিহারীলাল সরকার, **বিদ্যাসাগর**, কলিকাতা: ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৭৪)।

[১৭]. প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫; সূত্র বিমান বিহারী মজুমদার, **হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়ান সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াজ ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ**, চ্যাপ্টার চার।

[১৮]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

[১৯]. ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ৯৮৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনে এক আবেদন সরকারের নিকট পেশ করা হয়। একই বিষয়ে ভারতের আরো বহু স্থান থেকে বহু ব্যক্তির আবেদন সরকারের কাছে পৌছতে থাকে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১; ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।)

Dhaka University Institutional Repository

গভর্নর জেনারেল দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।[২০] এই আইন পাস হওয়ার পাঁচ মাস পর ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে।[২১]

১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০টি বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসব বিয়ের খরচ বাবদ ৮২ হাজার টাকার দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করেছিলেন। এজন্য তার ৫০ হাজার টাকা ঋণ করতে হয়েছিল।[২২] এরই ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সাল থেকে ১৯১১ সালের এর মধ্যে পাঁচশোর মতো বিধবার বিয়ে হয়।[২৩]

তিনি একজন সমাজ কর্মীরূপে, নেতারূপে বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেছেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা আন্দোলন করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার পুত্র নারায়নচন্দ্র ১৮৭০ সালে জনৈকা বিধবাকে বিবাহের উদ্যোগ নিলে তিনি তা সমর্থন করেন ।[২৪]

বাল্যবিবাহ রোধের জন্য আন্দোলন

উনিশ শতকের পাঁচের দশক থেকেই বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতা আন্দোলনের মর্যাদা পায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অবদান এ ব্যাপারে অনস্বীকার্য। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকাকে অবলম্বন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের চৈতন্য জাগ্রত করার প্রয়াস পান।[২৫]

অন্যান্য কুপ্রথার মত বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্যও শিক্ষিত সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। বাল্যবিবাহের দোষ (১৮৫২) শীর্ষক নিবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের অপকারিতা তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে প্রগতিশীল শিক্ষিত বাঙালীরা অনেক লেখালেখি করেছেন। পরবর্তীতে আন্দোলনও গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৬০ সালে সরকার একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে সহবাসের সর্বনিম্ন বয়স ধার্য করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধের ইতিহাসে আরেকটি আইনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এর প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে প্রণীত হয় 'ব্রম্ম নেটিভ ম্যারেজ এ্যাক্ট'। এই আইনটি কেবল ব্রাম্ম সমাজের জন্য প্রযোজ্য থাকলেও এর প্রভাব পড়ে সমগ্র সমাজের উপর। ১৮৭২ সালের এই আইনে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স

---

[২০]. জে. পি. গ্রান্টের দু:সাহসিক তেজস্বিতার প্রেরণা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তীব্র সামাজিক আন্দোলনের যুক্তি। বিধবা বিবাহ বিষয়ে তার লেখা বই এবং অন্যান্য বহু লেখনি সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল বিধবা বিবাহ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২)।

[২১]. ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের ১২ নম্বর বাড়িতে প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিধবা মেয়েটির নাম কালীমতি। মাত্র চার বছর বয়সে বিয়ে ও ছয় বছর বয়সে বিধবা হয়ে কালীমতি তখন ১০/১১ বছরের বালিকা মাত্র। কিন্তু বৈধব্য জীবনের নানাবিধ বিধি-নিষেধের ফলে ওই বালিকা বয়সেই তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কালীমতির বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের ব্রজপন্ডিত সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র শ্রীশ চন্দ্র (বন্দোপাধ্যায়) বিদ্যারত্নের সঙ্গে। এই বিয়ের খরচ বাবদ ১০ হাজার টাকার ব্যয়ভার ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহন করেছিলেন। সে সময়ের বহু গুণীজন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ ২১; ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০)।

[২২]. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিয়ের ব্যয়ভার বহন করতে ৫০ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। তাকে এই ঋণমুক্ত করার জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট ও এডুকেশন গেজেট এর সম্পাদকবৃন্দ এবং অন্য কয়েকজন ব্যক্তি "বিধবা বিবাহ তহবিল" খোলার উদ্যোগ নিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপত্তি জানান। সেজন্য এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেই এই ঋণ শোধ করেন। (প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১)।

[২৩]. স্বপন বসু, **সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর**, ২৭ জুলাই, ১৯৯১, পৃ: ৩৮।

[২৪]. পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহ বিষয়ে তার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে বিরোধ বাধে। তখন তিনি বলেন আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমি উদ্যোগ করে অনেকের বিবাহ দিয়েছি। এমন স্থলে আমর পুত্র বিধবা বিবাহ না করে কুমারী বিবাহ করলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাতে পারতাম না। (প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২)।

[২৫]. গোলাম মুরশিদ, **সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক**, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ: ২০৬-২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর করা হয়। কিন্তু সমাজে এই আইনের বাস্তবায়ন হয়নি।[২৬]

বাল্যবিবাহ বিরোধী মানসিকতা কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং বাল্যবিবাহ রোধে তারা পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, রামতনু লাহিড়ী ১৮৬৮ সালে তার বড় মেয়ের বিয়ে দেন ১৬ বছর বয়সে।[২৭] এবং ১৮৬৯ সালে ভ্রাতুষ্পুত্র অন্নদায়িনীর বিয়ে দেন ২০ বছর বয়সে।[২৮] তার কনিষ্ঠা কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় ২১ বছর বয়সে মারা যান।[২৯] অন্নদাচরণ কাস্তগীর তার মেয়ে সৌদামিনির বিয়ে দেন ১৬ বছর বয়সে।[৩০] যদিও এরকম বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনায় বাল্যবিবাহ বিরোধী মানসিকতার তীব্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সত্তরের দশকে বাঙালী হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ বিরোধী মনোভাব বেশ প্রবল হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে এ সময় ঢাকায় 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হয়।[৩১] এই সভার ছাত্ররা ১৮ বছরের আগে কেউ বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এই সভার মুখপাত্র হিসেবে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় 'বাল্যবিবাহ মহাপাপ'। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটি ৬ বছর টিকে ছিল। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বইও এ সময় লেখা হচ্ছিল। ১৮৭০ সালে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 'বাল্যবিবাহ' শীর্ষক বই লেখেন। রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। ১৮৭২ সালের 'বিশেষ বিবাহ আইন' গৃহীত হওয়ার কিছুদিন আগে দেশের খ্যাতনামা চিকিৎকদের প্রায় সকলেই বাল্যবিবাহের বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেন।[৩২]

এছাড়াও ১৮৮৯ সালে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। কলকাতার জনৈক হরিমোহন মাইতি (বয়স ৩৫) তার বালিকাবধূ ফুলমণির (বয়স ৯, সরকারি হিসাবে ১০) সঙ্গে জোর করে সহবাস করতে গেলে ফুলমণির মৃত্যু ঘটে। ফুলমণির এই নৃশংস মৃত্যুর ঘটনা সমাজকে জানিয়ে দিল, আইনের প্রয়োজন কত জরুরী! এর ফলে বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৮৯০ সালের শেষ দিকে বিতর্ক তুঙ্গে উঠল। পঞ্চান্ন জন মহিলা চিকিৎসক ভাইসরয়ের কাছে এই মর্মে আবেদন জানালেন, কিছুতেই যেন চৌদ্দর আগে মেয়েদের সহবাস আইন প্রণয়নের রায় দেয়া না হয়। এই দাবীর পক্ষে দুই হাজার বিশিষ্ট মহিলা আর্জি পাঠালেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে। তখন এর বিরুদ্ধবাদীরাও খুবই তৎপর ছিল।[৩৩]

১৮৯০ সালে ভারত সরকার ভারত সচিবের কাছে সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সহবাসের বয়স বারোতে উন্নীত করার আবেদন জানান। সে অনুযায়ী ১৮৯১ সালের ৯ জানুয়ারী স্কোবল ভাইসরয় কাউন্সিলে 'এজ অফ কনসেন্ট বিল' উত্থাপন করেন। এর ২ মাস ১০ দিন পরে অর্থাৎ ১৮৯১ সালের ১৯ মার্চ সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়ন পর্যন্ত সময়টিতে সমগ্র বাংলাদেশে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ ও পক্ষে বিপক্ষের আন্দোলনে মুখরিত থাকে।[৩৪]

---

২৬. গোলাম মুরশিদ, **সংকোচের বিহ্বলতা**, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ: ৩৩।
২৭. **বামাপ**, ফাল্গুন, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৭০৩।
২৮. **বামাপ**, কার্তিক, ১২৭৬, পৃ: ১৩৭-১৩৮।
২৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ**, (কলিকাতা: দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭), পৃ: ২০৩-২৯৮।
৩০. **বামাপ**, কার্তিক, ১২৭১, পৃ: ২২৩।
৩১. সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, **বাল্যবিবাহ**, ঢাকা, ১৮৭০। সোমনাথ বাল্যবিবাহের অনিষ্ঠকারিতা দেখিয়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।
৩২. S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, 2nd ed. (Calcutta: 1974), p: 158-159.
৩৩. বিরুদ্ধবাদীদের একজন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তার বৌবাবু (১৮৯০) প্রহসনে লিখলেন, কিশোরীর বদলে যুবতী বিয়ে করা বারবণিতা ঘরে আনার সামিল। কেননা প্রাপ্তবয়স্ক হলে কন্যা দুষিত হতে বাধ্য। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১, পৃ: ৫৯)।
৩৪. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধবাদীদের শত বাধা সত্ত্বেও সরকার সহবাস সম্মতি আইন সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদন করেন। তবে সহবাস সম্মতি আইনে এ সংক্রান্ত বয়স বারোতে উন্নীত করা সম্ভব হলেও বিয়ের বয়স উনিশ শতকেও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাল্যবিবাহের কুপ্রথা সমাজে কিছুটা কমলেও এখনো বন্ধ হয়নি।[৩৫]

সমাজের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তারাও পড়ালেখা শেষ না করে বিয়ে করতে সম্মত হতো না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬০ এর দশকে সাড়ে ১৩ বছর বয়সের স্বর্ণকুমারীর বিয়ে দেন। রামতনু লাহিড়ী ১৮৬৮ সালে তার বড় মেয়ের বিয়ে দেন ১৬ বছর বয়সে এবং ১৮৬৯ সালে ২৫ বছরের ভ্রাতুস্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিয়ে দেন। রাজনারায়ণ বসুর দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে দেন ১৬ বছর বয়সে।[৩৬]

উনিশ শতকের শেষ দিকে উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে বেশী বয়সে বিয়ে করা কিংবা বিয়ে না করার অনেক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) প্রথম গ্রাজুয়েট এবং এম.এ. পাস বাঙালী নারী। তিনি বেথুন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা ছিলেন। চাকরি ছেড়ে ৪১ বছর বয়সে বিপত্নীক পন্ডিত কেশবানন্দ ম্যামগেনকে বিয়ে করেন। প্রথম বাঙালী মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী বসু (১৮৬১-১৯২৩) বিয়ে করেন ২২ বছর বয়সে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে। বিয়ের পরও তিনি লেখাপড়া করেন। চন্দ্রমুখী বসুর ছোট বোন বিধুমুখী অবিবাহিতা ছিলেন। মেরী মিত্র ৩৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তার ছোট বোন অবিবাহিতা ছিলেন। বরিশালের চন্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী সেন ৩০ বছর বয়সে বিয়ে করেন। জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীর দুই বিদুষী মেয়ে সরলা চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০) বেশী বয়সে বিয়ে করেন।[৩৭]

উনিশ শতকে শিক্ষিত নারীরা বিয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে শুরু করেন। তারা বাল্যবিবাহের অপকারীতা সম্পর্কে যেমন সচেতন হন, তেমনি স্বামী নির্বাচনে নিজ পছন্দের গুরুত্ব উপলব্ধিতেও সমর্থ হন। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বিয়ে প্রথা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। উনিশ শতকে এক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' পাশ হয়। এই আইনের ২ ধারায় বিয়ের বয়স বেধে দেয়া হয়েছে। ছেলের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়ের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। আইন ভাঙলে শাস্তির বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩৮] আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হলেও একবিংশ শতাব্দীতেও বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ অব্যাহত রয়েছে।

সহবাস সম্মতি আইন প্রবর্তনের আন্দোলন

বাল্য বিবাহ বন্ধের জন্য বহু আন্দোলনের পর ১৮৬০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন জারি হয়। সে আইনে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিয়ের বয়স নির্দেশিত হয়েছিল ১০ বছর। যেসব বিবাহিত মেয়েদের বয়স ১০ হয়নি তাদের সাথে সহবাস করাকে পাশবিক অত্যাচার হিসেবে গণ্য করা হতো।[৩৯]

---

[৩৫]. গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

[৩৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।

[৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।

[৩৮]. একুশ বছরের কোন পুরুষ বা আঠারো বছরের কোন মহিলা কোন শিশুর সাথে বিবাহ চুক্তি সম্পাদন করলে তার ১ মাস মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড হতে পারে। উল্লেখ্য যে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে একুশ বছরের কম বয়স্ক পুরুষকে ও আঠারো বছরের কম বয়স্ক নারীকে 'শিশু' ও 'নাবালক' হিসাবে গণ্য করা হবে। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২)।

[৩৯]. ১৯৮৯ সালে কলকাতার জনৈক হরিমোহন মাইতি তার এগার বছরের স্ত্রী ফুলমনির সঙ্গে বলপূর্বক সহবাস করতে গেলে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ভারত ও ইংল্যান্ডে বাল্য বিবাহের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯০ সালের দিকে ভারতজুড়ে রক্ষণশীলরা যে শক্তিশালী ছিল তা স্পষ্ট হয়েছিল, সহবাস সম্মতি আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে।[৪০] ১৮৯১ সালে ৯ জানুয়ারি ভারতীয় পিনাল কোর্ডের ৩৭৫ ধারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্যার এন্ড্রু স্কোবল বিল আকারে উত্থাপন করেছিলেন এই আইন। পূর্ববঙ্গ, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আইনকে কেন্দ্র করে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে উগ্র আন্দোলন শুরু হয়। বালগঙ্গাধর তিলক সহবাস সম্মতি বিল নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনীতি শুরু করেন। বাংলাদেশের মুসলিমদেরও এরা আহবান জানায় সহবাস সম্মতি বিলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য। এর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের মধ্যেও বিরুদ্ধতা ও প্রতিবাদ ছিল।[৪১] তবে বেশ কিছু প্রতিবাদ সত্ত্বেও নবাব আহসান উল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ এই বিলের পক্ষে মত দিয়েছিলেন।[৪২] তীব্র প্রতিবাদ ও পক্ষে-বিপক্ষে জোরদার আন্দোলনের পর ১৮৯১ সালের ১৯ মার্চ সহবাস সম্মতি আইন প্রণীত হয়।[৪৩]

বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্দোলন

কুলীনদের বহুবিবাহ সংক্রান্ত সচেতনতা তুলনামুলকভাবে বৃদ্ধি পায় উনবিংশ শতাব্দির তিরিশের দশকে। স্ত্রীদের দুঃখ ও দুর্দশা অবলোকন করে বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রথম প্রতিবাদ জানান।[৪৪] রামমোহনের পরে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এ প্রথার বিরুদ্ধবাদী ছিল। তারা তাদের পত্রিকায় এই নিষ্ঠুর প্রথার সমালোচনা করত। তাদের গোষ্ঠীর সভাসমিতি ও পত্র পত্রিকাগুলিতে এ সম্পর্কে আলোচনা হত।[৪৫] কৃষ্ণমোহনের 'এনকোয়েরারে' প্রকাশিত একটি লেখায় তীব্রভাবে এই প্রথার নিন্দা করা হয়।[৪৬]

উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে খ্রিষ্টান মিশনারীরাও তাদের পত্র পত্রিকায় এ প্রথার সমালোচনা আরম্ভ করে। একই সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখি শুরু হয়। কৌলিন্যপ্রথাই বহুবিবাহের অন্যতম কারণ ছিল। কৌলিন্য প্রথার কুফল নিয়ে জ্ঞানান্বেষণ ও এনকোয়েরার নামে ইয়ং বেঙ্গলের দুটি মুখপত্রে আলোচনা চলতে থাকে। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' এই প্রথার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এর সম্পাদকীয়তে এ

জন চিকিৎসক তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধের জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করেন। মেয়েদের বিয়ের বয়স ১২, ১৪ এবং ১৬ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মতামত উত্থাপিত হতে থাকে। বিরুদ্ধবাদীরাও তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে জনমত সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে। (গোলাম মুরশিদ, **সংকোচের বিহ্বলতাঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃঃ ১৪৯-১৫০)।

৪০. সংক্ষেপে এই আইন এর মূল কথা ছিল বারো বছরের নিচে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত বালিকার সঙ্গে তার অনুমতি অথবা বিনা অনুমতিতে সহবাস করলে তা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০)।

৪১. ১৮৯১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই বিষয়ক প্রথম প্রতিবাদ সভায় জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল কুঞ্জপাল নাগ তীব্র প্রতিবাদ জানান। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রতিবাদ সভায় বহু মুসলিম জমিদার ও আইনজীবী বক্তৃতা করেন। জমিদার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা, কবি কায়কোবাদ, মৌলভী মকবুল আলী, মুন্সী মহিউল্লাহ প্রমুখ বিরোধীতা করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩)।

৪২. মুনতাসীর মামুন, **পূর্ব বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)**, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র), পৃঃ ১৯৯।

৪৩. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৪৪. রামমোহন কুলীন স্ত্রীদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সতীদাহ ও অন্যান্য সংস্কার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে কুলিনদের বহুবিবাহ বিষয়ে তিনি খুব বেশী মনযোগ বা সময় দিতে পারেননি। কুলীন স্ত্রীদের অনাদর ও কৃচ্ছসাধনার চেয়ে একটি বিধবাকে পুড়িয়ে মারার সমস্যা স্বভাবতই তার কাছে বেশী নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার মাধ্যমে সমাজের লোকদের সচেতন করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬)।

৪৫. ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।

৪৬. The Indian Gazette, **Polygamy Among the Hindoos**, re-printed from Enquirer, 14.1.1832.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথাকে ধিক্কার জানিয়ে বলা হয়, "Now Coolin Polygamy, as we have already shown is injurious to society, by increasing adultery both among the wives of the Coolins and among those who are by this system deprived by wives, by demoralizing the nation, and by checking the increase of population. All these evils are directly opposed, to the ends of civil Government, and as the cause of them is not enjoined in the Shastras the Government ought to abolish it."[৪৭]

পরবর্তীতে বিভিন্ন সংখ্যায় এ প্রথাকে আক্রমন করে তা বন্ধের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। শুধু রিফর্মারই নয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার দর্পণে আধুনিক কৌলিন্য রীতি যে শাস্ত্রসম্মত নয় এবং এর অশেষ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়ে সর্বদ্বারী বিবাহ প্রচলন ও কন্যা বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারী হস্ত ক্ষেপ প্রার্থনা করেন।[৪৮] সমাজের সচেতন মানুষও এই প্রথার তীব্র নিন্দা জানান। পরবর্তীতে এই প্রথা বন্ধের জন্য সমাজের বুদ্ধিজীবিরা সরকারের নিকট সুপারিশমালা পেশ করেন। সেসব সুপারিশমালায় বহুবিবাহের কুফল ও সমাজের উপর তার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। জনগণের দাবি ও যুক্তিকে মেনে নিয়ে বাংলার সরকার এই প্রথা বন্ধের জন্য আইন প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিটি গঠন করেন। কিন্তু সমাজের কতিপয় সুবিধাবাদী ব্যক্তির বাধার কারণে এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহের অভাবে আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়নি।[৪৯]

১৮৫৫ সালে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রনয়ন করার জন্য কিশোরীচাদ মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'বন্ধুবর্গ সমাজোন্নতি বিধায়ীনি সভা' বা 'সুহৃদ সমিতি'র সদস্যরা সরকারের কাছে আবেদন পত্র পাঠান। এই আবেদন পত্রে দশ হাজারেরও বেশী লোক স্বাক্ষর করেন। ১৮৫৭ সালে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি জে. পি. গ্রান্ট আন্দোলনকারীদের জানান যে, শীঘ্রই একটি বিল ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করা হবে। ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সদস্য এই বলে আশ্বাস দেন যে, ১৮৫৭ সালের মে মাসের আগেই বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণীত হবে। কিন্তু ঐ বছর সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় আইন প্রণয়নের বিষয়টি স্থগিত থাকে। ১৮৬৩ সালে আবার একটি আবেদন পত্র সরকারের কাছে দেয়া হয়। তবে এবারের আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না। ১৮৬৬ সালে পুনরায় আন্দোলন জোরদার হয় এবং ২০,৮৪১ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র বাংলার গভর্ণর সিসিল বিডনের কাছে পাঠানো হয়। এই আবেদন পত্রের পিছনে অধিকাংশ প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন থাকায় তৎকালীন ভারত সরকার এটাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন এবং আইন প্রনয়নের বিষয়টি বিচার বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে বাংলার সরকারকে সাত সদস্যের একটি কমিটি[৫০] গঠন করার নির্দেশ দেন। ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কমিটি একটি প্রতিবেদন তৈরী করে। প্রতিবেদনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যঘোষাল ছাড়া বাকী সকলেই বহুবিবাহ বন্ধের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন।[৫১] বাংলার সরকার এই মতের পক্ষে থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহের অভাবে আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়নি।[৫২]

---

[৪৭]. The Reformer, 7 April !833.

[৪৮]. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**, ২য় খন্ড, মাঘ ১৩৫৬, পৃ: ২৫২-২৫৩।

[৪৯]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), পৃ: ৫৫-৫৬।

[৫০]. কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন, সি. পি. হবহাউস, এইচ. টি. প্রিনসেপ, সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। (ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২)।

[৫১]. ১৮৬৭ সালে কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, কুলীনদের বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। গভর্ণর জেনারেল শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়নের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা দিয়ে কার্যকরভাবে বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না। দিগম্বর মিত্র, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি স্বতন্ত্র প্রতিবেদনে অভিমত দেন যে, বহুবিবাহের চল কমে যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন বাহুল্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যশরণ ঘোষাল ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, বহুবিবাহ সমাজে ব্যাপকভাবেই চালু আছে। আইনের সাহায্য ছাড়া তা কার্যকরভাবে রদ করা সম্ভব নয়। (মালেকা বেগম, সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় বাংলার নবজাগরণের মনীষীদের সাহায্যে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের আন্দোলনের সূচনা ঘটলেও যতদিন পর্যন্ত নারী সমাজ তার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারিত অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য উদ্যোগী হয়নি, ততদিন পর্যন্ত তাদের জাগরণের পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেনি। কিন্তু সমাজের সার্বিক প্রগতির জন্য যারা চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির নতুন দিক নিয়ে চর্চা শুরু করেন তারা রেনেসাঁর মানবিক আবেদন থেকে নারী সমাজের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসেন, প্রতিবাদ জানান এবং নারী নিপীড়ন বন্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন তৈরীর পক্ষে আন্দোলন করেন।[৫৩] তাই বাংলার নারীদের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ আইন, বিধবা বিবাহ আইন, কুলীন বহুবিবাহ বন্ধ, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক বা কণ্যাপণ বন্ধ ও সহবাস সম্মতি বিল ঘোষিত হওয়ায় নারী প্রগতির জন্য সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এরফলে সমাজে নারী সম্পর্কে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারী প্রগতি আন্দোলন

উনিশ শতকে শিক্ষিত সমাজের উদ্যোগে বাঙালী মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। নারী সমাজের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের দুঃখ দুর্দশা দুর করার জন্য সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই নারী শিক্ষার উদ্যোগ নেন। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নারী শিক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ১৮৫৭-৫৮ কালপর্বে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মিশনারী স্কুল ছাড়াও উনিশ শতকের শেষের দিকে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় নারীদের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৮৭০-১৮৯০ এর মধ্যে প্রায় বাংলাদেশের সব স্থানেই সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠেছিল। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে এসকল সংগঠন ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বাংলার নারী জাগরণ ও নারী শিক্ষার জন্য মেরী কার্পেন্টার, সোফিয়া ডবসন ও অ্যানেট অ্যাক্রয়েড এর নাম উল্লেখযোগ্য। সোফিয়া ডবসন বিলেতে বসেই বাংলাদেশের নারী সমাজের সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বহু বই লিখেছেন এবং আইন পাস করানোর জন্য আন্দোলন করেছেন। আর অ্যানেট অ্যাক্রয়েড ১৮৭২ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত বাংলার নারীদের শিক্ষার জন্য কাজ করেছেন।[৫৪] বাংলার নারী জাগরণের সূচনালগ্নে নারীসমাজের জন্য নবযুগের মনীষীরা, নতুন যুগের শিক্ষিত সমাজ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন।

হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ও তার পরবর্তী অনুসারী কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রমুখ ব্যক্তিগনই হিন্দু নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় উন্নত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানবতাবাদী ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন হিন্দু নারী সমাজ উন্নয়নের জন্য। এছাড়াও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দূর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ হালদার, শ্রীনাথ চন্দ প্রমুখ সমাজকল্যানকামী ব্যক্তি বহু বাধা অতিক্রম করে পূর্ববঙ্গে নারী শিক্ষা ও প্রগতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

নারী শিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজের অবদানও উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে তারা ঘরের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। নারী কল্যাণে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বামাবোধিনী সভা'। তার অনুকরণে ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল অন্ত:পুর স্ত্রী শিক্ষা সভা। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৮৭০ সালে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে ১৮৭২ সালে 'হিতকরী

আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬-৫৭; ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২-৯৩)।

[৫২]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

[৫৩]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩। এই আন্দোলন সমাজ সংস্কারমূলক হলেও বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। এই আন্দোলন বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নারী প্রগতির সূত্রপাত হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

[৫৪]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২), পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সভা' ও ১৮৭৭ সালে 'ব্রাহ্মিকা সভা' ও 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' চালু হয়েছিল। এসব কর্মউদ্যোগের সাথে মহিলারাও সম্পৃক্ত ছিলেন। বরিশালের গিরিশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৫] একই সময়ে বাংলার মুসলিম সমাজের প্রথমে ছিল গোড়া ফরায়েজী আন্দোলনের প্রভাব এবং পরবর্তীতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলার নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলীও উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমেদ খা প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সমঝোতামুলক মনোভাবের সাথে ইসলামী চেতনার সমন্বয় করার প্রয়াস করেছেন।[৫৬]

মুসলিম নারীদের পর্দা নষ্ট হওয়ার ভয়ে স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষা লাভের চেয়ে ঘরে শিক্ষা প্রদান করাই তারা পছন্দ করতেন। আর এই গৃহ শিক্ষা ছিল মূলত ধর্মীয় শিক্ষা। বাংলা ভাষা শিক্ষাও মুসলিম মেয়েদের জন্য সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিম নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ করুন পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে সৈয়দ আমীর আলী নারী শিক্ষা এবং নারী জাগরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের মুহাম্মদ ডিসুফ ভারতীয় ব্যবস্থাপনা সভাসমুহে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেন।[৫৭] উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই সমসাময়িক পত্রিকায় অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। এরও পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বালিকার বিদ্যা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। সমকালীন সমাচার দর্পণ এ তথ্যটি তুলে ধরে।[৫৮] বামারোধিনী পত্রিকার ১৮৩৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসের সংখ্যায় শিক্ষা বিভাগের ১৮৭১-১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় কলিকাতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১০ টি। ১৪ টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলো সরকারি সাহায্য পায় না এবং উভয় স্কুলে সর্বমোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৭৩২ জন। এর মধ্যে মাত্র ৫৮ জন ছিল মুসলমান ছাত্রী।[৫৯] এর চেয়েও করুন চিত্র দেখা যায়

---

৫৫. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৫৬. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম নবাবগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজ এক চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালি তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ কোম্পানির শাসকবর্গের ভাষা এবং নতুন পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না এবং শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও ছিল না। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ. জুন-১৯৯৮, পৃঃ ৬০)। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব তথা আযাদী আন্দোলনে শত শত মুসলমানকে গ্রেফতার ও বন্দী করেন তদানীন্তন কমিশনার মিঃ টেইলার। তিনি বন্দীকৃত মুসলমানদেরকে বিনা বিচারে অতি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিকভাবে প্রতিনিয়ত কিছু সংখ্যক করে তার বাংলার ময়দানে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে থাকেন এবং এ আন্দোলনের নেতা আহমদুল্লাহর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে প্রথমে মৃত্যুদন্ড এবং পরে মৃত্যুদন্ডাদেশ রহিত করে যাবজ্জীবন দীপান্তর ও যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহইয়া আলীরও যাজ্জীবন দীপান্তর দেয়া হয় এবং তিনি আন্দামানে ইন্তেকাল করেন। আহমদুল্লাহর অন্তিম ইচ্ছা ছিল সহোদরের পাশেই সমাহিত হতে কিন্তু ইংরেজ সরকার তার এই ইচ্ছা পুরণ করেনি। সাদিকপুরে পরিবারের বাসগৃহটি ভুমিস্মাৎ করে সেখানে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মিত হয়। একবস্ত্রে খালিহাতে পরিবারের নারী শিশুদের গৃহ থেকে উৎখাত করা হয় ঈদের দিনে। পৈশাচিকতার এখানেই শেষ নয় পরিবারের সুবৃহৎ পারিবারিক কবরস্থানটি চাষ দিয়ে উৎখাত করা হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়। যুক্তিসংগত কারণেই মুসলিম সমাজ তখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিলেন। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭-২৭৮)।

৫৭. Fimanbeharif Mazumdar, **History of Political thought from Ramnıohub to dayannda**, 18221-84, Vol. 1, (Bangal Calcutta. 1934) p: 394-401.

৫৮. সমকালীন সমাচার দর্পণ এ তথ্যটি তুলে ধরে বলেন, ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবাগত দশটার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় হিন্দু মুসলমানসহ প্রায় দেড়শত বালিকা অংশগ্রহণ করেছিল। (**সমাচার দর্পণ**, ২৭ ডিসেম্বর, ১৮২০, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, **মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮**, ঢাকাঃ ১৯৬৪, পৃঃ ৩১ ও ৫২ পৃষ্ঠার ১৩ নং তথ্য নির্দেশ)। স্যার সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে। ১৮৮৫ সালে লাহোরের আঞ্জুমান এ হিমায়েত নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিল। পশ্চিম ভারতের মুসলিম নারীরা অন্যধর্মের নারীদের চেয়েও বেশি শিক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছেন কারণ এসব স্থানে মুসলিম সংগঠনগুলো নারী শিক্ষার জন্য দৃঢ় ভুমিকা পালন করেছে।

৫৯. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ১২০ সংখ্যা, আগস্ট ১৮৭০, পৃঃ ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮০ খ্রী: ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৫৩ জনের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা মাত্র একজন।[৬০]

১৮৮২ খ্রী: বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় স্ত্রী শিক্ষায় সর্বপেক্ষা উন্নত পারসী সমাজ এবং সর্বাপেক্ষা অনুন্নত মুসলমান সমাজ।[৬১] তবে ধীরে ধীরে সমাজের মানসিকতার ক্রম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৩ সালে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রযোজনীয়তা অনুভব করে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী।[৬২] এই সংগঠন অন্ত:পুর শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে। নারীর পর্দা রক্ষা বিষয়ে মুসলিম সমাজে রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হলেও শিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ মেয়েদের শিক্ষার প্রতি যত্নবান হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান এডুকেশনাল কংগ্রেস' এ নারী শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ১৮৯৯ সালে নারী শিক্ষার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় মহিলা শিক্ষয়িত্রী স্কুল।[৬৩]

মুসলিম সমাজের অবরোধ প্রথার কঠোর শৃংখল ভেঙ্গে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় কয়েকজন মহিলার আবির্ভাব ঘটে যারা নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন, নারীর সম অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরে সংগ্রাম করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিবি তাহেরন নেসা, ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩) এবং করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬)।[৬৪] ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্যার সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। ১৮৮৫ সালে লাহোরের আঞ্জুমান-এ-ইসলাম নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশ্চিম ভারতের মুসলিম নারীরা বেশী শিক্ষা লাভে সমর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ এসব স্থানের মুসলিম সমাজ উন্নয়নকামী সংগঠনগুলো নারী শিক্ষার জন্য দৃঢ় ভুমিকা পালন করেছে। এসত্ত্বেও কলকাতায় মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়নি। ১৮৯০ সালে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য দুটি স্কুল চালু হলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়টি ছিল মুসলিম মেয়েদের জন্য অবিভক্ত বাংলার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[৬৫]

সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তৎকালীন সমাজে মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত না। ১৯০১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ৪০০ জন মুসলিম মহিলা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেছে।[৬৬] মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্দার বাধা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কথা ১৯০৫-১৯০৬ সালের মহিলা স্কুল পরিদর্শিকা মিস ব্রুকের রিপোর্ট থেকেও জানা যায়।[৬৭] বিশ শতকের শুরুতে মুসলমান সমাজে নারীর অবরোধ, পর্দাপ্রথা ও শিক্ষার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এবং মুসলমান সম্প্রদায়ে নারী জাগরণ ছড়িয়ে পড়ায় মেয়েরা অধিক পরিমাণে স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। ১৯০৪-১৯১১ সালের মধ্যে কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের অনেক স্কুল চালু হয়। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার অগ্রগতি খুবই ধীরগতিতে হচ্ছিল। ১৯১১ সালের এক রিপোর্টে জানা যায়, প্রতি হাজারে দুজন মেয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন। যদিও পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে গেল, তবুও শতকরা

---

[৬০]. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ১৮২ সংখ্যা, আগস্ট ১৮৮০, পৃ: ১৪৯।
[৬১]. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, ২০৪ সংখ্যা, আগস্ট ১৮৮২, পৃ: ২৬২।
[৬২]. আব্দুল আজীজ, ফজলুল করিম, ফজলুর রহিম, আবদুল মজিদ হেমায়েত উদ্দীন প্রমুখ মনীষীগণ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী বংশের মনীষী ঢাকা মাদ্রাসার তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লা আল ওবায়দীর নিকট হতে এ বিষয়ে এ সম্মিলনীর বিষয় তারা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারী** সমাজ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, পৃ: ৬২)।
[৬৩]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, ২০০২, পৃ: ৪০।
[৬৪]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০।
[৬৫]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।
[৬৬]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।
[৬৭]. ওয়াকিল আহমেদ, **উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা**, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ: ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে ১৯২২ সালে মাত্র ০.৪ ভাগ মেয়ে লেখাপড়া করেছিল এবং শতকরা ৩ জন আধুনিক শিক্ষা লাভ করেছিল।[৬৮]

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে নারীকে অবরুদ্ধ রেখে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে সমাজের সচেতন নারী-পুরুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহলের উদ্যোগে বোম্বের পারসী পরিবারে এবং ১৯০৫ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মা সমাজকর্মী খুজিস্তা আখতার বানুর উদ্যোগে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯২২ সালে সুলতানা বেগম নামে এক বাঙালী মহিলা আইন বিষয়ে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ফায়জী পরিবারের তিন বোন আতিয়া, জোহরা ও নাজরী মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। তারা নারীর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৪ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স থেকে মহিলাদের বাদ দেওয়া হলে আতিয়া ফায়জী তীব্র প্রতিবাদ জানান। পর্দার মধ্যে থেকেই তিনি নারীদের অধিকার প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন।[৬৯] বাঙালী মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। গোড়াপন্থীদের বহু নিন্দাবাদ সহ্য করে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী জাগরণের জন্য কাজ করে গেছেন।[৭০]

নারী প্রগতি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদান

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের অন্যতম ছিল বাংলার পশ্চাদপদ, নির্যাতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের মুক্তির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য তিনি দেশে গিয়ে ভারতের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারই আহ্বানে ১৮২১ সালে মেরী অ্যান কুক[৭১] কলকাতায় আসেন। মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এসে চার্চ মিশনারীতে যোগ দেন এবং বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের জন্য ৮টি স্কুল প্রতিষ্টা করেন। ১৮২৪ সালে আরও ২৪টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৭২] মেরী কাপেন্টার[৭৩] দ্বিতীয় ইংরেজ মহিলা যিনি ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষে এসে নারী শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ১৮৬৯ সালে একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্টা করেন। কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়।[৭৪] বিদেশের নারী সংগঠনগুলো থেকে তিনি

---

৬৮. ওয়াকিল আহমেদ, **উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

৬৯. Khawaz Mumtaz and Farida Shaheed, **Women of Pakistan**, (London: Zed Publishers, 1987), p: 40-41.

৭০. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, , পৃঃ ৪৭।

৭১. মেরী অ্যান কুক ১৮২৩ সালে মিশনারী পাদ্রী আইজাক উইলসনকে বিয়ে করেন। ২৪ বছর তিনি মিশনারী সোসাইটির মাধ্যমে বাংলার নারী সমাজের জন্য শিক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের কাজ করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃঃ ২৮)।

৭২. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।

৭৩. ১৮৩৩ সালে বিলেতে তাদেরই বাড়িতে মেরী কার্পেন্টার এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামমোহন রায়ের। সেখানে তিনি রামমোহন রায়ের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হন বাংলার নারীদের বিষয়ে কাজ করার জন্য। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর। অবশেষে ৫৯ বছর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে এসে প্রথমে বোম্বাই পরে সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আতিথ্যে আহমেদাবাদে ছিলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০)।

৭৪. সোনিয়া নিশাত আমিন, **বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ২০০২), পৃঃ ১১৩; তবে কারো কারো মতে, সরকার কার্পেন্টারের অনুরোধে ফিমেল নরম্যাল ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্টা করতে সম্মত হয়নি। (ড. জ্ঞানেশ মিত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, কলকাতাঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৮); উল্লেখ্য যে, ১৮৮৬ সালে ৪টি ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের জন্য ২৪২ জন ছাত্রী পড়ত এবং ১৮৯৯-১৯০০ সালে তা বেড়ে ৭০১ জন হয়েছিল। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের নারী শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।[৭৫] বাংলার নারী জাগরণের জন্য সোফিয়া ডবসন কলেটের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বিলেতে বসেই এ দেশের নারীসমাজের সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বহু বই লিখেছেন, আইন পাস করানোর জন্য আন্দোলন করেছেন। বিদুষী ইংরেজ মহিলা অ্যানেট অ্যাক্রয়েড বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, বীরভূম, বহরমপুর প্রভৃতি এলাকায় নারী শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক সহযোগীতা করেছেন।[৭৬]

মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

১৯০৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জাস্টিস আমীর আলীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রচার আন্দোলন হয়েছিল। এছাড়াও প্রখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচারক শেখ জমিরুদ্দিন, স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে ১৯০১ সালে রাজশাহীতে উদ্দীপনামুলক ভাষণ দিয়ে সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।[৭৭] এরকম বহু ধর্মপ্রাণ উদার ব্যক্তি স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে সমাজকে সচেতন করেন। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমান ওলামার সভাতেও স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল।[৭৮]

মুসলিম নারীদের মধ্যে পরবর্তিকালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বড় বোন করিমুন্নেসা খানম, হুগলীর আগা মোতাহারের মেয়ে জমিদার মন্নুজান, তাহেরুন্নেসা এবং লতিফুন্নেসা এবং বেগম রোকেয়া যারা নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

নারী প্রগতি আন্দোলনে ব্রাম্মসমাজের ভূমিকা

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট রাজা রামমোহন রায় ব্রাম্ম সমাজ প্রতিষ্টা করেছিলেন। নারীর সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তার যেসব পদক্ষেপ আত্মীয়সভার (১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেছিল তার বিস্তৃতি ঘটেছে ব্রাম্মসমাজের মাধ্যমে। সমাজের আশ্রয়হীনা, পতিতা, বিধবা, অত্যাচারিত মেয়েরা ব্রাম্মসমাজে আশ্রয় পেত। ব্রাম্মসমাজ নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্রাম্মসমাজের মাধ্যমেই অবিভক্ত বাংলায় নারী জাগরণের সূচনা ঘটে। মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্টা, বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, বিধবা বিবাহের প্রসার করা, কুলীন বিয়ে বন্ধ করা প্রভৃতি বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করে বাংলার ব্রাম্মরা নারীকে সামাজিক দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং নারী প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেছেন। রামমোহন রায়ের পরে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়দত্ত প্রমুখ উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার নবজাগরণের যে পথ তৈরী করেছিলেন ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের বিষয়ে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সে পথেই এগিয়ে চলছিলেন উদারপন্থী ব্রাম্মরা। নারীমুক্তি বিষয়ে তারা সোচ্চার ছিলেন। তাদের শ্লোগান ছিল, নারীসমাজকে দুর্গতির হাত থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়েই সমাজ সংস্কারের কাজ করতে হবে। নারীসমাজ যদি কষ্ট ভোগ করে এবং প্রগতির পথে না আসতে পারে তবে ভবিষ্যৎ নাগরিকরাও অন্ধকারেই থেকে যাবে।[৭৯]

নারী শিক্ষা প্রসারেও ব্রাম্মসমাজের অবদান উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে তারা ঘরের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। কলকাতায় চালু হয়েছিল 'বামাবোধিনী সভা'। তারই অনুকরণে ঢাকায় ১৮৭০ সালে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় চেষ্টায় 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ময়মনসিংহে ১৮৭২ সালে 'হিতকরী সভা' ও ১৮৭৭ সালে

---

[৭৫]. গৌতম নিয়োগী, **শারদীয় দেশ**, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৪৩; মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১।

[৭৬]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

[৭৭]. Khawaz Mumtaz and Farida Shaheed, **Women of Pakistan**, Ibid, p: 40.

[৭৮]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

[৭৯]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

'ব্রাহ্মিকা সভা' ও 'অন্ত:পুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' চালু হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগে ব্রাহ্ম মহিলারাও উদ্যোগী হয়েছিলেন। বরিশালের গিরিশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬), মাইকেল মধুসুদনের ভাতিজি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), বরিশালের চন্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), ঢাকার অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) এবং জীবনানন্দ দাশের মাতা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮০] সুতরাং বলা যায় বাংলার নবজাগরণের সূচনালগ্নে নারীসমাজের জন্য নবযুগের মনীষীরা, নতুন যুগের তরুণ শিক্ষিত সমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগী পুরুষরা নতুন জাগরণের পথ সৃষ্টি করে গেছেন।

নারী প্রগতি আন্দোলনে মুসলিম সমিতির ভূমিকা

উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মুসলিম নারী জাগরনের সূচনা পর্বে যেসব মুসলিম সমিতি নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি সমিতি হচ্ছেঃ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৮), ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩) ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি (১৯০৩)।[৮১]

১৮৬৩ সালে নবাব আব্দুল লতিফ যখন মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্টা করেন তখন সমগ্র মুসলিম সমাজই ছিল পশ্চাদপদ। তখন নারী প্রগতির বিষয়টি ছিল কল্পনারও অতীত। ১৮৭৮ সালে ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ও আইন বিষয়ে এই সমিতি যে কাজ ও আন্দোলনের সূচনা করে তাতে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে নারী প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার পথ সৃষ্টি হয়।[৮২]

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনির ভূমিকা

১৮৮৩ সালে কয়েকজন মুক্তচিন্তার যুবক[৮৩] প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনি সংগঠন। নারী শিক্ষা বিস্তারে সমগ্র উদ্যম কাজে লাগিয়ে সমাজে নারীর নীচ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতনতাবোধ থেকে নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে তারা উদার মতবাদ প্রচার করতে থাকে। নারী শিক্ষার বিষয়ে সামাজিক বিরুদ্ধতার প্রতি সজাগ থেকে তারা নারী শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন এবং প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করে সেই অনুসারে গৃহে পড়া ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তাদের উদ্যোগেই মুসলিম মেয়েদের জন্য ঘরে ঘরে অন্ত:পুর শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল।[৮৪]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির ভূমিকা

১৯০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী জাস্টিস আমির আলীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার ও বালিকা

---

৮০. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৮১. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

৮২. তবে রক্ষণশীলদের বাঁধায় নারী প্রগতির কাজ প্রায়ই স্থগিত হয়ে যেত বলে এ বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার জন্য সংগঠন থেকে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং নারী শিক্ষার পক্ষে প্রচেষ্টা চালানো হয়। রক্ষণশীলদের তর্কবিতর্ক ও বাধাদান সত্ত্বেও এই সংগঠন কাজি বিল, বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে অভিমত জানায়। কাজি বিল পাস হয়েছিল কিন্তু বিয়ে ও তালাক-এর রেজিস্ট্রেশন বিলটি তখন বিরুদ্ধবাদীদের আন্দোলনের ফলে নাকচ হয়ে গিয়েছিল। (ড. ওয়াকিল আহমেদ, **উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃঃ ২১২; মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, ২০০২, পৃঃ ৪৩)।

৮৩. আবদুল মজিদ (সমিতির সাধারণ সম্পাদক), মৌলভী ফজলুল করিম, মৌলভী বজলুর রহিম, মৌলবী আবদুল আজীজ প্রমুখ। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩)।

৮৪. মোতাহার হোসেন সূফী, **বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য**, (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃঃ ৩৫; মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রচার আন্দোলন হয়েছিল। এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, পর্দা রক্ষার সাথে সাথে মেয়েদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষাও লাভ করতে হবে।[৮৫] সমাজসেবার আদর্শ নিয়ে শিক্ষিত যুবকরা এই সংগঠনের আদর্শে গ্রাম ও শহরে নারী শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালায়। বহু ধর্মপ্রাণ উদার ব্যক্তিও নারী শিক্ষার সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৮ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে ওলামার সভাতে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।[৮৬]

নারী প্রগতি আন্দোলনে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের ভূমিকা

তৎকালীন সমাজে নারীর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, বৈষম্য ও নিপীড়ন এবং কঠোর অবরোধের নামে যেরূপ নির্যাতন চলছিল তার প্রতিবাদ সমসাময়িক বুদ্ধিজীবিদের লেখায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩), মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), মেহেরুল্লাহ তৃতীয়, সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, নুরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী, ইমদাদুল হক, ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৮৭] সমসাময়িক সাহিত্যে স্ত্রী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা, সমাজে নারীর মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটত।[৮৮] সুফি মতবাদে প্রভাবিত কবি মোজাম্মেল হক মেয়েদের বাংলা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে 'পদ্য শিক্ষা' নামে পাঠ্য বই লিখেছিলেন। প্রগতিবাদী সাহিত্যিক নজিবর রহমান আনোয়ারা ও গরিবের মেয়ে উপন্যাসে ইংরেজী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার সমর্থন করেছেন। তিনি ১৮৯২ সালে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে সেটিকে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বিধবা বিবাহের পক্ষে বিশেষ সংগ্রাম করেছেন। তিনি এ বিষয়ে বহু লেখা লিখেছেন এবং মুসলিম বিধবাদের বিবাহের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।[৮৯] নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী তার লেখনীর মাধ্যমে সমাজে মেয়েদের অবস্থা তুলে ধরতেন। তার বই থেকেই জানা যায় যে, সেসময় প্রতি ১০ হাজার মুসলিম মেয়ের মধ্যে মাত্র ১০ জন মেয়ে সামান্য শিক্ষিত, ৭ জন শিক্ষারত ছিল। শুধু শিক্ষা নয়, অন্যান্য সামাজিক অধিকারও মেয়েদের দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি প্রচার করতেন। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। বিভিন্ন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিরা নারীর সামাজিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সমাজ সংস্কারের আহবান জানাতেন। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী নারী জাগরণের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, 'বাল্যবিবাহ প্রথা, বিবাহে অতিরিক্ত জেওর-মোহর ধার্য করা, বিবাহোৎসবে ঢোল, বাদ্য, বাজনা, নাচ, গান, বাজী পোড়ানো, বরযাত্রীগণের জন্য অতিরিক্ত আহারের ব্যয় এবং সুদীকর্জ করে পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি কুপ্রথাসমূহ সামাজিক শাসন দ্বারা রহিত করা আবশ্যক। ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার উপর জোর দেন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতা করেন।

---

[৮৫]. Khawaz Mumtaz and Farida Shaheed, **women of Pakistan**, Ibid, p: 40.

[৮৬]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

[৮৭]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

[৮৮]. নারীর প্রতি সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল সমাজসেবী যেসব পত্রপত্রিকায় লিখতেন সেগুলোর মধ্যে মিহির ও সুধাকর, আল এসলাম, সওগাত, মোয়াজ্জিন, মাসিক মোহাম্মদী, নবনুর, কোহিনুর, ইসলাম প্রচারক, সাম্যবাদী, তবলীগ উল্লেখযোগ্য। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪)।

[৮৯]. উল্লেখ্য যে তখন মুসলিম ধর্মে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু পারিবারিক জীবনে বাল্যবিধবাদের ওপর সামাজিক নিগ্রহ চলত এবং বিধবার বিয়ে বাস্তবে সম্ভব হতো খুব কম। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫)।

Dhaka University Institutional Repository

নারী রক্ষা সমিতি

নারী আন্দোলনের মাধ্যমে সহিংসতার কারণ অনুসন্ধান ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রনয়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং ১৯২৩ সালের ৩০ এপ্রিল 'নারী রক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতি মূলত নারী হরণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার ঘটনার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠে। সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন এডভোকেট এস.আর দাস । এই সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিল নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। সমিতির পক্ষ থেকে নারী নিগ্রহ বন্ধ করা, অপহৃত নারীদের উদ্ধার করা এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে নারী নিগ্রহের সংবাদ সংগ্রহ করা হতো এবং সংবাদের ভিত্তিতে যে এলাকায় নারী নিগ্রহের সংখ্যা বেশী সে অঞ্চলে গিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে নারী রক্ষা সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হতো। এই কার্যক্রমের ফলে সে সময় যশোরসহ বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে "নারী রক্ষা সমিতি" গড়ে উঠে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ চলাকালে অসহায় নারী শিশুদের নিয়ে অর্থলোভীদের যে পাচার ও দেহ ব্যবসা শুরু হয় তা বন্ধ করতে পাপ ব্যবসা নিরোধ বিল পাস হয়। এই বিল পাশ করার ব্যাপারে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র চাপ ছিল।[৯০]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১)

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় কোন দেশের নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে ঘটবে এবং কতটুকু ঘটবে। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি যদি অগ্রাধিকার না পায় তাহলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক নীতিমালা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর আগমনের পথটি শুরু থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন।[৯১] ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্য সভা করা বা সমিতি গড়ে তোলা বাঙালী নারীর জন্য ছিল কঠিন কাজ। তারপরও কয়েকজন প্রগতিশীল নারী পুরুষের হাত ধরে নারী জাগরণ তথা নারী মুক্তির জন্য ঘরের বাইরে বের হয়েছিল। ১৮৭১ সালে কেশবচন্দ্র সেন ধর্মীয় সভা ও ধর্মীয় সংগঠনের বাইরে প্রথম মেয়েদের সংগঠন গড়ে তোলেন। তবে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি। তিনি মহিলা ও শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য সংস্কারমূলক কাজে ব্রতী হয়ে 'ভারত সংস্কার সভা'র অধীনে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্কুলের মেয়েদের নিয়ে তিনি 'বামা হিতৈষিনী সভা' নামে মেয়েদের জন্য সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি শুক্রবার সভা অনুষ্ঠিত হত এবং ৩০ জন পর্যন্ত মহিলা সভায় উপস্থিত থাকতেন এবং ব্রহ্মময়ী দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ, হেমাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ স্বনামধন্য মহিলা এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিতেন।[৯২]

জাগরণ থেকে আন্দোলনের পর্বে নারীদের উত্তরণের এই যুগ সন্ধিক্ষণে রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০), সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭), কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫), নিস্তারিনী দেবী

---

[৯০]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০ ।

[৯১]. নারী প্রগতি আন্দোলনের সূচনালগ্নে প্রকাশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা নারীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। পর্দা ও অবরোধ এবং সমাজের পশ্চাৎপদতার মধ্যে যখন মেয়েরা জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল তখন প্রকাশ্য সভা সমিতি গড়ার কাজে মহিলাদের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই প্রথম মহিলা সমিতি গড়ার উদ্যোগও নিতে হয়েছিল প্রগতিকামী পুরুষদেরই। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১)।

[৯২]. শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, **বাংলার নারী জাগরণ**, (কলিকাতাঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, ১৩৫২, চৈত্র), পৃঃ ৫৭-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৩৩-১৯১৬) প্রমুখ মহিলা আত্মকথা লিখে সে যুগের নারীদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। এদের অনেকেই অন্তঃপুরের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন এমনকি সভা সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য তারা মহিলাদের উৎসাহিত করতেন। ব্রহ্মময়ী দেবী, সৌদামিনী রায়, হেমাঙ্গিনী দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ স্বনামখ্যাত মহিলা নারী সংগঠন ও সমিতি পরিচালনা করেছেন।[৯৩]

অধিকার আদায়ের একবারে সূচনা পর্বে বাংলার নারী আন্দোলনের প্লাটফর্ম হলো একটি মহিলা সমিতি। যার নাম ছিল 'ভাগলপুর মহিলা সমিতি'।[৯৪] রামতনু লাহিড়ী এবং অপর কয়েকজনের নেতৃত্বে ১৮৬৩ সালে একদল নারী এই সমিতি গড়ে তুলেছিল। উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীকে মুক্ত করা। এরপর ১৮৬৬ সালে বাঙালী নারী বিভিন্ন সভায় যোগ দিতে শুরু করে এবং নিজ নিজ উদ্যোগে সংগঠন প্রতিষ্টা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৮৭৯ সালের ৮ আগষ্ট রাধা রাণী লাহিড়ী, কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ নারী মিলে 'বঙ্গীয় মহিলা সমাজ' বা 'বেঙ্গল লেডিস অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। ৪১ জন নারী সদস্য নিয়ে এই অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রা শুরু করলেও পরে এর সদস্য সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে যায়।[৯৫]

নারী সমাজের শৃংখল মোচন করে বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নারীরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় কংগ্রেস। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ছয় জন নারী যোগ দেন। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন বাঙালী। ওই দুজনের একজন হলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ড. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং অপর জন জানকী নাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলন বাংলার নারী সমাজকে দ্রুত রাজনীতিমুখী করে তোলে। ১৯০৫-১৯০৮ কালপর্বে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং বাংলার নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মেয়েরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও উৎপাদন শুরু করে। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৬১-১৯২৩) একটি মহিলা সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৯৬]

১৯০৮ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থনে একটি নারী কমিটি গঠন করেন। প্রথম দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন রাজনীতিতে যারা আসেন তাদের সবারই আগমন ঘটেছিল পারিবারিক সূত্র ধরে। গান্ধীজির নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরপর রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৭ সালে অ্যামি বেসান্ত ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ব্যাপক হারে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওই সময় নারীর উপর নেমে আসা বৃটিশদের অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুম নারীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অসহযোগ আন্দোলনে নারী কর্মীদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেন বাসন্তী দেবী। উর্মিলা দেবী ১৯২১ সালে 'নারী কর্ম মন্দির' প্রতিষ্টা করে মেয়েদের সত্যাগ্রহের শিক্ষা দেন। এর মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে হেমপ্রভা মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, দৌলতুন্নেসা, আসা লতা সেন, নেলী

---

[৯৩]. চিত্রাদেব, **অন্তঃপুরের আত্মকথা**, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪), পৃঃ ৫।

[৯৪]. স্বনামধন্য অধ্যাপক নব্যপন্থী রামতনু লাহিড়ীর নেতৃত্বে দুর্গামোহন দাস, রাখালচন্দ্র রায়, ব্রজকিশোর বসু, ও অভয়চরণ মল্লিক প্রমুখের সহযোগীতায় ১৮৬৩ সালে ভাগলপুর মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১)।

[৯৫]. গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, (ঢাকাঃ নিউজ নেটওয়ার্ক, ২০০৩), পৃঃ ৯।

[৯৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬-৯৭; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

সেনগুপ্তা, মোহিনী দেবী, সরলা গুপ্ত প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং নিজ উদ্যোগে একটি করে নারী সংগঠন গড়ে তুলে নারীকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু করেন।[৯৭]

অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের বাইরে আন্দোলনের আরেকটি ধারা তখন লক্ষ্য করা যায়। সেটি ছিল বিপ্লবী আন্দোলন। এই দু'টি ধারাতেই নারীর অংশগ্রহণ ছিল স্বপ্রণোদিত। বিশ থেকে তিরিশের দশক পর্যন্ত অনেকগুলো বিপ্লবী সংগঠনের জন্ম হয়। ওই সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীলা নাগ (রায়), কমলা দাস গুপ্ত, মনোরমা বসু প্রমুখ।[৯৮]

১৯৩২ সালে ইংরেজ গভর্নর স্টানলি জ্যাকসনসহ কয়েকজনকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে বিপ্লবী নেত্রী বীণা দাসের নয় বছর কারাদন্ড হয়। আবার গভর্নর অ্যান্ডরসনকে হত্যা পরিকল্পনায় সহযোগিতা করার জন্য ১৯৪৩ সালে উজ্জ্বলা মজুমদারের ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১৯৩২ সালের ১৪ জুন চট্টগ্রাম জেলার ধলঘাট থানায় পটিয়া গ্রামে ইংরেজী বাহিনীর বিরুদ্ধে বন্দুক যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে মাস্টারদা সূর্যসেনের জীবন রক্ষা এবং তাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এক সাহসী বিপ্লবী নারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। একই বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি ছয় জন সহযোদ্ধা নিয়ে চট্টগ্রামে ইউরোপীয় ক্লাব দখল করে নেন। পরে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। ঐ আত্মত্যাগের আগে লেখা এক চিঠিতে তিনি যে প্রশ্ন রেখে যান সেটি হল, "আমি আশ্চার্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ কেন থাকবে?"[৯৯]

বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনেও নারীর অংশগ্রহণ সক্রিয় ছিল। ১৯২১ সালে সন্তোষ কুমারী দেবী পশ্চিম বাংলার গৌরিপুর চটকল শ্রমিকদের নিয়ে গৌরিপুর শ্রমিক সমিতি গঠন করেন। শ্রমিকদের অধিকার সচেতন করে তুলতে তিনি বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন, যার নাম ছিল 'শ্রমিক'। তার নেতৃত্বেই ১৯২১-১৯২২ সালে চটকল ধর্মঘট এবং ১৯২৭ সালে বেঙ্গল নাগপুর ও খরগপুর রেল ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতার হাওড়ায় এবং ১৯২৮-২৯ সালে চটকল ধর্মঘটে প্রভাতী দাশ গুপ্ত সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন। তবে এরই মাঝে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' নারীর ভোটাধিকারের বিষয়ে আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এর আগে ১৯১৭ সালে সেক্রেটারী অব স্টেট মন্টেগু ভারত সফরে এলে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৪ জন নারীর একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা ভারত বর্ষের নাগরিক হিসেবে পুরুষের মত সম-প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান। এর পাশাপাশি তারা রাজনৈতিক নেতা ও অভিজাত পুরুষ সমাজের কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন সভায় উথাপিত নারীর ভোটাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। মুলত এরপর থেকে নারী সংগঠনগুলো সংগ্রাম শুরু করে। ১৯২৩ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, বেগম সুলতানা মুয়াজ্জেদা এবং কবি কামিনী রায়ের নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধি দল নারীর ভোটাধিকারের দাবি নিয়ে লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করেন। ওই সময় ভোটাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক সমর্থন যোগায় ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চট্রগ্রামসহ বেশ কয়েকটি জেলার মহিলা সংগঠন।[১০০]

১৯২৩ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারীর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরও আগে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংস্কার বিল এর মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। তবে ওই ভোটাধিকার কার্যকর হয় ১৯২৯ সালে। ওই বিল অনুযায়ী তিনটি শর্ত সাপেক্ষে

---

৯৭. প্রাগুক্ত।
৯৮. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
৯৯. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।
১০০. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ভোটাধিকার কার্যকর হতো। শর্ত তিনটি হল- ক) নারীকে বিবাহিত হতে হবে; খ) নারীকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে এবং গ) নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। তবে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারীকে রাজনৈতিকভাবে দমিয়ে রাখতেই ওইসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। তখন নারী শিক্ষার বিস্তারও বাধাহীন ছিল না। ফলে ভোটাধিকারের উল্লিখিত তিনটি শর্ত পুরণ করে মাত্র তিন লাখ ১৫ হাজার নারী ভোটাধিকার লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে গোটা ভারতবর্ষের নারীর জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার আইন পাস হয়। এবং রাজ্য সভায় ১৫০টি আসনের মধ্যে ছয়টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। মূলতঃ ভোটাধিকার লাভের মধ্যদিয়ে রাজনীতিতে নারীর সরব অংশগ্রহণ শুরু হয়।[১০১]

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে বিদেশী কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের দোকানে, মদের দোকানে পিকেটিং করতে ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চিরাচরিত বাধানিষেধ, জড়তা, সামাজিক নিন্দা প্রভৃতি তুচ্ছ করে শত সহস্র মহিলা আন্দোলনে যোগ দেন। এভাবে দেশের সকল অঞ্চলে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে মহিলারা কারাবরণ করেন। কয়েকজন কংগ্রেস নেত্রী ও কর্মীর উদ্যোগে কলকাতায় ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভারতীয় কংগ্রেসের কোনো মহিলা সমিতি বা শাখা ছিল না। রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন মহিলাদের সংগঠিত করাই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। সমিতির কাজ ছিল বিলাতী জিনিস বিক্রির কাজে বাধা দেওয়া, মদ বিক্রি করতে না দেওয়া এবং সভা ও শোভাযাত্রা করা। মহিলাদের এ ধরনের কাজের তীব্রতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের মধ্যে এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পুলিশের আক্রমণও বাড়তে থাকে। তবু পুলিশ মিলিটারির প্রতিরোধ উপেক্ষা করে সে সময় সত্যাগ্রহ সমিতির নেতৃত্বে নারী সমাজ হাসিমুখে কারাবরণ করেছে। শুধু কারাবরণ নয়, মেয়েরা নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচারেরও শিকার হন। বহু নারী সন্তান কোলে নিয়ে মিছিল ও সভায় যোগ দিয়েছেন, তাঁদের সন্তান গুলিতে মারা গেছে, লাঠির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, তবু তাঁরা সংগ্রামে নিরস্ত হননি। নারী সত্যাগ্রহ সমিতি ১৯৩০ সালের ২২ জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ওই দিন মহিলারা পুলিশের ঘোড়ার নিচে পিষ্ট হন, পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে আহত হন তবু তাঁরা সমাবেশের স্থানে সমবেত জনগণের ওপর ঘোড়া চালাতে বাধা দেন, লাগাম ধরে ঝুলে ঘোড়ার গতি রোধ করেন।[১০২]

ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি চলে খিলাফত আন্দোলন। এ আন্দোলনে মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী ও খিলাফত আন্দোলন উদ্দেশ্যের দিক থেকে ভিন্ন ছিল না। সেজন্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নারীরা উভয় আন্দোলনের সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন। শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী ও তাঁদের মা বি-আম্মা বেগম মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। বি-আম্মার উদ্দীপ্তমূলক ভাষণ ও অবরোধ ভাঙার আহ্বানে বাংলার মুসলিম নারী সমাজ অনুপ্রাণিত হয়।[১০৩]

বিট্রিশ আমলেও বাংলার কৃষক আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। জমিদার ও জোতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তিরিশের দশক থেকে শুরু করে চল্লিশের দশক পর্যন্ত পুর্ব ও পশ্চিম

---

১০১. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১।

১০২. কমলা দাশ গুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ: ৭৯-৮১। আরেকটি ঘটনা ১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারিতে ঘটে। ওই দিন পূর্ব পরিকল্পিত স্বাধীনতা দিবস পালনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল অক্টারলোনি মনুমেন্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা। ঘটনার পূর্বেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। সত্যাগ্রহ সমিতির উদ্যোগে মহিলারা ওই দিনও পুলিশের সঙ্গে তীব্র লড়াই করেন। পুলিশের সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করেও দু'তিনজন মহিলা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেন। ১৯৩১ সালের শেষ দিকে হিজলি বন্দিনিবাসে রাজবন্দিদের ওপর গুলি চালাবার প্রতিবাদে নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সদস্যরা উর্মিলা দেবীর নেত্রীতে আন্দোলন করেন। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।)

১০৩. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১২; গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় যে আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-তেভাগা আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন করে বাংলার নারীরা জোতদার জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সাহসী মানসিকতার পরিচয় দেন। ওই সময়ে সাহসী নারী নেত্রী সরলা বালার নেতৃত্বে নড়াইল এলাকার কয়েকশ নারী জমিদার শ্রেণীর শোষণের প্রতিবাদ জানাতে ঝাটা বাহিনী গঠন করেছিলেন। এছাড়া, দিনাজপুরের দ্বীপেশ্বরী, কালিয়াডাঙ্গীর জয়মনি ও রোহিণী, রাণীশংকৈলের তাঞ্চানী, বীরগঞ্জের কুলেশ্বরী, সেতাবগঞ্জের ভুত্বেরী, ফুলবাড়ীর বধুমনি ও যমুনা, দেবীগঞ্জের বুড়িমাসহ প্রত্যেকেই তৎকালীন জমিদারদের শোষণ ও আত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে বলিষ্ঠ ভুমিকা রেখেছিলেন এবং গড়ে তুলেছিলেন তীব্র প্রতিবাদ।[১০৪]

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরও বর্তমান বাংলাদেশ অংশে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর চাপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় ইলা মিত্রের নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে নারীর আত্নত্যাগের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অধিকার আদায়ে অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে ইলা মিত্র আত্নত্যাগ ও আন্দোলনের এক অন্যান্য দৃষ্টান্ত তৈরি করে গেছেন। তেভাগা আন্দোলনে তার এই সাহসী ভূমিকা বাংলার গ্রামীণ নারীকে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে; যা পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করেছে।[১০৫]

১৯৪৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির মহিলা সদস্যদের দ্বারা গঠিত 'মহিলা আত্নরক্ষা সমিতি' সমাজ সেবামুলক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে বাংলার নারীসমাজকে সংগঠিত করেছে বলে প্রচলিত রয়েছে। সে বছরের দুর্ভিক্ষের সময় সমিতি বহু লঙ্গরখানা চালু করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নারী ও শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে সমিতি পাঁচ হাজার নারীকে একত্র করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে নিয়ে যায় এবং আরও লঙ্গরখানা খুলে দেয়ার দাবি জানায়। মহিলা আত্নরক্ষা সমিতির নেত্রীদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন, গীতা রায় চৌধুরী, মনোরমা মাসিমা, জুঁইফুল বসু, মনিকুন্তা সেন, অমিয়া সেন, রেনু বসু, অণিমা সিংহ, শান্তি দত্ত, কনক দাস গুপ্ত (মুখার্জী), শচী লাহিড়ী (বিশ্বাস), মুক্তি ঘোষ (মিত্র) বাণী দাস গুপ্ত প্রমুখ।[১০৬]

এরপর আসে ভাষা আন্দোলন। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার দাবিদারদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু হয়েছিল। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়ার আগেই। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রশীদ সিলেট সফরে গেলে ছাত্র সমাজের পাশাপাশি একটি নারী প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে গুলি বর্ষণের খবর নারী সমাজের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ঢাকার ১২ নম্বর অভয়দাস লেনে বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে নারী সমাজ বিক্ষোভ করে। ওই সময় নারায়নগঞ্জের মডার্ন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টনে এক বিশাল নারী সমাবেশ হয়। ভাষা আন্দোলনে আরও যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া খান, হালিমা খাতুন, আহমেদ, নাদেরা বেগম, সারা তৈফুর প্রমুখ।[১০৭]

---

[১০৪]. গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

[১০৫]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২; গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১২।

[১০৬]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

[১০৭]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩; গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নুরজাহান মোর্শেদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমদ, বেগম সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুনন্নেসা আহমদ, মেহেরুন্নেসা খাতুন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিন জন সদস্য আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। ঐ সময়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন নেলী সেন গুপ্তা। তাদের এ বিজয় নারী সমাজের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। নারীরা তখন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হতে থাকেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নুরজাহান মোর্শেদ, রাজিয়া বানু, বেগম দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী করা হয়।[১০৮]

১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্য, লবণ ও তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের ও সংগঠনের মহিলারা রাস্তায় নামে এবং মন্ত্রী আতাউর রহমানকে ঘেরাও করে। দেশে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করলে নারীরা খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল করে।[১০৯]

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। জনগনের সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বাতিল করা হয়। সকল ধরণের সভা, সংগঠন বেআইনি ঘোষণা করে সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে রচিত ১ম শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয় এবং সারা দেশে সন্ত্রাসমূলক শাসন শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে নারীর অধিকার আন্দোলনও থেমে যায়। ১৯৫৯ সাল থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় সভানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হতে থাকলে নারীসমাজের কিছু কিছু সমাবেশ, সভা, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির সুযোগে বিভিন্ন সমিতির সদস্যরা একত্রিত হতে থাকে। ১৯৬০ এর দশকে ধীরে ধীরে নারী সংগঠনগুলো পুনরায় কাজ শুরু করে।[১১০]

পাকিস্তান শুরুর পর থেকেই নারীরা বিভিন্ন দাবী আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তারই ফলস্বরূপ ১৯৬১ সালে প্রণীত হয়, 'মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১'।[১১১] পরবর্তীতে মুসলিম আলেম সমাজের পক্ষ থেকে পারিবারিক আইন কুর'আনের পরিপন্থী উল্লেখ করে তা সংশোধনের জন্য প্রস্তাব উঠলে এর বিপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সাংসদ শাহনেওয়াজের মেয়ে বেগম নাসিম জাহানের নেতৃত্বে লাহোরের নারী সমাজ বিশাল মিছিল বের করেন।[১১২]

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় শামসুন্নাহার মাহমুদ ও বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আপওয়া, শিশুরক্ষা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, বেগম ক্লাব

---

[১০৮]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৩; গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩।

[১০৯]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৩।

[১১০]. গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি, শিশুরক্ষা সমিতি, আপওয়া, শিশুকল্যাণ পরিষদ ছাড়াও ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন, ইসলামিক মহিলা মিশন, নিখিল পাকিস্তান সমাজকল্যাণ সমিতির পূর্ব পাকিস্তান শাখা ইত্যাদি মহিলা সংগঠন সামরিক শাসনের মধ্যেও তাদের সম্মেলন, বার্ষিক সভা, সাহিত্য সভা ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করেছে। এসব সভায় নারী শিক্ষার প্রসার, মেয়েদের চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করা, চাকরিজীবি মেয়েদের সমস্যা সমাধানের বিষয়, শিশু আইন প্রবর্তন ও কিশোর অপরাধীদের জন্য বিশেষ বিচারালয় স্থাপন, পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা, প্রচলিত আইনে নারীর অধিকারগুলো সংশোধন করা, নার্সিং বৃত্তি প্রসার, অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ, মেয়েদের চলাফেরার নিরাপত্তা বিধান, নারী শিক্ষা সংকোচনের প্রতিবাদ, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে একজন করে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ, নির্বাচনে মহিলাদের জন্য জাতীয় পরিষদে ৩টি, প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে আসন সংরক্ষণের দাবি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক প্রস্তাব উত্থাপিত হতো। এসব কাজের মধ্য দিয়ে ঘরোয়াভাবে হলেও নারীদের মধ্যে প্রগতি লাভের চেতনা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছিল। (**সাপ্তাহিক বেগম**, ঢাকা, ৫৭-৬২; মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৭-১৪৮)।

[১১১]. এই আইনটিতে 'জাষ্টিস রশিদ কমিশনের' সকল সুপারিশ গৃহীত না হলেও নারী সমাজের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। বহুবিবাহ প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা, স্ত্রীকে যথেচ্ছ তালাক দেওয়া নিয়ন্ত্রিত করা, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা, মেয়ের বিয়ের বয়স ১৬ ও ছেলের ২১ বছর নির্ধারণ করা, মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোহরানা দাবিমাত্র পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি আইনের ধারা সংযুক্ত হয়েছে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮)।

[১১২]. Khawaz Mumtaz and Farida Shaheed (Eds.), **Women of Pakistan**, Ibid, p: 84.

Dhaka University Institutional Repository

ও অন্যান্য সংগঠনের মহিলারা প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদ সম্মেলন করেন।[১১৩] ইডেন কলেজের ছাত্রী মতিয়া চৌধুরী মহিলাদের দাবি সমর্থন করে বিবৃতি দেন।[১১৪] মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ বাতিলের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রস্তাব উঠলে সদস্য রোকাইয়া আনোয়ার পাল্টা প্রস্তাব করেন যে, ১৫ সদস্যবিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটিতে তা পাঠানো হোক। মহিলারা পাকিস্তানের উভয় প্রদেশেই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের নারীরা পারিবারিক আইনের পক্ষে ৫০ হাজার মহিলার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পারিবারিক আইন সংশোধনীর দাবি সোচ্চার থাকলেও নারীসমাজের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে কোন সংশোধনী ছাড়াই আইনটি গৃহীত হয়। এবং এটি পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাফল্যজনক বিজয়।[১১৫]

১৯৬৯ সালে সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে ১৯ জানুয়ারী আন্দোলনকারী ছাত্রীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। একই বছরের ২০ জানুয়ারী আসাদ শহীদ হওয়ার পর প্রতিটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলে নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। ২৪ জানুয়ারী হরতাল পালনের সময় ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা হাতে পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে গেলে তার পেছনে হাজার হাজার নারী পুরুষ পল্টন ময়দানের দিকে এগিয়ে যায়। এর কিছু দিন পর ৭ ফেব্রুয়ারী নারী সমাজের উদ্যোগে শোক মিছিল বের হয়। বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত হয় মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। পরবর্তী সময়ে ওই সংগ্রাম পরিষদেরই নাম হয় 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'।[১১৬]

১৯৬৯ এ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পরপরই আসে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার অসংখ্য নারীর আত্নত্যাগের কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করা হলোঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ছাত্রদের নিয়ে সশস্ত্র ছাত্রী ব্রিগেড গড়ে তোলে। ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন রোকেয়া খানম (কবীর) এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা। এই ব্রিগেডের ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে পরবর্তী সময়ে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় মহিলা ব্রিগেড গঠন করেন। মহিলাদের সংগঠিত করা এবং ছাত্রলীগ পরিচালিত ছাত্রী ব্রিগেড পরিচালনায় যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ফোরকান বেগম, মমতাজ বেগম ইকু ও ফেন্সি জেসমিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধকালে রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মালেকা বেগম। আগরতলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোকেয়া কবীর। চিকিৎসা সহায়তা ও রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করেছেন ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, ডা. ফৌজিয়া মোসলেম, আয়েশা খানম, সাইদা কামাল টুলু, মনিরা আক্তার, ফরিদা আক্তার, মুশতারী শফি প্রমুখ। যুদ্ধের সময় কলকাতায় পদ্মা পুকুর এলাকায় নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত গোবরা ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন সাজেদা চৌধুরী। তাকে সহযোগিতা করেছেন কৃষ্ণা রহমান ও ফজিলাতুন নেসা। ঐ ক্যাম্পের প্রায় চারশ নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ নারীকে আত্ন-বিশ্বাসী করে তোলে এবং সেটাই পরে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহস যোগায়।[১১৭]

১৯৭০ সালে ৪ এপ্রিল বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পুর্বপাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ছিল একমাত্র সংগঠন যে

---

[১১৩]. বেগম, ১২ই অক্টোবর, ১৯৬৩।
[১১৪]. সাপ্তাহিক বেগম, প্রাগুক্ত।
[১১৫]. Khawaz Mumtaz and Farida Shaheed (Eds.) **Women of Pakistan**, Ibid, p: 84.
[১১৬]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
[১১৭]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন সারা দেশের মহিলাদের সংগঠিত করে এবং সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আহবান জানায়। মহিলারা শহরে শহরে সমাবেশ করে লাঠি হাতে কুচকাওয়াজ করে, স্বামী সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রেরণা দেন।[১১৮]

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার ওপর পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস হানাদার পাক সেনাদের দ্বারা প্রায় ১৪ লাখ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী, পুত্র, কন্যা বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। এর ভেতর ধর্ষিতা হয়েছেন প্রায় সাড়ে চার লাখ নারী। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ৭ কোটি বাঙালি নর নারীর জীবন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রক্তস্নাত নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়[১১৯] এবং পৃথিবীর মানচিত্রে নুতন একটি দেশ 'বাংলাদেশ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

অন্যান্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন (১৯০০-১৯৭১)

বিশ শতকের ৪৭টি বছর (১৯০০-১৯৪৭) অবিভক্ত ভারতবর্ষে নারী আন্দোলনে নারী সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আত্মরক্ষা সমিতি, কংগ্রেসের নারী সংগঠন এবং বিভিন্ন নারী সমিতির নারীরা একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, অন্যদিকে নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নারী সমাজকে সংগঠিত করেছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নারী সমাজের নিজস্ব দাবিগুলো দৃশ্যমান হয়। যার ফলে উনিশ শতকের নারী আন্দোলনের সূত্র ধরে বিশ শতকের নারী আন্দোলনের ধারা অগ্রসর হয়।

বিশ শতকে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর অবদান নারী মুক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিরাচরিত মূল্যবোধকে ভঙ্গ করতে পারেনি। কিন্তু নারীর চেতনা ও মূল্যবোধে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে নারীরা পুরুষের জগত বা রাজনীতি ও ক্ষমতার জগতে যোগ দিয়েছিলেন। বাস্তব ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা, সাংসারিক সামাজিক দায়িত্ব পালন, দেশপ্রেম সব এক হয়ে বিশ শতকের নারী আন্দোলন অন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। উনিশ শতকের অবরোধের শৃঙ্খল কিছুটা শিথিল হওয়ায় বিশ শতকের নারী আন্দোলনে শিক্ষিত নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা লাভের ফলে জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন ধারণা নিয়ে তাঁরা সমাজকে সংগঠিত করতে থাকে। স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির সাথে নারীর সম্পর্ক, পরিবার, সংসার ও সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারা জন্মলাভ করে।

নারী আন্দোলন মূলত অবরোধ ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে হওয়ায় নারী স্বাধীনতার সমর্থনকারী প্রগতিশীল পুরুষও এর বিরোধীতা করে। বিশ শতকে নারী সমাজ সচেতন হয়ে যখন পুরুষ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে তখন নারী মুক্তি আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়। ১৯০০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রোগ্রামের ছাত্রী লিলিয়ান সংসার জীবনে অসুখী ছিলেন। তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করেন এবং পরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এই ঘটনায় নারীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক পুরুষ একজোট হয়ে বাধা দান করে। সেই বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন নারী আন্দোলনের বহু নেত্রী।[১২০]

স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি নারী সমাজ ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসে। ১৯১০ সালে সরলা দেবী এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় বাঙালি নারী সমাজের অবস্থা ও আন্দোলন সম্পর্কে জেনে খুব

---

[১১৮]. ১৯৬৯ সালের দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, সাপ্তাহিক বেগম; মালেকা বেগম, **বাংলাদেশের নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২; মালেকা বেগম, **নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক**, (ঢাকা: অন্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০২), পৃ:৫৮।

[১১৯]. রাজধানী ঢাকার শহীদ মিনারে কবি বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসমাবেশ হয়েছিল। সে সভায় সকলে মিলে শপথ নিয়েছিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন। (সুফিয়া কামাল, **একাত্তরের ডায়েরী**, ঢাকা: জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯)।

[১২০]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসা করেন। ঐ আন্দোলনের ধারাতেই ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম। একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় মহিলা সমাজ। 'অল ইন্ডিয়া উমেন্স কনফারেন্স' বা নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে।

শিক্ষা সংস্কার সম্মেলন দিয়েই 'নিখিলভারত মহিলা সম্মেলন' ১৯২৯ সাল থেকে নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ে কাজ শুরু করেন। ১৯৩০ সালে শুরু হয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার আন্দোলন। এই সময় জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনও তীব্ররূপ নেয়। ফলে নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দ্বিধাবিভাক্তি হয়ে পড়ে। একদল ছিলেন নারী সংগঠনকে রাজনীতির বাইরে রাখার পক্ষপাতী। অন্যদল বলেন দেশের আন্দোলনে যুক্ত না হলে নারীর আন্দোলন সফল হবে না। বাঙালি নারীরা কলকাতায় এই সংগঠনের শাখা পরিচালনা করেন। অর্পণা সেন সম্পাদিকা হন। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত নারীরা সংগঠিত হন। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা, ত্রান দেওয়া, রোগের চিকিৎসা, পতিতাবৃত্তি থেকে মেয়েদের রক্ষা করা, পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নারী সেবা সংঘ। বাঁকুড়া ও চট্রগ্রামে নিখিল ভারত মহিলা সংঘ কয়েকটি স্কুল ও দুধ বিতরণ কেন্দ্র পরিচালনা করতো। চট্রগ্রামের নেত্রী ছিলেন কল্পনা দত্ত। ১৯৪৬ সালের ২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শহরে মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন, মেয়েদের কাপড়ের অভাব দুর করা, শিশুদের দুধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবিতে নারী সমাজের ঐক্য কমিটি গঠিত হয়। ঐক্য কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে অন্যতম ছিলো, যুক্তভাবে ত্রাণ বিতরণ করা, নোয়াখালী ও বিহারে প্রতিনিধিদল পাঠানো ইত্যাদি। এছাড়াও কর্মরত মহিলাদের চাকরির নিরাপত্তা, বেতন, পুরুষের সমান কাজে সমান বেতন, শিশুপালন কেন্দ্রের ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথার বিলোপ ইত্যাদি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় কমিউনিষ্ট নারীরা এই সংগঠনের কাজে যুক্ত থেকে নারী আন্দোলনে সাধারণ নারী সমাজের দাবীগুলো যুক্ত করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখেন।[১২১]

অবিভক্ত বাংলার ১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম নারীসমাজ শিক্ষা দীক্ষায়, আন্দোলনে তেমন তৎপর ছিলো না। তাই তাদের পশ্চাৎপদতা দুরা করা, অবরোধ থেকে বের করে নিয়ে আসা প্রভৃতি কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মুসলিম লীগ সরকার নিজের দলীয় সংগঠন ও রাজনীতির স্বার্থে এবং ইসলামী অনুশাসনের নামে বিষেশত নারী সমাজের ওপর নানা বিধি নিষেধের আইন চাপিয়ে দেয়। তবে নারীরা এসব সত্ত্বে সমাজকল্যাণমুলক কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমে তারা সমস্যা সমাধানের জন্য পূনর্বাসনসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমুলক কাজে উদ্যোগী হয়।[১২২]

সরকারি মহিলা সমিতির বাইরেও পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন মহিলা স্বেচ্চাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে। 'দেশ ছেড়ে যাব না' আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন লীলা রায়। তারই উদ্যোগে সুফিয়া কামাল, মিসেস মোতাহার হোসেন, মিসেস মানিক ঘোষ, রহিমুন্নেসা (মিসেস রাজ্জাক), মিসেস রশিদ (ডাঃ ফরিদার মা), মিসেস বেগম প্রমুখ একত্রিত হয়ে পায়ে হেটে হেটে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জেলায় অবস্থানরত প্রগতিশীল মহিলা নেত্রী ও কর্মীরা ময়মনসিংহ শহরে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠনের জন্য সম্মেলনের আয়োজন করে। যুইফুল রায়, নিবেদিতা নাগ, পূর্ণিমা বকশি, রীনা চক্রবর্তী মজিরা খাতুন, মনোরমা বসু, হেনাদাস, জ্যোৎস্না নিয়োগী, ভানু দেবী, অপূর্ণা প্রমুখ ছিলেন এই সমিতির উদ্যোক্তা। সাধারণত প্রগতিশীল নারীদের কাছে এই সংগঠন শুভ আবেদন সৃষ্টি করে এবং দ্রুত এই সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি পায়। সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী এবং যুইফুল রায় ও নিবেদিতা নাগকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে পুর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮ সালে। এই সংগঠন প্রথম থেকেই সরকারি বাধার সম্মুখীন হয়। সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন ঢাকার মহিলা নেত্রীরা। সিলেটে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে দাড়ানোর ফলে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন নারী নেত্রীরা। বরিশালে চাল

---

[১২১]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯-১৪১।
[১২২]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ও নিত্যাপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশি নিপীড়নের শিকার হন তারা।[১২৩]

বিভাগোত্তরকালে এদেশ থেকে হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে ভারতে চলে যাওয়ার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সংকট দেখা দেয়। স্কুল কলেজগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায় সরকার সেগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিলেট মহিলা কলেজ বন্ধ না করার জন্য জোবেদা খাতুন চৌধুরী তৎকালীন গভর্ণরকে অনুরোধ করলে তিনি পর্যাপ্ত ছাত্রী সংগ্রহ করে কলেজ চালু রাখার জন্য একবছর সময় দেন। পরে সিরাজুন্নেসা চৌধুরী আরও কয়েকজন সহকর্মীসহ বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করে। ছাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায় ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিলে ১৯৪৮ সালে ৫০০ ছাত্রী ধর্মঘট ও বিভোক্ষ প্রদর্শন করে। ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষিকারাও ছিলেন। নারী শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে পুর্ব পাকিস্তানে নারী আন্দোলন হয়েছিল। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চোখে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ ছিল সরকার-বিরোধী তৎপরতার সামিল। এ কারণে নিরক্ষর গরিব মেয়েদের লেখাপড়ার উদ্যোগকে গ্রামের জোতদার মহাজনরা ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে প্রচারনা শুরু করে। এসব প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। মহিলা সমিতির কর্মীরা, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মহিলা কর্মীরা ও নেত্রীরা নারীশিক্ষার পক্ষে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন।[১২৪]

সমাজ উন্নয়ন ও নারীর অধিকার আদায়ে মহিলা সংগঠনের কাজ শুরু হলেও মেয়েদের শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার কোন সংগঠন ছিলো না। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'বেগম ক্লাব' পূর্ব পাকিস্তান মহিলাদের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। দেশের মহিলা সমাজসেবী, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান, এবং নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হত। সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, হোসনে আরা মোদাব্বের, খোদেজা খাতুন, সারা তৈফুর, জোবেদা খাতুন, লুলু বিলকিস বানু, শাহজাদী বেগম, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, খালেদা ফ্যাঙ্গি খানম, সেলিনা বাহার চৌধুরী প্রমুখ 'বেগম ক্লাবে সমবেত হতেন। এই ক্লাবের প্রয়াসকে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের নারীজাগরণে ও ঐক্যবদ্ধ প্রগতি আন্দোলনের একটি সুত্রপাত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।[১২৫]

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মুলনীতি ঘোষিত হলে দেখা যায়, তাতে মেয়েদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে মহিলারা আন্দোলন গড়ে তোলেন। মুলনীতিতে মহিলাদের ঘরের বাইরে কাজের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ছিল। ওলেমা বোর্ড মেয়েদের অধিকার বিষয়ে বিরূপ বক্তব্য রাখায় মেয়েরা প্রতিবাদ জানায়। গ্রামবাংলার মেয়েদের প্রতি সমাজের মনোভাব ছিল আরও কঠোর। সর্বপ্রকার আনন্দ-অনুষ্ঠান, গান, অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মপ্রাণ মহিলারা ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে চেয়েও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ ধরনের মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই নারী সমাজ প্রতিবাদ জানাতে থাকে।[১২৬]

মেডিকেল কলেজে নার্স অসন্তোষ বাড়তে থাকলে নারী সমাজ তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। মিটফোর্ড হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ওয়ার্ডকে ডাক্তারদের বাসস্থান করা হলে ১৯৫১ সালে নারী সমাজ প্রতিবাদমখুর হয়ে উঠে। আন্দোলনের ফলে ঐ ওয়ার্ড পুনরায় চালু করা হয়। নার্সদের রাতের ডিউটি একমাসের বদলে ১৫ দিন, অসুস্থ নার্সদের হাসপাতাল থেকে ওষুধ সরবরাহ, আলাদা ভিজিটিং রুমের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি মেনে নেওয়া হয়। নারী নেত্রীরা চা বাগানের নারী শ্রমিকদের ওপর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেন। রাজধানীতে মেয়েদের স্কুলের গাড়ির ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে ছাত্রীদের অভিভাবকরা আন্দোলন করে। বঙ্গীয় মুসলিম বিবাহ আইন ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিলের

---

[১২৩]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭।
[১২৪]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।
[১২৫]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩।
[১২৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনী নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদে আলোচনা চলার সময় মহিলারা সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ জানালে বিলটি স্থগিত হয়ে যায়। ওই বিলের মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে এবং পুরুষের পক্ষে সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা চলছিল।[১২৭]

মুক্তিযুদ্ধের আগে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলনকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে সরকারিভাবে দমন করা হতো। তাছাড়া স্বামী, বাবা বা অভিভাবকদের চাকরির ওপর চাপ সৃষ্টি করে নারী নেত্রী ও কর্মীদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখার দমননীতি চালু ছিল। গৃহবধূ, সমাজকর্মী নারীরা ঘর সংসারের কাজের পাশাপাশি বেগম ক্লাবে সমবেত হতেন। সওগাত সম্পাদক প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন বেগম পত্রিকার মাধ্যমে, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উত্তরসূরী নারী আন্দোলনের হাজার হাজার কর্মীকে লেখনীর মাধ্যমে, ক্লাবের আলোচনায় আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই নেত্রীরাই বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, যৌতুক ও সম্পত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেছেন। এছাড়াও ১৯৫০ সালের দশকে ভাষা আন্দোলনে, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে যুক্ত থেকে নতুন মাত্রার নারী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন।[১২৮]

পরিশেষে বলা যায়, সম্প্রতি নারী আন্দোলনের ধারার সাথে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী চার দশকের, বেইজিং-পূর্ব ও পরবর্তী নারী আন্দোলনের কর্মসূচির যোগসূত্র রয়েছে। নারী উন্নয়ন, উন্নয়নে নারী ও জেন্ডার উন্নয়ন পরীক্ষামূলকভাবে পৃথিবীব্যাপী নারী আন্দোলনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। নারীবাদ, জেন্ডার বা নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমতা বিষয়ক তত্ত্বের আন্তর্জাতিক ক্রমবিবর্তিত তর্কবিতর্ক থেকে অনেক দূরে রয়েছে বাঙালি নারীর সমঅধিকার বিষয়ক আন্দোলন।

নারী প্রগতি আন্দোলনে সম্পৃক্ত কতিপয় নারী

মনোরমা বসু

মনোরমা বসু[১২৯] ছিলেন বরিশালের বাঁকাইর জমিদার বাড়ীর বউ। আশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যখন ঘরের বধুরা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন তখন মনোরমা বসুও তাদের সাথে ছিলেন। হাতে হলুদ সূতোর রাখী বেধে স্বাধীনতা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেন। তারপর থেকে কখনও রাজনীতি থেকে সরে যাননি। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের মহিলা কর্মীদের সঙ্গে তিনি কাজ শুরু করেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য কারাবরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[১৩০]

উর্মিলা দেবী

উর্মিলা দেবী[১৩১] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ছোট বোন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বন্দি হন। ১৯২১ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নারী কর্মমন্দির' দেশাত্মবোধ ও অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯২৬ সালে সরোজিনী নাইডু যখন কংগ্রেসের সভানেত্রী তখন উর্মিলা দেবী তাঁর সঙ্গে বহু স্থানে রাজনৈতিক সভা করেন। ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গঠিত 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র তিনি সভানেত্রী ছিলেন। সে সময় আইন অমান্য করে তিনি কারারুদ্ধ হন।[১৩২]

---

[১২৭]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২-১৪৪।

[১২৮]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

[১২৯]. মনোরমা বসু ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[১৩০]. মালেকা বেগম , সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

[১৩১]. উর্মিলা দেবী ১৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[১৩২]. কমলা দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, (কলকাতা, ১৯৬০), পৃঃ ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ওই সময়কার আন্দোলনে নেতারা গ্রেপ্তার হলে বেআইনী সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনার ভার পড়ত 'নারী-কর্মমন্দির' ও তার নেত্রী উর্মিলা দেবীর উপর।

নেলী গ্রে

চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে বিয়ের পর ইংরেজ মহিলা নেলী গ্রে[১৩৩] (পরে সেনগুপ্তা) স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আসেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামে খদ্দর বিক্রি করে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হন। ঐ বছরই চট্টগ্রামের গান্ধী ময়দানের সভায় খদ্দর পরিহিতা নেলী সেনগুপ্তা আন্দোলনের অর্থ তহবিলে দুটি সোনার চুড়ি দান করেন। আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে সময় তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে নেলী সেনগুপ্তা দিল্লি, অমৃতসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। উক্ত দুই স্থানে বক্তৃতার পর যতীন্দ্রমোহন গ্রেপ্তার হন। এরপর দিল্লির একট নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতাকালে নেলী সেনগুপ্তা গ্রেপ্তার হন এবং ৪ মাসের কারাদন্ড ভোগ করেন। ১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে নির্বাচিত সভানেত্রী নেলী সেনগুপ্তা বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেসের সেই অধিবেশনের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালে তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৯৪০ ও ১৯৪৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আইন সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের সময় বৃদ্ধ বয়সেও সক্রিয়ভাবে চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় রোগশয্যায় থেকেও উদ্বিগ্ন চিত্তে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রচার কাজ করেছেন।[১৩৪]

মোহিনী দেবী

মোহিনী দেবী[১৩৫] ছিলেন মানিকগঞ্জের বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশংকর সেনের মেয়ে। তিনি তাঁর শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের প্রেরণায় নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ইত্যাদি সামাজিক কাজে যোগ দেন। ষাট বছর বয়সে তিনি স্বাধীনতা ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯২১-২২ সালে ও ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করে দাঙ্গা-অধ্যুষিত মুসলিম প্রধান অঞ্চল অ্যান্টনি বাগানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কাজ করেন।[১৩৬]

আশালতা সেন

বিক্রমপুরের আশালতা সেন[১৩৭] সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন নারী সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার কাজে। অকাল বৈধব্যের সংকট সত্ত্বেও ২২ বছর বয়স থেকে আশালতা সেন দেশসেবামূলক কাজ থেকে বিরত হননি। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ আশালতা সেন ১৯২১ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। শিল্পাশ্রমের মহিলারা তিনখানা তাঁতে খদ্দরের কাপড় তৈরি করতেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে সংগঠিত মহিলাদের নিয়ে ১৯২৪ সালে তিনি গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। তাঁর সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন সরলা গুপ্ত ও সরযুবালা গুপ্ত। সমিতির সদস্যরা ঘরে ঘরে গিয়ে খদ্দরের কাপড় বিক্রি করতেন। সমিতির বার্ষিক শিল্পমেলায়

---

[১৩৩]. নেলী গ্রে ১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
[১৩৪]. কমলা দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫১।
[১৩৫]. মোহিনী দেবী ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
[১৩৬]. কমলা দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।
[১৩৭]. আশালতা সেন ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীমন্ডপ বানিয়ে তার মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার চালানো হত। তিনি কাটুনী সংঘের সদস্য হয়ে খদ্দর প্রচারের কাজ করেন। ১৯২৯ সালে ঢাকায় 'কল্যাণ কুটির আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করে তিনি বহু মহিলা কর্মী তৈরি করেন। একই সঙ্গে তিনি গেন্ডারিয়ার কাছাকাছি জুড়াইনে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩৮]

১৯৩২ সালে আশালতা সেনের প্রেরণায় যাঁরা আন্দোলনে যুক্ত হন তাঁরা সকলেই কারাদন্ড বরণ করেন। আশালতা সেনের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারের জন্য ঢাকায় সভা হয়। সেজন্য ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং কল্যাণ কুটির আশ্রম-এর হোস্টেল ঘরও পুলিশ তালাবদ্ধ করে রাখে। আশালতা সেন তখন বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে সভা করে মহিলাদের সচেতন করতে থাকেন। গ্রামের দফাদাররা পরোক্ষভাবে সভার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তারা এমন সময় থানায় গিয়ে সভার খবর দিত, যখন পুলিশ এসে নারী কর্মীদের খোঁজ আর পেত না। পুলিশ অনেক সময় মহিলাদের বন্দি করে অনেক দূরের গ্রামে নিয়ে ছেড়ে দিত কিংবা মহিলাদের পেছনে এমনভাবে ধাওয়া করত যাতে কোথাও তাঁরা আশ্রয় না পায়। অকথ্য অত্যাচার ও মালপত্র-ভিটাবাড়ি প্রভৃতি দখলের ভয় সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা বিনা দ্বিধায় মহিলাদের সাহায্য করত। ১৯৩২ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ৭ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ৬১টি গ্রামে ও শহরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি লাভের পর তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে যুক্ত হন। কয়েক বছর তিনি ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠনে সহায়তা করেন। এ সময়ে তিনি কংগ্রেসের কাজে বর্ধমান, হাওড়া, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, খুলনা ইত্যাদি জেলা সফর করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ সালে তিনি মুক্তি পেয়ে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের সাহায্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬০-এর দশকে সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। ঢাকার গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতির নেতৃত্ব দিয়েছেন ষাটের দশক পর্যন্ত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন।[১৩৯]

সরলা দেবী চৌধুরানী

পরাধীনতা ও শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য যে কয়জন নারী আন্দোলন করেছেন তাদের মধ্যে সরলা দেবী চৌধুরানী[১৪০] অন্যতম। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে নারী প্রগতি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। বাংলার জনগণ তাকে 'বাংলার জোয়ান অব আর্ক' 'দেবী চৌধুরানী' বলে সম্মান করত।[১৪১] স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই সরলা দেবী স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার সহযোগীতায় বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে এলাহাবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময় সরলা দেবীর আহ্বানে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাজিরার মহারানীর সভানেত্রীত্বে। এই সম্মেলনেই ভারতের পর্দানসীন নারীদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সরলা দেবী মায়ের আদর্শ অনুসরণ করে নারী উন্নতির জন্য মহিলা সংগঠন পরিচালনা করেন।[১৪২]

জোবেদা খাতুন চৌধুরী

---

[১৩৮]. কমলা দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯-৬০।
[১৩৯]. কমলা দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০-৬১।
[১৪০]. সরলা দেবী চৌধুরানী ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
[১৪১]. সরলা দেবী চৌধুরানী, **জীবনের ঝরা পাতা**, (কলিকাতাঃ রূপা প্রকাশনী, ১৯৭৫), পৃঃ ১২৫-১৪৩।
[১৪২]. সরলা দেবী চৌধুরানী, **জীবনের ঝরা পাতা**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

জোবেদা খাতুন চৌধুরী[১৪৩] ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। স্বামীর সহযোগীতায় তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, ব্রিটিশ লবণ আইন ভঙ্গ করার আন্দোলনের সময় কংগ্রেসি মহিলাদের নিয়ে সিলেট 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। জোবেদা খাতুন অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠনের সভানেত্রী মনোনীত হন। তিনিই তৎকালীন আমলে একমাত্র মুসলিম মহিলা যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজপথে এসে দাড়িয়েছিলেন পুরুষের পাশাপাশি। জোবেদা খাতুন সারা বৃহত্তর জেলায় মহিলা সংঘের ২৮টি শাখা স্থাপন করেন। এই আইন অমান্য আন্দোলন প্রতিহত করতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সভা হয়। সে সভাতেও তিনি অন্যান্য সহকর্মী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসে সর্বপ্রথম মহিলারা স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করে। এ সময় ১৪৪ ধারা জারি অবস্থায় পুলিশ বেস্টিত হয়ে জোবেদা খাতুন স্বাধীনতার শপথবাক্য উচ্চারণ করে সহকর্মীদের উদ্দীপ্ত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অখন্ড বাংলাসহ সুরমা উপত্যকায় নতুন একটি নারী সংগঠনের জন্ম হয় যার নাম ছিল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। সর্বসম্মতিক্রমে জোবেদা খাতুন এই সমিমির সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সিলেটে জমিদারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় সে আন্দোলনেও জোবেদা খাতুন অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর জোবেদা খাতুন কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং মহিলা গুসলিম লীগ গঠন করে তার নেতৃত্ব দেন।[১৪৪]

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বাংলার নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের সাথে যার নাম সবার আগে স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন[১৪৫]। যিনি তার জীবনের সকল অর্থবিত্ত, মেধা, মনন, শ্রম ব্যয় করেছিলেন নারী শিক্ষার জন্য। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি সামান্য সম্পদ এবং প্রবল মানসিক শক্তি নিয়ে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন।[১৪৬] স্বামীর মৃত্যুর পর সৎ কন্যার পীড়নে রোকেয়া তার অসংখ্য

---

[১৪৩]. জোবেদা খাতুন চৌধুরী জন্মেছিলেন ১৯০১ সালে ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তার পিতা ছিলেন খান বাহাদুর শরাফাত আলী চৌধুরী। ১৯১৯ সালে সিলেটের কৃতি সন্তান খান বাহাদুর আবদুর রহিম চৌধুরীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগীতায় তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২০-১২২)।

[১৪৪]. বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করাই ছিল এ সমিতির লক্ষ্য কিন্তু পরবর্তীতে নারীর প্রতি সামাজিক এবং পারিবারিক বৈষম্য দুরীকরণসহ নিরক্ষরতা দুরীকরণে গঠনমুলক কাজের মাধ্যমে নারী জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার শিক্ষা দেয়া হত। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রিলিফ সংগ্রহ ও বিতরণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা ছাড়াও নিত্যপয়োজনীয় জিনিস এবং ন্যায্য মূল্যে কাপড় সরবরাহের জন্য মহিলাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০)।

[১৪৫]. বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসের সাথে নবাব ফয়জুন্নেসার মত যে মহিয়ষী নারীর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও বিশ শতকের বাংলার নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিজের হৃদয়রক্তে রঞ্জিত করেছেন যুগের জীবন কাহিনি। (শামিমা ইসলাম, **বেগম রোকেয়া, অর্জনের ইতিহাস**, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ৯ই ডিসেম্বর-১৯৯১, পৃ: ১৭)। রোকেয়া সে সময় এমন একটি প্রত্যয় দৃষ্টি এবং প্রাণশক্তি প্রকাশ করেছিলেন যা আজও নারীদের অভিভুত করে। তিনি ছিলেন একজন লেখক, তাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবী। তিনি বিনা দ্বিধায় বাংলায় নবজাগরণের স্থপতি রামমোহন অথবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারীর স্থান পেতে পারেন, যদিও তাকে শুধু মুসলমান নারী শিক্ষার পথ প্রদর্শক মহিয়সী নারী হিসেবে বর্ণনা করে তার ভুমিকাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নারী মুক্তিকামীদের মতো রোকেয়াও শিক্ষার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েছিলেন শৃংখল মোচনের পূর্বশর্ত হিসেবে। (আবদুল মান্নার সৈয়দ, **বেগম রোকেয়া**, ১৯৮৩ খ্রী: প্রবিশক; সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬)।

[১৪৬]. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে তথ্যগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন ১৯০৯ সালে ৩রা মে বেগম রোকয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন ইন্তেকাল করেন। বেগম রোকেয়া মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভাগলপুরে কিছুকাল এই স্কুল চলার পর জনাব সাখাওয়াতের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি বিজড়িত ভাগলপুর ছেড়ে চিরকালের মত কলকাতায় চলে আসেন। মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ কলকাতায় ওয়ালিউল্লাহ লেনে একটি ছোট কক্ষে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলে উর্দুতে শিক্ষা প্রদান করা হত। বিদ্যালয় স্থাপনের ১৪ বছর পরও তিনি বাংলা শিক্ষা শূর করতে পারেননি। ওয়ারী উল্লাহ লেনের ছোট বিদ্যালয়টি সামাজিক নিন্দা এবং সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও যথেষ্ট অগ্রসর হয়। ১৯১৩ সালে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৩৯ জন। ১৯৩১ সালে স্কুলটি হাইস্কুলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একটি করে শ্রেণী যুক্ত হচ্ছিল।[১৪৭]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে তফসিরসহ কুর'আন পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি, বাংলা উর্দু, ফার্সি, হোম নার্সিং, ফাস্ট এইড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে এসব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, কিন্তু ১১৪ টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল বাঙালি।[১৪৮] শিক্ষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে তিনি যেমন নানারকম বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তেমনি সমর্থনকারীও পেয়েছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মহিলা এবং পুরুষরা তাকে সদা উৎসাহিত করে গেছেন এবং কখনো কখনো তারা সরাসরি বেগম রোকেয়াকে বস্তুগত ও নৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন। এছাড়া উদারপন্থী দৈনিকগুলো এবং সাময়িক পত্রিকাগুলো তার স্বপক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে।[১৪৯] রোকেয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষক সমাজকর্মী এবং সংসদ সদস্য শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)।[১৫০]

বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বেগম রোকেয়ার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করেন। অবশেষে ১৯১০ সালের শেষদিকে বেগম রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। সেই সাথে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটিও কোলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এরপর আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালে ১৬ই মার্চ শুরু হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের কাজ। (শ্যামীমা ইসলাম, **বেগম রোকেয়া অর্জনের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪); একই মত প্রকাশ করেন লেখক গোলাম মুরশিদ **রামসুন্দরী থেকে রোকেয়া**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ২০০০, পৃঃ ১২৯)। বেগম রোকেয়া নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করার মহান ব্রতকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়ার গার্লস স্কুল। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪)। তিনি সামান্য সম্পদ ও শক্তি নিয়ে কোলকাতায় ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭); রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়টি অবিভক্ত বাংলার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২)।

[১৪৭]. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকই ছিলেন স্থানীয় খ্রীষ্টান, অ্যাংলো, হিন্দু অথবা বাঙালি মুসলমান। বাঙালি শিক্ষক ছিলেন আনোয়ারা বাহার ও ফাতেমা খানম। (আনোয়ারা বাহার চৌধুরী উদ্ধৃত মোহাম্মদ শামসুল আলম ১৯৮৯ খ্রীঃ পৃঃ ১২৪; সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭)।

[১৪৮]. বেগম রোকেয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরে অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন তার স্কুলে মেয়েদের পাঠাবার জন্য। সেই সাথে মেয়েদের নিরাপত্তা এবং পর্দার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তথাপি তিনি রক্ষণশীলদের নানারকম নিন্দা ও তিরস্কার সহ্য করেছেন। আবার সমাজে অনেকের সমর্থনও পেয়েছিলেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮)।

[১৪৯]. তবে কোন কোন ব্যক্তি বা মহল বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিগত চিন্তাবোধ ও বিশ্বাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে এবং তার রচনাগুলোকে বিকৃত করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। অথচ বেগম রোকেয়া চিন্তা ও বিশ্বাসে আদর্শ মুসলিম নারী ছিলেন তা তার রচনার থেকে প্রমাণিত হয়। এক বক্তব্যে তিনি বলেন, মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কুর'আন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কুর'আন শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখির মত আরবি শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। (**বেগম রোকেয়া বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি**, পৃঃ ২৮২; সম্পদনাঃ তাহসিনা তাকিয়া, **রোকেয়ার সন্ধানে**, ঢাকাঃ দি উইটনেস, পৃঃ ২৮)।

[১৫০]. শামসুন নাহার মাহমুদ নারী শিক্ষা এবং নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনসহ মৌলিক কিছু কাজের জন্য এদেশের নারী সমাজের কাছে খুবই পরিচিত ও প্রিয়জন। তিনি ১৯২৮ সালে সমাজ ও পরিবারের বাঁধা অতিক্রম করে আই. এ পাস করেন। ১৯৩২ সালে বি. এ. পাস করেন। ১৯৩৯ সালে লেডী ব্রেবোর্ন কলেজে বাংলা বিষয়ের প্রধান অধ্যাপিকা পদে যোগ দেন। তিনি একটি সুশিক্ষিত পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার বাবা মুন্সি তমিজউদ্দিন তদানীন্তন পুর্ব বাংলার প্রথম স্নাতক ছিলেন, নানা মাওলানা আবদুল আজিজ ছিলেন মুসলমান সুহৃদ সম্মেলনীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। (শামসুন্নাহার মাহমুদ, **আমি যখন ছাত্র ছিলাম**, উদ্ধৃত, সাহিদা পারভিন বেগম শামসুন্নাহার, ১৯৮৬ খ্রীঃ পৃঃ ২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মহৎ শিক্ষাবিদ। তার সবচেয়ে বড় অবদান হলো মুসলিম মহিলাদেরকে সুসংস্কারের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা এবং জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা।[১৫১]

শামসুন্নাহার মাহমুদ

শামসুন্নাহার মাহমুদ[১৫২] মুসলিম অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পর্দাপ্রথার কারণে তার লেখাপড়ার পথ খুব সহজ ছিল না। সমাজের প্রতিরোধে তার স্কুলে পড়া বন্ধ হলেও বাড়ীতে বসেই তিনি ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিনি এম.এ পাস করেন। কলকাতার নিখিল ভারত নারী সম্মেলন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি নারী প্রগতির জন্য কাজ করেছেন। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ও সমাজকল্যাণ করাই ছিল তার প্রধান কাজ।[১৫৩]

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন সংস্কার আইন পাস করেন। তখন পর্যন্ত ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। এই সময় শামসুন্নাহার নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলকাতা শাখার তরফ থেকে এ দেশের মেয়েদের ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলন চালাতে থাকেন। যার ফলে ভারতীয় নারীরা ভোট দেয়ার অধিকার পেল এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েকটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হলো। তিনি ১৯৩৬ সালে কলকাতায় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বাংলার মুসলমান নারী সমাজের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সে সময়ও তিনি দুঃস্থ দরিদ্র জনগণের পাশে ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ 'এমবিই' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পাকিস্তান শাসনামলে সমাজকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি তিনি মুসলিম লীগ সরকারের রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও অংশ নেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সরকার বিয়ে ও পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য যে কমিশন গঠন করেন শামসুন্নাহার তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৫৪]

লীলা নাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী (১৯২২) লীলা নাগ[১৫৫]এর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ, নারী শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন ও বিপ্লবী কর্মকান্ডের স্থান ছিল ঢাকা। তাঁর ভূমিকার ফলে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ও রাজনীতিতে ব্যাপক সংখ্যক নারী অংশ নেন। ১৯২৬ সালে তাঁর উদ্যোগে ঢাকায় 'দীপালি সংঘ' গড়ে ওঠে। একই বছর ঢাকা ও কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিপ্লবী পুলিন দাসের তত্ত্বাবধানে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। মেয়েরা আত্মরক্ষার জন্য লাঠি ও ছোরা চালানোর ট্রেনিং নিতে থাকে। নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটির সহ-সম্পাদিকা হিসেবে লীলা নাগ নারী সমাজকে সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কাজে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের নেত্রী লীলানাগ 'দেশ ছাড়বো না' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময়। ঢাকার

---

[১৫১]. সম্পাদনা তাহসিনা তাকিয়া, **রোকেয়ার সন্ধানে**, প্রাগুক্ত; এ. এ. রহমান, **বেগম রোকেয়া ও ইসলাম**, (ঢাকা: দি উইটনেস), পৃ: ১৪৫।

[১৫২]. লীলা নাগ ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[১৫৩]. বেগম রোকেয়া ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা 'মুসলিম মহিলা সমিতি' গঠন করে নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ট ভুমিকা পালন করেন। ক্রমে বাঙালি মুসলিম মহিলা সমাজে একটি চেতনাবোধ সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে শামসুন নাহার এই সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রকার সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে সুনাম অর্জন করেছেন। এছাড়াও শামনুস নাহার মাহমুদ ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে বক্তৃতা দিয়ে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে সুনাম অর্জন করেছিলেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬)।

[১৫৪]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭-৭৮।

[১৫৫]. লীলা নাগ ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হাটখোলায় 'নারী শিক্ষা মন্দির' (বর্তমান শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়) সহ ৪টি স্কুল (১৯২৩ সালে) ও জয়শ্রী পত্রিকার (১৯৩১ সালে) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিবেদিত ছিলেন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীকালে ভারতে চলে যান এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুসারী হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লকে আজীবন নেতৃত্ব দিয়েছেন।[১৫৬]

হোসনে আরা

হোসনে আরা[১৫৭] ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। স্বামীর সাহচর্যে তিনি ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য সারা ভারতে জারি হয়েছিল ১৪৪ ধারা। ১৯৩২ সালের ২৩ জানুয়ারি পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই মিছিল করে এসে মিলিত হবে কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্টের পাদদেশে। নির্ধারিত দিনে শুরু হয় নারী পুরুষের মিছিল। হোসনে আরা স্বদেশী পতাকা নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ সৈন্যরা দলে দলে মিছিলের ওপর হামলা করে। সৈন্যদের হামলা উপেক্ষা করে হোসনে আরা পৌঁছে যান মনুমেন্টের কাছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথম মুসলিম মেয়ে হোসনে আরা মাত্র ১৬ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কারাভোগ করেন।

দৌলতুন্নেসা খাতুন

দৌলতুন্নেসা খাতুন[১৫৮] ১৯২২ খ্রীঃ বগুড়ার সোনাতলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন থেকে দৌলতুন্নেসার সংগ্রামী জীবন শুরু। মাত্র ১৪ বছর বয়সে দৌলতুন্নেসা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশ সেবার জন্য তাকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। দৌলতুন্নেসা খাতুন গুপ্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমনকি তিনি গোপনে পিস্তল চালনার প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। তিনি গাইবান্ধা মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসনবিরোধী আন্দোলনের জন্য হুলিয়া নিয়ে তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৯-১৯৮২ সময়পর্বে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে 'যৌতুক নিরোধ বিল' উত্থাপন করেন এবং এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন। তিনি সাহিত্য সাধনায় ও নির্যাতিত, অসহায় নারীদের সহায়তা দানের কাজে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।[১৫৯] এই আপোসহীন নেত্রী ১৯৯৭ সনে ৪ আগষ্ট ইন্তেকাল করেন।[১৬০]

---

[১৫৬]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭-১০৮।

[১৫৭]. হোসনে আরার জন্ম ১৯১৬ সালে। হোসনে আরা, জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাতিজী ছিলেন। ১৯৩০ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর সাহচর্যে তার ভিতর ক্রমশ রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। এবং তিনি ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কারাভোগ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ছিলেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী**, ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১)।

[১৫৮]. দৌলতুন্নেছা খাতুন ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ সালে মারা যান। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে স্বামী ডাঃ হাফিজুর রহমানের সংসারে যান। স্বামী ডাঃ হাফিজুর রহমান একজন উদারচেতা ও প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। তারই অনুপ্রেরণায় উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক এবং সমাজকল্যাণে এম.এ. পাস করেন। দৌলতুননেছা শিক্ষাজীবনেও সংগ্রাম করেছেন। (শাহেদ আলী, **দৌলতুন্নেসা খাতুন, অন্তরঙ্গ আলোকে,** ঢাকাঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৭, খ্রীঃ)।

[১৫৯]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

[১৬০]. গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন্নেসা খাতুন**, দৈনিক বার্তা, রাজশাহীঃ ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ খ্রিঃ; গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন্নেসা খাতুন**, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৯, পৃঃ ১৬; সদরুল হোসেন, **রংপুর প্রতিভা,** ১ম খন্ড, তারত খালী গাইবান্ধা, তা.বি., পৃঃ ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম সুফিয়া কামাল[১৬১]

মুসলিম নারী জাগরণের সূচনালগ্নে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে বেগম সুফিয়া কামাল সর্বকনিষ্ঠ। কঠোর অবরোধ প্রথার কারণে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ তিনি পাননি। ১২ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাঁর শিক্ষা ও কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে স্বামীর সহযোগীতায়। বিভিন্ন সময়ে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনের সংগঠক হিসেবে, নিখিল ভারত মহিলা সংগঠনের সংগঠক হিসিবে মুসলিম নারী প্রগতি আন্দোলনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সে যুগের প্রথম বাঙালী নারী যিনি পরিবারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পাইলটের সাথে একা বিমানে চড়েছিলেন।[১৬২] ব্রিটিশ ভারতে নারী জাগরণের জন্য তার কর্মপ্রচেষ্টা পাকিস্তানি শাসনামলে ও স্বাধীন বাংলাদেশের নারী জাগরণ ও আন্দোলনে বলিষ্ঠভাবে পরিণতি লাভ করেছে।[১৬৩]

নারী প্রগতি আন্দেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য নারী ও সংগঠন

মহাত্মা গান্ধীর আহবানে সিলেটের সরলাবালা দেব, দিনাজপুরের প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ভোলার সরযুবালা সেন, বরিশালের ইন্দুমতী গুহ ঠাকুরতা, নোয়াখালির সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী, বর্ধমানের সুরমা মুখোপাধ্যায়, সিরাজগঞ্জের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, বিক্রমপুরের সরযুবালা সেন, ময়মনসিংহের ঊষা গুহ, বরিশালের প্রফুল্লকুমারী বসু প্রমুখ মহিলা নিজ নিজ অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে ব্যাপকভাবে নারী সমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে বহু কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নারীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠনকে আরও সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলেন।[১৬৪]

সিলেটে 'বিদ্যাশ্রম' ও 'নারীশিল্প ভবন' আগে থেকেই চালু ছিল। সরলাবালা দেব এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিজে যোগ দেন এবং আরও বহু মহিলাকে এসব সমিতিতে যুক্ত করেন। 'বালুরঘাট মহিলা সমিতি'র নেত্রী প্রভা চট্টোপাধ্যায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলেন। ভোলার 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'র সম্পাদিকা ছিলেন সরযুবালা সেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ঐ আন্দোলনে নারী সমাজকে যুক্ত করার জন্যই তিনি নারী সংগঠনেও কাজ করেন, অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য তিনি নারী সমাজের কাছে তুলে ধরেন। সুশীলা মিত্রের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের যুগে নোয়াখালিতে 'সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি' গড়ে ওঠে। তাঁত, সেলাই, ধাত্রীবিদ্যা, লাঠি-ছোরা খেলা, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে বহু মহিলা ঘরের বাইরে আসেন এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সেসময় নোয়াখালির বহু সাধারণ মহিলা অকাতরে তাদের স্বর্ণালঙ্কার স্বদেশী ভান্ডারে দান করেন। অন্য জেলাতেও একইভাবে মহিলা অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। প্রায় সর্বত্রই মহিলা সংগঠকরা চরকা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান এবং মহিলাদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার কাজ চালান। তাঁরা একই সঙ্গে গড়ে তোলেন স্থানীয় মহিলা সমিতি।[১৬৫]

১৯৩৬ সালে ছাত্র সমাজ প্রথম তাদের নিজস্ব সংগঠন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ছাত্র সমাজ প্রবল সরকারি দমননীতি উপেক্ষা করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। ছাত্রী শাখার মাধ্যমে মেয়েরাও এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। রেণু চক্রবর্তী, কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জী), গীতা ব্যানার্জি (মুখার্জী) প্রমুখের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। কংগ্রেসের

---

[১৬১]. ১৯১১ সালের ২০ জুন বেগম সুফিয়া কামাল বরিশালের শায়েস্তাবাদ নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ২০০৩, পৃ: ৪৯-৫০)।

[১৬২]. সুফিয়া কামাল, **একালে আমাদের কাল**, (ঢাকা: জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃঃ ১-১৫।

[১৬৩]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮।

[১৬৪]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩-১০৪।

[১৬৫]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন চল্লিশের দশক পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মহিলা সংগঠন হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, বেগম হামিদা আলি প্রমুখ নেত্রী এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় এই সংগঠন।[১৬৬]

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস মহিলা সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করাই ছিল এই সংঘের প্রধান কাজ। নারীর আইনগত সমঅধিকার, ভোটাধিকার, নারী শিক্ষা বিস্তারও তাদের কাজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল। কংগ্রেস ও বিপ্লবী দল থেকে নারীরা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হতে থাকেন। এদের মধ্যে ছিলেন লতিকা সেন, কমলা চ্যাটার্জি, মনিকুন্তলা সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি ঘোষ প্রমুখ। ১৯৩৯ সালে এই নারীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'রাজবন্দিদের মায়েরা'- নামের সংস্থা। বাঙালি ছাত্রীদের সংগঠন বা ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী শাখার সাফল্যজনক কাজ ও উদ্যোগ দেখে মুসলিম ছাত্রী ফেডারেশন গঠনের জন্য কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী উদ্যোগী হন। বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ-র সহযোগিতায় লেডি আবদুল কাদির, ফাতিমা বেগম ও মিস এম. কোরেশির উদ্যোগে ১৯৪১ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী শাখা গঠিত হয়। বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ[১৬৭] মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি গঠন করেন। তাঁর উদার প্রগতিশীল চিন্তাধারায় পরিচালিত ‘মুসলিম লীগ সমিতি’ মুসলিম মহিলাদের সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২ সালে মুসলিম নারীদের মুষ্ঠিমেয় অংশ রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন এবং ১৯৪৭ সালের মধ্যে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এঁদের মধ্যে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, জোবেদা খাতুন চৌধুরানী, দৌলতুন নেসা, সুফিয়া কামাল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ‘মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লীগ’ গঠন করে বাঙালি মুসলিম নারীরা নারীর মর্যাদা রক্ষা ও সমঅধিকারের আন্দোলন গড়ে তোলেন।[১৬৮]

---

[১৬৬]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।

[১৬৭]. বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ ১৯১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

[১৬৮]. **From Pardah to Parliament,** Cresset Press, London, p: 70-75.

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন (১৯৭২-২০০০)

অগণিত প্রাণ ও নির্যাতনের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র ও সমাজে এখনও নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হতে হচ্ছে। তাই নারী পুরুষ সম্পর্কের সমতা, সম-অধিকার, কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন রোধে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রধর্ম বিল বাতিল করা, ফতোয়া ও নারীর প্রতি সহিংসতায় আইন প্রণয়নে নিষ্ক্রিয়তা, পুলিশি নির্যাতন, সন্ত্রাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নারীর মর্যাদা, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী নারীর ন্যায্য মজুরী ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের নারী ও নারীবাদী সংগঠনগুলো আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।[১৬৯]

বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৭২ সালে নারী পুরুষ সমতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষিত হয়।[১৭০] কিন্তু নারীসমাজ সংরক্ষিত আসন বন্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিল না তাই 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'[১৭১] ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি জানায়।[১৭২]

আশির দশকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে যোগ হয় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন।[১৭৩] এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন দেশের বিপুল সংখ্যক নারী। ১৯৮৩ সালে আন্দোলনের শুরুতেই নারী নেত্রী দিপালী সাহা শহীদ হন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ও শামসুন নাহার হলের ছাত্রীরাই প্রথম কার্ফ্যু ভেঙ্গে মিছিল করেন এবং সেই মিছিলে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন।[১৭৪] ১৯৭২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, বেলা নবী, সাহারা খাতুন প্রমুখ রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কারাবরণ করেন। সামরিক ও

---

[১৬৯]. দীর্ঘ ৩০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসের প্রথম থেকে বিবি সখিনা, দুর্দানা বেগম (নবাব সিরাজউদ্দৌলার দাদী), রানী ভবানী, নবাব প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, আশালতা সেন, মনোরমা বসু, কবি সুফিয়া কামাল, দৌলতুননেসা, জোবেদা খাতুন চৌধুরী প্রমুখের জীবনীলেখ্য ও সংগ্রাম থেকে জানা যায়, বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আন্দোলন থেকেই উৎসারিত হয়েছে বাংলাদেশের নারী প্রগতি আন্দোলন। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫)।

[১৭০]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

[১৭১]. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠা (৪ এপ্রিল ১৯৭০) হয়েছে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকায়। কবি সুফিয়া কামাল আজীবন (১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত) ছিলেন সভানেত্রী। তিনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ছিলেন। এই সংগঠনের প্রথম থেকে ২১ বছর সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন মালেকা বেগম। ১৯৯২ থেকে সাধারণ সম্পাদিকা হয়েছেন আয়েশা খানম। উমরাতুল ফজল, আজিজা ইদ্রিস, আয়শা খানম, ফওজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস, বেলা নবী, রাখীদাস পুরকায়স্থ, খালেদা মাহবুব, সেলিনা খালেক, নার্গিস জাফর, মুনীরা খান, হাস্নাবানু, এডলিন মালাকার, রীনা হেলাল, সীমা মোসলেম, মমতাজ আরা তারা, রিজিয়া বেগম, সুফিয়া করিম, আরজু করিম, হেনা দাস, উষাদাস পুরকায়স্থ প্রমুখ হাজার হাজার নেত্রীর সহায়তায় এই সংগ্রামী নারী সংগঠনের ভিত গড়ে উঠেছে (সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না)। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের জাতীয় ধারা থেকে নারী আন্দোলন যেন বিচ্যুত না হয় সে বিষয়ে এ দেশের নারী আন্দোলনের অগ্রণী এই সংগঠন সচেতন রয়েছে। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫)।

[১৭২]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩)।

[১৭৩]. সামরিক শাসক এইচ. এম. এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরানোর আন্দোলনে বাংলাদেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। দুটি দলেরই নেতৃত্ব দেন দুজন নারী। এই আন্দোলনের জন্য আওয়ামী লীগ সভানেত্রী হাসিনাকে দেয়া হয় জননেত্রী উপাধি। আর বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া পান আপোষহীন নেত্রী খেতাব। (গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪)।

[১৭৪]. গৌতম মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক দলের দমননীতির শিকার হয়েছেন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেত্রী ও দেশের সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা।[১৭৫]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নারী আন্দোলনের চাপে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণীত হয়, যা নারীর প্রতি সহিংসতা রোধের আইনগত অগ্রগতি। নারীর প্রতি বৈষম্যমুলক পারিবারিক আইনের সংস্কার সাধনের আন্দোলন স্বাধীনতা উত্তরকালে আরো জোরদার হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণীত হয়। ১৯৮০ সালের দিকে যৌতুকের কারণে নারী সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেতৃত্বে যৌতুক বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবিতে ১৯৮০ সালের ২৬ শে জুন ১৭০০০ নারীর স্বাক্ষর স্বম্বলিত দাবিনামা জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার মীর্জা গোলাম হাফিজের কাছে দেওয়া হয়। এই দাবি মেনে নিয়ে ১৯৮০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর যৌতুক বিরোধ আইন প্রণীত হয়। ১৯৮৫ সালে মহিলা পরিষদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এসিড নিক্ষেপকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড বিধান করে অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

আশির দশকের নারী সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন নির্বতনমূলক অধ্যাদেশ পাস হয়। নারী সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আন্দোলন, সহিংসতার শিকার দরিদ্র নারীদের আইনগত সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। কতিপয় স্টাডি গ্রুপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নারী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে নারীর অবস্থান সম্পর্কে অনেক গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালিত হয়েছে- যা নীতি প্রণেতাদের প্রভাবিত করেছে নারীর পক্ষে ভূমিকা রাখতে। বিরূপ ফতোয়ার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং ফতোয়াবাজদের প্রতিরোধে 'উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট ফোরাম'[১৭৬] সংগঠনগত ও আইনগত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৯৫ সালে ২৪শে আগষ্ট দিনাজপুরে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন ধর্ষিত ও নিহত হলে নারী সংগঠনগুলো সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এই সহিংসতার ঘটনাকে ঘিরেই গড়ে উঠে সম্মিলিত নারী সমাজ, যা এখনো নারীর প্রতি যে কোনো ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং অনেক সংগঠন নির্যাতিত নারীকে আইনী সহায়তা প্রদান করছে।[১৭৭]

নারী প্রগতি আন্দোলনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নারী বিষয় নিয়ে আন্দোলন করার দাবি, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন, আইন প্রণয়ন ও বাস্তায়নের দাবি, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের দাবিতে সংগ্রাম করছে মহিলা পরিষদ। ১৯৮৪ সালে সিডও সনদে[১৭৮] সরকারের পূর্ণ সম্মতির দাবিতে মহিলা পরিষদ প্রথম আন্দোলন শুরু করেছে এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে আন্দোলন করেছে। এছাড়াও নারীর অধিকার, মানবাধিকার দাবিতে, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোডের দাবিতে মহিলা পরিষদ সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করে। তাই বলা যায়, তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সংগঠনটি বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠন।[১৭৯]

---

[১৭৫]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।
[১৭৬]. কতিপয় এনজিও ও নারী সংগঠনের প্রতিনিধি কর্তৃক গঠিত।
[১৭৭]. সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭০-১৭১।
[১৭৮]. নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ পরিষদে গৃহীত হয়। (সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৩)।
[১৭৯]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সর্বত্র নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের নারীসমাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। কখনও বিভিন্ন সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে স্ব স্ব উদ্যোগে আন্দোলন পরিচালনা করছে, আবার কখনও তারা যৌথভাবে সংগ্রাম গড়ে তুলেছে। শুধুমাত্র নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই নয়, নারী সংগঠসমূহ জাতীয় জীবনের সংকটলগ্নেও বিভিন্ন সময় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে ১৩ বা ১৪টি নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নিকটবর্তী দুটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এই সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতায় সকল সংগঠন একত্রে 'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ' শীর্ষক ব্যানারে নারী আন্দোলন পরিচালনা করে। বাংলাদেশের নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য '১৭-দফা' কর্মসূচী প্রণয়ন করে। ১৯৮৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তারা তাদের কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করে এবং নিম্নোক্ত দাবিসমূহ পেশ করে:

- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জাতিসংঘ-ঘোষিত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের দলিলের প্রতি রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
- যৌতুক নিষিদ্ধ আইনসহ নারী নির্যাতন-বিরোধী যে সকল আইন প্রণীত হয়েছে তা সংশোধনসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তিতে সমঅধিকার ও সন্তানের অভিভাবকত্বে মায়ের অগ্রাধিকার সহ সকল ক্ষেত্রে ধর্মমত নির্বিশেষে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' চালু করতে হবে।
- ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির উইল করার অধিকার দিয়ে নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করতে হবে। এফিডেভিড পদ্ধতি দ্বারা নারী পাচারের দালালদের অভিভাবক হওয়া এবং মেয়েদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার সরকারি পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।
- আইনগত প্রকৃত অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ পারিবারিক আদালত চালু করতে হবে।
- মেয়েদের জন্য গেজেটেড আসনে ১০% কোটা ১৫%-এ উন্নীত করতে হবে। গেজেটেড নন-গেজেটেড সকল ক্ষেত্রে কোটা-নির্ধারিত চাকরি মেয়েদের দ্বারা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। জেলাভিত্তিক কোটায় যদি যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অন্য জেলার মহিলা প্রার্থী দিয়ে সেসব আসন পূরণ করতে হবে। উপজাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাকরির জন্য নির্ধারিত কোটার শতকরা ১৫% পদ উপজাতীয় মহিলাদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।
- গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ক্ষেতমজুর মেয়ে ও শহরের বস্তিবাসী মেয়েদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (ক) গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি নির্ধারণসহ চাকরির নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। (খ) আইএলও কনভেনশনের ভিত্তিতে শ্রমজীবী নারীদের অন্ত:সত্ত্বাকালীন ছুটি ও অন্যান্য অধিকার প্রদান ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (গ) গৃহপরিচারিকাদের জন্য নূন্যতম মজুরি নির্ধারণ করে চাকরির নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- পরিকল্পনা কমিশন বা অনুরূপ জাতীয় পরিকল্পনা সেলে এক-তৃতীয়াংশ মহিলার নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- নির্যাতিত, নিগৃহীত, অপ্রাপ্তবয়স্ক, অভিভাবকহীন মেয়েদের জন্য শহর, গ্রাম সকল পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালিত পুনর্বাসন ও কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ প্রকৃত ইতিহাস, নারীজাতির প্রকৃত মর্যাদাদান ও মৌলিক মানবাধিকার প্রসঙ্গগুলি সর্বস্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- নারী সমাজের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আশু কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ধর্মীয় বা অনুরূপ অনুষ্ঠান, সমাবেশ, সভা-সমিতিতে সংবিধানে প্রদত্ত নারীর অধিকার ও প্রগতি বিরোধী প্রচারণা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য করতে হবে।
- খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এনে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করতে হবে।
- দেশ গঠনে সর্বস্তরের মহিলাদের অধিকার সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংসদে ও ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে।[১৮০]

'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজে'র সাথে যেসকল এনজিও ও নারী সংগঠন যুক্ত ছিল সেগুলো হচ্ছে: ১. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; ২. ঢাকা বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব; ৩. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ; ৪. উইমেন ফর উইমেন; ৫. ফেডারেশন অফ বিজনেস অ্যাান্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব, ঢাকা; ৬. সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম; ৭. বাংলাদেশ নারীমুক্তি সংসদ; ৮. বাংলাদেশ নারী সমিতি; (পরবর্তীতে লুপ্ত) ৯. বাংলাদেশ নারী অধিকার আন্দোলন; (অধুনালুপ্ত) ১০. গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন; ১১. জাতীয় মহিলা লীগ; ১২. নারী শ্রমিক কমিটি; ১৩. সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ (অধুনালুপ্ত); ১৪. সরোপটোমিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব; ১৫. জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি; ১৬. বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক মহিলা সংস্থা ও ১৭. বনানী লায়নেস ক্লাব।[১৮১]

ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসে আলোচনা সভা ও মিছিল করে; ৫ মে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে 'নারী ও আশ্রয়' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ধর্ম বিলের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান, সভা ও প্রতিবাদ মিছিল করে; ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার স্মরণে ও ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে। বন্যার সময় ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ ত্রাণতৎপরতা পরিচালনা করে। তবে ১৯৯০ এর পর ১৯৯৫ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের কাজ ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বেইজিং সম্মেলনের প্রস্তুতিকাজকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় ২২০টি সংগঠনের ফোরাম। ১৯৯৫ সালের ২৪ আগস্ট দিনাজপুরে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন নির্যাতিত ও নিহত হবার নির্মম ঘটনার প্রতিবাদে এবং অন্যান্য ইস্যুতে গড়ে ওঠে 'সম্মিলিত নারী সমাজ'।[১৮২] পূর্বে উল্লেখিত দাবিসমূহ ছাড়াও সম্মিলিত নারীসমাজ আরও যেসকল দাবি তোলে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান চালু করতে হবে। শিক্ষাখাতে বরাদ্ধের সময় নারী শিক্ষা ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ বরাদ্ধ দিতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের আবাসিক সংখ্যা বাড়াতে হবে। উচ্চ শিক্ষার সুবিধার জন্য প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রাবাস রয়েছে সেখানে ছাত্রীনিবাসও তৈরি করতে হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- পাঠ্যসুচিতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্তির ফলে নারী হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং যা পশ্চাদপদ চিন্তা করতে বাধ্য করে, পাঠ্যসুচি থেকে যেসব বিষয় বাদ দিতে হবে। গণমুখী, বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি প্রনয়ণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষাকে ধর্মীয় গোড়ামি থেকে মুক্ত করতে হবে।
- বাংলাদেশে মাতৃত্ব ও গর্ভপাতজনিত কারণে নারী মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্ধের ক্ষেত্রে নারী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বরাদ্ধের উল্লেখ থাকতে হবে। ধাত্রীদের স্বাস্থ্য কর্মী

---

[১৮০]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯-১৭১ ।

[১৮১]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭১ ।

[১৮২]. বর্তমানে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ নিষ্ক্রিয় ও ঘোষণা ছাড়াই বিলুপ্ত। আর 'সম্মিলিত নারী সমাজ' সক্রিয় রয়েছে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সমাবেশ ও বিবৃতি দেওয়ার মাধ্যমে। তবে শুরুতে যে সব সংগঠন সম্মিলিত নারী সমাজের সদস্য ছিল বর্তমানে তার অনেক সংগঠনই যুক্ত নেই। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮-১৬৯; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৬-১৪৮)।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দেশে মতৃসদনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় প্রয়োজনীয় ডাক্তার-নার্স ও যথেষ্ট বেডসহ মাতৃসদন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাকেন্দ্র করতে হবে। শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

- মা ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। কারণ মায়ের অধিকার সামাজিক ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ওপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই মাকে সন্তানের অভিভাবকত্বের অধিকার দিতে হবে।
- বিভিন্ন শিল্প-কারখানায়, যেখানে নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে স্বাস্থ্যহীন কাজের পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্প যেমন, গার্মেন্টস, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি নারী শ্রমিকদের কর্মজনিত পরিবেশ সৃষ্টি করার নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।
- ক্ষতিকারক ও বাতিলকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার রোধ করতে হবে।
- শহর ও গ্রামে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।
- সরকারি এবং বেসরকারি বাস ও অন্যান্য যানবাহনে নারীদের জন্য নির্ধারিত সীটের সংখ্যা কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ করতে হবে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল স্থাপন করতে হবে। পরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন শহরে মহিলাদের আবাসিক হোস্টেল আরো বৃদ্ধি করতে হবে। ঢাকায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং অহেতুক ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না। কর্মকালীন সময়ে মহিলাদের স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ দিতে হবে।
- বিভিন্ন স্বনিয়োজিত পেশায় সক্রিয় মহিলাদের একটি তালিকা প্রণয়ন ও তাদের কাজের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ইট ভাঙা ও গৃহনির্মাণে মহিলা শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরি ও তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। সকল স্বনিয়োজিত নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।
- সেবিকাদের কাজের সমস্যা দুর করে তাদের দাবি অনুযায়ী পরিকল্পনা নিতে হবে।
- মহিলা পরিদপ্তরের ভুমিকা পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে একে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। মহিলা পরিদপ্তরের প্রধান কাজ হবে অন্য সব মন্ত্রণালয়ে নারী সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা করা। মহিলা পরিদপ্তরকে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।
- সকল মন্ত্রণালয়ে নারী বিষয়ক সেল তৈরি করতে হবে এবং সেই সেল মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।
- উৎপাদনশীল খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্ধ এবং নারী উন্নয়নের জন্য বাজেটে একটি খাত তৈরি করতে হবে।
- দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক মুল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হবে।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।
- দেশের সুষ্ঠ উন্নয়ন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের মহিলাদের সম্পৃক্তিকরণ করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের একটি জেলা থেকে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিনিধিমুলক প্রতিষ্ঠানে সর্বস্তরের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচনে ভোট প্রদান পদ্ধতিতে প্রতি ভোটার দুটি ভোট প্রদান করবেন। নির্বাচনে প্রতিযোগী প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের নির্ধারিত আসন সংখ্যা নুন্যতম দশ-শতাংশ আসনে মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করবেন।
- জাতীয় পরিকল্পনায় নীতিনির্ধারণী প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমানে বৈষম্যমূলক নীতি বিলোপের লক্ষ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে নারীশিক্ষা প্রসারের সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- এ দেশের নিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে, নারী পুরুষ উভয়ের অবদান গ্রন্থিত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা ও পাঠক্রমে ও গণপ্রচার মাধ্যমে তা পরিবেশন করতে হবে।
- দেশের অর্থনৈতিক সংকট ও বৈদেশিক সাহায্যের সীমাবদ্ধতা উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের প্রসার, বাজার সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি প্রণয়ন ও বাস্ত বায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। কোন কারণে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করা যাবে না।
- জাতীয় মহিলা সংস্থা অধ্যাদেশ ১৯৯০ সহ সকল কালা-কানুন অবিলম্বে বাতিল ঘোষণা করতে হবে।[১৮৩]
- অশ্লীল পত্র-পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন ও আমদানি বন্ধ করতে হবে। নারীর অধিকার ও প্রগতি বিরোধী প্রচারণা, আইনগত দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে।
- জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে।[১৮৪]
- সংরক্ষিত আসনে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন নয়, অন্তত ২০টি আসনে মহিলা সংগঠন এবং ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের মনোনীত মহিলাদের প্রার্থী করতে হবে।[১৮৫]

উপরে বর্ণিত নারী সংগঠনগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে দীর্ঘকাল যাবত কয়েকটি আইন প্রনয়ন ছাড়া নারীর সার্বিক অবস্থা ও অবস্থানগত পরিবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলো, সরকার, সাংসদবৃন্দ উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাছাড়া প্রণীত আইনগুলো বাস্তবে কার্যকরী করতেও তাদের ভূমিকা অনুপস্থিত।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১৯৭০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংসদ বা আইনসভার কাছে, সরকার রাজনৈতিক দল, সিভিল সমাজের সকল অংশের কাছে উক্ত দাবীগুলো বাস্তবায়নের আবেদন জানাচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ ১৯৮০-১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত ১৭ দফা দাবিতে সোচ্চার থেকেছে এবং এখনো আন্দোলনে যুক্ত আছে। ১৯৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবিতে ৩টি রাজনৈতিক দল অবরোধ, অসহযোগ, কারফিউ, হরতাল পালন করেছিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রতি নারী সমাজের সমর্থন ছিল। ১৯৯৫ সালের রাজনৈতিক অবরোধ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন নারী এবং এনজিও

---

[১৮৩]. পরবর্তীকালে জাতীয় মহিলা সংস্থার সাথে নারী সংগঠনগুলো কাজ করছে। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২)।

[১৮৪]. বিভিন্ন দল ও জোটের কাছ থেকে দাবি জানানো হয় যে, সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬৪ (জেলা হিসাবে) গণ্য করা হোক, এবং নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ ভোটে। অপর বিকল্প প্রস্তাব হচ্ছে, জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের সংখ্যা আরও ১০০টি বা ১৫০টি বৃদ্ধি করে ৪০০ বা ৪৫০ টিতে উন্নীত করে ১০০টি বা ১৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হোক এবং ৩০ আসনের মহিলা সংরক্ষিত আসন বাতিল করা হোক। কিন্তু এ সব দাবি পূরণ করা সংবিধানের সংশোধন ছাড়া সম্ভব নয়। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩)।

[১৮৫]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৮৩-১৮৫; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০-১৬৩। যেসকল রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবার ক্ষেত্রে আশাবাদী তারা এ দাবি মানতে রাজি নন, কারণ এতে তাদের মনোনীত মহিলা কর্মীরা বা সমর্থকরা সংসদে বসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে সংরক্ষিত আসন থেকে মনোনীত করা একটি কৌশলগত প্রশ্ন। কিন্তু এই কৌশলগত প্রশ্নে নারীদের স্বার্থ আদায় হবে তখনই যদি এতে নারী প্রতিনিধিরা যেতে পারেন। তাছাড়া রাষ্ট্রধর্ম বিল বাতিল করার দাবিতেও নারী আন্দোলন সক্রিয় রয়েছে। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩)।

Dhaka University Institutional Repository

আইনজীবী মানবাধিকার সংগঠন কর্মসূচি ও সম্মিলিত নারী সমাজের কর্মসুচী অব্যাহত ছিল।[১৮৬] সুষ্ঠ নির্বাচনের নীতিমালায় নারী ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে কালো টাকা, সন্ত্রাস নির্যাতনের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে নারীর প্রতি হয়রানি বন্ধ করা, ফতোয়া দিয়ে নারী ভোটারকে নিজ পছন্দে ভোট দিতে নিরস্ত রাখা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও সম্মিলিত নারীসমাজ থেকে স্মারকলিপি দিয়েছে নারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।[১৮৭]

বেইজিং প্রস্তুতি কমিটি ১৯৯৩-১৯৯৫ পর্যন্ত বেইজিং সম্মেলনের পূর্বে নারী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। সম্মিলিত নারী সমাজ ১৯৯৫ এর মাঝামাঝি থেকে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো নারী সমাজের জন্য নির্বাচনী ইশতেহারে যেসকল কর্মসুচি ঘোষণা করেছিল তার কতটুকু পালন করেছে এবং যেগুলো পালন করেনি তা কেন করেনি তার পর্যালোচনাসহ নতুন প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করবে- এটাই নারী সমাজ চায়। ১০% নারী প্রার্থীকে নিয়োগ দিয়ে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের আইন সংসদে করার প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দলগুলোকে দিতে হবে এগুলোও নারী সমাজের দাবির অন্তর্ভুক্ত।[১৮৮]

এছাড়াও ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত নারী আন্দোলনকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও যে দাবিগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি সাধন করা।
- যত দ্রুত সম্ভব বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরু করা এবং দেশকে অবৈধ অস্ত্র মুক্ত করা।
- নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠিত করা। নির্বাচন কমিশনের কার্যকর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। নির্বাচন কমিশন যাতে রাজনৈতিক দলীয় চাপে পড়ে নিরপেক্ষতা না হারায় তার ব্যবস্থা করা।
- দ্রুত ভোটার তালিকা সংশোধন ও পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা। ভোটারদের পরিচয়পত্র এই নির্বাচনে (২০০১) করা সম্ভব না হলেও পরবর্তী নির্বাচনে অবশ্যই যাতে করা করা হয় সেই ব্যবস্থা করা।
- নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যয় সীমিত করা ও কঠোরভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া।
- ব্যাংক ঋণ খেলাপীদের সকল নির্বাচনের প্রার্থী পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা।
- নির্বাচনী প্রচারে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।
- নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি তৈরি করা এবং তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তদারক করা এবং লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[১৮৯]

স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল নারী সংগঠন, এনজিও সংগঠন, মানবাধিকার, মহিলা আইনজীবী সংগঠনের (প্রায় ৩০০) কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ সুফিয়া কামাল (প্রয়াত ১৯৯৯), নীলিমা ইব্রাহিম, নাজমা

---

[১৮৬]. ১৯৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অবরোধ হরতাল চলছিল। এরই মধ্যে নারীসমাজ ৮ই মার্চ নারী দিবসের কর্মসূচী পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু অবরোধ-হরতালে কারণে সেদিন কর্মসূচী পালন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে শুক্রবার হরতাল না থাকায় নারীদের কর্মসুচি পালন করা সম্ভব হয়েছে। আন্দোলনের আহবায়ক মুল দলগুলো ছাড়া বাম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ৮ মার্চ নারী দিবসে নারী আন্দোলনের সমর্থনে র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিল। পরে আরো অনেক নারী ও এনজিও সংগঠন এসব র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিল। বাম রাজনীতিবিদরা মিছিল থেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনকে। প্রতীকী এই অংশগ্রহণও অনেক অর্থবহ ছিল। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-১৫১)।

[১৮৭]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

[১৮৮]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫-১৮৬; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

[১৮৯]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৮৬; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩-১৬৪)।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, রোকেয়া রহমান কবির (প্রয়াত ২০০০), মালেকা বেগম, আয়শা খানম, আইভী রহমান, রাশেদা কে চৌধুরী, হামিদা আক্তার বেগম, সালমা খান, মাহমুদা ইসলাম, সাহারা খাতুন, হামিদা হোসেন, সালমা সোবহান, সিগমা হুদা, খুশী কবির, শিরিন হক, শিরিন আক্তার, রোকেয়া কবির, হোসনে আরা খান, ফরিদা আক্তার, হাজেরা সুলতানা, সালমা আলী, কৃষ্ণা চন্দ, ইলা চন্দ, নায়লা খান, সুলতানা রুবী, শাহিন আনাম, সুলতানা কামাল প্রমুখসহ হাজার হাজার নেত্রী।[১৯০] এছাড়াও জেলা ও গ্রাম পর্যায়, কেন্দ্রে আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। যারা দলীয় সংকীর্ণতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্মান্ধতা, পুরুষতান্ত্রিকতা, অধিপত্যবোধ বা নারী অবদমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, সরকার, আইন রক্ষাকারী সংস্থা, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের অনীহা পোষণের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।[১৯১]

এনজিও সংস্থার [১৯২] কার্যসূত্রে বাংলাদেশের গ্রামবাংলা জুড়ে বিস্তৃত নারী সমিতির সাথে শহরের নারী আন্দোলনের ব্যাপক যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। এটা ১৯৭২ সালের পর থেকে শুরু হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে শহরের শিক্ষিত অধিকার সচেতন নারীরা নারী প্রগতি আন্দোলনের একটা ভিত্তি দাড় করিয়েছে। যার স্বীকৃতি রয়েছে বেইজিং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনায়। বেইজিং সম্মেলনের প্রস্তুতিতে পরিচালিত 'বাংলাদেশ এনজিও ফোরাম ১৯৯৫-এর সাথে যুক্ত ছিল ২২০ টির বেশি জাতীয়, স্থানীয়, আঞ্চলিক, গ্রামভিত্তিক, পেশাভিত্তিক, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী এনজিও সংস্থা। তৃণমূলের নারীরা অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা, দাবি, সুপারিশের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ. সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। শহর ও গ্রামের নারী আন্দোলনের এই অভূতপূর্ব বৃহত্তম সেতুবন্ধন বিশ্বনারী আন্দোলন-সম্মেলনের পটভূমিকায় ঘটেছে।[১৯৩]

এনজিও সংগঠনের কাজ প্রধানত গ্রামভিত্তিক। রাজধানীর এনজিও কেন্দ্রীয় কর্মসুচিতেও নারী আন্দোলনের সমর্থনে ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্যও এনজিও সংস্থাগুলোর অব্যাহত কাজ রাজধানীতে এবং গ্রামে চলছে। প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে শ্রমজীবী ও নারীর ক্ষমতায়নে, দারিদ্র দুরীকরণে এনজিও সংস্থাগুলোর সাফল্য রয়েছে। এনজিওর এই চ্যালেঞ্জের সাফল্যের বিরুদ্ধেই ফতোয়াবাজির দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ফতোয়াবাজির মূল উদ্দেশ্য মুলত নারী ও শ্রমজীবী দরিদ্র নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের প্রতিরোধে শক্তি সঞ্চয় করা। এনজিও সংস্থাগুলো সাধারণত সমাজের সহযোগিতায় রুখে দাড়িয়েছে ফতোয়ার বিরুদ্ধে। ফতোয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে, নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে সাংবাদিক, আইনজীবী, ডাক্তার, ছাত্র-যুবসমাজ, এনজিও কর্মী, নারী আন্দোলনের কর্মী সকলেই আন্তরিকভাবে একাত্মতার সাথে কাজ করতে আগ্রহী। গ্রাম ও শহর পর্যায়ে নারী আন্দোলন বিস্তৃত করার লক্ষ্যে নারী সংগঠনগুলো ও এনজিও সংস্থাগুলো বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে।[১৯৪]

১৯৯৫ সাল থেকে বহু ব্যক্তি, সংগঠন ও এনজিও সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াসে নারী সমাজ একত্রে অধিকার ও দাবী আদায়ের আন্দোলন করে। বিভিন্ন সামাজিক অসংগতির প্রতিবাদে সম্মিলিত নারী

---

[১৯০]. যাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হরো না।

[১৯১]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ:১৮৬; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮-১৪৯)।

[১৯২]. এনজিও সংস্থাগুলোর বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের ফলে ১৯৮০-র দশক থেকে গ্রামবাংলার দরিদ্র, অবরুদ্ধ, নিরক্ষর পরনির্ভরশীল নারীর মধ্যে ব্যাপক জাগরণ ঘটেছে। শিক্ষা আর কাজ নারীকে করেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও নিয়ন্ত্রণে আত্মনির্ভরশীল। এই আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ নারী সনাতন সমাজ-সংসার, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত ফতোয়া ও নারী নির্যাতনকারী পশুশক্তির সাথে লড়াই করছে। পুরুষ ও পিতৃতান্ত্রিকতার তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে থাকার চেষ্টা যতই হোক না কেন আধিপত্য বিস্তারে পুরুষের বিচরণকে সমর্থন দিচ্ছে সরকার, সমাজ, আইন ও রাজনৈতিক দলীয় আদর্শ। (মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২-১৫৩)।

[১৯৩]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২।

[১৯৪]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের ব্যানারে সংগঠিত হয়ে একত্রে কাজ করছে। এবং আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্মিলিত নারী সমাজ আন্দোলনের কর্মসুচি গ্রহণ করেছে। জেলা শহরগুলোতে নারী আন্দোলন বিস্তৃত করার লক্ষ্যে নারী সংগঠনগুলো, এনজিও সংস্থাগুলো বেইজিং কর্মপরিকল্পনাকে নিজ নিজ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সমাজে, পরিবারে ও রাষ্টে নারীর যে অসম, নির্যাতিত, অবদমিত অবস্থা তার অবসান ঘটিয়ে নারীকে পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নারী সমাজ আন্দোলন করছে। কিন্তু নারী এখনও তার লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি।[১৯৫]

১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত নারী প্রগতি আন্দোলনরত সংগঠনগুলোর দৃষ্টিতে জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পারিবারিক

- পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও পরিবারের নারীর অসম অবস্থান
- পারিবারিক সম্পদ ও সিদ্ধান্তে নারীর নিয়ন্ত্রণের অধিকারহীনতা
- বৈষম্যমুলক পারিবারিক আইন
- বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ
- যৌতুক প্রথার চাপ
- ছেলে সন্তানের আকাঙ্খা ও মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য
- নারীর গৃহকর্মের স্বীকৃতি ও মুল্যায়ন না হওয়া
- পরনির্ভরশীলতা

শিক্ষাক্ষেত্রে

- নারী সাক্ষরতার নিম্নহার ও অব্যাহত নারী পুরুষ বৈষম্য
- নারী শিক্ষায় তুলনামুলকভাবে কম অর্থ বরাদ্ধ
- নারীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা
- পাঠ্যসুচি ও পাঠ্যক্রমে পুরুষ প্রাধান্য
- নারীশিক্ষার লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাব
- তথ্য ও গবেষণাকেন্দ্রের অভাব

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

- দরিদ্রতম ব্যক্তি হচ্ছে নারী
- কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয় নারী
- কাজের খোঁজে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নারী পাচারকারী এবং দালালদের শিকার হয়ে পতিতাবৃত্তির চক্রে পড়ে নারী।
- পুরুষকেন্দ্রিক শ্রমবাজারে নারীর সীমিত প্রবেশধিকার
- ঋণ ও বাজার পরিস্থিতির মন্দ প্রভাবে নারী উদ্যোক্তার টিকে থাকার সমস্যা
- ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অধিকার অবহেলিত

---

[১৯৫]. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

- অর্থকরী কাজের সময় ও সুযোগের অভাবে গৃহস্থালি ও গৃহভিত্তিক উৎপাদনশীল কাজে অবৈতনিক নারী শ্রমিকের উচ্চহার ও বেতনভোগী নারী শ্রমিকদের নিয়োগের নিম্নহার ।
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুলধারায় নারীর অনুপস্থিতি
- কৃষিকাজে নারীর অবদানের স্বীকৃতি না থাকা।
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাজেটে নারী ইস্যুতে বরাদ্দ নির্দিষ্ট না থাকা।
- সম্পদে নারীর অধিকারহীনতা
- গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকদের চাকরির নিশ্চয়তার অভাব, বেতন বৈষম্য ও অল্প মজুরি।
- কর্মজীবি ও শ্রমজীবি নারীদের শিশু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাব।

স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা

- স্বাস্থ্যব্যবস্থা লিঙ্গগত বৈষম্যের মডেলের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং দারিদ্র ও অনুন্নয়নের ছন্দাবরণে এই বৈষম্যটি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা
- জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণে নারীর ওপর একতরফা চাপ প্রয়োগ
- গর্ভবতী ও সন্তানদানকারী মায়ের চাহিদা পুরণ না হওয়া
- অপুষ্টি
- সন্তান প্রসবে জটিলতা ও প্রসূতি মৃত্যুর অধিক হার
- শিশু মৃত্যুর অধিক হার।
- এইডস, বক্ষ ক্যানসার ও অন্যান্য জটিল রোগের শিকার নারী
- ধর্মীয় গোড়ামী।

নারী নির্যাতন ও মানবাধিকার বিষয়ক সমস্যা

- নারী নির্যাতন বিরোধী আইনের ত্রুটি
- প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি
- সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধঃস্তন অবস্থান
- সকল সম্প্রদায়ে প্রচলিত বৈষম্যমুলক পারিবারিক আইনের অনুশাসন যা সংবিধানে ঘোষিত নারী-পুরুষের আইনগত সমঅধিকারকে খর্ব করে।
- ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য, যথা-নাগরিত্ব আইন
- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার ফলে সিডও সনদের পুর্ণাঙ্গ অনুমোদন না হওয়া।
- ধর্ষণ, পাচার ও নির্যাতনের শিকার নিরাশ্রিত অসহায় নারীদের পুনর্বাসন সেবা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিকুলতা।
- সরকারি মহলে বিশেষত পুলিশ প্রশাসনে নারী নির্যাতন বিষয়ে উদাসীনতা ও পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতন।
- আইনের শাসন উপেক্ষা করে ধর্মীয় অনুশাসনের অপব্যাখা ও প্রয়োগ এবং নারীকে ফতোয়ার শিকার করে নির্যাতন করা।
- পরিবার ও সমাজে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মুল্যবোধের অভাব
- সর্বত্র নারীর জন্য নিরাপত্তাহীন পরিবেশ
- দাম্পত্য জীবনে যৌন নিপীড়ন
- সামাজিক যৌন নিপীড়ন

পরিবেশগত অবক্ষয় ও বিরূপ প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

- মুক্তবাজার অর্থনীতি ও কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানকে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য দেওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় ও পরিবেশ দুষণ, খরা, গাছ কাটা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে নারীর জীবনে।

রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অনুপস্থিতি

- সাধারণ নারীর রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব
- রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার বিষয়ে নারীর অজ্ঞতা
- নারীর সীমিত অংশগ্রহণের জন্য দায়ীঃ দলীয় মুল্যবোধের অভাব, কালো টাকা ও সন্ত্রাসের প্রভাব, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর্থ-সামাজিক অসম অবস্থান।
- নারী ইস্যু বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসচেতনতা ও দলীয় কর্মসুচিতে তার গুরুত্ব না দেওয়া।
- জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা ও চিহ্নিত সমস্যাগুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী নারীদের সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে।[১৯৬]

উপরোক্ত সমস্যাবলী থেকে মুক্তি পাওয়া ও প্রগতি লাভের লক্ষ্যে বাংলাদেশে নারী প্রগতি আন্দোলন এখনও অব্যাহত রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় বেইজিং বিশ্বনারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নারী প্রগতি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠনের কাজের ব্যাপকতাই নারীকে আলোচিত বিষয়রূপে প্রতিফলিত করেছে। অন্যদিকে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, অপহরণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটছে অধিক হারে। মূলতঃ প্রচলিত প্রথা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতার আষ্টেপৃষ্ঠে নারীকে বেঁধে বছরের পর বছর নিছক করুণা ও কল্যাণের নামে গতানুগতিক মুল্যবোধের খাঁচায় অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই নারী আন্দোলনের সুফল বাংলাদেশের নারীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারছে না। তারপরও সমতা, সমঅধিকার, মানবাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নারী সমাজ প্রতিনিয়ত আন্দোলন করে যাচ্ছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ পুনর্বহালের আন্দোলন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ বাংলাদেশের নারী সমাজের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। দীর্ঘকাল যাবৎ নারীদের সুস্পষ্ট দাবির প্রেক্ষিতে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত ও সম্পন্ন চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী-পুরুষ সমতার ঘোষণা, সিডও সনদের ঘোষণা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনার আলোকেই 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭' প্রণীত হয়। কিন্তু ইসলামী চিন্তাবিদদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪ সালে তৎকালীন সরকার নারী উন্নয়ন নীতির কতিপয় ধারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে কিছুটা পরিবর্তন করেন। যা নিম্নরূপ[১৯৭]:

ধারা	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ১৯৯৭	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৪	পরিবর্তন/ সংশোধনীসমূহ

[১৯৬]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ:১৭৯-১৮১; মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী **তিনশ বছরের বাঙালী নারীর ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৬-১৫৮)।

[১৯৭]. **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭-২০০৮ ও মহিলা পরিষদ**, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জুন ২০০৮), পৃঃ ১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৭. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ	অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্য নীতি, মুদ্রা নীতি, কর নীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।	অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্য নীতি, মুদ্রা নীতি, কর নীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্ত বায়নে নারীর সংবিধানসম্মত অধিকার নিশ্চিত করা।	'সমান অধিকার' বাদ দিয়ে 'সংবিধানসম্মত অধিকার' লেখা হয়েছে।
	সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।	কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।	'সম্পদ' এবং 'অংশীদারিত্ব' শব্দ দুটি বাদ দেয়া হয়েছে।
	নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	'বাসস্থান' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।
৭.২ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন	নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভুমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।	নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।	'উত্তরাধিকার', সম্পদ এবং 'ভুমির উপর অধিকার' শব্দগুলো তুলে দেয়া হয়েছে।
৭.৩ নারীর কর্মসংস্থান	নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা	নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা	'যথোপযুক্ত' শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।
৭.৪ সহায়ক সেবা	সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবা যত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ,	সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবা যত্ন পরিচর্যা	দিবাযত্ন কেন্দ্র, বৃদ্ধ শব্দগুলোর স্থলে 'দিবাযত্ন কেন্দ্র বৃদ্ধি' লেখা হয়েছে, অর্থাৎ 'বৃদ্ধ' শব্দটি বাদ

Dhaka University Institutional Repository

	অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা	কেন্দ্র বৃদ্ধি, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা	দেয়া হয়েছে
৮. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা	বাদ	এই লাইন/অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।
	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেয়া	জাতীয় সংসদে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।
	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রীপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা	'সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রী পরিষদে'-এর পরিবর্তে 'সর্বস্তরে' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে
৯. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন	প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং সরাসরি প্রবেশের (লেটারাল এন্ট্রি) ব্যবস্থা করা	প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral Entry) ব্যবস্থা করা	'সরাসরি প্রবেশের' (লেটারাল এন্ট্রি) এর জায়গায় 'পার্শ্ব প্রবেশ' (Lateral Entry) লেখা হয়েছে
	বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, বিচার বিভাগের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা	বাদ	এই লাইনটি পুরোটাই বাদ দেয়া হয়েছে।
	জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ	জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতিনির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত কোটা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির	'সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ'-এর পরিবর্তে অধিকতর অংশগ্রহণ এবং 'শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা' এর

Dhaka University Institutional Repository

	গ্রহণ করা	উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা	পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত কোটা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা' সংযুক্ত করা হয়েছে
১২. নারী ও পরিবেশ	কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত ও সমান সুযোগ দেয়া	কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও অগ্রাধিকার দেয়া	'সমান সুযোগ' এর পরিবর্তে 'অগ্রাধিকার' লেখা হয়েছে

বাংলাদেশের নারী সমাজ উক্ত পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি। সারা দেশব্যাপী নারী সমাজ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ পুনর্বহালের দাবিতে বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন শুরু করে।[১৯৮] ৪৩টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠন এবং এনজিও'র সমন্বয়ে গঠিত হয় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি। ২০০৫ সালের ১২ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সংস্কার প্রসঙ্গে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বক্তব্য' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পত্রিকার ৪০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।[১৯৯] সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বক্তব্যে বলা হয়, "১৯৯৭ সালে ঘোষিত নারী নীতি নারী উন্নয়নে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার প্রথম উদ্যোগ। যার মূল লক্ষ্য ছিল নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অর্থাৎ নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান নিশ্চিত করা, নারী নির্যাতন দূরীকরণসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় সমঅধিকার নিশ্চিত করা। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে নারীর সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য উক্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নারী সমাজের কাছে একটি শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়। কিন্তু খুবই আকস্মিকভাবে জানা গেল জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পরিবর্তিত হয়েছে।" উক্ত সম্মেলনে নারী উন্নয়ন নীতির আকস্মিক পরিবর্তনের সমালোচনা করে ১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পুনরায় বহাল রাখার দাবী জানানো হয়।[২০০]

এছাড়াওআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন উপ-পরিষদের উদ্যোগে ৩ জুন ২০০৬ সালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭' পুনর্বহালের দাবিতে দিনব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সাথে এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২০১] উক্ত অনুষ্টানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দসহ আইন ও সালিশ

---

[১৯৮]. ২০০৫ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পরিবর্তনের প্রতিবাদে নারী প্রগতিবাদী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে সারাদেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন, মতবিনিময়, সাংবাদিক সম্মেলন, স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। নেত্রকোণা, ফরিদপুর, নাটোর ও চট্টগ্রামে মানববন্ধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বেলাব, কলমাকান্দা, স্বরূপকাঠি, মধুকালি, পাবনা, দিনাজপুর, কুমারখালী, রংপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ি, কাউখালি ও টঙ্গিসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রগতিবাদী নারীদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ, প্রতিবাদ সভা, মানববন্ধন ও র‍্যালির আয়োজন করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানানো হয়। (**জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭-২০০৮ ও মহিলা পরিষদ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২-১৫)।

[১৯৯]. সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সংবাদ, দি ডেইলি স্টার, ইনডিপেনডেন্ট, দৈনিক নয়া দিগন্ত, দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দি নিউ ন্যাশন, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক বাংলাবাজার, দৈনিক সমকাল, ডেইলি নিউ এজ, নিউজ টুডে, দৈনিক ভোরের ডাক, মৃদুভাষণ, দৈনিক মুক্ত খবর, দৈনিক নওরোজ, দৈনিক রূপালী দেশ, দৈনিক কবরপত্র এবং অন্যান্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও গণমাধ্যমের সাংবাদিক। (প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪)।

[২০০]. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪-২৫।

[২০১]. বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভানেত্রী হেনা দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা আয়েশা খানম। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় আন্দোলন সম্পাদিকা রেখা চৌধুরী। (**জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭-২০০৮ ও মহিলা পরিষদ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, কেয়ার বাংলাদেশ, নারী অধিকার বাস্তবায়ন কেন্দ্র, উইমেন ফর উইমেন, যুক্ত, গণস্বাস্থ্য সংস্থা, নারীপক্ষ, ডিডিএফ, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, কনসার্ন বাংলাদেশ, ব্র্যাক, অনন্যা, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, এনজিও ফোরাম, নাগরিক উদ্যোগ, আরডিবি, জাতীয় নারী জোট, বিডিপিসি, বাংলাদেশ মানবিক কর্মসংস্থা, জাতীয় নারী ঐক্য মঞ্চ, চার্ট অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ পুনর্বহালের দাবী জানান।[২০২]

২০০৬ সালের ২৭ আগষ্ট সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে রাজধানীর 'বিয়াম মিলনায়তনে' দিনব্যাপী জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তৃণমূল ও কেন্দ্র থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে ১৯৯৭ এর জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহালের দাবি জানায়। কনভেনশনে গৃহীত সুপারিশমালাসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ২০০৬ সালের ৮ অক্টোবর এক স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। সুপারিশমালা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- কোনোরূপ শর্ত ও পরিবর্তন ছাড়াই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '৯৭ এর পুনর্বহাল এবং বাস্ত বায়ন করতে হবে।
- সকল রাজনৈতিক দল ও জোটকে তাদের নির্বাচনী মেনোফেস্টোতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '৯৭ এর পুনর্বহালের অঙ্গীকার করতে হবে এবং নির্বাচনমুখী সকল রাজনৈতিক দলকে এই নীতির পক্ষে অবস্থান নিতে ও তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
- আইনগত সংশোধনীর মাধ্যমে নারী-পুরুষের সকল প্রকার সম্পদের উপর জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নির্বিশেষে সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
- সমঅংশীদারিত্ব ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা হবে না। সমঅংশীদারিত্ব শব্দটি বাদ দিলে নারীর মানবাধিকার লজ্ঘিত হবে। কাজেই শব্দটি পুনর্বহাল করতে হবে।
- সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর সমভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে। সংরক্ষিত আসন সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০০টি করতে হবে। এই নিয়ম ৩ টার্ম পর্যন্ত বলবৎ রাখতে হবে।
- রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগ, সাংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, নির্বাহী বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ- সর্বস্তরে নারীর ৩০% অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার পরিষদ বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন- এ নির্বাচিত নারী কমিশনার ও সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের ন্যায় সমান অধিকার, সুযোগ ও ন্যায্য বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।
- স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কাজের সম্মানী ও বেতনভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ওয়ার্ড অনুযায়ী যথাযথ বন্টন নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী নারীদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণসহ বিভিন্ন সহায়ক সেবা যেমন- শিশু যত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।[২০৩]

---

২০২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।
২০৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৭ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৭ পালন উপলক্ষ্যে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশ থেকে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ১১টি দাবী তুলে ধরা হয়। তারমধ্যে অন্যতম দাবি ছিল ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের সাথে আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ১৯৯৭' পুনর্বহাল করতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '৯৭ পুনর্বহালের দাবিতে বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে সকল নারী ও মানবাধিকার সংগঠন, উন্নয়ন সংস্থা এবং নারীসমাজ জোর আন্দোলন করতে থাকে। সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ, বিবৃতি প্রদান, মানববন্ধন, মতবিনিময় সভা, সংবাদ সম্মেলন, নারী সমাবেশের আয়োজন ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্দোলনরতদের দাবির এক পর্যায়ে ১৭ জানুয়ারী ২০০৮ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একাদশ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, শীঘ্রই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি যুগোপযোগী করে ঘোষণা দেয়া হবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ অনুমোদন করে এবং ৮ মার্চ ২০০৮ সালে বিশ্ব নারী দিবসে তার চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়।[২০৪]

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ঘোষণার পরপরই সরকার থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।[২০৫] একশ্রেণী নারী নীতির পক্ষ অবলম্বন করে এবং অপর শ্রেণী বিপক্ষে অবস্থান নেয়। নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ এর কতিপয় ধারা সরাসরি কুর'আন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবসহ সর্বস্তরের আলেম সমাজ প্রচন্ড বিরোধীতা করে এবং নারী নীতি বাতিলের আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের তীব্রতা এতই প্রবল ছিল যে, সরকার কর্তৃক নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ বাস্তবায়িত হয়নি।

নারী উন্নয়ন ও প্রগতি আন্দোলনে সম্পৃক্ত সংগঠনসমূহ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় ৫ বছর পর বাংলাদেশ সরকার নারীদের সমস্যা সমাধান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ১৯৭৬ সালে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার্থে এবং নারী উন্নয়নের স্বার্থে সরকার 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ সরকার মনোনীত একটি নির্বাহী কমিটি দ্বারা এই সংস্থা পরিচালিত হয়। এই সংস্থার প্রধান কার্যাবলী হচ্ছে আর্থ-সামাজিক। জাতীয় মহিলা সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো:

- নারীর অধিকার সংরক্ষণ করা,
- মেয়েদেরকে হাতে কলমে কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া,
- মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

জাতীয় মহিলা সংস্থা ছাড়াও বাংলাদেশে নারী উন্নয়নমূলক আরও কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন:

- Mother's Club of Social Welfare Directorate,
- Women's Cooperative of the Integrated Rural Development Programmers,

---

[২০৪]. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩, ২৭। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথে একটি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারায় নারী-পুরুষের সমঅধিকারের আলোকে ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত ও বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় ঘোষিত ১২টি ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘ ঘোষিত সিডও সনদের অনুমোদিত ধারাসমূহের বাস্তবায়নের জন্য এই কর্মসূচী একটি বাস্তব পদক্ষেপ। (প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১)।

[২০৫]. উল্লেখ্য যে, নারী নীতি ঘোষণার পূর্ব থেকেই তার বিষয় বস্তু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। এবং নারী নীতি ঘোষণার পর এই সন্দেহ সংঘাতে রূপ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

- Bangladesh Handicrafts Cooperatives Federations প্রভৃতি।[২০৬]

স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলের প্রধান বেসরকারী সংস্থাগুলো নতুনভাবে সংগঠিত হয়। যেমন 'আপওয়া' 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি' নাম নিয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। একইভাবে Business and Career Women's Association এবং Women's Voluntary Organization পুনরুজ্জীবিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' শক্তিশালী ও কার্যকরী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০৭]

বিশ শতকের আশির দশক থেকে বাংলাদেশে নারী সংগঠনগুলো ব্যাপক হারে গড়ে উঠেছে। ১৯৮১ সালের এক জরীপ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ৩২৬টি মহিলা সংগঠন আছে। জরীপে ২১৪টি সংগঠনের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে ৮৫.৫% বেসরকারী সংগঠন এবং ১৩.১% সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংগঠন। ১.৪% সংগঠন বিদেশী সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত।[২০৮] নারী প্রগতিবাদী সংগঠনগুলি একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা সংগঠনভেদে বিভিন্ন রকম হয়। ৫৭ শতাংশ সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ২০ জনের মধ্যে। পক্ষান্তরে ২১.৫ শতাংশ সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১ থেকে ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৫% সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩০ অথবা তারও বেশী।[২০৯] সংগঠনগুলির ৩১.৩% অফিস ভাড়া করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ৫০.৫% সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রধান সংগঠকের অথবা সদস্যদের বাড়ীতে কার্য পরিচালনা করে থাকে এবং ৭.৫% সংগঠনের কোন অফিস ঘর নেই বলে জানা যায়।[২১০]

মহিলা সংগঠনগুলি মূলত মহিলাদের অধঃস্তন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত সংগঠনের সংখ্যানুপাত ২৬.৮ শতাংশ। অন্যদিকে নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে গঠিত সংগঠনের সংখ্যানুপাত ১৮.৫ শতাংশ। তারমধ্যে বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্যে ১৭.৩ শতাংশ, মহিলা নেতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৪.৪ শতাংশ, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য ১১.৭ শতাংশ এবং সংস্কৃতি কর্মকান্ডের লক্ষ্যে ১১.৩ শতাংশ সংগঠন ও সংস্থা কাজ করছে।[২১১] বাংলাদেশে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি কোন না কোন ভাবে নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে নারী উন্নয়ন ও প্রগতি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি সংগঠন ও এনজিওর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

---

২০৬. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ এর রিপোর্ট দ্রষ্টব্য, পৃ: ৩-৪।

২০৭. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ এর রিপোর্ট দ্রষ্টব্য, পৃ: ৩-৪।

২০৮. **UNICEF, Inventory for Women's Organizations in Bangladesh**, S. Khan, S. Islam, J. Rahman & M. Islam (eds), Womens Development UNIT, UNICEF, Bangladesh, June, 1981, p: 11.

২০৯. খালেদা নাজনীন, **বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের স্বরূপ**, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৫ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৪, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, পৃ: ৯৫।

২১০. **UNICEF, Inventory for Women's Organizations in Bangladesh**, S. Khan, S. Islam, J. Rahman & M. Islam (eds), Womens Development UNIT, UNICEF, Bangladesh, June, 1981, p: 12.

২১১. **UNICEF, Inventory for Women's Organizations in Bangladesh**, S. Khan, S. Islam, J. Rahman & M. Islam (eds), Womens Development UNIT, UNICEF, Bangladesh, June, 1981, p: 13.

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি নারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত নারীদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ড বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে নারী উন্নয়নে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। দক্ষতা, গতিশীলতা ও দ্রুততার সাথে যথাযথভাবে নাগরিকদের সেবা প্রদান, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টায় জনগণকে সহযোগী ও সম্পৃক্তকরণ এবং নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব দানকারী মন্ত্রণালয় হিসাবে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের তদারকীর দায়িত্ব পালন, নারী উন্নয়ন বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহকে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করাই মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ৬৪টি জেলা ও ৪১২টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়।

কার্যাবলী

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৭টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। যা নিম্নরূপ:

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' (MGD) ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগ ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলাদের খাদ্যাভাবসহ সার্বিক দুর্দশা লাঘবে মাসিক ভাতা প্রদান করা।
- দু:স্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত, দু:স্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবি ও শ্রমজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা' এর মাধ্যমে দু:স্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত হস্তশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।
- স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীসহ সংগঠনসমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্ত বায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের পটভূমিতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল এটি পূর্ণাঙ্গ মহিলা সংগঠন হিসেবে নতুন করে সংগঠিত হয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'। এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভানেত্রী ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। সংগঠনের প্রথম থেকে ২১ বছর পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট লেখক মালেকা বেগম। ১৯৯১ সাল থেকে সাধারণ সম্পাদিকা হয়েছেন আয়শা খানম। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৪টি জেলায় এবং ১০টি থানায় এই সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে সক্রিয় জেলা শাখা ৩৯টি এবং ১৫টি শাখা সাংগঠনিকভাবে আশানুরূপ সক্রিয় নয়। এছাড়া ৬টি জেলায় সাংগঠনিক যোগাযোগ রয়েছে। ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ীএই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯৫,০০০। সদস্যদের ৮০ শতাংশ শিক্ষিত, ৭০ ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য, ৫ ভাগ উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত। বাকী অংশ গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত নারী সমাজ। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের জাতীয় ধারা থেকে নারী আন্দোলন যেন বিচ্যুত না হয় সে বিষয়ে নারী আন্দোলনের অগ্রণী এই সংগঠন সচেতন রয়েছে।[২১২]

আইন ও শালিস কেন্দ্র

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) একটি আইনী সহায়তা প্রদান ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৬ সালে কয়েকজন সাহসী সমাজকর্মীর সমন্বয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূলত: মানবিক অধিকারের উপর কাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অনুমোদন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। শ্রেণীবিভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য, ধর্মীয়ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করাই আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে আইন ও সালিশ কেন্দ্র যে সকল বিষয়ের উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত করছে তা হলো:

- সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ
- লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা
- নারী অধিকার ও নারী নির্যাতন বন্ধ

---

[২১২]. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

- শ্রম অধিকার।

এছাড়াও তদন্ত বিভাগ, আইনী সহায়তা কেন্দ্র, প্রকাশনা, সভা সমিতি, বিচার সালিশ সমঝোতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও লাইব্রেরী সুবিধা প্রদান করাও তাদের কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত।

নারীপক্ষ

১৯৮৩ সালে নারী আন্দোলনমুখী সংগঠন হিসেবে নারীপক্ষ জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে মহিলা অধিদপ্তর ও এনজিও ব্যুরোর সাথে নিবন্ধন করে। এর সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন। সদস্যরা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের। নারীপক্ষ নারীর অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর অধঃস্তন অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত একটি সদস্যভিত্তিক সংগঠন। নারীর ব্যক্তি অধিকার নিশ্চিত করা, নারীর প্রতি সহিংসতা ও সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীপক্ষ কাজ করছে। সামাজিকভাবে নারীর অংশগ্রহণের উপর বর্তমান সীমাবদ্ধতা দূরীভূত করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব অঙ্গনেই সচেতন, স্বাধীন ও বলিষ্ঠ 'ব্যক্তি' হিসেবে নারীর আত্মপ্রকাশ ও অবাধ চলাফেরার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নারীপক্ষ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

এনজিও ও নারী উন্নয়ন কর্মসূচি

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, আশা, আরডিআরএস, কারিতাস, বিএনপিএস, আইভিএস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং আরো কিছু বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও নারীদের উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন সময়ে এসকল এনজিও উন্নয়ন কর্মসূচী যেমন, Women in Development (WID), Women and Development (WAD), Gender and Development (GAD) নীতি অনুসরণ করে থাকে। বিভিন্ন কর্মসূচী অনুসরণ করে বাংলাদেশে প্রায় তিন শতাধিক এনজিও কাজ করছে।[২১৩] যার কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ব্র্যাক

ব্র্যাক নারীর সামগ্রিক অবস্থানের আলোকে তার কর্মসূচিগুলো নির্ধারণ করেছে। যেমন, ঋণদান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য- এই তিনটি প্রধান কর্মসূচিতে নারী এবং মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণই উল্লেখযোগ্য। ব্র্যাক মনে করে সমাজে নারীর নিম্ন অবস্থানের প্রধান কারণ শিক্ষার নিম্নহার, মজুরি স্বল্পতা, গড় আয়ুর নিম্নহার, সম্পদ এবং তথ্যপ্রাপ্তিতে অপর্যাপ্ত সুযোগ। তাদের অধস্তন অবস্থার জন্য শুধুমাত্র সরাসরি সম্পদের মালিকানার অভাবই দায়ী নয় বরং সমাজের সকল ক্ষেত্রে অধিকতর পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক আদর্শই কর্মক্ষেত্রে ও গৃহে শ্রমের লিঙ্গীয় বিভাজন সৃষ্টি করে থাকে। বেঁচে থাকার মৌলিক শর্ত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ব্র্যাক লক্ষ্য করেছে যে, মহিলাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হলেও নারীর গতিময়তা, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায়, সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার বেশির ভাগই নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষের দ্বারা। এই কারণেই মনে করা হয় নারীর অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা ও সম্পদের সমবন্টন। নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীর অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। এছাড়া কাজের ক্ষেত্রেও কর্মীদের মধ্যে কর্মময় সুসম্পর্ক

---

[২১৩]. ফওজিয়া খন্দকার ইভা, **'বাংলাদেশ জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এনজিওসমূহের ভূমিকা'**, জেন্ডার এবং **উন্নয়নঃ নীতিমালা, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন**, জেন্ডার ট্রেইনার কোর গ্রুপ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮, পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

বজায় রাখা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করে সমতা অর্থাৎ কর্মময় পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য ব্র্যাক নিম্নোক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[২১৪]

- পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন (Positive Discrimination) এর লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক মহিলা কর্মী নিয়োগ;
- সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট বৈষম্য দূর করে কর্মময় পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে (Gender Quality Action Learning) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু;
- গ্রাম পর্যায়ে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের অধিকার ও সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন (Gender and Development) প্রশিক্ষণ চালু;
- সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করা;
- তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যার সাথে জাতীয় সমস্যা সংযুক্ত করা;
- নারী কর্মীদের প্রতি অসম্মান ও কটূক্তিকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা;
- নারী ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার ও বুলেটিন প্রকাশ করা;
- জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সকল কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য Gender Resource Centre Ges Women Advisory Committee গঠন করা; এবং
- প্রধান কার্যালয়ে কর্মীদের সুবিধার লক্ষ্যে ব্র্যাক চাইল্ড সেন্টার বা শিশুকেন্দ্র চালু করা।[২১৫]

প্রশিকা

প্রশিকা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। প্রশিকা বিশ্বাস করে পুরুষতন্ত্র সমাজের মূল সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ফলে, পুরুষতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটাতে হলে নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শুরু থেকেই সমন্বিত বহুমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচির সার্বিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল থেকে নারী-পুরুষ সম্পর্ক সমন্বয়করণ কাজ শুরু করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রশিকার কর্মী ও দলীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন,

- সংস্থার সর্বস্তরের নারী পুরুষের সম্পর্কের সমতা নিশ্চিত করা;
- সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সম-অধিকার, সম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা;

---

[২১৪]. ফওজিয়া খন্দকার ইভা, **জেন্ডার এবং উন্নয়ন: নীতিমালা, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯-৬৩।

[২১৫]. সম্পাদনা: আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

- ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট নারীর সামাজিক পশ্চাৎপদতা, বঞ্চনা এবং তাদের বিশেষ চাহিদাসমূহ বিবেচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং
- নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনে অনুকূল শর্ত ও পরিবেশ তৈরি করা; জেন্ডার ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানিকীকরণ।[২১৬]

কারিতাস

মুলত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় ত্রান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমই এ সংস্থার লক্ষ্য হলেও মানব সম্পদ উন্নয়ন এর প্রধান লক্ষ্য এবং ১৯৭৯ সাল থেকে Development Entension Education Program (DEEDS) বা কর্মসূচি রেখেছে। যাতে ৫০% মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দেখা যায় যে, মহিলা প্রাথমিক গ্রুপ, পুরুষ গ্রুপ অপেক্ষা সঞ্চয় প্রবণতা, শিশু শিক্ষা ও সচেতনতার দিক থেকে দক্ষতা অর্জন করছে। ফলে Integrated Women Development Program (IWDP) কর্মসূচীতে নারীদের ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি স্থির করা হয় যাতে বলা হয়েছে পুরুষতন্ত্র অথবা পুরুষাধিপত্য মূলক সামাজিক বৈষম্যপূর্ণ নারী অবস্থানের জন্য দায়ী। ব্যক্তি পুরুষ নারী উন্নয়নে প্রতিবন্ধক না হলেও পুরুষাধিপত্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষ সহায়তা করতে পারে। কারিতাস এর কর্মসূচি নিম্নরূপ:

- অধিকাংশ কর্মী নারী ও কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে নারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নারীদের সচেতনতা ও বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;
- আয় বৃদ্ধি ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করা;
- তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যার সাথে জাতীয় সমস্যা যুক্ত করা;
- নারী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আন্দোলন সংগঠিত করা;
- জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কিশোরী ও শিশুদের হার বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা;
- আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহায়তা প্রদান করা; এবং
- নারী ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার, বুলেটিন প্রকাশ করা এবং নারী সংগঠনসমূহকে নিয়ে নেটওয়ার্কিং তৈরি করা।[২১৭]

পরিশেষে বলা যায়, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে যুক্ত কয়েক শত সংগঠন গ্রামবাংলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,

---

[২১৬]. সম্পাদনা: আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৮-২১৯।
[২১৭]. সম্পাদনা: আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৯-২২০।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার পরিষদ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, মহিলা আইনজীবি সমিতি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নারী প্রগতি সংস্থা, মহিলা সমিতি, নারীপক্ষ সহ বহু এনজিওর নাম উল্লেখ্যযোগ্য। নারী প্রগতি সংগঠন ও এনজিওগুলি ইস্যুভিত্তিক জোট তৈরী করে ১৯৮৭ সালে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বেইজিং সম্মেলনের প্রস্তুতি কাজকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় ২২০টি সংগঠনের ফোরাম। ১৯৯৫ সালে ইয়াসমিন হত্যা ও অন্যান্য ইস্যুতে 'সম্মিলিত নারী সমাজ' গঠিত হয়েছে। এই ফোরাম থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও সমঅধিকারের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন দাবি তোলা অব্যাহত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা

১ম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যা

২য় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ

ইসলাম শান্তি ও প্রগতির ধর্ম। এই ধর্মে নারী পুরুষ উভয়কেই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত নাগরিক হিসাবে সমান মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এদেশে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী জাতি চরমভাবে লাঞ্চিত, নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত। নারীরা এতটায় বঞ্চিত যে বাধ্য হয়ে নারী সমাজ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ঘরে বাইরে বিভিন্নভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরও নারী নির্যাতনের মাত্রা কমছে না বরং নতুন নতুন নির্যাতন কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে এবং নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়ার কারণে শতভাগ ইসলামী আইন কানুন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ মুসলিম হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে জীবনের সকলক্ষেত্রে ইসলামী আইন বাস্ত বায়িত হয়নি। ইসলামী দিকনির্দেশনা এবং নারীদের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আলেমসমাজ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিরা ধর্মের বিধান বাস্ত বায়নে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়াতে, সভা-সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়াও নারী অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পুস্ত ক প্রকাশিত হচ্ছে। এতসব প্রচেষ্টার ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামে যে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও পত্র-পত্রিকায় নারীদের দুর্দশা, নির্যাতন, অধিকার বঞ্চনার ইতিহাস প্রতিনিয়তই যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে তাতে মনে হয় নারীরা এখনও সেই অন্ধকারের তিমিরেই অবস্থান করছে। এ অবস্থা শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালেও একইরূপ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ইসলামী দেশগুলোতেও এখনও ইসলাম প্রদত্ত অধিকার নারীরা অনেকটাই ভোগ করতে পারে না। বাংলাদেশের নারীরা ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে পারছে না কারণ ইসলাম নারীদের যেসকল অধিকার দিয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্ত বায়নের সমস্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়া

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র। অর্থাৎ এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। বাংলাদেশ পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়ায় ইসলামী আইন শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এদেশে বিভিন্ন মতাদর্শের লোক বসবাস করে। বিশেষ করে রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা অবস্থিত ধর্মীয় বিষয়ে তাদের অনেকটা উদাসীনতার কারণেই ইসলাম প্রদত্ত বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এরূপ প্রচারও সমাজে প্রচলিত আছে যে, ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হলেও ইসলামী আইন বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকা ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

ধর্মের বিধান পালনে অনীহা

বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, উচু-নীচু সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ধর্মের সঠিক মূল্যায়ন ও তা অনুসরণে ব্যাপকভাবে আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে শুধু নামায ও রোযা পালনের মধ্যেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী ও পালনীয় বিষয়ে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে এখনও এবিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ হচ্ছে না। তাছাড়া ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তার প্রচারণাও সীমিত। অপরদিকে ধর্মের কিছু কিছু বিধান সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যা সার্বিকভাবে ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। যার ফলে ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি দুর্বলতা ও কুসংস্কারের প্রভাব

বাংলাদেশে সমাজব্যবস্থায় জনগণ সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি দৃঢ়ভাবে পালন করে। প্রচলিত রীতিনীতি যাই হোক না কেন তারা এটি পালনে জন্মসুত্রে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে এবং একে সাধারণ মানুষ এক ধরণের সামাজিক অলিখিত আইনের মত পালনীয় মনে করে। অন্যদিকে কুসংস্কার বহুক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যাবলীকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে। বস্তুত নারীর অধিকার ও মর্যাদা সমাজ ও পরিবারের প্রচলিত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়, ধর্ম বা দেশের আইনে যাই থাক না কেন তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার ও সমাজে অগ্রহণীয় ও অগ্রাহ্য হয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, প্রচলিত রীতি নীতি পালনের দুর্বলতা ও কুসংস্কারের কারণেও ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাংলাদেশে বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাব

বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। এই রক্ষণশীলতা নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। কখনও কখনও দেখা যায় পরিবারের ন্যুনতম চাহিদা মেটাতে সুষ্ঠু পরিবেশে মাঠ বা বাইরের কোন কাজে নারীর প্রবেশের পথে পরিবারের পক্ষ থেকে বাধা দেয়া হয়; অধিকাংশ পরিবারে নারীকে কেবল সন্তান জন্মদান ও লালন পালন এবং গৃহকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যদিও গৃহকর্ম ও সন্তান পালন নারীর কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত তার অর্থ এই নয় যে নারী অন্য কোন কাজে যোগ দিতে পারবে না। বরং শরীয়তের সীমার অন্তর্ভূক্ত সকল কাজে অংশগ্রহণের অধিকার ও অনুমতি ইসলাম নারীকে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের পারিবারিক রক্ষশীলতা নারীর জন্য ইসলাম প্রদত্ত অধিকার বাস্ত বায়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

ইসলামী আদর্শ ও আইনের বাস্তবায়ন না থাকা

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও আদর্শের বাস্তবায়ন নেই। মুসলিম পরিবারগুলোও সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শের অনুসারী নয়। এমনও দেখা যায় কোন কোন পরিবারে ইসলামী আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং পুরো পরিবার ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত রয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একদিকে ইসলামের পারিবারিক আদর্শ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাজনিত রক্ষণশীলতা এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যাধুনিকতা মুসলিম সমাজের পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই বলা যায় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আদর্শ ও আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকাই ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা।

সুশিক্ষার অভাব

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একদিকে নারীশিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও পরিকল্পনার অভাব রয়েছে, অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে কর্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্যহীনতা প্রতীয়মান হচ্ছে। তাছাড়া নৈতিক শিক্ষার স্বল্পতা, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বহীনতা ইত্যাদি কারণে পাঠ্যসূচী অবৈজ্ঞানিক ও প্রয়োজনীয় বিষয় বহির্ভূত বলে প্রমানিত হচ্ছে। এরফলে আগামী প্রজন্ম সঠিক শিক্ষা বা সুশিক্ষার অবাবে নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা গ্রহণ করতে পারছে না। তাই নর-নারীকে সুশিক্ষিত করতে পারলে, তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দিতে পারলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য করণীয় ও পালনীয় বিষয় সম্পর্কে ইসলামের বিধানাবলী শিক্ষা দিতে পারলে এবং প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

সম্যক অবহিত করতে পারলে তারা একদিকে তাদের মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে অন্যদিকে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে ধারণা পায়, যা ব্যক্তি, দেশ ও জাতির কল্যাণে উন্নত ভুমিকা রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু বাংলাদেশের সুশিক্ষার অভাব থাকার কারণে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে দেশ ও জাতির জন্য নর-নারীর কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুশিক্ষার অভাবের কারণে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

সামাজিক বিধি নিষেধ

পুরুষ ও নারীর ভূমিকা, দায়িত্ব, ধর্মীয় বিধান ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত ও পালনীয় না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে চলমান সমাজব্যবস্থায় পুরুষদের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমাজপতিরা সমাজে বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। বস্তুত নারী সমাজকে উপেক্ষা করে কোনরূপ রীতি-নীতি চালু করা বা অনুসরণ করা সহজ নয়, বিশেষ করে এগুলো নারীদের মর্যাদা, কার্যাবলী ও অধিকার সম্বলিত হলেও। তাই ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে সামাজিক বিধি নিষেধ।

রাষ্ট্রের অমনোযোগীতা

ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও মর্যাদা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অমনোযোগীতা একটি অন্যতম সমস্যা। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন, সংবিধান এর ধারা ও সুপারিশ সম্পর্কে রাষ্ট্র কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা কার্যকর করার প্রতি বাংলাদেশসহ অনেক দেশের সরকারের আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রে ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যে বিধান দেয়া আছে, রাষ্ট্র তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য না করে বিভিন্ন সংস্থা প্রস্তাবিত সুপারিশকেই অগ্রাধিকার দেয়। ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ও আইনগতভাবে ইসলামী বিধান গৌণ হয়ে যায়। এরফলে সমাজ ও নারী ইসলামী আইনের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়

ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরে মূল্যবোধের অবক্ষয় একটি অন্যতম সমস্যা। বলা যায় ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সমাজের সর্বস্তরের মূল্যবোধ বর্তমানে অতি নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য না করা, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য না করা, নৈতিক-অনৈতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য না করা, ভাল কাজের মূল্যায়ন না করা, মন্দ কাজকে ঘৃণা না করা, নীতিবোধ জাগ্রতকরণ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় এত ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যে ব্যক্তি সৎকাজ করছে সে অপমানিত ও বিপদগ্রস্ত হচ্ছে আর যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করছে সে পুরস্কৃত হচ্ছে। এরফলে সমাজে সৎলোক ও সৎকর্মের অভাব দেখা দিচ্ছে এবং দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। নারীর মর্যাদা বর্তমানে অনেকটাই এই দুষ্টচক্রের আবর্তে আবর্তিত। ভোগ, লালসা নারীকে অনেকক্ষেত্রেই পণ্য করে তুলেছে। যার ফলে সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্ষণ, ব্যভিচার, নারীহত্যা, তালাকের মত গর্হিত অপরাধ। নারীকে এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করা সমাজের সামগ্রিক মুল্যবোধের উন্নয়ন ব্যতিত অসম্ভব।

সমাজে পুরুষের প্রাধান্য

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর চেয়ে পুরুষদের প্রাধান্য ব্যাপক। তাছাড়া বেশিরভাগ পুরুষই নারীদের মর্যাদা ও অধিকার সচেতনতার ক্ষেত্রে আন্তরিক মনোভাব ও উদারতা দেখাতে পারে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র পুরুষের ব্যাপক প্রাধান্য ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। যার ফলে অনেকক্ষেত্রে নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে রত হয়। তাছাড়া একশ্রেণীর অধিক নারী প্রগতিবাদী সম্প্রদায় আছেন যারা ইসলামের বিধানে সন্তুষ্ট নয় তারা নারীকে প্রগতির নামে বিপথে পরিচালনার চেষ্টা করে। নারীদের মধ্যে এই দ্বিধাবিভক্তি থাকার কারণে

Dhaka University Institutional Repository

নারী প্রগতি আন্দোলন কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এবং নারী প্রকৃত ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অপসংস্কৃতির প্রভাব

বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নারী-পুরুষ বহুলাংশে নীতি বিবর্জিত সুস্থ সংস্কৃতি হতে দূরে সরে গিয়েছে। অপসংস্কৃতি তথাকথিত নারীমুক্তি ও প্রগতির নামে নারী সমাজকে করছে বিপথগামী। নারী তার মূল স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে বেহায়াপনা নির্লজ্জতার গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। আর এক শ্রেণীর অসাধূ ব্যবসায়ী নারীকে ব্যবহার করে তাদের ব্যবসার মুনাফা বৃদ্ধি করছে। ধর্মীয় রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে অপসংস্কৃতির প্রভাবে দেশ, সমাজ ও নারী জাতি ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলাম প্রদত্ত বিধান তাদের কাছে প্রগতির পথে বাধা মনে হচ্ছে এবং একশ্রেণীর নারীরা অন্ধ প্রগতির মোহে ইসলামের এই বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যেসকল অপসংস্কৃতি বাংলাদেশের নারীকে বিপথগামী করছে তা নিম্নরূপ:

সুন্দরী প্রতিযোগীতা[১]

গত কয়েক বছর ধরে বিদেশী ধারার প্রভাবে বাংলাদেশে সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজন শুরু হয়েছে। এক শ্রেণীর যুবতী কন্যারা নিজের রূপ সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিসর্জন দিচ্ছে মুসলিম ঐতিহ্য এবং চারিত্রিক পবিত্রতা। তথাকথিত সুনাম সুখ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করার জন্য বর্তমানে তরুণী সমাজ নিজের রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ও বিক্রির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা মেয়েদের সৌন্দর্য্যকে পোশাক ও সতরের সীমারেখা দ্বারা ঢেকে রাখতে বলেছেন।[২]

অশ্লীল চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা খুব সহজেই সাধারণ মানুষের নিকট তথ্য পৌঁছানো যায়, তাই এর ব্যাপ্তিও ব্যাপক। চলচ্চিত্র হচ্ছে নাটক, সাহিত্য সর্বোপরি মানব সংস্কৃতির একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ বিনোদন লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে অশ্লীলতা চলচ্চিত্র শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সৃজনশীল ছবি তৈরির পরিবর্তে কুরুচিপূর্ণ নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল ছবি তৈরী হচ্ছে। আর এই অশ্লীলতা বৃদ্ধিতে নারীরা মুখ্য ভুমিকা পালন করছে। এসব অশ্লীল চলচ্চিত্রের প্রভাবে সমাজে উচ্ছৃংখলতা, ধর্ষণ, অপহরণ, পরকীয়া প্রেম, নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদকাসক্তির মত অপকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। এরফলে নারী তার সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার হারাচ্ছে, যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে সর্বোপরি দেশ ও জাতির সুস্থ স্বাভাবিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

অশ্লীল সাহিত্য

সুস্থ ধারার সাহিত্য মানুষকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়। সাহিত্যে সমাজেরই বাস্তব চিত্র অংকিত হয়ে থাকে। সাহিত্যে সমাজের চালচিত্র, রীতিনীতি, বিধি বিধানের বাস্তব চিত্রই ফুটে ওঠে। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে যা বলা যায় না, সাহিত্যেও তা শোভা পায় না। যদি তা করা হয় তাকে সামাজিক ভাবে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশের একশ্রেনীর অসাধু সাহিত্যিক তাদের বইয়ের বিক্রি বৃদ্ধির

---

[১]. ১৯৫১ সালে লন্ডনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এরপর ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পর্যায়ক্রমে এই সুন্দরী প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ বাংলাদেশেও এই প্রতিযোগীতার আয়োজন শুরু হয়েছে। বিশ্ব সুন্দরীা প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব হল এক ঝাক নারীর অঙ্গশোভা প্রদর্শন। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৪-২৪৫)।

[২]. তোমরা গৃহাভ্যন্তরে আবস্থান করবে। মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত পবিত্র রাখতে। (আল কুর'আন, **সুরা আল আহযাব**, আয়াত: ৩৩)।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য অসুস্থ ধারার সাহিত্য রচনা করছে। এগুলোকে সাহিত্য না বলে সমাজ ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র বলা যায়। কিশোর কিশোরীরা এরূপ সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক। সাহিত্যের এসব অসুস্থ ধারা ও অশ্লীলতা একটি সুস্থ্য সমাজকে অসুস্থ করে তোলে। ক্রমান্বয়ে তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য আধুনিকতার নামে কবিতা সাহিত্যে অশ্লীলভাবে নারী চরিত্রের উপস্থাপন, অশ্লীল প্রেমের কাহিনী রচিত হচ্ছে। এক শ্রেণীর আসাধু ব্যবসায়ী বিদেশী পত্রিকার আদলে এদেশেও বিভিন্ন নগ্ন অর্ধনগ্ন ছবি সম্বলিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা বের করছে। এর বিরূপ প্রভাব সমাজে পড়ছে এবং যুবসমাজ বিপথগামী হচ্ছে।

ফ্যাশন শো

সুন্দরী প্রতিযোগীতার পাশাপাশি নারীর শরীর প্রদর্শনীর আরেক প্রক্রিয়া হচ্ছে ফ্যাশন শো। বর্তমানে রাজধানীর অভিজাত হোটেল ও প্রতিষ্ঠানে ফ্যাশন শো এর আয়োজন করা হচ্ছে। এসব ফ্যাশন শোতে নারীরা শত শত পুরুষের সম্মুখে স্বল্প পোশাক পরে আধো আলোতে যাত্রা ও নৃত্যের তালে তালে উপস্থিত হচ্ছে।

গানের আসর

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে গানের আসর বসানো হয়। বিশেষ করে অভিজাত হোটেল বা এলাকায় এসব গানের আসর বসে যেখানে অশ্লীলতার উপস্থিতি থাকে। অনেক রাত অবধি চলে এসব উৎসব। এসব উৎসবে তরুণ তরুণীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞাপনে নারী

বর্তমানে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তাদরে পণ্য বিপণনের উদ্দেশ্যে নারী দেহকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অশালীন এবং অশ্লীল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করছে। যা নারী সমাজের মর্যাদার জন্য হানিকর এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিপন্থি। নারীরা অর্থের বিনিময়ে এসব ব্যবসায়ীর হাতের পুতুল হয়ে যা বলছে তাই করছে। অথচ নারী তার দেহকে বাইরের কদর্যতা থেকে আড়াল করে রাখবে এটাই ইসলামের শাশ্বত বিধান।

পরিশেষে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল মুসলিম রাষ্ট্র। এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আর এই নারীরা উপরোক্ত সমস্যাবলীর কারণে ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণের প্রবণতা রোধ করতে হবে এবং ইসলাম প্রদত্ত দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতিবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে যখনই বিপর্যয়ের অমোঘ কালোছায়া নেমে এসেছে তারপরেই সমস্ত কালো মেঘকে দূরীভূত করে সূর্য উদিত হয়েছে। তাই আলো যেমন চিরস্থায়ী নয় তেমনি অন্ধকারও চিরস্থায়ী নয়। দিনের শেষে যেমন রাত আসে আবার রাতের শেষে দিন আসে, এটা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপরিসীম কুদরত। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন সমস্যার কারণে নারী সমাজ অবহেলিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও ইসলাম প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন সমস্যার কারণে যেমন নারীদের এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তেমনি এই অবস্থা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক দিক নির্দেশনা। নিম্নে উল্লেখিত দিক নির্দেশনাগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করলে বাংলাদেশে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতি বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্ভব।

প্রথমত: নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা, যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথমটি হল, নারী যেন সর্বোত্তমরূপে সন্তানাদি ও গৃহের তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং রাসূল (স.) এর বাণীর[৩] তাৎপর্য অনুসারে বিয়ের পর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্য হয়ে ওঠে। আর দ্বিতীয়টি হল, উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনের মূহুর্তে তার যথাযথ সেবা গ্রহণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত: নারীর কর্তব্য নিজের মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদক ও কল্যাণকর উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং যৌবন, পৌঢ়তা ও বার্ধক্যের যে কোন পর্যায়ে বা কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা, যে কোন অবস্থাতেই কর্ম করার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে। কোন নারী যদি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে তৈরী করতে পারে তাহলে বিপদগ্রস্ত হলে তাকে অন্যের উপর নির্ভরশীল বা করুণার পাত্র না হয়ে নিজের বিপদ নিজেই মোকাবেলা করতে পারবে। আর কর্মহীন বা বিপদগ্রস্ত নারীর জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব তেমনি নারীর নিজেকে তৈরী করতে সহযোগীতা করা বা পরিবেশ তৈরী করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

তৃতীয়ত: আল্লাহ বলেছেন, "পুরুষ নারীর জন্য ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এজন্য যে পুরুষ নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে।"[৪] সুতরাং বিবাহের পূর্বে কন্যার ব্যয়ভার পিতা বহন করবে, বিবাহের পর স্ত্রীর ব্যয়ভার স্বামী বহন করবে, যদি পিতা বা স্বামী মৃত্যুবরণ করে বা অক্ষম হয় এবং স্ত্রী বা কন্যার আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করার মত সক্ষম কাউকে রেখে না যায় তাহলে রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করবে।

চতুর্থত: মুসলিম নর-নারীর নিজের পবিত্রতা রক্ষা ও পবিত্র এবং চরিত্রবান সমাজ গঠনের জন্য বিবাহযোগ্য হলে বিয়ে করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব মুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যশালী এবং মহাবিজ্ঞ। আর যারা বিয়ের সুযোগ পাবে না, তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে

---

৩. "নারী তার স্বামীর পরিবারের সবার তত্ত্বাবধায়িকা। সেই তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।" (**সহীহ বুখারী**, আহকাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বানী, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসুলের আনুগত্য করো ও তোমাদের 'উলুল আমর' বা কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের আনুগত্য করো, ১৬ খন্ড, পৃ: ২২৯)।

৪. আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ধনী বানিয়ে দেন।"[৫] সঠিক সময়ে বিবাহ করলে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজে সুন্দর মানসিক স্বাস্থ্য ও উত্তম নৈতিক চরিত্র লাভ করতে পারে।[৬] এরফলে নারী-পুরুষ উভয়েই উপকৃত **হবে**, সমাজ থেকে খুন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদ ঘটবে এবং নারী নির্যাতন বন্ধ হবে।

পঞ্চমত: পরিবারের আর্থিক সামর্থ ও সমাজের প্রয়োজনের গন্ডির মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজ তাকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখুক তা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়। তবে পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে নারীর জন্য পেশাগত কাজ করা 'মানদুব' বা বৈধ। যথা: দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা, মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা, কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা ইত্যাদি। তবে দুটি অবস্থায় পেশাগত কাজ করা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। **এক.** পরিবারের জন্য উপার্জনশীল ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য। **দুই.** মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে নারীদের জন্য ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহ আদায় করা। এ অবস্থায় পরিবার ও সন্তান সন্ততির প্রতি দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ যথাসম্ভব করার জন্য নারীরা চেষ্টা করবে।

ষষ্ঠত: সাধারণভাবে সব নারী পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সমাজ যে কোনদিক দিয়েই মুসলিমদের জন্য আদর্শবাদী ও কল্যাণকর সমাজ হতে পারে না সে সম্পর্কে মানুষের সম্যক ধারণা অর্জন করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সপ্তমত: ইসলামে নারী ও পুরুষের মেলামেশা করা, দেখা-সাক্ষাৎ করার একটা নীতি ও সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে।[৭] মুসলিম সমাজের নারী ও পুরুষকে সেই নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে।

অষ্টমত: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী ও পুরুষকে ভিন্ন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাই শারিরীকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। শারিরীক পার্থক্যের মত নারী ও পুরুষের কর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেও কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের রীতি নীতি অনুসারে নারী ও

---

[৫]. আল কুর'আন, **সূরা আন নুর,** আয়াত: ৩২-৩৩।

[৬]. পেশাগত কাজ যদি নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখে বা বিনা প্রয়োজনে বিলম্বিত বিবাহের কারণ হয়ে দাড়ায় তাহলে তা নারীর জন্য হারাম বলে গণ্য হবে। অপরদিকে কোন পেশাগত কাজ যদি তার বিবাহ সম্পাদনে সহায়ক হয় তাহলে সেটা হয়ে তার জন্য বৈধ কাজ। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, হে যুব সমাজ! যাদের বিয়ে করার সামর্থ রয়েছে তাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ তা দৃষ্টি আনতকারী এবং গুপ্তাংগের হিফাজতকারী। (**সহীহ বুখারী**, যার বিয়ে করার সামর্থ নেই সে রোযা রাখবে অধ্যায়, ১১ খন্ড, পৃ: ১৩)।

[৭]. পুরুষের সাথে মেয়েদের দেখা সাক্ষাতের নিয়মাবলী আল কুরআনের আলোকে নিম্নরূপ:

ক) দৃষ্টি সংযম: এ ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তাদের জন্য উন্নত চরিত্র গঠনের এটিই উত্তম পন্থা তারা যাই করুক না কেন, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। অন্যদিকে মুমিন মেয়েদের বলে দাও, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।"(আল কুরআন, **সূরা আন নুর**, আয়াত: ৩০-৩১)।

খ) দুই হাতের কবজি ও মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীরই আবৃত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ: আল্লাহ বলেন, "মুমিন মেয়েরা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে, কেবল যেটুকু স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে পড়ে তাছাড়া। তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখে।"(আল কুরআন, **সূরা আন নুর**, আয়াত: ৩১)।

গ) মেয়েদের গতিবিধি ও চালচলনে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা: আল্লাহ বলেন, "মেয়েদের বলে দাও তারা যেন জমিনে পা ঠুকে শব্দ করে চলফেরা না করে, তাদের আবৃত ও সংরক্ষিত সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে।"(আল কুরআন, **সূরা আন নুর**, আয়াত: ৩১)।

ঘ) পর পুরুষদের সাথে প্রয়োজনবোধে অ-আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলা: আল্লাহ বলেন, "তোমরা অন্য পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে লম্পট চরিত্রের লোকেরা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে। তাই প্রয়োজনে তাদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ ও অনাকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বল।"(আল কুরআন, **সূরা আল আহযাব**, আয়াত: ৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। এবং একজনের অধিকার অন্যজন খর্ব করবে না।

নবমত: সমাজে বেশী বয়স পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে অবিবাহিত থাকার প্রবণতা বন্ধ না করলে অনেক সামাজিক অনাচার বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তাই বিয়েকে শুধু সহজসাধ্য নয় বরং ছেলে মেয়ের বিবাহের বয়স হলে এবং ছেলেরা স্ত্রী পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করলে অবিলম্বে বিয়ে অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে, সেজন্যে পারিবারিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অবিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে না। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ পালনে বাধ্য করতে উভয়কেই শরীয়তের বিধিবিধান মেনে বিবাহ করা উচিত।[৮] এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব অপরিসীম। আবার একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রেও শরীয়তের দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।[৯] তাহলেই পরিবারিক বিশৃংখলা প্রতিরোধ করা এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব হবে।

দশমত: বর্তমান সমাজে বিধবা নারী পুনর্বিবাহের প্রচলন সাধারণ পর্যায়ে না হলেও উচ্চ পর্যায়ে পরিত্যক্ত হতে যাচ্ছে। আর এর দরুণ নৈতিক ও পারিবারিক দিক দিয়ে দেখা দিচ্ছে অনেক বিপর্যয়। অথচ বিধবা বিয়ের বিধান বিশ্বের সকল নারীর জন্য ইসলামের এক বিশেষ অবদান। বর্তমানে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী দ্বিতীয় বিবাহ করতে অনীহা প্রকাশ করছে। অনেকক্ষেত্রে তালাক প্রাপ্তা নারী পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশত: দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাই না। আবার বিধবা নারীর সন্তান থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে বা লোকলজ্জার ভয়েও দ্বিতীয় বিবাহ করতে অপছন্দ করে। নারীদের এরূপ ভাবধারার পরিবর্তন করতে হবে।

একাদশতম: সমাজে বিনোদনের নামে যে সকল নাচ, গান, সিনেমা, নাটক, টেলিফিল্ম তৈরী করা হয় তার অধিকাংশই অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ থাকে। যা উঠতি তরুণ-তরুণীদের মৌলিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। তাই অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ এরূপ বিনোদনের মাধ্যমকে চিরতরে বন্ধ করতে হবে। বর্তমানে মানবজাতি প্রযুক্তির সর্বোচ্চসীমায় অবস্থান করছে এবং নিজেদেরকে সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত করছে। অথচ সভ্যতার অন্যতম অবদান কম্পিউটার এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতির জন্য ভয়ানক অসভ্য কাজকর্ম করছে। অর্থাৎ ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে কিছু কিছু ওয়েবসাইটে নারী পুরুষের পোশাকবিহীন ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। যা যুবসমাজকে ধ্বংস করছে। তাই প্রযুক্তির নামে এধরণের অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে।

দ্বাদশতম: বর্তমান সমাজে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত ব্যভিচারের শাস্তি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই একশতটি বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। আর তাদের শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।"[১০] সুতরাং ইসলামী আইন কার্যকর করলে সমাজ থেকে ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে।

ত্রয়োদশতম: সম্পদ উপার্জন, ব্যয় ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের যেসকল অধিকার প্রদান করেছে তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

[৮]. কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "এবং তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা ওদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (আল কুর'আন, **সুরা আর রূম**, আয়াত: ২১)।

[৯]. আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি আশংকা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার আর যদি আশংকা কর যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীকে।" (আল কুর'আন, **সুরা আন নিসা**, আয়াত: ৩)।

[১০]. আল কুর'আন, **সুরা আন নুর**, আয়াত: ২।

Dhaka University Institutional Repository

চৌদ্দশতম: শিক্ষার অগ্রগতি এবং পেশাগত কাজ ও সামাজিক তৎপরতায় বহুসংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের সাথে সাথে নারী ও পুরুষের জন্য সকল পর্যায়ে শিক্ষার বৈচিত্র ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ধর্মঘট ও মিছিলে অংশগ্রহণ অথবা ট্রেড ইউনিয়ন এবং আইনসভার নির্বাচনে ভোটদান অথবা ঐসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কিংবা রাজনৈতিক দল ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে নিজেকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে বহুসংখ্যক নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

পঞ্চদশতম: আধুনিক সমাজের জটিলতার কারণে মেয়েদের জীবনের জটিলতা ও তার সাথে সম্পর্কিত নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় আঞ্চলিক সংগঠন ও আইনসভায় মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, "মুনাফিক নর-নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয় ও ভাল কাজে নিষেধ করে...আর ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে।"[১১]

ষষ্ঠদশতম: নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণে পরিবার গঠিত হয়। অথচ এই পরিবারেই নারীরা সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়। তাই পরিবারে নারী নির্যাতন বন্ধ করে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।[১২] সকল কাজ স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে করলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, যৌতুকের মত ঘৃণ্য কাজ বন্ধ করতে হবে।

সপ্তদশতম: ইসলাম প্রদত্ত পর্দা-প্রথার বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে (সংযত রাখে) বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। আর হে নবী! মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলে (সংযত রাখে) এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলো হেফাযত করে আর তাদের সাজসজ্জা (লোকদেরকে) দেখিয়ে না বেড়ায় যা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। এবং তারা যেন স্বীয় বক্ষের উপর চাদর টেনে দেয় এবং সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। ঐ সকল লোক ব্যতীত, যথা: স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, তৎপুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র, বোনপুত্র, আপন স্ত্রী লোকগণ, স্বীয় দাস, নারীর প্রতি স্পৃহাহীন সেবক এবং ঐ সকল বালক যারা নারীর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়নি। উপরন্তু তাদেরকে আদেশ করুন যে তারা যেন পথ চলার সময় এমন পদধ্বনি না করে, যাতে তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য্য পদধ্বনিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"[১৩] সুতরাং নারী-পুরুষ উভয়েই যদি ইসলাম প্রদত্ত পর্দা প্রথা মেনে চলে তাহলে নারী নির্যাতন অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আর নারী নির্যাতন কমলেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

---

[১১]. আল কুর'আন, **সুরা আত তাওবা**, আয়াত: ৬৭-৭১।

[১২]. কুর'আন মজীদে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, "স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।" আল কুর'আন, **সুরা আল বাকারা**, আয়াত: ২৩৩। আল্লামা আহ্‌মাদুল মুস্তাফা আল-মারাগী এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, কুর'আন মজীদ সন্তান পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতা-মাতার একজনকে অপরজনের উপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি-এ কথা যদি চিন্তা ও লক্ষ্য করা হয় তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়। (আল্লামা আহ্‌মাদুল মুস্তাফা আল-মারাগী, **তাফসীরে আল-মারাগী**, ২য় খন্ড, দারুল ফিক্‌র, পৃ: ১৮৮)।

[১৩]. আল কুর'আন, **সূরা আন নূর**, আয়াত: ৩০-৩১। এ আয়াতদ্বয়ে পর্দার মৌলিক বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা, যৌন পবিত্রতা রক্ষা করা অর্থাৎ সতর ঢেকে পোশাক পরা, কুরআনে বর্ণিত কতিপয় সম্পর্কের পুরুষ (যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে পর্দা করা, সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা, পথ চলার সময় বিণীতভাবে পা ফেলা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টদশতম: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী দিক নির্দেশনা অনুসরণ করলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনে ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ সম্ভব হবে।[১৪]

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করে সমাজ থেকে যা কিছু মন্দ তা বিলুপ্ত করে যা কিছু মানবজাতির জন্য কল্যাণকর তা বাস্তবায়ন করলেই কেবল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টি নারীজাতির জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। বর্তমান পৃথিবী সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহন করেছে। কিন্তু সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী জাতি অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। অথচ মানুষ হিসেবে নারীর মূল্যবোধ প্রতিষ্টা না করে, ন্যায়-নীতি প্রতিষ্টা না করে মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই সর্বতোভাবে ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে একে কার্যকর রূপ দানে সচেষ্ট হওয়া উচিত, যাতে সার্বিকভাবে মানবজাতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হয়। এক্ষত্রে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপদেশাবলী মেনে চলাই সবচেয়ে উত্তম পন্থা। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (স.) বলেছেন, "হে মানবগণ, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা (হযরত আদম) এক। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের কিংবা সাদা মানুষের উপর কালো মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ জাতি বা বর্ণ বিভেদ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। একমাত্র আল্লাহভীতিই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। যে যত অধিক আল্লাহভীরু ও পরহেযগার সে তত অধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"[১৫] "নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।"[১৬] "নিশ্চয়ই তোমাদের যেমন নারীদের উপর হক (অধিকার) আছে, তদ্রুপ নারীদেরও তোমাদের উপর অধিকার আছে।"[১৭] "আমি তোমাদের নিকট এমন দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যার অনুসরণ করলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর গ্রন্থ পবিত্র কুর'আন এবং অন্যটি আমার সুন্নাহ।"[১৮] আর এই মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিশ করেছে, পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন পারিবারিক, সামজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

---

[১৪]. কুর'আন মজীদে আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেসব লোকের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন; তারা হচ্ছে আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। যারা এদের সঙ্গী-সাথী হবে, তাদের পক্ষে এরা কতই না উত্তম সঙ্গী! (আল কুর'আন, **সুরা আন-নিসা**, আয়াত: ৬৯)।

[১৫]. মাওলানা শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী**, ২য় খন্ড, (আযমগড়: মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিজরী), পৃ: ১৫৪।

[১৬]. **সহীহ্ মুসলিম**, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৯৭।

[১৭]. ইবন্ হিশাম, **আস্‌সীরাতুন্ নববিয়্যা**, ২য় খন্ড, (বৈরুত: 'উলূমুল কুর'আন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯), পৃ: ৬০৪।

[১৮]. **সহীহ্ মুসলিম**, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মবিশ্বাস, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিমালা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রভাবশীল বা প্রভাবহীন হওয়া মূলতঃ ঈমান ও আকীদার দৃঢ়তা ও তদনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতার উপর নির্ভরশীল। আর তদনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একজন পুরুষের মতই দায়িত্বশীল। আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে উভয়ের গুরুত্ব সমান। তাছাড়া ইসলামে পুরস্কার ও প্রতিফল লাভের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে ভিন্নচোখে দেখা হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আ:) ও হযরত হাওয়া (আ:) কে সৃষ্টি করে উভয়কে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং উভয়কে নির্দিষ্ট গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ অমান্য করে তারা উভয়েই নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করলেন। অর্থাৎ ঈমানের দৃঢ়তা ও তদনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতা থেকে তারা উভয়েই বিচ্যুত হলেন। অথচ ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম ও সমাজে তাঁদের এই অপরাধের জন্য শুধু হযরত হাওয়া (আ:) কে দোষারোপ করা হয়। অথচ কুর'আনে সূরা 'ত্বা-হা'র ১১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমি ইতিপূর্বে আদম থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু আদম সে অঙ্গীকার ভুলে যায়। আমি সে ব্যাপারে তারমধ্যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিনি।" তাই আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অমান্য করার অপরাধে শুধু হযরত হাওয়া (আ:) কে দোষারোপ করা ইসলামসম্মত নয়।

বর্তমান যুগে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় দাবীদার পাশ্চাত্য সভ্যতা। অথচ এসব দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতায় নারী ছিলো চরম নির্যাতিত ও অবহেলিত। সেখানে এমন কোন দৃঢ় আইন ছিল না যা নারীদেরকে পুরুষের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করতে পারতো। বরং কোন কোন সমাজ ও সভ্যতায় নারীকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীব হিসেবে গণ্য করা হতো। পরিবার ও সমাজে মানুষ হিসেবে নারীর কোন মর্যাদাই স্বীকৃত ছিল না। অর্থনৈতিক দিক থেকেও নারীরা ছিল বঞ্চিত। নারীদের স্বাধীনভাবে স্বামী নির্বাচন এবং স্বামী বা পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ছিল না। স্বামীর শত অত্যাচার-অনাচার, হাজারো নিপীড়ন তাদেরকে মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হতো। মোটকথা নারীকে সেবাদাসী হিসেবে গণ্য করা হতো। মানুষ হিসেবে নারীরা কোন মর্যাদার স্বীকৃতি পেত না। চীন সভ্যতায় নারীকে দু:খের প্রস্রবন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রোম সভ্যতায় নারীর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল এবং নৈতিক চরিত্র, সামাজিক বন্ধন এতটাই শিথিল হয়ে পড়েছিল যে, কাম প্রবণতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্লাবনে রোম সমাজ নিমজ্জিত ছিল। আর এটাই রোম সমাজকে পতনের দিকে ধাবিত করে।

প্রাচীন ভারতে বহু স্ত্রী গ্রহণ, নারী ও শিশু হত্যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সতীদাহের নামে নারীকে জীবন্ত দাহ করা হতো। এ প্রথা আধুনিক যুগেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বেদ অধ্যয়ন ও নৈবদ্য অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতে অতিথি আপ্যায়ন, সন্তান উৎপাদন, জুয়া খেলা ইত্যাদি কাজে নিজ স্ত্রীকে অন্যের কাছে সমর্পণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। মন্দিরে ধর্মের নামে সেবাদাসী রাখা হতো। আর মন্দিরের পুরোহিতরা ঐসব সেবাদাসীকে ধর্মের নামে নির্বচারে ভোগ করত। এসকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন অধিকার নারীর ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হলো নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা যায় না। তাই তারা ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে নারীর সাহচর্য পরিত্যাগ করতো। বৌদ্ধ ধর্মেও নারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়ন চালানো হতো। রাসূল (স.) এর আবিভাবের পূর্বে জাহেলী যুগে আরব সমাজে কন্যা সন্তান জন্মকে অসম্মানজনক মনে করে জীবিত কবর দেয়া হত। নারী সম্পদের অধিকারী হতো না, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত না, পিতার মৃত্যুর পর স্ত্রীরা অন্যান্য সম্পত্তির মত পুত্রদের মাঝে বন্টিত হতো। জুয়া খেলায় স্ত্রীকে বাজী ধরতো, হেরে গেলে অবলীলায় স্ত্রীকে অন্যের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে সমর্পণ করতো। মোটকথা রাসূল (স.) এর আর্বিভাবের পূর্বে আরব সমাজে নারী চরম অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন সহ্য করে দাসীদের মত জীবনযাপন করত। ইসলামই নারীদের এরূপ দুরবস্থার কবল থেকে মুক্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের সূরা আল বাকারার ২৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "স্ত্রীদেরও তেমন অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর, ঠিক যেমন স্বামীদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর এবং তা নিয়ম অনুসারে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।"

বর্তমান আধুনিক সমাজে নারী-পুরুষের সমতা, সম্পদের উত্তরাধিকার, তালাক, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক ধরণের বিভ্রান্তি প্রচলিত রয়েছে যে, এসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়ে কম অধিকার দিয়েছে। আসলে বিষয়গুলি একটু যৌক্তিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, যেমন, **এক.** সৃষ্টিগতভাবে নারী পুরুষের মধ্যে যে মানসিক ও দৈহিক ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত ব্যবধান ও ভিন্নতা রয়েছে, তাই মূলগত ব্যবধান। এই ব্যবধান ও ভিন্নতা তাদের দৈহিক শীরা উপশীরায় প্রকৃতিগত গঠন প্রণালীর ভিন্নতার দরুণই সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা যদি নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে সমতা দান করতেন তাহলে হয়তো মানব বংশধারা ক্রমবিকশিত হতো না এবং পরিবার প্রথা গড়ে উঠত না। এবং নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক না হয়ে প্রতিদ্বন্দী হতো। তাই সৃষ্টিকর্তা মানব বংশধারা বৃদ্ধি ও পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যেমন কতিপয় পার্থক্য দান করেছেন তেমনি অধিকার, কর্তব্যের ক্ষেত্রেও কতিপয় ব্যবধান রেখেছেন। যাতে পরিবারে নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতিদ্বন্দী না হয়ে পরিপূরক হয়। আর এ কারণেই নারীর সৃষ্টিগত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেই কতিপয় ক্ষেত্রে ইসলামে নারী পুরুষের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান করা হয়েছে। তাই একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রদত্ত নারী-পুরুষের মধ্যকার ব্যবধান উভয়ের জন্যই কল্যাণকর।

দুই. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের চেয়ে নারীকে সম্পদের অর্ধেক দেয়া হয়েছে। এর কারণ পুরুষের উপর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আর ভরণপোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থাৎ পুরুষকে যে অংশ দেয়া হয়েছে তা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের ভরণপোষণ প্রদানে ব্যয় হয়। অথচ স্বামী বা পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব থেকে নারী সম্পূর্ণ মুক্ত। নারীর উপর পরিবারের ভরণপোষণের দায়ভার না থাকায় তার প্রাপ্ত অর্ধেক অংশ সম্পূর্ণ ব্যয়হীনভাবে থেকে যায়। এছাড়া বিবাহের সময় স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোহরানা তো রয়েছেই যা পুরুষ পায় না বরং পুরুষকে আরো দিতে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে উত্তরাধীকারের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর চেয়ে বেশী পেলেও পরিবারের ভরণপোষণ বাবদ পুরুষের অর্থ ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা থাকায় তা ব্যয় হয়ে যায় আর নারী প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে পুরুষের চেয়ে অর্ধেক অংশ পেলেও পরিবারের ভরণপোষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা না থাকায় নারীর অংশ ব্যয়হীন রয়ে যায়।

তিন. তালাক শব্দের অর্থ মুক্তি বা বন্ধন থেকে মুক্তি বা বিবাহ বিচ্ছেদ। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নিকৃষ্ট বৈধ কাজ। আর এ নিকৃষ্ট কর্মটির ক্ষেত্রে পুরুষকে কিছুটা বেশী অধিকার দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয়, যে স্ত্রী স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ইসলাম নারীকে খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার দিয়েছে। তবে খোলা করতে হলে স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু পুরুষকে তালাক দিতে স্ত্রীর অনুমতি নিতে হয় না। উভয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু এটাই। এ পার্থক্যের মধ্যেও নারীর জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে, প্রয়োজন শুধু অনুধাবন করার দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন, (ক) স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণপোষণ পাওয়ার উৎস বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীর অভিভাবকত্ব থেকেও মুক্তি লাভ করে সে নিরাপত্তহীন হয়ে দুর্ভোগের স্বীকার হয়। কিন্তু স্ত্রী খোলা তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটালে স্বামীকে স্ত্রীর মত দুর্ভোগের শিকার হতে হয় না। দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে সাময়িক অসুবিধা

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ করতে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের দৃশ্যমান ফলাফলে নারীই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে যদি স্বামীর মত তালাক প্রদানের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে সমাজে তালাকের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়ে নারী নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। (খ) বিবাহের মাধ্যমে যেমন পরিবার গঠন হয় তেমনি তালাকের মাধ্যমে পরিবার ভেঙ্গে যায়। আর পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে পড়লে নারী (স্ত্রী) পুরুষসহ (স্বামী) পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও শান্তি নষ্ট হয়। বিশেষ করে ছেলে মেয়েরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকসময় সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়েও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। এরফলে শিশু বয়স থেকেই তার মনে নানারকম প্রশ্নের উদ্ভব হয়। অনেকক্ষেত্রে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনি নেতিবাচক প্রভাব যেখানে রয়েছে সেখানে পুরুষের মত নারীকেও তালাকের ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিলে এর আধিক্য আরও বৃদ্ধি পেত এবং এরফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতো। (গ) তালাক একটি নিকৃষ্ট কাজ, আর নিকৃষ্ট কাজের অধিকার প্রাপ্তি মানুষের মর্যাদাকে আরও নিম্নগামী করে। তাই নারী যদি পুরুষের মতো তালাক দেয়ার অধিকার পায় তাহলে প্রকারান্তরে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং নিম্নগামী হবে। তাই এটা মেনে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত বিধানের মধ্যেই নারীর জন্য অধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

চার. পবিত্র কুর'আনের সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "পুরুষরা নারীদের ব্যবস্থাপক।" এ আয়াতটিকে রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদে নারীকে নিয়োগের বিপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। আবার এরূপ মতও পাওয়া যায় যে, উক্ত আয়াত দ্বারা পুরুষকে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ মত এরূপ পাওয়া যায় যে, এ আয়াতটি পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। আর পুরুষ নারীর ব্যয় নির্বাহ করে থাকে বলেই আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষকে নারীর উপর কর্তত্বশীল করেছেন। অপরপক্ষে বলা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা যদি নারীর উপর পুরুষের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করার দায়িত্ব অর্পণ করতেন তাহলে হয়ত নারীকে পুরুষের উপর কর্তত্ব দিতেন। যেমন, কুর'আনের সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আমি (আল্লাহ) মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তবে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং দুই বছর তাকে স্তন্য দান করে থাকেন।" এছাড়াও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, এক ব্যক্তির উত্তম সাহচর্য পাবার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূল (স.) তিনবার মায়ের কথা উল্লেখ করার পর চতুর্থবারে পিতার কথা উল্লেখ করেন। এখানে পিতার চেয়ে মাতাকে বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে, কারণ পিতার চেয়ে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মা বেশী কষ্ট সহ্য করেন। তেমনিভাবে পরিবারের ভরণপোষণের মত কঠিন দায়িত্ব পালন করতেও পুরুষকে অধিক কষ্ট করতে হয়, তাই আল্লাহ তায়ালা পুরুষের কষ্টের পুরস্কারস্বরূপ কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছেন, নারীকে হেয় করার জন্য নয়। তাই বলা যায়, উক্ত আয়াতটি শুধু পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রাজনৈতিক জীবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর উক্ত আয়াত দ্বারা পুরুষকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব নয় এবং কর্তৃত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব এক নয়, তাছাড়া আল্লাহ তা'য়ালার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষ বা নারী দ্বারা নির্ধারিত হয় না বরং ব্যক্তির (নারী-পুরুষ) ঈমান ও আমল বা কর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়।

পাঁচ. নারী রাষ্ট্রপ্রধান বা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না, এরূপ নির্দেশ কুর'আনে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে হাদীসে উল্লেখ আছে রাসূল (স.) বলেছেন, যে জাতি নারীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সে জাতি কখনো সফলকাম হতে পারবে না।" (বুখারী, সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪০৭৭, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, পৃ: ২৭৪)। এ হাদীস দ্বারা নারীকে রাজনীতির সকল পর্যায় থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়নি বরং নারীর প্রকৃতি ও চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে নেতৃত্ব দানকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আর এই নিরুৎসাহিতকরণ নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে হেয় বা কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যে নয়। রাসূল (স.) এর সময়ের নারীদের জীবনী থেকে জানা যায়, তখনকার

Dhaka University Institutional Repository

নারীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই এই হাদীসের উদ্দেশ্য নারীকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণে বাঁধা দেয়া নয়।

সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের ব্যবধান, উত্তরাধিকার, তালাক ও নেতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে যে সামান্য ব্যবধান করেছে তা প্রকৃতপক্ষে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারকে হেয় করার জন্য নয়। বরং আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিগতভাবে আকৃতিতে নারীকে পুরুষের চেয়ে আলাদা করে যেমন একজনকে অপরজনের পরিপূরক করেছেন এবং মানব বংশধারার ক্রমবিকাশ অব্যাহত রেখেছেন তেমনি দায়িত্বের ক্ষেত্রে কতিপয় ভিন্নতা দান করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী-পুরুষ উভয়কে উভয়ের পরিপূরক করে পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই নারী-পুরুষ যাতে অর্পিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে সেজন্য সহযোগীতা করার উদ্দেশ্যে অনুকুল কার্যকারণ পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজের সকলের দায়িত্ব। কারণ নারী-পুরুষ একজন অপরের প্রতিদ্বন্দী নয় বরং একজন অপরের পরিপূরক। আর পরস্পর পরস্পরকে সহযোগীতার করার মধ্যেই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

ইসলাম নারীকে পরিপূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করলেও বাস্তবায়নের অভাবে নারী সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে নারীর উপর যেভাবে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হচ্ছে তা নারীর সমাজিক নিরাপত্তা তথা গোটা সমাজের নিরাপত্তাহীনতারই শামিল। এ প্রক্ষাপটে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিগত দুই দশকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান সমাজে জাতিগত বোধ, বিশ্বাস, ও ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে ধার করা সংস্কৃতি আর অনুষ্ঠানকে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে অনুশীলন ও বাস্তবায়নের আন্দোলন চলছে। তারই প্রভাব প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সামাজ, ও শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে। বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে ধ্বংস হচ্ছে যুব সমাজ, পরিবার ও পরিবেশ। বৃদ্ধি পাচ্ছে চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ, পতিতবৃত্তি, হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং এর মত অপরাধ এবং নারী প্রতিনিয়ত নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আবার এই নিগ্রহ ও নির্যাতনের কবল থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী চলছে আন্দোলন। গঠিত হচ্ছে নারী প্রগতি সংগঠন এবং সেইসব সংগঠনের ব্যানারে নারী প্রগতিবাদীরা নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে নারী দিবস, আয়োজন করা হচ্ছে সম্মেলন, সেসব সম্মেলনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত হচ্ছে নীতিমালা। এতকিছুর পরেও নারীর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটছে না। বরং কতিপয় ক্ষেত্রে নারী প্রগতির ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রগতির নামে নারী সমাজ তাদের শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বেপর্দা চলাফেরা করছে। অর্থের লোভে নিজের স্বকীয়তা বিক্রি করে পুরুষের অনেকক্ষেত্রে নারীর হাতের ক্রীড়ণক হয়ে বাজারের পণ্যের মত ব্যবহৃত হচ্ছে। ভেঙ্গে পড়ছে পরিবার প্রথা, বিনষ্ট হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক।

তাই নারীর এই অধ:পতিত অবস্থা থেকে পরিত্রানের অন্যতম উপায় হলো, ইসলাম প্রদত্ত নারীর মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবায়ন, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইসলাম প্রদত্ত নারীর জন্য সুবিধাজনক বিশেষ বিধানগুলো বাস্তবায়ন, যেগুলো বাইরের সহিংস পরিবেশ থেকে নারীকে রক্ষা করবে, যেমন পর্দা, একাকী দূরবর্তী স্থানে সফর না করা, ভরনপোষণের ব্যবস্থা করা, গর্ভাবস্থায় অধিক যত্ন নেওয়া ইত্যাদি, শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান, ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা, ধর্মের অপব্যাখ্যা বন্ধ করা, কুসংস্কার ও প্রথাগত কর্মতৎপরতার অপনোদন, নারীর জন্য অসম্মানজনক পেশা যেমন, পতিতাবৃত্তি, বিজ্ঞাপন, সিনেমা, নাটক ইত্যাদি কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করা, পরিবারে পুরুষ কর্তক তো বটেই নারী কর্তৃক নারী নির্যাতন বন্ধ করা, যৌতুক প্রথার বিলুপ্তকরণ, সঠিক সময়ে বিবাহ প্রদান ও পরিবারে নারীর মর্যাদা রক্ষা এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান, কর্মলাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং কর্মক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে নারীর কাজের মূল্যায়ন করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করলেই নারী নির্যাতন বন্ধ হবে এবং পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী সম্মান ও মর্যাদাজনক প্রতিষ্ঠা পাবে। আর এক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়কেই সহযোগীতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ মানব সভ্যতার বিনির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারী-পুরুষ উভয়ের সমভাবে অংশগ্রহণ। উভয় শ্রেণীর মধ্যে যাকেই বাদ দেয়া হবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরিশেষে বলা যায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কবল থেকে রক্ষা করতে হলে ইসলাম প্রদত্ত পুরুষের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার যেমন সংরক্ষণ করতে হবে তেমনি ইসলাম প্রদত্ত নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ ও বাস্তবায়িত করতে হবে। কেননা ইসলামে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন মৌলিক ব্যবধান নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

- **আল কুর'আনুল কারীম**
- **পবিত্র বাইবেল**
- **মহাভারত**
- **শ্রীমভ ভগবত গীতা**
- **বাল্মিকী রামায়ণ**
- **বেদ**
- **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।**
- অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস**, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, ভাদ্র-১৩৮০।
- অভয়ানন্দ বন্দোপাধ্যায়, **অগত্যা স্বীকার প্রকরণ**, কলিকাতা, ১৮৬১ খ্রী:।
- অভী দাস, **কন্যা জন্ম কন্যা বিসর্জন**, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২ খ্রী:।
- আছ-ছা'আলাবী, আবূ যায়িদ 'আব্দির রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাখলূফ, **আল-জাওয়াহিরুল হাস্সান ফী তাফসীরিল কুর'আন**, তা.বি.।
- আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইব্ন উমার আল-জামাখশারী, **আল-কাশ্শাফু 'আন হাকায়িকিল গাওয়ামিজিত তানযীল ওয়া 'উয়ূনুল আকাবীল ফী উজুহিত তা'বীল**, ১ম খন্ড, মিশর: মুস্তফা আল-বাবা আর-হালবী, ১৯৩৮ খ্রী:।
- আবূ সাঈদ নাসীরুদ্দীন নাসির উদ্দীন কাযী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল বয়যাবী, **আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসসারুত তা'বীল তাফসীরে বায়যাবী**, ১ম খন্ড, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, ১৯৯৮ খ্রী:।
- আল-আলুসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-হুসাইনী, **রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিল 'আজীম ওয়াস সাব'উল মাছানী**, বৈরুত: দারুস সাদির, তা. বি.।
- আল-রাযী, ফখরুদ্দীন, **তাফসীর-ই- কাবীর**, ২য় খন্ড, তা. বি.।
- আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন সাইয়্যেদ মাহমুদ আল আলুসী, **তাফসীরে রুহুল মা'আনী**, বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী:।
- আত-তাবারী, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর, **জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুর'আন**, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা. বি.।
- আবু বকর জাসসাস, **আহ্কামুল কুরআন**, ২য় খন্ড, লাহোর: সুহায়েল একাডেমী, ১৯৯১ খ্রী:।
- আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর, **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম**, ৪র্থ খন্ড, পেশওয়ার: মাকতাবাতু আলামিল ইসলামিয়া, তা. বি.।
- আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী মাওলানা, **তাফসীরে মাজেদী**, অনুবাদ: মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক, ১ম খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রী:।
- মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, **তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন**, অনুবাদ: মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রী:।
- আবদুল আযীয মাওলানা মুহাম্মদ, **তাফসীরুল বয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন**, ১ম খন্ড, ঢাকা: দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৭ খ্রী:।
- আশ্ শাওকানী মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ, **তাফসীরে ফাতহুল কাদীর**, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৩ খ্রী:।
- আহ্মাদুল মুস্তাফা আল-মারাগী আল্লামা, **তাফসীরে আল-মারাগী**, দারুল ফিক্র, তা. বি।
- আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী, **ফাতহুল বারী**, বৈরুত: দারুল মা'রেফা, লেবানন, তা. বি.।

Dhaka University Institutional Repository

- আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, আবূ আব্দুল্লাহ, **সহীহ্ আল বুখারী**, দেওবন্দ: শিরকাত মুখতার, ১৯৮৫ খ্রী: ।
- আল-কুশাইরী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আবুল হুসাইন, **সহীহ্ মুসলিম**, দেওবন্দ: শিরকাত মুখতার, ১৯৮৬ ।
- আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, আবূ ঈসা, **সুনানুত তিরমিযী**, বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৯৮৩ খ্রী: ।
- আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, আবূ ঈসা, **জামিউত তিরমিযী**, দিল্লী: মাকতাবা রাশীদিয়া, তা. বি. ।
- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, **জামে তিরমিযী**, দেওবন্দ: রশিদিয়া কুতুবখানা, তা. বি. ।
- ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস-সিজিস্তানী, **আস-সুনান**, রিয়াদ: দারুস-সালাম, ২০০০ খ্রী: ।
- ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস, **সুনানে আবূ দাউদ**, দিল্লী: মাকতাবা রাশীদিয়া, তা. বি. ।
- আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শুয়াইব আন নাসায়ী, **সুনানে নাসায়ী**, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯৫ খ্রী: ।
- আবু আব্দুর রহমান, আহমদ ইবনে শুআয়ব আন নাসায়ী, **সুনানুন নাসায়ী**, লাহোর: মাকতাবা সাফিয়া, ১৯৮২ খ্রী: ।
- আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী, **সুনানে নাসায়ী**, দারুল কিতাব দেওবন্দ, তা. বি. ।
- আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ, **সুনানে ইবনে মাজাহ**, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা. বি. ।
- ইমাম মালিক ইবন আনাস, **আল মুয়াত্তা**, দেওবন্দ: শিরকাত মুখতার, তা. বি. ।
- আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ দারেমী, **সুনানুদ দারেমী**, করাচী: কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি. ।
- আত-তীবরিযী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব, **মেশকাতুল মাসাবিহ**, ৩য় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯ খ্রী: ।
- আল-ইমাম আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন আহমাদ বদরুদ্দীন আল-আইনী, **'উমদাতুল কারী ফী শারহিল বুখারী**, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি: ।
- আফীফ আবুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, **রূহুদ্দীন আল্-ইসলামী**, বৈরুত: দারুল ই'ল্‌ম লিলমালাইন, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রী: ।
- আসফাহানী, আর্ রাগিব, **মুফরাদাত ফী গরীবুল কুর্আন**, তা. বি. ।
- ইমাম আবূ জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্ন শরফুদ্দীন আন-নববী, **শরহে নববী ফী মুসলিম**, ১ম খন্ড বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০১ হিজরী ।
- 'আব্দুর রহমান আন-নাহলভী, **'উলূমুত তারবীয়াহ আল-ইসলামিয়া ওয়া আছালিবুহা**, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৮ হি. ।
- আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী, **ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন**, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি. ।
- আল্লামা হাইসামী, **মাজমাউয** যাওয়ায়েদ, ৮ম খন্ড, তা. বি. ।
- আব্দুল ফাত্তাহ মাহমুদ, **আল মুগনী ফী মা'রিফাতি রিজালিস সাহীহায়ন**, বৈরুত: দারুল জায়ল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রী: ।
- আবদুল্লাহ খায়যী, **খুলাসাতু তাহযীবি তাহযীবিল কামাল ফী আসমাইর রিজাল**, ৩য় খন্ড, পাকিস্তান, আল-মাকতাবাতুল আসরীয়া, তা. বি. ।
- মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী, **আসাহ্হুস সিয়ার**, ঢাকা: কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রী: ।
- মোহাম্মদ আলী হাসান, **তাফসীর ও বঙ্গানুবাদ**, ১ম খন্ড, ঢাকা, তা. বি ।

Dhaka University Institutional Repository

- শেখ আহমদ শাহওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম আল-মুহাদ্দেসে দেহলভী, **দারুল মা'রেফা**, ২য় খন্ড, বৈরুত, তা. বি. ।
- আব্বাস রা. হযরত ইব্ন, **তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইব্ন আব্বাস**, করাচীঃ খাদীমী কুতুবখানা, তা. বি ।
- আবিদীন মুহাম্মদ আমীন ইব্নে, **হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার**, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩২৮ হিঃ ।
- আহমদ ইবন আলী হাজার আল আসকালানী, **আল ইসাবা ফী তামীযিস্ সাহাবা**, ৪র্থ খন্ড, তা. বি. ।
- আল-আসকালানী ইবনে হাজার, **তাহযীবুত তাহযীব**, মজলিশে দায়েরাতুল আল-মা'রেফ, ইন্ডিয়া, ১৩২৬ হিঃ ।
- আবু জাবির সাইয়্যিদ, **আল-কামুছ আল-ফিকহি**, করাচিঃ ইরাদাতুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, তা. বি. ।
- আবদুল আযীয আল মুনযেরী হাফেজ, **আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব**, ৩য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৪ হিজরী ।
- আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী, **আল বাহরুল মুহীত ফিত্ তাফসীর**, ২য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, তা. বি. ।
- আবু আবদুল্লাহ আহমদ আল-হাকিম নিশাপুরী, **আল-মুসতাদরিক**, হায়দারাবাদঃ দায়েরাতুল মা'রিফিল উসমানিয়া, ১৩৪৫ হিঃ ।
- আবদুল্লাহ জামালউদ্দীন হেজাবুল মারআ সাইয়্যেদ, **মকতবাতু আততুরাশ আল ইসলামী**, কায়রো, তা. বি. ।
- আমীন ইব্নে আবিদীন মুহাম্মদ, **হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার**, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি. ।
- আবুল হাসান আবুল নদভী, **আসসীরাতুন নব্বিয়্যা**, বৈরুতঃ দারুশ শরুক, ১৯৮৩ খ্রীঃ ।
- আলা উদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী ইবনে হুসামউদ্দীন, **কানযুল উম্মাল**, ১৬শ খন্ড, আল-মকতবা আত-তুরাস আল-ইসলামী, হালবী, তা. বি. ।
- আমিন আহসান এছলাহী, **মদাব্বেরে কুরআন**, ২য় খন্ড, দিল্লীঃ তাজ কোং, ১৯৮৯ খ্রীঃ ।
- আবদুর রউফ আল মানাভী, **ফায়যুল কাদীর**, ৩য় খন্ড, মিশরঃ আল মাকতাবাতুত্ তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হিঃ ।
- আল্লামা সুয়ূতী, **আল জামিউস সাগীর**, ৩য় খন্ড, জেদ্দাঃ দারু তায়েরুর ইরম, তা. বি. ।
- আবু আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, **আল মুসতাদরাক**, ২য় খন্ড, বৈরুতঃ দারুল মারিফাত, তা. বি. ।
- আবি শায়বা মুহাম্মদ ইবনে, **মুসান্নাফ**, ৫ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, রিয়াদঃ মাকদতাবাতুর রুশাদ, তা. বি. ।
- আলাউদ্দীন আল্লামা, **দররুল মোখতার**, মকতবাতে ফয়জুল কুর'আন, ২য় খন্ড দেওবন্দ, তা. বি. ।
- আব্দুল খালেক মাওলানা, **নামায**, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭ ।
- আব্দুল খালেক, **নারী ও সমাজ**, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪ ।
- আব্দুল খালেক, **নারী**, ঢাকা : দ্বীনি পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৪ ।
- আবদুল হাই মুহাম্মদ শেখ, **নারী অধিকার**, ঢাকাঃ মাহবুব প্রকাশনী, ২০০০ খ্রীঃ ।
- আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)**, ঢাকাঃ তাসনিম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রীঃ ।
- আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়েদ, **পর্দা ও ইসলাম**, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৩ ।
- আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **ইসলাম পরিচিতি**, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রীঃ ।
- আবুল আলা মওদুদী সাইয়েদ, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান**, ঢাকাঃ মওদুদী রিচার্স একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রীঃ ।
- আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

- আবু জাবির সাইয়্যিদ, **আল-কামুছ আল-ফিকহি**, করাচি: ইরাদাতুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, তা. বি.।
- আগষ্ট বেবেল, **নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে**, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি:, এপ্রিল ১৯৯০।
- আবু আহামেদ হাবিবুল্লাহ, **আল বেরুনীর 'ভারত তত্ত্ব'**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রী:।
- আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী মাওলানা, **মহানবী (স) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা**, ঢাকা: ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫ খ্রী:।
- আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, **ইসলাম আওর আওরাত**, লাহোর: ইদারায়ে ইসলামিয়া, তা বি.।
- আবুল কালাম আজাদ মাওলানা, **মুসলমান আওরাত**, ভারত: ইংল্যান্ডের আর্য বিশপদের রিপোর্ট, লন্ডন, ১৯৪৬ খ্রী:।
- আমিনুল ইসলাম ড:, **মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি**, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১ খ্রী:।
- আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, **পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস**, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯০ খ্রী:।
- আকবর শাহ খান নজিবাবাদী মাওলানা, **ইসলামের ইতিহাস**, ১ম খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রী:।
- আমীর আলী সৈয়দ, **আরব জাতির ইতিহাস**, মুল: **হিষ্ট্রি অফ সারা সিনস**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪ খ্রী:।
- মূল: ড. আশ শাইখ মুস্‌তাফা আস্‌ সিবায়ী, **আল মারআতু বাইনাশ শারীয়াতি ওয়াল কানুন**, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, **ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী**, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলাামিক সেন্টার, ১৯৯৮ খ্রী:।
- আবদুল হান্নান শাহ, **নারী ও বাস্তবতা**, চট্টগ্রাম: এ্যডন পাবলিকেশন্স ঢাকা, ২০০২ খ্রী:।
- আনিসুজ্জামান, **মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮**, ঢাকা: ১৯৬৪ খ্রী:।
- আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৪।
- আবুল বারাকাত, একেএম মাকসুদ, মাহমুদ কবীর, **বিশ্বায়ন ও নারী প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**, ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ফেব্রুয়ারী, ২০০২।
- আমীর আলী সৈয়দ, **দি স্পিরিট অব ইসলাম**, অনু: ড. রশীদুল আলম, কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৪ খ্রী:।
- মূল: আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, **রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদ: মাওলানা আবদুল মুনয়েম, অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী, মওলানা মুনওয়ার হোসাইন, ১ম খন্ড, ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ও ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থটস, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫।
- মূল: আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, **রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা**, অনুবাদ: মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ২য় খন্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থটস (বিআইআইটি), নভেম্বর ২০০২।
- আবদুল আজিজ, **ফারায়েজ শিক্ষা**, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খ্রী:।
- আলিমুজ্জামান চৌধুরী, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন**, ঢাকা: মহানগর ল' বুক সেন্টার, ১৯৯৮ খ্রী:।
- আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, **মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক**, ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী:।
- আব্দুল কাদির, **রোকেয়া রচনাবলী**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রী:।
- আব্দুল মান্নান সৈয়দ, **বেগম রোকেয়া**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রী:।
- আদিনাথ সেন, **স্বর্গীয় দীনানাথ সেনের জীবন ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ**, ১ম খন্ড, কলিকাতা: ধুর এন্ড সন্স, ১৯৪৮ খ্রী:।
- আখতার ইমাম, **ইডেন থেকে বেথুন**, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৯০ খ্রী:।

Dhaka University Institutional Repository

- আসদার হোসেন, **অভিশপ্ত এনজিও এবং আমাদের ধর্ম স্বাধীনতা ও নারী**, ঢাকা: প্রতিক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৭।
- আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, **শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)** ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭।
- আব্বাস আলী খান, **জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস**, প্রথম খন্ড, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, দ্বিতীয় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রীঃ।
- আনোয়ার হোসেন, **মেয়েশিশু সামাজিক বৈষম্য ধরন ও প্রভাব**, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রীঃ।
- আনোয়ার হোসেন, **শিশু ও নারী নির্যাতন এবং ব্যবসা**, ঢাকা: মুক্তাঙ্গন, আগষ্ট ২০০৫ খ্রীঃ।
- আসমা খাতুন হাফেজা, **নারী মুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম**, ঢাকা: সাফওয়ান পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০১, খ্রীঃ।
- আবদুল মান্নান মোহাম্মদ, **আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা**, ঢাকা: আশা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ খ্রিঃ।
- আবদাল আহমদ সৈয়দ, **নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২।
- আহাদ উদ্দিন হায়দার, **নারী-শিশু নির্যাতন, প্রতিরোধ ও আইন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**, রূপান্তর, খুলনা, ১৯৯৮ খ্রীঃ।
- আনু মুহাম্মদ, **নারী, পুরুষ ও সমাজ**, ঢাকা: সন্দেশ, ১৯৯৭ খ্রীঃ।
- আলী রিয়াজ, **ভয়ের সংস্কৃতি বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের প্রকৃতি এবং পরিসর**, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রীঃ।
- সম্পদনায় আলী রিয়াজ, **বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: চারদিক, বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫।
- এম. আনিসুজ্জামান, **ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা**, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।
- আলতাফ পারভেজ, **বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ**, ঢাকা: জন অধিকার, ২০০০ খ্রীঃ।
- ড. ইউসুফ হামিদ আল-আলিম, **আল-মাকাছিদুল 'আম্মা লিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ**, রিয়াদ: আল-মাহাদুল আলমী আল-ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হিঃ।
- ইবনে কাসীর, **আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা**, ১ম খন্ড, কায়রো: ঈমান বাবিল হালবী, ১৯৬৪ খ্রীঃ।
- ইবন আল-হাসান ইবন যাবালা মুহাম্মদ, **মুনতাখাব মিন কিতাবি আযওয়াজিন নাবী**, অনুবাদ: ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, মদীনা: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১ খ্রীঃ।
- ইবন সায়্যিদুন্নাস, **উয়ুনুল আসর**, বৈরুত: দারুল জেল, ১৯৭৪ খ্রীঃ।
- ইজ্জাহ দারুজা মুহাম্মদ, **আল মারআতু ফিল কুরআন ওয়াস্ সুন্নাহ**, বৈরুত: আল মাকতাবাতুল ফিকরিয়া, ১৯৮০ খ্রীঃ।
- ইউসুফ আল কান্দালুভী, **হায়াতুস সাহাবা**, ২য় খন্ড, দামেশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রীঃ।
- ইউসুফ ইসলাহী আল্লামা, **মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার**, ৪র্থ প্রকাশ, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রীঃ।
- সম্পাদনা পরিষদ, **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম**, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০০ খ্রীঃ।
- সম্পাদনা পরিষদ, **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ৫ম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮৮।
- সম্পাদনা পরিষদ, **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ১১শ খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রীঃ।
- সম্পাদনা পরিষদ, **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন.** ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৪।
- সম্পাদনা পরিষদ, **সীরাত বিশ্বকোষ**, ৩য় খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০২।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**, ২য় খন্ড।
- ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

- ইউসুফ মুহাম্মদ ড., **আল আহ্‌কাম আহ্‌ওয়াল আল শাখসিয়া**, তা. বি.।
- ইব্‌ন মানযুর, **লিসানুল 'আরব**, ১ম খন্ড, বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত্‌-তুরাসীল আরবী, তা. বি.।
- ইবন হিশাম, **আসসীরাতুন নববিয়্যা**, ২য় খন্ড, বৈরুত: উলুমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ খ্রী:।
- ইজ্জুদ্দীন বালিক (র:) আল্লামা, **মিনহাজুস সালেহীন**, অনু: মুহাম্মদ ইসমাঈল, ১ম খন্ড, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪ খ্রী:।
- ইব্‌নে সাদ মুহাম্মদ, **আত্‌ তাবাকাত**, ৮ম খন্ড, বৈরুত: দারুস সদর, ১৩৭৬ হি:।
- ইবনুল কাইয়্যুম আল জাওজিয়া, **ইলামুল মুয়াককিয়ীন**, ১ম খন্ড, মাতবা'আ ফায়জুল্লাহ আল কুর্দী, ১৩২৫ হি:।
- ইবনুল কাইয়্যুম আল জাওজিয়া, **যাদুল মা'আদ**, ৪র্থ খন্ড, রিয়াদ: দারুস সালাম, তা. বি.।
- ইব্‌ন জারীর আত্‌ তাবারী, আবূ জাফর মুহাম্মদ, **তারীখুর রসুল ওয়াল মুলুক**, ২য় খন্ড, বৈরুত: দারুস সাওদায়েন, তা. বি.।
- ইব্‌নে আবদুল বার, **আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আ সাহাব, তাযকিরাত বারী বিন্‌তে মাআওয়েজ**, ৪র্থ খন্ড, তা. বি.।
- ইবনুল আসীর আল্লামা, **উসুদুল গাবা ফী মা' রিফাতিস্‌ সাহাবা**, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত্‌ তুরাসিল আরাবী, তা. বি.।
- **ইসলামে নারীর মর্যাদা**, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা: বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
- **ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড**, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী:।
- এম আব্দুল কাদের ড., **নানা ধর্মে নারী**, চট্টগ্রাম: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রী:।
- এ. এফ. এম আবদুল মজিদ রুশদী, **হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা:)**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রী:।
- এ.এ খান অধ্যাপক, **সাংবিধানিক আইন**, ঢাকা: প্রভাতী প্রকাশনী।
- এম. এ হাসান ডা., **যুদ্ধ ও নারী**, ঢাকা: তাম্রলিপি, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।
- এম ফারুক খান, **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন**, ঢাকা: ডাইনামিক পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রী:।
- ওয়ালী উদ্দীন শায়খ, **মিশকাতুল মাসাবিহ্‌**, কিতাবুল নিকাহ্‌, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।
- ওয়াকিল আহমেদ, **উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রী:।
- কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, **নারী, শ্রেণী ও বর্ণ**, হাওড়া: ম্যানস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, ২০০০ খ্রী:।
- কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, **রাজনীতি ও নারীশক্তি ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত**, হাওড়া: ম্যানস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, ২০০২ খ্রী:।
- কনক মুখোপাধ্যায়, **উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর**, কলকাতা, তা.বি।
- কনক মুখোপাধ্যায়, **নারী আন্দোলনের নানা কথা**, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০০১।
- কুতুব শহীদ সাইয়েদ, **ফী যিলালিল কুরআন**, অনুবাদ: হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমদ, ১২তম খন্ড, লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রী:।
- কানিজ মুস্তাফা সাইয়্যেদা, **ইসলামে নারীর অধিকার**, কলকাতা: বাণী প্রকাশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রী:।
- কমলা দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**, কলকাতা, ১৯৬০ খ্রী:।
- খায়রাত মুহাম্মদ, **মারকাযুল মারআতি ফিল ইসলাম**, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫ খ্রী:।
- খাদরী বিন মুহাম্মদ শায়খ, **মুহাদারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যা**, ১ম খন্ড, মিসর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৩৮২ হি:।
- খাওলী আল, **আল মার'আতু বাইনাল বাইতি ওয়াল মুজতামা**, তা. বি.।
- খাল্লিকান ইবনে, **ওয়াফাতুল আ'ইয়ান**, ২য় খন্ড, মিশর: আল মাতবা আতুল আমীরিয়াহ, ১২৮৩ হি:।
- ক্ষিতিমোহন সেন, **প্রাচীন ভারতে নারী**, কলিকাতা: বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৮২ খ্রী:।
- ক্ষিতিমোহন সেন, **ভারতবর্ষমে জাতিভেদ**, কলকাতা, ১৯৪০ খ্রী:।

Dhaka University Institutional Repository

- খাদিজা আখতার রেজায়ী, **মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য**, ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।
- খোকা রায়, **সংগ্রামের তিন দশক**, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ খ্রী:।
- খাদিজা খাতুন, লতিফা আকন্দ, জাহানারা হক, শওকত আরা হোসেন এবং ফারজানা নাঈম সম্পাদিত, **নারী ও উন্নয়ন: প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান**, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫ খ্রী:।
- খালেদা নাজনীন, **বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের স্বরূপ**, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৫ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৪, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।
- খালেদা সালাউদ্দীন ড., **একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৬ খ্রী:।
- খালেদা সালাউদ্দীন ড., **বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও নারী সমাজ**, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৪ খ্রী:।
- খালেদা জাহান সৈয়দা, **জেব-উন-নেসা জামাল**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৯ খ্রী:।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট**, ঢাকা, ১৯৭৪।
- গোলাম মুস্তাফা মুহাম্মদ, **কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা.)**, ঢাকা: ইসলামিলক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রী:।
- গোপাল পাকড়াশী শ্রীকৃষ্ণ, **তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজচিত্র**, রিষড়া, হুগলী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
- গোলাম মুরশিদ, **সংকোচের বিহ্বলতা ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনীর প্রতিক্রিয়া**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রী:।
- গোলাম মুরশিদ, **সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রী:।
- গোলাম মুরশিদ, **রাসসুন্দরী থেকে বেগম রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৩।
- গৌতম মন্ডল, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল**, ঢাকা: নিউজ নেটওয়ার্ক, ২০০৩ খ্রী:।
- মুল: গোলাম সাত্তার, সিরাজ হোসেন খান, সাহান শরীফ আহামেদ, সম্পাদনায়- সালেহউদ্দীন আহমেদ, **নির্যাস খন্ড-১**, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী:।
- গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন্নেছা খাতুন**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৯।
- ড. চিত্তমন্ডল, **নারী নির্যাতন নারী আন্দোলন**, কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, ২০০৬ খ্রী:।
- চিত্র দেব, **অন্তঃপুরের আত্মকথা**, কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪ খ্রী:।
- চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, **বিদ্যাসাগর**, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
- চন্দন কুমার লাহিড়ী, **জন্মনিবন্ধন বাল্যবিবাহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন**, ঢাকা: জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন সেন্টার স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৫ খ্রী:।
- চিত্তরঞ্জন সরকার, **নারী ও দারিদ্র**, ঢাকা: স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ২০০৭ খ্রী:।
- চিত্রিতা বন্দোপাধ্যায় (রায়), **সময়ের উপকরণ: মেয়েদের স্মৃতিকথা**, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, আগষ্ট ২০০৪।
- ছাইদুল হক মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, **ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার: একটি সমীক্ষা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ২০০৫ খ্রী:।
- ছবি রায়, **বাঙলার নারী আন্দোলন**, কলিকাতা, তা. বি।
- জালালুদ্দীন সুয়ূতী, **আল কানযুল মদফুন**, ৫ম খন্ড, মিশর: মুসতাফাল বাবিল হালবী, ১৯৩৯ খ্রী:।
- জালালুদ্দীন আনসার উমরী সাইয়েদ, **ইসলামী সমাজে নারী**, অনুবাদ: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রী:।
- জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, **আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুর'আন**, ২য় মুদ্রণ, মিশর: মুস্তফা আলবাবী, ১৯৫১ খ্রী:।
- জামাল আল বাদাবী আল্লামা ড., **ইসলামিক টিচিং কোর্স**, ৩য় খন্ড, অনুবাদ: খালদুন আল মাহমুদ আবু, **ইসলামের সামাজিক বিধান**, ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, ১৯৯৯ খ্রী:।

Dhaka University Institutional Repository

- জাওয়াদ মাগানিয়া মুহাম্মদ, **আল আহ্ওয়াল আল শাখছিয়া আলা আল মাহাতিব আল খোমছা**, বৈরুত: দারুল ইল্‌ম, ১৯৬৪ খ্রী: ।
- জামালুদ্দীন মুহাম্মদ, **মুসলিম নারীর পোশাক ও কর্ম**, ঢাকা: এশা রাহনুমা, সাইনস ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮ খ্রী: ।
- জাহানারা হক, **ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-২**, সম্পাদনায় হামিদা আখতার বেগম, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮ খ্রী: ।
- **জেন্ডার এবং উন্নয়ন: নীতিমালা, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন**, জেন্ডার ট্রেইনার কোর গ্রুপ, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রী: ।
- জ্ঞানেশ মৈত্র ড., **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য**, কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রী: ।
- জহুরী সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, **অপসংস্কৃতির বিভীষিকা**, ঢাকা: উতলু প্রকাশন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রী: ।
- **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭-২০০৮ ও মহিলা পরিষদ**, ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জুন ২০০৮ ।
- তফাজ্জল হোছাইন মুহাম্মদ মাওলানা, ড. এইচ এম মুজতবা হোছাইন, **হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন**, ঢাকা: ঢাকা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রী: ।
- তাহের হোসেন মুহাম্মদ, **ইসলামে নারী**, ঢাকা: হৃদ প্রকাশন, ২০০০ খ্রী: ।
- তালিবুল হাশেমী, **মহিলা সাহাবী**, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রী: ।
- তাহমিনা আলম, **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ খ্রী: ।
- তাহমিনা আলম, **'বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালী মুসলিম নারী সমাজ**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রী: ।
- দিলারা চৌধূরী এান্ড আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, **উইমেনস পার্টিসিপেশন ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স স্কোপ নেচার অ্যান্ড লিমিটিশন**, সিডা, অক্টোবর, ১৯৯৩ খ্রী: ।
- দিলারা চৌধূরী এান্ড আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, **বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট**, ঢাকা, ১৯৭৪ ।
- দিলারা চৌধূরী এান্ড আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, **বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭-৯৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**, ১৯৯৮ খ্রী: ।
- দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, **বিবাহ সংস্কার**, মে ১৮৭৩ ।
- ধুর্জটি প্রসাদ দে, **বাংলার মুসলমান সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলন ও সমাজ সচেতনতা ইতিহাস অনুসন্ধানে**, কলকাতা : ১৯৮৭ খ্রী: ।
- নুরুযযামান মুহাম্মদ, **সংগ্রামী নারী**, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৭ খ্রী: ।
- নূরুল মু'মিন, **মুসলিম আইন**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০ খ্রী: ।
- নাসের উদ্দীন আল-বানী মুহাম্মদ, **হিজাবুল আওরাতিল মুসলিমাহ্ ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ**, বৈরুত: আল-মকতবা আল-ইসলামী, তা. বি. ।
- নো'মান আহমদ মাওলানা, **ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার**, ঢাকা: শিবলী প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রী: ।
- নূরুল মু'মিন, **মুসলিম আইন**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০ খ্রী: ।
- নীহার রঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব**, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলিকাতা: লেখক সমবায় সমিতি, ফাল্গুন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ।
- নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন, সাধারণ ব্রাম্মসমাজ**, কলিকাতা: ১৯৭২ খ্রী: ।
- নুরুল ইসলাম মো:, **মানবাধিকার ও সমাজকর্ম**, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫ খ্রী: ।
- নুর হোসেন মজিদী, **নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে**, ঢাকা: কনফিডেন্ট, পাবলিকেশন্স প্রা: লি: ১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৯ খ্রী: ।
- নুরুল ইসলাম ও মো: হাবিবুর রহমান, **সমাজ কল্যাণ নীতি ও কর্মসুচি**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রী: ।

Dhaka University Institutional Repository

- অনুবাদ ও সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্ক রত্ন, **সংস্কৃতি পুস্তক ভান্ডার**, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রীঃ।
- প্যারীচাঁদ মিত্র, **এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্ববস্থা**, কলিকাতা, ১৮৮০ খ্রীঃ।
- প্রদীপ রায়, **বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব**, কলকাতা: বুক ট্রাষ্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ খ্রীঃ।
- প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, **বাংলার নারী জাগরণ**, কলিকাতা: ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।
- ফরিদ বেজদী আল আফেন্দী, **সমাজ ও সভ্যতায় নারীর ভূমিকা**, অনুবাদঃ আকতার ফারুক, ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ খ্রীঃ।
- ফজলুর রহমান আশরাফী মাওলানা, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয**, ঢাকা: আর. আই এস, পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রীঃ।
- ফাতেমা আলী, **ইসলামে নারী**, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রীঃ।
- ফুয়াদ হামযা, **কালবু জাযীরাতিল আরব**, মিশরঃ আলমা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৫২ হিঃ।
- ফখরুদ্দীন রাযী, **আত তাফসীরুল কবীর**, ২য় খন্ড, করাচী: মাকতাবা ইসহাকিয়া, ৩য় সংস্করণ, তা. বি.।
- ফওজিয়া খন্দকার ইভা, **'বাংলাদেশ জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এনজিও সমূহের ভূমিকা'**, জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালা কৌশল এবং অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিশেষ সংকলন, জেন্ডার ট্রেইনার কোর গ্রুপ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮ খ্রীঃ।
- ফারজানা নাঈম, **"জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিকরণে সরকারের ভূমিকা"**, জেন্ডার এবং উন্নয়নঃ নীতিমালা, কৌশল এবং আভিজাত্য বিষয়ক বিশেষ সংকলন, জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ, ১৯৯৮ খ্রীঃ।
- বায়হাকী, **দালাইলুন নুবুওয়াহ**, ২য় খন্ড, **আস সুনানুল কুবরা**।
- বিনয়ভূষণ রায়, **'বাংলার সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন'**, কলিকাতা, ১৯৮৬ খ্রীঃ।
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রী, **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**, ২য় খন্ড ও ৩য় খন্ড, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।
- বিহারীলাল সরকার, **বিদ্যাসাগর**, কলিকাতা, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- **বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ**, দ্বিতীয় খন্ড, আগস্ট, ১৯৭২ খ্রীঃ।
- বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জেরীনা রহমান খান সম্পাদিত, **বাংলাদেশে নারী নির্যাতন**, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৭ খ্রীঃ।
- বোভোয়ার, সিমোন দ্য, **দি সেকেন্ড সেক্স**, অনুবাদঃ হুমায়ন আজাদ, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রীঃ।
- মুহাম্মদ আলী হাসান মাওলানা, **কুর'আন শরীফ, বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর**, ঢাকা: উসমানিয়া বুক ডিপো, তা. বি.।
- মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ ড., **আদদ্বীন**, মিশরঃ আসসায়াদা, ১৩৮৯ হিজরী।
- মুহাম্মদ আবদুর রাহীম শাহ ও ড মোঃ আমির হোসেন সরকার, **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলামী সংস্কৃতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ**, ঢাকা: সেন্টার ফর ইস্ট ওয়েস্ট ষ্টাডিজ ২০০৩ খ্রীঃ।
- মাহমুদুল হাসান ড., **ইসলামের ইতিহাস**, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ, ১৯৮৫ খ্রীঃ।
- মার্টন ল্যাংলী, **ধর্মের বিশ্বকোষ**, ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯৪ খ্রীঃ।
- মতিয়ার রহমান মোহাম্মদ, **প্রাচীন ভারতে বাল্যবিবাহ**, ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৪১ খ্রীঃ।
- মুসতাশার হাসান হাফনাভী আল, **মাকামাতুল মারআতি ফিল ইসলাম**, আল কাহেরা: দারুল বাশীর, আল মারআতু লাদাল ইয়াহুদ, তা. বি.।
- মজদুদ্দীন মোল্লা, **সীরাতে মুস্তাফা**, দিল্লীঃ মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৫৭ খ্রীঃ।
- মূলঃ মালিক রাম আল্লামা, **আওরাত আওর ইসলামী তা'লীম**, অনুবাদঃ মাহমুদা বেগম নেকু, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রীঃ।
- মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (রহ.) ইমাম, **রিয়াদুস সালেহীন**, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, একাদশ প্রকাশ, এপ্রিল-২০০১।
- মুহাম্মদ আবদুর রহীম মাওলানা, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০০ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

- মুহাম্মদ আবদুর রহীম মাওলানা, **নারী**, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রী: ।
- মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ডঃ, **ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ**, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রী: ।
- মাহবুবা রহমান ড., **কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০০৫ ।
- মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনূদিত, **সহীহ্ আল বুখারী**, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রী: ।
- মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন**, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রী: ।
- মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, **আমি নারী তিনশ বছরের (১৮-২০শতক) বাঙালী নারীর ইতিহাস**, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১ খ্রী: ।
- মালেকা বেগম, **নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক**, ঢাকা: অন্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী - ২০০২ খ্রী: ।
- মালেকা বেগম, **নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ**, ঢাকা: সমাজ নীরিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯০ খ্রী: ।
- সম্পাদনায়: মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, **নারী: রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ**, ঢাকা: সমাজ নীরিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯০ খ্রী: ।
- অনুবাদ: মালেকা বেগম, **জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা**, ঢাকা: রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, মে ১৯৯৭ ।
- মুহাম্মদ এনামুল হক ডক্টর ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, **ব্যবহারিক বাংলা অভিধান**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ও জুন ১৯৮৪ ।
- মুনতাসীর মামুন, **পূর্ব বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)**, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
- মাহমুদ কবীর, **বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: সূচীপত্র, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খ্রী: ।
- মাহমুদ শফিক, **খালেদা জিয়ার উত্থান**, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০২ খ্রী: ।
- মেঘনা গুহঠাকুরতা, **নারীদের দৃষ্টিতে ধর্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন**, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, **নারী: প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি**, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭ খ্রী: ।
- মেঘনা গুহঠাকুরতা, **সহিংসতা এবং নিপীড়ন : নারী আন্দোলনের প্রক্রিয়া**, সমাজ নিরীক্ষণ, নভেম্বর, ১৯৯৭ ।
- মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, **রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ**, সমাজ নিরীক্ষণ, নভেম্বর ১৯৯৬ ।
- মোতাহার হোসেন সূফী, **বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য**, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬ খ্রী: ।
- সম্পাদনা আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, **বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ**, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২ খ্রী: ।
- মফিজুল হক, **নারী পুরুষ বৈষম্য**, ঢাকা: বিশ্লেষণ প্রকাশনী, ১৯৯৯ ।
- মাহমুদ শামসুল হক, **বাঙালী নারী: হাজার বছরের বাঙালী নারী**, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০০ ।
- যায়েদ সায়েরাফী আবু, **সফর নামা**, তা. বি. ।
- মূল: রামশরণ শর্মা, অনুবাদ: অঞ্জন গোস্বামী, **প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস**, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান লি:, ১৯৯৬ খ্রী: ।
- রফিকুল আলম, **বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মে ২০০১ খ্রী: ।
- রামমোহন রায়, **সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ**, ১৮১৮ খ্রী: ।
- রশিদ রেযা মুহাম্মদ, **হকুক আন-নিসা ফিল ইসলাম**, বৈরুত: মকতবায়ে ইসলাম, ১৯৭৫ খ্রী: ।
- রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়, **সতীদাহ ভারতের কলংক**, দেশ, ১৯৮৭ খ্রী: ।

Dhaka University Institutional Repository

- রমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রী, **'বিদ্যাসাগর' বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি'** কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
- রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সামাজ**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩ খ্রীঃ।
- রওশন কাদির সৈয়দা, **স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার সমস্যা** ও **সম্ভাবনা, নারী** ও **রাজনীতি**, উইমেন ফর উইমেন গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রীঃ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **চরিত্র পূজা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**, ভাদ্র ১৩০২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **রবীন্দ্র রচনাবলী**, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা: বিশ্ব ভারতী, ১৯৬৫ খ্রীঃ।
- রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, **তিথিতত্ত্বম**, কলিকাতা, ১৯০৬ খ্রীঃ।
- সংকলনে মো. রফিকুল ইসলাম, **সংবিধান ও সনদ এ্যালবাম**, ঢাকা: কারেন্ট পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রীঃ।
- রুহুল আমিন, **বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মুলধারার নেতৃত্ব**, ঢাকা: হীরা বুক মার্ট, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩ খ্রীঃ।
- রহমান এ. এ., **বেগম রোকেয়া ও ইসলাম**, ঢাকা: দি উইটনেস।
- লায়লা জামান, **জীবনী গ্রন্থমালা ৩**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, তা. বি.।
- শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী**, ২য় খন্ড, আযমগড়: মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ।
- শামসুর রহমান এ.এফ. এম ড., **প্রাচীন পৃথিবী: ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতা**, রাজশাহী: রোজেন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০০ খ্রীঃ।
- শাহনেওয়াজ এ. কে. এম, **বিশ্বসভ্যতা প্রাচীন যুগ**, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৯৬ খ্রীঃ।
- শাহনেওয়াজ এ. কে. এম, **বিশ্বসভ্যতা মধ্য যুগ**, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা: ১৯৯৭ খ্রীঃ।
- শাহাবুদ্দীন আহমেদ সরকার, **নারী নির্যাতনের রকমফের**, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, মার্চ ২০০১ খ্রীঃ।
- মোহাম্মদ শামসুল হুদা অধ্যক্ষ, **নারীর অধিকার ও মর্যাদা**, ঢাকা: আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫ খ্রীঃ।
- শরৎ রচনাবলী, **নারীর মূল্য**, ৪র্থ খন্ড, তা.বি.।
- শাওকানী আল্লামা, **নায়লুল আওতার**, ৭ম খন্ড, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৩ খ্রীঃ।
- শামসুদ্দীন আয যাহাবী, **তাযকিরাতুল হুফফাজ**, ১ম খন্ড।
- শেহাবুদ্দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, **আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা**, ৪র্থ খন্ড।
- শামসুর রহমান গাজী ও অন্যান্য সম্পাদিত, **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রীঃ।
- শামছুর রহমান গাজী, **মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য**, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল লিঃ, ১৯৯৬ খ্রীঃ।
- শামছুর রহমান গাজী, **নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য আপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন (ভাষ্যসহ)**, ঢাকা: বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, জুন ১৯৯৪।
- শফি মুফতী মোহাম্মদ, অনুবাদ: মহিউদ্দিন খান, **তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন**, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০ খ্রীঃ।
- শামসুল আলম মুহাম্মদ, **'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্য কর্ম'**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ খ্রীঃ।
- শামসুন নাহার মাহমুদ, **রোকেয়ার জীবনী**, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রীঃ।
- শরৎ রচনাবলি, **নারীর মূল্য**, ৪র্থ খন্ড।
- শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, দ্বিতীয় সংস্কার**, কলিকাতা, ১৯৫৭ খ্রীঃ।
- শাহরিয়ার ইকবাল, **মোঘল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রীঃ।
- শামিমা ইসলাম, **বেগম রোকেয়া, অর্জনের ইতিহাস**, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

- **শত বছরের বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ খ্রীঃ।
- শীলা বোস, **রাজনৈতিক পটভুমিকায় বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশ**, এপ্রিল, ১৯৮৮ খ্রীঃ।
- শিরিন সুলতানা, **বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮ খ্রীঃ।
- শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ**, দ্বিতীয় সংস্কার, কলিকাতা, ১৯৫৭ খ্রীঃ।
- শামসুন্নাহার মাহমুদ, **আমি যখন ছাত্র ছিলাম**, ১৯৮৬ খ্রীঃ।
- শাহিন রহমান, **জেন্ডার প্রসঙ্গ**, ঢাকা: স্টেপস্ স্টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮ খ্রীঃ।
- শিরিন সুলতানা, **ক্ষমতা কাঠামোর নারী**, সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স, ২০০১ খ্রীঃ।
- শ্যামলী গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, **নারী ও বিশ্বায়ন**, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪ খ্রীঃ।
- শহীদুল ইসলাম, **বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারী**, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৬ খ্রীঃ।
- সিরাজুল ইসলাম এ. এম. এম., মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া ও অন্যান্য, **ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রীঃ।
- সুলায়মান নদভী সায়্যিদ আল্লামা (রাঃ), **সীরাতুন্নবী**, ৪র্থ খন্ড, আজমগড়: মাতমআ মাআরিফ, তা.বি.।
- সায়িদ আল-শাবালঞ্জি, **নুর আল-আবসর**, কায়রো: আতিফ প্রেস, ১৯৬৩ খ্রীঃ।
- সানাউল্লাহ উসমানী কাজী মুহাম্মদ, **তাফসীরে মাযহারী**, ১ম খন্ড, করাচী: রশিদিয়া কুতুবখানা।
- সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ড., **ইসলামে নারী**, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রীঃ।
- সালাউদ্দিন মুহাম্মদ, **ইসলামে মানবাধিকার**, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ২০০১ খ্রীঃ।
- সায়্যিদ সায়্যিদ আস সাফতী মুহাম্মদ, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ**, ঢাকা।
- সাইয়্যিদ সাবিক, **ফিকহুস সুন্নাহ আল ফাতহ লিল ইলমিল তারাবী**, ২য় খন্ড, কায়রো ১৯৯০ খ্রীঃ।
- স্বপন বসু, **সতী**, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮২ খ্রীঃ।
- স্বপন বসু, **সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর**, দেশ, ২৭ জুলাই ১৯৯১ খ্রীঃ।
- ড. সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, **আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী**, কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ২০০৫ খ্রীঃ।
- কবি সুফিয়া কামাল, **'আমার জীবনে রোকেয়া'**, ঢাকা: সচিত্র সন্ধানী, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৮০ খ্রীঃ।
- সুফিয়া কামাল, **একালে আমাদের কাল**, ঢাকা: জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রীঃ।
- সুফিয়া কামাল, **একাত্তরের ডায়েরী**, ঢাকা: জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রীঃ।
- সুধীরকুমার মিত্র, **হুগলী জেলার ইতিহাস** ও **বঙ্গসমাজ**, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৯১ খ্রীঃ।
- সুকুমার ভট্টাচার্য, **ভারত ইতিহাসে নারী**, কলিকাতা, ১৯৮৯ খ্রীঃ।
- সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, **বাল্যবিবাহ**, ঢাকা, ১৮৭০ খ্রীঃ।
- সোনিয়া নিশাত আমিন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, অনুবাদ: পাপড়ীন নাহার, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০২ খ্রীঃ।
- সেলিনা হোসেন ও দয়মন্তী বসু সিং, **নিঃশব্দ বিপ্লব বাংলাদেশের নারী মুক্তির তিন দশক**, কলকাতা: বিকল্প প্রকাশনী, তা. বি.।
- সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার, মাসুদুজ্জামান, **জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন**, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭ খ্রীঃ।
- সুব্রত সেন, **পণপ্রথা শাস্ত্রে ও সমাজে**, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮ খ্রীঃ।
- সালমা খান, **বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি এনজিও-র ভূমিকা, নারী ২০০৩**, বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও কোয়ালিশন বাংলাদেশ (এনসিবিপি) সচিবালয়: উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ২০০৩ খ্রীঃ।
- সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, **বাল্যবিবাহ**, ঢাকা, ১৮৭০ খ্রীঃ।
- হাসিনা জোয়ার্দার ও শফিউদ্দিন জোয়ার্দার, **Begum Rokeya:The Emancipator**, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

- হান্নানা বেগম, **মানব সম্পদ বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০২ খ্রী: ।
- হান্নানা বেগম, **নৈতিকতা নারী ও সমাজ**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৯০ ।
- Abdullah Seifi Al-Hatimy Said, **Women in Islam**, Lahore: Islamic Publication Ltd., October-1979.
- Altekar A.S., **Education in Ancient India**, Banaras: India book shop, 1951.
- Altekar A.S., **Position of Women in Hindu Civilization**, Banaras, 1956.
- Anis Ahmed, **women and higher Education**, Institute of Policy studies, Islamabad, Pakistan, 1984.
- Arthur Zefri, **The Family in Islam**, New York: Harfar and Row, 1959.
- Asif Fyzee, **Out lines of Muhammadan Law**, 2nd Edition, Oxford, 1995.
- Abdul Ala Maududi Saiyed, **Parda and The Status of Women in Islam**, Translated by Al- Ash'ari, Maktaba Islamia Publisher's, Delhi, 2000.
- Ameer Ali Sayyid, **"The Influence of Woman in Islam", The Nineteenth Century**, May, 1899 Quoted in K. K.Aziz, **Ameer Ali His life and work**, Lahore,1986.
- Ahsan ul Haque Helal, **Vulnerability of Commercial Sex Workers : Viewpoint from Tangail Brothel**, Dhaka, Unpublished, 1999.
- Libra, **Woman hood and the bible**, New York.
- Bhupendra Nath Dutt, **Studies in Indian Social Polity** Chapter-XII, Calcutta, 1944.
- Buchanan C., **Christian Researches in Asia**, 5th Ed. London, 1812.
- Binoy kumar Sarkar, **Varnasrama Dharma and Race fusion in India**, Modern Review, February, 1917.
- **Bengal Education consultaton**. 1878, Quoted Sharif Uddin Ahmed, **A Study in Urban History and Development**, London: Curzon ress, 1986.
- Bashan A. L., **The Wonder That was India**, Fontana, 1971.
- Chakladar H. C., **Social Life in Ancient India; A Study in Vatsyayana's Kamasutra**.
- **Encyclopeadia of Britanica**, 15th ed. 1995, U.S.A, Vol-10.
- **Encyclopeadia Britanica**, Vol - 11,
- **Encyclopeadia of Islam**, Vol. 1.
- **The Jewish Encyclopeadia**, Vol. xii.
- David Hellholm ed. **Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East**, Tubingen, 1983.
- Faraj Basmachi Dr., **Treasures of Iraq Museum**, Baghdad: Ministry of Information, Iraq, 1975-1976.
- Fazlur Rahman M., **The Bengali Muslims & English Education**, Quoted from the rules, aproved by the subscribes and general meeting held on 27 August. 1816. Calcutta Christon Observer. July 1832.
- Fleet, **Corprus Inscriptionum Indicarum**, III.
- Fida Hussain Malik, **Wives of the Prophet,** Pakistan: Ashraf Publication (4th ed.) 1983.
- Fimanbeharif Mazumdar, **History of Political thought from Rammohub to dayannda**, 1821-84, Vol. 1, Bangal Calcutta. 1934.

Dhaka University Institutional Repository

- George sarton, **A History of Science**, Vol-1.
- **Government of India to Government of Britain**, Bengal Beluchation Consultations, XV, 23 March, 1863.
- Hopkins E.W., **Mutual Relations of the Four Castes in Manu,** Leipzig, 1881.
- Hunter W. A., **Introduction to Roman Law**, London, 1934.
- Hunter W. W., **The Indian Mussalmans**, Bangladesh, First Edition Dacca, 1975.
- **History of Marriage**, London, 1926.
- **Human Rights in Bangladesh 1999**, Dhaka: Ain O Salish Kendro (ASK), 2000.
- Hester Marianne Kelly, Liz and Radford, Jill, **Women, Violence and Male power**, Open University Press, Philadalphia, 1996.
- The Indian Gazette, **Polygamy Among the Hindoos**, re-printed from Enquirer, 14.1.1832.
- Jamal a. Badwi, **Woman in Islam**, London: Islamic Council of Europe, 1976.
- John p. Mckay Bennet D. Hill & John Buckler, **A History of world societies**, Boston: Hughton Mifflin, 1992.
- Jolly, **Hindu Law and Custom**, Calcutta, 1928.
- Joshi K. L. and P. D. Shukla. **Women and Education in Indian society, In women and Education**, UNESCO. Paris, 1953.
- Jones Beven, **Woman in Islam**, Lucknow, 1951.
- Joseph Klansner, **From Jesus to paul**, London 1964.
- Josheph Chachat, **Pre Islamic Background of Family Development of Jurisprudence**, Washington: Middle East Institute, 1995.
- Jahanara Huq et.al. **Beijing Process and Follow-up. Bangladesh Perspective**, Women for Women, 1997.
- Khawaz Mumtaz and Farida Shaheed (Eds), **Woman of Pakistan**, Zed books Ltd. London, New Jerscy U. S. A. 1987.
- Katrak Jamshid, **Marriage in Ancient Iran**, Bombay, 1965.
- Kane, P.V, **History of Dharmasastra**, Vol- II, Part I, Puna, 1941.
- Quoted in K. M. Banerjee, **Kulin Polygamy**, Culcutta Review, Vol-XI VII, No, 93, 1868.
- Krishneala Ray., **Education in Medieval India**, B.R. Publishing Corporation. Delhi. 1984.
- Law B.C., **India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism**, London, 1941.
- Latifa Akanda and Ishrat Shamim, **Women and Violence: A Comparative Study of Rural and Urban Violence Against Women in Bangladesh**, Dhaka, Women for Women, 1985
- Masumeh Raghibi Byat, **Women Victim or Victor**, Dhaka: A B. Publications, 1995.
- Madani S. M., **The Family of the Holy Prophet (Sm)**, Delhi: Adam Publishers, India.

Dhaka University Institutional Repository

- Mitter D.N., **Position of women in Hindu Law.**
- Marshman J.C., **The Life and Times of Carry, Marshman and Ward**, Vol-I, London, 1859.
- Max Muller, quoted in M. F. Billington, **Women in India**, Re–printed: New Delhi, 1973.
- Mohammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, **Islamic Fatawa Regarding Women**, Darussalam Publisher's Riyad, 1996.
- Molla M.K.U., **The New Provinced of Eastern Bengaal and Assam**, Journal of Institute of Bangladesh studies, Rajshahi, 1981.
- Mahubul Haq and Khadiza Haq, **Human development in South Asia**, Oxford, karachi, 1998.
- Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, **The position of Woman in islam**, Kuwait: Islamic Book Publishers, 1982.
- Nazirah Zein Ed-Din, Edited by Azizah Al Hibri, **Women and Islam**, England: Perganon Press, Oxofrd.
- O'Leary De Lacy, **Arabia Before Muhammad**, London, 1927.
- Pandey R.B., **Vikramaditya of Ujjayini**, Banaras. 1951.
- Polpishi, Victor, **Devorce and Marriage**, London.
- Pusalker A. D., **Bhasa, A study**, Lahore, 1940.
- **The Progress of Nations 1999**, UNICEF, Bangladesh 2000.
- **Report of the Backward class Commission (Mondal Commission)** Government of India, New Delhi, 1980, Part 1, vol 1.
- Risley H. H., **The people of India**, London, 1915.
- Ramprasad Chanda, **Intercaste marriage in Buddhist India**, Modern Review, 1919.
- Remabai Saraswari P., **The High Caste Hindu Women**, 2nd ed. Philadalphia, 1887.
- Rustum and Zurayk, **History of the Arabs and Arabic Culture**, Beirut 1940.
- Report of Commission, **Marriage, Devorce and the Church**, London: 1971.
- Roy Choudhuri T., **Bengal under Akbar and Jahangir**, Colcutta, 1953.
- Radhakumud Mookherji, **Ancient Indian Education: Brahamanical and Buddhist**, Macmellan, London, 1747.
- Roushan Jahan, **Hidden Danger: Women and Family Violence in Bangladesh**, Women for Women, Dhaka, 1994.
- Rounaq Jahan, **The Elusive Agenda: Mainstreaning Women in Development**, Dhaka: University Press Limited, 1995.
- Sushil Chowdhury, **'A Note on sati in Medieval India' 'Proceedings of the History Congress'**, Part- 2 & 3, Rachi, 1964.
- Stuss, **Constitutional History of England**, 3rd Edition, Chapter-1.
- Shingha S.D., **Polyandry in Ancient India**, Chapters II, III.
- Scrafton L., **A history of Bengal before and After Plassey**, Re-printed, Kolkata, 1975.
- Smith W., **Kinship and marriage in Early Arabia**, London, 1970.
- Sabatino Moscati, **Ancient Semitic Civilization**, London, 1957.

Dhaka University Institutional Repository

- Shaner, Donald W, **A Christian view of Devorce**, London, 1996.
- S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, 2nd ed. Calcutta, 1974.
- Salma Khan, **The fifty Percent women in Development and policy in Bangadesh**, Dhaka: University Press Limited.
- R. Bhuiyan, **"Legal status of Women in Bangladesh' in Situation of Women in Bangladesh"**, Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, Government of Bangladesh, Dhaka, 1985.
- Tamesh Chandra Mazumdar, "**Ideal and Position of Indian Women in Domestic Life**"; Great Women of India (ed.) Swamei and Mazumder.
- Thomas, Bertram, **The Arabs**, London, 1937.
- Taslima Monsoor, **Prevention of child Marriage by the Child Marriage Restraint Act, 1999**, Legal Implications and Social Reality, a Seminar paper. (mimeo)
- U. May Oung, **Buddhist Law**, Part 1.
- UNICEF, **Inventory for Women's Organizations in Bangladesh**, S. Khan, S. Islam, J. Rahman & M. Islam (eds), Womens Development UNIT, UNICEF, Bangladesh, June, 1981.
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) **World Education report**, Paris, 1998.
- UNICEF, **Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh** 1998.
- Wau-Block, **The Sexual Life of our time**, p: 49; August Forel, **The Sexual Question,**
- Ward W., **A View of the History, Literature and Mythology of the Hindos**, Voll-II, Serampur, 1815.
- Wahiduddin Khan, **Woman Between Islam and Western Society**, New Delhi: Islamic center, 1997.

প্রবন্ধ

- **মানসম্মত শিক্ষাপত্র**, *গণসাহায্য সংস্থা*, জুলাই ১৯৯৬, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা।
- ড: নাজমা চৌধুরী কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ **'নারী ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন**, '৩ জানুয়ারি, ১৯৯৭।
- মো: নুরুল ইসলাম, **নারীর নিরাপত্তায় বাংলাদেশের প্রচলিত সামাজিক আইন ঃ একটি পর্যালোচনা**, *ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৬৬, ফেব্রুয়ারী ২০০০, খ্রী: ।
- *'নারী বার্তা'* প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, **নারী ও উন্নয়ন**, ড: নাজমা চৌধুরী, 'উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট : এ গাইড বুক ফর প্যানারস' (খসড়া রিপোর্ট), ১৯৯৪।
- ফেরদৌস হোসেন, **বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকা**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন ১৯৯৮।
- মো: মাসুদ আলম, **ইসলামে নারীর মর্যাদা ও বাংলাদেশের নারী সমাজ**, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ৪৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২০০৮।
- গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন্নেসা খাতুন**, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন-১৯৯৯ খ্রি: ।
- মর্তুজা খালেদ, **জরথুস্ত্রবাদ ও প্রাচীন পারসিক ধর্ম: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োদশ খন্ড, ২০০৪
- *অবোধ বন্ধু*, **এতদ্দেশীয় বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা**, ভাদ্র ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

- *বামাপ*, **কুলীন বহুবিবাহ (কবিতা): বামাগণের রচনা**, পৌষ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
- ওয়াকিল আহমদ, **সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন**, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৩-৮৪ বঙ্গাব্দ।
- ওয়াকিল আহমদ, **বাংলার বিদ্যাসভা ঃ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সপ্তম সংখ্যা, জুন ১৯৭৮।
- মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ঢাকা ঃ **মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সাহিত্যিক**, ১৪শ বর্ষ, বসন্ত, সংখ্যা ১৩৮৪।
- **সমাজে নারীর স্থান শীর্ষক প্রবন্ধ**, *আর্য গেজেট* ১৯৩০ সাল, ২২ নভেম্বর, ভারত।
- **'বঙ্গ-মোসলেম সমাজে মহিলা-জীবন'**, মহিলা-মহফিল, *মোয়াজ্জিন*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৫ (১৯২৮)।
- অধ্যাপক কাজী আনোয়ার কাদির, **'বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক গলদ'**, *মোয়াজ্জিন*, ৩য় বর্ষ, বন্যা-দুর্ভিক্ষ সংখ্যা, আষাঢ় - চৈত্র, ১৩৩৮
- সিরাজী, **'স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা'**, *আল্ -এস্লাম*, ২য় ভাগ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৩ (১৯১৭),
- ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, **স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা**, *আল-এসলাম*, ২য় ভাগ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৩ (১৯১৭)।
- আবুল হোসেন, **'নারীর অধিকার'**, *সাধনা*, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৮ (১৯২১)।
- মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা, **'পর্দা'** *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ, ১৩৪০ (১৯৩৩)।
- মিসেস আর এস, হোসেন, **'অবরোধবাসিনী'**, *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৭ (১৯৩০)।
- ডাঃ এম. এ মালেক, **অবরোধ প্রথার অপকারিতা**, *মাসিক মোহাম্মদী*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৫ (১৯২৯)।
- রিজাউল করীম, **'গৌরবের যুগে মুসলিম রমণী'**, *সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৪ (১৯২৭)।
- আমিনুল হক, **'অবরোধ প্রথা ও নারী জাতির শিক্ষা'**, *সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৪ (১৯২৭)।
- রিজাউল করিম, **'গৌরবের যুগে মুসলিম রমণী'**, *সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়-১৩৩৪ (১৯২৭)।
- মরহুম কাজি ইমদাদুল হক, **'বিবিধ প্রসঙ্গ'**, *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৩।
- সৈয়দ এমদাদ আলী, **'খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক'**, *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৩।
- মুজিবর রহমান, **তরুণের কাজ**, *সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪, ১৯২৭ খ্রীঃ।
- ইমদাদুল হক, **'ধর্ম্ম ও শিক্ষা'**, *নবনূর*, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১০ (১৯০৪)।
- মিসেস আর, এস, হোসেন, **'আমাদের অবনতি'**, *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১১ (১৯০৪)।
- মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, **'বাংলার মুসলিম নারী'**, *মাতৃ-মঙ্গল, ভারত বর্ষ*, ১৩শ বর্ষ, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩২ (১৯২৫)।
- শ্রী সুধীন্দ্রলাল রায়, বি.-এ. **'বীণার তান'**, *ভারতবর্ষ*, ৫ম বর্ষ, ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৪ (১৯১৭)।
- মোহাম্মদ আব্বাস আলী, বি. এ. **'এসলাম ও নারী'** *শরীয়তে-এস্লাম*, ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ, ১৩৪৫ (১৯৩৮)।
- মোঃ আহাদ আলী, **হেড পন্ডিত স্ত্রী শিক্ষা**, *শরিয়তে-ইসলাম*, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৭, ১৯৩০, খ্রীঃ।
- *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, **বিধবা বিবাহ**, চৈত্র ১৭৭৬ (১৮৫৫)।
- Shahanaz Husain, **`Glimpes in the Condition of Bengali Muslim Women during the later half of the Nineteenth Century : A Study Based on the**

Dhaka University Institutional Repository

Bamabodhini Patrika', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, University of Rajshahi, Vol.iii. 1978.

পত্রিকা

- নাজমুন নাহার, **সম্ভ্রমহানী কি ধর্ষণের প্রতিশব্দ?** *ভোরের কাগজ*, অক্টোবর ১২, ১৯৯৮, ঢাকা।
- নাজমা চৌধুরী, **'নারীর ক্ষমতায়ন': রাজনৈতিক প্রেক্ষিত**, *ভোরের কাগজ*, ২ নভেম্বর, ১৯৯৬।
- শাহেদ আলী, **দৌলতুন্নেসা খাতুন, অন্তরঙ্গ আলোকে**, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৫ই আগষ্ট-১৯৯৭ খ্রীঃ।
- গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন্নেসা খাতুন**, *দৈনিক বার্তা*, রাজশাহীঃ ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ খ্রিঃ।
- *সোমপ্রকাশ*, **হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইবে কিনা**, কোলকাতাঃ ২রা আষাঢ়, ১২৯২।
- শিশির কুমার ঘোষ, **বিধবা বিবাহ**, *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১১ মার্চ ১৮৬৯।
- *সোমপ্রকাশ*, **বাল্যবিবাহ ও হিন্দু হিতৈষিনী**, সাবাস ৪, ২৫ ভাদ্র ১২৮৫।
- দৈনিক পত্রিকা, *জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ইনকিলাব*, ২ অক্টোবর ২০০১।

....